বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ

হরপ্রসাদ মিত্র

বি. সরকার এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

প্রকাশক :
বি. সরকার
বি. সরকার এণ্ড কোং
১৫, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

মহালয়া, ১৩৭০
১৭ই অক্টোবর, ১৯৬৩

মুদ্রাকর :
শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা
মুদ্রণী
৭১, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৬

দশ টাকা

উৎসর্গ

জনক-জননীর স্মৃতিতর্পণ

ধর্ম যার মর্মকথা, কর্ম যার বাণী,
বক্ষে প্রেম, চক্ষে ক্ষেম, সব্যসাচী পাণি,—
বঙ্গের বঙ্কিম সেই শাশ্বত সুপ্রিয়,
সে শুধু সম্রাট নয়—সে যে অদ্বিতীয় !

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

ভূমিকা

বাংলা সাহিত্যে উনিশ শতকের নব আন্দোলনের প্রথম ফসল মধুসূদনের কাব্য, কবিতা, নাটক, প্রহসন। মধুসূদন বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই কলম ধরেন। ইতিহাসের ধারা বিশ্লেষণ ক'রে দেখলে তাঁকেই আমাদের নতুন সাহিত্যের প্রথম স্রষ্টা ব'লতে হয়। তাঁর মৃত্যুতে বঙ্কিম লেখেন: 'কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।'

কিন্তু মধুসূদনের কবিতা সে-যুগে সাধারণ পাঠকসমাজে যতোটা প্রবেশের সুযোগ পেয়েছে, বঙ্কিমের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধের জনপ্রিয়তা ছিল সে তুলনায় অনেক বেশি। শিক্ষিত জনচিত্তের দিক থেকে একথা মানতেই হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্রই আমাদের প্রথম ভাবনেতা। তিনিই আমাদের সর্বাধিক সংখ্যক পাঠকের বোধগম্য প্রথম ভাবুক শিল্পী। ব্যক্তি-মনের স্বাতন্ত্র্যবোধ, আর, সমষ্টির কল্যাণচিন্তা,—তাঁর সাহিত্যলোকে এ-দুইই সু-ব্যক্ত। বৃহৎ পাঠক-সমাজের মনন এবং কল্পনা উদ্দীপিত করবার সার্থক নেতা হিসেবে বঙ্কিমই ছিলেন আমাদের উনিশ শতকের প্রথম স্মরণীয় লেখক।

'বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ' বাংলা সাহিত্যের সেই অদ্বিতীয় লেখকের গদ্য-পদ্য যাবতীয় রচনার পাঠক-কৃত্য। অনেক আলোচক এ-পথে অনেক আনন্দের কথা লিখে গেছেন। পূর্বালোচকদের দান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ ক'রে, বর্তমান লেখকও এখানে নিজের আনন্দ যোগ করবার চেষ্টা ক'রেছেন।

স্বর্গত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আমাকে এ কাজে প্রথম উৎসাহিত করেন। আজ তাঁর কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। বন্ধুবর অধ্যাপক ভোলানাথ ঘোষের আগ্রহের ফলে প্রকাশক শ্রীযুক্ত ভারত সরকার এ-গ্রন্থ প্রকাশে উদ্যত হন। তাঁদের ঋণ অপরিশোধনীয়।

স্নেহাস্পদ অধ্যাপক শ্রীপুলিনবিহারী দাস, এম. এ. এ-বইয়ের 'প্রসঙ্গ-নির্দেশিকা'র পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ক'রতে সাহায্য ক'রেছেন।

কয়েকটি ছাপার ভুল হয়েছে। কয়েকটি ত্রুটি পৃথক পৃষ্ঠায় দেখিয়ে দেওয়া হোলো।

মহালয়া, ১৩৭০
প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা

হরপ্রসাদ মিত্র

অধ্যায়-সূচী

বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ

বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ

আদিকথা

॥ ১ ॥

ব্যক্তিবোধ, সমাজবোধ, স্বদেশবোধ এবং পরিশেষে অখণ্ড আন্তর্জাতিকতার দিকে আগ্রহ,—বিশেষ সময়ে, বিশেষ দেশে,—একই ব্যক্তির মধ্যে অথবা কোনো কোনো জনসমষ্টিতে যুগপৎ এই চার উপলব্ধির সমন্বয় অসম্ভব নয়। যে-যুগে বঙ্কিমচন্দ্র দেখা দিয়েছিলেন, সে-ছিল এই রকম বিচিত্র স্ফুরণের যুগ। তাঁর জন্মের আগেই এদেশে মধ্যযুগের অবসান ঘটে গেছে। রামমোহন এসে লোক-প্রবৃত্তির মোড় ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তখন থেকেই এদেশে বৃহৎ জন-জাগরণের সূত্রপাত!

তাঁর অল্প বয়সের কবিতায় কৈশোরক বেদনার চিহ্ন আছে। ১৮৫২র ২৮এ ফেব্রুয়ারি 'সমাচার দর্পণে' 'বিরলে বাস' নামে তাঁর যে কবিতাটি ছাপা হয়, তাতে নির্জনতা-প্রীতির কথা ছিল। এদিক থেকে রবীন্দ্রনাথের বাল্য-রচনার সঙ্গে তাঁর বাল্য-রচনার ক্ষীণ সাদৃশ্যও অনুভব করা যায়। কিন্তু সে-সাদৃশ্য ধর্তব্য নয়। কারণ, প্রথমতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের কবি-কর্ম তুচ্ছ; দ্বিতীয়তঃ পনেরো-ষোলো বছর বয়সে তিনি যা লিখে গেছেন, সে-সব রচনায় তাঁর পরিণত ব্যক্তিত্বের আভাসমাত্রও অনুপস্থিত। তিনি তখন ঈশ্বর গুপ্তের অনুরাগী কিশোর। পনেরো বছরের বালকের পক্ষে 'বিষয়ে বিরক্ত হয়ে স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে' বাস করবার সুখ কামনা করা নিতান্তই কৃত্রিম ব্যাপার! কৈশোরক কবি-কল্পনার দীর্ঘশ্বাস যোগ ক'রে বালক বঙ্কিম লিখেছিলেন:

'চাতুরী আশঙ্কা দুঃখে পূর্ণিত সংসার।
সত্য সুখ বনে, শুদ্ধ ছায়া সহকার॥'

মানুষের দুঃখ যে প্রধানতঃ মানুষেরই কর্মফল, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য উভয় ক্ষেত্রের জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা ক'রে, শেষ-বয়সে তিনি এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেছেন। সর্বসুখী, সর্বগুণযুক্ত মানুষ যে একেবারেই অসম্ভব, সে-কথা তিনি বলেননি; তবে, 'ধর্মতত্ত্বে'র চতুর্থ অধ্যায়ে 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে 'গুরু'কে দিয়ে তিনি বলিয়েছেন: 'ইহা স্বীকার করিব যে, এ পর্যন্ত কেহ কখন [তাহা] হয় নাই।' তাঁর সেই লেখাটিতেই 'গুরু' বলেন: 'যে শিশু দেখিতেছ, ইহা

মানুষের অঙ্কুর। বিহিত কর্ষণে অর্থাৎ অনুশীলনে উহা প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রাপ্ত হইবে। পরিণামে সর্বগুণযুক্ত, সর্বসুখসম্পন্ন মনুষ্য হইতে পারিবে। ইহাই মানুষের পরিণতি।' বঙ্কিম ছিলেন এই বিশ্বাসের মানুষ।

তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, রামকমল ও কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য,—রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ইত্যাদি মনীষী কোঁতের নিশ্চয়বাদ বা ধ্রুবদর্শনের অনুরাগী ছিলেন; 'ক্যানিং ইন্‌স্টিটিউটে' রেভারেণ্ড ম্যাকডোনাল্ড প্রভৃতি এই মতবাদের আলোচনা করেন। বঙ্কিম কন্‌গ্রিভের ধ্রুববাদী আলোচনা দেখেছেন; কোঁৎ, মিল, লক্, বেন্থাম, হ্যামিল্টন, রীড্, স্টুয়ার্ট, স্পেনসার ইত্যাদি দার্শনিকের লেখাও প'ড়েছেন,—আবার কুল্লুক ভট্ট অথবা রঘুনাথ শিরোমণির সঙ্গে মেধাবী রামমোহনকে এক আসনে অধিষ্ঠিত ব'লেও অনুভব করেছেন; জয়দেব গোস্বামীর পরে বাংলায় বহুকাল পরে বড়ো কবির অভ্যুদয় যে মধুসূদনের মধ্যে,—এও তিনিই লিখে গেছেন! তাঁর পথ প্রধানতঃ সাহিত্যসৃষ্টির পথ। তাতে যুক্তি, তর্ক, তথ্য, তত্ত্ব সবই আছে,—কিন্তু 'সবার উপরে' তাঁর আনন্দ আর কল্যাণবোধ!

বঙ্কিম-সাহিত্যের নানা বিভাগ, নানা প্রদেশ। প্রথম-জীবনের অক্ষম কবিতা আর অস্ফুট জীবন-চিন্তা থেকে শুরু ক'রে, শেষ-জীবনের গভীর তত্ত্বালোচনার সীমা অবধি তাঁর সুদীর্ঘ সৃষ্টিকালের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কম নয়।

প্রচলিত বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীতে তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি 'উপন্যাস' খণ্ডে এবং তাঁর প্রবন্ধাদি অন্যান্য রচনা তথাকথিত 'সাহিত্য' খণ্ডে সংকলিত হ'য়েছে ব'লেই এ-আলোচনার 'বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠ' নামটি কোনো কোনো পাঠকের মনে কিঞ্চিৎ বিভ্রম ঘটাতে পারে। তাই, আলোচনার শুরুতেই ব'লে নেওয়া দরকার যে, তাঁর সমস্ত সাহিত্য-রচনাই এর বিষয়ীভূত। ১৮৫২-৫৩ থেকে শুরু ক'রে,—শেষ পর্যন্ত তিনি বাংলায় তাঁর গদ্য-পদ্য যতো লেখা প্রকাশ ক'রেছেন, সেই সব-কিছু নিয়েই তাঁর সুবিপুল সাহিত্যলোক। তাঁর ইংরেজি লেখাগুলি পৃথকভাবে আলোচিত হ'তে পারে। কিন্তু একসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিত্বের মূলকথার মধ্যে সে-সব কথারও উল্লেখ অনিবার্য।

রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, রামকৃষ্ণ, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম, নাট্যাচার্য গিরিশ, রবীন্দ্রনাথ, সুরেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ ইত্যাদি মনীষীদের মনে রেখে, ইতিহাসের দিকে নজর রাখলে, উনিশ শতকের বঙ্গ-সংস্কৃতিতে সর্বাধিক স্মরণীয় কোন্ কোন্ ভাবতরঙ্গের ধাক্কা লেগেছিল, সেটা অনুভব

করা যায়। সেই শতবর্ষের সব কথা কেবল এই ক'জনেই যে নিঃশেষে ব'লে গেছেন, তা নয়। আরো অনেকেই ছিলেন। অক্ষয়কুমার, রাধাকান্ত দেব, ঈশ্বরগুপ্ত, রঙ্গলাল, ভূদেব, প্যারীচাঁদ, কালীপ্রসন্ন সিংহ, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল, দীনবন্ধু, অমৃতলাল, নবীনচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল ইত্যাদি অনেকের সমাবেশ ঘটেছিল সে-সময়ে। কেশবচন্দ্র সেন, রামকৃষ্ণ, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, বিবেকানন্দ, ব্রহ্মবান্ধব প্রভৃতি ভাবসাধকের অভ্যুদয়ও সেই উনিশ শতকের ঘটনা। জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রও উনিশ শতকের জাতক।

ভাব, ভাবনা এবং লোকব্যবহারের ক্ষেত্রে মধ্যযুগের প্রান্তসীমা পেছনে ফেলে, আমরা প্রথম আধুনিক যুগে প্রবেশ ক'রেছি সেই উনিশ শতকেই। এবং সে শুধু প্রবেশ মাত্রই নয়। বঙ্গ-সংস্কৃতির নবযুগের উদ্ভব, বিকাশ এবং পরিণতি ঘটেছিল সেই উনিশ শতকেই। আমাদের শিক্ষার সংস্কার, স্বাধীনতার সাধনা, সাহিত্যবোধের উন্নয়ন, ব্যক্তিত্ববোধের প্রতিষ্ঠা, গভীর অধ্যাত্মজাগৃতি এবং প্রবল যুক্তিবাদ—এ সবের সূচনা, বিকাশ, পরিণতি ঘটেছিল সেই উনিশ শতকে। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন রামমোহনের 'বেদান্ত-গ্রন্থ' প্রকাশিত হয়, তখন আমাদের গদ্য ছিল অস্ফুট, দুর্বল, জটিল এবং কৃত্রিমতাময়। মিশনারী সাহেবদের আনুকূল্যে, পণ্ডিত আর মুন্সীদের পরিশ্রমে বাংলা গদ্যের গোড়া-পত্তন তখন সবে শুরু হ'য়েছে। রামমোহন অনুভব ক'রেছিলেন যে—প্রথমত 'বাঙ্গলা ভাষাতে আবশ্যক গৃহব্যাপার নির্ব্বাহের যোগ্য কেবল কথকগুলিন শব্দ আছে'—দ্বিতীয়ত এ ভাষা সংস্কৃতের অধীন, —তৃতীয়ত 'এ ভাষায় গদ্যতে অদ্যাপি কোনো শাস্ত্র কিম্বা কাব্য বর্ণনে আইসে না'। পাঠকদের অবগতির জন্যে তাঁকে জানিয়ে দিতে হয়েছিল—'বাক্যের প্রারম্ভ আর সমাপ্তি এই দুইয়ের বিবেচনা বিশেষ মতে করিতে উচিত হয়। যে যে স্থানে যখন যাহা যেমন ইত্যাদি শব্দ আছে তাহার প্রতিশব্দ তখন তাহা সেইরূপ ইত্যাদিকে পূর্বের সহিত অন্বিত করিয়া বাক্যের শেষ করিবেন। যাবৎ ক্রিয়া না পাইবেন তাবৎ পর্যন্ত বাক্যের শেষ অঙ্গীকার করিয়া অর্থ করিবার চেষ্টা না পাইবেন। কোন্ নামের সহিত কোন্ ক্রিয়ার অন্বয় হয় ইহার বিশেষ অনুসন্ধান করিবেন যেহেতু এক বাক্যে কখন কখন কয়েক নাম এবং কয়েক ক্রিয়া থাকে ইহার মধ্যে কাহার সহিত কাহার অন্বয় ইহা না জানিলে অর্থজ্ঞান হইতে পারে না· ····।'

রামমোহনের [১৭৭৪-১৮৩৩] ধর্ম-আন্দোলন আর সমাজ-সংগঠনের কর্মভূয়িষ্ঠ পর্ব গেছে ১৮১৫ থেকে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। তাঁর এই রচনার পঞ্চাশ বছর পরে, গ্রন্থাকারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশিত হয়। তার কিছু আগেই—১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখা হ'য়েছিল। 'দুর্গেশনন্দিনী' লিখে ফেলেও তিনি কিন্তু বেশ কতকটা সন্দেহান্বিত ছিলেন। কাঁটালপাড়ার বাড়িতে তিনি সে-লেখা অনেককে প'ড়ে শুনিয়েছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র লিখে গেছেন :

> 'এক সময়ে বড়দিনের কি মহরমের ছুটিতে আমার মনে নাই, অনেক ভদ্রলোক আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শিক্ষিত, অশিক্ষিত উভয় সম্প্রদায়ের লোকই ছিল। ভাটপাড়ার পণ্ডিতগণও ছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার হস্তলিখিত 'দুর্গেশনন্দিনী' তাঁহাদের নিকট পাঠ করিতে আরম্ভ করিলেন। সকলে নিঃশব্দে বসিয়া শুনিতে লাগিলেন ; কেহ ঐ ঘরে প্রবেশ করিলে শ্রোতৃগণ বিরক্ত হইয়া উঠিতেছিলেন।'

এইভাবে দু'দিন প'ড়ে পাঠ শেষ করা হয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' এতই চিত্তাকর্ষক হয়েছিল যে, শ্রোতারা তামাক খেতে ভুলে গিয়েছিলেন! পড়া শেষ ক'রে বঙ্কিম উপস্থিত পণ্ডিতদের জিজ্ঞাসা করেন যে, তাঁরা ব্যাকরণের দোষত্রুটি কিছু লক্ষ্য করেছেন কিনা। মধুসূদন স্মৃতিরত্ন বলেছিলেন : 'গল্প ও ভাষার মোহিনী শক্তিতে আমরা এতই আকৃষ্ট হইয়াছিলাম যে, আমাদের সাধ্য কি যে অন্যদিকে মন নিবিষ্ট করি।' চন্দ্রনাথ বিদ্যারত্ন বলেন : 'আমি স্থানে স্থানে ব্যাকরণদোষ লক্ষ্য করিয়াছি বটে, কিন্তু সেই সেই স্থানে ভাষা আরও মধুর হইয়াছে।'

বাংলা সাহিত্যের আসরে তখন বড় বড় ঘটনা ঘটতে শুরু হ'য়েছে। এক রকম সৌষম্যহীন বাংলা গদ্যে সমাচার-দর্পণ, সমাচার-চন্দ্রিকা, সংবাদ-কৌমুদী, বঙ্গদূত, জ্ঞানানেষণ, সংবাদ-প্রভাকর প্রভৃতি পত্র-পত্রিকায় সাহিত্য-প্রয়াসের সূচনা তার কিছু আগের ঘটনা। চল্লিশের দশকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩), এবং পঞ্চাশের দশকে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের [১৮২২-১৮৯১] 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' (১৮৫১) বেরিয়েছিল। প্যারীচাঁদ মিত্র [১৮২২-৯১] আর রাধানাথ শিকদারের 'মাসিক পত্রিকা'ও ১৮৫৪তে আত্মপ্রকাশ করে। তার

আগেই বিদ্যাসাগরের [১৮২০-৯১] হাতে বাংলা গদ্যের সংস্কার আরম্ভ হ'য়েছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের [১৮১৭-১৯০৫] 'ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যা' বই হ'য়ে বেরিয়েছিল ১৮৬১তে। ইংরেজি গদ্য-পদ্যের বঙ্গানুবাদে তখন ছিল অভূতপূর্ব প্রাচুর্যের কাল। মাধবচন্দ্র শর্মার 'ঋতুসংহার' [১৮৫৫], দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূত' [১৮৬০] এবং অন্যান্য লেখকের লেখা সংস্কৃত কাব্যের অন্যান্য অনুবাদও তখন পাঠক-সমাজে সুপরিচিত! ইংরেজি রোমান্সের আদর্শে ভূদেব মুখোপাধ্যায় [১৮২৫-৯৪] তখন বাংলা উপন্যাস-চর্চার পথ দেখিয়েছেন। সরকারী উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত 'ভার্নাকিউলার লিটারেচার সোসাইটি'র [১৮৫১] অনুবাদের উদ্যমও তখনকার লোকবিশ্রুত আন্দোলন। আশুতোষ দেবের বাড়িতে নন্দকুমার রায়ের 'অভিজ্ঞান-শকুন্তলা'র অভিনয় আর রামজয় বসাকের বাড়িতে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীনকুলসর্বস্ব নাটকে'র অভিনয়ও ১৮৫৭র ঘটনা। গদ্য-পদ্য-নাটক প্রহসন, সব ক্ষেত্রেই দেশে তখন নতুন নতুন উদ্যম দেখা দিয়েছে।

কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বঙ্কিম যখন তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' প'ড়ে শোনান, তারই বছর চার-পাঁচ আগে মধুসূদনের 'শর্মিষ্ঠা' [১৮৫৯] বেরিয়ে গেছে। কালীপ্রসন্ন সিংহের [১৮৩০-৭০] মহাভারতের গদ্য-অনুবাদ তারই সমকালীন ঘটনা। আর, তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নকশা'ও [১৮৬২-৬৩] তখন বেরিয়ে গেছে।

রাজা ঈশ্বরচন্দ্র সিংহকে মধুসূদন তাঁর 'শর্মিষ্ঠার' পাণ্ডুলিপি দিয়েছিলেন। ঈশ্বরচন্দ্র সেই পাণ্ডুলিপি দেখতে দেন তাঁদেরই সভাপণ্ডিত প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশকে। নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' থেকে সেই ঘটনার এই বিবরণটুকু স্মরণীয় :

> 'যথা সময়ে প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ নাটকখানি লইয়া রাজসভায় উপস্থিত হইলেন। ঘটনাক্রমে মধুসূদনও সেই সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তর্কবাগীশকে দেখিয়াই মধুসূদন বলিলেন 'আপনি আপত্তিকর স্থানসমূহে দাগ দিয়াছেন কি ?' তর্কবাগীশ হাসিয়া বলিলেন, 'দাগ দিতে গেলে কিছু থাকবে না। তবে কি না, আমি যে চোখে দেখছি, সে রকম চোখ আর গোটা দুই লোকের আছে। আমরা ফতে হয়ে গেলে তোমার বই খুব চলে যাবে, বাহবা বাহবা পড়বে।' [১]

১। মধুস্মৃতি। ভাদ্র, ১৩৬১ সংস্করণ। পৃঃ ৯২-৯৩।

বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'র গদ্য সম্বন্ধেও প্রতিকূল মতের অভাব হয়নি। ভাটপাড়ার পণ্ডিতরা খুশি হয়েছিলেন বটে, কিন্তু কলকাতার পণ্ডিতসমাজে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণের [১৮২০-৮৬] মতন মানুষ ছিলেন। দ্বারকানাথের 'সোমপ্রকাশে' বঙ্কিমী ভাষার নিন্দাজনক সমালোচনা ছাপা হ'য়েছিল। সে-ভাষায় গুরুচণ্ডালী লক্ষ্য ক'রে তাঁরা সে-ভাষাকে 'শব পোড়া মড়া দাহ' বলে বিদ্রূপ করতেন।

এই পক্ষ-প্রতিপক্ষের কোনো তরফেই আন্তরিকতার অভাব ছিল না। যাঁরা সংস্কারের পক্ষে ছিলেন, তাঁদেরও যেমন দৃঢ় বিশ্বাস, যাঁরা ছিলেন সংরক্ষণে আগ্রহী, তাঁরাও ছিলেন সেই রকমই আন্তরিক। বিপরীত মতামতের তীব্র অভিব্যক্তি ছিল, কোনো পক্ষেই নিষ্প্রাণ স্থাণুত্ব ছিল না। উনিশ শতক ছিল এদেশের সর্বব্যাপী জাগরণের কাল। রামমোহনের বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ধর্মমতের নিরাকারবাদে সেকালের প্রগতিশীল নবীন-প্রবীণ শিক্ষিত বাঙালী খুবই ঝুঁকেছিলেন বটে, কিন্তু তারই পাশাপাশি লৌকিক আচার ছিল, প্রাচীনপন্থী সনাতনীরাও ছিলেন।

শতকের প্রথম দিকেই ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে রাজনারায়ণ বসুর [১৮২৬-৯৯] পিতা নন্দকিশোর জন্মগ্রহণ করেন; তাঁর জন্মের দু'বছর পরে তাঁর সহোদর হরিহরের জন্ম হয়। তরুণ বয়সেই হরিহর ছিলেন রামমোহনের অনুবর্তী। একদিন, তাঁদের বোড়ালের বাড়ির সামনে এক পুকুরপাড়ে ব'সে হরিহর রামমোহনের বই প'ড়ছিলেন। বোড়াল কলকাতা থেকে মাত্র ছয় ক্রোশের পথ। গ্রামের রামধন তর্কবাগীশ সেই পথ দিয়ে যেতে যেতে, হরিহরকে সেই বই প'ড়তে দেখে, তাঁর হাত থেকে বইখানি কেড়ে নিয়ে সেই পুকুরের জলে ফেলে দেন! দেশের বৃহত্তর পরিসীমার মধ্যে বোড়াল গ্রামের এই তর্কবাগীশ, আর অন্য পক্ষে, এই 'ব্রহ্মজ্ঞানী দলের' উৎসাহী প্রতিনিধি হরিহরের মতন নিশ্চয় আরো অনেক মানুষ ছিলেন। তাঁরা কখনো-কখনো দলাদলি ক'রেছেন বটে, কিন্তু সামাজিকতা ছিল সহজ স্বভাব। রাজনারায়ণের পিতামহ রামসুন্দরের সমাজপ্রীতির কথা রাজনারায়ণ নিজেই লিখে গেছেন। আর, তাঁর পিতা নন্দকিশোর,—যিনি ছেলেবেলায় রামমোহনের ইস্কুলে ইংরেজি প'ড়েছিলেন,—বিশুদ্ধ ইংরেজিতে যিনি চিঠিপত্র লিখতেও পারতেন,—রামমোহন নিজে যাঁকে স্নেহবশে, এক স্ত্রী বর্তমানে দ্বিতীয়বার বিয়ে ক'রতে

নিষেধ করেন,—সেই নন্দকিশোর বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নিরাকার ব্রহ্মে বিশ্বাস রাখলেও লোকাচার উল্লঙ্ঘনে সত্যিই বিমুখ ছিলেন। রাজনারায়ণের কথায়—

> 'পিতাঠাকুর বেদান্ত-প্রতিপাদ্য নিরাকারবাদে বিশ্বাস করিতেন. কিন্তু তাঁহার এই মত ছিল যে, ভিতরে যাহা মত থাকুক না কেন, 'তথাপি লৌকিকাচারং মনসাপি ন লঙ্ঘয়েৎ' মনেতেও লৌকিকাচার উল্লঙ্ঘন করিবে না। তিনি কোষাকুষি লইয়া রোজ পূজা আহ্নিক করিতেন, আর একটি প্রেকের উপর তুলসীর মালা ঝুলানো থাকিত। রামমোহন রায়ের অনুবর্তী ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির বাটিতে যাইলে তাহা পরিয়া যাইতেন।' [২]

শতাব্দীর প্রথম পাদেই দেশের সংস্কৃতি-ক্ষেত্রে, একদিকে বহুকালের লোকাচার পালনের তাগিদ, অন্যদিকে নতুন কালের উদ্দীপনা আর প্রাণাবেগ, —এই দুই বিরুদ্ধ প্রবণতার ঘাত-প্রতিঘাত অপরিহার্য প্রেরণা আর প্রতি-বন্ধকতার রূপ নিয়েছিল। শতাব্দীর মধ্যপর্বে পৌঁছবার আগেই,—অর্থাৎ দ্বিতীয় পাদের মধ্যেই, প্রথা-রক্ষার চেয়ে নতুন পথ সন্ধানের উদ্দীপনারই অবশ্যম্ভাবী বিজয়-সম্ভাবনা অনুভব করা গিয়েছিল! আর, সেই মধ্যপর্বে 'ইয়ং বেঙ্গলের' অতি-উদ্দীপনা প্রশমিত হ'য়ে সেকালের ঐতিহাসিক ভাবাবর্ত থেকে বাঙালী মনের শুভ নিষ্ক্রমণ ঘটেছে যখন, ঠিক সেই অবস্থাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের হুগলী কলেজের দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছে। ২৩এ অক্টোবর ১৮৪৯ থেকে শুরু ক'রে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই জুলাই পর্যন্ত তিনি হুগলী কলেজের ছাত্র ছিলেন।

১২৭৯ সালের বৈশাখে বঙ্কিমের 'বঙ্গদর্শন' প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় বন্ধনী চিহ্নের মধ্যে 'বঙ্গদর্শনের' এই পরিচয় প্রচারিত হয়েছিল যে, সেটি একখানি মাসিক পত্রিকা এবং তাতে নিয়মিতভাবে সমালোচনা প্রকাশিত হবে। সে সংখ্যার প্রথম প্রবন্ধটির নাম ছিল 'পত্রসূচনা'। তাতে তখনকার বাংলা ভাষা আর বাংলা সাহিত্যের মানের আলোচনা ছিল এবং বাঙালী লেখক-পাঠকের মনোভাবের কথাও বলা হ'য়েছিল। সে-সব কথা অবশ্য খুবই নৈরাশ্যব্যঞ্জক। তখন বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স মাত্র চৌত্রিশ বছর।

২। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত। তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৫২। পৃঃ ১৮।

সে-ঘটনার তেইশ বছর আগে বাংলাদেশে ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালীর উদ্যোগে উচ্চ আদর্শের মাসিক সাহিত্য-পত্রিকার জন্ম হ'য়েছে। তবে, বাংলায় নয়, ইংরেজিতে। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে কৈলাসচন্দ্র বসু তাঁর সতীর্থ গিরিশচন্দ্র ঘোষের সহায়তায় 'লিটারারি ক্রনিকল' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ ক'রেছিলেন। ঈশ্বরগুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, রামনিধি গুপ্ত [নিধুবাবু], রাম্সু-নৃসিংহ, হরু ঠাকুর, নিত্যানন্দ দাস বৈরাগী, রাম বসু প্রভৃতি প্রাচীন বাঙালী কবিদের জীবনকথা প্রকাশিত হ'য়েছে। তারও আগে ১৮৪২ খ্রীব্দাব্দের জুন মাসে অক্ষয়কুমার দত্ত [১৮২০-৮৬] প্রসন্নকুমার ঘোষের সহায়তায় স্বল্পায়ু মাসিক পত্রিকা 'বিদ্যাদর্শন' প্রকাশ ক'রেছেন। বাংলা ভাষা তখন 'যে মৃতপ্রায়',—এবং সে-ভাষার যে 'পুনরুদ্দীপন' দরকার, তাঁরাও সে-কথা বলে গেছেন। বাংলা কবিতার মান উন্নয়নের সাধু উদ্দেশ্যও তাঁরা ঘোষণা ক'রেছিলেন। শ্রীরামপুর মিশন এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে গদ্য রচনার প্রভূত আয়োজন সত্ত্বেও কবিতার দিকেই লেখকদের তখন সহজ অনুরাগ ছিল। 'লিটারারি ক্রনিকল' ইংরেজি পত্রিকা ছিল বটে, তবু তাতেও বাঙালী মনের কাব্যাবেগ প্রকাশে বাধা ঘটেনি, গিরিশচন্দ্র তাতে শিখযুদ্ধ সম্বন্ধে ইংরেজি কবিতা লিখেছিলেন। আর, সে-পত্রিকার অন্যতম কর্ণধার কৈলাসচন্দ্র নিজে বাংলা কবিতায় আদিরসের বাড়াবাড়ি দেখে, তাঁর বন্ধু হরচন্দ্র দত্তের সঙ্গে নিন্দায় যদিও একমত হ'য়েছিলেন, তবু সেসব নিন্দার যথাযোগ্য প্রতিবাদ করবার লোকেরও অভাব ঘটেনি। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল হরচন্দ্র বীটন সোসাইটিতে 'বেঙ্গলি পোয়েট্রি' শিরোনামে তাঁর একইংরেজি প্রবন্ধ পড়েন। সেই নিন্দা শুনে, ১৩ই মে তারিখের সভায় কবি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ইতিহাসের কালক্রম উল্লেখ ক'রে, তুলনামূলক পদ্ধতিতে, যুক্তিতর্কের সাহায্যে—একালের সমালোচনার পরিভাষায় যাকে বলে Inductive বা আরোহপন্থী সমালোচনরীতি—সেই রীতিতেই আলোচনা ক'রে দেখিয়ে দেন যে, বিদ্যা-সুন্দরের কবি ভারতচন্দ্রকে যদি অশ্লীলতার অভিযোগে দায়ী করা যায়, তবে Venus and Adonis-এর লেখক শেক্স্পীয়রই কী সে-রকম অভিযোগ থেকে আত্মরক্ষা ক'রতে পারেন ?

সেকালের বাংলা সাহিত্যের আসরে পত্র-পত্রিকার সংখ্যা কম ছিল না বটে, তবে ইতিহাসের কালক্রম অনুসরণ ক'রে, দেশ বা জাতির মনোগঠন

বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সৃষ্টির দোষগুণ বিচার করা,—আরোহপন্থা এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টি, দুটিই বজায় রেখে কাজে এগিয়ে যাওয়া,—দেশপ্রেম এবং স্বাজাত্যবোধের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে বাংলা সাহিত্যের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উৎসাহ পোষণ করা—বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই এসব লক্ষণ দেখা দিয়েছিল। অক্ষয়কুমার দত্তের 'বিদ্যাদর্শন' মাত্র ছয় সংখ্যা প্রকাশিত হ'য়েই বন্ধ হ'য়ে যায়। তবু, সেই স্বল্পজীবী পত্রিকার তরুণ পরিচালকদেরও উচ্চাশা ছিল : 'এতৎ পত্রে এমত সকল বিষয়ের আলোচনা হইবেক, যদ্দ্বারা বঙ্গভাষায় লিপি বিদ্যার বর্তমান রীতি উত্তম হইয়া সহজে ভাব প্রকাশের উপায় হইতে পারে। যত্নপূর্বক নীতি ও ইতিহাস এবং বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিদ্যার বৃদ্ধি নিমিত্ত নানা প্রকার গ্রন্থের অনুবাদ করা যাইবেক এবং দেশীয় কুরীতির প্রতি বহুবিধ যুক্তি ও প্রমাণ দর্শাইয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা হইবেক।'

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট থেকে অক্ষয়কুমারের সম্পাদনায় 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। ইতিহাস, ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, মনোবিজ্ঞান ইত্যাদি নানা বিদ্যার আলোচনায় 'তত্ত্ববোধিনী'র আগ্রহের কথা ইতিহাস-স্বীকৃত। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে [কার্তিক, ১৭৭৩ শকাব্দ]। সে-পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই এই ঘোষণাটি ছিল : 'যাহাতে সাধারণ জনগণ অনায়াসে বিদ্যালাভ করে,...যাহাতে বালক ও বালিকাগণ গল্প-বোধে ক্রীড়াচ্ছলে এই পত্র পাঠ ক'রিয়া আপন আপন জ্ঞানের বিস্তার করে, যাহাতে যুবকগণ ইন্দ্রিয়োদ্দীপক গ্রন্থসকল পরিহরণপূর্বক উপকারক বিষয় চর্চা করে, যাহাতে বৃদ্ধ ব্যক্তি তুষ্টিজনক সদালাপ করিতে সক্ষম হয়েন, এমত উপায় করা এই পত্রের লক্ষ্য।' বঙ্কিমের বঙ্গদর্শনের আগেই এদিকে কাজ শুরু হ'য়েছিল—এবং শাস্ত্রচর্চা আর সাহিত্যসৃষ্টি দু'য়েরই পরিণত মান দেখা দিয়েছিল। এই কথাই এই সূত্রে স্মরণীয়।

বঙ্কিম-সাহিত্যে যুক্তি-তর্ক আর আবেগ-অনুভূতি দুইই উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। মিল-বেন্থাম-কোঁৎ-হিউমও আছেন, গীতা-মহাভারতের প্রতিধ্বনিও সেখানে প্রভূতপরিমিত! সাধু-সন্ন্যাসী আর যোগবিভূতির কথাও তিনি কিছু কম বলেননি! এসবই তাঁর কালের কথা,—তাঁর আপন যুগের লক্ষণ।

॥ ২ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মতারিখ ২৬এ জুন, ১৮৩৮। বাংলা হিসেবে ১৩ই আষাঢ় ১২৪৫। তাঁর পিতামহের নাম রামহরি চট্টোপাধ্যায়। মাতামহের বিষয়সম্পত্তি পেয়ে রামহরি চব্বিশ পরগনার কাঁটালপাড়ায় বাস ক'রতে এসেছিলেন। চাটুজ্জে-পরিবারের কাঁটালপাড়ায় বাসের সূচনা সেই তখন থেকেই।

বঙ্কিমের পিতার নাম যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। শোনা যায়, তাঁর বয়স যখন মাত্র চোদ্দ বছর, সেই সময়ে যাদবচন্দ্র নাকি পায়ে হেঁটে উড়িষ্যার জাজপুরে যান। জাজপুরে তাঁর বড়ভাই কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায় চাকরি ক'রতেন। আঠার বছর বয়সে যাদবচন্দ্রের এক দুরারোগ্য ব্যাধি হয় এবং সেই ব্যাধিতেই তাঁর মৃত্যু হ'য়েছে মনে ক'রে শেষকৃত্যের জন্যে তাঁকে বৈতরণী-তীরে নিয়ে যাওয়া হয়। এক সন্ন্যাসীর কৃপায় সেই অবস্থা থেকে যাদবচন্দ্র বেঁচে উঠেছিলেন! সেই সন্ন্যাসী সেই সময়েই যাদবচন্দ্রকে তাঁর সন্তান-জন্মের নিশ্চিত সম্ভাবনার কথা জানিয়ে দিয়েছিলেন।

যাদবচন্দ্র ফার্সী পড়েছিলেন এবং কিছু ইংরেজি শিক্ষাও পেয়েছিলেন। সামান্য বেতনের সরকারী চাকরি থেকে, ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শুরুতেই (মতান্তরে, ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর) তিনি রিকেট্স্ সাহেবের অনুগ্রহে মেদিনীপুরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার নিযুক্ত হন।

তাঁর মাতামহ ভবানীচরণ বিদ্যাভূষণ ছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। বঙ্কিমের অন্যতম জীবনীকার—তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বইয়ের প্রথম দিকেই দেখা যায়—'গঙ্গার এক পারে কাঁটালপাড়া—অপর পারে চুঁচুড়া। চুঁচুড়ায় স্বর্গীয় ভূদেবচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকারের বাসস্থান। কাঁটালপাড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মস্থান। আর একদিন, প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে দেখিয়াছিলাম, গঙ্গার একপারে ভারতচন্দ্র রায়, অপর পারে রামপ্রসাদ সেন।' সেই সুদূর অতীতের কথা স্মরণ ক'রে, ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের একটি দিন শচীশচন্দ্র বিশেষভাবে উল্লেখ করে গেছেন:

> 'একদা অপরাহ্নে জনৈক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী সশিষ্য কাঁটালপাড়ায় আসিয়া উপনীত হইলেন। অতিথিশালা নাই, সন্ন্যাসী বাধ্য হইয়া অর্জুনার তটে বটচ্ছায়াতলে বিশ্রামার্থ উপবেশন করিলেন।

তাঁহার কাঁধের উপর একটি দীর্ঘ বিলম্বিত ঝুলি। ঝুলির ভিতর রাধাবল্লভ জীউ ছিলেন। সন্ন্যাসী ঝুলিটি নামাইয়া তরুচ্ছায়ায় উপবেশন করিলেন। বিশ্রামান্তে সন্ন্যাসী যখন ঝুলিটি তুলিতে গেলেন, তখন তাহা আর পারিলেন না;…সন্ন্যাসী বুঝিলেন ঠাকুরের সেস্থানে থাকিতে ইচ্ছা হইয়াছে। তিনি তখন রঘুদেব ঘোষালকে ঠাকুরের সেবার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন।…কয়েক মাস পরে সন্ন্যাসী ফিরিয়া আসিয়া এক দানপত্র রঘুদেবকে প্রদান করিলেন। দানপত্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কর্তৃক রাধাবল্লভজীউ বরাবর লিখিত। দানের সম্পত্তি সামান্য,—কয়েক বিঘা ভূমি মাত্র। বর্তমানে চট্টোপাধ্যায়-বাটী, রাধাবল্লভ-মন্দির প্রভৃতি এই দানপ্রাপ্ত ভূমির উপর দণ্ডায়মান।

রাধাবল্লভের মন্দিরের গায়ে পাথরের ফলকে লেখা ছিল :

বাণ সপ্ত কলা শকে
রঘুদেবেন মন্দিরম্।

অর্থাৎ, ১৬৭৫ শকে রঘুদেব ঘোষাল সেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

তারপর সুদীর্ঘকাল অতিবাহিত হয়েছে। পরিণত বয়সে বঙ্কিম যখন কাঁটালপাড়ার বাড়িতে বাস ক'রতেন, সেই সময়ে রাধাবল্লভের অলৌকিক মহিমা সম্বন্ধে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের কাছে কখনো কখনো তিনি গল্প ক'রেছেন। চন্দ্রনাথ বসু লিখে গেছেন : 'নবমী পূজার দিন প্রাতে গিয়াছি, সঞ্জীববাবু, বঙ্কিমবাবু প্রভৃতি পূজাদালানে বসিয়া আছেন। দেবীকে প্রণাম করিয়া বসিতে যাইতেছি, বঙ্কিমবাবু বলিলেন—তা হবেনা, রাধাবল্লভকে প্রণাম করিয়া আসিয়া বস।' শচীশচন্দ্র লিখেছেন : 'যখন তাঁহার [বঙ্কিমের] জ্যেষ্ঠা কন্যা আসন্নপ্রসবা, তখন তিনি রাধাবল্লভের মন্দিরে গিয়া ঠাকুরের সম্মুখে পদ্মাসনে বসিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরকে কত ডাকিয়াছিলেন। লোকচক্ষুর সম্মুখে এই তাঁহার প্রথম ডাক।' চণ্ডীচরণ জানিয়েছেন : 'বঙ্কিমচন্দ্র মধ্যজীবন হইতে রাধাবল্লভের ভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।' ১৮৯৪-এর শ্রাবণ সংখ্যার 'সাধনা'তে প্রকাশিত শ্রীশচন্দ্রের 'স্মৃতিকথায়' দেখা যায় যে, ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিম নিজেই বলতেন—'আগে আমি নাস্তিক ছিলাম, এক সময়ে জন স্টুয়ার্ট মিলের আমার উপর বড় প্রভাব ছিল। এখন সে সব গিয়াছে।' ১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কথা উল্লেখ ক'রে কালীনাথ দত্ত জানিয়ে গেছেন : 'বঙ্কিমবাবুর

'এতগুলি সদগুণ সত্ত্বেও তাঁহার জীবনে ঈশ্বরবিশ্বাসের অভাবে আমার বড় কষ্ট হইত।'

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে বঙ্কিমের পিতৃবিয়োগ হয়। তখন থেকেই তাঁর মনে ধর্ম-জিজ্ঞাসা এবং আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা আগের চেয়ে অনেক বেশি তীব্রভাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর সহোদর পূর্ণচন্দ্র তাঁদের সেই পিতৃবিয়োগের প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে জানিয়েছেন:

> 'এই ঘটনার পরেই তাঁহার ভিতর একটা গুরুতর পরিবর্তন হয়। ইহার পর যাহাই লিখিতেন তাহাই হিন্দু ধর্ম বুঝাইবার উদ্দেশ্যে লিখিত।'

বঙ্কিমের পূর্বপুরুষ গঙ্গানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন হুগলী জেলার বর্তমান কোন্নগরের সন্নিহিত দেশমুখো গ্রামের অধিবাসী। রামজীবন চট্টোপাধ্যায় সেই বংশেরই সন্তান। তিনিই কাঁটালপাড়ার রঘুদেব ঘোষালের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁরই সন্তানের নাম রামহরি চট্টোপাধ্যায়।

কাঁটালপাড়ায় চট্টোপাধ্যায়-বংশের কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে পাঁচ বছর বয়সে বঙ্কিমের হাতে-খড়ি হয় এবং গ্রামের পাঠশালায় রামপ্রাণ সরকারের কাছে তাঁর প্রথম শিক্ষারম্ভ ঘটে। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে, তাঁর বয়স যখন মাত্র ছ'বছর, সেই সময় তিনি পিতার কর্মস্থল মেদিনীপুরে গিয়ে সেখানকার ইংরেজি স্কুলে ভর্তি হন। মেদিনীপুর থেকে ফিরে, কয়েক বছর পরে ১৮৪৯-এ তিনি হুগলী কলেজে ভর্তি হন। ১৮৫৬র জুলাই মাসে তিনি হুগলী ছেড়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রবেশ করেন।

॥ ৩ ॥

রামমোহনের সময় থেকে শুরু ক'রে,—হিন্দু কলেজের ডিরোজিও, রিচার্ডসন প্রভৃতি শিক্ষকের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিচিত্র চমকের মধ্য দিয়ে, ইয়ং-বেঙ্গলের নানামুখী উত্তেজনার ধারায়, দেশের সনাতন ধর্মবিশ্বাস এবং লোকাচার সম্বন্ধে সেকালে যতই তর্ক-বিতর্ক ঘটে থাক্ না কেন,—ব্রাহ্মমতবাদের নিরাকার উপাসনা যতই প্রভাব ছড়িয়ে থাক্ না কেন,—শিক্ষিত সমাজের মনে তো বটেই,—এমন কি ব্রাহ্ম মতের উপাসনাতেও ভক্তিভাবের অভাব ছিল

না ; তথাকথিত অজ্ঞেয়বাদীদের যাবতীয় বিমুখতার বিরুদ্ধে আদি-ব্রাহ্মসমাজের উপাসনা-বেদী থেকে, ১৭৮২-৮৩ শকে, অর্থাৎ ১৮৬০-৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রধান আচার্য যে ঈশ্বর-বিশ্বাস, প্রীতিচর্চা, সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি প্রসঙ্গের অবতারণা ক'রেছিলেন, এখানে সেরকম দু'একটি মন্তব্যের পরিচয় দেওয়া যেতে পারে। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে ২রা কার্তিক আচার্য ব'লেছিলেন :

> 'যাঁহারা বলিয়া বেড়ান, ঈশ্বরকে জানা যায় না, প্রীতি করা যায় না, তাঁহার সহিত সহবাস হয় না, তাঁহাদিগকে আর কি বলিব। এই বলিতে পারি, আপনারা পবিত্র হও, জ্ঞানকে উজ্জ্বল কর,—ঈশ্বরকে অনুক্ষণ প্রার্থনা কর ; অবশ্যই সেই অভয়পদে আশ্রয় পাইবে—তাঁহার আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। তাঁহার প্রেম উপলব্ধি করিয়া তাঁহাকে প্রীতিপুষ্প দ্বারা অর্চনা করিতে পারিবে। তাঁহাকে লাভ করিবার যত্ন করার অগ্রে কেহ যেন মুখে না বলেন, তাঁহাকে স্মরণ করা যায় না। চিরকাল যাহা ঈশ্বর-পরায়ণেরা বলিয়া আসিতেছেন, সে সকল মিথ্যা, সকলই প্রলাপ-বাক্য। কিন্তু এই সকল জল্পনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি আপনাকে অগ্রে পবিত্র করুন, এবং সকল অপেক্ষা যাহা প্রকৃষ্ট উপায়, তাহা অবলম্বন করুন,—তাঁহাকে প্রার্থনা করুন ; অবশ্যই সেই সত্য-স্বরূপকে দেখিতে পাইবেন—কেননা যে তাঁহাকে অন্বেষণ করে, সে কখনই শূন্য হস্তে ফিরিয়া আসে না। এই সত্য।'[৩]

ঐ বছর ১৪ই অগ্রহায়ণ আচার্য বলেছিলেন :

> 'কেহ বলেন যে, তিনি বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনেকে ঈশ্বরের সঙ্গে জগতের সঙ্গে একীকৃত করিয়া ফেলেন ; অনেকে জগৎ-কারণকে কেবল এক অন্ধ শক্তির ন্যায় বিবেচনা করেন। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম অন্যপ্রকার উপদেশ দেন। ব্রাহ্মধর্ম এক অন্ধ দৈবশক্তিকে জগতের আদিকারণ বলেন না ; কিন্তু এক মহান পুরুষের ইচ্ছা ইহার মূলে দেদীপ্যমান দেখেন। তাঁহার ইচ্ছার সঙ্গে জ্ঞান, কর্তৃত্ব এবং মঙ্গল-ভাব সকলই আছে। সেই স্বতন্ত্র শক্তি, সেই পরম পুরুষ, সেই জীবিত ঈশ্বরই পরম কারণ। তিনি

৩। ব্রাহ্মধর্মের ব্যাখ্যান (পঞ্চম সংস্করণ) পৃঃ ৬৫

> বাধ্য হইয়া এই জগৎ সৃষ্টি করেন নাই; কিন্তু অপর কাহারো সাহায্য ব্যতীত আপন ইচ্ছাতে, আপন মঙ্গলভাবে এই সমস্ত করিয়াছেন। তিনি অন্য কাহারো দ্বারা নিয়মিত হয়েন নাই, কিন্তু আপনার স্বাভাবিক জ্ঞান-বল-ক্রিয়াতে এই সকলই সৃজন করিলেন ······তিনি নিজে যে প্রকার মঙ্গলময় এবং আনন্দময়, জগৎকেও সেই মঙ্গলভাবে ও আনন্দরসে পরিপূর্ণ করিলেন। সেই আশ্চর্যময়েরই এই আশ্চর্য জগৎ। উন্নতিই ইহার জীবন। পৃথিবীর মুখশ্রীর উন্নতি হইতেছে, জ্ঞানধর্মের উন্নতি হইতেছে, মঙ্গলভাব প্রচার হইতেছে।' [৪]

সেকালের হাওয়ায় ছিল ভাঙা-গড়ার ব্যাপক আগ্রহ! দেশে গভীর আধ্যাত্মিকতাও ছিল, আবার বহির্মুখিতাও ছিল। হিন্দু কলেজের সঙ্গে ডেভিড হেয়ার, ক্যাপ্টেন রিচার্ডসন, সার ডিরোজিও প্রভৃতির কথা অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে আছে। হেনরী লুই ভিভিয়ান ডিরোজিওর [১৮০৯-১৮৩১] পিতা ছিলেন কৃতী ব্যবসায়ী। শোনা যায়, তাঁর শরীরে নাকি পর্তুগীজ আর ভারতীয় রক্তের মিশ্রধারা বইতো। হেনরীর মা আর বিমাতা দু'জনেই ছিলেন ইংরেজ। সেকালের কলকাতায় যতটা ইংরেজি-কায়দার শিক্ষা পাওয়া সম্ভব ছিল, ডিরোজিও তা পেয়েছিলেন। অতি অল্প বয়সেই তাঁকে তাঁর কাকার নীলচাষে যোগ দিতে হয়। সে ছিল গঙ্গাতীরের দেশ। তাঁর বয়স তখন খুবই কম। তাঁর স্বভাবে ছিল কবিতার আবেগ। সেই তরুণ বয়সে কিছু কবিতা লিখে, তিনি বেশ কবিখ্যাতিও পেয়েছিলেন। ১৮২৬এ হিন্দু কলেজের সহকারী প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হ'য়ে অনেকগুলি উজ্জ্বল, নবীন মনের নেতৃত্ব লাভ করেন তিনি। ১৮৩১এর এপ্রিলেই তাঁকে কিন্তু কাজে ইস্তফা দিতে হয়। কলেজের ভেতরেও যেমন, বাইরেও তেমনি—তাঁর প্রভাব ছিল অনিবার্য, অপরিসীম! তাঁর সঙ্গে সক্রেটিসের সাদৃশ্যের কথা ভাবা হ'য়ে থাকে। তর্ক-বিতর্ক আলাপ-আলোচনার এক আসর গড়ে তুলেছিলেন তিনি। সেকালের 'অ্যাকাডেমিক' অ্যাসোসিয়েশান' তাঁরই সৃষ্টি [১৮২৮]। সেই সভায় নানা বিষয়ে আলোচনা হোতো। মানুষের ইচ্ছার স্বাধীনতা,—

৪। ঐ পৃঃ ৭২-৭৩

সত্যের স্বরূপ,—পাপ-পুণ্যের তত্ত্ব, ধর্ম-বিশ্বাসের অর্থ,—দেশপ্রেম,—অন্ধভাবে ধর্মাচার পালনের প্রসঙ্গ,—পৌত্তলিকতার ব্যর্থতা—এই সবই ছিল আলোচনার বিষয়। দেশের যুবকদের মনে তাঁর ব্যাপক প্রভাব দেখে অভিভাবকদের মধ্যে অনেকেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন। কর্তৃপক্ষের দিক থেকে অতঃপর উদাসীন থাকাও সম্ভব ছিল না। হিন্দুর ধর্ম-বিশ্বাস আর লোকাচারের যে সমালোচনা তিনি তাঁর ছাত্রদের শোনাতেন, ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের কাছে সেই সব সমালোচনা সম্বন্ধে তাঁকে জবাবদিহি করতে হয়। হিন্দু কলেজ থেকে ঐ সময় তাঁর অপসারণের হুকুম হয়। সেই আদেশের বিরুদ্ধে তিনি যে চিঠি লিখেছিলেন, তার সারাংশের বঙ্গানুবাদ ক'রলে সেটা এই রকম দাঁড়াবে :

> ঈশ্বরের অস্তিত্ব আমি যে অস্বীকার করেছি, একথা তো কারোই শ্রুতি-গোচর হয় নি! এই ধরনের প্রসঙ্গ আলোচনা করা যদি অন্যায় হয়ে থাকে, তাহলে অবিশ্যি আমি অপরাধী! কিন্তু দার্শনিকদের সন্দেহ, আর, সে সন্দেহ নিরসনের উপায়,—আমি তো দুইই দেখিয়ে দিয়েছি। কিছুকালের জন্যে যুবকদের শিক্ষার ভার ছিল আমার ওপর ; মানুষের এই সব গভীর প্রশ্নের কেবল একতরফা জবাব দিয়ে তাদের বিচার-বুদ্ধিহীন, অন্ধ আচার-বিশ্বাসী, এবং গোঁড়ামির ধারক-বাহক ক'রে তোলাই কি আমার উচিত ছিল? লর্ড বেকন বলতেন,—নিশ্চিত সিদ্ধান্ত নিয়ে যে মানুষ যাত্রা শুরু করে, সন্দেহেই তার চলার শেষ! আমি জানি যে, অজ্ঞতার ওপর চিরকাল নির্ভর করা চলে না। মানুষ ভাবতে বাধ্য। অতি-বিলম্বে হ'লেও,—অজ্ঞতা-জনিত পরিতৃপ্তিকেও একদিন ভেবে দেখবার ভবিতব্যের সম্মুখীন হ'তে হয়। তখন এই অবস্থাই ঘটে থাকে। এক সন্দেহ থেকে আর এক সন্দেহ দেখা দেয়। এবং সর্বব্যাপী সন্দেহবাদেই এর শেষ পরিণতি! এই কারণেই কলেজের কয়েকটি ছেলেকে আমি হিউমের প্রসিদ্ধ রচনা—ক্লিআনথিস আর ফিলো-র সংলাপ থেকে আস্তিক্যের বিরুদ্ধে গভীর, সূক্ষ্ম যুক্তিগুলি শোনানো কর্তব্য বলে মেনে নিয়েছিলুম। কিন্তু সেই সঙ্গে হিউমের সেইসব তর্কের জবাবে ডকটর রীড আর ডুগাল্ড স্টুয়ার্ট যা যা বলেছেন,—যে জবাব আজ পর্যন্ত কোনোরকম প্রতিবাদের দ্বারা পর্যুদস্ত হয়নি, তাও তো আমি শুনিয়েছি! এতেই

যদি ছেলেদের ধর্মমত শিথিল হ'য়ে গিয়ে থাকে, তাহলে সে দোষ আমার নয়। বিশ্বাস উৎপাদন করা আমার সামর্থ্যের সাধ্য নয়; আর এও সত্যি যে, কোনো কোনো ছাত্রের নাস্তিক্যের জন্যে যদি আমাকে অভিযুক্ত করা হয়, তাহলে অন্য কারো কারো আস্তিক্য বিশ্বাসের জন্যেও আমাকে প্রশংসা করা উচিত। বিশ্বাস করুন, মশাই —মানুষের অজ্ঞতা আর মানুষের নিরন্তর মত পরিবর্তনের নিশ্চয়তা সম্বন্ধে আমি এতই অবহিত আছি যে, জগতের অতি তুচ্ছ বিষয়েও আমি নিশ্চিতভাবে কিছুই বলতে পারি না···অনির্দিষ্ট নানা কথা এবং ভিত্তিহীন অনেক গুজব রটেছে আমার সম্বন্ধে,···আমি বিশ্বাস করি যে, কর্তৃপক্ষ আমাকে সরিয়ে দিতে চেয়েছেন ব'লেই কাজ থেকে আমাকে অপসারিত করা হোলো। আমার সম্বন্ধে কোনো অনুসন্ধান না ক'রে রাগের বশে তাঁরা আমাকে বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত করলেন।···এই চিঠি দীর্ঘ হয়ে গেল ব'লে আমি ক্ষমা-প্রার্থী এবং এই অপ্রীতিকর ব্যাপারে আমার সম্বন্ধে আপনি যে সাহায্য করেছেন সেজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ জানাই।' ৫

যে-বছর রবীন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়েরও জন্ম সেই ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-পাঠ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তৃতা শোনা—এবং সংস্কৃত সাহিত্যের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের মধ্য দিয়েই তাঁর তরুণ বয়সের দিনগুলি অতিবাহিত হয়। ব্রহ্মবান্ধবের পিতা ছিলেন পুলিস-ইন্‌স্পেকটর। অতি অল্প বয়সেই তাঁর মাতৃবিয়োগ ঘটে। তাঁর কাকা প্রোটেস্ট্যাণ্ট খ্রীষ্টান কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধবের ছেলেবেলায় প্রায়ই তাঁর বাল্যশিক্ষায় সাহায্য করতেন। তাঁর বয়স যখন সতেরো বছর, দেশ থেকে ইংরেজ বিতাড়নের বিদ্যা আয়ত্ত করবার জন্যে বাড়ি ছেড়ে, তিনি তখন গোয়ালিয়রের মহারাজার সেনাদলভুক্ত হবার ব্যর্থ চেষ্টা করেন; তারপর কিছুদিন দেশে দেশে ঘুরে ঘুরে কলকাতায় এক ইস্কুলের শিক্ষক হন। এই ভ্রমণের পরে ব্রহ্মবান্ধব যখন আবার কলকাতায় ফেরেন, তখন আঠারশ'-আশির দশক শুরু হয়েছে। দেশের শিক্ষিত-সমাজের

৫। Poems of Henry Louis Vivian Derozio: Bradley-Birt: London. Oxford (১৯২৩) দ্রষ্টব্য।

মধ্যে তখন ধর্মানুসন্ধানে উল্লেখযোগ্য অভিনিবেশ! তিনি প্রথমে কেশব সেনের দিকে আকৃষ্ট হন এবং তাঁরই মধ্যস্থতায় রামকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করেন। নরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর বন্ধুত্ব হয়। ১৮৮৭তে তিনি ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হন এবং তারপর অচিরেই কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে পশ্চিম-ভারতে সিন্ধু প্রদেশে গিয়ে, সংস্কৃত শিক্ষার সঙ্গে নৈতিক চরিত্র গঠনের সমন্বয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে এক ইস্কুল খোলেন। অনেক অধ্যয়ন আর অনেক অন্তরালোড়ন অতিক্রম ক'রে, চার বছর পরে তিনি খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেন,—প্রথমে প্রোটেষ্টাণ্ট মতে, তারপর রোমান ক্যাথলিক মতে! এতৎসত্ত্বেও নিজেকে তিনি আন্তরিক ভাবে হিন্দু ব'লেই গণ্য করতেন। ১৮৯৪ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৯০৭এ তাঁর মৃত্যুকাল অবধি অকৃতদার অবস্থায়, আহারের শুদ্ধতা বজায় রেখে, হিন্দু সন্ন্যাসীর জীবনই তিনি যাপন ক'রে গেছেন। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে খ্রীষ্টীয় ধর্মমতের অন্বয় উপলব্ধির দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিল! ১৯০১এ রবীন্দ্রনাথ যখন শান্তিনিকেতন-বিদ্যালয় স্থাপন করেন, তখন তিনি ব্রহ্মবান্ধবের সাহায্য পেয়েছিলেন। তার আগেই উনিশ শতকের শেষ দশকে স্বামী বিবেকানন্দ সুদূর ইংলণ্ডে, অ্যামেরিকায় ভারতীয় অধ্যাত্মভাবনার বিশদ আলোচনা ক'রে এসেছেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবান্ধব রোম যাত্রা করেন। রোমে, ইংলণ্ডে,—অক্সফোর্ডে, কেম্ব্রিজে ভারত-সংস্কৃতি সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়ে তিনি বিবেকানন্দের আরব্ধ কাজেরই আনুগত্য ক'রেছিলেন। তারপর ১৯০৫এ দেশে ফিরে, কলকাতায় সাপ্তাহিক 'সন্ধ্যা' পত্রিকার মাধ্যমে তিনি বঙ্গবিচ্ছেদ-বিরোধী আন্দোলনের অন্যতম প্রচারক হ'য়ে ওঠেন। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিনচন্দ্র পাল, তিলক প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের সঙ্গে এই সময় তিনি ছিলেন একই সাধনার অংশীদার। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে রাজদ্রোহী সাংবাদিকতার অভিযোগে তাঁকে বন্দী করা হয় এবং এক অস্ত্রোপাচারের ফলে তাঁর মৃত্যু হয়।

ব্রহ্মবান্ধব যেমন উনিশ শতকের সত্যসন্ধ বাঙালী তরুণের প্রতিভূ হিসেবে ইতিহাসে স্মরণীয় হ'য়ে আছেন,—নানা আকস্মিক এবং অবিস্মরণীয় ব্যক্তিগত ঘটনার ঔজ্জ্বল্যে তাঁর জীবন যতটা অনন্যসাধারণ ব'লে মনে হয়, ঠিক ততোটা না হ'লেও রাজনারায়ণ বসুর জীবনও কতকটা সেইরকম উপাদানেই সমৃদ্ধ। হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থায় তাঁর ধর্মমতের পরিবর্তন ঘটেছে বার-বার! পরিণত বয়সে তিনি নিজে বলেছেন:

'হিন্দু কলেজে পড়িবার সময় আমার ধর্মমতে পরপর কতকগুলি

> পরিবর্তন হয়, কিন্তু উনিশ বৎসরের সময় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সঙ্গে আলাপ হইলে যে আদি ব্রাহ্ম সমাজের ব্রাহ্ম হই, তাহা এখনও আছি। এই সম্বন্ধে দেবেন্দ্রবাবু আমাকে তাঁহার কোনো পত্রে নানকের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া লিখেন, 'যুগে যুগে একো বেল'। পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে শেভালিয়র র‍্যামজের 'সাইরাসেজ ট্র্যাভেলজ্' পড়িয়া প্রচলিত হিন্দুধর্মে আমার বিশ্বাস বিচলিত হয়। তৎপরে রামমোহন রায়ের 'অ্যাপীল টু দি ক্রিশ্চিয়ান পাবলিক ইন ফেভর অফ্ দি প্রিসেপ্টস্ অব্ জীসাস' এবং চ্যানিঙ্গের গ্রন্থ পাঠ করিয়া ইউনিটেরিয়ান খ্রীষ্টীয়ান হই, তৎপরে ঈষৎ মুসলমান হই, পরিশেষে কলেজ ছাড়িবার অব্যবহিত পূর্বে হিউম পড়িয়া সংশয়বাদী হই। যে পুস্তক যখনই পাঠ করা যায় তখনই সেইরূপ হওয়া অবশ্য বালকতা বলিতে হইবে, আর তখন যথার্থই বালক ছিলাম।'[৬]

ভারতবর্ষ সম্বন্ধে দুটি চতুর্দশপদী কবিতা লিখেছিলেন ডিরোজিও—'The Harp of India' এবং 'To India—My Native Land'। দুটিতেই স্বদেশ-বন্দনার আন্তরিকতা ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যে স্বদেশ-প্রেমের আবেগ দেখা দেবার আগেই ইতিহাসের এই পূর্ববর্তী প্রেরণা ছিল, তাড়না ছিল—ঘটনাচক্র ছিল! ঈশ্বর গুপ্তও স্বদেশ-প্রেমিক ছিলেন। ডিরোজিও ভারতবর্ষকেই স্বদেশ ব'লে মেনেছিলেন। এখানে সে-সব কথার বিস্তৃততর উল্লেখ অবান্তর না-হ'লেও কতকটা বাহুল্য, সন্দেহ নেই। তাই বঙ্কিম-সাহিত্য পাঠের অভিপ্রায়ে লক্ষ্য রেখে, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের জীবনের দিকে এবার নজর দেওয়া দরকার।

তাঁর সারাজীবনের প্রধান ঘটনাবলীর একটি কালানুক্রমিক তালিকা সামনে রেখে, ১৮৩৮ থেকে ১৮৯৪ পর্যন্ত মোট প্রায় ছাপ্পান্ন বছরের আয়ুষ্কালে তাঁর বহুমুখী কর্মপ্রচেষ্টা আর চিরজীবনের ধ্যানের কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। নিচে এই রকম একটি তালিকা সাজিয়ে দেওয়া হোলো :

৬। রাজনারায়ণ বসুর আত্মচরিত [৩য় সংস্করণ] পৃঃ ৪৩-৪৪

১৮৩৮, ২৬শে জুন : রাত নটায় কাঁটালপাড়ায় জন্ম।
[১২৪৫, ১৩ই আষাঢ়]

১৮৪৩ : কুল-পুরোহিত বিশ্বম্ভর ভট্টাচার্যের কাছে পাঁচ বছর বয়সে হাতে-খড়ি হয়। গ্রামের পাঠশালার গুরুমশাই রামপ্রাণ সরকার ছিলেন তাঁর এই পর্বের প্রথম শিক্ষক।

১৮৪৪-১৮৪৮ : ১৮৪৪-এ মেদিনীপুরে ইংরেজি ইস্কুলে প্রবেশ। ১৮৪৮ পর্যন্ত এখানে তিনি ছাত্র ছিলেন।

১৮৪৯ : মেদিনীপুর থেকে কাঁটালপাড়ায় প্রত্যাবর্তনের অল্পকাল পরেই এই বছর ফেব্রুয়ারি মাসে কাঁটালপাড়ার নারায়ণপুর গ্রামের এক পাঁচ বছরের বালিকার পাণিগ্রহণ। এই বছরের ২৩এ অক্টোবর তিনি হুগলী কলেজে জুনিয়ার ডিবিসনে প্রথম শ্রেণীর 'এ' সেকসনে ভর্তি হন। তখন তাঁর বয়স ছিল সাড়ে এগার বছর।

১৮৫০-৫৬ : হুগলীতে নবীনচন্দ্র দাসের কাছে বঙ্কিমের প্রথম ইংরেজি শিক্ষা শুরু হয়। সেখানে তাঁর অন্যান্য শিক্ষকদের মধ্যে ছিলেন ঈশানচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর মহেশচন্দ্র; দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি ঈশানচন্দ্রের কাছেও পড়েছিলেন। এছাড়া প্রধান শিক্ষক গ্রেভ্‌স্‌-সাহেবের কাছে তিনি সাহিত্য আর ইতিহাসের পাঠ নিয়েছিলেন, দ্বিতীয় শিক্ষক ব্রেণ্ডাণ্ড সাহেবের কাছে তিনি অঙ্ক আর ভূগোল পড়েছিলেন; ১৮৫৩-র শেষ থেকে ১৮৫৪ পর্যন্ত তিনি বীন্‌ল্যাণ্ড সাহেবের কাছেও পড়েছিলেন।

১৮৫২-র ২৫এ ফেব্রুয়ারি 'সংবাদ প্রভাকরে' সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম কবিতা এবং ২৩এ এপ্রিল ঐ পত্রিকায় তাঁর প্রথম গদ্যরচনা ছাপা হয়। 'সংবাদ প্রভাকরের' সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের এবং তখনকার নবীন লেখক দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতির আদর্শে সাহিত্য রচনায় বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম আত্মনিয়োগ। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা'য় তাঁর সাহিত্য-জীবনের এই আদিপর্বের কথাপ্রসঙ্গে

ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবের পরিচয় দেওয়া হয়েছে এইভাবে : 'এই শিষ্যত্বের ফল 'সংবাদপ্রভাকরে' প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের কয়েকটি ঋতুবর্ণনা অথবা উত্তর-প্রত্যুত্তরমূলক কবিতা, কবিতাকারে একটি 'বিচিত্র' ও একটি 'বিষম বিচিত্র' নাটক এবং দুই-একটি টুকরা গদ্যরচনা। 'ললিতা ও মানস' কাব্যও এই প্রভাবের ফল।' ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে পয়ারাদি বিবিধ ছন্দে তাঁর 'ললিতা। পুরাকালিক গল্প। তথা মানস' লেখা হয়— এবং ১৮৫৬তে সে-রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে তিনি জুনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষায় প্রথম হ'য়ে, দু'বছরের জন্যে মাসিক আট টাকা বৃত্তি পান। ১৮৫৬র এপ্রিল মাসে সিনিয়ার স্কলারশিপ পরীক্ষাতেও প্রথম হ'য়ে দু'বছরের জন্যে মাসিক কুড়ি টাকা বৃত্তি পান ১৮৫৬-র জুলাই মাসে তিনি হুগলী কলেজ ছেড়ে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন শ্রেণীতে প্রবেশ করেন।

১৮৫৭-৫৮

এই বছর [১৮৫৭] প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-বিভাগ থেকে এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। সে বছর অন্যান্য যাঁরা প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় [উত্তর-পাড়া থেকে], কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য [সংস্কৃত কলেজ থেকে], সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ইত্যাদিও ছিলেন। ১৮৫৮র এপ্রিলের প্রথমে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা হয়। তাতে প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-বিভাগ থেকে বঙ্কিমচন্দ্র এবং সাধারণ-বিভাগ থেকে যদুনাথ দত্ত যথাক্রমে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। দু'জনেই পাঁচটি বিষয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন কিন্তু ষষ্ঠ বিষয়ে অনধিক সাত নম্বর কম পান। তৎসত্ত্বেও তাঁদের বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব'লে মেনে নেওয়া হয়। বি. এ. পরীক্ষার পরে ১৮৫৮র ৭ই আগস্ট পর্যন্ত বঙ্কিম প্রেসিডেন্সি কলেজের আইন-বিভাগে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন।

তারপর তিনি ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদে নিযুক্ত হ'য়ে যশোহরে চলে যান, কিন্তু ১৮৬৯-এর জানুয়ারি মাসে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকেই বি. এল. পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে তৃতীয় স্থান অধিকার করেন। এইখানেই তাঁর ছাত্র-জীবনের পরিসমাপ্তি।

১৮৫৮, ৭ই আগষ্ট থেকে ১৮৯১, ১৪ই সেপ্টেম্বর :

সরকারী বিভিন্ন পদে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কর্মজীবনের বিস্তার তেত্রিশ বছর। তিনি প্রথমে যশোহরে নিয়োগ পান। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে সেখানেই তাঁর প্রথম আলাপ হয়। সেখান থেকে ১৮৬০-এর ২১এ জানুয়ারি মেদিনী-পুরের নেগুয়াঁতে বদলি হন; প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পরে ১৮৬০ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে তিনি হালিশহরের চৌধুরী-পরিবারের কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। অতঃপর ৯ই নভেম্বর খুলনায় নিযুক্ত হন; ১৮৬৪-র ৫ই মার্চ ২৪ পরগনার বারুইপুরে কর্মভার গ্রহণ করেন; সেখান থেকে ঐ বছর ২৪এ অক্টোবর ডায়মণ্ড হারবারে অস্থায়ী পদে বদলি হন। ১৮৬৭র ৩১শে মে গভর্ণমেণ্ট আমলাদের বেতন-নির্ধারণ-কমিশনের কাজে নিযুক্ত হন। তখন তিনি আলিপুরে থাকতেন। ১৮৬৯-এর ১৫ই ডিসেম্বর মুর্শিদাবাদের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। সেখান থেকে ১৮৭৪ এর ৪ঠা মে তাঁকে বারাসতে যেতে হয় এবং ইতিমধ্যে ১৮৭১এ তিনি কিছুদিন বহরমপুরে রাজসাহী কমিশনারের পর্সোন্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট হয়েছিলেন। বারাসত থেকে ১৮৭৬-এর ২০এ মার্চ তিনি হুগলিতে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর পদেই বদলি হন। ১৮৮১, ১৪ই ফেব্রুয়ারি হাওড়ায় কর্মভার গ্রহণের পূর্বেই ১৮৮০র নভেম্বর মাসে বর্ধমান বিভাগীয় কমিশনারের অস্থায়ী পার্সোন্যাল অ্যাসিস্টেণ্ট হয়েছিলেন। ১৮৮১র ৪ঠা সেপ্টেম্বর তদানীন্তন বাংলা সরকারের অস্থায়ী অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারি হন। ১৮৮২র ২৬এ জানুয়ারি তিনি

আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। সেখান থেকে ঐ বছর মে মাসে তিনি একবার বারাসতে বদলি হ'য়ে সেই মে মাসেই আবার আলিপুরে ফিরে যান এবং ৮ই আগস্ট জাজপুরে [কটক] বদলি হন। সেখান থেকে আবার ১৮৮৩র ১৪ই ফেব্রুয়ারি হাওড়ায় যান। ১৮৮৫র ১লা জুলাই যশোহরের ঝিনাইদহতে যেতে হয়। পরের বছর ১৭ই মে ভদ্রকে—এবং ১৮৮৬র ১০ই জুলাই হাওড়ায় কর্মভার গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৮৮৭র ১৯এ মে মেদিনীপুরে এবং তারপর ১৮৮৮র ১৬ই এপ্রিল আবার আলিপুরে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টর হন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি সরকারী চাকরি থেকে অবসর নেন।

এই তেত্রিশ বছরের নিত্যপরিবর্তনময় কর্মজীবনের মধ্যে তিনি যেসব ছুটি নিয়েছিলেন, সেগুলির উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সজনীকান্ত দাস তাঁর কর্মজীবনের এই সুদীর্ঘ ঘটনাপঞ্জী আরো বিস্তৃতভাবে এবং খুবই সতর্কতার সঙ্গে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সন-তারিখ মিলিয়ে সাজিয়ে দিয়েছেন। ব্যাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের [C. E. Buckland] লেখা 'Bengal under the Lieutenant Governors' বইখানির অন্তর্ভুক্ত বঙ্কিমের সংক্ষিপ্ত জীবনী থেকে বঙ্কিমের কর্মজীবনের প্রশস্তিসূচক মন্তব্যটিও তাঁরা তুলে দিয়েছেন। খুলনায় অবস্থানকালে সেখানকার জলদস্যু দমনে বঙ্কিম যে খুবই তৎপরতার পরিচয় দিয়েছিলেন, ব্যাক্‌ল্যাণ্ড সাহেব সেকথাও জানিয়ে গেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ এবং সজনীকান্ত আরো জানিয়েছেন : 'বঙ্কিমের বারুইপুর ও আলিপুরের কর্মজীবন সম্বন্ধে তাঁহার সহকর্মী কালীনাথ দত্ত মহাশয় 'প্রদীপে' একটি ধারাবাহিক প্রবন্ধে [আষাঢ়-ভাদ্র, ১৩০৬] কিছু ঘনিষ্ঠ পরিচয় দিয়াছেন। নবীনচন্দ্র সেনের 'আমার জীবনেও' বঙ্কিমের কর্মজীবন সম্বন্ধে সামান্য ইঙ্গিত আছে। ভূদেব-পুত্র

মুকুন্দদেব মুখোপাধ্যায় 'আমার দেখা লোক' পুস্তকে বঙ্কিমচন্দ্রের ডেপুটিগিরির কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।'
১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তিনি রায়বাহাদুর হন এবং ১৮৯৪ এর জানুয়ারিতে সি. আই. ই, উপাধি পান।

সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' পুস্তিকায় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর যে কালানুক্রমিক তালিকা প্রকাশ করেছেন, সেই তালিকার প্রাসঙ্গিক বিস্তৃত উদ্ধৃতি ও মন্তব্যগুলি বাদ দিয়ে এখানে কেবল বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকাশিত বইগুলির উল্লেখ করা হোলো :

১। ললিতা : পুরাকালিক গল্প। তথা মানস। [১৮৫৬] পৃঃ ৪১।
[তিন বছর আগেই—অর্থাৎ ১৮৫৩তে লেখা হয়]

২। দুর্গেশনন্দিনী। ইতিবৃত্ত-মূলক উপন্যাস। [১৮৬৫] পৃঃ ৩০৭।

৩। কপালকুণ্ডলা [১৮৬৬] পৃঃ ১২৪।

৪। মৃণালিনী [১৮৬৯] পৃঃ ২৪১।

৫। বিষবৃক্ষ [১৮৭৩] পৃঃ ২১৩।
[১২৭৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়।]

৬। ইন্দিরা। উপন্যাস। ১২৭৯, চৈত্র সংখ্যার বঙ্গদর্শন থেকে উদ্ধৃত [১৮৭৩] পৃঃ ৪৫।

৭। যুগলাঙ্গুরীয়। [১৮৭৪] পৃঃ ৩৬।
১২৮০, বৈশাখের বঙ্গদর্শনে প্রথম প্রকাশিত হয়।

৮। লোকরহস্য। ১২৭৯-৮০ সালের 'বঙ্গদর্শন' থেকে উদ্ধৃত। কৌতুক ও রহস্য। [১৮৭৪] পৃঃ ৯৯। ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে লোকরহস্যের পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপা হয়।

৯। বিজ্ঞানরহস্য অর্থাৎ ১২৭৯-৮০ সালের 'বঙ্গদর্শন' থেকে উদ্ধৃত-বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ-সংগ্রহ [১৮৭৫] পৃঃ ১৭০।

১০। চন্দ্রশেখর। উপন্যাস [১৮৭৫] পৃঃ ১৯৫। ১২৮০ সালের শ্রাবণ থেকে ১২৮১র ভাদ্র অবধি ধারাবাহিক ভাবে 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।

১১। রাধারাণী [১৮৭৫] ১২৮২ কার্তিক-অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' ছাপা হয়।

১২। কমলাকান্তের দপ্তর। 'বঙ্গদর্শন' থেকে পুনর্মুদ্রিত। [১৮৭৫] পৃঃ ১৬২।

১৩। বিবিধ সমালোচনা। 'বঙ্গদর্শন' থেকে পুনর্মুদ্রিত। [১৮৭৬] পৃঃ ১৪৪।

১৪। রজনী। উপন্যাস [১৮৭৭] পৃঃ ১২২।
[১২৮১-৮২ 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত হয়।]

১৫। উপকথা। অর্থাৎ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস সংগ্রহ [১৮৭৭] পৃঃ ৮৩।
[ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী]

১৬। রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী [১৮৭৭] পৃঃ ১।৷০

১৭। কবিতাপুস্তক [১৮৭৮] পৃঃ ১১২।

১৮। কৃষ্ণকান্তের উইল [১৮৭৮] পৃঃ ১৭০।
[১২৮২ ও ১২৮৪ বঙ্গদর্শনে ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ]

১৯। প্রবন্ধ-পুস্তক [১৮৭৯] পৃঃ ১৫৮। পরে 'বিবিধপ্রবন্ধে' ও 'কমলাকান্তে' গ্রন্থভুক্ত।

২০। সাম্য [১৮৭৯] পৃঃ ৬৮।

২১। রাজসিংহ [ক্ষুদ্র কথা] [১৮৮২] পৃঃ ৮৩।
['রাজসিংহ' ১২৮৪ সালের চৈত্র থেকে ১২৮৫ সালের ভাদ্র সংখ্যা অবধি 'বঙ্গদর্শনে' আংশিকভাবে ছাপা হয়েছিল। ১৮৯৩ খ্রীস্টাব্দে রাজসিংহের যে চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশিত হয় (পৃঃ ৪৩৪), সেটিই বর্তমান আকারে 'পুনঃ প্রণীত'।]

২২। আনন্দমঠ। [১৮৮২] পৃঃ ১৯১।

২৪। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। ১২৮৭ সালের 'বঙ্গদর্শন' থেকে পুনর্মুদ্রিত [১৮৮৪] পৃঃ ৪৭।

২৪। দেবী চৌধুরাণী [১৮৮৪] পৃঃ ২০৬।

২৫। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উপন্যাস [১৮৮৬]
[ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, রাজসিংহ।]

২৬। কৃষ্ণচরিত্র [প্রথম ভাগ] [১৮৮৬] পৃঃ ১৯৮।
[১৮৯২-এর সংস্করণটি প্রথমটির পরিবর্ধিত এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'অভিপ্রেত সম্পূর্ণ গ্রন্থ।']

২৭। সীতারাম [১৮৮৭] পৃঃ ৪১৯। ১২৯১-৯৩ 'প্রচারে' প্রকাশিত।

২৮। বিবিধ প্রবন্ধ। [প্রথম ভাগ] [১৮৮৭] পৃঃ ২৮০।

[পূর্ব প্রকাশিত 'বিবিধ-সমালোচনা'-এর কয়েকটি প্রবন্ধ বাদ দিয়ে এই সংগ্রহে সেই দুটি বইয়ের অন্যান্য রচনা সংকলিত]

২৯। ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন। [১৮৮৮] পৃঃ ৩৫৯।

[১২৯১-৯২ 'নবজীবনে' বইখানির অংশবিশেষ আগেই প্রকাশিত হয়।]

৩০। বিবিধ প্রবন্ধ। [দ্বিতীয় ভাগ] 'বঙ্গদর্শন' ও 'প্রচার' থেকে পুনর্মুদ্রিত [১৮৯২] পৃঃ ৩৫৬।

৩১। সহজ রচনা শিক্ষা [১৮৯৪-এর ডিসেম্বরে দ্বিতীয় সংস্করণ এবং ১৯৯৬এ তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়]

৩২। সহজ ইংরেজী শিক্ষা [১৮৯৪-এর ডিসেম্বরে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়]

৩৩। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা [১৯০২] পৃঃ ৩৭৮+৯।

৩৪। Rajmohon's Wife [১৯৩৫] পৃঃ ১৫৬।

[১৮৬৪তে 'Indian Field' পত্রিকায় ধারাহিকভাবে প্রকাশিত। 'শ্রীযুক্ত শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-প্রকাশিত 'বারিবাহিনী' পুস্তকের প্রথম নয় অধ্যায় Rajmohan's Wife পুস্তকের বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত অনুবাদ।']

৩৫। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী—জন্ম-শতবার্ষিক সংস্করণ। ১৯৩৮-৪২।

॥ ৫ ॥

বঙ্কিমচন্দ্র লোকান্তরিত হবার অনেকদিন পরে—রবীন্দ্রনাথ তাঁর সম্বন্ধে যে কবিতা লিখে শ্রদ্ধা প্রকাশ ক'রেছিলেন, সেটি এইবার স্মরণ করা যেতে পারে। 'বঙ্কিমচন্দ্র' শিরোনামে এই কবিতাটিতে বলা হয়ঃ

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে।
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি,
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।

তার স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা,
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্তকণা,
অঙ্কুর উঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান।

সে প্রার্থনা পুরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগ-সাহিত্যের উৎস উঠি মন্ত্র স্পর্শে তব।
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গ-কল্লোলে,
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে।
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি।

রবীন্দ্রনাথের 'আধুনিক সাহিত্য' বইখানিতে তাঁর প্রসিদ্ধ 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি ছাপা হয়েছে। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধটি ছাড়া 'কৃষ্ণচরিত্র' নামে আরো একটি প্রবন্ধ তাতে সংকলিত হয়েছে; তাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাগত নেতৃত্বের কথা আছে। উনিশ শতকের শেষার্ধের প্রথম দিকেই বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের যখন প্রথম আবির্ভাব ঘটে, তখন তাঁর সম্বন্ধে পাঠকসম্প্রদায়ের আগ্রহ মোটেই উৎসাহজনক ছিল না। নানা বিরোধিতার মধ্য দিয়ে নিজের পথ তৈরী করে বঙ্কিমচন্দ্রকে এগিয়ে যেতে হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রবন্ধের স্থচনাতেই সেই বিশেষ সময়ের কথা স্মরণ করেছেন। সেই সন্ধিকালে একদল লেখক তাঁর সম্বন্ধে বিস্তর বিদ্বেষ পোষণ করতেন, অন্যেরা আবার তাঁরই রচনারীতি অনুকরণের চেষ্টা ক'রতেন। অর্থাৎ বাংলা সাহিত্যে সে-সময়ে প্রাচীন সংস্কার আর নতুন ভাবাদর্শের এক সংঘর্ষ উপস্থিত হ'য়েছিল। বঙ্কিম-সাহিত্য সেই সংঘর্ষের অভিব্যক্তি এবং নতুন পথসন্ধানের বহুমুখী প্রয়াসও বটে।

রবীন্দ্রনাথ ব'লে গেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁদের যখন প্রথম সাক্ষাৎ ঘটে, সে-সময়ে 'সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে কোনরূপ পূর্ব সংস্কার'

তাঁদের মনে বদ্ধমূল হয়ে যায় নি, এবং সেই নতুন কালের নতুন ভাবপ্রবাহ তাঁদের কাছে ছিল এক অপরিচিত, অনভ্যস্ত ব্যাপার। এই কথাটি প্রকাশ ক'রতে গিয়ে সমুচিত আবেগের সঙ্গেই তিনি জানিয়েছিলেন : 'তখন বঙ্গসাহিত্যেরও যেমন প্রাতঃসন্ধ্যা উপস্থিত আমাদেরও সেইরূপ বয়ঃসন্ধিকাল। বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যে প্রভাতের সূর্যোদয় বিকাশ করিলেন, আমাদের হৃৎপদ্ম সেই প্রথম উদ্‌ঘাটিত হইল।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' সেকালের বাংলা সাহিত্যের আসরে অভূতপূর্ব বিচিত্রতা ঘটিয়েছিল। আমাদের সাহিত্যলোকের সেই ভাবৈশ্বর্য এবং রীতিগত সমারোহের কথাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ আষাঢ়ের প্রথম বর্ষা-সমাগমের তুলনা দিয়েছিলেন। বলা হয়েছিল : 'নবসমাগমের মহোৎসব'! জীবনের সেই অতিক্রান্ত অধ্যায়ের কথা-প্রসঙ্গে পরিতাপের সঙ্গে তিনি বলেছিলেন : 'মনে হয় সেদিন হৃদয়ে যে অপরিমেয় আশার সঞ্চার হইয়াছিল তদনুরূপ ফল লাভ করিতে পারি নাই। সে জীবনের বেগ আর নাই।' কিন্তু পর মুহূর্তেই নৈরাশ্য বর্জন ক'রে তিনি পুনরপি বলেছিলেন : 'কিন্তু এই নৈরাশ্য অনেকটা অমূলক। প্রথম সমাগমের প্রবল উচ্ছ্বাস কখনও স্থায়ী হইতে পারে না। সেই নব আনন্দ, নবীন আশার স্মৃতির সহিত বর্তমানের তুলনা করাই অন্যায়। বিবাহের প্রথম দিনে যে রাগিণীতে বংশীধ্বনি হয় সে রাগিণী চিরদিনের নয়।' এই কথার পরে তিনি আমাদের ইতিহাস-সচেতনতার দায়িত্ব সম্বন্ধে কথা তুলেছিলেন। বর্তমান তো অতীতেরই সম্প্রসারণ। যে জাতি ঐতিহ্য সম্বন্ধে সমুচিত শ্রদ্ধাশীল নয়, সে জাতির পক্ষে বর্তমানের পূর্ণ অধিকার লাভ করা কখনই সম্ভব নয়। এই ঐতিহ্যের কথাসূত্রে তিনি রামমোহনের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন এবং তাঁকে 'আমাদের বর্তমান বঙ্গদেশের নির্মাণকর্তা' ব'লে উল্লেখ করেন। রাজনীতি, বিদ্যাশিক্ষা, সমাজ, ভাষা ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই আধুনিক বাংলার গোড়া পত্তন ক'রে গেছেন রামমোহন। দেশের প্রাচীন শাস্ত্র অনুশীলনের দিকে উৎসাহ জাগিয়ে গেছেন তিনিই। সাধারণের অনধিগম্য বেদ-পুরাণ-তন্ত্রের সার উদ্ধার ক'রে রামমোহনই আমাদের যথার্থ প্রগতির পথ প্রশস্ত ক'রে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায়—'রামমোহন বঙ্গসাহিত্যকে গ্রানিট-স্তরের উপর স্থাপন করিয়া নিমজ্জনদশা হইতে উন্নত করিয়া তুলিয়াছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্র তাহারই উপর প্রতিভার প্রবাহ ঢালিয়া স্তরবদ্ধ পলিমৃত্তিকা ক্ষেপণ করিয়া গিয়াছেন।

আজ বাংলাভাষা কেবল দৃঢ় বাসযোগ্য নহে, উর্বরা-শস্যশ্যামলা হইয়া উঠিয়াছে। বাসভূমি যথার্থ মাতৃভূমি হইয়াছে। এখন আমাদের মনের খাদ্য প্রায় ঘরের দ্বারেই ফলিয়া উঠিতেছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রকে রবীন্দ্রনাথ সে-কালের 'শিক্ষিতশ্রেষ্ঠ' এবং 'কর্মযোগী' নামেও অভিহিত করেছেন। বঙ্কিম যে নিজের শিক্ষাগর্বে বঙ্গভাষার প্রতি অনুগ্রহ-মাত্র প্রকাশ করেন নি, সে-কথা উল্লেখ ক'রে বঙ্কিমের সাহিত্য-সম্পর্কিত গুরু-দায়িত্বভারের বিশ্লেষণ ক'রেছেন তিনি। সেকালে বাংলাভাষা যে-অবস্থায় ছিল, তাতে শিক্ষিত মানুষের সর্বপ্রকার ভাব প্রকাশের সম্ভাবনা ছিল না। দ্বিতীয়ত এই ব্যাপক অবহেলার ফলে বাংলাসাহিত্যের সংকীর্ণ ক্ষেত্রে তখন কোনো উচ্চ আদর্শও ছিল না। সেই দুরবস্থাতেই বঙ্কিমের মহত্ব সংশয়াতীত স্বাক্ষর রেখে গেছে। নিজের মনের উন্নত আদর্শ সর্বদা সামনে রেখে, সুলভ খ্যাতিলাভের প্রলোভন সংবরণ ক'রে, 'অশ্রান্ত যত্নে অপ্রতিহত উদ্যমে দুর্গম পরিপূর্ণতার পথে' বঙ্কিম নিজের সাধনার পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

'বঙ্গদর্শনে'র পূর্ববর্তী এবং তার পরবর্তী বাংলাসাহিত্যের ব্যবধান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ আর-একটি অবিস্মরণীয় উপমা ব্যবহার ক'রে লিখেছিলেন : 'বঙ্গদর্শনের পূর্ববর্তী এবং তাহার পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে যে উচ্চনীচতা তাহা অপরিমিত। দার্জিলিং হইতে যাঁহারা কাঞ্চনজঙ্ঘার শিখরমালা দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন সেই অভ্রভেদী শৈলসম্রাটের উদয়রবিরশ্মি-সমুজ্জ্বল তুষারকিরীট চতুর্দিকের নিস্তব্ধ গিরি-পারিষদবর্গের কত ঊর্ধ্বে সমুত্থিত হইয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্রের পরবর্তী বঙ্গসাহিত্য সেইরূপ আকস্মিক অত্যুন্নতি লাভ করিয়াছে; একবার সেইটি নিরীক্ষণ এবং পরিমাণ করিয়া দেখিলেই বঙ্কিমের প্রতিভার প্রভূত বল সহজে অনুমান করা যাইবে।'

রচনা এবং সমালোচনা,—সাহিত্যের এই দুই দিকের দায়িত্বই তিনি একা গ্রহণ ক'রেছিলেন। বঙ্কিমের এই দায়িত্ব-স্বীকৃতির কথা মনে রেখেই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে 'কর্মযোগী' ব'লে গেছেন। আর, তাঁর এই কর্মকে বলেছেন, 'দুষ্কর ব্রতানুষ্ঠান'। তাঁর সাহসিকতার প্রসঙ্গ তিনি নানা বাক্যে, নানা বিশেষণে ব্যক্ত ক'রে গেছেন! বঙ্কিমের এই দায়িত্বনিষ্ঠার কথা-প্রসঙ্গেই তিনি ব'লেছিলেন যে, বঙ্কিম 'অম্লান মুখে বীরদর্পে' নিজের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন। সাহিত্যের 'কর্মযোগী' এবং 'ধ্যানযোগী' কথা দু'টির মধ্য দিয়ে রচনা এবং সমালোচনা, সাহিত্যের এই দু'টি পৃথক দিকের কথা রবীন্দ্রনাথের

ঐ রচনায় আর-একভাবে ব্যক্ত হয়েছিল। একদিকে লেখক-মনের আত্মমগ্নতা এবং বহিঃপ্রকাশ,—অন্যদিকে চিন্তার বিচিত্র ক্ষেত্রে, বিভিন্ন ব্যবহারিক প্রয়োজন-চেতনার সাগ্রহ স্বীকৃতি এবং তজ্জনিত সমালোচনা ও সংগঠন, এই দুই কর্মেই বঙ্কিম নিজের প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছেন। 'কৃষ্ণচরিত্রে' তৎকালীন পতিত হিন্দুসমাজ ও বিকৃত হিন্দুধর্মের যে সমালোচনা আছে, রবীন্দ্রনাথ সেদিকেও তর্জনী প্রসারিত ক'রে গেছেন। সেই সূত্রেই বঙ্কিমকে তিনি ব'লেছিলেন—'তেজস্বী প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তি।' তিনি এও ব'লেছিলেন যে 'বঙ্কিমের বাণী কেবল স্তুতিবাদিনী ছিল না, খড়্গধারিণীও ছিল।' এবং কৃষ্ণচরিত্রের গবেষণায় বঙ্কিমকে,—রবীন্দ্রনাথের কথায়,—দুই শত্রুর মাঝখান দিয়ে পথ কেটে চ'লতে হয়েছে,—যাঁরা অবতার মানেন না তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি দেবত্ব-আরোপের বিরোধী ছিলেন,—আর যাঁরা শাস্ত্রের এবং লোকাচারের প্রতিটি ব্যাপার অভ্রান্ত বলে মনে করতেন, বঙ্কিমের বিশ্লেষণী বুদ্ধির তাঁরাও যে খুব তারিফ ক'রে গেছেন, তা নয়। মহত্তম মানবসত্তার আদর্শ অনুসারে দেবতার রূপায়ণ তাঁদের মনোমত হয় নি। এই সূত্রেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে 'কল্পনা' এবং কাল্পনিকতা', এই দু'টি লক্ষণের প্রভেদের কথা রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে গেছেন। বঙ্কিম কাল্পনিকতার সেবক ছিলেন না, তিনি যথার্থ কল্পনাশক্তিরই অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই দু'টি নির্দেশনা এখানে পর পর তাঁরই লেখা থেকে উদ্ধৃত হোলো। প্রথমে ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর কথা :

> 'সাহিত্যের মধ্যেও দুই শ্রেণীর যোগী দেখা যায়, ধ্যানযোগী এবং কর্মযোগী। ধ্যানযোগী একান্তমনে বিরলে ভাবের চর্চা করেন, তাঁহার রচনাগুলি সংসারী লোকের পক্ষে যেন উপরি-পাওনা যেন যথালাভের মতো।
>
> 'কিন্তু বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা-কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব—যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন। নবীন বঙ্গসাহিত্যের মধ্যে সকল বিষয়েই আদর্শ স্থাপন করিয়া যাওয়া তাঁহার উদ্দেশ্য

ছিল। বিপন্ন বঙ্গভাষা আর্তস্বরে যেখানেই তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছে সেখানেই তিনি প্রসন্ন চতুর্ভুজ মূর্তিতে দর্শন দিয়াছেন।'

দ্বিতীয়তঃ 'কল্পনা' এবং 'কাল্পনিকতা' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য :

'কল্পনা এবং কাল্পনিকতা তুইয়ের মধ্যে একটা প্রভেদ আছে। যথার্থ কল্পনা, যুক্তি সংযম এবং সত্যের দ্বারা সুনির্দিষ্ট আকারবদ্ধ—কাল্পনিকতার মধ্যে সত্যের ভান আছে মাত্র কিন্তু তাহা অদ্ভুত আতিশয্যে অসংগতরূপে স্ফীতকায়। তাহার মধ্যে যেটুকু আলোকের লেশ আছে ধূমের অংশ তাহার শতগুণ। যাহাদের ক্ষমতা অল্প, তাহারা সাহিত্যে প্রায় এই প্রধূমিত কাল্পনিকতার আশ্রয় হইয়া থাকে—কারণ, ইহা দেখিতে প্রকাণ্ড কিন্তু প্রকৃতপক্ষে অত্যন্ত লঘু। এক শ্রেণীর পাঠকেরা এইরূপ ভূরি-পরিমাণ কৃত্রিম কাল্পনিকতার নৈপুণ্যে মুগ্ধ এবং অভিভূত লইয়া পড়েন এবং তুর্ভাগ্যক্রমে বাংলায় সেই শ্রেণীর পাঠক বিরল নহে।'

এইরূপ অপরিমিত. অসংগত কল্পনার দেশে বঙ্কিমের ন্যায় আদর্শ আমাদের পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান। 'কৃষ্ণচরিত্রের' উদ্দাম ভাবের আবেগে তাঁহার কল্পনা কোথাও উচ্ছৃঙ্খল হইয়া ছুটিয়া যায় নাই। প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সর্বত্রই তিনি পদে পদে আত্মসংবরণপূর্বক যুক্তির সুনির্দিষ্ট পথ অবলম্বন করিয়া চলিয়াছেন। যাহা লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে, যাহা লিখেন নাই তাহাতেও তাঁহার অল্প ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই।'

বঙ্কিমের শাস্ত্রানুসন্ধান সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের সেই লেখাটিতেই বলা হ'য়েছিল যে, তিনি দেশানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অন্তরে প্রবেশ ক'রেছিলেন এবং সত্যানুরাগের সাহায্যে শাস্ত্রের অমূলক অংশ পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। তাঁর প্রতিভার এই বিশেষ প্রকৃতিটিই ছিল আতিশয্য এবং অসংগতি থেকে সর্বপ্রকারে আত্মরক্ষার সামর্থ্য। প্রবন্ধটির শেষ দিকে, বঙ্কিমের হাস্যসৃষ্টির কথা-প্রসঙ্গেই এই সংযমগুণের কথা বিশেষভাবে বলা হয়। বাংলায় তিনিই প্রথম হাস্যরসকে সাহিত্যের উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেন। 'নির্মল শুভ্র সংযত হাস্য বঙ্কিমই সর্বপ্রথমে বঙ্গ সাহিত্যে আনয়ন করেন'—রবীন্দ্রনাথের এ-মন্তব্য আজ সকলেরই পরিচিত। ঈশ্বর গুপ্ত-দীনবন্ধুর আমলে এই রুচি রক্ষা করা যে সহজ কাজ ছিল না, রবীন্দ্রনাথ সেকথাও স্মরণ ক'রে

গেছেন। ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্বে, বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্য সম্বন্ধে তাঁর সে মন্তব্য স্মরণীয়। তাঁর কথায়:

> 'বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে ঈশ্বরগুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্যশ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে-সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না। সে-সময়কার অসংযত বাক্‌যুদ্ধ এবং আন্দোলনের মধ্যে দীক্ষিত ও বর্ধিত হইয়া ইতরতার প্রতি বিদ্বেষ, সুরুচির প্রতি শ্রদ্ধা এবং শ্লীলতা সম্বন্ধে অক্ষুণ্ণ বেদনাবোধ রক্ষা করা কী যে আশ্চর্য ব্যাপার তাহা সকলেই বুঝিতে পারিবেন। দীনবন্ধুও বঙ্কিমের সমসাময়িক এবং তাঁহার বান্ধব ছিলেন কিন্তু তাঁহার লেখায় অন্য ক্ষমতা প্রকাশ হইলেও তাঁহাতে বঙ্কিমের প্রতিভার এই ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা দেখা যায় না। তাঁহার রচনা হইতে ঈশ্বর গুপ্তের সময়ের ছাপ কালক্রমে ধৌত হইতে পারে নাই।'

'আধুনিক সাহিত্যে' বঙ্কিম-সম্পর্কিত দ্বিতীয় প্রবন্ধের নাম 'কৃষ্ণচরিত্র' এবং তৃতীয়টি 'রাজসিংহ'। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে ব'লতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন যে, বঙ্গসমাজের 'উল্টারথের দিনে' এই কৃষ্ণচরিত্র রচিত হয়। অর্থাৎ, রবীন্দ্রনাথের কথায়—'সমাজ ও ধর্মের মূল জাতীয় প্রকৃতির এমন গভীরতম দেশে অনুপ্রবিষ্ট যে তাহাতে হস্তক্ষেপ করিতে গেলে নানা দিক হইতে নানা গুরুতর বাধা আসিয়া পড়ে এবং পুরাতন অমঙ্গলের স্থলে নূতন অমঙ্গল মাথা তুলিয়া দাঁড়ায়। এমন স্থলে শঙ্কিতচিত্তে পুনরায় নিশ্চেষ্টতার অবলম্বন করিতে প্রবৃত্তি হয় এবং সেই নিশ্চেষ্টতার পথে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত স্পর্ধার সহিত আস্ফালন করাও অস্বাভাবিক নহে—বুক ফুলাইয়া সর্বসাধারণকে বলিতে ইচ্ছা করে ইহা আমাদের হার নহে, জিত।' এই অবস্থার কথা ব'লতে গিয়েই 'উল্টারথের দিন' প্রয়োগটি ঘ'টেছিল। কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি লিখেছিলেন: 'প্রথম ইংরেজি শিক্ষা পাইয়া আমরা যখন রাজনীতির সমালোচনা আরম্ভ করিয়া দিলাম, সমাজনীতি এবং ধর্মনীতিও সেই নিষ্ঠুর পরীক্ষার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি প্রাপ্ত হয় নাই। তখন ছাত্রমাত্রেরই মনে

আমাদের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে একটা অসন্তোষ ও সংশয়ের উদ্রেক হইয়াছিল।' রবীন্দ্রনাথ নিজে যেখানে রাষ্ট্রচিন্তার কথা জানিয়েছেন, সেখানে সমাজ এবং ধর্মের কথা অবিচ্ছেদ্য ভাবে দেখা দিয়েছে। এই 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে তাঁর এই বিশেষ দৃষ্টির কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা চোখে পড়ে। সেকালের অবস্থা মনে রেখে এখানে তিনি ব'লে গেছেন: 'রাজ্যতন্ত্র সম্বন্ধে আমাদের নিজের কর্তব্য অতি যৎসামান্য; কারণ, রাজত্বের অধিকার আমাদের হস্তে কিছুই নাই। এইজন্য পোলিটিক্যাল সমালোচনা এখনো অত্যন্ত তীব্র ও প্রবলভাবে চলিতেছে, তৎসম্বন্ধে কোনোপ্রকার দ্বিধা অথবা বাধা অনুভব করিবার কোনো কারণ ঘটে নাই। কিন্তু সমাজ ও ধর্মসম্বন্ধীয় কর্তব্য আমাদের নিজের হাতে। অতএব ধর্ম ও সমাজনীতি সম্বন্ধে বিচারে যাহা স্থির হয় কাজে তাহার প্রয়োগ না হইলে সেজন্য আপনাকে ছাড়া আর কাহাকেও দোষী করা যায় না।' সমাজ এবং ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় সেকালে আমাদের বিশেষ আগ্রহের কারণ ব্যাখ্যা ক'রে তিনি এসব কথা লিখেছিলেন।

কাজে কাজেই সেদিকে উদাসীন থাকা সম্ভব নয়। কোনো-না-কোনো কৈফিয়ৎ বা ব্যাখ্যার কথা মানুষকে ভাবতেই হয়। উনিশ শতকে ইউরোপীয় ভাবাদর্শের সম্মুখীন হ'য়ে বাঙালী সমাজকে এই কারণেই সমাজ এবং ধর্মের ভাঙনের কথা বারবার ভাবতে হয়েছিল। একবার সমালোচনার উদ্যোগ,—পর মুহূর্তেই নিশ্চেষ্টতায় প্রত্যাবর্তন,—এই ছিল তখনকার অবস্থা। সেই বিচার-বিবেচনার ফলে যে-সব সিদ্ধান্ত দেখা দিয়েছিল, বঙ্কিম-সাহিত্যে তারই ছায়া প'ড়েছে।

তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' যে কেবল জনতার স্বরে স্বর মিলিয়ে যাওয়া নয়, তাতে যথার্থই 'প্রতিভার কণ্ঠে' নতুন এক সুর যে বেজে উঠেছিল, তাঁর এই প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে সে-কথা অকুণ্ঠভাবে সূচিত। তিনি লিখে গেছেন যে, কৃষ্ণচরিত্রে 'সর্বসাধারণের সমর্থন নাই, সর্বসাধারণের প্রতি অনুশাসন আছে'। কৃষ্ণচরিত্রে বঙ্কিম 'স্বাধীন মনুষ্যবুদ্ধির জয়পতাকা' উড়িয়েছিলেন। এই দিকটিতে বিশেষ জোর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ জানিয়ে গেছেন:

> 'আমাদের মতে 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থের নায়ক কৃষ্ণ নহেন, তাহার প্রধান অধিনায়ক স্বাধীন বুদ্ধি, সচেষ্ট চিত্তবৃত্তি। প্রথমত বঙ্কিম বুঝাইয়াছেন, জড়ভাবে শাস্ত্রের অথবা লোকাচারের অনুবর্তী হইয়া আমরা

পূজা করিব না, সতর্কতার সহিত আমাদের মনের উচ্চতম আদর্শের অনুবর্তী হইয়া পূজা করিব। তাহার পরে দেখাইয়াছেন, যাহা শাস্ত্র তাহাই বিশ্বাস্য নহে, যাহা বিশ্বাস্য তাহা শাস্ত্র। এই মূল ভাবটিই কৃষ্ণচরিত্র গ্রন্থের ভিতরকার অধ্যাত্মশক্তি, ইহাই সমস্ত গ্রন্থটিকে মহিমান্বিত করিয়া রাখিয়াছে।'

কৃষ্ণচরিত্রের যথার্থ ইতিহাস অনুসন্ধানের প্রয়াস বঙ্কিমের লেখাতেই প্রথম দেখা গিয়েছিল। সে-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ ব'লেছেন :

'কোন্‌টা ইতিহাস তাহা স্থির করিবার পূর্বে কোন্‌টা ইতিহাস নহে তাহা নির্ণয় করা বিপুল পরিশ্রমের ও বিচক্ষণতার কাজ। আমাদের বিবেচনায় বর্তমান গ্রন্থে বঙ্কিম সেই ভাঙিবার কাজ অনেকটা পরিমাণে শেষ করিয়াছেন—গড়িবার কাজে ভালো করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার অবসর পান নাই।'

রবীন্দ্রনাথের বঙ্কিম-পর্যালোচনা এইভাবে এগিয়েছিল।

উনিশ শতকের বঙ্গ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই ভাঙা-গড়ার সুবিপুল বৈচিত্র্যের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের ভূমিকার যথার্থ স্বরূপটি কী, সে-আলোচনা তাঁর সাহিত্য-পাঠের মধ্য দিয়েই আহরণীয়। মনুষ্যত্বের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর নিজস্ব ধ্যান এবং সমকালীন মানবজগৎ সম্বন্ধে তাঁর চিন্তা,—তাঁর সাহিত্যসৃষ্টিতে দুই-ই প্রতিফলিত হয়েছে।

॥ ৬ ॥

বঙ্কিম-মানসের স্বরূপ বিশ্লেষণের চেষ্টা হয়েছে অনেকবার। কেউ কেউ তাঁর সমাজ-চেতনার ওপর জোর দিয়েছেন। পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের মতামত সম্বন্ধে তিনি কতোটা সজাগ ছিলেন, সে-বিষয়ে কোনো কোনো আলোচক একটু যেন বেশি উৎসাহই দেখিয়েছেন। তাঁর গভীর গাম্ভীর্য এবং সরস সমালোচনা দুই-ই উল্লেখযোগ্য। তাঁর দেশপ্রেম আর ইউরোপ-অনুরাগ দুই-ই সত্য। উপন্যাসে এবং প্রবন্ধে—প্রধানত সাহিত্যের এই দুটি মাধ্যম অবলম্বন ক'রে নিজের পরিণত মনন এবং সমীক্ষার পরিচয় তিনি নিজেই রেখে গেছেন। অধ্যাপক সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' [দ্বিতীয় খণ্ড]

-এর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ থেকে রবীন্দ্রনাথের 'সাধনা' প্রকাশের পূর্বকাল অবধি—অর্থাৎ ১৮৭২ থেকে ১৮৯১ পর্যন্ত কুড়ি বছরের পর্বটিকে 'শিক্ষা-পর্ব' নাম দিয়েছেন। তার আগের অধ্যায় 'সংস্কার পর্ব'। তাঁর নিজের কথায়—'পূর্বের যুগকে যদি 'সংস্কার-পর্ব' বলি তবে আলোচ্য যুগকে বলিব শিক্ষা-পর্ব। পূর্বের যুগে সাহিত্যের প্রবণতা ছিল সমাজ সংস্কারের দিকে।'

এই চিত্ত সংস্কারের যুগেই জাতীয়তাবোধ বাংলা সাহিত্যের গদ্য-পদ্য-নাটক—সকল ক্ষেত্রেই প্রকট হয়ে ওঠে। বঙ্কিম-সাহিত্যে এই স্বাদেশিকতা-বোধ বা জাতীয়বোধের সম্যক অভিব্যক্তি দেখা যায়। সাহিত্য-সাধক চরিতমালায় বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের আলোচনায় সজনীকান্ত এবং ব্রজেন্দ্রনাথ জানিয়েছেন যে, ১৮৫২র ২৫এ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৮৯৪এর মার্চ মাস অবধি মোট ৪২ বৎসর বঙ্কিমচন্দ্র সাহিত্য সাধনা করে গেছেন। সেই বিয়াল্লিশ বছয়ের আবার চারাটি পর্ববিভাগ কল্পিত হ'য়েছে। সেগুলি এই রকম :

আদিপর্ব : ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ থেকে আরম্ভ ক'রে ১৮৬৫তে দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশ অবধি ১৩ বছর। বঙ্কিম তখন হুগলী-কলেজের ছাত্র,—তারপর প্রেসিডেন্সি কলেজের,—তারপর তাঁর চাকরি শুরু হ'য়েছে। তাঁর তখনকার গুরু ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত এবং সতীর্থ দীনবন্ধু মিত্র, দ্বারকানাথ অধিকারী প্রভৃতি। ১৮৫৬তে ললিতা ও মানস' প্রকাশিত হওয়ার পর কাব্যচর্চা তিনি প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলেন। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব, রংপুরের ভুষভাণ্ডারের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী ও কুণ্ডি পরগনার জমিদার কালীচন্দ্র রায় চৌধুরী বঙ্কিমকে সে-পর্বে নানাভাবে উৎসাহিত ক'রেছেন। ব্রজেন্দ্র-সজনীকান্ত ঠিকই ব'লেছেন—'আদিপর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা যদি বা পড়া যাইত, তাঁহার গদ্য ছিল অপাঠ্য, বিষম!' 'ললিতা ও মানসের' 'বিজ্ঞাপনে' 'গ্রন্থকার' নিজে লিখেছিলেন 'সুকাব্যালোচক মাত্রেরই অত্র কবিতাদ্বয় পাঠে প্রতীতি জন্মিবেক যে ইহা বঙ্গীয় কাব্যরচনারীতি

পরিবর্তনের এক পরীক্ষা বলিলে বলা যায়। তাহাতে গ্রন্থকার কতদূর সুত্তীর্ণ হইয়াছেন তাহা পাঠক মহাশয়েরা বিবেচনা করিবেন।

উদ্যোগপর্ব : ১৮৬৫ থেকে ১৮৭২—অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী থেকে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশ অবধি ৭ বছর।

যুদ্ধপর্ব : ১৮৭২ থেকে ১৮৮৯—অর্থাৎ 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'প্রচার পত্রিকার শেষ সীমা অবধি ১৭ বছর।

শান্তিপর্ব : ১৮৮৯ থেকে ১৮৯৪-এর এপ্রিল মাসে তাঁর মৃত্যু অবধি ৫ বছর।

ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্ত লিখেছেন : 'প্রথম দুই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক, তৃতীয় পর্বে সম্পাদক ও সমালোচক এবং চতুর্থ পর্বে তিনি পিতামহ ভীষ্মের মত উপদেষ্টা।'

১২৮৪ সালের আশ্বিন সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের 'মনুষ্যত্ব কি?' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। তাতে তাঁর এই মন্তব্য দেখা গিয়েছিল যে, মানব-জীবনের উদ্দেশ্য কি, সে-বিষয়ে প্রকৃত মীমাংসা যদিও সহজ নয়,—এবং ব্যক্তি-মাত্রেরই 'কিয়ৎপরিমাণে ধনাকাঙ্ক্ষা' থাকা যদিও সমাজের পক্ষে মঙ্গলকর,—আর, শাক্যসিংহ প্রভৃতি যে-সব মনীষী বলে গেছেন যে 'ঐহিক ব্যাপারে চিত্তনিবেশ মাত্র অনিষ্টপ্রদ' তাঁরা যদিও বঙ্কিমের অনুমোদনযোগ্য কথা বলেন নি, তবু—'স্থূল কথা এই যে, ধনসঞ্চয়াদির ন্যায় সুখশূন্য, শুভ-ফলশূন্য, মহত্বশূন্য ব্যাপার প্রয়োজনীয় হইলেও কখনই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বলিয়া গৃহীত হইতে পারে না।' তিনি ব'লেছিলেন : 'এ জীবন ভবিষ্যৎ পারলৌকিক জীবনের জন্য পরীক্ষা মাত্র—পৃথিবী স্বর্গলাভের জন্য কর্মভূমি মাত্র—এ কথা যদি যথার্থ হয়, তবে পরলোকে সুখপ্রদ কার্যের অনুষ্ঠানই জীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত বটে।' পরলোক এবং স্বর্গ সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিশ্বাস সেখানে তিনি এর চেয়ে জোর ক'রে ব্যক্ত করেন নি। সে-রকম প্রকাশে ঈষৎ 'যদি'-র বাধা ঘটেছিল। তবে, পরলোকে অবিশ্বাসও তিনি করেন নি। তিনি ব'লেছিলেন : 'মনোবৃত্তিসকল যে অবস্থায় পরিণত হইলে পুণ্যকর্ম তাহার স্বাভাবিক ফলস্বরূপ স্বতঃনিষ্পাদিত হইতে থাকে, পরলোক থাকিলে, তাহাই পরলোকে শুভদায়ক বলিলে কথা গ্রাহ্য করা যাইতে পারে। পরলোক থাকুক বা না থাকুক, ইহলোকে তাহাই

মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য বটে।' এই সিদ্ধান্ত প্রকাশের পরেই তাঁর মনে আবার একটু 'কিন্তু' দেখা দিয়েছিল। ঠিক এর পরের বাক্যেই তাঁকে ব'লতে হ'য়েছিল—'কিন্তু কেবল তাহাই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য হইতে পারে না।' তাঁর মতে মানবমনের চিত্তরঞ্জিনী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী—যাবতীয় সুবৃত্তির সম্যক অনুশীলনের লক্ষ্যই স্বীকার্য। তাঁর নিজের কথায়—'বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।' যাঁরা পৃথিবীতে এই আদর্শ অনুসরণ ক'রে জীবন যাপন ক'রে গেছেন, সেরকম মানুষের মধ্যে তিনি দুজনের কথা বিশেষ-ভাবে উল্লেখ ক'রেছিলেন—একজন গেটে, দ্বিতীয় ব্যক্তি জন স্টুয়ার্ট মিল!

এই প্রবন্ধের চার বছর আগে মিল্-এর মৃত্যু উপলক্ষে ১২৮০র শ্রাবণ-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর 'জন স্টুয়ার্ট মিল' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। তাতে মিলের জন্মকাল ১৮০৬ থেকে তাঁর মৃত্যুবর্ষ ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ অবধি তাঁর জীবনের আদর্শ এবং তৎসম্পর্কিত প্রধান প্রধান কর্ম-পরিচিতি দেওয়া হ'য়েছিল। প্রসঙ্গত কোম্‌তের উল্লেখ ছিল। রাজ্যশাসন, বিদ্যানুশীলন, সমাজ-সংগঠন ইত্যাদি বিষয়ে মিলের বিশিষ্ট চিন্তারও সংক্ষিপ্ত আলোচনা ক'রেছিলেন তিনি। মিল যে 'অতি সূক্ষ্মবুদ্ধিসম্পন্ন নৈয়ায়িক' ছিলেন,—স্ত্রী-স্বাধীনতা প্রচারে তাঁর যে বিশেষ আগ্রহ ছিল,—কোম্‌তের সঙ্গে শেষ দিকে তাঁর যে মতের মিল ছিল না,—এবং ভারতবর্ষে শিক্ষাব্যবস্থা-সম্পর্কিত ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের প্রসিদ্ধ লিপি[৭] রচনায় মিলের যে বিশেষ উৎসাহ এবং সহযোগিতা ছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ছোট প্রবন্ধটিতে এসব ঘটনারও উল্লেখ স্মরণীয়। এই নানাকথার মধ্যেই মিলের মৃত্যুতে তাঁর গভীর শোকোচ্ছ্বাস ব্যক্ত হ'য়েছিল এবং একটি সংক্ষিপ্ত বাক্যে তিনি জানিয়েছিলেন: 'ব্যক্তিবিশেষ ও জনসমাজ এতদুভয় মধ্যে, মিলের মতে ব্যক্তির প্রাধান্য রক্ষা করিয়া সমাজের উন্নতিসাধন করিতে হইবেক নতুবা পৃথিবী ক্রমশঃ নিস্তেজ হইয়া যাইবেক।'

আবার, 'কমলাকান্তের দপ্তরে' 'বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব' প্রবন্ধে দেখা যায় যে,

৭। Wood's Despatch : এই ডেসপ্যাচের প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ভারতবর্ষের শিক্ষণ-ব্যবস্থাপনায় সেই প্রথম কিছু কিছু পালনীয় কর্মবিধি এবং পরিকল্পনা ঘোষিত হয়। কোম্পানির ডিরেক্টরদের এতে একথাও বোঝাবার চেষ্টা ছিল যে, দেশীয় ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা প্রচার বিধেয় এবং ভারতে ইউরোপীয় আদর্শের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার কাল সমাসন্ন। ১৮৫৭র ২৪এ জানুয়ারি সমুচিত আইন পাশ হওয়ার পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়।

এক 'ভৃঙ্গরাজ' উড়ে এসে কমলাকান্তকে ব'লেছিল : 'তোমায় সত্য বলিতেছি, কমলাকান্ত! তোমাদের জাতির ঘ্যান্‌ঘ্যানানি আর ভাল লাগে না। দেখ আমি যে ক্ষুদ্র পতঙ্গ, আমিও শুধু ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করি না—মধু সংগ্রহ করি আর ফুল ফুটাই।' বঙ্কিমচন্দ্রের অধ্যাত্ম-মননে কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ—তিন যোগেরই প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত। তিনি ব্যক্তিত্বের সম্যক স্ফুরণও চেয়েছিলেন, জনসমাজের সম্যক বিকাশও চেয়েছিলেন। তবে, ব্যক্তিত্বের প্রাধান্য সম্বন্ধেই তাঁর যেন কিঞ্চিৎ বেশি আগ্রহ ছিল।

দেবেন্দ্রনাথের হাতে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়, তাতে পাশ্চাত্য দার্শনিক ডেকার্টের প্রভাব ব'র্তেছিল ব'লে শোনা যায়। ডিরোজিও তাঁর হিন্দু-কলেজের ছাত্রদের লক্, স্টুয়ার্ট, হিউম পড়িয়েছিলেন। হার্বার্ট স্পেন্সর, শোপেনহবার, ক্যাণ্ট, ডারুইন ইত্যাদি দার্শনিকদের মতামতও সেকালে এদেশে খুবই পড়া হ'য়েছে। ভূদেব এবং বঙ্কিম দুজনেই কোম্‌তের অনুরাগী ছিলেন। প্রসঙ্গটি একটু ব্যবহিত হলেও, এই সূত্রে সেকালের প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য দার্শনিক নীট্‌শের কথা মনে পড়ে। অনুকূল পরিবেশের প্রভাবেই যে বড়ো বড়ো ব্যক্তিত্বের উদ্ভব ঘটে থাকে, নীট্‌শে সে-কথা বিশ্বাস ক'রতেন। তাঁর মতে, প্রাচীন গ্রীসে ব্যক্তিত্ব জাগিয়ে তোলবার মতন উপযুক্ত সমাজ ছিল। সেখানে মানুষমাত্রেই যে ভালো ছিল, তা নয়। কোনো দেশে, কোনো কালেই তা হয় না। বরং সেকালের গ্রীসে মানুষের কুপ্রবৃত্তির সংঘর্ষ খুবই তীব্র হ'য়ে উঠেছিল। তবে, শ্রেষ্ঠ বক্তিত্ব স্ফুরণের পক্ষে সে-অবস্থা অনুকূল ছিল। যে উপায়েই হোক্, শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে দেওয়াই নাকি মানব-সমাজের লক্ষ্য! নীট্‌শেই সে-কথা ব'লে গেছেন!

কিন্তু সমাজে ব্যক্তিত্বের স্থান সম্বন্ধে বঙ্কিম যা ভাবতেন সে অন্য কথা। তাঁর ভাবনা অন্য রকম। রবীন্দ্রনাথও ব্যক্তিত্ব-সাধনার কথা ব'লেছেন। নীট্‌শের নাম উল্লেখ ক'রে তিনি নীট্‌শের অনুসৃত আদর্শের নিন্দাই ক'রেছেন।[৮] বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গেও না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও না,—নীট্‌শের সঙ্গে এদেশের চিন্তার মিল নেই। তবু, সংক্ষেপে মনুষ্যত্বের সীমা সম্প্রসারণের আদর্শগত ভাবনা ভাবতে গেলে তাঁর আয়ুকাল আর মতামতের উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

নীট্‌শে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। ১৯০০-তে তাঁর মৃত্যু হয়।

৮। কালান্তর : 'ছোটো ও বড়ো' দ্রষ্টব্য।

শেষ বয়সে তাঁর মাথা খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল ব'লে শোনা যায়। তাঁর বোন লিখেছেন যে, নীট্‌শের অতি-মানবতত্ত্ব বুঝতে হ'লে তিনটি প্রসঙ্গের সমাবেশের কথা মনে রাখা দরকার। 'The order of Rank' বলতে কী যে বোঝায়, সেটা হৃদয়ঙ্গম করা চাই। দ্বিতীয়ত, 'The will to power' '—শক্তি অর্জনের জন্যে আমাদের ভেতরকার এই ইচ্ছা-শক্তির তত্ত্বও জানা চাই, এবং তৃতীয়তঃ 'Transvaluation of all values'। নীট্‌শে মনে ক'রতেন যে, খ্রীষ্টধর্মের উদ্ভব যেহেতু নিপীড়িত জনসমাজের আত্মত্রাণের উপায় হিসেবে, সেই কারণেই—জগতে এই দীন-দরিদ্র-আর্তের ধর্ম খ্রীষ্টধর্মের ব্যাপক আকর্ষণের ফলে মানুষের সত্যিকার শৌর্য-বীর্য বা শক্তি-সাধনার ধারা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হ'য়েছে। জীবনে যা সুন্দর, সবল, গর্বান্বিত এবং শক্তিময়, সেদিকে খ্রীষ্টধর্মের তেমন নাকি আনুকূল্য নেই! অতএব, মনুষ্যত্বের যথার্থ স্বীকৃতির জন্যেই অতিমানবের বন্দনা ক'রতে হবে। অতিমানবই মানবজীবনের তীব্রতম, প্রখরতম, উজ্জ্বলতম অভিব্যক্তি! সংক্ষেপে নীট্‌শে তাই ছিলেন শক্তের উপাসক, অশক্তের শত্রু।

'জরথুষ্ট্র' তাঁরই অমর কাব্য। জরথুষ্ট্র প্রাচীন পারসিক ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন ঈশ্বরবাদী ধর্মপ্রচারক। সংসারে তথাকথিত নীতিধর্মের আদর্শ যে কতো উপলক্ষিত, কতো যে মিথ্যে,—সে-কথা তাঁর 'জরথুষ্ট্রই' দেখিয়ে দিয়েছে। তাঁর মতে, আদর্শবাদীর দল প্রতিদিনের বাস্তব লোক থেকে দূরে সরে গিয়েই আত্মরক্ষা ক'রে থাকেন। জরথুষ্ট্র ছিলেন সে রকম পলায়ন-প্রবণতার ঘোর শত্রু। ভাবের ঘরে কোনো-রকম চুরির অপরাধী হ'তে চাননি তিনি। সত্য কথা বলা এবং জীবনের আরাধ্য লক্ষ্যটা সোজাসুজি অনুসরণ করা,—একান্ত-ভাবে এই ছিলো তাঁর নিজস্ব আদর্শ। অভ্যস্ত নৈতিকতার পথে নীতির কৃত্রিম সীমানা ডিঙিয়ে যেতে চেয়েছিলেন তিনি। জীবনে সত্যিকার নীতির স্বার্থে তথাকথিত নীতিজ্ঞানের কৃত্রিম সীমা লঙ্ঘন করাটাই সত্যিকার অহংবোধের কাজ। তাকেই বলা যায় 'আমিত্বে'র যথার্থ স্বীকৃতি। তাঁর জরথুষ্ট্র বলেছিলেন :

'আমি তোমাদের অতিমানুষের কথা বলছি। মানুষ যে সীমাতে প্রতিষ্ঠিত, মনে রেখো, সেই সীমাও ছাড়িয়ে যেতে হবে। মানবসত্তার সেই সীমা অতিক্রম করবার সাধনায় কী তোমার দান?—কী-করেছ তুমি?'

'তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক জ্ঞানী যিনি, তিনিও তো ছন্দহীন একটা

মিশ্রণ—কিছু তাঁর তরুলতার মতো ক্ষীণ চৈতন্য-লাঞ্ছিত জড়, কিছু তাঁর ছায়ামূর্তি !'[১]

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-প্রসঙ্গে নীট্‌শের কথা স্মরণ করা তাই এক রকম বিরোধী ভাবনা ! এ-প্রসঙ্গ এ আসরে বলবার নয়। ভল্‌টেয়ার থেকে কোম্‌ৎ পর্যন্ত য়ুরোপের দার্শনিকরা,—যাঁরা স্বাধীন চিন্তার কথা ব'লে গেছেন—তাঁরা খ্রীষ্টীয় আদর্শে আঘাত করেন নি। শোপেনহবারও পরোপকার প্রভৃতি কোমলতা-চর্চার গুণগ্রাহী ছিলেন। কিন্তু ব্যক্তিত্বের গুণগান ক'রে ফ্রেডারিক নীট্‌শেই ব'ললেন—বিনয় মানুষের চিত্তদৈন্য মাত্র ! অথচ এই নীট্‌শেই প্রথম জীবনে নির্জনে ব'সে বাইবেল প'ড়তেন—এবং প'ড়ে মুগ্ধ হ'তেন !

যাই হোক্‌, নীট্‌শের অতিমানববাদ অন্য ব্যাপার ! বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিত্ববিকাশ-বাদ সে-ধারার অনুসরণ নয়। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাতন্ত্র্যের কথা সর্বদা স্মরণীয়। তিনি অতীতে আস্থাশীল, ভবিষ্যতে আশাময়।

কিন্তু দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র সম্পূর্ণ বঙ্কিমের একাংশ মাত্র। সাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্রকে বোঝবার জন্যেই সে-প্রসঙ্গের অবতারণা।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে ১৩৪৪-৪৫ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম-শতবার্ষিকী উৎসব সম্পন্ন হয়। মেদিনীপুর জেলার কাঁথিতে তাঁর স্মরণোৎসব-সভায় হীরেন্দ্রনাথ দত্ত সভাপতিত্ব করেন। সেই সভায় 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' সম্বন্ধে তিনি যে ভাষণ দেন, সেই ভাষণই আরো বিস্তৃত হ'য়ে পরে 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' নামে তাঁর একখানি বই প্রকাশিত হয়। সেই বইয়ের প্রকাশকাল ১৩৪৭ সাল। বইয়ের বিজ্ঞপ্তিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে, গীতার প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ হিসেবে গীতাকে তিনি স্মরণীয় বলে নির্দেশ ক'রে গেছেন। তাঁর বইখানির গুরুতে আছে 'উপক্রম' নামে একটি অধ্যায় এবং শেষে 'পরিশিষ্ট' নামে আর-একটি অধ্যায় ; আর, এই দুই প্রান্তের মধ্যবর্তী পর পর তিনটি খণ্ডে

১। 'I teach you the Superman. Man is something that is to be surpassed. What have ye done to surpass man ?

'Even the wisest among you is a disharmony and hybrid of plant and phantom.'

তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক চিন্তার বিশ্লেষণ দিয়ে গেছেন। প্রথম খণ্ডে পর পর সাতটি অধ্যায়; প্রথম অধ্যায়ে 'কোঁতের দৃষ্টবাদ', দ্বিতীয় অধ্যায়ে 'বেন্থামের হিতবাদ' তারপর তৃতীয় অধ্যায়ে 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্ব'—এবং এই তৃতীয় প্রসঙ্গই প্রথম খণ্ডের চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ, ও সপ্তম অধ্যায়ে বিবৃত হয়েছে। অতঃপর বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডে পর পর দুটি অধ্যায়ে যথাক্রমে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও ভগবদ্‌গীতা' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্র ও গীতার ধর্ম' এই দুই প্রসঙ্গ আলোচিত হ'য়েছে। আর, তৃতীয় খণ্ডে তিনটি অধ্যায়ে যথাক্রমে 'প্রত্নতাত্ত্বিক বঙ্কিমচন্দ্র', বঙ্কিমচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণ' এবং 'বঙ্কিমচন্দ্রের অবতারতত্ত্ব' সংকলিত হয়েছে। 'বিজ্ঞপ্তি'তে তিনি বলে গেছেন: 'বঙ্কিমচন্দ্রের দার্শনিক মতের পরিচয় দিতে হইলে ঐ ভগবদ্‌গীতার আলোচনা অবশ্যম্ভাবী। সেইজন্য আমার গ্রন্থের অঙ্গরূপে ভগবদ্‌গীতা সম্বন্ধে কয়েকটি অধ্যায় লিখিত হইয়া 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'য় প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ অধ্যায়গুলি এ গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে সন্নিবিষ্ট হইল।' বঙ্কিমচন্দ্রের লেখকস্বভাবের বিশেষত্ব স্মরণ ক'রে তিনি সেই বিজ্ঞপ্তিতে আরো জানিয়েছিলেন: 'বঙ্কিমচন্দ্র একাধারে দার্শনিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক ছিলেন। প্রত্নতত্ত্বক্ষেত্রে তাঁহার অপূর্ব অবদান—'কৃষ্ণচরিত্র'। শ্রীকৃষ্ণের প্রসঙ্গে তাঁহাকে অবতারতত্ত্বের আলোচনা করিতে হইয়াছিল। দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় দিতে আমিও কৃষ্ণচরিত্র ও অবতারবাদের আলোচনা করিয়াছি। পাঠক ঐ আলোচনা এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডে দৃষ্টি করিবেন।'

'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্রের' উপক্রম' অংশে 'মূল কথা' অধ্যায়েই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' বইখানির বিজ্ঞাপন থেকে হীরেন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথা তুলে দিয়েছিলেন। 'বঙ্গদর্শন' সম্পাদনার মধ্য দিয়ে বঙ্কিম সর্বাঙ্গসম্পন্ন সাহিত্য-স্থষ্টির প্রেরণা তো পেয়েই ছিলেন—তার যথার্থ নিদর্শনও পরিবেশন ক'রে গেছেন,—এই বিশেষ প্রসঙ্গই তিনি উল্লেখ ক'রেছিলেন। 'বিবিধ প্রবন্ধের' ঐ বিজ্ঞাপনে বঙ্কিম জানিয়েছিলেন:

> 'যেমন কুলি-মজুর পথ খুলিয়া দিলে অগম্য কানন বা প্রান্তর মধ্যে সেনাপতি সেনা লইয়া প্রবেশ করিতে পারেন, আমি সেইরূপ সাহিত্য-সেনাপতিদিগের জন্য সাহিত্যের সকল প্রদেশের পথ খুলিয়া দিবার চেষ্টা করিতাম।'

জ্ঞানেন্দ্রলাল রায়ের 'প্রবন্ধ লহরী' বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়

১৩০৩ সালে। 'পতাকা' ও 'নব্যভারত' পত্রিকায় তাঁর যেসব প্রবন্ধ বেরিয়েছিল, তারই কিছু কিছু এই বইয়ে সংকলিত হয়। এই প্রবন্ধ-সংগ্রহের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা দেখা যায়। 'বঙ্কিমবাবু' প্রবন্ধটি ১৩০১ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনতিকাল পরেই লেখা এবং ছাপাও হয়। বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বের কথা সেই প্রবন্ধে বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়। জ্ঞানেন্দ্রলালের সেই কথাগুলি এখানে বিবেচ্য। তিনি লিখেছিলেন :

> 'সঞ্জীবচন্দ্র, চন্দ্রনাথ, চন্দ্রশেখর, অক্ষয়চন্দ্র, রবীন্দ্র, যোগেন্দ্র, রমেশ—বঙ্কিমচন্দ্র-প্রতিভার প্রভাব। সঞ্জীববাবু, বঙ্কিম-রবি-প্রতিফলিত চন্দ্রালোক। চন্দ্রনাথবাবুর শকুন্তলাতত্ত্ব বঙ্কিমবাবুর উত্তরচরিত সমালোচনা-উদ্বোধিত। তাঁহার হিন্দুত্ব, ব্রাহ্মণ বঙ্কিমের ব্রাহ্মণত্বে জীবিত। চন্দ্রশেখরবাবুর 'উদ্‌ভ্রান্ত প্রেম' বঙ্কিমবাবুর কমলাকান্তের দপ্তরের একখানি মাত্র কাগজ পরিবর্ধিত; কমলাকান্তের নানাবিধ সুরের মধ্যে একটি সুর মাত্র গীতিপুঞ্জে দীর্ঘীকৃত, কলকণ্ঠে মধুরনাদিত। অক্ষয়বাবু 'বঙ্গদর্শনে', 'সাধারণীতে,' 'নবজীবনে' বঙ্কিমবাবুর মেধাবী শিষ্য রবীন্দ্রবাবু বঙ্কিমবাবুর সহজ চলিত ভাষা, আরও সহজ করিয়া, লিখিত ভাষায় কথিত ভাষার আরও সমাবেশ করিয়া, বঙ্কিমবাবুর কবিত্বময় গদ্য আরও কবিত্বময় করিয়া, সুন্দরে সুন্দর মিশ্রিত করিয়াছেন। রমেশবাবুর 'বঙ্গবিজেতা' বঙ্কিমবাবুর উৎসাহে লিখিত। যোগেন্দ্রবাবুর 'আর্য্যদর্শন, 'বঙ্গদর্শনের' অনুযাত্রী। আমাদিগের দেশের আরও অনেক সুলেখক আছেন, তাঁহারা নিজেরাই স্বীকার করিবেন যে বঙ্কিম তাঁহাদিগের সাহিত্য-জীবনের প্রবৃত্তি বা জন্মদাতা, তাঁহাদিগের রচনাতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে দেখিতে পাইতেছি।'

আমাদের দেশের ঐতিহ্যলব্ধ যাবতীয় অর্জনের যা সারাংশ, নিজের প্রতিভার গুণে সেই সব উপাদান আত্মসাৎ ক'রে নিজের দেশকে বঙ্কিমচন্দ্র ভবিষ্যতের পথ দেখিয়ে গেছেন, এই ছিল লেখকের সুচিন্তিত মন্তব্য। তিনি জানিয়ে গেছেন :

> 'আমি বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থকারগণের ভিতর, তাঁহার প্রতিভায় উন্মেষিত প্রতিভা-সম্পন্ন গ্রন্থকারগণের ভিতর, তাঁহার সহস্র পাঠকের

হৃদয়দর্পণের ভিতর, যুক্তিমূলক হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের চেষ্টার ভিতর, এক বঙ্কিমচন্দ্রকে সহস্রধা দেখিতে পাইতেছি।'

সে-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ইংরেজি ভাষায় বিশেষ অধিকারের কথাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত হ'য়েছিল। জ্ঞানেন্দ্রলাল ব'লেছিলেন :

> 'ইংরাজি ভাষায় বঙ্কিমবাবুর অসাধারণ দখল ছিল। বঙ্কিম-হেষ্টি যুদ্ধে, বঙ্কিমের ইংরাজির শক্তিতে, ইংরাজি-নিপুণ হেষ্টিকে অস্থির হইয়া 'ধন্য ধন্য' বলিতে হইয়াছিল। এমন কি, তখন কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছিলেন যে বঙ্কিমের ইংরাজি অধিক মিষ্ট বা বাঙ্গালা অধিক মিষ্ট, তাহা আমরা বলিতে পারি না।'

ইংরেজি ভাষায় প্রগাঢ় জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও তিনি যে মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশ করাই সমীচীন মনে ক'রেছিলেন, সে-প্রসঙ্গ স্মরণ ক'রে এই আলোচনায় আরো বলা হ'য়েছিল :

> 'বক্তৃতাতে বল, সংবাদপত্রে বল, উপন্যাসে বল, নাটকে বল, বাঙ্গালা ভাষাতে বঙ্গসমাজের যে সংস্কার ও উন্নতি হইতে পারে, তাহা ইংরাজিতে কদাপি হইতে পারে না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনতাবোধ বিশ্লেষণ ক'রে তিনি দেখিয়ে গেছেন যে, এই স্বাধীনতাবোধের ফলেই বঙ্কিম একদিকে ইংরেজির শাসন থেকে আত্মরক্ষা ক'রেছেন, অন্যদিকে সংস্কৃতের প্রভুত্ব থেকে নিজের স্বাতন্ত্র্য বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছিলেন। জ্ঞানেন্দ্রলালের নিজের কথায় :

> 'বঙ্কিমবাবু চতুষ্পাঠিতে রীতিমত পড়িয়াও সংস্কৃত শাস্ত্রে সুপণ্ডিত হইয়াও তাঁহার রচিত গ্রন্থে সংস্কৃত শব্দের আড়ম্বর পরিত্যাগ করিয়া, কথিত ভাষার যথাযোগ্য প্রভুত্ব সংস্থাপন করিলেন।'

সাহিত্য-শিল্পী হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বাধীনতার কথা-সূত্রে তাঁর এই বিশেষ ভাষা-প্রকৃতির উল্লেখ ক'রে, অতঃপর তাঁর চিন্তার স্বাধীনতার কথা বলা হ'য়েছিল। সেই উনিশ শতকের মধ্যপর্বে বাংলা সাহিত্যের ভাষা-সৃষ্টিতে বিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের প্রয়াস-প্রযত্নের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। জ্ঞানেন্দ্রলালও তা ভোলেন নি। তিনি জানিয়ে গেছেন যে, বিদ্যাসাগর মহাশয় নিঃসন্দেহে বাংলাভাষার এক নতুন যুগ সৃষ্টি ক'রে গেছেন —এবং তাঁর পরে,—বঙ্কিমচন্দ্র নতুনতর আর এক যুগ প্রবর্তন করেন :

'বাঙ্গালা ভাষা-সাম্রাজ্যের সম্রাট-বংশে বিদ্যাসাগর মহাশয় বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে বঙ্কিম যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত হন, এবং তাঁহার বিবিধ বিষয়িণী বুদ্ধি দ্বারা, রাজ্যের সীমা ও গৌরব বৃদ্ধি করেন।'

বঙ্কিমের চিন্তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে আরো যা বলা হয়েছিল, পরিমাণে একটু বেশি দীর্ঘ হ'লেও—সে কথাগুলি এখানে উদ্ধৃত হোলো :

'আমি বঙ্কিমের স্বাধীন চিন্তার কথা বলিতেছিলাম। তিনি যে ডার্বিন স্পেন্সারের ন্যায় কোন একটা নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন, কোন একটা নূতন মত, নূতন চিন্তা জগৎকে দিয়া গিয়াছেন, তাহা আমি বলিতেছি না। আমি বলিতেছি যে, তিনি ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং সংস্কৃত শাস্ত্র একটু নূতনভাবে বুঝাইয়াছেন। ইংরাজি বিজ্ঞান সংস্কৃত শাস্ত্রের দীপে, সংস্কৃত শাস্ত্র ইউরোপীয় আলোকে, পাঠককে নূতনভাবে দেখাইয়াছেন। সাহিত্যের তিনটি যুগ আছে ১। অনুবাদ যুগ, ২। অনুরচনা যুগ, ৩। মূল রচনা যুগ। ইংরাজি সাহিত্যের সংঘর্ষণে এবং বাঙ্গালীদিগের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতা-বশতঃ, অন্য দেশে দুই শতাব্দীতে সাহিত্যের যে পরিমাণে বিকাশ হয়, আমাদিগের দেশে এক শতাব্দীতে সেই পরিমাণে সাহিত্যের উন্নতি হইয়াছে। এক শতাব্দীতে সাহিত্যের দুইটি যুগের আবির্ভাব হইয়াছে এবং তৃতীয় যুগের সূত্রপাত হইয়াছে। রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের যুগ, অনুবাদের যুগ, আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টির যুগ। বিদ্যাসাগর মহাশয় হইতে বঙ্কিমবাবুর যুগ, অনুকরণ বা অনুরচনার যুগ। কিন্তু বঙ্কিমবাবুর কেবলমাত্র অনুরচনাতে নিঃশেষ হন নাই, তিনি অনুরচনার যুগের শেষভাগে মূল রচনার আরম্ভ করিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিমবাবুর অভ্যুদয়ের পূর্বে ইংরাজপ্রিয় কৃতবিদ্যগণের প্রায় স্থির জ্ঞান ছিল যে, তাঁহাদের পাঠের যোগ্য কিছুই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত হইতে পারে না। তাঁহাদিগের বিবেচনায়, বাঙ্গালা ভাষায় লেখক হয়ত বিদ্যাবুদ্ধিহীন, লিপিকৌশলশূন্য, নয়ত ইংরাজি গ্রন্থের অনুবাদক। তাঁহাদিগের বিশ্বাস ছিল 'যাহা কিছু বাঙ্গালা ভাষায় লিপিবদ্ধ হয়, তাহা হয়ত অপাঠ্য, নয়ত

> কোন ইংরাজি গ্রন্থের ছায়া মাত্র। ইংরাজিতে যাহা আছে, তাহা আর বাঙ্গালায় পড়িয়া আত্মাবমাননার প্রয়োজন কি?' তখন সুশিক্ষিতে বাঙ্গালা পড়িত না। সুশিক্ষিতে যাহা পড়িত না, তাহা সুশিক্ষিতে লিখিতে চাহিত না। 'লেখক মাত্রেই যশের অভিলাষী। যশ সুশিক্ষিতের মুখে। অন্যে সদসৎ বিচারক্ষম নহে, তাহাদিগের নিকট যশ হইলে, তাহাতে রচনার পরিশ্রমের সার্থকতা বোধ হয় না।' সুশিক্ষিতে না পড়িলে সুশিক্ষিত ব্যক্তি লিখিবে কেন? কিন্তু সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা পড়িত না কেন? বাঙ্গালার মূল রচনা ছিল না বলিয়া, বঙ্কিমবাবু তাঁহার মধুর উপন্যাসে, তাঁহার প্রতিভান্বিত 'বঙ্গদর্শনে', পাঠ্য মূল রচনা বাহির করিলেন। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী বাঙ্গালা রচনা আদরে পড়িতে লাগিলেন। সুতরাং বঙ্কিমবাবু বাঙ্গালার আদর বাড়াইয়া দিয়াছেন। ইহা বঙ্কিমবাবুর স্বাতন্ত্র্যের আর একটি পরিচয়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে নিজের ব্যক্তিগত পরিচয়ের কথা উল্লেখ ক'রে তাঁর এই প্রবন্ধে তিনি আরো লিখেছিলেন: 'বঙ্কিমবাবুর জীবনের শেষ বৎসরে আমি তাঁহার নিকট শুনিয়াছিলাম—'আমি বিবেচনা করি, চাকুরী আমার জীবনের সর্বাপেক্ষা গুরুতর দুর্ভাগ্য।' একজন বাঙ্গালী সিভিলিয়ান বঙ্কিমবাবু নামের আদিতে 'Mr.' যোগ ক'রেছিলেন। তার উত্তরে বঙ্কিম জানান—'আমাকে মিষ্টার না লিখিয়া বাবু লিখিলেই আমি যথেষ্ট সুখী হইব।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'সুখ স্ফূর্তি ও অনুশীলন' সম্পর্কিত প্রবন্ধ প'ড়ে জ্ঞানেন্দ্রলাল 'নব্যভারতে' সেই লেখাটির কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ প্রকাশ করেন এবং নিজের নাম না দিয়ে 'মীমাংসাপ্রার্থী' ব'লে আত্মপরিচয় দেন। তার কয়েকদিন পরে বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। জ্ঞানেন্দ্রনাথের সেই আলোচনার কথা জেনেও তিনি কিন্তু অণুমাত্র কঠোরতা দেখান নি।

বঙ্কিমচন্দ্রের এই পরমতসহিষ্ণুতা,—আর, তাঁর আত্মপ্রত্যয়, ঐতিহ্যবোধ, যথার্থ স্বাধীনতা ইত্যাদি গুণের পরিচয় তাঁর সারা জীবনের অজস্র রচনায় প্রতিফলিত। বিরুদ্ধ-সমালোচকদের তর্কবিতর্ক তিনি সমুচিত শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনেছেন, ভেবেছেন এবং যোগ্যক্ষেত্রে সে-সব কথার সমুচিত জবাবও দিয়েছেন। শেষ বয়সের লেখাগুলিতে তিনি বিশেষভাবে তৎকালীন পাশ্চাত্ত্য ভাবাদর্শের সান্নিধ্য বা প্রভাবের কথা মনে রেখে, ভারতবর্ষের প্রাচীন হিন্দু-

সাধনার কথা প্রচার ক'রে গেছেন। জ্ঞানেন্দ্রলাল ঠিকই বলে গেছেন—'তিনি ইংরাজি সাহিত্যচক্রে ভ্রাম্যমান হইয়াও, সংস্কৃত শাস্ত্রের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন—বঙ্কিমবাবু হিন্দুদিগের দুর্জ্ঞেয় সাংখ্যদর্শন, অত্যুন্নত গীতাধর্ম, বহু পল্লবিত পুরাণমর্ম, অপূর্বসমাজতত্ত্ব, নব্য হিন্দুদিগের বোধগম্য ভাবে ও বিলাতি যুক্তিপ্রাণালীদ্বারা বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করিয়া, অনেকস্থানে ইউরোপীয় শিক্ষার ফল এবং সংস্কৃত শিক্ষার ফল সমন্বিত করিয়াছেন।'

বঙ্কিমের সমন্বয়চিন্তা এবং সামঞ্জস্য-সাধনার নানা দিক দেখিয়ে এই প্রবন্ধের শেষ দিকে 'দেবীচৌধুরাণী'র 'প্রফুল্ল' এবং তার সপত্নী সাগর-এর কথোপকথন তুলে দেওয়া হ'য়েছিল। 'দেবীচৌধুরাণী'কে ব্যাকরণ, ভট্টি, রঘু, নৈষধ, শকুন্তলা, সাংখ্য, বেদান্ত, ন্যায়, যোগশাস্ত্র সব-কিছুই প'ড়তে হ'য়েছিল। এই সব অধ্যয়নের পরে তিনি 'রানী' হ'য়েছিলেন। তারপরে আবার যখন গৃহধর্মে প্রত্যাগমন ক'রে সেই দেবীরানীর অন্তর্বর্তিনী প্রফুল্লকে নারীর সেবাব্রত নিতে হয়, তখন তিনি তাতেও বিমুখ হননি। এই সমন্বয়ের কথা ভেবে—বঙ্কিমচন্দ্রের এই সেকালের গুণগ্রাহী সমালোচক জানিয়েছিলেন: 'দেখুন প্রফুল্লতে বিদ্যার ও গৃহস্থালীর সমন্বয়, সংসারধর্ম আর নিষ্কাম ধর্মের সমন্বয়। বঙ্কিমবাবু যদি আর কিছু না লিখিয়া কেবলমাত্র দেবীচৌধুরাণী লিখিতেন, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে ভক্তিসহকারে প্রণাম করিতাম।'

এই বঙ্কিমের তিরোধানে বঙ্কিম-মানসের গভীর তল অবধি যাঁরা পুনরায় পর্যবেক্ষণে আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। আর, সে-সময়ে অরবিন্দ ঘোষও একটি কবিতা লিখেছিলেন। ১৮৯৪-এর ৮ই এপ্রিল বঙ্কিমের মৃত্যু হয়। তখন থেকে মাস তিনেকের ভেতর বঙ্কিম-প্রভাবিত অরবিন্দ ইংরেজিতে তাঁর সম্বন্ধে পর পর সাতটি প্রবন্ধও লেখেন। অরবিন্দের সেই ইংরেজি কবিতাটিতে বঙ্কিম-সত্তার বিশিষ্টতার কথা ছিল।[১০]

১০। SARASWATI WITH THE LOTUS

(Bankim Chandra Chatterjee, Obitt 1894)

Thy tears fall fast, O mother, on its bloom,
O white-armed mother, like honey fall thy tears,
Yet even their sweetness can no more relume
The golden light, the fragrance heaven rears,
The fragrance and the light for ever shed
Upon his lips immortal who is dead.

সেই ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দেই অরবিন্দ ঘোষ তাঁর এক গদ্য-নিবন্ধে জানান :

> 'He (Bankim) had been a sensuous youth and a joyous man. Gifted supremely with the artist's sense for the warmth and beauty of life, he had turned with a smile from the savage austerities of the ascetic and with a shudder from the dreary creed of the Puritan'।[১১]

আর, মধুসূদন এবং বঙ্কিমের তুলনার কথা ছিল তাঁর আর একটি লেখাতে :

> As we read the passage of that Titanic personality (অর্থাৎ মধুসূদনের ব্যক্তিত্ব) over a world too small for it, we seem to be listening again to the thunder-scenes in Lear, or to some tragic piece out of Thucydides or Gibbon narrating the fall of majestic nations or the ruin of mighty kings. No sensitive man can read it without being shaken to the very heart.
>
> 'Bankim's influence has been far-reaching and every day enlarges its bounds. What is its result? Perhaps it may be very roughly summed up thus: When a Mahrathi or Gujerati has anything important to say, he says it in English; when a Bengali, he says it in Bengali. That is, I think, the fact which is most full of meaning for us in Bengal.'[১২]

বরোদা ছেড়ে কলকাতায় আসবার আগেই,—১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে অরবিন্দ ঘোষ একখানি পুস্তিকা লিখে সেটি বারীন ঘোষের হাতে কলকাতায় পাঠিয়েছিলেন। সেই পনেরো-ষোলো পৃষ্ঠার চটি বইখানির নাম 'ভবানী মন্দির'। 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ' বইয়ের লেখক গিরিজাশঙ্কর

১১। 'Bankim Chandra Chatterjee' প্রবন্ধ—১৩ আগষ্ট, ১৮৯৪। গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরীর 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ' [১৫ আগষ্ট ১৯৫৬] থেকে উদ্ধৃত।

১২। 'Induprakash'—২০এ আগষ্ট ১৮৯৪। ঐ।

রায়চৌধুরীর সে-বইয়ের কথা বিস্তৃতভাবে আলোচনা ক'রেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, রাউলাট কমিটির রিপোর্টে বলা হ'য়েছিল :

Bhawani Mandir : 'It will be remembered that in 1905 was published the pamphlet Bhawani which set out the aims and objects of the revolutionaries. It was remarkable in more ways then one.'

বারীন্দ্রকুমার নিজে এই গ্রন্থকার গিরিজাশঙ্করকে ব'লে গেছেন :

'I came to Calcutta from Baroda probably in February or March, 1906 with the Mss. of Bhawani Mandir, written by Sri Aravindo in English. It was printed secretly at night in D. Gupta's press at Kalitola under the supervision of Sudhir Sorkar of Khulna, Joshi (a Marhatti) and myself in pamphlet form. The pamphlet was 15 to 16 pages, and in it there was a scheme for the establishment of a temple to Bhawani, to be erected in some inaccessible hilly region of India. Though the region was not mentioned, the site had been selected near the Sone River in the Kimur Range.

'In this temple devotees were to receive initiation both spiritually and politically for the deliverance of India from foreign rule. The scheme undoubtedly owed its origin to Anandamath of Bankim Chandra Chatterjee.

'The pamphlet opened an invocation of Bhawani and in most stirring and appealing language called for initiates to this cult in the new spirit of Nationalism. But the appeal was more in the nature of a spiritual than a political one, as the failure of the first attempt [1902-1904] at the formation of a secret society clearly proved that without spiritual background, the

movement was not likely to have the moral tone to terroist activities.'[১৩]

রাউলাট-কমিটির রিপোর্ট বেরিয়েছিল ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে। বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠ'-এর সঙ্গে 'ভবানী মন্দির' বইখানির আদর্শগত সাদৃশ্যের কথা তাঁরাও অনুভব ক'রেছিলেন। বাংলার বৈপ্লবিক চিন্তাধারার বিশ্লেষণ শুনে, তাঁরা কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক তথ্য পরিবেষণের চেষ্টা ক'রেছিলেন— এবং সেই প্রয়াসসূত্রেই তাঁরা জানিয়ে গেছেন :

'The central idea as to a given religious order is taken from the well-known novel Ananda Math of Bankim Chandra. We find the glorification of Kali, under the names of Sakti and Bhawani (two of her numerous names) and the preaching of the gospel of Force and Strength as the necessary condition for political freedom. The necessity for Indians to worship Sakti (or Bhawani manifested as the Mother of Strength) is insisted upon if success is desired. A new order of political devotee was to instituted.

'A new organization of political Sannaysis was to be started who were to prepare the way for revolutionary work. It was the liberation of India from foreign yoke.

'At this stage there was no reference to violence or crime.'[১৪]

ঐ রিপোর্টেই আরো বলা হয়েছিল :

'The Revolutionary Societies in Bengal infected the principles and rules, advocated in the Bhawani Mandir, with the Russian ideas of revolutionary violence. While

১৩। গিরিজাশঙ্করের 'শ্রীঅরবিন্দ ও বাঙ্গালায় স্বদেশী যুগ' পৃ: ৪২০-২১ : Barindra K. Ghose ; 12-6-48 দ্রষ্টব্য।

১৪। *Report of Rowlatt Committee, p. 67* । [ঐ, পৃ: ৪১২]

a great deal is said in the Bhawani Mandir about the religious aspect, the Russian rules are matter of fact.

'The samities and associations formed later than 1908, gradually dropped the religious ideas underlying the Bhawani Mandir pamphlet and developed the terroristic side with its necessary accompaniments of dacoity and murder.'[১৫]

'The book is a remarkable instance of perversion of religious ideals to political purposes.'[১৬]

॥ ৭ ॥

এদেশের ভাবের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্ব যে নানামুখী—এবং তাঁর তিরোধানের পরেও সে-প্রভাব যে অনেক ভাবে আত্মবিস্তার ক'রেছে, এসব তথ্য থেকে তারই সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁর সম্বন্ধে প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখতে গিয়ে কোনো কোনো আলোচক তাঁকে সমাজ-সংস্কারক ব'লে চিহ্নিত ক'রেছেন। কিন্তু সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে তাঁকে ঠিক কর্মী বলা চলে না। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে সমাজভুক্ত ব্যক্তিমনের যে উন্নয়ন বা নিয়ন্ত্রণ ঘটিয়ে তোলা সম্ভব, তাঁর সমাজ-সংস্কারকর্মের সীমা সেই অবধি। প্রধানত গল্প-উপন্যাসের এলাকার মধ্যে—এবং কিছু কিছু প্রবন্ধের সহায়তায় তাঁর সে-প্রয়াস আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। শেষ বয়সে, ১২৯১ সালের মাঘ সংখ্যার 'প্রচার' পত্রিকায় তাঁর 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' বেরিয়েছিল। সেই ছোটো লেখাটিতে বাংলার নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে তিনি বারো দফা পরামর্শ বা অনুরোধ জানিয়েছিলেন। তিনি বিশ্বাস ক'রতেন যে, যথার্থ বিবেক-সম্পন্ন লেখক টাকার জন্যেও লেখেন না, খ্যাতির জন্যেও লেখেন না; বৃহৎ, ব্যাপক মানব-সমাজের মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যেই সুলেখক লেখনী ধারণ ক'রে থাকেন। নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে প্রচারিত পূর্বোক্ত বিধি-নিষেধের চতুর্থ ধারাতে তাই তিনি জানিয়েছিলেন :

১৫। [ঐ, পৃঃ ৩৭—ঐ পৃঃ ৪১৩ দ্রষ্টব্য।]

১৬। [ঐ পৃঃ ১৭, পূর্বানুরূপ।]

'যাহা অসত্য বা ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থ সাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনো হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ মহাপাপ।'

অজস্র লেখার ভেতর দিয়ে এই আদর্শ প্রচার করা সত্ত্বেও ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি সমুচিত উদার ছিলেন না ব'লে অভিযোগ উঠেছিল। অতীতে অনেকেই ব'লে গেছেন এবং আজও অনেকে ব'লে থাকেন যে, মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধে তাঁর দরদের অভাব ছিল। ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে আবুল হুসেনের লেখা এক ধরনের বঙ্কিম-চর্চা দেখা দিয়েছিল—যাতে তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা,' 'বিষবৃক্ষ', 'সীতারাম', ইত্যাদি রচনাগুলির বিকৃত সমালোচনা ছাপা হয়। এখানে প্রসঙ্গক্রমে সে-সব আলোচনার উল্লেখ মাত্র করা হোলো! ততোধিক আলোচনা নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ, হীরেন্দ্রনাথ, জ্ঞানেন্দ্রলাল ইত্যাদি বঙ্কিম-সাহিত্য-আলোচকের নাম সুপরিচিত। তাঁদেরও আগে গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরীর 'বঙ্কিমচন্দ্র' বে'রিয়েছিল ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে; হারাণচন্দ্র রক্ষিতের 'বঙ্গসাহিত্যে বঙ্কিম' প্রকাশিত হয় ১৮৯৯-এ। তার আগে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রজনীকান্ত গুপ্তের 'প্রতিভা' বইখানি ছাপা হয়। সে-বইয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বরূপের রেখাচিত্র ফুটে উঠেছিল। এই সূত্রে আরো পরবর্তী বই রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'চরিত কথা'ও স্মরণীয়। ডক্টর শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা এবং ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' [১৩৪৫] একালের উল্লেখযোগ্য আলোচনা। এ ছাড়া আরো বহু লেখকের নাম করা যায়। ইংরেজিতে ডক্টর জয়ন্তকুমার দাশগুপ্তের A critical study of the life and Novels of Bankimchandra বেরিয়েছিল ১৯৩৭-এ। তার দশ বছর আগে ১৯২৭-এ রামসহায় বেদান্ত শাস্ত্রীর 'A critical study of the characters portrayed in Vankim's Novels' ছাপা হ'য়েছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে মোহিতলাল মজুমদার এ যুগের উল্লেখযোগ্য বঙ্কিম-অনুরাগী কবি-সমালোচক হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত। ডঃ অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম-মানস' এক হিসেবে নতুন দৃক্‌কোণের পরিচায়ক। আবার, বঙ্কিমচন্দ্রের ঐতিহাসিক উপন্যাসগুলির ইতিহাস-আনুগত্য সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত দিয়ে গেছেন ঐতিহাসিক

যদুনাথ সরকার। মুসলমান লেখক-পাঠক-সমাজে বঙ্কিমের বিরুদ্ধে অভিযোগও দেখা দিয়েছে, আবার তাঁর মতামতের আংশিক সমর্থনের দৃষ্টান্তও সে-অঞ্চলে একেবারেই যে চোখে না পড়ে, তাও নয়। এদিক থেকে রেজাউল করীমের নাম উল্লেখযোগ্য।

বাংলাভাষার সংস্কার-সাধন এবং বাংলা সাহিত্যের অশেষ সমৃদ্ধি বিস্তারের কাজে সে-যুগে তাঁর সত্যিকার সমকক্ষ কেউ ছিলেন না। শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে যখন নিমচাঁদের মতন ইংরেজিতে স্বপ্ন দেখবার ঝোঁক ব্যাপক হ'য়ে উঠেছিল, তখন তিনিও সে-স্রোতে হয়তো প্রথম কিছুদিন কিঞ্চিৎ ভেসে গিয়েছিলেন, কিন্তু অচিরেই তিনি তাঁর নিজের পথ খুঁজে পান। Indian Field পত্রিকায় তাঁর 'Rajmohon's wife' প্রকাশের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। সে-পথ পরিত্যাগ ক'রে অনতিবিলম্বেই তিনি মাতৃভাষার অনুশীলনে মন দিয়েছিলেন। তারপর জীবনের অবশিষ্ট কাল সেই চর্চাতেই তিনি ছিলেন একনিষ্ঠ মনোযোগী।

গল্পকার ও ঔপন্যাসিক বঙ্কিম,—প্রবন্ধ-লেখক বঙ্কিম,—আর কবি-বঙ্কিম—যথার্থ বঙ্কিম-পরিচিতির এই তিনটি ধারা। এই ত্রি-ধারার মধ্যে কবি-বঙ্কিম প্রসঙ্গই সংক্ষিপ্ততম জায়গা দাবি করে। তবে, পদ্য-ছন্দে লিখলেই যে সে-রচনা কবিতা হয়, আর গদ্য রচনায় যে সত্যিকার কাব্যগুণ একেবারেই না বর্তায়, তা নয়। বঙ্কিমের কবিদৃষ্টি সর্ববিদিত। সে-দৃষ্টির চিহ্ন ছড়িয়ে আছে তাঁর গল্পে-উপন্যাসে-প্রবন্ধে। তাঁর সেই কবিদৃষ্টির সম্যক উপলব্ধিই বঙ্কিম-সাহিত্যপাঠের অন্যতম লক্ষ্য।

গল্প-উপন্যাস ছাড়া তিনি যে অজস্র প্রবন্ধ-নিবন্ধ লিখে গেছেন, সেই সব চিন্তাভূয়িষ্ঠ আলোচনার তত্ত্ব-তথ্যের নানা দিক যেমন স্মরণীয়, তাঁর রচনার শিল্পগুণের কথাও অনুরূপ ভাবেই বিবেচ্য।

উনিশ শতকের শেষ দিকে, তিনি আমাদের সাহিত্য-প্রবাহের মধ্য দিয়ে স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে ধর্মবোধ এবং ঈশ্বর-সচেতনতা একাধারে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তিনি যে যুক্তিবাদী, তথ্যপ্রমাণাদি-সচেতন মানুষ ছিলেন, সে-কথা একবাক্যে সকলেই স্বীকার করেন। 'ধর্মতত্ত্বে'-র গুরু-শিষ্য-সংলাপের এক জায়গায় প্রীতির বিশ্লেষণসূত্রে গুরু একথা সুস্পষ্টভাবে বুঝিয়েছেন যে, পাশ্চাত্ত্য দেশে দেশবাৎসল্যের সাধনা বিদ্যমান বটে, কিন্তু সেখানে প্রীতিস্ফূর্তি সম্পূর্ণতা লাভ ক'রতে পারে নি। কারণ, সেখানে

আত্মপ্রীতিই নিখিল জগৎ-প্রীতির বাধা। হিতবাদীদের প্রভূততম লোকের প্রচুরতম হিতসাধনের আদর্শ,—নিশ্চয়বাদীর মানবপ্রীতি,—যীশু খ্রীষ্টের সর্বপ্রীতিবাদ ইত্যাদি য়ুরোপীয় সমাজের তদানীন্তন আদর্শগুলির কথা উল্লেখ ক'রেও ঐ বাধার কথা উল্লেখ ক'রতে 'গুরু' ভোলেন নি। সেই কথা-প্রসঙ্গেই হিন্দুর ঈশ্বরতত্ত্বের ব্যাখ্যা দেখা দিয়েছিল।

হিন্দুর ঈশ্বর কী রকম? 'গুরু' বলেছিলেন: 'তিনি সর্বভূতময়। তিনিই সর্বভূতের অন্তরাত্মা। তিনি জড় জগৎ নহেন, জগৎ হইতে পৃথক, কিন্তু জগৎ তাঁহাতেই আছে। যেমন সূত্রে মণিহার, যেমন আকাশে বায়ু, তেমনি তাঁহাতে জগৎ। কোন মনুষ্য তাঁহা ছাড়া নহে, সকলেই তিনি বিদ্যমান। আমাতে তিনি বিদ্যমান। আমাকে ভালবাসিলে ভালবাসিলাম। তাঁহাকে না ভালবাসিলে আমাকেও ভালবাসিলাম না। তাঁহাকে ভালবাসিলে, সকল মনুষ্যকেই ভালবাসিলাম। সকল মনুষ্যকে না ভালবাসিলে তাঁহাকে ভালবাসা হইল না, আপনাকে ভালবাসা হইল না, অর্থাৎ সমস্ত জগৎ প্রীতির অন্তর্গত না হইলে প্রীতির অস্তিত্বই রহিল না। যতক্ষণ না বুঝিতে পারিব যে সকল জগৎই আমি, যতক্ষণ না বুঝিব যে সর্বলোকে আর আমাতে অভেদ, ততক্ষণ আমার জ্ঞান হয় নাই, ধর্ম হয় নাই, ভক্তি হয় নাই, প্রীতি হয় নাই। অতএব জাগতিক প্রীতি হিন্দুধর্মের মূলেই আছে; অচ্ছেদ্য, অভিন্ন, জাগতিক প্রীতি ভিন্ন হিন্দুত্ব নাই।' বাজসনেয় সংহিতায়, গীতায়,—অর্থাৎ আমাদের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে যে এই রকম নির্দেশ আছে, সে-কথা ধর্মতত্ত্বে বারবার উল্লিখিত হ'তে দেখা গেছে।

স্বামী বিবেকানন্দের নানা প্রবন্ধে-নিবন্ধে এবং রবীন্দ্রনাথেরও অনেক প্রবন্ধে এই প্রীতিবাদ উচ্চারিত হ'য়েছে। উনিশ শতকের শেষ প্রান্ত ছেড়ে এসে, বর্তমান শতকে স্বাধীনতা-লাভের কয়েক বছর আগে পর্যন্ত, দেশের বড়ো বড়ো রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির কোলাহলের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বার বার এ-আদর্শ শুনিয়ে গেছেন। তাঁর প্রসিদ্ধ 'লোকহিত' প্রবন্ধটির কথা মনে পড়ে। তাঁর আরো অনেক রচনাতেই এ-কথা বলা হ'য়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর প্রবন্ধ-সাহিত্যে এই প্রীতি-চর্চার উপায়ও দেখিয়ে গেছেন। প্রহ্লাদকে হিরণ্যকশিপু জিগেস ক'রেছিলেন, 'শত্রুর সঙ্গে রাজার কিরূপ ব্যবহার করা কর্তব্য'? তার উত্তরে প্রহ্লাদ বলেন, 'শত্রু কে? সকলই তো বিষ্ণুময়'! বঙ্কিম সে-কাহিনী স্মরণ ক'রে বলেন যে, এ সাধনা অভ্যাস

ক'রলে শুধু প্রীতি কেন, সর্ববাৎসল্য দেখা দেবে! 'গুরু' ব'লেছিলেন: 'আজিকালি পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার জোর বড় বেশি হইয়াছে বলিয়া আমরা দেশবৎসল হইতেছি, লোকবৎসল আর নহি'।

নিষ্কাম কর্মযোগই সর্বপ্রীতিবোধ জাগিয়ে তোলবার উপায়। সংসারের বাস্তব সীমা মেনে নিয়েও বঙ্কিম ছিলেন আদর্শবাদী মানুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব দার্শনিক বিশ্বাস ব'লতে সংক্ষেপে এই কথাই বুঝতে হবে।

'দার্শনিক চিন্তা' কথাটি খুবই ব্যাপক অর্থের সূচক। 'দর্শন'-এর সংজ্ঞা কি? একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ব'লেছেন: 'দর্শন বলিতে ভারতীয় দর্শনাচার্যগণ আত্মসাক্ষাৎকার বা তত্ত্বজ্ঞানের সাধনশাস্ত্রকেই বুঝিতেন। আত্মা বা অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞানের সাধনশাস্ত্রই দর্শন, অন্য বিষয়ে জ্ঞানের নাম প্রাকৃতিক বিজ্ঞান।'[১৭]

বলা বাহুল্য, বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের অজস্র লেখাতে অধ্যাত্ম-প্রসঙ্গের অনেক উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু তাঁর নিজের জীবনে এই প্রত্যক্ষাত্মক জ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নি। সতীশচন্দ্র যে 'প্রতীতি'-র কথা জানিয়েছেন, সে-অর্থে সে-রকম কোনো প্রতীতি বঙ্কিম লাভ ক'রেছিলেন কি না, তাও বলা সাধ্য নয়।[১৮] আধ্যাত্মিক তত্ত্বানুভূতির আলোচনা-প্রসঙ্গে বলা হয়:

> 'আধ্যাত্মিক তত্ত্বের অনুভূতি ও স্বীকৃতি ধর্মের প্রকৃত লক্ষণ এবং আধ্যাত্মিক বা পারমার্থিক তত্ত্বের বিচারসাপেক্ষ জ্ঞান দর্শনের স্বরূপ। ইহা হইতে বুঝা যাইবে যে, ধর্ম ও দর্শনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সংযোগ আছে। সুপ্রসিদ্ধ জার্মান দার্শনিক হেগেলের মতে উভয়ের মধ্যে যে সকল ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে তাহাই নহে, উহারা একই বস্তু'।[১৯]

বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ধর্মচিন্তায় এ-সব ভাবনা যে অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে, সে-কথা ঠিক। তবে সাক্ষাৎ উপলব্ধির কথা স্বতন্ত্র। স্বামী বিবেকানন্দের 'রাজযোগ' বইখানির 'অবতরণিকা' অংশে বলা হ'য়েছে: 'ধর্ম যে কেবল

১৭। ডক্টর সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত 'তত্ত্বজিজ্ঞাসা' [১৩৫৮: দাশগুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা] গ্রন্থে 'দর্শনের স্বরূপ' প্রবন্ধ, পৃঃ ২ দ্রষ্টব্য।

১৮। 'প্রত্যক্ষের স্বরূপলক্ষণ সাক্ষাৎ প্রতীতি, ইন্দ্রিয়জন্যত্ব নহে'—ঐ, পৃঃ ৩।

১৯। ঐ পৃষ্ঠা ৩৪।

পূর্বকালীন অনুভূতির উপর স্থাপিত, তাহা নহে ;—পরন্তু স্বয়ং এই সকল অনুভূতিসম্পন্ন না হইলে কেহ ধার্মিক হইতে পারেন না। যে বিদ্যার দ্বারা এই সকল অনুভূতি হয়, তাহার নাম যোগ'।[২০] বলা বাহুল্য, অনুভূতি দেখা দিলে আর সংশয় থাকে না—সমস্ত চাঞ্চল্য দূর হয়ে যায় !

'রাজযোগে'র ভূমিকার শেষ অনুচ্ছেদে দেখা যায়: 'পাতঞ্জল দর্শন সাংখ্যমতের উপর স্থাপিত, এই দুই মতে প্রভেদ অতি সামান্য'। এই সামান্য প্রভেদের ব্যাখ্যা ক'রে সেখানে এও জানানো হ'য়েছে: 'পতঞ্জলি আদি-গুরুস্বরূপ সগুণ ঈশ্বর স্বীকার করেন, কিন্তু সাংখ্যেরা কেবল প্রায় পূর্ণতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, যাঁহার উপর সাময়িক [কোন কল্পে] জগতের শাসনভার প্রদত্ত হয়, এইরূপ অর্থাৎ অন্য-ঈশ্বর মাত্র স্বীকার করিয়া থাকেন। দ্বিতীয়তঃ যোগীরা মনকে আত্মা বা পুরুষের ন্যায় সর্বব্যাপী বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। সাংখ্যেরা তাহা করেন না।'[২১] বলা বাহুল্য, এই সূত্রে এই ধরনের আরো অনেক কথা ভাবা যেতে পারে।

মতামত আর উপলব্ধি এক নয়। দার্শনিক উপলব্ধি ব'লতে এই সব ব্যাপারই বুঝিয়ে থাকে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেও তাঁর অনেক লেখাতে এসব দিকের কথা স্মরণ ক'রেছেন। তবে, নিজের দার্শনিক মতামতের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন বুদ্ধি-বিদ্যা-বিশ্লেষণের দ্বারা শাসিত; এবং এও ঠিক যে, অলৌকিক অনুভূতি না থাক্, অলৌকিক ঘটনা তাঁর জীবনে কিছু-কিছু ঘটেছিল। এখানে সে-প্রসঙ্গেও দু' একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে।

২০। 'রাজযোগ', পৃঃ ৫, ১৩৫৬ সালের পুনর্মুদ্রণ।

২১। ঐ, পৃঃ ৪।

গীতায় বলা হয়েছে:

> নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ
> ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন॥
> যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
> যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা। গীতা, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ১৬।১৭

'অতিভোজনকারী, উপবাসশীল, অধিক জাগরণশীল, অধিক নিদ্রালু, অতিরিক্ত কর্মী, অথবা একেবারে নিষ্কর্মা—ইহ দের মধ্যে কেহই যোগী হইতে পারে না।'—(ঐ পৃঃ ২১)। রাজযোগের অষ্টাঙ্গ বলতে বোঝায় যথাক্রমে যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি। 'যম' মানে—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় অর্থাৎ অচৌর্য, ব্রহ্মচর্য এবং অপরিগ্রহ। 'নিয়ম' -এর মধ্যে এইগুলি কর্তব্য—শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় (অধ্যাত্মশাস্ত্র পাঠ) ও ঈশ্বর প্রণিধান বা ঈশ্বরে আত্মসমর্পণ। 'রাজযোগ'-এর তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হয়েছে: 'প্রাণায়ামের অর্থ প্রাণের সংযম'।

তাঁর জন্মের আগে,—জন্মকালে, এবং তাঁর জীবিতকালেও কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘ'টেছিল। শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা 'স্বর্গীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবন-চরিত' বইখানিতে সে-সব ব্যাপারের উল্লেখ আছে। ইতিপূর্বেই সে-প্রসঙ্গের উল্লেখ করা হ'য়েছে।[২২] কাঁটালপাড়ার রাধাবল্লভজীর মন্দির প্রতিষ্ঠার সঙ্গেও এক সন্ন্যাসীর যোগ ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতা যাদবচন্দ্র আঠারো বছর বয়সে উড়িষ্যার যাজপুরে অবস্থানকালে খুবই পীড়িত হন। শচীশচন্দ্র লিখে গেছেন—'বৈতরণী খেয়াঘাটের পার্শ্বে যাদবচন্দ্রের দেহ রক্ষিত হইল। চিতা সজ্জিত হইল। যাদবচন্দ্রের অগ্রজ ভ্রাতা ও বন্ধুবান্ধবেরা কাঁদিয়া আকুল। সেই ক্রন্দনরোলের মধ্যে সহসা গুরুগম্ভীর বাক্য-নির্ঘোষ শ্রুত হইল—'স্থিরো ভব'।'

সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর এক সন্ন্যাসীর। শচীশচন্দ্রের কথায়—'তিনি মুমূর্ষুকে প্রদক্ষিণ করিতে করিতে নানা ভঙ্গিতে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অচিরে যাদবচন্দ্রের চৈতন্যসঞ্চার হইল।'

তাঁরই পুত্রের—অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের জন্মকালে নাকি অলৌকিক শঙ্খধ্বনি হয়। এবং সে ধ্বনি পরিবারের অনেকেই শুনেছিলেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের শেষ-জীবনের কথা-প্রসঙ্গে 'সন্ন্যাসী' নামে পৃথক একটি অধ্যায় চিহ্নিত হ'য়েছে। সেই অধ্যায়ে শচীশচন্দ্র জানিয়েছেন যে, ১৩০০ সালের কার্তিক মাসে একদিন বিকেলে বঙ্কিমচন্দ্রের দর্শনপ্রার্থী এক সন্ন্যাসী তাঁর কলকাতার বাসবাড়িতে এসে উপস্থিত হন। দারোয়ান তাঁকে প্রবেশে বাধা দেয়। তখন সন্ন্যাসী পথের ধারে দাঁড়িয়ে থাকেন। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর দৌহিত্রদের সঙ্গে নিয়ে কলেজ স্ট্রীটে তাঁর ঘোড়ার গাড়িতে উঠতে যাচ্ছিলেন, এমন সময়ে—

> 'সন্ন্যাসী তখন উঠিলেন; কয়েক হস্ত পশ্চাতে দাঁড়াইয়া বলিলেন, 'খাড়া হো'।

বঙ্কিমচন্দ্র ফিরে দাঁড়ান। সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করেন, 'তোম্‌হারা নাম বঙ্কিমচন্দর'?

২২। বর্তমান গ্রন্থের ১০-১১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বঙ্কিমচন্দ্র সম্মতি জ্ঞাপন ক'রলে সন্ন্যাসী বলেন, 'তোম্‌হারা ওয়াস্তে ম্যাঁয় নেপালসে আতা হুঁ—লউটকে আও'।

তখন—

> 'বঙ্কিমচন্দ্র—মহাতেজস্বী বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিরুক্তি না করিয়া বালকের ন্যায় সন্ন্যাসীর আজ্ঞায় ফিরিলেন এবং সন্ন্যাসীকে সসম্মানে আমন্ত্রণ করিয়া উপরের ঘরে লইয়া গেলেন।'

সেখানে গিয়ে নাকি সন্ন্যাসী বঙ্কিমচন্দ্রকে ব'লেছিলেন :

> 'আমার গুরু নেপালে থাকেন, তিনি তোমার কাছে আমায় পাঠাইয়াছেন। তুমি ও আমি পূর্বজন্মে এক গুরুর মন্ত্র-শিষ্য ছিলাম। আমরা উভয়ে একত্র যোগ সাধনা করিয়াছিলাম। তোমার কর্মফল তোমায় সংসারে টানিয়া আনিল, আমি যোগী হইয়া আবার পূর্বজন্মের গুরুকে পাইলাম'!

এই সন্ন্যাসী বঙ্কিমকে একটি রুদ্রাক্ষ দিয়ে সেটিকে প্রত্যহ পূজা ক'রতে ব'লেছিলেন। কিন্তু শচীশচন্দ্রের কথায়—'সে রুদ্রাক্ষের পূজা করিতে বঙ্কিমচন্দ্রকে কেহ কখনও দেখে নাই'। তবে, তিনমাস পরে সেই সন্ন্যাসী আবার এসেছিলেন। সেবারে কেউ তাঁকে ঘরে ঢুকতে বাধা দেয়নি। তিনি একেবারে ওপরের বৈঠকখানায় হাজির হন। সেখানে 'বঙ্কিমচন্দ্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র উপস্থিত ছিলেন।' বঙ্কিমকে সন্ন্যাসী মৃত্যুর ভাবনা ভাবতে বলেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে সেই সন্ন্যাসীর কাছে ঘণ্টা-তিনেক বঙ্কিম 'রমণ-পাষ্টি' আলোচনা শুনেছিলেন। 'রমণ-পাষ্টি' কী ব্যাপার, তা শচীশচন্দ্র জানতেন না। তবে, দরজা খুলে বঙ্কিম যখন সেই ঘর থেকে বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁর চেহারা কী রকম হয়েছিল, সে-কথা তিনি বলে গেছেন—'তখন তাঁহার মুখমণ্ডল বিদ্যুৎভরা মেঘের ন্যায় গম্ভীর'!

এসব ঘটনা পুরোপুরি সত্য ব'লে মেনে নিতে কেউ কেউ হয়তো আপত্তি ক'রতে পারেন। অলৌকিক ঘটনার দিকে অনেকেরই আগ্রহ দেখা যায়। কথায়-কথায় কথা বেড়েও যায়! ব্যক্তিগত বা পারিবারিক ক্ষেত্রের অলৌকিকতাপ্রীতি সম্বন্ধে সতর্ক থেকে,এখানে বরং—তাঁর নিজের রচনাবলীতে সন্ন্যাসতত্ত্ব, ধর্মানুভূতি, আধ্যাত্মিকতা ইত্যাদি বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্র কী কী ব'লে

গেছেন,—সন্ন্যাসী-চরিত্র রূপায়ণে তিনি কতো যে আগ্রহী ছিলেন, সে-সব প্রসঙ্গ স্মরণ করাই সুবিবেচনা।

'বঙ্গদর্শন' প্রকাশের সূচনা থেকে—অর্থাৎ ১৮৭২ থেকে পরবর্তী কয়েক বছর তাঁর সাহিত্যিক জীবনের চিন্তাভূয়িষ্ঠ কর্মকীর্তিময় পর্ব উদ্‌যাপিত হয়। তাঁর 'চন্দ্রশেখর' সেই পর্বের রচনা। শাস্ত্রজ্ঞানে, সাহসে, ইন্দ্রিয়বিজয়ে, নির্লিপ্ততায় চন্দ্রশেখর চরিত্রটি অপূর্ব। সেই কাহিনীতেই রমানন্দ স্বামীর কথা আছে। মুঙ্গেরের মঠে থাকতেন রমানন্দস্বামী। তিনি সিদ্ধপুরুষ। 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সেই রমানন্দ স্বামী চন্দ্রশেখরকে বলেছেন—'শুন বৎস চন্দ্রশেখর! যে সকল বিদ্যা উপার্জন করিলে, সাবধানে প্রয়োগ করিও। আর কদাপি সন্তাপকে হৃদয়ে স্থান দিও না। কেননা, দুঃখ বলিয়া একটা স্বতন্ত্র পদার্থ নাই। সুখ দুঃখ তুল্য বা বিজ্ঞের কাছে একই। যদি প্রভেদ কর, তবে যাহারা পুণ্যাত্মা বা সুখী বলিয়া খ্যাত, তাহাদের চিরদুঃখী বলিতে হয়'। অতঃপর রমানন্দ স্বামী যযাতি, হরিশ্চন্দ্র, নলরাজা, রামচন্দ্র, যুধিষ্ঠির ইত্যাদির জীবন-প্রসঙ্গ আলোচনা ক'রেছিলেন। চন্দ্রশেখর সেই সন্ন্যাসীর আলোচনা শুনে মুগ্ধ হ'য়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায়—'তিনি গাত্রোত্থান করিয়া রমানন্দ স্বামীর পদরেণু গ্রহণ করিলেন। বলিলেন, 'গুরুদেব আজ হইতে আমি আপনার নিকট এ মন্ত্র গ্রহণ করিলাম।' গল্পের ধারায়, শৈবলিনীর যখন উন্মাদ অবস্থা, সেই অবস্থায়, ষষ্ঠ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রমানন্দ স্বামীর যোগবলে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীর সুস্থ চেতনা সাময়িকভাবে ফিরিয়ে এনেছিলেন। সে অধ্যায়টির শিরোনাম 'যোগবল—Psychic Force'। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে এদেশে মনোবিজ্ঞানের পাশ্চাত্ত্য আধুনিক অনুশীলনের ঢেউ অবিশ্যি ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েনি, তবে, 'যোগবল' সম্বন্ধে তাঁর নিজের অধ্যয়ন-অনুরাগ ছিল।

॥ ৯ ॥

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় মুসলমান চরিত্র, ইসলাম ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি প্রসঙ্গের কথায়-কথায় নিজের মন্তব্য প্রকাশ ক'রে ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রেজাউল করীম লিখেছিলেন:

'তিনি কোথাও ইসলাম ধর্মকে আক্রমণ করেন নাই, ইসলামের

আদর্শ, ইসলামের পয়গম্বর, ইসলামের পবিত্র গ্রন্থ কোরান, হদীস—এ সবের উপর কোথাও বিদ্রূপপূর্ণ আঁচড় কাটেন নাই। জায়েদ, রশীদ, সাদেকের মত কতকগুলি লোক, আর দু পাঁচজন বাদশা, বেগম ও শাহজাদা শাহজাদীকে কেন্দ্র করিয়া যে সব উপন্যাস তিনি লিখিয়াছেন, তাহার সহিত ইস্‌লামের অথবা মুসলমানের নিগূঢ় সম্বন্ধ কি থাকিতে পারে যে, তাঁহাদিগকে জঘন্যভাবে চিত্রিত করিলে বর্তমান যুগের মুসলমানদের রক্ত গরম হইয়া যাইবে? তাছাড়া, সে সব বাদশা-বেগমের চরিত্র সম্বন্ধে, অন্যে পরে কা কথা, মুসলমান লেখকগণও একমত নহেন। কেহ নিন্দা করেন, কেহ প্রশংসা করেন, সে ক্ষেত্রে অনুকূল মত গ্রহণ করিয়া বঙ্কিমচন্দ্র কি এমন অপরাধ করিয়াছেন……?'[২৩]

শুধু এই প্রশ্ন ক'রেই ক্ষান্ত হননি তিনি। সেখানে তাঁর পরামর্শ দেখা গেছে এই রকম:

'একটু অন্তর্দৃষ্টি লইয়া বঙ্কিম-সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, মুসলমানের পক্ষ হইতে তাঁহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের কতকগুলি কাল্পনিক, কতকগুলি বিদ্বেষপ্রসূত, আর কতকগুলি আংশিক সত্য। এই আংশিক সত্যটাকেই গোটা সত্য বলিয়া মনে করিবার কোন কারণ নাই।'

মুসলমান সমাজ যে বঙ্কিমের কাছে অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ, রেজাউল করীম তারই ব্যাখ্যাসূত্রে অতীতের বাংলা সাহিত্যে 'সহিশোনাভান' ও 'গোলেবাকাউলি' শ্রেণীর রচনায় উল্লেখ ক'রে বাংলায় বঙ্কিমের মৌলিক সৃষ্টির কথা তুলেছিলেন। বঙ্কিম যে ভারতীয় সংস্কৃতিকে খুব

২৩। শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইখানিতে 'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনা-সূত্রে লিখেছেন: 'বর্তমান ঐতিহাসিকদের সঙ্গে তুলনা করিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের উদারতাই প্রমাণিত হয়।' ঔরংজেবের প্রবর্তিত জিজিয়া, হিন্দুর মন্দির ধ্বংস—এবং হিন্দু মুসলমানের তারতম্য ঐতিহাসিক সত্য। ডঃ সেনগুপ্ত ফারুকির 'Aurangzebe and His Times'-এর ১৫২ পৃষ্ঠা উল্লেখ ক'রে ব'লেছেন যে, ঔরংজেবের সমর্থকরা বলেন বটে, যে তিনি 'Spread of Islam'-এর তুলনায় বরং 'the spread of the law of Islam' চেয়েছিলেন। কিন্তু সুবোধচন্দ্রের কথায়—'ঔরংজেবের অ-মুসললান প্রজার কাছে এই প্রভেদ খুবই অকিঞ্চিৎকর বোধ হইয়া থাকিবে।'

বড় ক'রে দেখেছিলেন এবং তাঁর তথাকথিত হিন্দুপ্রীতির আসল প্রেরণা যে তাঁর গভীর স্বদেশপ্রীতিতে আশ্রিত, তিনি সে-কথাও উল্লেখ ক'রেছেন। তাঁর নিজের কথায়:

> 'তাঁহার হিন্দুপ্রীতির গোড়ার কথা গভীর স্বদেশপ্রীতি। তিনি দেখিলেন যে পরাধীন জাতি স্বদেশপ্রীতি ব্যতীত উন্নত হইতে পারিবে না। এই কথাটি তিনি নানাভাবে উপন্যাসে, প্রবন্ধে ও রঙ্গরসের মধ্যে বুঝাইয়া গিয়াছেন। সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের পত্রে পত্রে, ছত্রে, ছত্রে, এই স্বদেশ-প্রীতির ভাবটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে। মুসলমানকে আক্রমণ করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, মুসলিম আমলের অরাজক যুগের চিত্র অঙ্কিত করিয়া বর্তমান যুগের রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান করিতে চাহিয়াছিলেন। হিন্দু নয়, মুসলমান নয়, এরূপ যে কোন পাঠক বঙ্কিমের মধ্যে এই ভাবেরই প্রাবল্য দেখিতে পাইবেন। তাঁহার নিকট মুসলিম-বিদ্বেষটা ফুটিয়া উঠিবে না। ফুটিয়া উঠিবে বঙ্কিমের স্বদেশপ্রীতির কথা।'

বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতির কথা থেকেই তাঁর জাতি-ধারণা বা জাতি-চিন্তার কথা উঠেছিল। সেই সূত্রে করীম সাহেব আরো লিখেছিলেন:

> 'বঙ্কিমচন্দ্র জাতি বলিতে যাহা বুঝিয়াছিলেন, মুসলমান তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল না। তিনি তাঁহার জাতির সংজ্ঞায় মুসলমানকেও পর্যায়ভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার বিভিন্ন প্রবন্ধে ইহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে। তিনি সাতকোটি বাঙালীকে প্রাণের দরদ দিয়া ভালবাসিয়াছিলেন, বঙ্গজননীর সপ্তকোটি সন্তানকেই তিনি স্বাধীনতার সংগ্রামে আহ্বান করিয়াছিলেন। সুতরাং বঙ্কিমচন্দ্রকে বিদ্বেষী মনে করিয়া তাঁহার প্রকৃত দানের মর্যাদা ভুলিলে চলিবে না। আমরা, মুসলমানগণ, নানাভাবে তাঁহার নিকট ঋণী।'

মৌলিক সাহিত্য রচনায় তাঁর সামর্থ্য বিশ্লেষণের চেষ্টায় বঙ্কিমের কথা-সাহিত্যের কথাই বিশেষভাবে ধরা হ'য়ে থাকে। সেকালে পূর্ণচন্দ্র বসুর লেখা 'কাব্য-সুন্দরী' বইখানিতে তাঁর উপন্যাসের নায়িকাদের কথা বলা হ'য়েছিল। কুন্দনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, শৈবলিনী, রজনী, বিমলা, আয়েষা, মনোরমা, এবং শান্তি—এই নায়িকাদের সম্বন্ধে পৃথক পৃথক অধ্যায়ে তাঁর আলোচনা এগিয়েছে। ১৩০৭ সালের ১লা আশ্বিন তারিখে লেখা 'নিবেদন' অংশে তিনি এই বইয়ের নতুন সংস্করণ প্রকাশের কারণ দেখিয়ে,—সেই সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের অনুসৃত নারীচরিত্র রূপায়ণের বিরুদ্ধে তাঁর নিজস্ব কয়েকটি যুক্তির উল্লেখ করেন। এই যুক্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি যে কিঞ্চিৎ উদ্ভট ধরনের, সে-কথা ব'ললে অত্যুক্তি হয়না। পূর্ণচন্দ্র তাঁর এই 'নিবেদন' অংশে আরো একটি কথা ব'লে গেছেন : 'কাব্য-সুন্দরী বঙ্গভাষায় প্রথম সমালোচনা-গ্রন্থ।' বলা বাহুল্য, ইতিহাসের যথাযথ বিচারে তাঁর এ-মন্তব্য কিছুতেই গ্রাহ্য হ'তে পারে না। কিন্তু সে যাই হোক্, বঙ্কিমচন্দ্রের গল্প-উপন্যাস সম্বন্ধে সে-কালের সমালোচক-মহলে বিশ্লেষণের অভাব ছিল না। তাঁর উপন্যাসগুলির এইসব নারীচরিত্র পর্যালোচনাসূত্রে পূর্ণচন্দ্র দেখিয়েছিলেন যে, পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের আদর্শে রচিত এই সব উপন্যাসে নারীচরিত্রের বিশেষ এক আদর্শই প্রচারিত হ'য়েছে,—এবং সে-আদর্শ বঙ্কিমেরই নিজস্ব মননপ্রসূত। তিনি এও ব'লে গেছেন যে, সেই আদর্শের প্রথম চিত্র 'দুর্গেশনন্দিনীর' বিমলা। 'বিমলা' চরিত্রের বিশ্লেষণসূত্রে তাঁর এই ধারণা ব্যক্ত হ'য়েছিল যে, বঙ্কিম হিন্দু সতীচরিত্রের স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতার [এই স্বাধীনতাকে পূর্ণচন্দ্র কিঞ্চিৎ তিরস্কার ক'রে 'স্বেচ্ছাচারিতা' নাম দিয়েছিলেন] সামঞ্জস্য দেখাতে চেয়েছেন। তাঁর মতে, বিমলা চরিত্রে এই স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা তো আছেই, বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য হিন্দু-সতীচরিত্রেও তা বিদ্যমান। তাঁর বিশ্লেষণে একথাও বলা হ'য়েছিল যে, পাঠানকন্যা আয়েষা ছাড়া বঙ্কিমের অন্য কোন নারীচরিত্রই পুরবাসিনী নন—'সকলেই যথাতথা বিচরণ করিয়া কার্য করিয়া বেড়াইতেছে।' এসব কথা পূর্ণচন্দ্র তাঁর 'সাহিত্য-চিন্তা'-তে উত্থাপন ক'রেছিলেন। 'কাব্যসুন্দরীর' ভূমিকায় তিনি সংক্ষেপে

এই মন্তব্য প্রকাশ ক'রে গেছেন যে, 'যে স্থলে এই সতীত্বভঙ্গ হইয়াছে, সেইখানেই অশান্তি, এবং যেখানে তাহা বজায় আছে, সেখানেই সুখ।'

'কাব্যসুন্দরীর' প্রবন্ধ-পর্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নারীচরিত্র রূপায়ণ সম্বন্ধে তিনি যা ব'লেছেন, সংক্ষেপে সেই আলোচনার মূল কথাগুলি এই ভূমিকাতেও বলা হ'য়েছে। তাঁর এই পরিকল্পনাটি তাঁর নিজের কথাতেই উল্লেখ করা যেতে পারে :

> 'এই সতীত্ব-ধর্ম ধরিয়া আমিও কাব্যসুন্দরীর প্রবন্ধাবলী পর পর সাজাইয়াছি ; আমিও প্রথমে দেখাইয়াছি, যেস্থলে এই সতীত্বভঙ্গ হইয়াছে বা ভঙ্গ হইবার উপক্রম ঘটিয়াছে, সেই স্থলেই অশান্তি। তৎপরে বঙ্কিমবাবুর সতী নারীগণের প্রেমপ্রগাঢ়তা এবং তাহাদিগের চরিত্রে সেই সতীত্বের ধর্ম ও লক্ষণ কিরূপ পরিব্যক্ত হইয়াছে, তাহা দেখাইবার জন্য পর পর এক-এক জন গৃহীত হইয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের আলোচনা এ-বইয়ের এ-অধ্যায়ের মূল বিষয় নয়। তবু এই 'আদি-কথা' অধ্যায়ে পূর্ণচন্দ্রের বিশ্লেষণ-রীতি সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন :

> 'বিষবৃক্ষে দেখিতে পাই, নগেন্দ্র আশ্রিতা কুন্দের সতীত্বভঙ্গ করিয়া তাহাকে নিজ পরিবার-মণ্ডলেই রাখিয়াছেন। পবিত্র হিন্দু গৃহপুরে এরূপ পাপমহিলার অবস্থান এবং নগেন্দ্র-কুন্দের পাপপ্রেমাভিনয়ের বিষময় ফল, এই উপন্যাসক্ষেত্রেই প্রকাশিত হইয়াছে—নগেন্দ্রের পারিবারিক শান্তিভঙ্গ হইয়াছে, এবং কুন্দও মনোবেদনায় প্রাণত্যাগিনী হইয়াছেন। এই বিষময় ফল দেখাইবার জন্যই কুন্দ-নগেন্দ্রের পাপপ্রেমের বিষবীজ নগেন্দ্রের গৃহে রোপিত হইয়াছিল। সেই পাপবীজ-সমুৎপন্ন বৃক্ষই বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ। তাই তিনি নিজেই তাহার নাম 'বিষবৃক্ষ' দিয়াছেন। বিষবৃক্ষের লোকশাসনের জন্য এরূপ গ্রন্থ প্রকাশে দোষ নাই। বিষবৃক্ষের পর কপালকুণ্ডলার প্রস্তাব কেন?'

এই প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে তিনি লিখে গেছেন :

> 'কপালকুণ্ডলার কল্পনায় কবি দুইটি বিষয় দেখাইয়াছেন। প্রথমে কপালকুণ্ডলার চরিত্রে দেখাইয়াছেন হিন্দু সংসার-আশ্রমে আশ্রিতা এবং সুশিক্ষিতা না হইলে পতিপ্রাণা হিন্দুসতী জন্মে না। পরে দেখাইয়াছেন, যিনি মতিবিবির ন্যায় সেই শান্তিময় সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়া ব্যভিচারপথে যাইবেন, তাঁহার সুখ ঐশ্বর্যে নাই,—এ জগতে নাই। সেই মতিবিবি লালায়িত হইয়া পুনরায় সংসারে প্রবেশ-লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুর পবিত্র সংসার পাপিনীকে গ্রহণ করিল না।'

'রাজসিংহে'র উপসংহারে 'গ্রন্থকারের নিবেদন' অংশে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে ব'লে গেছেন :

> 'গ্রন্থকারের বিনীত নিবেদন এই যে, কোন পাঠক না মনে করেন যে, হিন্দু মুসলমানের কোন প্রকার তারতম্য নির্দেশ করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। হিন্দু হইলেই ভাল হয় না, মুসলমান হইলেই মন্দ হয় না, অথবা হিন্দু হইলেই মন্দ হয় না, মুসলমান হইলেই ভাল হয় না। ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে। বরং ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, যখন মুসলমান এত শতাব্দী ভারতবর্ষের প্রভু ছিল, তখন রাজকীয় গুণে মুসলমান সমসাময়িক হিন্দুদিগের অপেক্ষা অবশ্য শ্রেষ্ঠ ছিল। কিন্তু ইহাও সত্য নহে যে সকল মুসলমান রাজা সকল হিন্দু রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন।'

ঔরঙ্গজেবের 'ধর্মশূন্যতা' আর রাজসিংহের 'ধার্মিকতা'র উল্লেখ ক'রে জানানো হয় : 'ঔরঙ্গজেবের উত্তম ঐতিহাসিক তুলনার স্থল স্পেনের দ্বিতীয় ফিলিপ। উভয়েই প্রকাণ্ড সাম্রাজ্যের অধিপতি ; উভয়েই ঐশ্বর্যে, সেনাবলে, গৌরবে আর সকল রাজগণের অপেক্ষা অনেক উচ্চ। উভয়েই শ্রমশীলতা, সতর্কতা প্রভৃতি রাজকীয় গুণে বিভূষিত ছিলেন। কিন্তু উভয়েই নিষ্ঠুর কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক। এজন্য উভয়েই আপন আপন সাম্রাজ্য ধ্বংসের বীজ বপন করিয়া গিয়াছিলেন।'

হিন্দু সতীর প্রসঙ্গ ধ'রে, মতিবিবির কথা-সূত্রে, পূর্ণচন্দ্র বসু আরো ব'লে গেছেন :

'সংসারাশ্রম ভিন্ন যে পতিপরায়ণতা জন্মে না,এ কথা ঠিক বটে, কিন্তু হিন্দু সংসারাশ্রম ভিন্ন হিন্দুসতী জন্মে না। হিন্দু সতীর সহিত বিলাতী সতীর বিভিন্নতা কোথায়, তাহা আমি 'সাহিত্য-চিন্তায়'য় প্রদর্শন করিয়াছি। নারীর স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা থাকিলে বিলাতী সতীত্বেরই সম্ভাবনা হয়, কিন্তু সেই স্বাতন্ত্র্য ও স্বেচ্ছাচারিতা পরিবর্জ্জিত না হইলে হিন্দু সতীত্বের সম্ভাবনা নাই। এ বিষয় বিস্তৃতরূপে 'সাহিত্যচিন্তা'য় আলোচিত হইয়াছে।'

কিন্তু উপন্যাসে লেখককে নিজের কল্পনার ওপর নির্ভর ক'রতে হয়। সেখানে জীবনের হুবহু নকল সম্ভব নয়। সে-কথা মনে ক'রিয়ে দিয়ে, তিনি লিখেছিলেন :

'বলিতে পার, বঙ্কিমচন্দ্র ত প্রকৃত জীবনের চিত্র দেন নাই, তিনি উপন্যাস লিখিয়াছেন। প্রকৃত জীবনের উপর কল্পনারাজ্য, সেই কল্পনারাজ্যের সহিত প্রকৃত জীবনের মিলনে উপন্যাস প্রস্তুত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাই প্রকৃত জীবনকে কল্পনাক্ষেত্রে আনিয়া অনেক স্বাধীনতা গ্রহণ করিয়াছেন; এরূপ স্বাধীনতা না দিলে উপন্যাস রসাল হয় না। এ কথা ঠিক! কিন্তু এ কথাও ঠিক যে, সেই প্রকৃত জীবনের সহিত যে কল্পনা সমঞ্জসীভূত হয়, এমত কল্পনাই সুসঙ্গত ও গ্রহণ করা উচিত; নহিলে কল্পনার অসঙ্গতি এবং রুচিভঙ্গ দোষ ঘটে।'

অতঃপর তিনি শৈবলিনীর কথা তুলেছিলেন :

'কপালকুণ্ডলার পর শৈবলিনীর প্রস্তাব। শৈবলিনী মতিবিবির ন্যায় প্রকৃত পক্ষে ব্যাভিচারিণী হইয়া উঠিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু তিনি সেই পথে যাইতে উদ্যতা হইয়াছিলেন। এই উদ্যোগের পরিণাম শৈবলিনী-চরিত্রে অতি পরিস্ফুটরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। শান্তিময় সংসার ছাড়িয়া যাইতে গেলেই স্বেচ্ছাচারিতার পথে সমূহ অশান্তি উপস্থিত হয়।

যে হিন্দু নারীতে পতিপরায়ণতা প্রগাঢ় প্রেমে পরিণত, সেই সতী মৃণালিনী ও ভ্রমর। কবি তাঁহাদিগের হৃদয়ের শান্তি দেখাইবার জন্য তাঁহাদিগকে বিভিন্ন অবস্থায় অবস্থাপিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রগাঢ় প্রেম অন্ধ রজনীতে আরও ঘনীভূত হইয়াছিল। তাই

আমি সেই অন্ধ রজনীর প্রেম-প্রগাঢ়তা দেখাইয়া হিন্দু সতী-হৃদয়ের পতিপরায়ণতার প্রবল আবেগ চিত্রিত করিয়াছি।'

পূর্ণচন্দ্র যে বিশেষভাবে বঙ্কিম-সাহিত্যের নারী-চরিত্র সম্বন্ধে মনোযোগ দেখিয়ে গেছেন, তার একটি কারণ এই হওয়া সম্ভব যে, বঙ্কিমের উপন্যাসে পুরুষের চেয়ে নারী-চরিত্রই বেশি জীবন্ত। বিমলচন্দ্র সিংহ সম্পাদিত 'বঙ্কিম-প্রতিভা' [১৩৪৫] বইখানিতে সংকলিত যদুনাথ সরকারের 'বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশ' প্রবন্ধে যদুনাথ সেই নারী-প্রাধান্যের কথাই ব'লে গেছেন। সে যাই হোক্, পূর্ণচন্দ্র ব'লেছিলেন :

> 'তেজস্বিনী হিন্দু সতীর সতীত্ব বিমলায় কিরূপ প্রকটিত হইয়াছে, তাহা দেখিলে, সেই সতীর কতদূর তেজ, তাহা বুঝা যায়। কিন্তু সেই বিমলার সহিত হিন্দু আদর্শের দ্রৌপদীর মত কোন তেজস্বিনী মহিলার তুলনা করিলে তবে হিন্দু ও বিলাতী আদর্শের বিভিন্নতা স্পষ্ট প্রতীত হয়। কোন্ আদর্শ চরিত্র রুচিকর, সে কথার মীমাংসা লোকের রুচির উপর নির্ভর করে। কিন্তু রুচিকে পরিশুদ্ধ এবং পরিচালিত করা সুকবির কার্য। আয়েষার প্রেম বুঝি উচ্চতর। হিন্দু সতীর প্রেম বিধাতার ব্রহ্মচর্যে পরিপূত হইয়া হিন্দু বিধবাকে দেবোপম করে। আয়েষার প্রেম তদপেক্ষাও পরিপূত। এ কথা আয়েষার প্রস্তাবে আলোচিত হইয়াছে। সে প্রেম রেবেকাতে নাই, সে প্রেম হিন্দু কল্পনাতে আছে। জগৎসিংহ হইতে সে প্রেম যদি শ্রীভগবৎ-পদে সমর্পিত হইত, তবে একদা গোপী-প্রেমে উঠিতে পারিত। মনোরমা এক ধারে কপালকুণ্ডলা, আয়েষা প্রভৃতির প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া দেখান একদা কপালকুণ্ডলা সংসারিণী হইলে কত উচ্চ হিন্দু সতী-প্রেমে গৌরবিনী হইতে পারিতেন। সর্ব শেষে শান্তি চরিত্রে হিন্দু সতীত্বের কতিপয় বিশেষ লক্ষণ প্রকাশিত হইয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-সাহিত্য সমালোচনার এই রীতি নিতান্তই প্রাচীন রীতি। অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, গিরিজাপ্রসন্ন রায়চৌধুরী প্রভৃতি লেখকেরা বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য আলোচনায় ব্যাপকতর মনোযোগ দেখিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'রাজসিংহ' সমালোচনা সেই আদিযুগের

অসাধারণ রচনা। এ-কালে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্য-প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, তাঁর উপন্যাসে আমাদের 'সনাতন রোমান্স-প্রবণতা পূর্ণ পরিণতি' লাভ ক'রেছে। তাঁর মতে,'বঙ্কিমের অব্যবহিত পরবর্তী এক বিপ্লবকারী রুচি পরিবর্তনের' যুগে ইউরোপীয় সমাজ এবং সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের নিবিড়তর সংযোগ ঘটেছিল, এবং তারই ফলে দেখা দিয়েছে নতুন আদর্শ। তিনিই ব'লেছেন—'ইতিহাসলব্ধ রোমান্স উপন্যাস-ক্ষেত্র বঙ্কিম এবং রমেশচন্দ্র ও নাটকে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রায় নিঃশেষিত করিয়া দিয়াছেন।'

তাঁর উপন্যাসে ইতিহাসের প্রভাব দেখে কেউ কেউ মনে ক'রেছেন যে, ইতিহাস পড়তে-পড়তেই তিনি উপন্যাসের দিকে আকৃষ্ট হন। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ব'লে গেছেন যে, বঙ্কিম যখন কলেজের ছাত্র, তখন ইতিহাস পড়ার দিকে তাঁর খুবই ঝোঁক ছিল। তাঁর উপন্যাসের নানা দিক নানা আলোচকের প্রবন্ধে-নিবন্ধে বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো হ'য়েছে। কিন্তু সে-সব প্রসঙ্গ এ-অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে প্রদর্শনীয় নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের নানা ঘটনা, তাঁর যুগের বিভিন্ন চিন্তা,—তাঁর সাহিত্যসৃষ্টি আর তাঁর ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ,—তাঁর দার্শনিকতার কয়েকটি প্রসঙ্গ অবলম্বন ক'রে তাঁর চিন্তার স্বাধীনতা সম্বন্ধে এখানে যে দুয়েকটি ইঙ্গিত স্মরণ করা হোলো,—সমন্বয় আর সামঞ্জস্য সম্বন্ধে তাঁর যে ব্যক্তিগত আগ্রহের কথা বলা হোলো,—তাছাড়া, নিজের ব্যক্তিগত প্রবণতার দিক থেকে যুক্তি-তর্ক আর অলৌকিক অভিজ্ঞতা, দু'দিকেই তিনি যে ঝোঁক দেখিয়ে গেছেন,—ইতিহাস-চর্চায় অনুরাগ, মুসলমান-সমাজ সম্বন্ধে তাঁর মতামত,—তাঁর উপন্যাসের আখ্যানে, চরিত্র-রূপায়ণে শিল্প-সুষমার অভিব্যক্তি আর নীতিবোধের প্রভাব ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের এই অতি দ্রুত-ভাষিত যে সূত্রগুলি এখানে পরিবেষিত হোলো,—তৎপ্রভাবে তাঁর সাহিত্য-পাঠে প্রবেশের পথ অনুকূল হোক্, এ-আলোচনার এই মাত্র অভিপ্রায়।

তাঁর সাহিত্য-ধারণার মূল কথা তিনি নিজেই নানাসূত্রে ব'লে গেছেন। সেই অজস্র কথার মধ্যে ১২৮০ সালের পৌষ সংখ্যায় 'বঙ্গদর্শনে' রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'মানস বিকাশ'-এর সমালোচনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: 'সাহিত্য দেশের অবস্থা এবং জাতীয় চরিত্রের প্রতিবিম্ব মাত্র।...

.. ভারতবর্ষ ধর্মশৃঙ্খলে এরূপ নিবদ্ধ হইয়াছিল যে, সাহিত্যরসগ্রাহিণী শক্তিও তাহার বশীভূত হইল। প্রকৃতাপ্রকৃতবোধ বিলুপ্ত হইল। সাহিত্যও ধর্মানুকারিণী হইল।' ভারতবর্ষের পুরাণ সেই 'ধর্মমোহের' ফলেই দেখা দিয়েছিল! জলবায়ুর প্রভাবে ভারতবর্ষের মানুষ দিনে দিনে তার স্বভাবের তেজ হারিয়েছে। —এবং 'অলস, নিশ্চেষ্ট, গৃহসুখপরায়ণ চরিত্রের' প্রভাবে বাংলাদেশে গীতিকাব্যের প্রগল্‌ভতা দেখা দিয়েছে!

এই বিশ্লেষণের মধ্যে ইতিহাস-দৃষ্টি এবং বিচার-বিতর্কের আগ্রহ, দুই-ই সূচিত হয়। বঙ্কিম ছিলেন সেই বিশেষ মননের মানুষ। তিনি কখনো লঘু সুরেও কথা ব'লেছেন, কখনো বা গভীর, গম্ভীর রীতিতে। তাঁর সাহিত্য-সৃষ্টিতে এই দু'রকম ভঙ্গিই সমান নৈপুণ্যের চিহ্নবাহী।

লঘু প্রবন্ধের গুরু ইঙ্গিত

লোকরহস্য,

কমলাকান্ত,

মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত।

ডি-কুইন্সি দু'জাতের লেখার কথা লিখে গেছেন—literature of knowledge এবং literature of power—জ্ঞানপ্রচারধর্মী রচনা এবং শক্তিমন্ত সাহিত্য। তাঁর নিজের কথায়:

'All that is literature seeks to communicate power, all that is not literature, to communicate knowledge.'

আবার, 'রসসাহিত্যে'র ব্যাখ্যাসূত্রে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য:

'মন নিয়ে এই জগৎটাকে কেবলি আমরা জানছি। সেই জানা দুই জাতের।
জ্ঞানে জানি বিষয়কে। এই জানায় জ্ঞাতা থাকে পিছনে আর জ্ঞেয় থাকে লক্ষ্যরূপে সামনে।
ভাবে জানি আপনাকেই, বিষয়টা থাকে উপলক্ষ্যরূপে সেই আপনার সঙ্গে মিলিত।'

এই কথার পরে আরো বিশদভাবে তিনি 'রসসাহিত্যের' স্বরূপ উদ্ঘাটন ক'রেছিলেন:

'যে প্রকাশচেষ্টার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে আপন প্রয়োজনের রূপকে নয়, বিশুদ্ধ আনন্দরূপকে ব্যক্ত করা, সেই চেষ্টারই সাহিত্যগত ফলকে আমি রসসাহিত্য নাম দিয়েছি।'

এইখানে 'আনন্দ' কথাটির মানে বুঝে নেওয়া দরকার। রবীন্দ্রনাথের নিজের উক্তি থেকেই এ-কথার ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে এবং কাব্যে 'আনন্দ' শব্দটির প্রয়োগ ঘ'টেছে বারে বারে। সাহিত্য-সম্পর্কিত আলোচনাতে একালেও এ-কথার বহুল ব্যবহার ঘ'টে থাকে। 'আনন্দ' আর 'সুখ'—দুটি শব্দ সমার্থক নয়। রবীন্দ্রনাথ ব'লে গেছেন:

'দুঃখের তীব্র উপলব্ধিও আনন্দকর, কেননা সেটা নিবিড় অস্মিতাসূচক। কেবল অনিষ্টের আশঙ্কা এসে বাধা দেয়। সে আশঙ্কা না থাকলে দুঃখকে বলতুম সুন্দর। দুঃখে আমাদের স্পষ্ট ক'রে তোলে, আপনার কাছে আপনাকে ঝাপসা থাকতে দেয় না।'

সাহিত্যতত্ত্বের নানা বইয়ে এ-বিষয়ে অনেকের অনেক মন্তব্য জ'মেছে। এখানে সে-সব কথা বাড়াবার প্রয়োজন নেই। তবে, ডি-কুইন্সির যে

মন্তব্যটি স্মরণ ক'রে এ লেখা শুরু হ'য়েছে, সে-উক্তির সঙ্গে সাহিত্যের এই আনন্দতত্ত্বের যোগ যে কোথায়, সেটুকু জেনে রাখা দরকার,—এবং, সেই সম্পর্কটি জেনে নেওয়ার পরে ধারণোপযোগী একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব। সেই সিদ্ধান্তটি কি?

সিদ্ধান্তটি এই যে, জ্ঞানের সাহিত্য এবং ভাবের সাহিত্য,—দু'জাতের রচনাই পাঠকের আত্মবোধের সহায়ক। কিন্তু যে-রচনা কেবল জ্ঞানের সামগ্রী পরিবেষণ ক'রেই ক্ষান্ত হয়, সে-রচনা আমাদের জ্ঞানপিপাসার নিবৃত্তি সাধনেই পূর্ণ চরিতার্থতা পায়। জ্ঞাতা আর জ্ঞেয়,—এই দু'পক্ষ পরস্পর ভেদ-ব্যবহিত। সুতরাং জ্ঞানের বিষয় যখন জানা যায়, তখন আমাদের খণ্ডচেতনার অখণ্ডত্বে নিমজ্জন ঘটে না। অপর পক্ষে, ভাবের সাহিত্য, তথ্য বা তত্ত্বজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে সৃষ্ট হ'লেও তার ফলশ্রুতি হ'য়ে ওঠে তথ্যের নির্দিষ্ট সীমার অতিশায়ী,—যথার্থ রসের উদ্বোধক। তার লক্ষ্য অখণ্ড আত্মব্যাপ্তির অভিমুখে। অর্থাৎ জ্ঞানের সাহিত্য সীমাভিমুখী, ভাবের সাহিত্য অসীম-অভিমুখী।

এখন প্রশ্ন এই যে, কমলাকান্তের দপ্তর তাহ'লে কোন্ শ্রেণীর সাহিত্য? তাকে অবিমিশ্র জ্ঞানের সাহিত্য বলা চলে না। কারণ, উনিশ শতকের আত্মভ্রষ্ট বাঙালীর শিক্ষাবিধায়ক ঐ দপ্তরগুলির মধ্যে নানা নীতিজ্ঞান যদিচ প্রচারিত হ'য়েছে, তথাপি, ঐ বইখানি শুধু নীতিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। নীতিজ্ঞানের অতিরিক্ত এক চিরস্থায়ী আবেদনও ওখানে আছে। সে আবেদন ভাবের আবেদন। জ্ঞান আর ভাব—এ বইয়ে এই দুটি উপাদানই বর্তমান।

'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর', 'সাম্য', 'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত'—ইত্যাদি রচনা প্রথম ভূমিষ্ঠ হয় 'বঙ্গদর্শনে'। অতএব, রচনাকালের দিক থেকে মনন-প্রকৃতির একটি অবশ্যম্ভাবী ঐক্য এই সব ক'টি লেখার মধ্যেই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' পরে পরিবর্ধিত আকারে 'কমলাকান্ত' নামে প্রকাশিত হয়। ১৮৭২ থেকে '৭৬ অবধি 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদনা পর্বের বহু-পঠনশীল, সামাজিক, শ্রমনিষ্ঠ, বিচক্ষণ বঙ্কিমচন্দ্রের আত্মপ্রকাশ ঘ'টেছিল কমলাকান্তের বিচিত্র কথায়। 'কমলাকান্ত' বইখানি এই পর্বের বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক-আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণার আধার। এই পাত্রে সামাজিক চিন্তাসূত্রে, স্বাদেশিকতার প্রসঙ্গে, ধর্ম-অর্থ-কাম-

মোক্ষ—চতুর্বর্গীয় আলোচনায়, অপূর্ব রাজসিকতায় তাঁর পূর্ণ যৌবনের তপ্ত প্রাণোচ্ছ্বাস যেন ফেনিল হয়ে উঠেছে!

ব্রজেন্দ্রনাথ আর সজনীকান্ত 'বঙ্গদর্শন'-পর্বের বঙ্কিম-সাহিত্যের শিরোনাম দিয়ে গেছেন 'যুদ্ধপর্ব'—সে-কথা আগেই বলা হ'য়েছে। তার আগে গেছে 'উদ্যোগপর্ব'। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রচার' [শ্রাবণ, ১২৯১] পত্রিকার আবির্ভাব থেকে আরম্ভ ক'রে, তাঁর শেষ-জীবনের রচনাবলী 'শান্তিপর্বে'র অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছে।

'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত', 'সাম্য' প্রভৃতি 'বঙ্গদর্শন'-পর্বের প্রবন্ধগুলি সত্যিই একরকম যুদ্ধাবহের স্মারক। এবং এ যুদ্ধ পৌরাণিক প্রথানুযায়ী নির্দিষ্ট কোনো রণাঙ্গনের গদাযুদ্ধ নয়, একালের সার্বিক রণকৌশলের বহুমুখিতার সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের মসীযুদ্ধনৈপুণ্য তুলনীয়! তিনি তাঁর রণাঙ্গনের বিস্তার ঘটাতে কুণ্ঠিত হননি, এবং বহুবিস্তীর্ণ সমরাঙ্গণে দাঁড়িয়ে নিমেষের জন্যেও রণে ভঙ্গ দেননি।

কমলাকান্তের শিল্পগুণগত বিশেষত্বের কথা ভাবতে ব'সলে ওয়েণ্ডেল উইল্‌কির On: World-এ বর্ণিত জেনারেল মণ্টোগোমারি-র একটি উক্তি মনে পড়ে। উইলকি একবার মণ্টোগোমারি-কে জিগেস ক'রেছিলেন, জার্মান সেনাপতি রমেলের কৃতিত্ব কী রকম? উত্তরে তিনি বলেন—তাঁর কেবল একটি দোষ,—তিনি তাঁর এক কৌশল বার বার দেখিয়ে থাকেন। উনিশ শতকের বঙ্গ-সংস্কৃতির নবজাগরণপর্বের সাহিত্য-নেতা বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্তে' তাঁর রণকৌশলের পুনরাবৃত্তি যথাসম্ভব পরিহার ক'রেছেন। তাঁর সেই অভিনব সাফল্যের বিষয়ে দু'কথা ব'লতে হ'লে 'লোকরহস্য' থেকেই আলোচনা আরম্ভ করা দরকার।

'লোকরহস্যে'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে; দ্বিতীয় সংস্করণ ১৮৮৮-তে। প্রথম সংস্করণের আটটি প্রবন্ধ ছাড়া দ্বিতীয় সংস্করণে নতুন আটটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয় এবং রামায়ণের সমালোচনামূলক রচনাটি মূল সংস্করণে যেভাবে ছিল, দ্বিতীয় সংস্করণে সে ভাবে না রেখে, তা' নতুন ভাবে লেখা হয়। 'বঙ্গদর্শন' এবং 'প্রচার' থেকে দ্বিতীয় সংস্করণের 'লোকরহস্য' পুনর্মুদ্রিত হয়। ১২৮০-৮২ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রথম প্রকাশিত হ'য়ে, ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে 'কমলাকান্তের দপ্তর' গ্রন্থাকারে আত্মপ্রকাশ করে। তারপর, ১২৯২ সালে 'কমলাকান্ত' নামে পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। এই পরিবর্ধিত সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' বলা হ'য়েছিল:

> 'এই গ্রন্থ কেবল কমলা[illegible] । পুনঃ সংস্করণ নহে। 'কমলাকান্তের দপ্তর' ভিন্ন ইহাতে 'কমলাকান্তের পত্র' ও 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' এই দুইখানি নূতন গ্রন্থ আছে। কমলাকান্তের দপ্তরেও দুইটি নূতন প্রবন্ধ এবার বেশী আছে।...'চন্দ্রালোকে' আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচিত; এবং 'স্ত্রীলোকের রূপ' আমার প্রিয় সুহৃৎ শ্রীমান্ বাবু রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের রচিত।...কমলাকান্তের পত্র তিনখানি মাত্র বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। তিনখানি ভাঙ্গিয়া এখন চারিখানি হইয়াছে। 'বুড়া বয়সের কথা' যদিও বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের নামযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই, তথাপি উহার মর্ম কমলাকান্তি বলিয়া উহাও 'কমলাকান্তের পত্র' মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছি। মোটে পাঁচখানি।...'কমলাকান্তের জোবানবন্দী' সমেত সর্বশুদ্ধ আটটি নূতন পুনর্মুদ্রিত করা গেল।'

'কমলাকান্তের' তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৯১-এ। এই সংস্করণে ১২৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'ঢেঁকি' প্রবন্ধটি সংযোজিত হয়।

'লোকরহস্যে' হাস্য-পরিহাসের অস্ত্রচালনার কৌশল আয়ত্ত ক'রে নিয়ে, 'কমলাকান্তে' সে-অস্ত্র বঙ্কিম যেন পূর্ণ শক্তিতে প্রয়োগ ক'রেছিলেন। 'লোকরহস্যে'র 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল' প্রবন্ধটিতে [পর পর দু'খণ্ডে সম্পূর্ণ] বর্ণিত সুন্দরবনের ব্যাঘ্রসভা ভারতবর্ষের পাণ্ডিত্যগর্বী ইংরেজ-শাসককুলের প্রতীকমাত্র। 'বৃহল্লাঙ্গুল' এই সভার প্রধান বক্তা, 'অমিতোদর' এই সভার সভাপতি, 'মহাদংষ্ট্রা' অন্যতম শ্রোতা, 'দীর্ঘনখ' এক সুশিক্ষিত তরুণ জিজ্ঞাসু! বৃহল্লাঙ্গুল সেখানে বৃহৎ সত্য ঘোষণা করেছেন:

> 'সম্ভ্রান্ত লোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা। ধূর্তের আহারান্বেষণের নাম চুরি। বলবানের আহারান্বেষণের নাম দস্যুতা, লোকবিশেষে দস্যুতা শব্দ ব্যবহার হয় না; তৎপরিবর্তে বীরত্ব বলিতে হয়। যে দস্যুর দণ্ডপ্রণেতা নাই, তাহার দস্যুতার নাম বীরত্ব। আপনারা যখন সভ্যসমাজে অধিষ্ঠিত হইবেন, তখন এই সকল নামবৈচিত্র্য স্মরণ করিবেন, নচেৎ লোক অসভ্য বলিবে।

বস্তুতঃ আমার বিবেচনায় এত বৈচিত্র্যের প্রয়োজন নাই, এক উদরপূজা নাম রাখিলে বীরত্বাদি সকলই বুঝাইতে পারে ।'

বৃহল্লাঙ্গুলের আর একটি উক্তি :

'মনুষ্যজাতি অত্যন্ত অপরিণামদর্শী। আপন আপন বধোপায় সর্বদা আপনারাই সৃজন করিয়া থাকে।...শুনিয়াছি, কখন কখন সহস্র সহস্র মনুষ্য প্রান্তরমধ্যে সমবেত হইয়া ঐ সকল অস্ত্রাদির দ্বারা পরস্পর প্রহার করিয়া বধ করে।'

বন্দী অবস্থায় বৃহল্লাঙ্গুল একবার মানুষের ব্যাঘ্রদর্শন-স্পৃহা চরিতার্থ ক'রে এসেছিলেন! সেই সুযোগে মানবসমাজ সম্বন্ধে তিনি যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন, তারই ভিত্তিতে ব'লেছেন :

'আমরা পূর্বাপর শুনিয়া আসিতেছি যে, মনুষ্যেরা ক্ষুদ্রজীব হইয়াও পর্বতাকার বিচিত্র গৃহ নির্মাণ করে। ঐরূপ পর্বতাকার গৃহে তাহারা বাস করে বটে, কিন্তু কখন তাহাদিগকে ঐরূপ গৃহ নির্মাণ করিতে আমি চক্ষে দেখি নাই। সুতরাং তাহারা যে ঐরূপ গৃহ স্বয়ং নির্মাণ করিয়া থাকে, ইহার প্রমাণাভাব। আমার বোধ হয়, তাহারা যে সকল গৃহে বাস করে, তাহা প্রকৃত পর্বত বটে, স্বভাবের সৃষ্টি ; তবে তাহা বহু গুহাবিশিষ্ট দেখিয়া বুদ্ধিজীবী মনুষ্যপশু তাহাতে আশ্রয় করিয়াছে।'

এই উক্তির পরে এক পাদটীকায় বলা হয় :

'পাঠক মহাশয় বৃহল্লাঙ্গুলের ন্যায়শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি দেখিয়া বিস্মিত হইবেন না। এইরূপ তর্কে মোক্ষমূলর স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা লিখিতে জানিতেন না। এইরূপ তর্কে জেমস্ মিল স্থির করিয়াছেন যে, প্রাচীন ভারতবর্ষীয়েরা অসভ্য জাতি এবং সংস্কৃত ভাষা অসভ্য ভাষা। বস্তুতঃ এই ব্যাঘ্র-পণ্ডিতে এবং মনুষ্য-পণ্ডিতে অধিক বৈলক্ষণ্য দেখা যায় না।'

মানবসমাজের বৈশ্য-দাসত্বের কথা-প্রসঙ্গে বৃহল্লাঙ্গুল তাঁর ভাষণের অন্যত্র ব'লে গেছেন :

'মুদ্রা মনুষ্যদিগের পূজ্য দেবতাবিশেষ,...পৃথিবীতে এমন সামগ্রীই নাই যে, এই দেবীর বরে পাওয়া যায় না। এমন দুষ্কর্মই নাই যে,

> এই দেবীর উপাসনায় সম্পন্ন হয় না। এমন দোষই নাই যে, ইঁহার অনুকম্পায় ঢাকা পড়ে না। এমন গুণই নাই যে, তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত গুণ বলিয়া মনুষ্যসমাজে প্রতিপন্ন হইতে পারে; যাহার ঘরে ইনি নাই—তাহার আবার গুণ কি? যাহার ঘরে ইনি বিরাজ করেন, তাহার আবার দোষ কি? মনুষ্যসমাজে মুদ্রামহাদেবীর অনুগৃহীত ব্যক্তিকেই ধার্মিক বলে—মুদ্রাহীনতাকেই অধর্ম বলে। মুদ্রা থাকিলেই বিদ্বান হইল। মুদ্রা যাহার নাই, তাহার বিদ্যা থাকিলেও মনুষ্যশাস্ত্রানুসারে সে মূর্খ বলিয়া গণ্য হয়।'

মানব-সমাজের—বিশেষতঃ উনিশ শতকের বাঙালী হিন্দু-সমাজের বিবাহ-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বৃহল্লাঙ্গুল প্রচলিত বিবাহ-রীতির তিনটি শ্রেণীর উল্লেখ করেন—নিত্য, নৈমিত্তিক ও মৌদ্রিক; এবং পুরোহিত-শ্রেণীর পরিচয় দিতে গিয়ে ব্যাঘ্রাচার্য আরো ব'লে গেছেন:

'বঞ্চকে যদি চাল-কলা খায়, তাহা হইলে পুরোহিত হয়।'

পাশ্চাত্ত্য পাণ্ডিত্যের উচ্ছিষ্টভোজী স্বভাবনিন্দক, তামসিক, দেশীয় বৈয়াকরণদের বানরগোষ্ঠীভূত জীব হিসেবে চিত্রিত ক'রে, সেই গোষ্ঠীর এক প্রতিভূর মুখে এই স্বীকৃতিটুকু যোগ ক'রেছেন:

> 'আমার বিবেচনায় বক্তৃতার মহদ্দোষ এই যে, বৃহল্লাঙ্গুল আপনার জ্ঞান ও বুদ্ধির দ্বারা আবিষ্কৃত অনেকগুলি নূতন কথা বলিয়াছেন। সে সকল কথা কোন গ্রন্থেই পাওয়া যায় না। যাহা পূর্বলেখক-দিগের চর্বিতচর্বণ নহে, তাহা নিতান্ত দূষ্য। আমরা বানরজাতি, চিরকাল চর্বিতচর্বণ করিয়া বানরলোকের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া আসিতেছি—ব্যাঘ্রাচার্য যে তাহা করেন নাই, ইহা মহাপাপ।'

'লোকরহস্যের' 'বাবু'-প্রবন্ধে বিচিত্রবুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী, চসমালঙ্কৃত, ...বহুভাষী, সন্দেশপ্রিয়, চিত্রবসনাবৃত, বেত্রহস্ত, রঞ্জিতকুন্তল উনিশ শতকীয় বাঙালী বাবুর দশ অবতারের একটি তালিকা আছে। এই বিশেষণগুলির প্রত্যেকটিই তাঁর নিজের ব্যবহৃত। অনেকেই সে তালিকার অন্তর্ভুক্ত হ'য়েছেন—কেরানি, মাষ্টার, ব্রাহ্ম, মুৎসুদ্দী, ডাক্তার, উকিল, হাকিম, জমিদার, সংবাদপত্র-সম্পাদক এবং নিষ্কর্মা! এই 'বাবু' সম্প্রদায়ের বিচিত্র শক্তি-সামর্থ্যের উল্লেখ ক'রে আরো জানানো হ'য়েছিল:

> 'যাঁহার বল হস্তে একগুণ মুখে দশগুণ, পৃষ্ঠে শতগুণ এবং কার্যকালে অদৃশ্য, তিনিই বাবু। যাঁহার স্নানকালে তেলে ঘৃণা, আহারকালে আপন অঙ্গুলিকে ঘৃণা, এবং কথোপকথন কালে মাতৃভাষাকে ঘৃণা, তিনিই বাবু।'

'গর্দ্দভ' প্রবন্ধে নির্বোধ বিচারক, শিক্ষক, গায়ক, সম্রাট ইত্যাদি সকল জড়ধর্মী অহংকারীর দেহে তিনি বৃহৎ গর্দভমুণ্ডের হাস্যকর, ভয়াবহ সঞ্চালন লক্ষ্য ক'রে ব'লে গেছেন :

> 'বিধাতা তোমায় তেজ দেন নাই এজন্য তুমি শান্ত ; বেগ দেন নাই, এজন্য সুধীর ; বুদ্ধি দেন নাই, এজন্য তুমি বিদ্বান এবং মোট না বহিলে খাইতে পাও না, এজন্য তুমি পরোপকারী।'

'বাবু' ব্যতীত 'হনূমদ্বাবু সংবাদ' নামে বাবু-বিষয়ক অন্য একটি প্রবন্ধ 'লোকরহস্যে'র অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ইংরেজি ভাষার প্রতি আত্মভ্রষ্ট বাঙালী বাবুর ভক্তির বাহুল্য—এবং মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা লক্ষ্য ক'রে 'বাবু' প্রবন্ধে যেমন তিরস্কার বর্ষিত হ'য়েছিল, 'হনূমদ্বাবু সংবাদে'ও ব্যঙ্গদিগ্ধ অনুরূপ তিরস্কার আছে : 'হে টুপ্যাবৃত মহাপুরুষ! মাতৃভাষায় কথা বল।'

প্রবন্ধের উপসংহারে হনুমানের বোধশক্তির দৈন্য স্মরণ ক'রে Local Self-Government-মদগর্বিত 'বাবু' যে খেদোক্তি ক'রেছেন, সে খেদোক্তি বস্তুতঃ তাঁরই আত্মদৈন্যের স্বীকৃতি! সেই উক্তির মধ্যে সুকৌশলে তিনি কিছু নাট্যরস সিঞ্চন ক'রেছেন। বাবুর সেই অভিযোগের পাত্র অন্য কেউ নয়,—বাবু নিজেই! বাবু বলেছেন : 'ছি ছি বুঝিলাম, বাঁদরে আত্মশাসন বুঝিতে পারে না।'

হনুমানকে এই কথা শুনিয়ে, অতঃপর 'বাবু' নিজে যখন আত্মপ্রসাদ-লাভে উন্মত্ত হন, পাঠকের সঙ্গে লেখকের তখন একবার স্মিতহাস্যে দৃষ্টি-বিনিময় হ'য়ে যায়! সে দৃষ্টির টীকা নিষ্প্রয়োজন। তবে, পরে এ-বিষয়ে পুনরায় কথা উঠবে।

উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য মদলালিত অর্ধশিক্ষিত বাঙালী-সমাজের নিন্দনীয় বৈশিষ্ট্যগুলির মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিল মাতৃভাষার প্রতি তাঁদের অবজ্ঞা। তার

আগে.—রবীন্দ্রনাথের প্রসিদ্ধ কবিতার কথা ধার ক'রে বলা চলে,—যিনি ছিলেন 'মাটির কাছাকাছি,' সেই নিধুবাবু যদিও ব'লেছিলেন—

নানান্ দেশের নানান্ ভাষা
বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা ?

—তবু তখনকার বাঙালী ভদ্র-সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত বাবু-গোষ্ঠী বলতেন—'Polished society-তে কি ও সব চলে ?'

'ইংরাজস্তোত্র' নামক রচনায় ইংরেজ প্রভুর শ্রীচরণে আত্মসমর্পণের ঘোষণাটি সুখপাঠ্য, এবং সেটিও একই সূত্রে স্মরণীয়।

লোকরহস্যের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর' প্রবন্ধে এই গোষ্ঠীরই এক ব্যক্তির স্ত্রীর মুখে এঁদের রুচিবিকার সম্পর্কে পরিহাস-প্রহসিত, ঘৃণাচিহ্নিত, কান্তাসম্মিত, যে উক্তিটিকে বঙ্কিমচন্দ্র চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়ে গেছেন, সেটিও এখানে তুলে দেওয়া হোলো। ইংরেজি 'Polished society'-র ধ্বনিসাদৃশ্য বজায় রেখে বাঙালী বাবুর বহু গুণবতী স্ত্রী ব'লেছেন :

> 'ছিঃ এই বুঝি তোমার পালিশ ষষ্ঠী ? তোমার পালিশ ষষ্ঠীর চেয়ে আমার চাপড়া ষষ্ঠী, শীতলা ষষ্ঠী অনেক ভাল।

এই 'বাবু'-সম্প্রদায়ের বর্ষারম্ভ হোতো—পয়লা বৈশাখে নয়,—পয়লা জানুয়ারি-তে; শুভদিনে কলসী উৎসর্গের অভিরুচি এঁরা প্রত্যাখ্যান ক'রেছিলেন; তার বদলে সবান্ধবে মদ্যমাংস পানাহারে নববর্ষের উৎসব উদ্‌যাপন ক'রে, সাহেবদের কাছে ভেট পাঠিয়ে, এঁরা কৃতার্থ বোধ ক'রতেন ! একদা রামবাবুর স্ত্রী এ-বিষয়ে কান্তাসম্মিত যৎকিঞ্চিৎ বিরোধিতা প্রকাশ করায় রামবাবু অবিলম্বে উকিলের বাড়ি গিয়ে 'হিন্দুর divorce হইতে পারে কি না, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা' করেন। এই তথ্যটি পাওয়া যায় 'লোকরহস্যের' অন্তর্ভুক্ত New Year's Day প্রবন্ধে।

দেশী হাকিমদের বিচারাধিকারে য়ুরোপীয় আসামীদের অন্তর্ভুক্তি সম্বন্ধে সে-সময়ে Ilbert Bill উপলক্ষ ক'রে দেশে যে আন্দোলন চ'লছিল, তার এক চিত্তাকর্ষক চিত্র আছে 'লোকরহস্যে'র Bransonism-প্রবন্ধে। তাছাড়া পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতের কলমে প্রাচ্য বিষয়ে গবেষণা যে কতদূর হাস্যকর অপলাপে পর্যবসিত হোতো, তার সুন্দর নমুনা আছে 'কোন স্পেশিয়ালের পত্রে'। এই গবেষকের আবিষ্কৃত তথ্যগুলির প্রত্যেকটিই সমান চমকপ্রদ,—যেমন,

তিনি ব'লেছেন, বাংলাদেশের ইংরেজি নাম Bengal থেকে অনুমান করা যায় যে, Benjamin Gall নামে কোন ইংরেজ এই দেশ আবিষ্কার ক'রেছিলেন ; বাঙালীদের মধ্যে যাঁদের চুল কুঞ্চিত তাঁরা কাফ্রী, আর, যাঁরা কিছু গৌরবর্ণ তাঁরা পূর্বোক্ত Benjamin সাহেবের বংশসম্ভূত ; ম্যাঞ্চেষ্টারের সংস্রবে আসবার আগে বাংলাদেশের জনসাধারণ ছিলেন দিগম্বর ; বাংলা-ভাষা ইংরেজি ভাষার একটি উপশাখা মাত্র ; হিন্দুরা বহু জাতিতে বিভক্ত,—যথা, ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্র, কুলীন, বংশজ, বৈষ্ণব, শাক্ত, রায়, ঘোষাল, টেগোর, মোল্লা, ফরাসী, রামায়ণ, আসাম, মহাভারত, গোয়ালপাড়া, পারিয়া ডগস্! সুকুমার রায়ের 'আবোল-তাবোল'-এর অনেক আগে উনিশ শতকের অষ্টম দশকে এ-রকম খাপছাড়া খুশির রস পরিবেষণের সিদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্রের কলমে এইভাবেই সার্থক হ'য়ে উঠেছিল! কিন্তু 'স্পেশিয়ালের' এই পত্রের শেষতম অনুচ্ছেদটির কটাক্ষ বহুকটাক্ষপটু বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির মধ্যেও বিরল দৃষ্টান্ত! তাতে তথাকথিত য়ুরোপীয় গবেষকটিকে এই মত প্রকাশ ক'রতে দেখা গেছে :

> 'হিন্দুদিগের যে চারিটি বেদ আছে—তাহার মধ্যে চাণক্য শ্লোক নামক বেদে (আমি এ সকল শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়াছি) লেখা আছে যে,—আত্মানং সততং রক্ষেৎ দারৈরপি ধনৈরপি, ইহার অর্থ এই, হে পদ্মলোচন শ্রীকৃষ্ণ। আমি আপনার উন্নতির জন্য তোমাকে এই বনফুলের মালা দিতেছি তুমি গলায় পর।'

এই অনুচ্ছেদটি প'ড়ে শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মৃদু হাস্য সহসা অট্টহাস্যে পরিণত হয়,—তারপর, সেই হাসির আলোড়ন যখন শান্ত হ'য়ে আসে, তখন, নবশক্তিসমৃদ্ধ পাঠকচিত্ত নিজের স্মৃতির মধ্যে এই ব্যাপারের সাদৃশ্য খুঁজতে চেষ্টা করে। এই গবেষণা কি Pickwick-সমিতির স্মারক? বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন উনিশ শতকের সুঅধীতি বাঙালী লেখকদেরই অন্যতম। Sir Walter Scott, Wilkie Collins, Reynolds, Boccaccio, Kriloff, Lytton, Haggard, Marryat, Hugo, Rosbart ইত্যাদি পাশ্চাত্ত্য লেখকবৃন্দের গল্প-উপন্যাসের প্রতি সাহিত্যানুরাগী বাঙালী লেখক-পাঠকের সে-যুগে অল্প-বিস্তর শ্রদ্ধা ছিল। প্রথিতযশা ডিকেন্স অবশ্যই এই নামাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। তথাপি, পূর্বোদ্ধৃত গবেষণার সাদৃশ্যক্ষেত্র

Dickens-এর Pickwick-সমিতির বিচিত্র অনুসন্ধিৎসার মধ্যে নয়। এমন পাণ্ডিত্যের তুলনা মেলে বরং সংস্কৃত নাটকের ক্ষেত্রে,—বিদূষকের অপভাষণে, প্রিয়বয়স্যের অনুশীলিত মূর্খতায়। শূদ্রক-রচিত 'মৃচ্ছকটিক' নাটকের দুর্বৃত্ত-চরিত্র 'শকারে'র পাণ্ডিত্য-বিলসন এই 'স্পেশিয়াল'-এর গবেষণার যোগ্য উপমান ব'লে মনে হয়। বসন্তসেনাকে প্রহার করবার সময়ে শকার ব'লেছিল :

চাণক্কেণ জধা শীদা মালিদাভালদে জুএ।
এব্বং দে মোড়ইশ্‌শামি জড়াউ বিঅ দোবদিং ॥[২৪]

মৃচ্ছকটিক নাটকের অনেক জায়গায় শকারের অনুরূপ আরো অনেক উক্তি আছে। শকার সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের চিরপ্রসিদ্ধ নানা 'বিদূষকে'র অন্যতম ; সে কিন্তু খাঁটি বিদূষক নয়,—স্বভাবলম্পট মূর্খ রাজশ্যালক মাত্র। লম্পট, মদ্যপ ও মূর্খের মুখে এই জাতীয় কথার প্রয়োগ বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বেও একেবারে লোপ পায়নি। অনুরূপা দেবীর 'মা' উপন্যাসের অষ্টম পরিচ্ছেদে নিশীথ-নগরীর পথচারী মদ্যপটি ব'লেছে : 'জানকীর দশা দেখে হাসে দুর্যোধন'![২৫]

লোকরহস্যের 'রামায়ণের সমালোচনা' এবং 'কোন স্পেশিয়ালের পত্র' একই পর্যায়ভুক্ত রচনা। দুটি প্রবন্ধের লক্ষ্য ছিল একই,—অর্থাৎ, ভারত-সম্পর্কিত গবেষণার ব্যাপারে পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতদের হাস্যকর দাম্ভিকতা উদ্ঘাটন করা।

'বর্ষ-সমালোচনা' কিন্তু অন্য ধরনের সমালোচনা। খবর-কাগজে, প্রতি নববর্ষ-সূচনায় সদ্য অতিক্রান্ত বছরের সালতামামি প্রকাশের যে সংস্কার অদ্যাপি বিদ্যমান আছে, সেই রীতি অনুসরণ ক'রে, 'বঙ্গদর্শনে' ১৮৭৫ সালের সাল-তামামি রচনার প্রচেষ্টায় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রবন্ধটিতে অপেক্ষাকৃত তরল

২৪। 'চাণক্য যেমন ভারতযুগে সীতাকে মারিয়াছিলেন, কিংবা জটায়ু যেমন দ্রৌপদীকে নিষ্পেষণ করিয়াছিল, সেইরূপ আমি তোকে নিষ্পেষণ করিব।'

—শ্রীহরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশ ভট্টাচার্যের অনুবাদ॥

২৫। সংস্কৃত সাহিত্যে 'শকার,' 'বিট', 'বিদূষক'—এঁরা সকলেই অল্প-বিস্তর দূষণক্ষম ব্যক্তি—অর্থাৎ পরের দোষ দেখা এঁদের স্বভাব। তবে প্রকৃত 'বিদূষক' হলেন বিজ্ঞ, বিদগ্ধ, ব্রাহ্মণ রাজানুচর,—'বিট' ধূর্ত ব্রাহ্মণ,—এবং 'শকার' হলেন মূর্খ রাজশ্যালক। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কোন স্পেশিয়ালের পত্রে' পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতম্মন্য ব্যক্তিদের বিদূষণ-বৃত্তির বর্ণনা দিতে গিয়ে 'শকার', 'বিট' ও 'বিদূষক'—এই তিন চরিত্রের দূষণস্বভাবের সাধারণ লক্ষণগুলির দ্বারা হয়তো কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হ'য়ে থাকবেন,—বর্তমান আলোচকের এই অনুমান।

হাস্যরস পরিবেষণ ক'রে গেছেন। লেখাটির উপসংহারে, পাঠককে আহ্বান ক'রে তিনি লিখেছিলেন: 'আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাস-জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস-জল।'

এর আগে যে প্রবন্ধগুলির উল্লেখ করা হ'য়েছে, সেগুলিতে যেমন তৎকালীন বিশেষ-বিশেষ সমস্যার অথবা অপব্যবহারের নিন্দনীয়ত্ব উপলক্ষ ক'রে পরিহাস শাণিত হ'য়ে উঠেছে, 'বর্ষ-সমালোচনায়' তেমন নয়। 'পঁচাত্তরেও ঘাস-জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস-জল'—বাঙালীর এই সর্বজনীন নৈরাশ্যের তথ্যটিই এই প্রবন্ধের উপজীব্য।

'লোকরহস্যের' দ্বৈভাষিক রচনাপুঞ্জের মধ্যে হনুমদ্বাবু-সংবাদ, New year's Day, Bransonism এবং বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর—এই চারটির উল্লেখ করা হ'য়েছে। পঞ্চম দ্বৈভাষিক রচনাটির নাম—The Matrimonial Penal Code (দাম্পত্য দণ্ডবিধির আইন)। এই নাম থেকেই বিষয়বস্তুর যথাযোগ্য ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এ-রচনায় একদিকে, ভারতীয় Penal Code,—অন্যদিকে, উনিশ শতকের বাঙালীর দাম্পত্য-সম্পর্ক যেন একই পাত্রে মর্দিত হ'য়েছে। Penal Code-এর চিরস্মরণীয় হাস্যকর অসারত্ব ঘোষিত হ'য়েছে 'দেবীচৌধুরাণী'তে। সে-প্রসঙ্গ অন্যত্র আলোচ্য। আপাততঃ, বাঙালীর দাম্পত্য-সম্পর্কের বিষয়ে বঙ্কিম-ভাষিত Penal Code-এর কয়েকটি সংজ্ঞা উদ্ধৃত হোলো:

> 2. A husband is a piece of moving and movable property at the absolute disposal of a woman.
>
> 3. A wife is a woman having the right of property in a husband.
>
> 4. 'The married state' is a state of penance into which men voluntarily enter for sins committed in a previous life.
>
> ২ ধারা। যে কোন স্ত্রীলোকের সম্পূর্ণ অধীন যে সচল অস্থাবর সম্পত্তি তাহাকে স্বামী বলা যায়।
>
> ৩ ধারা। যে স্বামীর উপর যে স্ত্রীলোকের সম্পত্তি বলিয়া স্বত্ব আছে, সেই স্ত্রীলোক সেই স্বামীর পত্নী বা স্ত্রী।

৪ ধারা। পূর্ব্বজন্মকৃত পাপের জন্য পুরুষদের প্রায়শ্চিত্ত বিশেষকে বিবাহ বলে।

স্ত্রীস্বত্বরক্ষিণী সভার সম্পাদিকা শ্রীমতী অনৃতসুন্দরী দাসীর স্বাক্ষরে বঙ্কিমচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে' এই আইনের খড়সা প্রকাশ ক'রেছিলেন। সম্পাদিকার কলম দিয়ে তিনি লিখিয়েছিলেন :

> 'সকলের স্বত্বরক্ষার্থ যেখানে প্রত্যহ আইনের সৃষ্টি হইতেছে, সেখানে আমাদিগের চিরন্তন স্বত্ব-রক্ষার্থ কোন আইন হয় না কেন? অতএব এই আইন সত্বরে পাশ হইবে, এই কামনায় স্বামিগণকে অবগত করাইবার জন্য আমি তাহা বঙ্গদর্শনে প্রচার করিলাম।'

উনিশ শতকে বাংলাদেশে হিন্দুর বিবাহ সম্বন্ধে নানান বিতর্ক, নানান আলোচনা ঘ'টে গেছে। লর্ড বেন্টিকের সতীদাহ দমন-আইনের আগেও এদেশে দাম্পত্য বিধিব্যবস্থার সংস্কারকামীর অভাব ছিলনা।

শতাব্দীর চতুর্থ দশক থেকে ঈশ্বর গুপ্তের রচনায়, বিদ্যাসাগরের একাধিক পুস্তিকায়, প্যারীচাঁদ মিত্রের 'গৃহকথা'-মালায়—কৌলীন্যপ্রথা, বাল্যবিবাহ, বিধবা-বিবাহ, বহু-বিবাহ ইত্যাদি প্রসঙ্গের উল্লেখ-আলোচনা ঘ'টেছে। সেসব কথার মুখ্য প্রেরণা ছিল মানবিকতাবোধ,—ইংরেজিতে যাকে বলে humanitarianism। বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না—প্রথম পুস্তক' প্রকাশিত হবার এক সপ্তাহের মধ্যে প্রথম সংস্করণের সর্বসমেত দু'হাজার বই নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল! স্ত্রীজাতির প্রতি ব্যাপক সহানুভূতি-চর্চার সেই শুভ লগ্নে বিবাহ-সম্পর্কের অর্থনৈতিক দিকটা এদেশে খুব বেশি আলোচিত হয় নি। বলা বাহুল্য, কৌলীন্য-প্রথার আলোচনায়, প্রসঙ্গত এই দিকটির কথা ওঠা সহজ ছিল। এবং সে-কথা একেবারেই যে না উঠেছিল, তাও বলা চলে না। তবে স্ত্রী-পুরুষের অর্থনৈতিক সম্পর্ক-নিয়ন্ত্রণে বিবাহের যে একটি অবশ্যম্ভাবী দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব আছে,—প্রচলিত সমাজব্যবস্থার অন্তর্গত এই ধ্রুব সত্যটির বিচারে-ব্যাখ্যানে সে-কালের মনীষীরা সাহিত্যের পাত্র পূর্ণ ক'রে তুলতে মন দেন নি। সে আলোচনা পরবর্তী যুগ-পরিবেশের প্রতীক্ষায় ছিল। Ibsen, Bernard Shaw প্রভৃতি পাশ্চাত্য লেখকদের রচনায় এবং বাংলায় রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে,' 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি গ্রন্থে এই সম্পর্ক-চেতনার অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট ছায়া প'ড়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'লোকরহস্যের' 'দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইনে' যে পরিহাস প্রচার

ক'রে গেছেন, তার মূলেও সেই উনিশ শতকীয় মধ্যবিত্ত সন্তুষ্টি এবং ক্ষীণ মানবিকতাবোধই প্রেরণা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের মানবিকতাবোধ যে ক্ষীণ ছিল, সে-রকম মন্তব্য এ-উক্তির অভিপ্রেত নয়। বিশেষত 'দাম্পত্য দণ্ডবিধি আইন' সম্বন্ধেই এখানকার 'ক্ষীণ' বিশেষণটি গ্রাহ্য। তাঁর রচনার অন্যত্র সহানুভূতির অপেক্ষাকৃত তীব্র ও ব্যাপক প্রকাশ ঘ'টেছে।

মধ্যবিত্ত সন্তুষ্টি সম্পর্কে ওপরে যে মন্তব্য করা হোলো, তার একটু ব্যাখ্যা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের আমলে, তীব্র এক আলোড়নের ফলে এদেশের জনচৈতন্য এক নবভাব লাভ করে। আজ সে তথ্য বহু-প্রচারিত, বহু-স্বীকৃত ঐতিহাসিক সূত্রে পরিণত হ'য়েছে। কিন্তু সাহিত্য, ধর্ম, সমাজ, রাজনীতি ইত্যাদি বিচিত্র প্রদেশে সেই মনোভাব সঞ্চারিত-বিস্তারিত হওয়া সত্ত্বেও বিবাহের অর্থনৈতিক দিকটি সে-যুগে একালের মতো সর্বজনীন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি। তার কারণ, অর্থচিন্তা সে যুগে আজকের মতো সর্বগ্রাসী হ'য়ে ওঠেনি।[২৬]

উনিশ শতকের বাংলা সাহিত্য ছিল প্রধানত এই 'strong and loyal middle class'-এর সৃষ্টি। ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে এঁদের loyalty যে সর্বাংশে অক্ষুণ্ণ ছিল, তা নয়; কিন্তু, আর্থিক সমস্যা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টি চর্চার জন্যে, সমাজদেহে অর্থবণ্টনধারার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটানো—আবশ্যিক পূর্বানুষ্ঠান রূপেই-যে গ্রাহ্য, সে-রকম কোনো বিশ্বাস বা উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানের ভূমিকায় উনিশ শতকের আলোচ্য পর্বের বাঙালী লেখকরা অবতীর্ণ হন নি। ফলে, পাশ্চাত্ত্য চিন্তার সংঘাতে এদেশে যে নবজাগরণ ঘটে, সে জাগরণ অংশতঃ আচারপরিবর্তক,—অংশতঃ দর্শনানুপ্রেরক,—অংশতঃ সাহিত্যস্রজক,—কিন্তু, মানবসমাজের সমষ্টিগত পারমার্থিক-প্রবণতা আর্থিক স্বাস্থ্যকে পূর্ণভাবে অগ্রাহ্য ক'রে যে কুসুমিত হ'তে পারে না,—এই সহজ বাস্তব চেতনা

২৬। রমেশচন্দ্র দত্তের এই মন্তব্য থেকে অবস্থাটি কিছু পরিমাণে অনুমিত হতে পারে:
'The rule of the East India Company terminated in 1858. The first Viceroys under the Crown were animated by a sincere desire to promote agricultural prosperity, and to widen the sources of agricultural wealth in India. Statesmen like Sir Charles Wood and Sir Stafford Northcote and rulers like Lord Canning and Lord Lawrence laboured with this object. They desired to fix the State-demand from the soil, to make the nation prosperous, to create a strong and loyal middle class, and to connect them by their own interest with British rule in India.'—The Economic History of India in the Victorian Age (Preface).

সে-যুগের সাহিত্যিক চেতনায় সার্থক হ'য়ে ওঠেনি। এক রকম আত্মবঞ্চক সন্তুষ্টির মধ্যে এঁদের দিন কেটেছে। প্যারীচাঁদ মিত্র, কালীপ্রসন্ন সিংহ, রমেশচন্দ্র দত্ত—বাংলা উপন্যাস রচনায় এঁরা প্রত্যেকেই সমাজচিত্র পরিবেষণে উদ্যোগী হ'য়েছিলেন বটে, কিন্তু সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তি ও শ্রেণীর অর্থগত নির্ভরশীলতার কথা এঁদের উপন্যাসে প্রাধান্য লাভ করেনি। বঙ্কিমচন্দ্রও এই যুগোচিত নিস্পৃহতার ব্যতিক্রম নন। বিশুদ্ধ দারিদ্র্যের চিত্র এঁরা যে না এঁকেছেন, তা নয়; কিন্তু দারিদ্র্য যে পাপ,—দারিদ্র্য যে অন্যায়,—শ্রেণী-বিশেষের অতি-ভোগাভ্যাসের স্বার্থপরতায় অপরাপর শ্রেণীর অনশন যে অবশ্যম্ভাবী,— এসব তথ্য বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে-গল্পে আশ্রয় পায়নি,—পেয়েছে তাঁর কোনো কোনো প্রবন্ধে,—যেমন 'সাম্য' এবং 'বিড়াল',—এই দুটি প্রবন্ধে। সমাজদেহের অর্থমূল অস্বাস্থ্যের চিন্তায় শরৎচন্দ্রও মূলতঃ পরাঙ্মুখ;—আর্থিক অনর্থের কথা তাঁর উপন্যাসে প্রবেশ ক'রেছে প্রসঙ্গসূত্রে অথবা কারুণ্য-রঞ্জকতাগুণে। রবীন্দ্রনাথ তো তাঁর উপন্যাসে এ-প্রদেশ পূর্ণভাবে পরিহার ক'রেছেন—তবে, 'গল্পগুচ্ছে' মানবসংসারের অর্থবশ্য উৎকর্ষ-অপকর্ষ-সম্ভাবনা তিনি লঘু-গুরু রেখাপাতে স্থলে স্থলে পরিস্ফুট ক'রেছেন। মার্ক্সীয় পর্যালোচনীতির প্রভাব বিস্তারের আগে বাংলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র অবধি ঔপন্যাসিকেরা দারিদ্র্যের কারুণ্যে মাত্র উৎসাহী ছিলেন,—দারিদ্র্যের পর্যালোচন-দায়িত্ব যে-অর্থনৈতিক চেতনার ফলে সাহিত্যে-সাধনার বরণীয় উপাদান হয়ে ওঠে, বঙ্কিম-রবীন্দ্র-শরৎ শাসিত বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে সেই বিশেষ অবস্থা প্রকট হয়নি। ১৯৩০-এর আগে এ নিয়ে বাংলাদেশের লেখকরা মাথা ঘামাবার তাগিদ বোধ করেননি। সে যাই হোক, এখন দাম্পত্য-সম্পর্ক অবলম্বনে লোকরহস্যের অন্তর্ভুক্ত আর একটি রচনার কথায় এগিয়ে যাওয়া যেতে পারে। 'বসন্ত ও বিরহ' লেখাটি তাঁর ব্যঙ্গদক্ষতার আর-এক দৃষ্টান্ত। পূর্ববর্তী রচনা 'দাম্পত্য-দণ্ডবিধির আইনের' সঙ্গে এই লেখাটির তুলনা ক'রলে প্রধান দুটি তত্ত্ব মনে পড়ে,—এক হোলো, এই দুটি রচনার বিষয়বস্তুর আংশিক সাদৃশ্য,—দুটি রচনাতেই স্ত্রী-পুরুষের পরিণয়-সম্পর্ক অবলম্বন ক'রে পরিহাস সৃষ্টি করা হ'য়েছে—এবং দ্বিতীয়ত, প্রথমটিতে Penal code-এর আইনী ভাষার অনুকরণ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে হাসিয়েছেন,—আর, দ্বিতীয়টিতে সংস্কৃত কাব্যের শৃঙ্গার-বর্ণনরীতির,—বিশেষতঃ বিপ্রলম্ভ-কথার অনুকরণে তিনি স্বামীর মুখে

অলঙ্কৃত বাক্যাবলী দিয়ে, বামীর মুখে নিরলঙ্কৃত বাস্তবের বর্ণনা আরোপ ক'রেছেন। এই দুই সখীর কাব্যালোচনার মধ্যে এসে পড়েছে শ্যামী,—সে ভাল লেখাপড়া জানে না, একটু একটু জানে মাত্র। ফলে, রামী যখন বলে, 'মলয়মারুত মৃদু মৃদু প্রবাহিত',—বামী তার জবাবে বলে, 'তদ্বাহিত ধূলায় দন্ত কিচকিচিত।' এবং বামী যখন বলে, 'কেমন চুতলতা সকল নব মুকুলিত', শ্যামী তখন জিগেস করে, 'সই আঁবের গাছই দেখিয়াছি; আঁবের লতা কোন্গুলা?'

অতীতের সাহিত্য-রিকৃথ-লব্ধ বসন্তের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার প্রত্যক্ষ বসন্তের যে বিরোধ,—কবিপ্রসিদ্ধির রমণীয়তা বাস্তব জীবনের অন্যতর আবেষ্টনীর দ্বারা যেভাবে লাঞ্ছিত,—সেই তিক্ততার উদ্‌ঘাটন লোক-রহস্যের 'বসন্ত ও বিরহ' নামক রচনায় এইভাবে সরস হ'য়ে উঠেছে। এই প্রসঙ্গে 'সুবর্ণ গোলক' নামক রচনাটিও স্মরণীয়; কারণ, সেই আখ্যায়িকার বাহনে বাস্তব জীবনের আর-এক তিক্ত অভিজ্ঞতাকে বঙ্কিমচন্দ্র সরস ক'রে তুলেছেন। স্বর্গের দেবদেবীর ক্রীড়নক—হর-পার্বতীর পাশা-খেলার বাজি—পরাজিত মহাদেব পার্বতীকে যা দিয়েছিলেন,—সেই সুবর্ণ-গোলক যখন মর্ত্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে, তখন, পার্বতী কৈলাস-পতিকে বলেন, 'আপনি ইহা সংবরণ করুন'। তার উত্তরে মহাদেব বলেন:

> 'হে শৈলসুতে! আমার গোলকের অপরাধ কি? এ কাণ্ড কি আজ নূতন পৃথিবীতে হইল? তুমি কি নিত্য দেখিতেছ না যে, বৃদ্ধ যুবা সাজিতেছে, যুবা বৃদ্ধ সাজিতেছে, প্রভু ভৃত্যের তুল্য আচরণ করিতেছে, ভৃত্য প্রভু হইয়া বসিতেছে? কবে না দেখিতেছ যে, পুরুষ স্ত্রীলোকের ন্যায় আচরণ করিতেছে? এ সকল পৃথিবীতে নিত্য ঘটে, কিন্তু তাহা যে কি প্রকার হাস্যজনক তাহা কেহ দেখিয়াও দেখে না। আমি তাহা একবার সকলের প্রত্যক্ষীভূত করাইলাম।'

'লোকরহস্য' নামটি সার্থক। এর প্রতিপাদ্য বিষয়, শুধু বাঙালীরহস্য বা ইংরেজরহস্য নয়। বৃহৎ মানবসমাজ কোনো সংকীর্ণ ভৌগোলিক পরিসীমায় আবদ্ধ নয়। 'লোকরহস্য' নামটিতে—ব্যাপকভাবে সারা দুনিয়ার মানবপ্রকৃতির রহস্যের দিকটিই সূচিত হ'য়েছে। হাস্যপরিহাসের সুরে এই রহস্যকথার যতটুকু বলা যায়, বঙ্কিমচন্দ্র ততটুকুই ব'লেছেন। এবং প্রধানতঃ

বাঙালী চরিত্রের রহস্যই এতে স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। 'সুবর্ণ-গোলক' থেকে যে-অংশটুকু তুলে দেওয়া হ'য়েছে, তাতে, 'লোকরহস্যে'র এই সর্বজন-লক্ষ্যতার সমর্থন আছে। 'কমলাকান্তের দপ্তরে'ও হাস্য-পরিহাসের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অনুরূপ দায়িত্ব পালন ক'রেছেন। পরে, 'বিবিধ প্রবন্ধে' তাঁর সুর গম্ভীর হয়েছে।

এখন, 'লোকরহস্য' প'ড়তে-প'ড়তে বাংলা সাহিত্যের ধারায় এই ঠাট্টার সুরের ক্রমায়াত যে প্রবাহটি মনে পড়া স্বাভাবিক, সে বিষয়ে দু'একটি কথা বলা দরকার। 'বঙ্গদর্শনে'র,—অথবা, সে-যুগের অন্যান্য লেখকদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ, রামদাস সেন, পূর্ণচন্দ্র বসু, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, অক্ষয়চন্দ্র সরকার প্রভৃতি অনেকের নাম প্রবন্ধরচয়িতা হিসেবে খ্যাতিমণ্ডিত হ'য়েছে বটে, তবে, 'লোকরহস্যে'র সঙ্গে পাশাপাশি তুলনা চ'লতে পারে রাজকৃষ্ণ ও অক্ষয়চন্দ্রের কোনো কোনো লেখার।

আমাদের এ যুগের অধ্যাপকদের লেখা একাধিক বইয়ে লোকরহস্য-জাতীয় রচনার প্রসঙ্গে 'রস-রচনা' কথাটি ব্যবহৃত হ'তে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথ 'রস-সাহিত্য' কথাটির যে অর্থ ঘোষণা ক'রেছেন, সে তো এ অধ্যায়ের শুরুতেই বলা হ'য়েছে। 'রসরচনা' শব্দটির অর্থ সম্বন্ধে, অথবা আমাদের উদ্দিষ্ট অর্থবোধে ঐ শব্দের প্রয়োগ-যৌক্তিকতা সম্বন্ধে আলোচনা মুলতবী রেখে, 'লোকরহস্যে' স্বাদটি যে বিশিষ্ট, তার অনুরূপ স্বাদ বঙ্গদর্শনের লেখকদের বিচিত্র রচনার মধ্যেও যে বিরল, সে-সিদ্ধান্ত মানতে আপত্তি নেই। বঙ্কিম-পরবর্তী লেখকদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের প্রবন্ধের কোনো কোনো অংশে পরিহাস ফুটেছে বটে,—কোনো কোনো জায়গায় পরিহাস-অতিরেকও ঘ'টেছে —কিন্তু, 'লোকরহস্যের' প্রকৃতির সঙ্গে সে-সব রচনার দূর সাদৃশ্যও কষ্টকল্প্য। অন্যান্য গম্ভীর লেখকদের মধ্যে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় কিছু হালকা প্রবন্ধ লিখেছেন,—তবে সেসব লেখাও লোকরহস্য-জাতীয় নয়। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় বঙ্কিমী পরিহাসে অপেক্ষাকৃত সিদ্ধি লাভ ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রযুগে ব্রহ্মবান্ধব ছাড়া আর যে-দুজন এই জাতীয় রচনায় সিদ্ধিলাভ ক'রেছিলেন, তাঁদের একজনের লেখায় নাগরিক বাক্‌চাতুর্য যেমন স্পষ্ট, অন্যজনের রচনায় অর্ধ-নাগরিক পরিহাসনৈপুণ্য তেমনি সহজদৃশ্য। প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনাপ্রকৃতি ভিন্নমুখী,—তথাপি এঁদের লেখার স্বাদে অনস্বীকার্য্য এক সাদৃশ্যও বর্তমান। সে সাদৃশ্যের উৎস খুঁজে দেখলে 'লোক-রহস্যে' পৌঁছোনো অবশ্যম্ভাবী।

প্রমথ চৌধুরী তাঁর 'আত্মকথায়' নিজের বাক্‌চাতুর্যসিদ্ধি স্মরণ ক'রে সেই নৈপুণ্যের নাম দিয়ে গেছেন—'কৃষ্ণনাগরিকতা'। ইন্দ্রনাথের 'পঞ্চানন্দের' প্রেরণা দিয়েছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার। পঞ্চানন্দের 'আত্মচরিতে'র অবতরণিকা অংশটুকু যাঁরা প'ড়েছেন, তাঁদের কাছে পঞ্চানন্দের ওপর বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাব সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা বাহুল্য মনে হবে। প্রমথ চৌধুরী এবং ইন্দ্রনাথ উভয়েই ছিলেন পরিহাসদক্ষ লেখক,—বাক্‌চাতুর্য এঁদের দুজনেরই অল্পবিস্তর অধিকারভুক্ত। ভারতচন্দ্রের প্রভাব ছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবেও যে এঁরা দু'জনেই অল্পবিস্তর লালিত হ'য়েছিলেন, সে-কথা মনে করাও অসংগত নয়।

ভীষ্মদেব খোশনবীশ কমলাকান্তের সঙ্গে তাঁর পাঠকদের পরিচয় ঘ'টিয়ে দিতে গিয়ে যা বলেছিলেন, সেই কথাগুলিই প্রথমে স্মরণ করা যেতে পারে :

> অনেকে কমলাকান্তকে পাগল বলিত।···লেখাপড়া না জানিত এমন নহে। কিছু ইংরেজি, কিছু সংস্কৃত জানিত। কমলাকান্তের একবার চাকরি হইয়াছিল একজন সাহেব তাহার ইংরেজি কথা শুনিয়া ডাকিয়া লইয়া গিয়া একটি কেরাণীগিরি দিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত চাকরি রাখিতে পারিল না। আপিসে গিয়া, আপিসের কাজ করিত না।···একবার সাহেব তাহাকে মাসকাবারে পে-বিল প্রস্তুত করিতে বলিয়াছেন। কমলাকান্ত বিল-বহি লইয়া একটি চিত্র আঁকিল যে, কতকগুলি নাগা ফকির সাহেবের কাছে ভিক্ষা চাহিতেছে। সাহেব নূতনতর পে-বিল দেখিয়া কমলাকান্তকে মানে মানে বিদায় দিলেন। কমলাকান্তের চাকরি সেই পর্য্যন্ত। অর্থেরও বড় প্রয়োজন ছিল না। কমলাকান্ত কখনও দার পরিগ্রহ করেন নাই। স্বয়ং যেখানে হয়, দুইটি অন্ন এবং আধভরি আফিম পাইলেই হইত। যেখানে সেখানে পড়িয়া থাকিত। অনেকদিন আমার বাড়িতে ছিল। আমি তাহাকে পাগল বলিয়া যত্ন করিতাম। কিন্তু আমিও তাহাকে রাখিতে পারিলাম না। সে কোথাও স্থায়ী হইত না। একদিন প্রাতে

উঠিয়া ব্রহ্মচারীর মত গেরুয়া বস্ত্র পরিয়া কোথায় চলিয়া *গেল।...সে এ পর্যন্ত আর ফিরে নাই।'*

'কমলাকান্তে' অনুসৃত আঙ্গিক বা ভঙ্গির দৃষ্টান্ত ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র অধ্যাপক, পণ্ডিত এবং উৎসাহী, অনুরাগী ও অনুসন্ধিৎসু গবেষকের চোখে হয়তো আরো বেশি সংখ্যায় ধরা পড়তে পারে।[২৭] সেই আঙ্গিকগত সাদৃশ্যের অনুসন্ধান-প্রসঙ্গে পণ্ডিতরা বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে Addison, Steele, Leigh Hunt প্রভৃতি লেখকদেরও নাম ক'রেছেন। Addison ও Steele বিদ্রূপ-সমন্বিত সমালোচনায় দক্ষ ছিলেন। Leigh Hunt-এর 'The Cat by the Fire' প্রবন্ধটি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' প্রবন্ধের হুবহু প্রতিধ্বনি ব'ললে অত্যুক্তি হয়না। বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্তের দপ্তরে', বক্তব্য বিষয় আর বর্ণন-ভঙ্গির বিশ্লেষণে পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের বহু রচনার সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া সম্ভব। তথাপি 'কমলাকান্তের দপ্তর' প্রধানতঃ এই সব প্রভাবের দৃষ্টান্ত ব'লেই যে স্মরণীয়, তা নয়। 'কমলাকান্ত' বাংলা সাহিত্যের চিরস্মরণীয়, চিরজীবী, চিরশক্তিমান, একটি চরিত্র,—কালসীমাতিশায়ী একটি ভাব বা 'idea,'—বর্তমান কালের লেখক-পাঠক-শ্রোতা নির্বিশেষে কমলাকান্তকে একটি সিদ্ধ-রসাশ্রয় ও ভাবসত্য হিসেবে গ্রহণ ক'রে থাকেন। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেন-গুপ্তের মন্তব্যটি স্মর্তব্য; তিনি ব'লেছিলেন,: 'কমলাকান্ত একটি শ্রেষ্ঠ কমিক চরিত্র; সেই দিক দিয়া বিচার করিলে কমলাকান্ত অনন্যসাধারণ'।[২৮] এ মন্তব্য যে ব্যক্তিবিশেষের স্বকপোলকল্পিত নয়,—একাধিক সুধী ব্যক্তি যে এই ধারণা পোষণ করেন,—তার নজির পাওয়া যায় হাল আমলের একখানি বইয়ের স্তুতিমালায়। ১৩৩৪-এ চারুচন্দ্র রায় এম. এ. মহাশয় নিজের নাম গোপন রেখে, 'কমলাকান্তের পত্র' নামে যে-বইখানি প্রকাশ ক'রেছিলেন,

২৭। শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন লিখেছিলেন,'...as far as mere form goes *Kamalakanter Daptar* owes much to De Quincey's Confessions of an Opium Eater and *Bhishmadev Khoshnabish* seems to be modelled on Scott's Jedediah Cleishbotham, while the idea of the book (Daptar) having been left by its old author to somebody else through whom it was published is also taken from Scott's plan in the Tales of my Landlord. In addition, there is the element of irrepressible Sam Weller of Dickens in the make-up of *Kamalakanta* when standing on his trial in the court.'—Western Influence in Bengali Literature—P. R. Sen, chap. vii.

২৮। 'বঙ্কিমচন্দ্র' : সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত।

তারই প্রশংসাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত সম্বন্ধে নিচের মন্তব্যগুলি পাওয়া গেছে :

'অহিফেনামৃত পান করিয়া কমলাকান্ত ঠাকুর বাংলা সাহিত্যে অমর হইয়া আছেন।'...
—মানসী ও মর্মবাণী আষাঢ়, ১৩৩৩

*

'কমলাকান্ত মানুষ নহে—ভাব, আমাদের জাতীয় ভাব। জাতির চিন্তার খাঁটি দুগ্ধে তাহার পুষ্টি। সে এই সুজলা সুফলা মলয়জশীতলা জননী জন্মভূমির বুকের ধন। বাঙ্গালা ভাষা অবলম্বন করিয়া সে আত্মবিকাশ করে। তাহার আত্মবিকাশের সন্ধান পাইয়াছিলেন—বঙ্কিমচন্দ্র। তখন বঙ্কিম-মণ্ডলের অন্যান্য সাহিত্যিককেও সেই ভাবের ভাবুক হইতে দেখা গিয়াছিল—যথা অক্ষয়চন্দ্র ও রাজকৃষ্ণ। সে সব ভাবের অভিব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র দপ্তরে বাঁধিয়াছিলেন, কিন্তু এই যে কমলাকান্ত ভাব ইহা সকলকে ধরা দেয় নাই। তাই সাহিত্য-চন্দ্র-চকোর চন্দ্রশেখরের চেষ্টাও 'মসলাবাঁধা কাগজে' পরিণত হইয়াছিল।'...
—দৈনিক বসুমতী, ১০ই মাঘ, ১৩৩১

*

'বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত যদি একটি মানুষ হোতো তো এতকাল ধরে সে বেঁচে থাকতেই পারতো না—কিন্তু সে নাকি একটা ধূমকেতুর মতো, তাই থেকে থেকে আসে এবং চলে যায় পৃথিবীর গায়ে আলোর ঝাঁটা বুলিয়ে দিয়ে। বঙ্কিমের যুগে এই ঝাঁটা একবার দেশের উপরে পড়েছিল।...
—শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ;—ভারতী, ফাল্গুন, ১৩৩০।

এ রকম মন্তব্য সংখ্যায় এক-আধটি মাত্র নয়, অগণ্য! কিন্তু উদ্ধৃতির বাহুল্যে বর্তমান বইয়ের কলেবর বাড়িয়ে লাভ নেই। ওপরের স্বীকৃতিগুলির সূত্রে 'কমলাকান্ত' সম্পর্কে আজ থেকে বছর চল্লিশেক আগেকার বাঙালী পাঠকের অভিমত জানা গেল। এঁদের এইসব কথা থেকে ন্যূনপক্ষে, কমলাকান্তের এই ক'টি গুণের উল্লেখও পাওয়া গেল—প্রথমতঃ কমলাকান্ত অমর,—দ্বিতীয়তঃ খাঁটি বাঙালী,—তৃতীয়ত তিনি ধূমকেতুসদৃশ,—অর্থাৎ, বাঙালীর মনোগগনে কমলাকান্ত হলেন নিত্যস্থায়ী, কিন্তু বিরলপ্রকাশ,—যখন আসেন, তখন, তাঁর ভয়াবহ আলোর ঝাঁটায় মনের এবং অভ্যাসের গ্লানি ঝেঁটিয়ে দিয়ে যান।

সুধীজনের মন্তব্য শ্রদ্ধার্হ। অবনীন্দ্রনাথ কমলাকান্তকে ব'লে গেছেন, ধূমকেতু। তবে, এই ধূমকেতু বাংলার আকাশে একটিবার মাত্র দেখা দিয়েই মহাপ্রস্থান ক'রেছেন। অর্থাৎ, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কমলাকান্ত' ছিলেন অদ্বিতীয় চরিত্র—বঙ্কিম-প্রতিভার বিশিষ্ট আহ্বানেই তিনি সাড়া দিয়েছিলেন,—তারপর, আর আসেন নি! শ্রীযুত চারুচন্দ্র রায়, এম. এ.-প্রকাশিত 'কমলাকান্তের পত্রে'ও তাঁর খাঁটি স্বাক্ষরটি পড়েনি। বঙ্গসাহিত্যে সেই ধূমকেতুর পুনরাবাহনের চেষ্টা ঘ'টেছে মাঝে মাঝে। অর্থাৎ কমলাকান্তের অনুকরণ অনেকে ক'রেছেন। 'বঙ্গদর্শনে' শ্রীশঙ্করাচার্য বঙ্গদেশীর রচনায়, চন্দ্রশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'জটাধারীর রোজনামচায়,' অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'মহাপূজা,' রূপক ও রহস্য' প্রভৃতি গ্রন্থে,—এবং একালে, বনফুল, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতির্ময় ঘোষ (ভাস্কর) প্রভৃতি সাহিত্যিকদের কলমে কমলাকান্তের ভর হ'য়েছে বৈ কি! তবে, মূল কমলাকান্ত একজনই—তিনি আদি এবং অকৃত্রিম,—তাঁর স্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র! একালে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যাঁরা কমলাকান্তের ভর পেয়ে কলম ধ'রেছেন, তাঁদের অনেক লেখার মধ্যে চারুচন্দ্র রায়ের 'ভদ্রলোক', Democracy না ধামা-cracy,' 'বহুবচন' প্রভৃতি রচনা,—জ্যোতির্ময় ঘোষের 'চ্যী'-র মতো গল্প, রাজশেখর বসুর 'নামতত্ত্ব', 'তিথি' প্রভৃতি প্রবন্ধ একই অনুষঙ্গে মনে পড়া স্বাভাবিক।

বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে লিখতে ব'সে এই আলোচনার সূচনায় ডি-কুইন্সি-কথিত সাহিত্যের দুই পৃথক শ্রেণীর উল্লেখ করা হ'য়েছে। প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি থেকে 'রসসাহিত্য' শব্দটির অর্থোল্লেখও ঘ'টেছে। এখন, এই সূত্রে নবেন্দু বসুর একটি উক্তি স্মরণ করা যাক। নবেন্দু বাবুর কথায়—'সাহিত্যিকতার দিক থেকে সাহিত্যকে মোটামুটি দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—প্রথম তথ্য-সাহিত্য; দ্বিতীয় রসসাহিত্য; তথ্যসাহিত্য তাই-ই—যার উদ্দেশ্য কোন বস্তু-জগতের কোন সংবাদ বহন করা।···রসসাহিত্যের বিষয় যাই হোক্ না কেন, তার মূল উদ্দেশ্য সংবাদ দেওয়া নয়। রসসাহিত্যের মূল লক্ষণ আর মাপকাঠি হোলো আবেগের অনুভূতি থেকে আনন্দ বোধ করা বা চিত্তের বিনোদন হওয়া। রসসাহিত্যেও তথ্যের বিষয়বস্তু থাকে, আর তার সম্পর্কে কতকগুলো ধারণা ব্যক্ত ক'রেই, গদ্যে হোক বা কাব্যে হোক, সে সাহিত্যের রচনা হয়ে থাকে।'[২৯]

২৯। রসসাহিত্যঃ নবেন্দু বসু, পৃঃ ৩-৪

'লোকরহস্য' এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর'—এই উভয় ক্ষেত্রেই তথ্যের বহুলতা আছে বটে,—তৎসত্ত্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তথ্যবস্তু যে রসোত্তীর্ণ হয়ে উঠেছে, তাতে সন্দেহ করা চলে না। লেখক সংবাদ দিতে ব'সে আনন্দ পরিবেষণ ক'রেছেন। এখন প্রশ্ন এই যে, এরকম সাহিত্যকে কোন্ শ্রেণীতে জায়গা দেওয়া যাবে? ডি-কুইন্সির দুটি বিভাগেরই আমন্ত্রণে এই রচনাগুলি যুগপৎ সাড়া দিতে পারে; কারণ, 'লোকরহস্য' এবং 'কমলাকান্ত' —দু'য়েতেই দেখা যায় তথ্য এবং রসের হরগৌরী অভিব্যক্তি। ব্যাপারটি বুঝে দেখতে হ'লে আরো একটু বাগ্‌বিস্তার আবশ্যক। বিশুদ্ধ 'রসসাহিত্য' এবং অবিমিশ্র 'তথ্যসাহিত্যে'র দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যাবে কি? নবেন্দু বসুর আবিষ্কৃত 'তথ্যসাহিত্য' নামটিতে মন খুঁৎখুঁৎ করা স্বাভাবিক। কারণ, তথ্য যখন সাহিত্যে রূপান্তরিত হয়, তখন, সেই রূপায়ণই তো রসায়নের নামান্তর। তথ্য যখন রসাত্মক বাক্যে আত্মপ্রকাশ করে, তখনই তা 'সাহিত্য' পদবাচ্য হয়।

আবার, রবীন্দ্রনাথের পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্য সত্ত্বেও 'রসসাহিত্য' কথাটিও কি একরকম বাগ্‌বাহুল্যের দৃষ্টান্ত নয়? 'সাহিত্যরস' কথাটি যেমন স্পষ্ট একরকম ভাববাহী, 'রসসাহিত্য' কথাটা তেমন নয়। আমরা সাহিত্যের রস অনুভব করি, —কিন্তু, রসের সাহিত্য কোন্ বস্তু? 'রসসাহিত্য' পদটি তৎপুরুষ সমাসেও অনর্থসূচক, কর্মধারয়েও অচল। রবীন্দ্রনাথ ও-কথার যে-অর্থ ঘোষণা ক'রেছিলেন, তাতে ব্যাপারটি আর দুর্বোধ্য থাকেনি,—বোঝা গেছে যে, ওখানে তথ্যপরিমাণের একটি আপেক্ষিকত্ব নিহিত। যে সাহিত্যে তথ্যের প্রাধান্য, নবেন্দু বসু তাকেই ব'লেছেন 'তথ্যসাহিত্য,'—আর, যে-সাহিত্যে বস্তুবিষয়ে জ্ঞানলাভের চেয়ে আত্মবিষয়ে উপলব্ধির সম্ভাবনা বেশি থাকে, রবীন্দ্রনাথ তাকেই ব'লেছেন 'রসসাহিত্য'। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' অথবা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পাষাণের কথা' যদি হয় 'তথ্যসাহিত্যে'র নিদর্শন, রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম'-কে তাহলে অবশ্যই বলা যাবে 'রসসাহিত্যে'র দৃষ্টান্ত। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা এই তিনখানি বইয়েরই প্রেরণা জুগিয়েছে,—অবিমিশ্র তথ্যের অবরোধে এই তিন লেখকের মধ্যে একজনও বাঁধা থাকেননি,—ভিন্ন ভিন্ন তথ্যপ্রসঙ্গ উপলক্ষ ক'রে, শিল্পিমনের অস্মিতাবোধে এঁরা সকলেই উত্তরণনিষ্ঠ। এবং, এই উত্তরণসাফল্যে রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব অপরিমেয়,—রাখালদাসের অসামান্য,—

রামেন্দ্রসুন্দরের স্বল্পমিত। 'কমলাকান্তের দপ্তর' রসোত্তীর্ণ রচনা বটে, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যাকে 'রসসাহিত্য' ব'লেছেন, 'কমলাকান্ত' সে-পর্যায়ে স্থান পায় না; বরং, শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের দেওয়া নামটিই এ-ক্ষেত্রে বেশ লাগসই মনে হয়। তিনি এ-বইখানিকে বলেছেন 'রসসন্দর্ভ' এবং এই সংজ্ঞা অনুসরণ ক'রে আরো বিশদ ভাবে লিখেছেন:

> 'কমলাকান্তের দপ্তর একটি তান-লয় শুদ্ধ সঙ্গীতের মত আমাদের রসবোধকে পরিপূর্ণ তৃপ্তিদান করে।" ৩০

'কমলাকান্তের দপ্তর' নানা তথ্যের স্মারক; বিভিন্ন আধিভৌতিক প্রসঙ্গে এ রচনা অভিনিবিষ্ট। কয়েকটি দপ্তরের আলোচনা লক্ষ্য ক'রলেই এ-বিষয়ে সন্দেহ দূর হবে।

প্রথম দপ্তরের নাম, 'একা'—কমলাকান্ত সেখানে বলেছেন, 'মনুষ্যজাতির উপর যদি আমার প্রীতি থাকে, তবে আমি অন্য সুখ চাই না।' দ্বিতীয় দপ্তর 'মনুষ্য-ফল,'—সেখানে বলা হ'য়েছে, 'মনুষ্যসকল ফলবিশেষ,'—বিত্তশালী সমাজবরণ্যে ব্যক্তিরা 'কাঁঠাল',—সিবিলিয়ান সাহেবরা 'আম',—স্ত্রীলোকেরা 'নারিকেল',—ভণ্ড দেশহিতৈষীরা 'শিমূল',—অধ্যাপক ব্রাহ্মণেরা 'ধুতুরা',—বাঙালী লেখকবৃন্দ 'তেঁতুল' এবং দেশী হাকিমেরা 'পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড'। দশম দপ্তর 'বড়বাজার'-এ বলা হয়েছে: 'এই বিশ্বসংসার একটি বৃহৎ বাজার—সকলেই সেখানে আপন আপন দোকান সাজাইয়া বসিয়া আছে। সকলেরই উদ্দেশ্য মূল্যপ্রাপ্তি।' ত্রয়োদশ সংখ্যক দপ্তরে 'বিড়াল' প্রসঙ্গে বিতর্কের প্রধান বিষয় এই: 'অধর্ম চোরের নহে—চোর যে চুরি করে, সে অধর্ম কৃপণ ধনীর। চোর দোষী বটে, কিন্তু কৃপণ ধনী তদপেক্ষা শতগুণে দোষী। চোরের দণ্ড হয়, চুরির মূল যে কৃপণ, তাহার দণ্ড হয় না কেন?'

এইভাবে প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র তথ্যকথা উপলক্ষ ক'রে 'কমলাকান্তের দপ্তরে' মানবসমাজের স্থায়ী-অস্থায়ী, প্রাদেশিক এবং সার্বিক বিভিন্ন সমস্যা-সংশয়ের আলোচনা ঘ'টেছে। 'লোকরহস্যে'ও যে তাই হ'য়েছে,—সে তো ইতিপূর্বেই দেখা গেছে।

এই কারণেই কেউ কেউ ব'লতে বাধ্য হ'য়েছেন যে, 'লোকরহস্য' সাংবাদিকতার ছোটো গণ্ডি কাটিয়ে উঠতে পারেনি, এবং 'কমলাকান্তের

৩০। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'

দপ্তর'ও নাকি অনেকাংশে সেই পক্ষন্তরাসীন রচনা। এ-অভিযোগের বিচার তর্ক-বুদ্ধির রাজদ্বারে সম্ভব হবে না। কারণ, বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে উপাদানাবলীর তালিকা তৈরি করা চলে বটে,—তার অতিরিক্ত দাবি তর্কবুদ্ধিতে মেটানো সম্ভব নয়। রসোপলব্ধির ক্ষমতা অন্য এক শক্তি। 'কমলাকান্তের দপ্তরে' এবং 'লোকরহস্যে' ব্যবহারিক জীবনের, প্রাত্যহিক আচার-ব্যবহারের অনেক কথা বলা হ'য়েছে ঠিকই,—কিন্তু, অবিমিশ্র তথ্যসর্বস্বতা তো এই দুই গ্রন্থের ফলশ্রুতি নয়। অষ্টম দপ্তর 'স্ত্রীলোকের রূপ' অথবা একাদশ দপ্তর 'আমার দুর্গোৎসব' পড়বার সময়ে পাঠকের রসপিপাসা কি অতৃপ্ত থাকে?

'লোকরহস্য,' 'কমলাকান্ত' এবং 'মুচিরামগুড়ের জীবন চরিত'—এই তিনটি কৌতুকরসাশ্রিত, তথ্যবহুল, বুদ্ধিদীপ্ত এবং গ্রাম্যতাবর্জিত রচনায় শ্রেয়স্কাম, শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রেরই স্বাক্ষর প'ড়েছে। সমস্ত বাঙালী জাতের,—অথবা আরো ব্যাপক ভাবে বলা যায় যে, সারা ভারতের নানা বেদনার কথা এই সব লেখায় হাসির রসে জরিয়ে উঠেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের দীপ্ত চোখ এবং চাপা ঠোঁটের ব্যক্তিত্বময়তা এই সব রচনার ছত্রে ছত্রে বিদ্যমান। ব্যক্তিগত বিদ্বেষবর্জিত, জ্বালাহীন ব্যঙ্গরসে উনিশ শতকের ভারতবর্ষের রাজনীতি-সমাজনীতি-ধর্মনীতি-সাহিত্যপ্রীতি ইত্যাদি যাবতীয় মানসকৃত্যের আপাতলঘু, ফলতগভীর পর্যালোচনা ক'রে গেছেন তিনি। আঙ্গিকের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র De Quincey-র কাছে কী পরিমাণ ঋণী ছিলেন, অথবা Leigh Hunt-এর কাছে তিনি কতোদূর প্রেরণা পেয়েছিলেন,—সে-আলোচনা রসোপভোগের পক্ষে অবান্তর। তাঁর সমস্ত রচনার [তাঁর 'ললিতা ও মানস' এই মন্তব্যের একমাত্র ব্যতিক্রম] সম্পর্কে যে কথাটি খাটে,—এই লেখাগুলির সম্বন্ধেও সেই কথাটিই স্মরণীয়; —তাঁর খ্যাতির প্রধান কারণ তাঁর বিষয়বৈচিত্র্য-মাত্র নয়, শিল্পসৌকর্যমাত্রও নয়—আসল কারণটি তাঁর অপরিসীম ব্যক্তিত্ব!

এতবড়ো ব্যক্তিত্ব বাংলা সাহিত্যে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর তৃতীয় কোনো লেখকের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করেনি। 'লোকরহস্যে' সেই অপরিসীম ব্যক্তিত্বময় বঙ্কিমচন্দ্র হালকা সুরে দেশের বিভিন্ন সাময়িক বিষয়ে আলোচনা ক'রে, তাঁর আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজছিলেন। 'কমলাকান্তে' প্রসন্ন গোয়ালিনী, নসীরাম বাবু, ভীষ্মদেব খোসনবীশকে অবলম্বন ক'রে তাঁর পর্যালোচনামালা অর্ধ-ঔপন্যাসিক রমণীয়ত্বে উন্নীত হ'য়েছে।[৩১] তারপর 'বিবিধ প্রবন্ধে' তিনি

৩১। 'কমলাকান্ত' নামে অহিফেনসেবী লোকটির আবির্ভাবের হেতু নির্দেশকল্পে শ্রীযুক্ত

গম্ভীর সুরে নতুনতরো আলোচনা শুরু করেন। আনন্দমঠ-দেবীচৌধুরাণী-সীতারামে যে সার্থক মাতৃপূজার আয়োজন,—কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসবে'ই তার প্রথম উদ্বোধন ঘ'টেছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা ঠিকই :

> 'আনন্দমঠের 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, 'মৃণালিনীতে' যাহার সূত্রপাত, 'কমলাকান্তে' সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ। আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা সুরু।'[৩২]

তথ্যবৈচিত্র্যের অভিনবত্বে, আঙ্গিকের কৌশলে—সর্বোপরি, এক বিস্ময়কর ব্যক্তিত্বের প্রসাদে 'কমলাকান্ত' বাংলা সাহিত্যের অমর সৃষ্টি হ'য়ে উঠেছে। এই 'দপ্তরের' আলোচনাকালে শ্রীযুক্ত কালিদাস রায় লিখেছেন :

> 'রচনাগুলির মধ্যে তিন প্রকারের পরম্পরাই (sequence) দেখা যায়,—'আমার দুর্গোৎসব,' 'কে গায় ওই,' ইত্যাদি নিবন্ধের পরম্পরা আবেগাত্মক (emotional)। 'একটি গীত' নিবন্ধে কমলাকান্ত ব্যাখ্যাতা সাজিয়াছেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহার পরম্পরা ঠিক ব্যাখ্যার নয়, ইহার পরম্পরাও আবেগাত্মক। 'স্ত্রীলোকের রূপ,' 'চন্দ্রালোকে' ইত্যাদি রচনার পরম্পরা যুক্তিমূলক (logical)। 'বড়বাজার', ঢেঁকি,' ইত্যাদি নিবন্ধের পরম্পরা আলঙ্কারিক (rhetorical)। রূপকমালার ক্রম অনুসারে এইগুলি রচিত হইয়াছে।'[৩৩]

অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রবন্ধগুলি বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন যে, লেখক কতকগুলি প্রবন্ধে 'জীবনকে এক একটা প্রবল,

কলিদাস রায়ের নিম্নোক্ত মন্তব্যটি স্মরণীয় : 'বঙ্কিম যে সমাজসংসারের কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন তাহার মধ্যেই যে ব্যক্তি জীবনযাত্রা নির্বাহ করে, সে তাহারই অঙ্গীভূত। সেই সমাজ সংসারের সুখ দুঃখ সাধারণ সংস্কারের দ্বারা তাহার চিত্ত অভিরঞ্জিত। তাহার দ্বারা এইরূপ সমালোচনা স্বাভাবিক নয়। সে অধিকারীও নয়। সেই অধিকার অধিগত করিবার জন্য তিনি নিজেকে তাহার বাহিরে দাঁড় করাইয়াছেন একজন নিরপেক্ষ অনাসক্ত দ্রষ্টারূপে।'
—বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় : কালিদাস রায় ; পৃঃ ২০৯।

৩২। সাহিত্যসাধক চরিতমালা—২২ ; পৃঃ ৬০।

৩৩। বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয় : কালিদাস রায় ; পৃঃ ২১০

সর্বব্যাপী, হাস্যকর অথচ গভীর অর্থপূর্ণ কল্পনার' ভেতর দিয়ে দেখেছেন, এবং তার ফলে, 'জীবনের সমস্ত প্রচেষ্টা ও উদ্দেশ্য এক ব্যর্থ উদ্ভট খেয়ালের সূত্রে গ্রথিত' ব'লে প্রতিভাত হয়। 'মনুষ্য-ফল', 'পতঙ্গ', 'বড়-বাজার', 'বিড়াল', ঢেঁকি', ইত্যাদি এই শ্রেণীর রচনা। অন্য কতকগুলি প্রবন্ধে 'প্রৌঢ়ত্বের মোহভঙ্গ, যৌবনের নেশার অবসানের তীব্র অনুভূতিময় বিশ্লেষণ' দেওয়া হ'য়েছে। 'একা', 'আমার মন', ও 'বুড়া বয়সের কথা' এই জাতীয় রচনা। 'ইউটিলিটি বা উদরদর্শন' শ্রেণীর রচনায় 'সংস্কৃত সূত্র ও ভাষ্যের রচনাপ্রণালীর ব্যঙ্গাত্মক অনুকরণ' ঘ'টেছে। এই তৃতীয় বিভাগটি কেবল যে 'কমলাকান্তের দপ্তর' সম্পর্কেই স্মরণীয়, তা নয়; 'লোকরহস্যে'র দাম্পত্য-দণ্ডবিধির প্রসঙ্গও এই শ্রেণীতেই স্থান পাবে—সেখানেও ব্যাঙ্গাত্মক অনুকরণ ঘ'টেছে, তবে সংস্কৃত কোনো সূত্রের বা ভাষ্যের নয়,—ইংরেজি আইনী ভাষার। শ্রীকুমার বাবুর বিশ্লেষণ অনুসারে, এই রচনাবলীর চতুর্থ শ্রেণী-বিভাগটিতে যে লক্ষণ ফুটেছে, তার নাম দেওয়া হ'য়েছে fantasy ধর্ম; 'বসন্তের কোকিল' ও 'ফুলের বিবাহ' এই শাখায় স্থান পাওয়া উচিত। পঞ্চম শ্রেণীতে স্থান পাবে 'আমার দুর্গোৎসব' এবং 'একটি গীত'। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশপ্রীতি যেন এই দুটি রচনায় 'দীর্ঘকালরুদ্ধ আবেগের আকস্মিক নিষ্ক্রমণ' লাভ ক'রেছে। শ্রীকুমার বাবুর প্রদর্শিত কমলাকান্তের এই পঞ্চবিভাগ উল্লেখ করবার সঙ্গে-সঙ্গে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের একটি উক্তি স্মরণীয়। কমলাকান্তের সর্বগুণের পরিচয় দিতে গিয়ে সুবোধচন্দ্র খুবই সংক্ষিপ্ত এবং সংহত ভাষায় বলেছেন: 'সুইফট্-এর অন্তর্দৃষ্টি বিষ্ণুশর্মার কল্পনার সঙ্গে মিলিত হইয়াছে।'

সুইফট্ এবং বিষ্ণুশর্মা—দুজনেই কলম ধ'রেছিলেন ব্যক্তি ও সংঘের কল্যাণ সাধনের তাগিদে। তাঁদের উভয়ের প্রচেষ্টাই বাগ্দেবীর স্থায়ী অনুমোদন লাভ ক'রে বৃহৎ মানবসমাজের মূল্যবান সঞ্চয় হ'য়ে উঠেছে। কমলাকান্ত এই দুই কৃতী লেখকের বিশিষ্টতার লক্ষণগুলি সত্যিই আত্মসাৎ ক'রতে পেরেছিলেন ব'লে যদি স্বীকার করা যায়, তাহলে, De Quincey-র প্রচারিত সাহিত্যের দুটি বিভাগের মধ্যে কোন্‌টিতে তাঁর স্থান হবে, সহজেই সে-প্রশ্নের জবাব দেওয়া যায়। তাহলে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছুতে আর বাধা নেই যে, 'কমলাকান্ত' literature of knowledge এবং literature of power,—এই দু'য়েরই হরগৌরী-মূর্তি। শুধু

উপাদানের জন্যে নয়,—কেবল প্রকরণের চারুত্বগুণেও নয়,—কমলাকান্তের খ্যাতি আর সার্থকতার কারণ এই যে, এতে উপাদান এবং আঙ্গিকের উদ্বাহসমন্বয় ঘ'টেছে,—তথ্য ও রসের অব্যবহিত মিলন এতে অব্যাহত।

লোকরহস্যের প্রথম প্রবন্ধ 'ব্যাঘ্রাচার্য বৃহল্লাঙ্গুল'-এর [পর পর দুটি 'প্রবন্ধে' সম্পূর্ণ] কথা বিস্তৃতভাবে আলোচিত হ'য়েছে। তারপর যথাক্রমে ইংরাজস্তোত্র, [এ-লেখাটির শিরোনামের নিচে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে কৌতুক-চিহ্নিত উৎস-নির্দেশ দেখা যায়—'মহাভারত হইতে অনুবাদিত'] বাবু, গর্দ্দভ, দাম্পত্য-দণ্ডবিধি-আইন [পর পর আটটি 'অধ্যায়ে' সম্পূর্ণ], বসন্ত এবং বিরহ, সুবর্ণগোলক, রামায়ণের সমালোচনা [এ-লেখাটির শিরোনামের নিচে জানানো হ'য়েছে—'কোন বিলাতী সমালোচক প্রণীত'।], বর্ষ-সমালোচনা, কোন 'স্পেশিয়ালে'র পত্র, Bransonism [ইলবর্ট বিল আন্দোলনের স্মারক], হনুমদ্বাবু সংবাদ, গ্রাম্য কথা [পর পর দুই সংখ্যায় সম্পূর্ণ], বাঙ্গালা সাহিত্যের আদর এবং New year's Day—সর্বসমেত এই পনেরোটি রচনা সংকলিত হ'য়েছে। আর, 'কমলাকান্তে' মোট চোদ্দ সংখ্যায় পূর্বোক্ত বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা জায়গা পেয়েছে। অধুনা-প্রচলিত বঙ্কিম-রচনাবলীতে [সাহিত্য-সংসদ সংস্করণ] দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্দশ সংখ্যায় 'ঢেঁকি' লেখাটির পরেই, 'কমলাকান্তের পত্র' ছাপা হ'য়েছে। সেই বইয়ের পর পর পাঁচখানি পত্রের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। তারপর 'কমলাকান্তের জোবানবন্দী'। এই 'জোবানবন্দী'র উল্লেখও আগেই করা হ'য়েছে। 'জোবানবন্দী' খোসনবীশ জুনিয়র প্রণীত। 'কমলাকান্তের' দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত-পরিচিতির কিঞ্চিৎ অংশ ইতিপূর্বে উদ্ধৃত হ'য়েছে। এই একই সূত্রে প্রথম সংখ্যার কমলাকান্তের পত্র অংশে 'কি লিখিব' থেকে আরো একটু অংশ তুলে দেখা দরকার :

> 'আমার নাম শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী, সাবেক নিবাস শ্রীশ্রীনঁসিধাম, আপনাকে আমি প্রণাম করি। আপনার নিকট আমার সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে পরিচয় নাই, কিন্তু আপনি নিজগুণে আমার বিশেষ পরিচয় লইয়াছেন, দেখিতেছি। ভীষ্মদেব খোশ্‌নবীস, জুয়াচোর লোক আমি পূর্বেই বুঝিয়াছিলাম—আমি দপ্তরটি তাঁহার নিকট গচ্ছিত রাখিয়া তীর্থদর্শনে যাত্রা করিয়াছিলাম ; তিনি সেই অবসর পাইয়া সেইটি আপনাকে বিক্রয় করিয়াছেন।'

কমলাকান্ত তাঁর এই পত্রেই 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদককে [এই পত্রগুলি যখন বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়, তখন সম্পাদক ছিলেন সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়] জানান যে, একজোড়া জুতো কেনবার ফলেই—অনেকদিন পরে,—হঠাৎ ভীষ্মদেব খোশ্‌নবীসের দপ্তর হস্তান্তরিত হবার বৃত্তান্ত তিনি জানতে পারেন! সেই নতুন জুতো মোড়া ছিল 'বঙ্গদর্শনে'রই ছিন্নপত্রে! দৈবাৎ সেই ছাপা কাগজ কমলাকান্তের হাতে পড়ে। এই সূত্রে তাঁর মনে বঙ্গদর্শন সম্বন্ধে কৌতূহল জাগে—'বঙ্গদর্শন' কী? এক বন্ধু বলেন—'বোধ হয় বঙ্গদেশ দর্শন করাই বঙ্গদর্শন।' আর এক বন্ধু বলেন—'শকারের উপর যে রেফটি আছে, বোধ হয়, তাহা মুদ্রাকরের ভ্রম; শব্দটি 'বঙ্গদশন', অর্থাৎ বাঙ্গালার দাঁত'!

কমলাকান্ত তাঁকে এক চতুষ্পাঠী খুলতে পরামর্শ দিয়ে অন্য এক 'সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে' পুনরায় প্রশ্ন করেন। তিনি বলেন—'ইহার অর্থ পূর্ব বাঙ্গালা দর্শন করিবার বিধি'—অর্থাৎ, 'A guide to Eastern Bengal'! আরো অনেক অনুসন্ধানের ফলে তিনি জানতে পারেন যে, 'বঙ্গদর্শন একখানি মাসিক-পত্রিকা এবং তাহাতে কমলাকান্ত শর্মার মাসিক পিণ্ডদান হইয়া থাকে।' এইভাবে প্রকৃত অবস্থা জানতে পেরে, আসল কমলাকান্ত তাঁর দপ্তরের জন্যে 'এক-আধ পোয়া' আফিঙ দাবি ক'রেছিলেন। কিন্তু শুধু তাই নয়। 'বঙ্গদর্শন'-সম্পাদকের সঙ্গে লেখক হিসেবে তিনি কিছু পাকাপাকি বন্দোবস্ত ক'রতেও রাজি ছিলেন। তৎসূত্রে তাঁর প্রশ্ন এবং প্রস্তাব, দুইই ঐ প্রথম পত্রেই প্রকাশিত হয়:

> 'এ কমলাকান্তি কলে, ফরমায়েস মত সকল রকমের রচনা প্রস্তুত হয়—আপনার চাই কি? নাটক নবেল চাই, না পলিটিক্সের দরকার? কিছু ঐতিহাসিক গবেষণা পাঠাইব, না সংক্ষিপ্ত সমালোচনার বাহার দিব? বিজ্ঞানশাস্ত্রে আপনার প্রসক্তি, না ভৌগোলিক তত্ত্বরসে আপনি সুরসিক? স্থূল কথাটা, গুরু বিষয় পাঠাইব, না লঘু বিষয় পাঠাইব? আমার রচনার মূল্য, আপনি গজ দরে দিবেন, না মণ দরে দিবেন? আর যদি গুরু বিষয়েই আপনার অভিরুচি হয়, তবে বলিবেন, তাহার কি প্রকার অলঙ্কার সমাবেশ করিব। আপনি কোটেশান ভালবাসেন, না ফুটনোটে আপনার অনুরাগ? যদি কোটেশান বা ফুটনোটের প্রয়োজন হয়, তবে কোন্ ভাষা হইতে দিব, তাহাও লিখিবেন। ইউরোপ ও আশিয়ার সকল ভাষা হইতেই আমার কোটেশান সংগ্রহ করা

হইয়াছে—আফ্রিকা ও আমেরিকার কতকগুলি ভাষার সন্ধান পাই নাই। কিন্তু সেই সকল ভাষার কোটেশান, আমি অচিরাৎ প্রস্তুত করিব, আপনি চিন্তিত হইবেন না।'

'যদি গুরু বিষয়ক রচনা আপনার নিতান্ত মনোনীত হয়, তবে কি প্রকার গুরু বিষয়ে আপনার আকাঙ্ক্ষা, তাহাও জানাইবেন।'

অতঃপর তিনি জানান যে, তিনি নিজে সে-বিষয়ে কিছু করতে পারুন আর না-ই পারুন, তাঁর এক বড় সহায় জুটেছিল,—এবং তাঁরই ওপর তাঁর ভরসা ছিল। তিনি ভীষ্মদেব খোশ্‌নবীসের পুত্র—'ইউটিলিটি' শব্দের ব্যাখায় যিনি লিখেছিলেন 'ইউ—টিল্—ইটি—আই।' ভীষ্মদেবের সেই ছেলেটি ইতিমধ্যে এম. এ. পাশ ক'রে বিদ্যার ফাঁস গলায় দিয়েছেন। গুরু বিষয়ে তাঁর অধিকার জ'ন্মেছে! বর্ণ-পরিচয় থেকে শুরু ক'রে রোম দেশের ইতিহাস পর্যন্ত সব কিছুই তিনি লিখতে পারেন! পুরোনো পেনি-ম্যাগাজিন থেকে অনেক প্রবন্ধের অনুবাদ ক'রেছেন তিনি! গোল্‌ডস্মিথের 'এনিমেটেড নেচারের' সারাংশ সংকলন ক'রে মহাপণ্ডিত হয়েছেন তিনি! জ্যামিতি ত্রিকোণমিতিতেও তিনি পিছপা নন। বিদ্যা প্রদর্শনে ব্যাকুল, অন্তঃসারশূন্য লেখকদের তথাকথিত পাণ্ডিত্যের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ প্রদর্শন ক'রে তিনি লিখেছিলেন :

> 'তিনি চিতোরের রাজা আল্‌ফ্রেড দি গ্রেটের একখানি জীবনচরিত দশ পনেরো পৃষ্ঠা লিখিয়া রাখিয়াছেন এবং বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচন বিষয়ক একখানি গ্রন্থ মহাভারত হইতে সংকলিত করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কোমত্ ও হর্বট স্পেন্‌সরের মত খণ্ডন আছে এবং ডারউইন যে বলেন, যে মাধ্যাকর্ষণের বলে পৃথিবী স্থির আছে, তাহারও প্রতিবাদ করিয়াছেন।'

আর, শুধু তাই নয়, মালতীমাধব থেকে কয়েকটি শ্লোকও তাঁর সে-বইয়ে ব্যবহৃত হ'য়েছে!

এই তো গেল গুরু বিষয়ের কথা। সেই চিঠিতেই কমলাকান্ত সে-কালের বাংলা সাহিত্যের তথাকথিত লঘু-সৃষ্টিরও সমালোচনা ক'রেছিলেন। তাঁর সে সমালোচনাও এই রকম ইঙ্গিতাশ্রয়ী! সে-কালে বাংলা নাটকের অতিনাটকীয়তা আর ভাবোচ্ছ্বাস,—অসংগতি আর অবাস্তবতা তাঁর নজরে প'ড়েছিল ব'লেই তিনি তাঁর এই সব লঘু-প্রবন্ধে সে বিষয়ে এই রকম

তিরস্কার বর্ষণ ক'রেছিলেন। কমলাকান্তের নিজের কথায়—'শেষ অঙ্কের ছুরি-মারা সিনের কুড়ি ছত্রে অন্ততঃ আটটা, হা সখি আর তেরটা 'কি হলো,'কি হলো' ছিল। শেষে নায়িকা ছুরি হাতে নিয়ে একটি গানও' গেয়েছেন!

এইভাবে ভীষ্মদেবের ছেলেটির পাণ্ডিত্য—এবং তার সাহিত্যসৃষ্টির সামর্থ্যের কথা ব'লে নিয়ে, তিনি সেকালের বাংলা উপন্যাস প্রসঙ্গেও কটাক্ষ ক'রে গেছেন। নাটক, নবেল, কাব্য-কবিতা—কিছুতেই বাঙালী লেখক পিছিয়ে থাকতে নারাজ। তদানীন্তন সাহিত্যের আসরে বাঙালী লেখকদের এই অতিপ্রস্তুতি—অর্থাৎ অনুকরণসর্বস্বতা এবং ভাবালুতার নিন্দা ক'রে তিনি জানিয়েছিলেন:

> 'আমরা উক্ত নবেল লিখিতে পারি, তবে কি না ইচ্ছা ছিল যে, বাজে নবেল না লিখিয়া ডনকুইকসোট বা জিলব্লার পরিশিষ্ট লিখিব। দুর্ভাগ্যবশতঃ দুইখানি পুস্তকের একখানিও এ পর্যন্ত আমাদের পড়া হয় নাই। সম্প্রতি মেকলের এসের পরিশিষ্ট লিখিয়া দিলে আপনার কার্য হইতে পারে কি? সেও নবেল বটে। যদি কাব্য চাহেন, তবে মিত্রাক্ষর অমিত্রাক্ষর বিশেষ করিয়া বলিবেন। মিত্রাক্ষর আমাদের হইতে হইবে না—আমরা পয়ার মিলাইতে পারি না। তবে মিত্রাক্ষর যত বলিবেন, তত পারিব।'

এই রকম তীব্র, সরস ভঙ্গি বজায় রেখেই কমলাকান্ত তাঁর তথাকথিত সেই ভরসার পাত্রটির অমিত্রাক্ষর ছন্দে দক্ষতার উল্লেখ ক'রেছিলেন। সেকালে স-মিল পয়ারেও যাঁদের হাত চ'লতোনা, অমিত্রাক্ষরে তাঁদেরও উৎসাহের অন্ত ছিল না! তাই কমলাকান্ত লিখেছিলেন:

> 'সম্প্রতি খোশনবীসের ছানা, জীমূতনাদবধ বলিয়া একখানি কাব্যের প্রথম খণ্ড লিখিয়া রাখিয়াছেন, ইহা প্রায় মেঘনাদবধের তুল্য—দুই চারিটি নামের প্রভেদ আছে মাত্র।'

১৮৭২ থেকে ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের আসরে ভূরি-পরিমাণে যে-সব রচনা-প্রয়াস দেখা দিয়েছিল, সেগুলির মধ্যে বঙ্কিমের অনুকরণে লেখা অজস্র উপন্যাস, মধুসূদনের অনুকরণে-অনুসরণে লেখা মহাকাব্য আর খণ্ডকাব্য,—এবং ব্যঙ্গাত্মক নাটক-প্রহসন—এই তিনটি শ্রেণী

বিশেষভাবে স্বীকার্য। কমলাকান্তের এই প্রথম পত্রের এই উক্তিতে সেকালের এই তিন শ্রেণীর রচনা-প্রাচুর্য সম্বন্ধে কটাক্ষ দেখা যাচ্ছে।

দ্বিতীয় পত্রে তিনি পলিটিক্সে বাংলার 'অধিকার' সম্বন্ধে কথা তোলেন। তাঁর নিজের পলিটিক্স্-বিমুখতা সম্বন্ধে প্রথমে এই কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়:

> 'কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী ব্রাহ্মণ, তাহাকে পলিটিক্স্ লিখিবার আদেশ কেন করিয়াছেন? কমলাকান্ত স্বার্থপর নহে—আফিঙ ভিন্ন জগতে আমার স্বার্থ নাই, আমার উপর পলিটিকেল চাপ কেন? আমি রাজা, না খোশামুদে, না জুয়াচোর, না ভিক্ষুক, না সম্পাদক, যে আমাকে পলিটিক্স্ লিখিতে বলেন?...আপনি আজিও বুঝতে পারেন নাই যে, কমলাকান্ত শর্মা উচ্চাশয় কবি, কমলাকান্ত ক্ষুদ্রজীবী পলিটিশ্যন নহে।'

যাই হোক্, এতৎসত্ত্বেও সম্পাদকের অনুরোধ লঙ্ঘন ক'রতে না পেরে, ভরিটাক আফিঙ খেয়ে নিয়ে, শিবে কলুর বাড়ির উঠোনে বাঁধা দু'তিনটি বলদের দিকে চোখ ফেরাতে হয় তাঁকে।—'মাটিতে পোঁতা নাদায় কলুপত্নীর হস্তমিশ্রিত খলি-মিশান ললিত বিচালিচূর্ণ গোগণ মুদিতনয়নে, সুখের আবেশে কবলে গ্রহণ করিয়া ভোজন করিতেছিল।' সেই দৃশ্য দেখে, তিনি 'পলিটিক্স্-বিকারশূন্য সুখ' কা'কে বলে, সেটা বুঝতে পারেন! এবং সেই উপলব্ধি উল্লেখ ক'রে অতঃপর তাঁর এই ঘোষণা প্রচারিত হয়:

> 'ভাই পলিটিক্স্ওয়ালারা, আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী তোমাদিগের হিতবাক্য বলিতেছি, পিয়াদার শ্বশুরবাড়ি আছে, তবু সপ্তদশ অশ্বারোহী মাত্র যে জাতিকে জয় করিয়াছিল, তাহাদের পলিটিক্স্ নাই। 'জয় রাধে কৃষ্ণ! ভিক্ষা দাও গো!' ইহাই তাহাদের পলিটিক্স্। তদ্ভিন্ন অন্য পলিটিক্স্ যে গাছে ফলে, তাহার বীজ এ দেশের মাটিতে লাগিবার সম্ভাবনা নাই।'

কমলাকান্তের মনে যখন এই রকম ভাবনা, ঠিক সেই সময়ে, কলুর ছেলেটির আহার শুরু হয়, আর,—একটা কুকুর তার ভাতের থালার কাছে এগিয়ে এসে বসে। আহারে কুকুরেরও আগ্রহ। কিন্তু এক্ষেত্রে জোরের সঙ্গে অধিকার করা তার সামর্থ্যের অতীত। একদিকে,—সেই ক্ষীণজীবী কুকুরের মৃদু আন্দোলন,—তার লেজ নাড়া, হাই তোলা, মৃদু গর্জন এবং কিঞ্চিৎ প্রসাদ-প্রাপ্তি—অন্যদিকে, সেই উঠোনেই এক 'বৃহৎকায় বৃষ' সেই দু'তিনটি বলদের

খোল-বিচালি জোর ক'রে খেতে থাকে,—তার বিশাল শরীরের দিকে তাকিয়ে বলদগুলো কাতর-নয়নে তার আহারনৈপুণ্য দেখে,—অন্যদিকে, ছেলের ভাতের কাছেই কুকুরটাকে ভাত খেতে দেখে ক্রুদ্ধ কলুগৃহিণী এক ইঁটের টুকরো ছুঁড়ে মারতেই কুকুর পালিয়ে যায়,—কিন্তু একটুকরো বাঁশ নিয়ে, সেই বৃহৎকায় বৃষকে যখন তিনি মারতে এগিয়ে যান, তখন সেই দস্যু-বৃষ—'বৃহৎ শৃঙ্গ হেলাইয়া তাঁহার হৃদয় মধ্যে সেই শৃঙ্গাগ্রভাগ প্রবেশের সম্ভাবনা জানাইয়া দিল'! এই দু'রকম পলিটিক্‌স্ সম্বন্ধে কমলাকান্তের চোখ খুলে যায়! তিনি অতঃপর জানান:

> 'দুই রকমের পলিটিক্‌স্ দেখিলাম—এক কুকুর-জাতীয়, আর এক বৃষ-জাতীয়। বিস্মার্ক এবং গর্শাকফ এই বৃষের দরের পলিটিশ্যন—আর উল্‌সি হইতে আমাদের পরমাত্মীয় রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর পর্যন্ত অনেকে এই কুক্কুরের দরের পলিটিশ্যন।'

যে-কারণেই-হোক্, সে-সময়ে 'মুচিরাম' নামটি বঙ্কিমের মনে ঘুরছিল। তাঁর 'বঙ্গদর্শন' পর্বের রচনাবলীর মধ্যেই 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বেরিয়েছিল [১২৮৭ সালের আশ্বিনের বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত]। পরিবর্ধিত 'কমলাকান্ত' বই হ'য়ে বেরোয় ১২৯২ সালে। সেই পরিবর্ধিত সংস্করণেই কমলাকান্তের পত্রাবলী ছাপা হয়। কমলাকান্তের দ্বিতীয় পত্রের এই মুচিরাম কেবল 'রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর'! 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিতে' সেই ব্যক্তিরই সম্পূর্ণ জীবনী পরিবেষিত হয়। 'কমলাকান্তে'র সঙ্গে 'লোকরহস্য'—চিন্তায় এবং রীতিতে—দু'দিকেই সাদৃশ্যে বাঁধা; 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত'ও সেই একই সময়-বিস্তারের, একই মননভঙ্গির ফসল। কমলাকান্তের দ্বিতীয় পত্রের পূর্বোক্ত পলিটিক্‌স্-চিন্তার সঙ্গে লোকরহস্যের বৃহল্লাঙ্গুল-প্রসঙ্গ—বিশেষতঃ 'সম্ভ্রান্তলোকের আহারান্বেষণের নাম বিষয়কর্ম, অসম্ভ্রান্তের আহারান্বেষণের নাম জুয়াচুরি, উঞ্ছবৃত্তি এবং ভিক্ষা।'—কিংবা 'ইংরাজস্তোত্রে'র শেষ ছত্রগুলি,—যেখানে বলা হ'য়েছে—

> 'হে ভগবন্! আমি অকিঞ্চন। আমি তোমার দ্বারে দাঁড়াইয়া থাকি, তুমি আমাকে মনে রাখিও। আমি তোমাকে ডালি পাঠাইব, তুমি আমাকে মনে রাখিও। হে ইংরাজ! আমি তোমাকে কোটি কোটি প্রণাম করি।'

—কিংবা 'বাবু' প্রবন্ধে যেখানে 'বাবু'র নানা লক্ষণের কথা শেষ ক'রে জানানো হয়:

> 'হে নরনাথ! আমি যাঁহাদিগের কথা বলিলাম, তাঁহাদিগের মনে মনে বিশ্বাস জন্মিবে যে, আমরা তাম্বুল চর্বণ করিয়া, উপাধান অবলম্বন করিয়া, দ্বৈভাষিকী কথা কহিয়া, এবং তামাকু সেবন করিয়া ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধার করিব।'

—সে-সব অংশের সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। দেশের দুষ্ট প্রথা, সমাজের বিভিন্ন ত্রুটি, ব্যক্তিমনের আলস্য-জড়তা-অহংকার এবং জাতি-মনের অবসাদ-দৈন্য-তামসিকতা সম্বন্ধে ১৮৭২ থেকে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে—ব্রজেন্দ্রনাথ-সজনীকান্ত-কথিত সেই 'যুদ্ধ-পর্বে'র লেখাগুলিতে তিনি একই ভঙ্গিতে নানা কথা ব'লে গেছেন।

কমলাকান্তের তৃতীয় পত্রে 'বাঙ্গালির মনুষ্যত্ব' সম্বন্ধে আর-এক স্মরণীয় আলোচনার ভূমিকা হিসেবে এই পূর্বকথাটুকু দেখা যায় যে, কমলাকান্ত তাঁর কুঁড়েঘরের পাশে দু'তিনটি ফুলগাছ ব'সিয়েছিলেন। সেই ফুলের আকর্ষণে পালে পালে ঝাঁকে ঝাঁকে বোলতা, মৌমাছি ইত্যাদি এসে হাজির হোতো! সেই 'রসক্ষেপা রসিকের দল'-কে তিনি বলেন:

> 'এ সভা নহে, সমাজ নহে, এসোসিয়েশ্যন, লীগ, সোসাইটি, ক্লাব প্রভৃতি কিছুই নহে—কমলাকান্তের পর্ণকুটীর মাত্র, আপনাদিগের ঘ্যান্ ঘ্যান্ করিতে হয়, অন্যত্র গমন করুন—আমি কোন রিজোলিউশ্যনই দ্বিতীয়িত করিতে প্রস্তুত নহি; আপনারা স্থানান্তরে প্রস্থান করুন।'

কিন্তু তাতে বিপরীত ফল হয়। সেই 'গুনগুনের দল' কমলাকান্তের বাগান ছেড়ে, ঘরে ঢুকে পড়ে। কমলাকান্ত হাতপাখা দিয়ে তাদের তাড়িয়ে দিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা বেরিয়ে যেতে নারাজ।

> 'আমি তালবৃন্ত হস্তে ভ্রমরের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলাম। তখন আমি ঘূর্ণন, বিঘূর্ণন, সংঘূর্ণন প্রভৃতি বহুবিধ বক্রগতিতে তালবৃন্তাস্ত্র সঞ্চালন করিতে লাগিলাম; ভ্রমরও ডীন, উড্ডীন, প্রডীন, সমাডীন প্রভৃতি বহুবিধ কৌশল দেখাইতে লাগিল।'

অবশেষে দংশনভয়ে অস্থির হ'য়ে কমলাকান্ত রণে ভঙ্গ দেন! তার আগে ভ্রমরের আচরণের প্রতিবাদসূত্রে তাঁকে ব'লতে হ'য়েছিল:

'আমি কমলাকান্ত চক্রবর্তী—দপ্তর মুক্তাবলীর প্রণেতা, কিন্তু হায়, মনুষ্যবীর্য! তুমি অতি অসার! তুমি চিরদিন মনুষ্যকে প্রতারিত করিয়া শেষ আপন অসারতা প্রমাণীকৃত কর! তুমি জামার ক্ষেত্রে হানিবলকে, পলটোবাব ক্ষেত্রে চার্লসকে, ওয়াটর্লুর ক্ষেত্রে নেপোলিয়নকে, এবং আজি এই ভ্রমরসমরে কমলাকান্তকে বঞ্চিত করিলে।'

কমলাকান্তের তরফে এই মন্তব্য! আর, ভ্রমরের তরফে এরই জবাব:

'আমি কি একাই ঘ্যানঘেনে!···বাঙ্গালী হইয়া কে ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ছাড়া? কোন্ বাঙ্গালীর ঘ্যান্‌ঘ্যানানি ছাড়া অন্য ব্যবসা আছে?'

কমলাকান্তের তৃতীয় পত্রের এই বাঙালী-চরিত্র-সমালোচনার সঙ্গে—লোকরহস্যের 'গর্দভ' লেখাটিতে বাঙালী সমালোচকের প্রতি যে কটাক্ষ দেখা গেছে, সেটুকু এখানে স্মরণ করা চলে। সেখানে গাধাকে বলা হ'য়েছিল:

'তুমি নানা রূপে, নানা দেশ আলো করিয়া যুগে যুগে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ। এক্ষণে তপস্যা-বলে ব্রহ্মার বরে, তুমি বঙ্গদেশে সমালোচক-হইয়া অবতীর্ণ হইয়াছ।'

'লোকরহস্যে'র 'বর্ষ সমালোচন' লেখাটিও এইসূত্রে মনে পড়বার কথা। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত সেই লেখাটিতে ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দের কৌতুকপূর্ণ সাল-তামামির শেষ অনুচ্ছেদে পাঠককে সম্বোধন ক'রে লেখক জানিয়েছিলেন:

'আপনার ও আমার পক্ষে সমান কথা, কেন না, আপনার ও আমার পঁচাত্তরেও ঘাসজল, ছিয়াত্তরেও ঘাসজল।'

এ-কথা আগেই বলা হ'য়েছে। 'টুপ্যাবৃতমস্তক' বাবুর কথাও এর আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে। লোকরহস্যের 'হনূমদ্বাবুসংবাদ'-এ সেইরকম এক বাবুর সঙ্গে হনূমানের সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গ দেখা গেছে। হনূমানকে ইংরেজিতে প্রাতঃসম্ভাষণ জানিয়ে, বাবু সেখানে আলাপ শুরু ক'রেছিলেন। হনূমান তাই শুনে, সংস্কৃত ভাষায় জবাব দিতে থাকেন! তাতে বাবু বলেন—'It seems most barbarous gibberish—that precious lingo of his; but I suppose I must put up with it'। কিন্তু হনূমানের মেজাজ অন্যরকম, ব্যবহার-বিবিধও অন্যরকম! নিজের লেজের প্যাঁচে বাবুকে কয়েকবার ঘুরিয়ে দিতেই তাঁর চুরুট, টুপি, চশমা, চাবুক এবং তাঁর

মুখের ইংরেজি সবই অপসারিত হয়! বাবু ব'লে ওঠেন—'ও হনূমান মহাশয়, ঘাট হয়েছে, ছাড়! ছাড়! ছাড়! রক্ষা কর গরিবের প্রাণ যায়।'

সেই টুপ্যাবৃত মহাপুরুষকে হনুমান শুধু মাতৃভাষায় কথা ব'লিয়েই ক্ষান্ত হননি। 'আত্মশাসন' যে কী জিনিস,—তাঁকে সে-প্রসঙ্গও ভাবতে বাধ্য ক'রেছিলেন।

হনূমান রামরাজ্যে বিশ্বাসী। 'বাবু একটু ইশারায় জানিয়েছিলেন—'কেহ কেহ বলেন, সে সকল গল্পমাত্র ...'। তাতে হনূমানকে অত্যন্ত উত্তেজিত হ'তে দেখে, বাবু তাড়াতাড়ি ব'লতে বাধ্য হ'য়েছিলেন—'তুমি রামের দাস,—আমি ইংরেজের দাস। তোমার রাম বড়, কি আমার ইংরেজ বড়?' ইংরেজ 'বাবু'কে local self government বা স্থানীয় আত্মশাসন-এর অধিকার দিয়েছে—এইটেই ছিল বাবুর বিশেষ গর্বের কারণ! হনূমান সেই আত্ম শাসনের উল্লেখ শুনে বাবুকে সোজাসুজি জানিয়ে দেন: 'তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি প্রকারে?'

সে-প্রশ্ন শুনে, বাবু মনে মনে ব'লেন 'একেই বলে বাঁদুরে বুদ্ধি!'

·

হনূমানের এই অবিস্মরণীয় মন্তব্য দেখে একালের সতর্ক পাঠকের মনে বেজে উঠবে রবীন্দ্রনাথেরই গানের লাইন:

আমরা সবাই রাজা আমাদের এই রাজার রাজত্বে;
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে।
আমরা যা খুশি তাই করি
তবু তাঁর খুশিতেই চরি,
আমরা নই বাঁধা নই দাসের রাজার ত্রাসের দাসত্বে,
নইলে মোদের রাজার সনে মিলব কী স্বত্বে॥

'হনূমদ্বাবুসংবাদে' লঘু সরসতা বজায় রেখে স্বাধীনতা, আত্মশাসন, রাজত্ব বা রাজমনোভাব এবং রাজা-প্রজা-সম্পর্কের বিশ্লেষণ দেখা দিয়েছিল। প্রবন্ধের যে বিশেষ শ্রেণী-স্বভাব মেনে নিয়ে,—যে বিশেষ সাহিত্য-পাত্রে বঙ্কিমচন্দ্র সেখানে তাঁর বক্তব্য পরিবেষণ ক'রে গেছেন, সেই পাত্র বা সাহিত্য-প্রকারের সীমার মধ্যে—'তুমি নিজে রাজা না হইলে আত্মশাসন করিবে কি প্রকারে'—কথাটুকুই যথেষ্ট। ও-কথার গভীরতর যে ব্যঞ্জনা সেখানে বাজবার নয়, তা বাজেনি। কিন্তু সেই কথারই সূত্র ধ'রে, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃত গানের

লাইনগুলি অনুভব ক'রলে বাংলা সাহিত্যের দুই কালের এই দুই মনীষীর আদর্শ ও মননের সুনিহিত এক যোগই ধরা পড়ে। লোকরহস্য, কমলাকান্ত, মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত,—এমন কি তাঁর সাম্য-ও একই রকম অনুভূতির,—এবং কতকটা একই রকম অভিব্যক্তির স্মারক। শুধুই কল্পনা-বিলাস নয়, শুধুই ডি-কুইন্সি প্রভাব নয়,—এইসব রচনায় তাঁর সমাজ-চিন্তার গভীর পরিচয় প্রতিফলিত হ'য়েছে। উপন্যাসে তাঁর প্রতিভার অতুলনীয় চমক দেখে সেকালের সাধারণ পাঠক অভিভূত বোধ ক'রেছিলেন; আর, সে-যুগে সমালোচকমহল তাড়াতাড়ি স্কটের অনুকরণের কথা তুলেছিলেন। যে বঙ্কিম অন্ধ পরানুকরণের তীব্র বিরোধিতা ক'রে গেছেন, নিজের সাহিত্য-সৃষ্টির ক্ষেত্রে তাঁকেও তথাকথিত অনুকরণ-স্বভাবের জন্যে ব্যঙ্গবাণ সহ্য ক'রতে হ'য়েছে। ডক্টর সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে [৩য় সংস্করণ, ১৩৬২; পৃঃ ২০৩] গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রহসন 'বিধবার দাঁতে মিশি' [১৮৭৪] থেকে উড়ুম্বর চট্টোপাধ্যায় [প্রকারান্তরে বঙ্কিমচন্দ্র]-এর ভূমিকাটি এইসূত্রে দেখিয়ে দিয়েছেন :

উড়ুম্বর। গুড্ নাইট বরদা বাবু
গোরা। আইয়ে ইণ্ডিয়ান সারওয়াল্টার স্কট।
উড়ুম্বর। আর কেন জ্বালাও বাবা।

'বঙ্গদর্শনের' গ্রন্থ-সমালোচনায় উত্তেজিতচিত্ত বঙ্কিম-বিরোধীদের মনোভাবটি দেখিয়ে দেবার অভিপ্রায়ে, প্যারীমোহন কবিরত্নের 'গীতাবলী'-র [১৭৯৮ শকাব্দ] ৮০-৮৩ পৃষ্ঠা থেকে তিনি আরো স্মরণ ক'রেছেন :

বঙ্গদর্শনের দর্শনশক্তি চমৎকার,
এ দোষদর্শনে রোষ হয় না কার ?
অন্ধ যে জন, নাইকো লোচন, সমালোচন কেন তার ?
পদে পদে দেখতে পাই, কর্তা কর্ম বোধ নাই,
ভাব রসের মা গোসাঁইঞ, কেন লেখার ছল ধরে,—
রাধাকৃষ্ণ বলতে শিখে, দুট একটা গল্প লিখে,
শরাটাকে শরা সম জ্ঞান করে :—
শুনে হাসি পায়, বাঁচিনে লজ্জায়,
কালে বাপু পণ্ডিত হবে, এই কারখানা সেই প্রকার।

বঙ্কিম-প্রতিভার বিরুদ্ধে সমকালীন বিদ্বৎসমাজ যে এইভাবে কলম ধ'রতে বাধ্য হ'য়েছিলেন,—এবং গুণগ্রাহী কয়েকজন ছাড়া অনেকেই যে নিজেদের অজ্ঞতার অন্ধকারে তাঁর খ্যাতি ঢেকে দিতে চেয়েছিলেন, তার আরো নজির দেখিয়ে দিয়েছেন অধ্যাপক সেন। রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর প্রথম তিনখানি উপন্যাসের সমালোচনায় সাধ্যানুসারে পক্ষপাতিত্ব এড়িয়েছিলেন বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর জ্যেষ্ঠাগ্রজের নামে তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' উৎসর্গ করেন ব'লে 'সুরলোকে বঙ্গের পরিচয়' [প্রথম খণ্ড, ১৮৭৫] বইয়ে বলা হয়—'দেখুন, সেই মহাত্মা জ্যেষ্ঠ সহোদরকে একখানি অশ্লীল গ্রন্থ উৎসর্গ করিয়াছেন।' ১২৮৭ সালে কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ 'বাউল শ্রীফকিরচাঁদ বাবাজী' ছদ্মনামে 'বঙ্গীয় সমালোচক (কাব্য)'—বইয়ে বঙ্কিমকে গালাগালি দিয়েছিলেন। অধ্যাপক সেন সে-ব্যঙ্গ বুঝিয়ে দিতে গিয়ে লিখেছেন: 'প্রথমেই ছবি কাঁঠাল গাছের তলায় বাঁদর দাঁড়াইয়া আছে, হাতে বঙ্গদর্শন, নিচে কবিতা 'হে বঙ্গ দর্শন কর বঙ্কিম বানর' ইত্যাদি।

ব্যক্তিগত অনুভূতির দিক থেকে, 'যুদ্ধ-পর্বে'র রচনায়, এই সব বিদ্রূপের বিরুদ্ধে তাঁকে একদিকে আত্মরক্ষা ক'রতে হয়,—অন্যদিকে সমাজের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধেও অক্লান্তভাবে কলম চালাতে হয়। রবীন্দ্রনাথও 'ব্যঙ্গকৌতুক' লিখেছিলেন। তাঁর আগে বঙ্কিমচন্দ্রকেও সেই রকম বিশেষ এক সাহিত্য-বাহন সৃষ্টি ক'রে নিতে হ'য়েছিল। শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্ত তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্র' বইখানিতে ঠিকই ব'লেছেন:

> 'কমলাকান্ত একাধারে কবি, দার্শনিক, সমাজশিক্ষক, রাজনীতিজ্ঞ ও স্বদেশপ্রেমিক; অথচ তাহাতে কবির অভিমান, দার্শনিকের আড়ম্বর, সমাজশিক্ষকের অরসজ্ঞতা, রাজনৈতিকের কল্পনাহীনতা, স্বদেশপ্রেমিকের গোঁড়ামি নাই।'

এ-প্রসঙ্গে এই ধরনের আরো অনেক মন্তব্য আগেই স্মরণ করা হ'য়েছে। বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ বঙ্কিম-রচনাবলীর সম্পাদকীয় ভূমিকায় সম্পাদকরা যা বলে গেছেন, এইবার সে-মন্তব্যও তুলে দেখা যেতে পারে। তাতে তাঁর লঘু-প্রবন্ধের প্রকৃতিটি যথাযথভাবে দেখিয়ে দেওয়া হয়:

> 'বঙ্গদর্শনের সম্পাদক হিসাবে পৃষ্ঠাপূরণের এবং বিবিধ বিষয়ক আলোচনার দ্বারা পত্রিকার অঙ্গসৌষ্ঠব সম্পাদনের জন্য অর্থাৎ

সাধারণ পাঠকের মনোরঞ্জনের জন্য সব্যসাচী বঙ্কিমকে আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত লঘু বিষয় লইয়াও ব্যঙ্গ ও রসিকতার ভঙ্গিতে লেখনী ধারণ করিতে হইয়াছে—'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য' ও 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' বঙ্কিমচন্দ্রের বিপরীত বা লঘুদিকের পরিচয়। কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের গল্প অথবা ঈশ্বর গুপ্তের সমাজ-বিষয়ক কবিতাগুলি যে অর্থে লঘু, বঙ্কিমচন্দ্রের এই সকল হালকা রচনা সে অর্থে লঘু নহে। তাঁহার হাসি বা ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অপমান-লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু শুকাইয়া আছে। 'বিবিধ প্রবন্ধে' বঙ্কিমচন্দ্র যে সকল চরম কথা বলিতে পারেন নাই, 'লোক-রহস্যে' ও 'কমলাকান্তে' বিদ্রূপের আবরণে সে সকল কথা অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। বাংলা দেশের চিরন্তন গতানু-গতিকতার বিরুদ্ধে হুতোমের পরেই কমলাকান্তী বঙ্কিমের এই বিদ্রোহ।'

তাঁর এইসব লঘু-প্রবন্ধের জনপ্রিয়তার একটি নজির আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে,—যে, আজ পর্যন্ত এ-রীতির ব্যাপক অনুকরণ চ'লছেই; দ্বিতীয় নজির—সেকালে 'কমলাকান্তের জেবানবন্দী'র নাট্যরূপ দেখা দেয়,—এবং তা অভিনীতও হয়। আনন্দবাজার-পত্রিকার একালের 'কমলাকান্ত শর্মা' [শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী] অথবা 'যুগান্তর-এর 'এককলমী' [শ্রীযুক্ত পরিমল গোস্বামী] সেই 'যুদ্ধপর্বের' বঙ্কিম-রচনাবলীর লঘু-তীক্ষ্ণ আবেদনেরই প্রতিধ্বনি ব'ল্‌লে অন্যায় হয়না। ভূয়োদর্শী, শক্তিসমৃদ্ধ সাহিত্যিকের যা করণীয়, বঙ্কিমচন্দ্র তাই ক'রেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের 'সবাই রাজা'-তত্ত্বের সঙ্গে লোকরহস্যের 'হনুমদ্বাবুসংবাদ-এর 'আত্মশাসন'-তত্ত্বের সাদৃশ্য যেমন সাহিত্য-ইতিহাস-সচেতন রসিক পাঠকের অনুভূতির বিষয়,—রবীন্দ্রনাথের 'ব্যঙ্গকৌতুক' প্রভৃতি রচনা-প্রকারের আবেদনের সঙ্গে পূর্বকালবর্তী বঙ্কিমচন্দ্রের এইসব রচনার নৈকট্যও যেমন অনুভূতির বিষয়,—এই যুদ্ধ-পর্বের বঙ্কিম-রচনাবলীতে মনোযোগী থাকলে, ব্যক্তি ও সমাজ-প্রসঙ্গে এই দুই লোকোত্তর মনীষার চিন্তাধারার সাদৃশ্যও অনুরূপ ভাবেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়। 'কালান্তর'-এ 'লোকহিত' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যে প্রীতি-চর্চার কথা ব'লেছেন,—তাঁর আগে এসে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি রচনায় সেই কথাই ব'লে গেছেন। দায়িত্বজ্ঞানহীন সাহিত্য-সমালোচকের

উদ্দেশে 'ক্ষণিকা'য় রবীন্দ্রনাথের যে কটাক্ষ অনুভব করা গেছে, 'লোকরহস্য' এবং 'কমলাকান্ত',—উভয় ক্ষেত্রেই কতকটা সেই ধরনের মনোভাব ব্যক্ত হ'য়েছে। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্রের মননের,—এবং তাঁর আদর্শেরও সংযোগ অনুভব করা যায় রবীন্দ্রনাথের মধ্যে। 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' প্রভৃতি লঘু-রচনাও যে এই উপলব্ধির ক্ষেত্র—এখানে সেই কথাই স্মরণীয়।

তাঁর রচনায়—উপন্যাসের ক্ষেত্রে, যেমন স্কটের প্রভাবের কথা বলা হ'য়ে থাকে, এইসব লঘু-প্রবন্ধের ক্ষেত্রে—বিশেষতঃ তাঁর 'কমলাকান্ত' সম্বন্ধে তেমনি ডিকুইন্সি, স্কট, ডিকেন্স প্রভৃতির প্রভাবের কথা বলা হয়। এ-বিষয়ে অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেনের মন্তব্য এর আগেই তুলে দেখানো হ'য়েছে। সেই সূত্রে কমলাকান্তের অনন্যসাধারণত্ব সম্বন্ধে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রভৃতি অনেক সুধী ব্যক্তির কথাও দেখা গেছে। উনিশ শতকের বাংলা-সাহিত্য-সমালোচনায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যরীতি আর পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যাদর্শের দিকে এতো বেশি নজর দেওয়া হোতো যে, দেশের প্রতিভাশালী লেখকদের মৌলিক সৃষ্টিক্ষমতার সত্যও তাতে কতকটা ঝাপসা হ'য়ে যাওয়া অনিবার্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছিল। সেকালের সমালোচকদের মতামতে লক্ষ্য রাখলে দেখা যায় যে, স্কটের প্রভাব বঙ্কিমের উপন্যাসেও যেমন,—নবীনচন্দ্রের অন্তত একখানি কাব্যেও তাঁরা তেমনি অনুভব ক'রে গেছেন! নবীচন্দ্রের 'রঙ্গমতী' কাব্য প্রকাশিত হ'লে, তাঁর এক ব্যারিষ্টার বন্ধু এক চিঠিতে স্কটের উল্লেখ ক'রেছিলেন। 'আমার জীবন'-এ নবীনচন্দ্র নিজেই সে-কথা জানিয়ে গেছেন—'স্কটের কাব্য ভিন্ন তিনি এরূপ বর্ণনা পাঠ করেন নাই। পাঠ করিতে করিতে স্কটল্যাণ্ডের পার্বত্য দৃশ্য সকল তাঁহার মনে পড়িয়াছিল।'[৩৪] বঙ্কিম বাংলার স্কট,—মধুসূদন মিল্টন,—নবীনচন্দ্র বায়রণ[৩৫]—এই ধরনের পরিচিতিতে এদেশের পাঠক অভ্যস্ত হ'য়ে গেছেন! শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার দত্তগুপ্তের 'বঙ্কিমচন্দ্র' থেকে নিচের মন্তব্যটুকু সেই প্রসঙ্গেই দেখা দরকার:

> 'হায় রে অদৃষ্ট। 'মৌলিকতা' 'মৌলিকতা' করিয়া অথবা আপনাদের দেশের দৃষ্টিমাত্রেরই মৌলিকতা সন্দেহ করিতে করিতে দেশটা অধঃপাতে যাইতে বসিয়াছে। কৈশোরে 'কমলাকান্ত' পাঠ

৩৪। 'আমার জীবন', তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২০৪ দ্রষ্টব্য।

৩৫। 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রই 'পলাশীর যুদ্ধ' সমালোচনায় নবীনচন্দ্রকে 'বাংলার বাইরণ' বলেছিলেন।—ঐ, দ্বিতীয় ভাগ, পৃঃ ২২৭ দ্রষ্টব্য।

> করিবার পর যখন বিস্ময়ে আত্মহারা হইয়াছিলাম, তখন ইংরেজী সাহিত্যে জ্ঞানাভিমানী এক ব্যক্তি বড় গম্ভীরভাবে বলিয়াছিলেন, 'ওটা De Quincey's 'Confessions of an Opium Eater'-এর অনুকরণ'। বড হইয়া বুঝিয়াছি উহা পণ্ডিতের যোগ্য উক্তি নয়। কমলাকান্তের দুই দশটা উক্তির অনুরূপ উক্তি বিশাল ইংরেজী সাহিত্যের কোথাও নাই এমন কথা বলিব না, কমলাকান্তের জোবানবন্দী Pickwick Papers-এর Sam-এর জোবানবন্দীর আদর্শে রচিত হইয়াছে তাহাও বিশ্বাস করি, তবু বলিব উহাতে কমলাকান্তের মৌলিকতার হানি হয় নাই।'

'লোকরহস্যে' হাস্য-পরিহাসের অস্ত্রচালনা কৌশল আয়ত্ত ক'রে নিয়ে, 'কমলাকান্তে' বঙ্কিম তা পূর্ণ শক্তিতে প্রয়োগ ক'রে গেছেন,—এই যে মন্তব্যটি ইতিপূর্বে ব্যক্ত হ'য়েছে,—সেই সূত্রে, রচনাধারার দিক থেকে,—এই দুটি বইয়ের সম্পর্ক সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণের সম্পাদকীয় মতও এখানে ভেবে দেখা দরকার। তাঁরা জানিয়ে গেছেন যে, বঙ্কিমের রহস্যপ্রিয় মন প্রথমে লোকরহস্যের সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার ক'রে নিয়েছিল। কিন্তু নিছক হাস্য-পরিহাসে মগ্ন থাকা তাঁর স্বভাব নয়,—সংসারের সর্বপরিচিত সাধারণ আচার-আচরণের অন্তরালবর্তী জীবনের গূঢ়তর জিজ্ঞাসা এবং সমালোচনার দিকে স্বভাবতই তিনি উন্মুখ হ'য়ে ওঠেন। ফলে, নতুন প্রয়োজন দেখা দেয়:

> 'অর্ধোন্মাদ নেশাখোর কমলাকান্তের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া তখন তাঁহার উপায় ছিল না। সোজাসুজি সজ্ঞানে যে সকল কথা বলিতে তিনি সংকোচ বোধ করিতেন, কমলাকান্তের মুখ দিয়া সেই সকল কথা তিনি অসংকোচে বলিতে পারিতেন, এবং এই রহস্যময় পাগলকে কেন্দ্র করিয়া মাসের পর মাস পাঠক ভুলাইতে তাঁহাকে বেগ পাইতে হইত না।'

কিন্তু শুধু কি সংকোচ পরিত্যাগের কথা? কমলাকান্ত আবেগময়। কমলাকান্ত কবি। সেই নেশাখোর কমলাকান্তই 'আমার দুর্গোৎসব'-এর মতন গদ্য-বাহিত কাব্যের কবি!

'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত'-এর প্রথম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদেই দেখা যায়—'এদেশে ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না'! কবে কোন্ তারিখে মুচিরাম জন্মগ্রহণ ক'রেছিলেন, তৎসম্পর্কিত ইতিহাসের অভাবের কথাটা পরিহাস বটে,—তবে 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখবার আগে থেকেই ইতিহাস-চর্চার দিকে তাঁর মনে যে নিরন্তর প্রশ্নমনস্কতা দেখা দিয়েছিল, যুদ্ধ-পর্বের রচনায় তাঁর সেই ইতিহাস-চিন্তায় দিকটিও বিবেচ্য। কমলাকান্তের কলমেই আগে লেখা হ'য়েছিল :

> 'আমি এই কাল-সমুদ্রে মাতৃসন্ধানে আসিয়াছি। কোথা মা! কই আমার মা? কোথায় কমলাকান্ত-প্রসূতি বঙ্গভূমি! এ ঘোর কাল-সমুদ্রে কোথায় তুমি? সহসা স্বর্গীয় বাদ্যে কর্ণরন্ধ্র পরিপূর্ণ হইল—দিঙ্মণ্ডলে প্রভাতারুণোদয়বৎ লোহিতোজ্জ্বল আলোক বিকীর্ণ হইল—স্নিগ্ধ মন্দ পবন বহিল—সেই তরঙ্গসঙ্কুল জলরাশির উপরে দূরপ্রান্তে দেখিলাম—সুবর্ণমণ্ডিতা, এই সপ্তমীর শারদীয়া প্রতিমা! জলে হাসিতেছে, ভাসিতেছে, আলোক বিকীর্ণ করিতেছে। এই কি মা? হাঁ, এই মা। চিনিলাম, এই আমার জননী জন্মভূমি—এই মৃণ্ময়ী মৃত্তিকারূপিণী—অনন্ত রত্নভূষিতা—এক্ষণে কালগর্ভে নিহিতা!'

কমলাকান্তের দ্বাদশ সংখ্যায় 'একটি গীত' লেখাটিতে সেই ইতিহাস-চিন্তারই আবেগাত্মক আর-এক নিদর্শন দেখা যায় :

> '১২০৩ সাল হইতে দিবস গণি। যেদিন বঙ্গে হিন্দুনাম লোপ পাইয়াছে, সেই দিন হইতে দিন গণি। যেদিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল, সেই দিন হইতে দিন গণি। হায় কত গণিব! দিন গণিতে গণিতে মাস হয়, মাস গণিতে গণিতে বৎসর হয়. বৎসর গণিতে গণিতে শতাব্দী হয়, শতাব্দীও ফিরিয়া ফিরিয়া সাতবার গণি। কই, অনেক দিবসে মনের মানসে বিধি মিলাইল, কই? যাহা চাই, তাহা মিলাইল কই? মনুষ্যত্ব মিলিল কই? একজাতীয়ত্ব মিলিল কই? ঐক্য কই? বিদ্যা কই? গৌরব কই? শ্রীহর্ষ কই? ভট্টনারায়ণ কই? হলায়ুধ কই? লক্ষ্মণ সেন কই?...
>
> 'আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণি-মাণিক্য হইলে না, তোমায়

কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না! তোমায় যদি কণ্ঠে পরিতাম, মুসলমান আমার হৃদয়ে পদাঘাত না করিলে তাহার পদরেণু তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিত না। তোমায় সুবর্ণের আসনে বসাইয়া হৃদয়ে দোলাইয়া দেশে দেশে দেখাইতাম। ইউরোপে, আমেরিকে, মিশরে, চীনে দেখিত, তুমি আমার কি উজ্জ্বল মণি!'

দেশপ্রেমের আবেগ-মথিত হৃদয়ে কমলাকান্ত এখানে কবি-কমলাকান্ত! সেই আবেগ সুখও বটে, দুঃখও বটে। কমলাকান্তের নিজের কথায়—

'সুখ দ্বিবিধ, সম্পূর্ণ এবং অসম্পূর্ণ। অসম্পূর্ণ সুখ যথা,
'মণি নও মাণিক নও যে হার ক'রে গলায় পরি'
পরে সম্পূর্ণ সুখ,

'আমায় নারী না করিত বিধি
তোমা হেন গুণনিধি,
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।'

সম্পূর্ণ অসহ্য সুখের লক্ষণ, শারীরিক চাঞ্চল্য, মানসিক অস্থৈর্য। এ সুখ কোথায় রাখিব: লইয়া কি করিব, আমি কোথায় যাইব, এ সুখের ভার লইয়া কোথায় ফেলিব?'

এইভাবে সুখের তীব্র অস্থিরতার কথা ব্যাখ্যা ক'রে, তিনি অতঃপর দুঃখাবেগের কথা বলেন। সেখানেও তাঁর ইতিহাস-অনুধ্যানের চিহ্ন দেখা যায়: 'সুখের কথায় বাঙালীর অধিকার নাই—কিন্তু দুঃখের কথায় আছে।' সেই সুখ-দুঃখের কথাতেই তাঁর মনে লাগে গানের দোলা:

'তোমায় যখন পড়ে মনে
আমি চাই বৃন্দাবন পানে
আলুইলে কেশ নাহি বাঁধি।'

—এবং দেশপ্রেমের সঙ্গে, ভক্ত বৈষ্ণব মনের এই গভীর বেদনা-ঘটিত অন্বয়ানুভূতি প্রকাশ ক'রে, আবার তিনি ইতিহাসের প্রসঙ্গে ফিরেছেন:

'আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে—নিদর্শন কই? দেবপালদেব, লক্ষ্মণসেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ,—প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? সে গৌড়

> কই ?…আর্য রাজধানীর চিহ্ন কই ? আর্যের ইতিহাস কই ? জীবন-চরিত কই ? কীর্তি কই ? কীর্তিস্তম্ভ কই ? সমরক্ষেত্র কই ?…
>
> 'চাহিবার এক শ্মশানভূমি আছে,—নবদ্বীপ। সেইখানে সপ্তদশ যবনে বাঙ্গালা জয় করিয়াছিল। বঙ্গমাতাকে মনে পড়িলে, আমি সেই শ্মশান-ভূমি প্রতি চাই।…মনে মনে দেখিতে পাই, মার্জিত বর্শাফলক উন্নত করিয়া, অশ্বপদশব্দমাত্রে নৈশ নীরবতা বিঘ্নিত করিয়া, যবনসেনা নবদ্বীপে আসিতেছে। কাল পূর্ণ দেখিয়া নবদ্বীপ হইতে বাঙ্গালার লক্ষ্মী অন্তর্হিত হইতেছেন।…'

বই হিসেবে 'কমলাকান্তের' প্রথম প্রকাশের তারিখ থেকে ধ'রলে দেখা যায়—তার ছ'বছর আগে বঙ্কিমের তৃতীয় উপন্যাস 'মৃণালিনী' [১৮৬৯] বেরিয়ে গেছে। 'মৃণালিনী'র প্রথম পরিচ্ছেদেই প্রয়াগতীর্থে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গমে হেমচন্দ্র দেখা দিয়েছেন মাধবাচার্যের কুটীরে। মাধবাচার্য আগেই দিল্লীর খবর শুনেছিলেন। বখ্‌তিয়ার খিলিজিকে হাতিতে মারতো, কিন্তু হেমচন্দ্র সেই হাতিকে মেরে বখ্‌তিয়ারকে বাঁচিয়েছেন! কিন্তু কেন? প্রশ্নের উত্তরে মগধরাজপুত্র হেমচন্দ্র বলেন: 'তাহাকে স্বহস্তে যুদ্ধে মারিব বলিয়া। সে আমার পিতৃশত্রু, আমার পিতার রাজ্যচোর। আমারই সে বধ্য।' মাধবাচার্য গণনার ফলে জেনেছেন—'যবনসাম্রাজ্য-ধ্বংস বঙ্গরাজ্য হইতে আরম্ভ হইবে।' আর, সেই 'মৃণালিনীর' তৃতীয় পরিচ্ছেদে গিরিজায়া এসে গান শুনিয়ে গেছে—'যমুনার জলে মোর, কি নিধি মিলিল'।

'কমলাকান্তের' আগেই—ইতিহাস-বীক্ষা, স্বদেশপ্রেম, আর বৈষ্ণব গান—এক সূত্রে এই তিন তত্ত্ব গেঁথে তোলবার এই মানসিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হয়। 'মৃণালিনী'র আগে 'দুর্গেশনন্দিনী'র তৃতীয় পরিচ্ছেদে 'মোগল পাঠান' শিরোনামে বখ্‌তিয়ার খিলিজির আমল থেকে শুরু ক'রে, পাঠান রাজত্ব-কালের বিনাশ উল্লেখের পর, মোগল বাদশাহ আকবরের আমল পর্যন্ত সংক্ষিপ্ত ইতিহাস পরিবেশিত হয়। কাজে-কাজেই, 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' লিখতে ব'সে, এদেশের ইতিহাস-শূন্যতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে মন্তব্য ক'রে-ছিলেন, তাঁর সে-দৃষ্টি হঠাৎ দেখা দেয়নি। বঙ্কিম-মানসের বিশ্লেষণে যে স্থায়ী উপাদানগুলি চোখে পড়ে,—ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহ সেই সব মূল প্রবণতার সঙ্গেই জড়িত। কবি নবীনচন্দ্র সেন ছিলেন তাঁর স্নেহাস্পদ ব্যক্তি। যে বছর 'কমলাকান্ত' প্রথম বই হ'য়ে বেরোয়, সেই ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নবীনচন্দ্র

চট্টগ্রাম কমিশনারের 'পার্সোন্যাল অ্যাসিস্ট্যাণ্ট' হন—এবং এই পদে অধিষ্ঠিত হবার পরেই তাঁর 'পলাশির যুদ্ধ' প্রকাশিত হয়। দেশে তখন জাতীয় ভাবের প্রবল প্রাচুর্য দেখা দিয়েছে। 'পলাশির যুদ্ধে'র কথা-প্রসঙ্গে নবীনচন্দ্র নিজে ব'লে গেছেন—'তাহাতে দেশব্যাপী যেরূপ আন্দোলন উঠে, এবং যেরূপ আগ্রহের সহিত প্রকাশ হইবামাত্র উহা 'ন্যাসন্যাল' রঙ্গভূমিতে অভিনীত হইতে আরম্ভ হয়, তাহা কেবল আমার আশাতীত নহে, স্বপ্নাতীত।' সেই স্বীকৃতিতে উৎসাহিত হ'য়ে তিনি 'রঙ্গমতী' রচনা শুরু করেন। বঙ্কিমচন্দ্রকে নবীনচন্দ্র তাঁর সে-কাব্য উপহার দেবার সংকল্প জানিয়ে অনুমতি চেয়েছিলেন। বঙ্কিম তাঁকে 'নাতি' সম্বোধনে চিঠি লিখে সম্মতি দেন। তাঁর মনে যে একসময়ে ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখবার বাসনা দেখা দিয়েছিল, সেই চিঠিতেই তার নজির আছে।[৩৬] 'কমলাকান্ত' প্রকাশিত হবার পরে তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধ' প্রথম ভাগে [১৮৮৭] 'আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প,' 'বাঙ্গালীর বাহুবল', 'ভারত কলঙ্ক', 'ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা', 'প্রাচীন ভারতবর্ষের

৩৬। 'আমার জীবন', তৃতীয় ভাগ, পৃষ্ঠা ২২৯-২৩০ দ্রষ্টব্য। এই চিঠিতে বন্ধনী-চিহ্নের মধ্যে ব্যবহৃত বাংলা অংশগুলি নবীনচন্দ্রের :

Chinsurah
July 15/80

My dear Nati

I have read through your delightful poem,-and I was detaining it for the purpose of giving it a second perusal. As, however, the publication is being delayed, the second perusal may stand over till it is the property of the public.

The dedication of it would be an honour which I certainly have done nothing to deserve. But as undeserved honours are the order of the day, I do not see why I should scruple to receive my share. So fire away and glorify grandeur to your heart's content.

I am afraid that History (ভারতবর্ষের ইতিহাস লেখা এক সময়ে তাঁহার আকাঙ্ক্ষা ছিল) is not likely to make much progress. I have however, got through a few chapters (সেগুলি কি হইল) ?·· and also through a novel (আনন্দমঠ)—so to call it—but I have not the slightest idea when the latter will be ready for publication.

Trusting this will find you all serene,

I remain,
yours affectionately,
sd/Bankim Ch. Chatterjee.

রাজনীতি' প্রভৃতি প্রবন্ধে [প্রথমটি আগেই ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'বিবিধ সমালোচন' বইয়ে ছাপা হয়, পরের চারটি লেখাই ১৮০৯ তে প্রকাশিত 'প্রবন্ধ পুস্তকে'র অন্তর্ভুক্ত হয়] তাঁর ইতিহাস-চিন্তার উদাহরণ আছে। কিন্তু এ-লেখাগুলির প্রকৃতি অন্য রকম। এরা তাঁর লঘু-প্রবন্ধের নমুনা নয়। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'বিবিধ প্রবন্ধ দ্বিতীয় ভাগে'—'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে তিনি জন স্টুয়ার্ট মিলের 'জীবনচরিত সমালোচনার ভগ্নাংশ' পরিবেষণ করেন। একসঙ্গে 'বিবিধ প্রবন্ধ'—প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগের প্রবন্ধগুলির শ্রেণীবিভাগ ক'রতে গিয়ে হীরেন্দ্রনাথ দত্ত দেখিয়েছেন যে, সেই দু'খণ্ডে 'ইতিহাস ও অর্থনীতি' সম্পর্কে মোট প্রবন্ধের সংখ্যা দশ। বাঙালীর উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁর প্রবন্ধমালা ১২৮৭ সালের পৌষ থেকে ১২৮৮ সালের জ্যৈষ্ঠ পর্যন্ত ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। সে-সব লেখার সুর গম্ভীর, দৃষ্টি যুক্তিনিষ্ঠ।

তুলনা ক'রতে হ'লে 'বিজ্ঞানরহস্য'কে অনেকটা 'বিবিধ প্রবন্ধের' ভঙ্গির সাদৃশ্যবাহী বলা চলে। ১২৭৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকেই 'বঙ্গদর্শনে' 'বিজ্ঞানরহস্য' শুরু হয়। আর ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায়,— এবং ১২৮২-র কার্তিক সংখ্যায় পর পর তিনটি প্রস্তাবে তাঁর 'সাম্য' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদেশের কৃষক' পর্যায়ের লেখাগুলির কিছু অংশ নিয়ে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সাম্য' বই হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। অর্থাৎ ১৮৭২ থেকে ১৮৮৯ পর্যন্ত যে 'যুদ্ধ-পর্বের' বিস্তার ধরা হ'য়েছে, 'বিজ্ঞানরহস্য' এবং 'সাম্য'ও সে-পর্বেরই অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবন-চরিত' যে শ্রেণীর রচনা, অন্য লেখাগুলিকে সে-শ্রেণীতে ধরা যায়না। রচনা-কালের ঐক্য মনে রাখলে, এগুলির প্রত্যেকটিতে পারস্পারিক নৈকট্যের কেবল এই লক্ষণ ধরা পড়ে যে, এই সব লেখাতে তিনি দেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, দর্শন, ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প, বিজ্ঞান ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ে সতর্ক এবং ব্যাকুল অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন। প্রথম তিনখানি বইয়ের এই অনুশীলনের সঙ্গে সরসতার যতোটা যোগ ঘ'টেছিল, অন্যগুলিতে ঠিক সে-রকম নয়,—বা ততোটা নয়। ১২৮৮ সালের ভাদ্র [১৮৮১]-সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'রামধন পোদ' কিন্তু কমলাকান্ত এবং মুচিরাম-এরই স্মারক! তবে, মুচিরাম গুড় সম্পর্কিত লেখাটির সঙ্গেও 'রামধন পোদ'-এর ভঙ্গি ঠিক পুরোপুরি মেলেনা। কারণ, 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত',—সমস্ত লেখাটির মধ্যেই

পরিহাস আর বিদ্রূপের ভাব অনুস্যূত হ'য়ে আছে। 'রামধন পোদ' অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্তই শুধু নয়, সেখানে 'বাঙ্গালীর বাহুবল'-এরই যেন রেশ বেজেছে! ১৮৭৬ খ্রীস্টাব্দের 'প্রবন্ধ পুস্তকে' 'বাঙ্গালীর বাহুবল' প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয়, সে-কথা আগেই বলা হ'য়েছে। সেখানে 'বাহুবল'-এর এই ব্যাখ্যা দেওয়া হ'য়েছিল যে —'শারীরিক বল বাহুবল নহে।...উদ্যম, ঐক্য, সাহস এবং অধ্যবসায়, এই চারিটি একত্রিত করিয়া শারীরিক বল ব্যবহার করার যে ফল, তাহাই বাহুবল।'—এই চার শক্তির অভাবে বাঙালী দীন, তবে,—'সামাজিক গতির বলে এ চারিটি বাঙ্গালীচরিত্রে সমবেত হওয়ার অসম্ভাবনা কিছুই নাই।' এ সবই গম্ভীর বিশ্লেষণ। অনেকদিন পরে লেখা তাঁর 'রামধন পোদ'-এ এই বিশ্লেষণের সূত্র ধ'রেই তিনি যেন কথা আরম্ভ ক'রেছিলেন। বাংলার লোক-সংখ্যার আধিক্য এবং খাদ্যের অপ্রাচুর্য সম্বন্ধে আলোচনা উত্থাপন ক'রে, তিনি 'মাল্‌থসি বুলি'র উল্লেখ করতেও ভোলেন নি। তারপর,—শুধু ভাতে যে মানুষের জীবনমাত্র রক্ষা করা সম্ভব, তার বেশি নয়,—এবং মাংস না হোক্,—দুধ, ঘি, ময়দা, ডাল, ছোলা ইত্যাদি বেশি পরিমাণে না খেলে বাঙালীর স্বাস্থ্যের উন্নতি যে সুদূরপরাহত,—রামধন পোদ-কে লেখক সেই কথা বোঝাবার চেষ্টা ক'রে গেছেন! রামধনের পেটে আহার জোটেনা, কিন্তু তার চারটি ছেলে, তিনটি মেয়ে, দুই পুত্রবধু, দুটি নাত্‌নী, এক নাতি। পরিবার-পরিকল্পনার কথা রামধন শুনতে বিমুখ। সে জানে বিধাতাই তার পরিবার বাড়িয়েছেন!

বাঙালীর এই দুরবস্থার প্রসঙ্গই সে-রচনার আসল কথা। রামধনের ঢেঁকিশাল থেকে সমালোচক দেখেছেন উঠোনে রামধনের জীর্ণ কুকুর, রোমশূন্য গৃহমার্জার! এইসব উল্লেখ দেখে, কমলাকান্তের দ্বিতীয় পত্রের পূর্বালোচিত 'পলিটিক্‌স্' প্রসঙ্গ মনে পড়া স্বাভাবিক। সেখানে ছিল কলুর বাড়ির উঠোন, —এখানে নিরন্ন পোদ-পরিবারের উঠোন। সেখানেও কুকুর ছিল, এখানেও এক কুকুরের উল্লেখ দেখা গেল। গরিব বাঙালী সংসারের সাধারণ দৈন্যের ছবি এ দুটি। সেদিক থেকে মিল ঘ'টে থাকা স্বাভাবিক। তবে, এখানকার ভঙ্গিই অন্যরকম। কমলাকান্তের দ্বিতীয় পত্রে পলিটিক্‌সের দুই শ্রেণী—বৃষজাতীয় আর কুকুরজাতীয়,—সেই দুটি শ্রেণী দেখিয়ে দেওয়াই কমলাকান্তের লক্ষ্য ছিল। রামধনের কথা কিন্তু আর-এক সিদ্ধান্তে গিয়ে পৌঁছেচে। দু'ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত আছে বটে, কিন্তু দুটিকে ঠিক এক জাতের সিদ্ধান্তমুখী রচনা বলা যায় না। কমলাকান্তের প্রতিটি সিদ্ধান্তে মিশে আছে

সরসতা, বিস্ময়, বিদ্রূপ! লোকরহস্যেও তাই, মুচিরাম গুড়েও তাই। রামধনের শেষ কথায় কিন্তু গম্ভীর উপদেশের সঙ্গে তীব্রতর কিঞ্চিৎ তিরস্কারের সুর মিশেছে। লেখক জানিয়েছেন:

> 'ছেলে থাকিলেই তাহার বিবাহ দিতেই হইবে, মনুষ্যমাত্রকেই বিবাহ করিতে হইবে, আর বাপ মার প্রধান কার্য—শৈশবে ছেলের বিবাহ দেওয়া—এরূপ ভয়ানক ভ্রম যে-দেশে সর্ব্বব্যাপী, সে-দেশের মঙ্গল কোথায়? যে-দেশে বাপ মা, ছে'লে সাঁতার শিখিতে না শিখিতে বধূরূপ পাতর গলায় বাঁধিয়া দিয়া ছেলেকে এই দুস্তর সংসারসমুদ্রে ফেলিয়া দেয়, সে দেশের উন্নতি হইবে?'

নানা কারণে, বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু-প্রবন্ধের আলোচনায় এগিয়ে যেতে যেতে তাঁর কয়েকটি গুরু-প্রবন্ধের কথা উঠলো। কতকটা রচনাকালের দিক থেকে, কতকটা আবার বিষয়-সাদৃশ্য-বশেও এই মিশ্রণ অপরিহার্য। সতর্ক বিশ্লেষণে নির্ভর ক'রলে, তাঁর লঘু-প্রবন্ধ ব'লতে বোঝাবে প্রধানতঃ তাঁর তিনখানি বই—লোকরহস্য, কমলাকান্ত, আর মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত। প্রথম দু'খানির কথা এতক্ষণ বিস্তৃতভাবে বলা গেছে। এইবার মুচিরামের কথা।

কৈবর্ত ব্রাহ্মণ সাফলরাম গুড় ছিলেন মোনাপাড়ার বাসিন্দা। কমলাকান্তী ঢঙে সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে, তাঁর সম্বন্ধে বলা হ'য়েছে—'যেমন এক চন্দ্র রজনী আলোকময়ী করেন, যেমন এক সূর্য্যই দিনমণি, যেমন এক বার্তাকুদগ্ধ গুড় মহাশয়ের অন্নরাশির উপর শোভা করিতেন, তেমনি সাফলরাম এক ব্রাহ্মণ মোহনপল্লী [অর্থাৎ মোনাপাড়া] উজ্জ্বল করিতেন।'

মুচিরামের মায়ের নাম যশোদা। তিনিই 'মুচিরাম' নাম রেখেছিলেন। 'দুষ্ট লোকে বলিত যে, যশোদা দেবীর যৌবনকালে কোন কালো-কোলো কোঁকড়াচুল নধরশরীর মুচিরাম দাস নামা কৈবর্তপুত্র তাঁহার নয়নপথের পথিক হইয়াছিল, সেই অবধি মুচিরাম নামটি যশোদার কানে মিষ্ট লাগিত।' দিনে দিনে শিশু মুচিরামের অতি দুরন্ত প্রকৃতি দেখা দেয়—'তিন বৎসর যাইতে না যাইতেই গুরু ভোজনে দোষ উপস্থিত হইল এবং পাঁচ বৎসর যাইতে না যাইতেই মহামতি মুচিরাম মাকে পিতৃ উচ্চারণ করিতে এবং বাপকে শালা বলিতে শিখিলেন। যশোদা কাঁদিয়া বলিতেন, এমন গুণের ছেলে বাঁচলে

হয়।' শুড় বংশে তিন পুরুষের মধ্যে কোনো পাঁচ বছরের শিশুর হাতেখড়ি হয় নি। তাই যশোদা যখন ছেলের হাতেখড়ির প্রস্তাব শোনান, সাফলরাম তখন বিচলিত বোধ করেন! কিন্তু গৃহিণীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সাফলরামের কোনো গতি না থাকায় উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বেরুতে হয়। এদিকে,—'তিন ক্রোশের মধ্যে পাঠশালা বা গুরু মহাশয় নাই।' বঙ্কিম তাঁর পূর্বাভ্যস্ত লোকরহস্য-কমলাকান্তী রীতিতেই ব'লেছেন—'অগত্যা মুচিরাম অন্যান্য বিদ্যা অভ্যাসে সাহুরাগ হইলেন। অন্যান্য বিদ্যার মধ্যে—'পরা অপরা চ'—গাছে ওঠা, জলে ডোবা, এবং সন্দেশ চুরি।...কৈবর্তের ছেলেদের সঙ্গে মুচিরামের প্রত্যহ একটি নূতন কোন্দল হইত—শুনা গিয়াছে, কৈবর্তদিগের ঘরেও খাবার চুরি হইত।' মুচিরামের বয়স যখন ন'বছর, তখন তার উপনয়ন হয়। তার এক বছর পরে ওলাউঠা রোগে সাফলরামের মৃত্যু ঘটে। এইখানেই জীবন-চরিতের প্রথম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদটি আরো সংক্ষিপ্ত। কৈবর্তেরা গ্রামে আর-এক ঘর ব্রাহ্মণ এনেছে। সুকণ্ঠ মুচিরাম অতঃপর গ্রামে হারান অধিকারীর যাত্রা শুনে, যাত্রার গান গেয়ে বেড়াতে থাকে। তার সেই গান শুনে অধিকারী তাঁর আয়-বৃদ্ধির সম্ভাবনার কথা ভেবেছেন। এই সূত্রে আবার কিঞ্চিৎ কমলাকান্তী মন্তব্য দেখা দিয়েছে:

> 'অধিকারী মহাশয়ের নিকট গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। সে দোষে অধিকারী মহাশয় একা দোষী নহেন—জিজ্ঞাসা করিলে অনেক উকিল মহাশয়েরা ইহার কিছু নিগূঢ় তত্ত্ব বলিয়া দিতে পারিবেন। তাঁহাদের কাছেও গলার আওয়াজ টাকার আওয়াজে পরিণত হয়। উকিলবাবুদেরই বা দোষ কি—*Glorious British Constitution*! হায়! গলাবাজি সার!'

'ব্রিটিশ কন্‌স্টিটিউশ্যন' সম্বন্ধে এই তির্যক কটাক্ষের পরেই পুনরপি বলা হ'য়েছে:

> 'অধিকারী মহাশয়—মানুষের সঙ্গে প্রেম করেন না—ব্রিটিশ পার্লিয়ামেণ্টের মত এবঞ্চ কুরঙ্গিণীসদৃশ, মনুষ্যকণ্ঠেই মুগ্ধ—অতএব তিনি হাত নাড়িয়া মুচিরামকে ডাকিলেন।'

মুচিরাম হারান অধিকারীর যাত্রার দলে ঢুকতে রাজী হ'য়ে যায়। অধিকারী এ-বিষয়ে মুচিরামের মায়ের সঙ্গে আলাপ ক'রে নেওয়াই

সুবিবেচনা মনে করে। যশোদা প্রথমে বাধা দেয়, কিন্তু সংসারের অভাবের কথা ভেবে তাকেও রাজী হ'তে হয়।—'অগত্যা পাঁচটাকা মাসিক বেতন রফা করিয়া যশোদা মুচিরামকে হারান অধিকারীর হস্তে সমর্পণ করিল। তারপর আছাড়িয়া পড়িয়া স্বামীর জন্য কাঁদিতে লাগিল।' এইখানেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে, যাত্রাভিনয়-বিদ্যায় স্থূলবুদ্ধি বালক মুচিরামের নানা অসামর্থ্যের কথা-প্রসঙ্গে কিছু স্থূল পরিহাস পরিবেশিত হ'য়েছে, যেমন—

> পিছন হইতে বলিয়া দিতেছে—"নীরদকুন্তলা—লোচনচঞ্চলা দধতি সুন্দর রূপং।"
>
> 'নীরদকুন্তলা—' থামিল—আবার পিছন হইতে বলিল, 'লোচন-চঞ্চলা'—মুচিরাম ভাবিয়া চিন্তিয়া গায়িল, 'লুচি চিনি ছোলা।' পিছন হইতে বলিয়া দিল, 'দধতি সুন্দররূপং'—মুচিরাম না বুঝিয়া গাহিল, 'দধিতে সন্দেশ রূপং'।'

ততোধিক ভুল ঘ'টেছিল আর একদিন। সেদিন কৃষ্ণের ভূমিকায় তার বলা উচিত ছিল 'মানময়ি রাধে, একবার বদন তুলে কথা কও'। কিন্তু তখন বেহালাওয়ালা মৃদঙ্গীর হাতে তামাকের কল্কে দিয়ে ব'লেছে 'গুড়ক খাও'। সেই শুনে মুচিরাম ব'লে ফেলেছিল—'রাধে, একবার বদন তুলে গুড়ক খাও'!

সেই দুর্ঘটনার পরেই অধিকারী 'একগাছা বাঁক সাপটিয়া ধরিয়া, মুচিরামের দিকে ধাবিত হওয়ায়, প্রহারের ভয়ে মুচিরাম পলায়ন করে। পরদিন যাত্রার দল সে-গ্রাম ছেড়ে অন্যত্র চ'লে যায়। মুচিরাম প'ড়ে থাকে। তারপর ভয়ে নৈরাশ্যে ভেঙে পড়ে সে। সেই সময়ে তার মনে হয়—'আমি কেন পালাইলাম! আমি কেন দাঁড়াইয়া মার খাইলাম না!'

সেই খেদোক্তির সূত্র ধ'রে স্বদেশ-প্রেমিক, ইতিহাস-সচেতন বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন :

> 'গ্রন্থকার ভণে, এবার যখন বাঁক উঠিতে দেখিবে, পিঠ পাতিয়া দিও। তোমার গোষ্ঠীর বাপচৌদ্দপুরুষ বুড়ো সেনরাজার আমল হইতে কেবল পিঠ পাতিয়া দিয়াই আসিতেছে। তুমি পালাইবে কোথায়? এ সুসভ্য জগতের অধিকারীরা মুচিরাম দেখিলে বাঁক পেটাই করিয়া থাকে—মুচিরামেরা পিঠ পাতিয়াই দেয়। কেহ পলায় না—রাখাল ছাড়া কি গরু থাকিতে পারে? ঘাস জলের প্রয়োজন

হইলেই, তোমার যখন রাখাল ভিন্ন উপায় নাই, তখন পাঁচন বাড়িকে প্রাতঃপ্রণাম করিয়া গোজন্ম সার্থক কর।'

মনে পড়ে, 'কমলাকান্তের বর্ষ-সমালোচনা—'আপনার ও আমার পঁচাস্তরেও ঘাস-জল, ছিয়াত্তরেও ঘাস-জল'! সে-উদ্ধৃতি আগেই দেওয়া হ'য়েছে। আরো একটি কথা—মুচিরামের গল্প ব'লতে-ব'লতে হঠাৎ এই যে উচ্ছ্বাসচিহ্নিত স্বগতোক্তি প্রয়োগের উদাহরণ দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের এ-রীতি অন্যত্রও দেখা গেছে। 'দেবীচৌধুরাণী'র তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে সন্ন্যাসিনী দেবীচৌধুরাণীর ঋণ পরিশোধ করবার বদলে, ব্রজেশ্বরের কাছে দেবীর ঠিকানা জেনে নিয়ে, হরবল্লভ গিয়েছিলেন রংপুরের কালেক্টার সাহেবের কাছে। পাঁচশ' সৈন্য নিয়ে লেফটেনান্ট ব্রেনান তখন দেবীকে ধ'রতে যান। কোম্পানির পক্ষে আয়োজনের সমারোহ ছিল। তাঁরা জানতেন দেবীর দলে দেবীর আজ্ঞাধীন বরকন্দাজ-বাহিনী আছে। বরকন্দাজদের লাঠির আক্রমণে কোম্পানির সৈন্য অনেক সময়ে ঘায়েল হোতো। মুচিরামের তৃতীয় পরিচ্ছেদে যেমন সেন-রাজবংশের পতনের কথা উঠেছে,—দেবীচৌধুরাণীর সেই অংশে এই লাঠির প্রসঙ্গ দেখা দিতেই অনুরূপভাবে,—কিংবা আরো একটু বেশি উচ্ছ্বাসের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্র ব'লেছিলেন :

> 'হায় লাঠি! তোমার দিন গিয়াছে। তুমি ছার বংশের বংশ বটে, কিন্তু শিক্ষিত হস্তে পড়িলে তুমি না পারিতে এমন কাজ নাই। তুমি কত তরবারি দুই টুকরা করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছ, কত ঢাল খাঁড়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিয়াছ—হায়।' বন্দুক আর সঙ্গীন তোমার প্রহারে যোদ্ধার হাত হইতে খসিয়া পড়িয়াছে।…তুমি তখনকার পীনাল কোড ছিলে—তুমি পীনাল কোডের মত দুষ্টের দমন করিতে, পীনাল কোডের মত শিষ্টেরও দমন করিতে এবং পীনাল কোডের মত রামের অপরাধে শ্যামের মাথা ভাঙ্গিতে। তবে পীনাল কোডের উপর তোমার এই সর্দারি:ছিল যে, তোমার উপর আপীল চলিত না।…'

এও নিঃসন্দেহে কমলাকান্তী ভাবোচ্ছ্বাস,—কমলাকান্তী স্মৃতিসুখ,—কমলা-কান্তী দর্শনচিন্তা!

বাংলার,—তথা ভারতবর্ষের সুখ-দুঃখের ভাবনা বঙ্কিম-মানসের এক স্থায়ী আবেগে পর্যবসিত হ'য়েছিল। নিপীড়িতজনের দুঃখ মোচনের উৎসাহ,

বীরের স্বীকৃতি, আত্মবিস্মৃত জাতির পুনরুদ্ধার-বাসনা তাঁর রচনাবলীর মধ্যে ইতস্ততঃ এইভাবে বার বার দেখা দিয়ে গেছে। দীনবন্ধু মিত্রের সঙ্গে তাঁর অকৃত্রিম বন্ধুত্বের প্রসঙ্গ এই সূত্রে সহজেই মনে আসে। মনে পড়ে, দীনবন্ধু তাঁর 'নীলদর্পণ' উৎসর্গ ক'রেছিলেন তাঁরই নামে; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'আনন্দমঠ' উপহার দেন সেই দীন-জন-বন্ধু দীনবন্ধুকেই! ভারতবর্ষের ঐতিহ্যের গৌরব তিনি তাঁর সারা জীবনের অজস্র রচনায় মনে মনে লালন ক'রে গেছেন। মুচিরামের প্রথম অনুচ্ছেদে তাঁর ইতিহাস-চিন্তায় যে উদাহরণ আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে,—'মৃণালিনী'র সঙ্গে সেই সূত্রে যে সাদৃশ্য দেখা গেছে,—সে-রকম ব্যাপার তাঁর আরো অনেক উপন্যাসের অন্যতম আনুসঙ্গিক অঙ্গ। তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সেই যুদ্ধ-পর্বেই দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী লিখেছিলেন তিনি। দীনবন্ধুর অভিজ্ঞতার বিস্তার,—তাঁর ক্রোধশূন্যতা,—পরদুঃখকাতরতা,—তাঁর নিরহঙ্কার ব্যবহার,—পরিহাসে তাঁর সিদ্ধি ইত্যাদি নানা গুণের কথা তিনি ব'লে গেছেন। সেই লেখাতেই—তখন থেকে সাতাশ বছর আগে পড়া দীনবন্ধুর 'মানব-চরিত্র' কবিতার উল্লেখ আছে। দীনবন্ধুর একটি কবিতার যে দু'ছত্র তিনি সেই লেখাতে তুলে দেখিয়েছিলেন, সেই দুটি লাইন উদ্ধৃত হওয়া দরকার:

যে দোষে সরস হয় সে জনে সরস।
সে দোষে বিরস হয় সে জনে বিরস॥

এই সরসতা-বিরসতার ভেদ মনে রাখলে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের লঘু-প্রবন্ধের সরসতার স্বরূপ বুঝতে সুবিধা হয়। মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিতে বাঙালী স্বভাবের সেই দোষ-প্রদর্শন-সংশ্লিষ্ট সরসতা দেখা দিয়েছিল। আবার ১২৮১ সালের মাঘ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' 'প্রাপ্ত গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত সমালোচনা'সম্পর্কে সম্পাদকীয় উক্তিতে—খুবই স্বল্প আয়তনের সেই লেখাটিতে—সেই রকম সরসতাই দেখা দিয়েছিল। অসার বাংলা বইয়ের তৎকালীন অতি-প্রাচুর্য সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন:

> 'আজিকালি বাঙ্গালা ছাপাখানা ছারপোকার সঙ্গে তুলনীয় হইয়াছে; উভয়ের অপত্যবৃদ্ধির সীমা নাই, এবং উভয়েরই সন্তান-সন্ততি কদর্য এবং ঘৃণাজনক। যেখানে ছারপোকার দৌরাত্ম্য সেখানে কেহ ছারপোকা মারিয়া নিঃশেষ করিতে পারে না; আর যেখানে বাঙ্গালা গ্রন্থ সমালোচনার জন্য প্রাপ্ত হইয়া থাকি, তাহা

সকল পাঠান্তর। সমালোচনা করা যায়, এত অবকাশ নিষ্কর্মা লোকের থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গদর্শনলেখকদিগের কাহারও নাই।'

এই ব'লে তিনি ঘোষণা করেন যে, অতঃপর 'বৃত্রসংহার' বা 'কল্পতরু' বা ঐ শ্রেণীর বই ছাড়া অন্যান্য বইয়ের সমালোচনা আর বঙ্গদর্শনে প্রকাশ করা হবে না!

মুচিরাম-এর তৃতীয় পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদ সম্বন্ধে আলোচনা শুরু ক'রে, এখানে বঙ্কিম-রচনাবলীর বিস্তৃততর ক্ষেত্রে এই দ্রুত পরিক্রমার উদ্দেশ্য—কেবল এইটুকু দেখিয়ে দেওয়া যে, লোকরহস্য, কমলাকান্ত এবং মুচিরাম ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রেও কমলাকান্তী রীতির অভিব্যক্তি বিরল নয়।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে, ঈশানবাবু নামে একশ টাকা মাইনের এক সৎকুলোদ্ভব কায়স্থের কথা আছে। যাত্রার দলের সঙ্গে যাত্রা ক'রতে এসে, মুচিরাম যে-গ্রামে অধিকারীর প্রহারের ভয়ে দলছাড়া হ'য়ে পড়েছিল, ঈশানবাবুর গ্রাম সেটি। তিনি ছুটিতে বেড়াতে এসেছিলেন। তিনি মুচিরামকে আশ্রয় দিয়ে, নিজের কর্মস্থলে নিয়ে যান এবং পাঠশালায় ভর্তি করে দেন। অনেক চেষ্টা ক'রেও মুচিরামের মায়ের ঠিকানা পাননি তিনি। ইতিমধ্যে মুচিরামের মা ছেলের কোনো সন্ধান না পেয়ে, আহার-নিদ্রা ত্যাগ ক'রে, রোগে জীর্ণ হ'য়ে দেহত্যাগ করে। ঈশানবাবুর পরিচয় দিতে গিয়ে, আবার বাঙালী-স্বভাবের সমালোচনা ব্যক্ত হ'য়েছে। 'ঈশানবাবু অতি ক্ষুদ্র লোক—কেন না, বেতন এক শত টাকা মাত্র—কোন জেলার ফৌজদারী আপিসের হেড কেরাণী। বাঙ্গালাদেশে মনুষ্যত্ব বেতনের ওজনে নির্ণীত হয়—কে কত বড় বাঁদর, তার লেজ মাপিয়া ঠিক করিতে হয়।'

পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—পাঠশালায় মুচিরামের হাতের লেখা খুব ভাল হ'য়েছে। তারপর সে ইস্কুলে ভর্তি হ'য়েছে। কিন্তু বেশি বয়সে ইস্কুলে ভর্তি হওয়ার জন্যে তার লেখাপড়া আর এগোয়নি। ঈশানবাবু তাকে দশ টাকার মুহুরিগিরিতে বহাল ক'রে, নিজে কাজ থেকে অবসর নিয়ে, মুচিরামের আলাদা বাসস্থান ঠিক ক'রে দিয়ে গ্রামে ফিরে গেছেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষ সেখানেই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে ঈশানবাবু অন্তর্হিত হওয়ায় অভিভাবকহীন মুচিরামের—'পোয়া বারো—মুচিরাম জেলা লুঠিতে লাগিল!' অসদুপায়ে টাকা উপায়ের পথ মুহুরির কাজে সুপ্রশস্ত। মুচিরাম সে-পথ সমুচিত ভাবেই ব্যবহার ক'রে

গেছে ! এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষ্ণুশর্মা'র নাম ক'রেছিলেন। বিষ্ণুশর্মা বিদ্যা এবং অর্থের চিন্তা ক'রতে ব'লে গেছেন। কিন্তু একজন মাত্র মানুষ একই সঙ্গে এই দুই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন না। তাই মুচিরাম প্রাণ পণ ক'রে টাকা উপার্জ্জনে মন দেন। বঙ্কিম লিখে গেছেন :

> 'বিষ্ণুশর্মা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেল্লি—চাণক্য ভারতবর্ষের রোশফুকল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, তাহাদিগের উচিত, আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা। তাহাদের শিক্ষা হয় নাই।'

সরল গঙ্গারাম সাহেবকে [Grongerham নামের বাঙালী উচ্চারণ] খুশি ক'রে মুচিরাম 'মীর মুন্সী' পদে উন্নীত হয়। অতঃপর সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, সে নবাগত কালেক্টর হোম-সাহেবকে খুশি ক'রে পেস্কার পদে অধিষ্ঠিত! মিষ্টি কথায় মুচিরামের এই দক্ষতার প্রসঙ্গ ধ'রে, লেখক আবার বাঙালী-স্বভাবের কথা তুলেছেন—'দেশী, বিদেশী, সকল মনুষ্যই এইরূপ। সকলেই মিষ্ট কথার বশ। অবোধ বাঙ্গালীরা আজকাল মিষ্টকথা ভুলিতেছে।'

অষ্টম পরিচ্ছেদে, পেস্কারী পদে অধিষ্ঠিত মুচিরাম, ভজগোবিন্দ চক্রবর্ত্তী নামে বুদ্ধিমান, কর্ম্মঠ এক তাইদনবীশকে নিজের বাসস্থানে জায়গা দিয়ে, নিজের কাজে উপযুক্ত সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করেন। প্রচুর অর্থাগমের ফলে, ভজগোবিন্দের পরামর্শেই বেনামীতে জমি কেনবার সংকল্প জাগে। ভজগোবিন্দের সহোদরা বারো বছরের মেয়ে ভদ্রকালীর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়! তারপর নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায়—বছর-দুয়েক পরে সেই ভদ্রকালীর অনুরোধেই ভজগোবিন্দকে একটি মুহুরির চাকরি ক'রে দিতে হয়। সেই চাকরি পেয়ে, ভজগোবিন্দ মুচিরামের কাজে ঢিলে দেয়। এদিকে হোম-সাহেবের বদলি এবং রীড্-সাহেবের আবির্ভাব ঘটে। রীড্ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। মুচিরাম যে এক 'বৃক্ষভ্রষ্ট বানর',—অচিরেই তিনি তা' ধ'রে ফেলেন! কিন্তু তাকে পদচ্যুত না ক'রে ডেপুটি কালেক্টর পদের জন্যে তার নামে ওপরমহলে সুপারিশ করেন! হোম-সাহেব তখন 'বাঙ্গাল আপিসে সেক্রেটারি' ছিলেন। তিনি রিপোর্ট পেয়েই মুচিরামকে 'ডিপুটি বাহাদুরিতে' নিযুক্ত করেন। মুহুরি থেকে 'মীর মুন্সী',—তা' থেকে পেস্কারি, —এবং পেস্কারি থেকে ডেপুটি কালেক্টার পদ লাভের পরমাশ্চর্য কৃতিত্ব ঘ'টে

যায় পর-পর এই নটি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে! কিন্তু দশম পরিচ্ছেদের আদিতেই দেখা যায়—'মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পেস্কারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার করেন—আড়াই শত-টাকার ডিপুটিগিরিতে তাঁহার কি হইবে?' ভজগোবিন্দ তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করে—ডিপুটিগিরি ত্যাগ ক'রলে রীড্ সাহেব বুঝতে পারবেন যে, ঘুষের লোভেই মুচিরাম পদোন্নয়নে অসন্তুষ্ট! ডেপুটি কালেক্টারের কাজে মুচিরামের অব্যাহত দক্ষতার বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে সেই দশম পরিচ্ছেদে। তার আগেই সে-দক্ষতার রহস্যের ইশারা আছে নবম পরিচ্ছেদের শেষ দিকে—যেখানে লেখক ব'লে গেছেন:

> 'ভারি ঘুষখোরেও ডিপুটি হইলেই ঘুষ খাওয়া ত্যাগ করে; ডিপুটিগিরি এক প্রকারে আমলাদিগের বৈধব্য—বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই। আর মুচিরাম যে মূর্খ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। সেরূপ অনেক ডিপুটি আছে। ডিপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না।'

কমলাকান্তের 'মনুষ্য-ফল' প্রবন্ধটিতে আগেই বলা হ'য়েছিল:

> 'দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইঁহারা উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান।'

রীড-সাহেব আর হোম-সাহেবের হুকুমের কলম দিয়ে মুচিরামের অদৃষ্ট মুচিরামকে 'চালে' তুলে দিয়েছিল! মিষ্টিকথার গুণে, আর, চোখ বুজে ডিক্রি দেবার অভ্যাসে তাঁর খ্যাতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই মিষ্টি-কথার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই লেখক ছুঁয়ে গেছেন। এখানে পুনর্বার সে-কথা ব'লেছেন:

> 'সেই মিষ্টি কথা। একবার তিনি কমিশনার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরম মেজাজে ছিলেন, এতেলা হইবামাত্র বলিলেন, 'নেকাল দেও শালাকো।' বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেইখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, 'বহৎ খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।'

কিন্তু এইসব গুণেই অতঃপর যখন তাঁর চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে বদলির

হুকুম হয়, তখন মুচিরাম চাকরিতে ইস্তফা দেন। দশম পরিচ্ছেদে সেই বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়ে, একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে বলা হ'য়েছে—'স্থূল কথা, মুচিরামের জমিদারির আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ডিপুটিগিরির সামান্য বেতন তাঁহার ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।'

একাদশ থেকে চতুর্দশ অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মুচিরামের কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া, সেখানকার 'প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়' রামচন্দ্র দত্ত—যাঁর 'সোনাবাঁধা হুঁকা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হ্যাণ্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক'—সেই রামচন্দ্রকে মুরুব্বি পাওয়া,—এবং তার ফলে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে উপেক্ষা ক'রে বাবুয়ানিতে যথাসর্বস্ব ব্যয় করা,—তাঁরই নেতৃত্ব মেনে নিয়ে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায়' প্রবেশ এবং সেখানকার বক্তা হ'য়ে ওঠা,—গভর্নমেণ্ট হাউসে ও 'বেলবিডীরে' যাওয়া,—লেফটেনাণ্ট গবর্নরের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বাংলা কৌন্সিলের সদস্যপদ-প্রাপ্তি,—এদিকে রামচন্দ্রের পরিকল্পনা সার্থক ক'রে ঋণগ্রস্ত হ'য়ে রামচন্দ্রের কাছে অর্ধেক মূল্যে তালুক বাঁধা রাখা,—আর চতুর্দশ পরিচ্ছেদে, সেই দুঃসময়ের মধ্যে হঠাৎ ভজগোবিন্দ এসে পড়ায় তারই পরামর্শে চন্দনপুর তালুকে ফিরে, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের দিনেও সেই সম্পন্ন প্রজা-অধ্যুষিত গ্রামে নিজের কন্যার বিবাহের অজুহাতে নজর আদায় ক'রে টাকার সিন্দুক ভ'রে তোলবার বিস্ময়কর ইতিকথা বর্ণিত হ'য়েছে! শুধু তাই নয়, সেই জেলার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট মীনওয়েল সাহেব ঠিক সেই সময়েই, এক অপরাহ্নে অশ্বারোহণে দুর্ভিক্ষের দুরবস্থা দেখতে বেরিয়ে, চন্দনপুরের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মুখের বিকৃত বাংলা প্রশ্ন না বুঝতে পেরে, এক সরল চাষা প্রজা তাঁকে যে জবাব দেয়, যথার্থ ভাষা-জ্ঞানের অভাবে তা থেকে সেই সত্যিকার ন্যায়বান, হিতৈষী, পরিশ্রমী ম্যাজিস্ট্রেট বোঝেন যে, চন্দনপুরের জমিদার মুচিরাম রায় প্রতিদিন তাঁর অনেকগুলি প্রজাকে খাইয়ে থাকেন। তাঁর সুপারিশে ভারত-সরকার বললেন, তথাস্তু।—'গেজেট হইল রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর'!

লেখা শেষ ক'রে লেখক ব'লেছেন: 'তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।'

সামাজিক অসংগতি আর ব্যক্তিজীবনের ত্রুটি দেখিয়ে কমলাকান্তে যেমন পরিহাসের সঙ্গে তীব্র ব্যঙ্গাঘাত ঘ'টতে দেখা গেছে, মুচিরামের এই

বিবরণেও তাই হ'য়েছে। তাঁর এই লঘু প্রবন্ধমালার বস্তুবৈচিত্র্য, সরসতা, আঙ্গিক-কৌশল,—পৌনঃপুনিক ইতিহাস-স্মৃতি, আবেগধর্ম, যুক্তি-তর্ক ইত্যাদি নানা দিকের কথাই বলা হোলো। পৃথকভাবে প্রত্যেক প্রবন্ধের কথা এ-বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ তাতে অযথা বইয়ের কলেবরবৃদ্ধি ঘ'টতো। এইসব লঘু-প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে এই কথাটাই বিশেষ ভাবে ধ্বনিত হ'য়েছে যে, গভীর দুঃখের কথাও সরস ভাবে বলা যায়। 'বসন্তের কোকিল' লেখাটিতে কমলাকান্ত ব'লেছিলেন—'তুই এই পুষ্প-কাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়ে বেড়াস—আমিও এই সংসার-কাননে গৃহে গৃহে আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই।' তিনি ব'লে গেছেন :

'যে সুন্দর তাকেই ডাকি ; যে ভাল তাকেই ডাকি।'

সেই কল্যাণের আদর্শই তাঁর সারা জীবনের আদর্শ। সে ধ্যান কখনো লঘু ভঙ্গিতে ব্যক্ত হ'য়েছে, কখনো বা গুরু ভঙ্গিতে। আবেগ আর প্রেরণার তারতম্য অনুসারেই এই রীতিভেদ। যুদ্ধ-পর্বে দুই রীতিই দেখা গেছে। সেই যুদ্ধ-পর্বেই মধুসূদনের মৃত্যুতে,—তাঁর মনে যে প্রগাঢ় আবেগ দেখা দিয়েছিল, তাতে স্বদেশের ঐতিহ্যচিন্তা, ইতিহাসবোধ,—বাহুবলের প্রসঙ্গ,—জ্ঞানোন্নতির আশা,—ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে দেশের নতুনতর সমন্বয়ের সম্ভাবনাবোধ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ভাবগুলিই ব্যক্ত হয়। কিন্তু তা লঘু-রীতিতে নয়। সে তাঁর গভীর গম্ভীর ভঙ্গি। লঘু-প্রবন্ধের আলোচনায় উপসংহারে পৌছে, তাঁর সেই একই সময়ের গুরু ভঙ্গির উাদহরণ হিসেবে সেই হ্রস্বায়তন লেখাটি এখানে পুরোপুরি উদ্ধৃত ক'রলে সন্ধানী মনের তুলনা-কৌতুহল পরিতৃপ্ত হবে :

মৃত মাইকেল মধুসূদন

আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পুরস্কার, জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায় ? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন ; যিনি যশের অপাত্র,

গেছে ! এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শেষেই বঙ্কিমচন্দ্র 'বিষ্ণুশর্মা'র নাম ক'রেছিলেন। বিষ্ণুশর্মা বিদ্যা এবং অর্থের চিন্তা ক'রতে ব'লে গেছেন। কিন্তু একজন মাত্র মানুষ একই সঙ্গে এই দুই লক্ষ্যে পৌঁছুতে পারেন না। তাই মুচিরাম প্রাণ পণ ক'রে টাকা উপার্জনে মন দেন। বঙ্কিম লিখে গেছেন :

> 'বিষ্ণুশর্মা ভারতবর্ষের মাকিয়াবেল্লি—চাণক্য ভারতবর্ষের রোশফুকল। যাহারা এইরূপ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের বালকদিগকে পড়াইবার নিয়ম করিয়াছে, তাহাদিগের উচিত, আবার বিদ্যালয়ে প্রবেশ করা। তাহাদের শিক্ষা হয় নাই।'

সরল গঙ্গারাম সাহেবকে [Grongerham নামের বাঙালী উচ্চারণ] খুশি ক'রে মুচিরাম 'মীর মুন্সী' পদে উন্নীত হয়। অতঃপর সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখা যায় যে, সে নবাগত কালেক্টর হোম-সাহেবকে খুশি ক'রে পেস্কার পদে অধিষ্ঠিত! মিষ্টি কথায় মুচিরামের এই দক্ষতার প্রসঙ্গ ধ'রে, লেখক আবার বাঙালী-স্বভাবের কথা তুলেছেন—'দেশী, বিদেশী, সকল মনুষ্যই এইরূপ। সকলেই মিষ্ট কথার বশ। অবোধ বাঙ্গালীরা আজকাল মিষ্টকথা ভুলিতেছে।'

অষ্টম পরিচ্ছেদে, পেস্কারী পদে অধিষ্ঠিত মুচিরাম, ভজগোবিন্দ চক্রবর্তী নামে বুদ্ধিমান, কর্মঠ এক তাইদনবীশকে নিজের বাসস্থানে জায়গা দিয়ে, নিজের কাজে উপযুক্ত সাহায্য পাবার ব্যবস্থা করেন। প্রচুর অর্থাগমের ফলে, ভজগোবিন্দের পরামর্শেই বেনামীতে জমি কেনবার সংকল্প জাগে। ভজগোবিন্দের সহোদরা বারো বছরের মেয়ে ভদ্রকালীর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়! তারপর নবম পরিচ্ছেদে দেখা যায়—বছর-দুয়েক পরে সেই ভদ্রকালীর অনুরোধেই ভজগোবিন্দকে একটি মুহুরির চাকরি ক'রে দিতে হয়। সেই চাকরি পেয়ে, ভজগোবিন্দ মুচিরামের কাজে ঢিলে দেয়। এদিকে হোম-সাহেবের বদলি এবং রীড্-সাহেবের আবির্ভাব ঘটে। রীড্ অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি। মুচিরাম যে এক 'বৃক্ষভ্রষ্ট বানর',—অচিরেই তিনি তা' ধ'রে ফেলেন! কিন্তু তাকে পদচ্যুত না ক'রে ডেপুটি কালেক্টর পদের জন্যে তার নামে ওপরমহলে সুপারিশ করেন! হোম-সাহেব তখন 'বাঙ্গাল আপিসে সেক্রেটারি' ছিলেন। তিনি রিপোর্ট পেয়েই মুচিরামকে 'ডিপুটি বাহাদুরিতে' নিযুক্ত করেন। মুহুরি থেকে 'মীর মুন্সী',—তা' থেকে পেস্কারি, —এবং পেস্কারি থেকে ডেপুটি কালেক্টার পদ লাভের পরমাশ্চর্য কৃতিত্ব ঘ'টে

যায় পর-পর এই নটি পরিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে! কিন্তু দশম পরিচ্ছেদের আদিতেই দেখা যায়—'মুচিরামের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। তিনি পেস্কারিতে ঘুষ লইয়া অসংখ্য টাকা রোজগার করেন—আড়াই শত-টাকার ডিপুটিগিরিতে তাঁহার কি হইবে?' ভজগোবিন্দ তাঁকে বুঝিয়ে রাজী করে—ডিপুটিগিরি ত্যাগ ক'রলে রীড্ সাহেব বুঝতে পারবেন যে, ঘুষের লোভেই মুচিরাম পদোন্নয়নে অসন্তুষ্ট! ডেপুটি কালেক্টারের কাজে মুচিরামের অব্যাহত দক্ষতার বিবরণ দেওয়া হ'য়েছে সেই দশম পরিচ্ছেদে। তার আগেই সে-দক্ষতার রহস্যের ইশারা আছে নবম পরিচ্ছেদের শেষ দিকে—যেখানে লেখক ব'লে গেছেন :

> 'ভারি ঘুষখোরেও ডিপুটি হইলেই ঘুষ খাওয়া ত্যাগ করে; ডিপুটিগিরি এক প্রকারে আমলাদিগের বৈধব্য—বিধবা হইলে আর মাছ খাইতে নাই। আর মুচিরাম যে মূর্খ, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না, সেরূপ অনেক ডিপুটি আছে, ডিপুটিগিরিতে বিদ্যাবুদ্ধির বিশেষ প্রয়োজন দেখা যায় না।'

কমলাকান্তের 'মনুষ্য-ফল' প্রবন্ধটিতে আগেই বলা হ'য়েছিল :

> 'দেশী হাকিমেরা কোন্ ফল বল দেখি? যিনি রাগ করেন করুন, আমি স্পষ্ট কথা বলিব, ইঁহারা পৃথিবীর কুষ্মাণ্ড। যদি চালে তুলিয়া দিলে, তবেই ইঁহারা উঁচুতে ফলিলেন—নহিলে মাটিতে গড়াগড়ি যান।'

রীড-সাহেব আর হোম-সাহেবের হুকুমের কলম দিয়ে মুচিরামের অদৃষ্ট মুচিরামকে 'চালে' তুলে দিয়েছিল! মিষ্টিকথার গুণে, আর, চোখ বুজে ডিক্রি দেবার অভ্যাসে তাঁর খ্যাতি ক্রমেই বাড়তে থাকে। এই মিষ্টি-কথার প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই লেখক ছুঁয়ে গেছেন। এখানে পুনর্বার সে-কথা ব'লেছেন :

> 'সেই মিষ্টি কথা। একবার তিনি কমিশনার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। সাহেব তখন মেমসাহেবের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গরম মেজাজে ছিলেন, এতেলা হইবামাত্র বলিলেন, 'নেকাল দেও শালাকো।' বাহির হইতে মুচিরাম শুনিতে পাইয়া সেইখান হইতে দুই হাতে সেলাম করিয়া বলিল, 'বহৎ খুব হুজুর। হামারা বহিনকো খোদা জিতা রাখে।'

কিন্তু এইসব গুণেই অতঃপর যখন তাঁর চট্টগ্রামের কালেক্টরীতে বদলির

হুকুম হয়, তখন মুচিরাম চাকরিতে ইস্তফা দেন। দশম পরিচ্ছেদে সেই বৃত্তান্ত জানিয়ে দিয়ে, একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে বলা হ'য়েছে—'স্থূল কথা, মুচিরামের জমিদারির আয় এত বৃদ্ধি হইয়াছিল যে, ডিপুটিগিরির সামান্ত বেতন তাঁহার ধর্তব্যের মধ্যে ছিল না। সুতরাং সহজে চাকরি ছাড়িয়া দিলেন।'

একাদশ থেকে চতুর্দশ অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত মুচিরামের কলকাতায় সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া, সেখানকার 'প্রথমশ্রেণীর বাটপাড়' রামচন্দ্র দত্ত—যাঁর 'সোনাবাঁধা হুঁকা, হীরাবাঁধা গৃহিণী, হাণ্ডনোটে বাঁধা ইংরেজ খাদক'—সেই রামচন্দ্রকে মুরুব্বি পাওয়া,—এবং তার ফলে নিজের আত্মীয়-স্বজনকে উপেক্ষা ক'রে বাবুয়ানিতে যথাসর্বস্ব ব্যয় করা,—তাঁরই নেতৃত্ব মেনে নিয়ে 'ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভায়' প্রবেশ এবং সেখানকার বক্তা হ'য়ে ওঠা,—গভর্নমেণ্ট হাউসে ও 'বেলবিডীরে' যাওয়া,—লেফটেনাণ্ট গবর্নরের সঙ্গে পরিচিত হ'য়ে বাংলা কৌন্সিলের সদস্যপদ-প্রাপ্তি,—এদিকে রামচন্দ্রের পরিকল্পনা সার্থক ক'রে ঋণগ্রস্ত হ'য়ে রামচন্দ্রের কাছে অর্ধেক মূল্যে তালুক বাঁধা রাখা,—আর চতুর্দশ পরিচ্ছেদে, সেই দুঃসময়ের মধ্যে হঠাৎ ভজগোবিন্দ এসে পড়ায় তারই পরামর্শে চন্দনপুর তালুকে ফিরে, প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের দিনেও সেই সম্পন্ন প্রজা-অধ্যুষিত গ্রামে নিজের কন্যার বিবাহের অজুহাতে নজর আদায় ক'রে টাকার সিন্দুক ভ'রে তোলবার বিস্ময়কর ইতিকথা বর্ণিত হ'য়েছে! শুধু তাই নয়, সেই জেলার প্রধান ম্যাজিস্ট্রেট মীনওয়েল সাহেব ঠিক সেই সময়েই, এক অপরাহ্নে অশ্বারোহণে দুর্ভিক্ষের দুরবস্থা দেখতে বেরিয়ে, চন্দনপুরের পথ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তাঁর মুখের বিকৃত বাংলা প্রশ্ন না বুঝতে পেরে, এক সরল চাষা প্রজা তাঁকে যে জবাব দেয়, যথার্থ ভাষা-জ্ঞানের অভাবে তা থেকে সেই সত্যিকার ন্যায়বান, হিতৈষী, পরিশ্রমী ম্যাজিস্ট্রেট বোঝেন যে, চন্দনপুরের জমিদার মুচিরাম রায় প্রতিদিন তাঁর অনেকগুলি প্রজাকে খাইয়ে থাকেন। তাঁর সুপারিশে ভারত-সরকার বললেন, তথাস্তু।—'গেজেট হইল রাজা মুচিরাম রায় বাহাদুর'!

লেখা শেষ ক'রে লেখক ব'লেছেন: 'তোমরা সবাই আর একবার হরি বল।'

সামাজিক অসংগতি আর ব্যক্তিজীবনের ত্রুটি দেখিয়ে কমলাকান্তে যেমন পরিহাসের সঙ্গে তীব্র ব্যঙ্গাঘাত ঘ'টতে দেখা গেছে, মুচিরামের এই

বিবরণেও তাই হ'য়েছে। তাঁর এই লঘু প্রবন্ধমালার বস্তুবৈচিত্র্য, সরসতা, আঙ্গিক-কৌশল,—পৌনঃপুনিক ইতিহাস-স্মৃতি, আবেগধর্ম, যুক্তি-তর্ক ইত্যাদি নানা দিকের কথাই বলা হোলো। পৃথকভাবে প্রত্যেক প্রবন্ধের কথা এ-বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি, কারণ তাতে অযথা বইয়ের কলেবরবৃদ্ধি ঘ'টতো। এইসব লঘু-প্রবন্ধের মধ্য দিয়ে এই কথাটাই বিশেষ ভাবে ধ্বনিত হ'য়েছে যে, গভীর দুঃখের কথাও সরস ভাবে বলা যায়। 'বসন্তের কোকিল' লেখাটিতে কমলাকান্ত ব'লেছিলেন—'তুই এই পুষ্প-কাননে, বৃক্ষে বৃক্ষে আপনার আনন্দে গাইয়ে বেড়াস—আমিও এই সংসার-কাননে গৃহে গৃহে আপনার আনন্দে এই দপ্তর লিখিয়া বেড়াই।' তিনি ব'লে গেছেন:

'যে সুন্দর তাকেই ডাকি; যে ভাল তাকেই ডাকি।'

সেই কল্যাণের আদর্শই তাঁর সারা জীবনের আদর্শ। সে ধ্যান কখনো লঘু ভঙ্গিতে ব্যক্ত হ'য়েছে, কখনো বা গুরু ভঙ্গিতে। আবেগ আর প্রেরণার তারতম্য অনুসারেই এই রীতিভেদ। যুদ্ধ-পর্বে দুই রীতিই দেখা গেছে। সেই যুদ্ধ-পর্বেই মধুসূদনের মৃত্যুতে,—তাঁর মনে যে প্রগাঢ় আবেগ দেখা দিয়েছিল, তাতে স্বদেশের ঐতিহ্যচিন্তা, ইতিহাসবোধ,—বাহুবলের প্রসঙ্গ,—জ্ঞানোন্নতির আশা,—ইউরোপীয় সংস্কৃতির সংস্পর্শে দেশের নতুনতর সমন্বয়ের সম্ভাবনাবোধ ইত্যাদি প্রসিদ্ধ ভাবগুলিই ব্যক্ত হয়। কিন্তু তা লঘু-রীতিতে নয়। সে তাঁর গভীর গম্ভীর ভঙ্গি। লঘু-প্রবন্ধের আলোচনার উপসংহারে পৌঁছে, তাঁর সেই একই সময়ের গুরু ভঙ্গির উদাহরণ হিসেবে সেই হ্রস্বায়তন লেখাটি এখানে পুরোপুরি উদ্ধৃত ক'রলে সন্ধানী মনের তুলনা-কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবে:

মৃত মাইকেল মধুসূদন

আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমরা সংশয় করি না—এই ভূমণ্ডলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব হইবে। কেন না বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে—অকপটে বাঙ্গালী, বাঙ্গালী কবির জন্য রোদন করিতেছে।

যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের সৌভাগ্য। যে দেশে সুকবি যশঃ প্রাপ্ত হয়, সে দেশের আরও সৌভাগ্য। যশঃ, মৃতের পুরস্কার, জীবিতের যথাযোগ্য যশঃ কোথায়? প্রায় দেখা যায়, যিনি যশের পাত্র, তিনি জীবিতকালে যশস্বী নহেন; যিনি যশের অপাত্র,

তিনি জীবিতকালে যশস্বী। সক্রেতিস এবং যীশুখ্রীষ্টের দেশীয়েরা, তাঁহাদিগকে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল। কোপরনিকস, গেলিলীয়, দান্তে, প্রভৃতির দুঃখ কে না জানে, আবার হোল, সিওয়ার্ড প্রভৃতি মহাকবি বলিয়া খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে, আজিও দাশরথি রায়ের একটু যশ আছে। যে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি যশস্বী হইয়া জীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে যশস্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝা যায়, যে বাঙ্গালা দেশ উন্নতির পথে দাঁড়াইয়াছে।

বাঙ্গালা প্রাচীন দেশ। যাঁহারা ভূতত্ত্ববেত্তাদিগের মুখে শুনেন যে বাঙ্গালা নদীমুখনীত কর্দমে সম্প্রতি রচিত, তাঁহারা যেন না মনে করেন যে, কালি পরশ্ব হিমাচলপদতলে সাগরোর্মি প্রহত হইত। সেরূপ অনুমানশক্তি কেবল হুইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচীন দেশে, দুই সহস্র বৎসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী। শ্রীহর্ষের কথা বিবাদের স্থল—নিশ্চয়স্থল হইলেও শ্রীহর্ষ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীমধুসূদন।

যদি কোন আধুনিক ঐশ্বর্য-গর্বিত ইউরোপীয় আমাদিগের জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার ভরসা কি?—বাঙ্গালীর মধ্যে মনুষ্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে শ্রীচৈতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রঘুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসূদন।

স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুল্লুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগন্নাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, চণ্ডিদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায়, প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। অবনতাবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্নপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামও বঙ্গদেশে ধন্য হইল। কেবলই কি বঙ্গদেশে?

আমাদের ভরসা আছে। আমরা স্বয়ং নির্গুণ হইলেও, রত্নপ্রসবিনীর সন্তান। সকলে সেই কথা মনে করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যত্ন কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ কি উন্নতির উপায়? আর কি উন্নতির উপায় নাই? রক্তস্রোতে

জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের পারে যাওয়া যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের জ্ঞানোন্নতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে, কি উপায়ান্তর হইবে না?

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাচীন ভারত উন্নত হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ 'শ্রীমধুসূদন'।

বঙ্গদেশ, বঙ্গকবির জন্য রোদন করিতেছে। বঙ্গকবিগণ মিলিয়া, বঙ্গীয় কবিকুলভূষণের জন্য রোদন করিতেছেন। কবি নহিলে কবির জন্য রোদনে কাহার অধিকার?'[৩৭]

মধুসূদনের মৃত্যু উপলক্ষে লেখা এই ছোটো প্রবন্ধটি তাঁর লঘু প্রবন্ধাবলীর মধ্যে গণ্য নয়, তবু এ-অধ্যায়ে সেটি স্মরণ করবার কারণ এই যে, লোকরহস্য, কমলাকান্ত প্রভৃতি রচনায় লঘু ভঙ্গি মেনে নিয়েও বাংলাদেশ আর বাঙালী-সমাজ সম্বন্ধে তিনি যে অকৃত্রিম অনুরাগ দেখিয়ে গেছেন,—দেশের ঐতিহ্য আর পুরাকীর্তি সম্বন্ধে যে অনুসন্ধানী দৃষ্টি এইসব রচনার ছত্রে ছত্রে প্রকাশিত,—মধুসূদন সম্বন্ধে তাঁর এই ছোটো লেখাটিতে গভীর আবেগের সঙ্গেই তা পুনরায় উচ্চারিত হয়। লেখাটিতে এদেশে ইংরেজি প্রভাবের গুণগান আছে। 'আনন্দমঠ'-এর শেষ দিকের কথাগুলির সঙ্গে ভিন্ন শ্রেণীর এই লেখাটি,—আর এই সময়েরই অনুরূপ হ্রস্বায়তন আরো কোনো কোনো প্রবন্ধের মন্তব্য মিলিয়ে দেখলে, একরকম ভাবগত ঐক্যেরই ধারণা হয়। 'সাধারণী'তে 'জাতিবৈর' [১১ কার্তিক, ১২৮০], 'বঙ্গদর্শনে 'সর উইলিয়ম গ্রে ও সরজর্জ ক্যাম্বেল' [জ্যৈষ্ঠ, ১২৮১] লিখে তিনি আমাদের উনিশ শতকের সেই পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শের ভালো দিকটি বিশেষ ভাবে দেখিয়ে দেন। 'ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন ভিন্ন সোপান'—এই উক্তিতে তাঁর নিজের ইতিহাস-দৃষ্টির পরিচয় ফুটে ওঠে। ১৩০৯ সালে 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ যখন লেখেন—'ইতিহাস সকল দেশে সমান

৩৭। 'বঙ্গদর্শন', ভাদ্র ১২৮০—পৃঃ ২০৯-২১০।

হইবেই, এ কুসংস্কার বর্জন না করিলে নয়'—এবং সেই একই প্রবন্ধে তিনি যখন জানান—'ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি, প্রভেদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন করা, নানা পথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয়রূপে অন্তরতররূপে উপলব্ধি করা,—বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয়, তাহাকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে অধিকার করা',—তখন লঘু-গুরু উভয় শ্রেণীর প্রবন্ধে সু-ব্যক্ত বঙ্কিমচন্দ্রেরও সেই একই ধারণার কথা মনে পড়ে। ১৩০৮ সালে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতা' প্রবন্ধে ফরাসী মনীষী গিজোর ইতিহাস-ধারণার কথা ছিল। গিজোর নাম ক'রে রবীন্দ্রনাথ বলেন যে 'আধুনিক য়ুরোপীয় সভ্যতার পূর্ববর্তী কালে' প্রত্যেক সভ্যতার মধ্যেই একটি মূল ভাব ব্যক্ত হ'তে দেখা গেছে,—সেই ভাবকে আশ্রয় ক'রেই প্রত্যেক সভ্যতা অধিষ্ঠিত আছে—এই ছিল গিজোর বিশ্বাস। ইজিপ্টে পুরোহিত-শাসনতন্ত্রে, ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রে এই বিধিরই ইঙ্গিত! কিন্তু এসব দেশের এসব আয়োজনে সমাজ অচল হ'য়ে পড়ে। অপর পক্ষে, য়ুরোপীয় সভ্যতায় 'একদিকে স্বাতন্ত্র্যের দুরন্ত তৃষ্ণা অন্যদিকে একান্ত বাধ্যতা-শক্তি'—এই টানা-পোড়েনের মধ্যে 'রাষ্ট্রীয় স্বার্থ-ই যেন য়ুরোপীয় সভ্যতার অন্তর্নিহিত দুর্ভেদ্য সংহতি' রক্ষা ক'রেছে। গিজোর কথা থেকে এগিয়ে গিয়ে, য়ুরোপীয় সভ্যতার রাষ্ট্রীয় স্বার্থগত এই সংহতির উল্লেখ ক'রে, রবীন্দ্রনাথ এই প্রবন্ধেই লিখেছিলেন—'ইতিহাসের কোন্ গূঢ় নিয়মে দেশ-বিশেষের সভ্যতা ভাব-বিশেষকে অবলম্বন করে, তাহা নির্ণয় করা কঠিন; কিন্তু ইহা সুনিশ্চিত যে, যখন সেই ভাব তাহার অপেক্ষা উচ্চতর ভাবকে হনন করিয়া বসে, তখন ধ্বংস অদূরবর্তী হয়।'—আর তিনিই লিখেছিলেন, 'প্রত্যেক জাতির যেমন একটি জাতিধর্ম আছে, তেমনি জাতিধর্মের অতীত একটি শ্রেষ্ঠ ধর্ম আছে, তাহা মানব-সাধারণের।' রবীন্দ্রনাথের আগেই—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর লঘু-গুরু উভয় শ্রেণীর প্রবন্ধেই এ-দিকটি দেখিয়ে দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়,—আমাদের 'বর্ণাশ্রমধর্মের সংকীর্ণতা' আমাদের 'নিত্যধর্মে'র খর্বতা ঘটিয়েছিল। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার—তথা ইংরেজি প্রভাবের ফলে, আমাদের জড়তা দূর হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। বঙ্কিমও সে-কথা জানিয়ে গেছেন। ১২৭৯ সালের ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শনে' 'Three years in Europe' বইখানির সমালোচনায় পাশ্চাত্ত্য সংস্পর্শের কথাসূত্রে, তথ্যানুসন্ধানের আসল দিকটি

তিনি জানিয়ে গেছেন। লোকরহস্যে, কমলাকান্তেও সেই কথা ব্যক্ত হয়। 'Three Years in Europe' বইখানির যিনি লেখক, তিনি ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে নিজের সহোদরের কাছে ইংরেজিতে তিনি যেসব চিঠি লেখেন, এ-বই সেই সব চিঠিরই সংগ্রহ। বইখানির সমালোচনা লিখতে ব'সে বঙ্কিমচন্দ্র জানান যে, ইউরোপ সম্বন্ধে লেখকের ধারণা অনুকূল,—এবং তা খুবই স্বাভাবিক বটে, তবু—

> 'ইউরোপে কি কি আমাদিগের ভাল লাগে না, সেইটুকু শুনিবার জন্য আমাদিগের বিশেষ কৌতূহল আছে.'—এবং লেখক স্বদেশ-বিদ্বেষী বা ইংরাজপ্রিয় নহেন। তিনি স্বদেশবৎসল, স্বাদেশবৎসল্যে তাঁহার অন্তঃকরণ বিচলিত হইলেও তিনি প্রবাস হইতে স্বদেশ বিষয়ে যেসকল কবিতা [গুলি] লিখিয়া ভ্রাতাকে পাঠাইয়াছেন তাহা আমাদের কর্ণে অমৃতবর্ষণ করে। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, গুণহীনা মাতার প্রতি সৎপুত্রের যেরূপ স্নেহ, স্বদেশের প্রতি তাঁহার সেই স্নেহ। গুণবতী মাতার প্রতি পুত্রের যে স্নেহ, সে স্নেহ কোথায়? এই বঙ্গদেশের প্রতি সে স্নেহ কাহার আছে? সে স্নেহ কিসে হইবে?'

'লোকরহস্যে', 'কমলাকান্তে',—বাংলাদেশ—তথা ভারত-ঐতিহ্য সম্বন্ধে তাঁর সেই স্নেহদৃষ্টিই সর্বপ্রধান। এবং 'বিজ্ঞান রহস্য' [১৮৭৫] যদিও ঠিক লঘু প্রবন্ধের মধ্যে ধর্তব্য নয়, তবু সে-আলোচনাতেও তাঁর সেই ভারত-গৌরববোধই ছিল মূল প্রেরণা। ১২৭৯ সালের চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বইখানির সমালোচনা-সূত্রেও তিনি তাঁর সেই দেশবাৎসল্যেরই প্রকাশ ঘ'টতে দিয়েছিলেন। তিনি ব'লেছিলেন বটে—'রাজনারায়ণ বসু যেমন হিন্দুধর্মের অংশবিশেষ গ্রহণ করিয়া ঐ ধর্মের প্রশংসা করিয়াছেন, তেমনি ঐ ধর্মের অপরাংশে গ্রহণ করিয়া তাঁহার সকল কথাই খণ্ডন করা যাইতে পারে, 'যেমন কলিকাতাকে ভারতবর্ষ বলা যায় না, তেমনি কেবল ব্রহ্মোপসনাকে হিন্দুধর্ম বলা যায় না'! তবু সেই প্রবন্ধেই তিনি জানিয়েছিলেন—'আমরা হিন্দু, কোন সম্প্রদায়ভুক্ত নহি; কোন সম্প্রদায়ের আনুকূল্যে এ কথা বলিলাম না; হিন্দু জাতির আনুকূল্যেই এ কথা বলিলাম'। পত্রিকার প্রথম প্রচার-সূচনায় 'বঙ্গদর্শন'-এর কার্যাধ্যক্ষ জানিয়েছিলেন যে 'এই পত্রে ধর্ম-সম্প্রদায়ের মতামতের সমালোচনা হইবে

না'। কিন্তু স্বদেশ ও স্বজাতি সম্বন্ধে তিনি ঐকান্তিক স্নেহবশীভূত ছিলেন ব'লেই সে-পত্রিকায় রাজনারায়ণের এই ধর্ম-সম্পর্কিত আলোচনার সমালোচনা বেরিয়েছিল। আর, সেই কারণেই সে-সমালোচনার প্রায় শেষ দিকে কমলাকান্তের 'আমার মন', 'আমার দুর্গোৎসব' ইত্যাদি রচনার মতোই উচ্ছ্বসিত ভঙ্গিতে লেখা, মিল্টন-প্রসঙ্গে রাজনারায়ণের অনুধ্যানের কথা এবং তৎসূত্রেই তাঁর হিন্দু-জাতি-গৌরব-বিচিন্তা উদ্ধৃত হ'য়েছিল। রাজনারায়ণের মন্তব্য :

> 'আমি দেখিতেছি, আবার আমার সম্মুখে মহাবলপরাক্রান্ত হিন্দুজাতি নিদ্রা হইতে উত্থিত হইয়া বীরকুন্তল পুনরায় স্পন্দন করিতেছে এবং দেববিক্রমে উন্নতির পথে ধাবিত হইতে প্রবৃত্ত হইতেছে। আমি দেখিতেছি যে, এই জাতি পুনরায় নবযৌবনান্বিত হইয়া পুনরায় জ্ঞান, ধর্ম ও সভ্যতাতে উজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীকে সুশোভিত করিতেছে, হিন্দু জাতির কীর্তি হিন্দু জাতির গরিমা পৃথিবীময় পুনরায় বিস্তারিত হইতেছে।'

রাজনারায়ণ অতঃপর স্মরণ করেন :

> মিলে সব ভারত সন্তান
> এক তান মনঃ প্রাণ ;
> গাও ভারতের যশোগান।

তখনকার বাংলা সাহিত্যের আসরে এ যেন মনে হয়, কমলাকান্তেরই প্রতিধ্বনি! কিন্তু সে কি সত্যিই জোরের সঙ্গে বলা যায়? বরং মনে হয়, সেকালের হাওয়াতেই এই অনুভূতির আনুকূল্য ছিল। সমুচিত ক্ষেত্রে এই সমধর্মিতা ব্যক্ত হ'য়েছে। রাজনারায়ণের উদ্ধৃত অংশের নিচে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন :

> 'রাজনারায়ণবাবুর লেখনীর উপর পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হউক! এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র মহাগীত হউক। হিমালয়-কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা যমুনা সিন্ধু নর্মদা গোদাবরীর তটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! পূর্ব পশ্চিম সাগরের গভীর গর্জনে মন্দ্রীভূত হউক। এই বিংশতি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।'

১৮৬৯-এর সেপ্টেম্বর থেকে ১৮৭৯-র সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজনারায়ণ

কলকাতায় বাস করেন। সেই সময়ে তিনি পর-পর এই সব বিষয়ে বক্তৃতা দেন—'ব্রাহ্মধর্ম কি এই প্রশ্নের জবাব',—'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা',—'সেকাল একাল',—'ব্রাহ্মধর্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদিগের বর্তমান আধ্যাত্মিক অভাব'। তখনকার চিন্তাশীল প্রবন্ধকারদল একযোগে ধর্ম, সমাজ, ইতিহাসবোধ ইত্যাদি বিষয়ের আকর্ষণ অনুভব ক'রেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিজ্ঞানরহস্য' সে-সময়ের বাংলা প্রবন্ধ-ধারার আর-এক স্মরণীয় দিক। 'প্রীতিবাদ' সে সময়ের শিক্ষিত বাঙালীর সর্বাধিক অনুসরণীয় মতবাদ। বঙ্কিমচন্দ্রের কমলাকান্ত তাই 'আমার মন'-এ জানিয়েছিলেন :

> 'সুখে আমার অধিকার নাই, কিন্তু তাই বলিয়া মনে করিও না যে, তোমরা বিবাহ করিয়াছ বলিয়া সুখী হইয়াছ। যদি পারিবারিক স্নেহের গুণে তোমাদের আত্মপ্রিয়তা লুপ্ত না হইয়া থাকে, যদি বিবাহ নিবন্ধন তোমাদের চিত্ত মার্জিত না হইয়া থাকে, যদি আত্মপরিবারকে ভালবাসিয়া তাবৎ মনুষ্যজাতিকে ভালবাসিতে না শিখিয়া থাক, তবে মিথ্যা বিবাহ করিয়াছ ; কেবল ভূতের বোঝা বহিতেছ। ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি বা পুত্রমুখ নিরীক্ষণের জন্য বিবাহ নহে যদি বিবাহবন্ধে মনুষ্যচরিত্রের উৎকর্ষসাধন না হইল, তবে বিবাহের প্রয়োজন নাই। ইন্দ্রিয়াদি অভ্যাসের বশ, অভ্যাসে এ সকল একেবারে শান্ত থাকিতে পারে। বরং মনুষ্যজাতি ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া পৃথিবী হইতে লুপ্ত হউক, তথাপি যে বিবাহে প্রীতি শিক্ষা না হয় সে বিবাহে প্রয়োজন নাই।'

'কমলাকান্তের পত্রের' চতুর্থ পত্রে 'বুড়া বয়সের কথা'-প্রসঙ্গে বলা হ'য়েছিল :

> 'আপনার কাজ ফুরায় না—যদি মনুষ্যজীবন লক্ষ বর্ষ পরিমিত হইত তবু আপনার কাজ ফুরাইত না—মনুষ্যের স্বার্থপরতার সীমা নাই—তাই বলি, বার্ধক্যে আপনার কাজ ফুরাইয়াছে বিবেচনা করিয়া পরহিতে রত হও।'

হিন্দু-বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রীতিবাদের সঙ্গে ব্রাহ্ম-রাজনারায়ণের 'আত্মচরিত'-এর একটি উক্তি মিলিয়ে দেখলেই সে-পর্বের বাঙালী

মনীষার ভাবাদর্শের সাধারণ ভিত্তিটি স্পষ্ট হ'য়ে উঠবে। রাজনারায়ণ ব'লে গেছেন :

> 'আমার সমাধিমন্দিরে আমার বক্তৃতা হইতে উদ্ধৃত নিম্নলিখিত বাক্য কয়েকটি লিখিত থাকিবে।
>
> 'প্রীতি অধ্যাত্মযোগের জীবন, প্রীতি সৎকার্যের জীবন, প্রীতি ধর্ম প্রচারের একমাত্র উপায়।'
>
> 'স্বদেশী লোকের মন বিদ্যাদ্বারা আলোকিত ও সুশোভিত হইবে, অজ্ঞান ও অধর্ম হইতে নিষ্কৃতি পাইবে, জ্ঞানামৃত পান ও যথার্থ ধর্মানুষ্ঠান করিবে এবং জাতীয় ভাব রক্ষাপূর্বক সভ্য ও সংস্কৃত হইয়া মনুষ্যজাতি সমূহের মধ্যে গণ্যজাতি হইবে এই মহৎ কল্পনা সুসিদ্ধ করিবার চেষ্টায় যাবজ্জীবন ক্ষেপণ করতঃ সেই ব্যক্তি কি আনন্দিত থাকেন।'

উদাহরণ-উদ্ধৃতি দিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু-প্রবন্ধাবলী থেকে তাঁর বিশ্বাসের মূল কথাগুলি পরিবেষণ ক'রতে গেলে স্থান-সংকোচের কথা ভুলে যেতে হয়। স্বভাবতই উদাহরণ বেড়ে যায়। পারিপার্শ্বিক ক্ষেত্রের সমকালীন অন্যান্য মনীষীর কথা এসে পড়ে। স্বদেশের সীমা পার হ'য়ে বিদেশের চিন্তানায়কদের প্রসঙ্গে এগিয়ে গেলে আলোচনা আরো বেড়ে যাওয়া অনিবার্য। অতএব এ অধ্যায়ের এইখানে ছেদ টানা দরকার। ডিরোজিও, রিচার্ডসনের আমলে ছাত্রাবস্থায় ঈশ্বর গুপ্তের কাছে সাহিত্য-রচনায় প্রথম দীক্ষিত হ'য়ে,—অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতির প্রভাবাধীন যুগসন্ধির বঙ্গসংস্কৃতির আবহাওয়ায় তাঁর নবযৌবনের দিনযাপন ক'রে,—কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম স্নাতকদের অন্যতম বঙ্কিমচন্দ্র—সে-পর্বের ইংরেজ শাসনের প্রতিনিধি লর্ড হার্ডিঞ্জের আমলে প্রবর্তিত এদেশের ধর্ম-সমাজ-রাষ্ট্রচিন্তার সব ঢেউগুলিই তীক্ষ্ণভাবে অনুভব ক'রেছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে নীলদর্পণ' বেরিয়েছে। বঙ্কিম তখন খুলনায়। ১৮৬৬তে তিনি যখন বারুইপুরে, রাজনারায়ণ বসুর 'জাতীয় গৌরব-সঞ্চারিণী সভা স্থাপনের প্রস্তাব' বেরিয়েছে তখন। ১৮৬৩ থেকে ১৮৬৭ পর্যন্ত 'এশিয়াটিক সোসাইটি'র সভ্য ছিলেন তিনি। ইতিহাসে তাঁর ছিল বিশেষ অভিরুচি। সেকালের বাংলা সাহিত্যে সংস্কৃতপন্থী আর ইংরেজিপন্থী—এই দু'জাতের লেখকদের মধ্যে ইংরেজিপন্থীদের দিকেই তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে

'ক্যালকাটা রিভিয়ু'-এ প্রকাশিত তাঁর দুটি প্রবন্ধে[৩৮] সে-প্রবণতার সমর্থন বিদ্যমান। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'Mookerjee's Magazine'-এ তিনি 'The Study of Hindu Philosophy' নামে যে প্রবন্ধ লেখেন, তাতেও স্বদেশের এবং স্বজাতির ইতিহাস অনুসন্ধানের ব্যগ্রতার চিহ্ন ছিল। 'লোকরহস্যে', 'কমলাকান্তে,' 'মুচিরামগুড়ের জীবনচরিতে'—সেই স্বদেশ-প্রেমিক, ইতিহাস সচেতন, যুক্তিবাদী, কৌতুকভাষী বঙ্কিমেরই স্বাক্ষর সুমুদ্রত!

৩৮। 'A Popular Literature of Bengal' এবং 'Bengali Literature'।

গুরু প্রবন্ধের প্রথম পর্ব

'বিজ্ঞানরহস্য'

'সাম্য'

১২৭৯ সালের ভাদ্র সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' 'ভারতবর্ষীয় বিজ্ঞানসভা' নামে বঙ্কিমচন্দ্রের একটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। তারও আগে, দ্বিতীয় সংখ্যার 'বঙ্গদর্শন' [জ্যৈষ্ঠ] থেকেই তাঁর বিজ্ঞান-সম্পর্কিত আলোচনার সূত্রপাত ধরা উচিত। পরে ১৮৭৫-এ 'বিজ্ঞানরহস্য' বই বেরোয়; দ্বিতীয় সংস্করণ বেরিয়েছিল ১২৯১ সালে। অর্থাৎ 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত', 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' ইত্যাদি লেখাগুলির সমকালেই তাঁর বিজ্ঞান-সম্পর্কিত প্রবন্ধের ধারা চ'লতে থাকে। এই 'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য' এবং 'বিবিধ প্রবন্ধে'র ভঙ্গি লঘু নয়,—এ-লেখাগু'লতে গুরুত্বের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

১২০১ সালের চৈত্র সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকার-সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহে'র আলোচনায় বেশ উৎসাহের সঙ্গে 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে নিজের আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। ১২৮০র জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় সংখ্যায়, এবং ১২৮২র কার্তিকের 'বঙ্গদর্শনে' 'সাম্য' প্রবন্ধের তিনটি প্রস্তাব ছাপা হয়। সেই সঙ্গে 'বঙ্গদেশের কৃষক' যুক্ত হ'য়ে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে 'সাম্য' বই হ'য়ে বেরোয়। পরে, সেই 'সাম্য' বইয়ের মতামত তিনি প্রত্যাহার ক'রতে চেয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্র মজুমদার-কে তাই তিনি বলেন—'সাম্যটা সব ভুল, খুব বিক্রয় হয় বটে, কিন্তু আর ছাপাব না'।[১]

তাঁর অন্যান্য গুরু প্রবন্ধের নাম উহ্য রেখে,—কেবল এই বইক'টির কথা মনে রাখলেও এ-কথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, রচনাকালের বিচারে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' [১৮৮৬], 'অনুশীলন' [১৮৮৮] ইত্যাদি গুরু-প্রবন্ধ অপেক্ষাকৃত পরবর্তী রচনা; 'বিজ্ঞানরহস্য', 'সাম্য', 'বিবিধ প্রবন্ধ' ইত্যাদি লেখাগুলি আরো আগের আমলের। অতএব আগে, তাঁর গুরু প্রবন্ধমালার প্রথম পর্বের কথা।

'বিজ্ঞানরহস্যে'র উদ্দেশ্য ও অবলম্বন সম্বন্ধে,—আর, সেগুলির অসম্পূর্ণতা

১। 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ', পৃষ্ঠা ১৯৮ দ্রষ্টব্য।

প্রসঙ্গেও কিঞ্চিৎ ক্ষোভের সঙ্গে প্রথম সংস্করণের 'বিজ্ঞাপনে' [১৮৭৫] বলা হয়:

'বঙ্গদর্শন হইতে উদ্ধৃত হইয়া এই কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইল। প্রবন্ধগুলি লেখকের সন্তোষজনক হয় নাই—কৃতবিদ্য পাঠকেরও হইবার সম্ভাবনা নাই। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আলোচনায় অনেক পুস্তকের সাহায্য প্রয়োজন করে; এ সকল প্রবন্ধ যেখানে লিখিত হইয়াছিল, সেখানে বৈজ্ঞানিক পুস্তক পাওয়া কষ্টকর। অনেক কথা কেবল স্মৃতির উপর নির্ভর করিয়া লিখিত হইয়াছে,—অথচ স্মৃতির ন্যায় বিশ্বাসঘাতিনী কেহ নাই। লিখিত বিষয়ের যাথার্থ্য নিরূপণের জন্য অনেক সময় আবশ্যক, লেখক সময়াভাবে নিতান্ত কাতর। এই সকল প্রবন্ধে যে অনেক ভ্রান্তি আছে, ইহা নিতান্ত সম্ভব। যিনি যেখানে যে ভ্রম দেখিবেন, অনুগ্রহ করিয়া তাহা লেখককে জানাইবেন, ভবিষ্যতে তাহা সংশোধন করা যাইবে।'

এই তাঁর খেদের স্বীকৃতি। এসব প্রবন্ধ যখন লেখা হয়, তখন তিনি কর্মসূত্রে বহরমপুরে ছিলেন। 'বিজ্ঞাপনে' তাঁর তখনকার বাসস্থানের ইশারা আছে। তারপর, প্রবন্ধগুলির বিষয়গত উৎস বা অবলম্বন সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য:

'এইসকল প্রবন্ধ প্রধানতঃ হক্সলী, টিণ্ডল, প্রক্টর, লাকিয়র, লায়েল প্রভৃতি লেখকের মতাবলম্বন করিয়া লিখিত হইয়াছে। কোনটিই অনুবাদ নহে। তবে টিণ্ডল সাহেবের 'Dust and Disease' নামক প্রবন্ধের সার মর্ম 'ধূলা', গ্লেসর সাহেবের গ্রন্থ হইতে 'গগন পর্যটন', হক্সলীর 'Ley Sermons' হইতে জৈবনিক, এবং লায়েল সাহেবের 'Antiquity of Man' হইতে 'কতকাল মনুষ্য' নামক প্রবন্ধ সংকলিত হইয়াছে।'

অতঃপর 'বিজ্ঞানরহস্যে'র উদ্দেশ্যের ইঙ্গিত:

'লেখকের প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, আলোচিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বসকল সাধারণ বাঙ্গালী পাঠক, বাঙ্গালা বিদ্যালয়ের উচ্চতর শ্রেণীর বালকেরা এবং আধুনিক শিক্ষিতা বাঙ্গালী স্ত্রী বুঝিতে পারেন।'

তাঁর অন্যান্য নানা রচনার মতন তাঁরই নিজের কলমে এই বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধগুলিরও কিছু কিছু সংশোধন ও পরিবর্তন ঘটে। দ্বিতীয় সংস্করণের বইয়ে 'বিজ্ঞানরহস্যে'র এই ছিল বিষয়সূচী: ১। Great Solar Eruption

[আশ্চর্য সৌরোৎপাত], ২। Multitudes of Stars [আকাশে কত তারা আছে], ৩। Dust [ধূলা], ৪। Aerostation [গগনপর্যটন], ৫। The Universe in Motion [চঞ্চল জগৎ], ৬। Antiquity of Man [কতকাল মনুষ্য], ৭। Protoplasm [জৈবনিক], ৮। Curiosities of Quantity and Measure [পরিমাণ-রহস্য]—এবং ৯। The Moon [চন্দ্রলোক]।

প্রথম প্রবন্ধটিতে সৌরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংকলিত হয়; দ্বিতীয় প্রবন্ধে আকাশের নক্ষত্র সম্বন্ধে কৌতূহলোদ্দীপক কিছু কিছু মন্তব্য দেখা দেয়; তৃতীয় প্রবন্ধের বিষয়বস্তু 'ধূলা'। ধূলা যে জগতে সর্বত্র পরিব্যাপ্ত এবং তার অনেকটাই যে জৈব পদার্থ, সে-কথা প্রকাশ ক'রে তিনি লেখেন—'যে জল স্ফটিক পাত্রে রাখিলে বৃহৎ হীরক-খণ্ডের ন্যায় স্বচ্ছ বোধ হয়, তাহাও সমল কীটাণুপূর্ণ। জৈনেরা একথা স্মরণ রাখিবেন।' চতুর্থ প্রবন্ধ 'গগন পর্যটন' প্রসঙ্গে ব্যোমযানের কথা আছে,—এবং সেই সূত্রে এদেশের সঙ্গে বিদেশের তুলনাও দেখা দিয়েছে। ব্যোমযানের সৃষ্টিকর্তা ফরাসী মোনগোল্‌ফিয়ের দুঃসাহসিক আবিষ্কার, আর, তাঁর পরবর্তী অন্যান্যদের অভিযানের সূত্র ধ'রে, সে-প্রবন্ধে তিনি লিখে গেছেন যে, পিলাতর দে রোজীর নামে এক বৈজ্ঞানিক, কৌশলে রাজার অনুমোদন নিয়ে, মার্কুইস দার্লন্দের সঙ্গে ব্যোমযানে আকাশ ভ্রমণ করেন। সেবার তিনি নির্বিঘ্নে ফিরে এসেছিলেন বটে, কিন্তু তার দু'বছর পরে ব্যোমযানে সমুদ্র অতিক্রম ক'রতে গিয়ে তাঁকে প্রাণ দিতে হয়! এই খবরটুকুর পরে তিনি মন্তব্য করেন:

> 'যাহা হউক, তিনিই মনুষ্যমধ্যে প্রথম গগনপর্যটক। কেন না দুষ্মন্ত, পুরুরবা, কৃষ্ণার্জুন প্রভৃতিকে মনুষ্য বিবেচনা করা অতি ধৃষ্টের কাজ। আর যিনি 'জয় রাম' বলিয়া পঞ্চবায়ুপথে সমুদ্র পার হইয়াছিলেন, তিনিও মনুষ্য নহেন, নচেৎ তাঁহাকে এই পদে অভিষিক্ত করার আমাদিগের আপত্তি ছিল না।'

'বিজ্ঞানরহস্যে'র পরবর্তী ক'টি প্রবন্ধ—'চঞ্চল জগৎ', 'কতকাল মনুষ্য,' 'বৈজ্ঞানিক পরিমাণ-রহস্য' এবং 'চন্দ্রলোক'—প্রতিটিই বৈজ্ঞানিক তথ্যময়, এবং প্রত্যেকটি তাঁর গভীর অনুভূতি-চিহ্নিত! জগতের স্থায়ী স্বভাব যে গতিশীলতা, 'চঞ্চল জগৎ' প্রবন্ধে সেই প্রসঙ্গ ধ'রে, তিনি নাক্ষত্রিক গতি থেকে ক্রমে মানব-সমাজের গতিতত্ত্বে এসে পৌঁছেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে' তাঁর ধর্ম-সমাজ-

রাষ্ট্রচিন্তার যে পূর্ণতর অভিব্যক্তি দেখা গেছে,—লোকরহস্য, কমলাকান্ত, মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ইত্যাদির পরে, বিজ্ঞানরহস্যের এই সব মন্তব্যে তারই পূর্বাভাস সূচিত হয়। 'চঞ্চল জগৎ' লেখাটির উপসংহারে তিনি জানান :

'যাহা বলা গেল তাহাতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, গতিই জাগতিক নিয়ম—স্থিতি নিয়মরোধের ফলমাত্র। জগৎ সর্বত্র, সর্বদা চঞ্চল। সেই চাঞ্চল্য বিশেষ করিয়া বুঝিতে গেলে, অতি বিস্ময়কর বোধ হয়। জীবনাধারে শোণিতাদির চাঞ্চল্যই জীবন। হৃৎপিণ্ড বা শ্বাসযন্ত্রের চাঞ্চল্য রহিত হইলেই মৃত্যু উপস্থিত হয়। মৃত্যু হইলে পরেও দৈহিক পরমাণু মধ্যে রাসায়নিক চাঞ্চল্য সঞ্চার হইয়া, দেহ ধ্বংস হয়। যেখানে দৃষ্টিপাত করিবে, সেইখানে চাঞ্চল্য, সেই চাঞ্চল্য মঙ্গলকর। যে বুদ্ধি চঞ্চলা, সেই বুদ্ধি চিন্তাশালিনী। যে সমাজ গতিবিশিষ্ট, সেই সমাজ উন্নতিশীল। বরং সমাজের উচ্ছৃংখলতা ভাল, তথাপি স্থিরতা ভাল নহে।'

'কতকাল মনুষ্য' প্রবন্ধটিতে জগৎসৃষ্টি এবং জগতে মানুষের আবির্ভাবের ইতিহাসের কথা আছে। বৈজ্ঞানিক তথ্য-পরিবেষণেই এ-লেখাটির প্রধান আগ্রহ বটে, কিন্তু তারই মধ্যে ধর্মগ্রন্থ আর বিজ্ঞানশাস্ত্র,—জগতের সত্য সন্ধানে এ-দু'য়ের সামর্থ্য আর মতভেদ সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক কিছু-কিছু মন্তব্য আছে। যেমন প্রবন্ধটির দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তিনি লিখে গেছেন :

'খ্রীষ্টানদিগের প্রাচীন গ্রন্থানুসারে মনুষ্যের সৃষ্টি এবং জগতের সৃষ্টি কালি-পরশ্ব হইয়াছে। যে দিন জগদীশ্বর কুম্ভকাররূপে কাদা ছানিয়া পৃথিবী গড়িয়া, ছয় দিনে তাহাতে মনুষ্যাদি পুত্তল সাজাইয়াছিলেন খ্রীষ্টানরা অনুমান করেন যে, সে ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে। এ কথা খ্রীষ্টানেরাও আর বিশ্বাস করেন না। আমাদিগের ধর্ম-পুস্তকের কথার প্রতি আমরাও সেইরূপ হতশ্রদ্ধ হইয়াছি। বিজ্ঞানের প্রবাহে সর্বত্রই ধর্মপুস্তকসকল ভাসিয়া যাইতেছে। কিন্তু আমাদিগের ধর্ম-গ্রন্থে এমন কোন কথা নাই যে তাহাতে বুঝায় যে, আজি কালি বা ছয় বৎসর বা ছয় শত বৎসর বা ছয় সহস্র বৎসর পূর্বে এই ব্রহ্মাণ্ডের সৃজন হইয়াছে। হিন্দু শাস্ত্রানুসারে কোটি কোটি বৎসর পূর্বে, অথবা অনন্ত কাল পূর্বে জগতের সৃষ্টি। আধুনিক ইউরোপীয় বিজ্ঞানেরও সেইমত।'

প্রসঙ্গতঃ হার্বার্ট স্পেনসারের উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন :

> 'স্পেনসারের কথা প্রামাণিক না হইলে হইতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির কৌশল আশ্চর্য। স্পেনসর কেবল আকারশূন্য পরমাণুসমষ্টির অস্তিত্ব মাত্র প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা হইতে জাগতিক ব্যাপারের সমুদায়ই সিদ্ধ করিয়াছেন।'

লাপ্লাসের সৌরজগৎ উৎপত্তির বিবরণ থেকেই স্পেনসারের এই বিশ্বাস,—এবং কোম্‌ৎ, মিল প্রভৃতি দার্শনিকরাও যে এই মতে আপত্তি করেন নি, এ-প্রবন্ধে তিনি সে-কথাও স্মরণ ক'রে গেছেন। 'জৈবনিক' প্রবন্ধে পঞ্চভূতের কথা ওঠে। ভারতবর্ষে ক্ষিতি, অপ্‌, প্রভৃতি পঞ্চভূতের কথা সুপরিচিত। এদিকে আধুনিক পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞানেও জগতের অন্তর্নিহিত কতকগুলি মৌলিক উপাদান বা 'Elementary Substances'-এর তত্ত্ব স্বীকৃত। পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান ভারতবর্ষের কণাদ-কপিলের প্রাচীন পঞ্চভূততত্ত্ব-কে পূর্বাভ্যস্ত মর্যাদা দিতে নারাজ! ঈষৎ কৌতুকের ভঙ্গিতে এই কথাটি উত্থাপন ক'রে প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র আর আধুনিক বিজ্ঞানের বিবাদের কথা বোঝানো হ'য়েছে :

> 'প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রে এবং আধুনিক বিজ্ঞানে এই প্রকার বিবাদ। ভারতবর্ষবাসীরা মধ্যস্থ। মধ্যস্থেরা তিন শ্রেণীভুক্ত। এক শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন যে, 'প্রাচীন দর্শন, আমাদের দেশীয়। যাহা আমাদের দেশীয়, তাহাই ভাল, তাহা মান্য এবং যথার্থ। আধুনিক বিজ্ঞান বিদেশী, যাহারা খ্রীষ্টান হইয়াছে, সন্ধ্যা আহ্নিক করে না, উহারাই তাহাকে মানে। আমাদের দর্শন সিদ্ধ-ঋষি-প্রণীত, তাঁহাদিগের মনুষ্যাতীত জ্ঞান ছিল, দিব্য চক্ষে সকল দেখিতে পাইতেন; কেন না তাঁহারা প্রাচীন এবং এদেশীয়। আধুনিক বিজ্ঞান যাঁহাদিগের প্রণীত, তাঁহারা সামান্য মনুষ্য। সুতরাং প্রাচীন মতই মানিব।'

অতঃপর দ্বিতীয় শ্রেণীর কথা :

> 'আর এক শ্রেণীর মধ্যস্থ আছেন, তাঁহারা বলেন, কোন্‌টি মানিতে হইবে, তাহা জানি না। দর্শনে কি আছে, তাহা জানি না, বিজ্ঞানে কি আছে, তাহাও জানি না। কালেজে তোতা পাখির মত কিছু বিজ্ঞান শিখিয়াছিলাম বটে, কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা কর, কেন সে সব মানি, তবে আমার কোন উত্তর নাই। যদি দুই মানিলে চলে

তবে দুই মানিব। তবে, যদি নিতান্ত পীড়াপীড়ি কর, তবে বিজ্ঞানই মানি, কেন না তাহা না মানিলে, লোকে আজিকালি মূর্খ বলে। বিজ্ঞান মানিলে লোকে বলিবে, এ ইংরেজি জানে, সে গৌরব ছাড়িতে পারিব না। আর বিজ্ঞান মানিলে বিনা কষ্টে হিন্দুয়ানির বাঁধাবাঁধি হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। সে অল্প সুখ নহে। সুতরাং বিজ্ঞানই মানিব।'

পরিশেষে, তৃতীয় শ্রেণীর বক্তব্য :

'তৃতীয় শ্রেণীর মধ্যস্থেরা বলেন, প্রাচীন দর্শনশাস্ত্র দেশী বলিয়া তৎপ্রতি আমাদিগের বিশেষ প্রীতি বা অপ্রীতি নাই। আধুনিক বিজ্ঞান সাহেবি বলিয়া তাহাকে ভক্তি বা অভক্তি করি না। যেটি যথার্থ হইবে, তাহাই মানিব—ইহাতে কেহ খ্রীষ্টান কেহ বা মূর্খ বলে, তাহাতে ক্ষতি বোধ করি না। কোন্‌টি যথার্থ, কোন্‌টি অযথার্থ, তাহা মীমাংসা ক'রবে কে? আমরা আপনার বুদ্ধিমত মীমাংসা করিব;—পরের বুদ্ধিতে যাইব না। দার্শনিকেরা আমাদিগের দেশী লোক বলিয়া তাহাদিগকে সর্বজ্ঞ মনে করিব না—ইংরেজেরা রাজা বলিয়া তাহাদিগকে অভ্রান্ত মনে করি না।'

এইভাবে কথায়-কথায় এই প্রবন্ধের উপসংহারে পৌঁছে, তিনি জানান : 'জৈবনিক ভিন্ন জীবন নাই।' এই লেখাটির মধ্যে সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ এবং আধুনিক বিজ্ঞানের প্রকৃতিবাদের প্রসঙ্গ দেখা দেয়। এই সুখদুঃখবহুল জীবনের অন্তর্নিহিত সত্য যে জৈবনিকের ক্রিয়া,—অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগ-সমবায়ের ফল,—নিউটনের বিজ্ঞান, কালিদাসের কবিতা, হাম্বোল্ট অথবা শঙ্করাচার্যের পাণ্ডিত্য,—শাক্যসিংহের ধর্মজ্ঞান,—আকবরের শৌর্য,—কোম্‌তের দর্শন,—সবই যে জৈবনিকের ইন্দ্রজাল,—বিজ্ঞানের কথা থেকে বিশেষ ভাবে এই আধ্যাত্মিক ইঙ্গিতটি এ-লেখায় স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে! উপসংহারে বলা হয় :

'এই সর্বকর্তা জৈবনিক অম্লজান, জলজান, অঙ্গারজান এবং যবক্ষারজানের রাসায়নিক সমষ্টি। অতএব এই চারিটি ভৌতিক পদার্থই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছায় সর্বকর্তা। ইহারা প্রকৃত ভূত, এবং এই ভূতের কাণ্ডসকল আশ্চর্য বটে। পাঠক দেখিবেন যে, আমাদিগের পূর্বপরিচিত পঞ্চভূত হইতে এই আধুনিক ভূতগণের যে প্রভেদ, তাহা কেবল প্রমাণগত। নচেৎ উভয়েরই ফল প্রকৃতিবাদ [Mate-

rialism]। সাংখ্যের প্রকৃতিবাদ হইতে আধুনিক প্রকৃতিবাদের প্রভেদ, প্রধানতঃ প্রমাণগত। তবে আধুনিক বলেন, ক্ষিত্যাদি ভূত নহে, আমাদিগের পরিচিত এই ভূতগুলিই ভূত। যেই ভূত হউক, তাহাতে আমাদের বিশেষ ক্ষতি নাই,—কেন না, মনুষ্যজাতি ভূত-ছাড়া হইল না। নাই হউক—স্মরণ রাখিলেই হইল, ভূতের উপর সর্বভূতময় একজন আছেন। তাঁহা হইতে ভূতের এ খেলা।'

'পরিমাণ-রহস্য' প্রবন্ধটিতে জগতের অমেয় বিস্তারের বিস্ময়বোধ থেকে যাত্রা শুরু ক'রে, তিনি একে-একে—পাদরি ডাক্তার স্কোরেসবি, বৈজ্ঞানিক পল্টন, সিনসিনেটির ডাক্তার ভন, মস্থর পুইলা, সর উইলিয়ম হর্শেল, ইষ্ট্রেনবর্গ, বের্থেম ও ব্রেগেট, ডাক্তার ইয়ং ইত্যাদি নানা বৈজ্ঞানিকের নাম উল্লেখ ক'রে,—আকাশ ও নীহারিকা, সমুদ্রের গভীরতা, শব্দতরঙ্গ, জ্যোতিস্তরঙ্গ ইত্যাদি প্রসঙ্গ-সূত্রে পরিমিতির কথা তোলেন। আর, বিজ্ঞানরহস্যে'র শেষ প্রবন্ধ 'চন্দ্রলোক'-এর প্রথম দুটি অনুচ্ছেদে—মধ্যযুগের কবি-প্রসিদ্ধিতে অভ্যস্ত বাংলার সাহিত্য-চেতনায় উনিশ শতকের পাশ্চাত্ত্য বিজ্ঞান যে কী সংঘাত সৃষ্টি ক'রেছিল, তারই ইঙ্গিত বিদ্যমান। আগ্নেয়গিরি-সমাকীর্ণ পাষাণময় চন্দ্রের কথা তিনি এইভাবে আরম্ভ ক'রেছিলেন ঃ

> 'এই বঙ্গদেশের সাহিত্যে চন্দ্রদেব অনেক কার্য করিয়াছেন। বর্ণনায়, উপমায়,—বিচ্ছেদে, মিলনে,—অলঙ্কারে, খোশামোদে,—তিনি উলটি পালটি খাইয়াছেন। চন্দ্রবদন, চন্দ্ররশ্মি, চন্দ্রকরলেখা, শশী মসি ইত্যাদি সাধারণ ভোগ্য সামগ্রী অকাতরে বিতরণ করিয়াছেন; কখন স্ত্রীলোকের স্কন্ধোপরি ছড়াছড়ি, কখন তাঁহাদিগের নখরে গড়াগড়ি গিয়াছেন; সুধাকর, হিমকরনিকর, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, কলঙ্ক প্রভৃতি অনুপ্রাসে, বাঙ্গালী বালকের মনোমুগ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু এই ঊনবিংশ শতাব্দীতে এইরূপ কেবল সাহিত্য-কুঞ্জে লীলা খেলা করিয়া কার সাধ্য নিস্তার পায়? বিজ্ঞান-দৈত্য সকল পথ ঘেরিয়া বসিয়া আছে। আজি চন্দ্রদেবকে বিজ্ঞানে ধরিয়াছে, ছাড়াছাড়ি নাই। আর সাধের সাহিত্য-বৃন্দাবনে লীলা খেলা চলে না—কুঞ্জদ্বারে সাহেব অক্রুর রথ আনাইয়া দাঁড়াইয়া আছে; চল, চন্দ্র বিজ্ঞান-মথুরায় চল; একটা কংস বধ করিতে হইবে।'

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের অনুভূতি-মগ্নতার আদর্শে বঙ্কিমচন্দ্রের মন ছিল না।

ইতিহাসের ধারা সম্বন্ধে সক্রিয় আগ্রহ রক্ষা ক'রে,—বিজ্ঞানের দাবি উপেক্ষা না ক'রে,—যুক্তি-তর্কের পথ ধ'রেই তিনি তাঁর লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদের মধ্যযুগের সংস্কার তখন সুদূরে বিলীন! 'চন্দ্রলোক'-এর এই সূচনাংশে কতকটা কমলাকান্তী ভঙ্গিতে তিনি সে-কথা ব'লেছেন বটে,—কিন্তু সেটাই নবযুগের সত্যিকার পরিচয়। নবযুগ—মানে, বৃন্দাবন থেকে মথুরা অভিমুখে নিষ্ক্রমণ,—অভ্যাসের আবর্ত থেকে নবীন আবিষ্কার-ব্রতে!

২৮৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধটির কথা ইতিপূর্বে অনেকবার বলা হ'য়েছে। তিনি যে ইতিহাস-চর্চায় খুবই অনুরাগী ছিলেন,—তাঁর অনেক প্রবন্ধে-নিবন্ধে, লঘু-গুরু বিভিন্ন রচনায় প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য বিভিন্ন দার্শনিকের কথা যে বার বার দেখা দিয়েছে,—১২৮১ সালের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথমশিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস' বইখানির সমালোচনা-সূত্রে বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে তিনি যে নানা কথা ব'লে গেছেন,—১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' শীর্ষক আলোচনায় এবং—পুনরায় ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' প্রভৃতি প্রবন্ধে রাজেন্দ্রলাল মিত্র, এল্‌ফিনস্টোন, ইত্যাদি ঐতিহাসিকের কথাও যে বলা হ'য়েছিল,—১২৮৪ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর 'বাহুবল ও বাক্যবল' প্রবন্ধে হেরডোটস্, কে, কিংলেক্ ইত্যাদির নামোল্লেখ ছিল,—তাঁর রামধন পোদ, সাম্য ইত্যাদি প্রবন্ধে দেশের কৃষক জমিদার সম্পর্কের কথা এবং আনুষঙ্গিক আরো নানা কথাই যে দেখা দিয়ে গেছে, সে-সব প্রসঙ্গ এখন সুপরিচিত। তাঁর 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধটিকে তাঁর সমস্ত জীবনের আদর্শ ও আচরণের মূল ভিত্তি বলা যেতে পারে। ১২৮০-র অগ্রহায়ণ সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধে উনিশ শতকের বঙ্গমনীষার নবজাগরণ সম্বন্ধে তাঁর যে কটাক্ষ দেখা দিয়েছিল, সে-কথাও বলা হ'য়েছে। এ-দেশে লোকশিক্ষার সমুচিত ব্যবস্থাপনার অভাব দেখে তিনি খুবই দুঃখিত হন। 'বঙ্গীয় নব্যযুবকের কুরুচির দোষ' দেখে তিনি বলেন:

> 'রামমোহন রায় হইতে কলেজের ছেলের দল পর্যন্ত সাড়ে তিন পুরুষ ব্রাহ্মধর্ম ঘুষিতেছেন। কিন্তু লোকে ত শিখে না। লোক-

শিক্ষার উপায় ছিল, এখন আর নাই।' ...'ইংরেজি শিক্ষার গুণে লোকশিক্ষার উপায় ক্রমে লুপ্ত ব্যতীত বর্ধিত হইতেছে না।'

এই ধরনের কথা উঠলেই আবেগে তাঁর যেন কণ্ঠরোধ হ'য়ে আসে! অচিরে কমলাকান্তী রীতি দেখা দেয়। লোকশিক্ষা-ভাবনাসূত্রেও সেই ব্যাপার ঘ'টেছিল। শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে সমবেদনার অভাব দেখে,—পরে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শিক্ষা-সম্পর্কিত প্রবন্ধমালায় মূলতঃ যে মন্তব্য জানিয়ে গেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকশিক্ষা' প্রবন্ধের কয়েকটি মাত্র অনুচ্ছেদে, কিঞ্চিৎ কমলাকান্তী আবেগের সঙ্গে সেই কথাই তীব্রভাবে উচ্চারিত হয়। এখানে সে-অংশটুকু তুলে দেওয়া গেল :

> 'কেন যে এ ইংরেজি শিক্ষা সত্ত্বেও দেশে লোকশিক্ষার উপায় হ্রাস ব্যতীত বৃদ্ধি পাইতেছে না; তাহার স্থূল কারণ বলি—শিক্ষিতে-অশিক্ষিতে সমবেদনা নাই। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের হৃদয় বুঝে না। শিক্ষিত, অশিক্ষিতের প্রতি দৃষ্টিপাত করে না। মরুক রামা লাঙ্গল চষে, আমার ফাউলকারি সুসিদ্ধ হইলেই হইল। রামা কিসে দিন যাপন করে, কি ভাবে, তার কি অসুখ, তার কি সুখ, তাহা নদের ফটিকচাঁদ তিলার্ধ মনে স্থান দেন না। বিলাতে কাণা ফসেট সাহেব, এ দেশে সার অসৃলি ইডেন্, ইঁহারা তাঁহার বক্তৃতা পড়িয়া কি বলিবেন, নদের ফটিকচাঁদের সেই ভাবনা। রামা চুলোয় যাক্, তাহাতে কিছু আসিয়া যায় না। তাহার মনের ভিতর যাহা আছে, রামা এবং রামার গোষ্ঠী—সেই গোষ্ঠী ছয় কোটি ষাটি লক্ষের মধ্যে ছয় কোটি উনষাটি লক্ষ নব্বই হাজার নয় শ—তাহারা তাঁহার মনের কথা বুঝিল না। যশ লইয়া কি হইবে? ইংরেজে ভাল বলিলে কি হইবে? ছয় কোটি ষাট লক্ষের ক্রন্দন-ধ্বনিতে আকাশ যে ফাটিয়া যাইতেছে—বাঙ্গালায় লোক যে শিখিল না। বাঙ্গালায় লোক যে শিক্ষিত নাই, ইহা সুশিক্ষিত বুঝেন না।'

লোকরহস্যে, কমলাকান্তে—লোক-কল্যাণের দিকে তাঁর আগ্রহের লক্ষণ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই আগ্রহই তাঁর 'বঙ্গদেশের কৃষক' পর্যায়ের প্রবন্ধগুলিতে,—বিড়াল, সাম্য ইত্যাতি লেখাগুলিতে এবং এক হিসেবে তাঁর বিজ্ঞানরহস্যেও ধরা প'ড়েছে।

'সাম্য' প্রবন্ধে হিন্দু-সমাজের বর্ণবৈষম্যগত অনুচিত অধিকারভেদের নিন্দা

আছে,—এতে স্ত্রীজাতির বিষয়াধিকার, সতীত্বধর্ম এবং উপার্জনাধিকারের প্রসঙ্গও আলোচিত হয়—এবং প্রবন্ধের শেষদিকে তিনি সোজাসুজি বলেন—'শিক্ষাই সকলপ্রকার সামাজিক অমঙ্গল নিবারণের উপায়।' পরে, রবীন্দ্রনাথও ঠিক এই কথাই ব'লেছিলেন।

মোট পাঁচটি পরিচ্ছেদে 'সাম্য' সম্পূর্ণ। পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষে একটি 'উপসংহার' ছাপা হ'য়েছে। সংসারের নানা বৈষম্যই প্রথম পরিচ্ছেদের মূল কথা। প্রবন্ধের সূচনাতে বলা হয়: 'লোকের পরস্পর বৈষম্যজ্ঞান মনুষ্যমণ্ডলীর কার্যের একটি প্রধান প্রবৃত্তির মূল।' দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে তাঁর এই ইঙ্গিত দেখা যায় যে,—পরকে বঞ্চনা করবার সামর্থ্যের ওপরেই সংসারে তথাকথিত বড়োলোকের প্রতিষ্ঠা নির্ভরশীল। সমাজে অন্য মর্যাদাও আছে বটে,—'যেমন 'গোপাল ঠাকুর' জাতিতে ব্রাহ্মণ ব'লেই মর্যাদা পেয়ে থাকেন—'গোপাল দরিদ্র, মূর্খ, নরাধম, পাপিষ্ঠ, কিন্তু সেও বড়লোক!' তবে বৈষম্যই সংসারের নিয়ম। কিন্তু বৈষম্যের মধ্যেও শ্রেণীভেদ কল্পনা করা যায়:

> 'যেমন প্রকৃত বৈষম্য আছে—প্রকৃত বৈষম্য অর্থাৎ যে বৈষম্য প্রাকৃতিক নিয়মানুরুদ্ধ,—তেমন অপ্রকৃত বৈষম্য আছে। ব্রাহ্মণ শূদ্রে অপ্রকৃত বৈষম্য।...দেশী বিলাতীর মধ্যে সেইরূপ আর একটি অপ্রকৃত বৈষম্য।...অর্থগত বৈষম্য গুরুতর।'

প্রথম পরিচ্ছেদেই এ-সম্বন্ধে তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত জানিয়ে গেছেন:

> 'সমাজের উন্নতিরোধ বা অবনতির যে সকল কারণ আছে, অপ্রাকৃতিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার প্রধান। ভারতবর্ষের যে এতদিন হইতে এত দুর্দশা, সামাজিক বৈষম্যের আধিক্যই তাহার বিশিষ্ট কারণ।'

এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে,—তিনি খ্রীষ্ট, বুদ্ধ,—এবং ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক মহম্মদের উল্লেখ ক'রে লেখেন:

> 'পৃথিবীতে তিনবার আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়াছে। বহুকালান্তর, তিন দেশে তিনজন মহাশুদ্ধাত্মা জন্মগ্রহণ করিয়া ভূমণ্ডলে মঙ্গলময় এক মহামন্ত্র প্রচার করিয়াছেন। সেই মহামন্ত্রের স্থূল মর্ম, 'মনুষ্য সকলেই সমান।'

ভারতবর্ষ যখন বৈদিক ধর্মসঞ্জাত বৈষম্যে পীড়িত ছিল, সেই সময়ে শাক্য-

সিংহের আবির্ভাব ঘটে। শাক্যসিংহ সাম্য প্রচার করেন। তিনি সত্যধর্ম পালনের নেতৃত্ব ক'রে গেছেন। বৌদ্ধধর্ম প্রচারের ফলে, ভারতবর্ষে হাজার বছরের গৌরব ও সমৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। যীশু খ্রীষ্ট ছিলেন জগতের দ্বিতীয় সাম্যাবতার। স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের ভোগৈশ্বর্য ব্যাহত ক'রে, সেকালে খ্রীষ্ট-ধর্ম রোমক সাম্রাজ্যের মর্মমূলে প্রবেশ করে! কিন্তু কালক্রমে—'খ্রীষ্টধর্ম সাম্যাত্মক হইলেও পরিণামে তৎফলে একটি গুরুতর বৈষম্য' দেখা দেয়। অর্থাৎ—খ্রীষ্টধর্মে ক্রমশঃ পুরোহিত বা ধর্মযাজকের ক্ষমতা বাড়তেই থাকে।

ফ্রান্সে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে গুরুতর বৈষম্য দেখা দেয়। ফরাসী-বিপ্লবে সেই বৈষম্যেরই অভিব্যক্তি ঘ'টেছিল। এবং—সেই তৃতীয় ক্ষেত্রেই সাম্যাবতার রুশোর অভ্যুদয় ঘটে।

'সাম্য' প্রবন্ধের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তিনি এইসূত্রে আঠারো শতকের ফ্রান্সের অবস্থা এবং ফরাসী-বিপ্লব সম্বন্ধে কার্লাইলের অভিমত স্মরণ ক'রে গেছেন। পঞ্চদশ লুই-এর প্রমোদাসক্তি, স্বার্থপরতা ইত্যাদি উল্লেখ ক'রে,—তাঁর উপপত্নীদের জন্যে,—বিশেষতঃ মাদাম পোম্পাদুর ও মাদাম দুবারির জন্যে রাজকোষ থেকে তখন যে প্রচুর অর্থব্যয় ঘটতো, তা জানিয়ে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য অপব্যয়, অরাজকতা, স্বেচ্ছাচারিতা ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে, সে-দেশে প্রচলিত সে-আমলের 'অপরিশুদ্ধ রাজ্যশাসনপ্রণালী-জাত' বৈষম্যের দিকে তর্জনী নির্দেশ ক'রেছেন। তাঁর নিজের কথায়—'রুশোর গুরুতর প্রহারে সেই রাজ্য ও রাজ্যশাসনপ্রণালী ভগ্নমূল হইল। তাঁহার মানস শিষ্যেরা তাহা চূর্ণীকৃত করিল।'

অবশ্য রুশোকে তিনি শাক্যসিংহ অথবা যীশুখ্রীষ্টের সমশ্রেণীভুক্ত বলেন নি। রুশো জগতে 'অবিমিশ্র বিমল সত্য' আনেন নি! তাঁর ছিল বচনের সামর্থ্য,—'বাগিন্দ্রজালের লোকবিমোহিনী শক্তি'! কিন্তু সেই রুশোরও মূল কথা—'সাম্য'। কারণ, রুশোর মতে—'বসুন্ধরা কাহারও নহেন; তৎপ্রসূত শস্য সকলেরই'!

ভলটেয়ার রুশোর এই মতের সমালোচনা ক'রে গেছেন। এ-প্রবন্ধে সে-প্রসঙ্গও উল্লেখ করা হয়:

> 'রুশোর এইসকল কথা অতি ভয়ানক। বল্‌টেয়ার শুনিয়া বলিয়াছিলেন, এ সকল বদমায়েসের দর্শনশাস্ত্র। এই সকল কথার

অনুবর্তী হইয়া রুশোর মানস শিষ্য প্রুধোঁ বলিয়াছেন যে, অপহরণেরই নাম সম্পত্তি।' [১]

প্রথমে রুশো ছিলেন সভ্যতার তীব্রনিন্দক,—পরে ততোটা ছিলেন না। *Le-Contrat Social* নামে তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থে—সম্পত্তি, অধিকার, সভ্যতায় ন্যায়ানুভাবকতা ইত্যাদি বিষয়ে তিনি নিজের কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত, মতামত জানিয়ে গেছেন।

অতঃপর 'ফুরীরিজম্',—জন স্টুয়ার্ট মিলের মন্তব্য,—ভারতবর্ষে শ্রমজীবী মানুষের অবনতির নানা কারণ প্রদর্শন,—ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়ের ভিন্ন ভিন্ন দায়িত্বের কথা,—স্ত্রী-পুরুষের অধিকারভেদ ইত্যাদি বিষয় দেখা দেয়।

রুশো তাঁর *Le Contrat Social*-এ মানবসমাজে বৈষম্যের মূল কারণ হিসেবে সভ্যতাকেই দায়ী ক'রে গেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন যে, *Le Contrat Social*-এর আসল উদ্দেশ্য এই দেখিয়ে দেওয়া যে, সমাজ সমাজভুক্ত মানুষেরই সম্মতি-সৃষ্ট। জয়েণ্ট-স্টক-কোম্পানি যেমন পাঁচজন ব্যবসাদারের স্বেচ্ছাস্বীকৃত সমাবেশ, ব্যাপক মানব-সমাজকেও রুশো সেই ভাবে দেখেছেন। লোককল্যাণের উদ্দেশ্যে লোকস্বীকৃত বিধি-বন্ধনের নাম সমাজ। এই দিকটি দেখিয়ে দিয়ে বলা হয়েছে :

> 'এ কথার ফল অতি গুরুতর। তোমায় আমায় চুক্তি হইয়াছে যে, তুমি আমার জমি চসিয়া দিবে, আমি তোমাকে খাইতে পরিতে দিব এবং গৃহে স্থান দিব। তুমি যেদিন আমার ভূমি কর্ষণ বন্ধ করিলে, সেই দিন আমি তোমার গলদেশে হস্তার্পণ করিয়া গৃহ হইতে বাহির করিয়া দিলাম এবং গ্রাসাচ্ছাদন বন্ধ করিলাম। এই কার্য ন্যায়সঙ্গত হইল। তেমনি যদি রাজা-প্রজার সম্বন্ধ কেবল চুক্তিমাত্র হয়, তবে প্রজা অত্যাচারী রাজাকে বলিতে পারে, 'তুমি চুক্তিভঙ্গ করিয়াছ। প্রজার মঙ্গল করিবে এই অঙ্গীকারে তুমি রাজা; তোমার কার্য আমাদের মঙ্গল করা, আমাদের কার্য তোমাকে করদান ও তোমার আজ্ঞা পালন।...'

ষোড়শ লুইয়ের সিংহাসনচ্যুতি রুশোর ঐ বিপ্লবাত্মক বইয়েরই ফল! ফরাসী-বিপ্লবে,—রাজা, রাজকুল, রাজপদ—সবই গেছে,—রাজনাম লুপ্ত

১ এই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিড়াল' প্রবন্ধটি স্মরণীয়।

হয়েছে, নতুন ফ্রান্স জন্ম গ্রহণ ক'রেছে, কিন্তু তাতে মানবজাতির স্থায়ী কোনো কল্যাণ হয়নি! বেশ তীব্রভাবেই তিনি জানান:

> 'রুশোর ভ্রান্ত বাক্যে অনন্তকালস্থায়িনী কীর্তি সংস্থাপিতা হইল। কেন না, সেই ভ্রান্ত বাক্য সাম্যাত্মক—সেই ভ্রান্তির কায়া অর্ধেক সত্যে নির্মিত।'

এবং সেই বিপ্লবের পরের কথা ব'লতে গিয়ে আরো বলা হ'য়েছে:

> 'ফরাসীবিপ্লব শাসিত হইল, তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল, কিন্তু 'ভূমি সাধারণের' এই কথা বলিয়া রুশো যে মহাবৃক্ষের বীজ বপন করিয়াছিলেন, তাহার নিত্য নূতন ফল ফলিতে লাগিল। অদ্যাপি তাহার ফলে ইউরোপ পরিপূর্ণ। 'কম্যুনিজম্' সেই বৃক্ষের ফল। 'ইণ্টরন্যাশনাল' সেই বৃক্ষের ফল।'[২]

এ-কথার পরে, কমিউনিজম্ মতবাদে প্রচারিত—মূলধন এবং ভূমির অধিকার-সম্পর্কিত ধারণা উল্লেখ ক'রে, তিনি আবার জানিয়েছেন: 'সর্ববিঘ্ননাশিনী বাক্‌শক্তির বলে এই কথা রুশো পৃথিবীর মধ্যে আদৃতা করিয়াছিলেন।' সকলেই সমান ভাগে ধনের অধিকারী'—এই সাম্যবাদী মতের উল্লেখ ক'রে,—অতঃপর ওয়েন, লুই ব্লাং, কাবে,—এই তিন মনীষীর নাম করা হয়। আর, বৈষম্যের কথা-প্রসঙ্গে মানুষে মানুষে নৈসর্গিক তারতম্য যে স্বীকার্য, সে-কথাও তিনি জানিয়ে দেন। সেই সূত্রে উত্তরাধিকারিত্ব সম্বন্ধে আদর্শ ন্যায়ানুযায়ী ব্যবস্থা পৃথিবীর কোনো দেশেই যে নেই,—সেই স্বীকৃতি,—এবং 'বিলাতী ব্যবস্থার' তুলনায় এ-দিকে হিন্দু ব্যবস্থার শ্রেয়ত্বই তিনি অনুমোদন করেন। জন্ স্টুয়ার্ট মিল, উপার্জিত ধনে উপার্জনকর্তার অধিকার মেনে নিয়েছিলেন—এবং পিতা তাঁর উপার্জিত ধন যে স্বেচ্ছায় তাঁর সন্তানকে অবশ্যই দিয়ে যেতে পারেন,—সে-কথাও তিনি বিশ্বাস ক'রতেন। বঙ্কিমচন্দ্র মিলের সে-মতেরও যৌক্তিকতা স্বীকার ক'রেছেন। তবে, পিতা যদি স্বেচ্ছায় পুত্রকে তাঁর উত্তরাধিকারী না ক'রে যান, তখন,—মিলের মতে,—সে-সম্পত্তি সমাজের। মিলের এই মতকেও বঙ্কিম সাম্যাত্মক মত বলেন। তারপর, বাংলাদেশের দুঃখী কৃষকের প্রতিনিধি পরাণ মণ্ডলের উল্লেখ ক'রে, তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে কৃষিজীবী সাধারণ বাঙালীর

২। ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে First International Association of Warkingmen সূচিত হয় এবং ১৮৬৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যেই কার্ল মার্কস তার গঠন সুসংস্কৃত করেন। Das Kapital-এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৬৭-তে।

প্রতিভূ হিসেবে এই পরাণ মণ্ডলের প্রসঙ্গই আলোচনা করা হয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের সেই অংশে তাঁর মন্তব্য :

> 'নৈসর্গিক তারতম্যে সামাজিক তারতম্য অবশ্য ঘটিবে ; যে বুদ্ধিমান এবং বলিষ্ঠ, সে আজ্ঞাদাতা ; যে বুদ্ধিহীন এবং দুর্বল, সে আজ্ঞাকারী অবশ্য হইবে। রুশোও একথা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু সাম্যতত্ত্বের তাৎপর্য এই, যে-সামাজিক বৈষম্য, নৈসর্গিক বৈষম্যের ফল, তাহার অতিরিক্ত বৈষম্য ন্যায়বিরুদ্ধ, এবং মনুষ্যজাতির অনিষ্টকর। যে সকল রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রচলিত আছে, তাহা অনেকগুলি এইরূপ অপ্রাকৃত বৈষম্যের কারণ। সে ব্যবস্থাগুলি সংশোধন না হইলে মনুষ্যজাতির প্রকৃত উন্নতি নাই। মিল এক স্থানে বলিয়াছেন, এক্ষণকার যত সুব্যবস্থা, তাহা পূর্বতন কুব্যবহার-সংশোধক মাত্র। ইহা সত্য কথা। কিন্তু সম্পূর্ণ সংশোধন কালসাপেক্ষ।'

অর্থাৎ প'রবর্তন দরকার, কিন্তু বিপ্লবাত্মক পথে নয়,—উদ্ধৃতির শেষ বাক্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই ইঙ্গিতই বিদ্যমান।

এ প্রবন্ধের পরাণ মণ্ডলের প্রসঙ্গ তাঁর 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'রামধন পোদে'র স্মারক। কৃষক-জমিদারের কথা-প্রসঙ্গে এখানে জমিদারদের নিন্দাও আছে, প্রশংসাও আছে। এবং বিশেষভাবে জমিদারদের সম্বোধন ক'রেই তিনি জানিয়েছেন :

> 'যদি কোন পরিবারে পাঁচ ভাই থাকে, তাহার মধ্যে দুই ভাই দুশ্চরিত্র হয়, তবে আর তিন জনে দুশ্চরিত্র ভ্রাতৃদ্বয়ের চরিত্র সংশোধন জন্য যত্ন করেন। জমিদার সম্প্রদায়ের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে, তাঁহারাও সেইরূপ করুন। সেই কথা বলিবার জন্যই আমাদের এ প্রবন্ধ লেখা। আমরা রাজপুরুষদিগকে জানাইতেছি না,—জনসমাজকে জানাইতেছি না। জমিদারদিগের কাছেই আমাদের নালিশ।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথম দিকেই বকল্ সাহেবের নামোল্লেখ আছে।— 'জ্ঞানবৃদ্ধিই যে সভ্যতার মূল এবং পরিমাণ, ইহা বকল সাহেবের স্থূল কথা।' আমাদের পরাণ মণ্ডলের দল জ্ঞানে বঞ্চিত। তারই ফলে, দেশে লোকসংখ্যার গতিবৃদ্ধি,—শ্রমোপজীবীদের বেতনের স্বল্পতা,—দারিদ্র্য, মূর্খতা, দাসত্ব!

'ধনসঞ্চয়ই সভ্যতার আদিম কারণ'—এ তত্ত্ব দেখিয়ে,—চতুর্থ পরিচ্ছেদে তিনি জানিয়েছেন—'ধনলিপ্সা সভ্যতাবৃদ্ধির নিত্য কারণ।' এই কথা থেকেই লেকির 'History of Rationalism in Europe' বইখানির উল্লেখ ঘটে।

জ্ঞানলিপ্সা আর ধনলিপ্সা—এই দুটি প্রবৃত্তির মধ্যে দ্বিতীয়টির খুবই নিন্দা শোনা যায় বটে, কিন্তু মানুষের কল্যাণ সাধনায় ধনলিপ্সার সামর্থ্যই যে বেশি, লেকি তাঁর এই বইখানিতে তা স্বীকার ক'রেছেন। এখানে, সেই কথা ধ'রে,—ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিশেষত্ব,—যেমন অতিরিক্ত গ্রীষ্মপ্রাধান্য,—তারই ফলে, এ-দেশের মানুষের পরিশ্রমে বিমুখতা ইত্যাদি ব্যাপারের উল্লেখ ক'রে বলা হয় :

> 'সুখ স্বচ্ছন্দতার আকাঙ্ক্ষার বৃদ্ধি সভ্যতাবৃদ্ধির পক্ষে নিতান্ত প্রয়োজনীয়। বাহ্য সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত হইয়া আসিলে জ্ঞানের আকাঙ্ক্ষা, সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষা, তৎসঙ্গে কাব্যসাহিত্যাদির প্রিয়তা এবং নানাবিধ বিদ্যার উৎপত্তি হয়। যখন লোকের সুখ-লালসার অভাব থাকে, তখন পরিশ্রমের প্রবৃত্তি দুর্বলা হয়। উৎকর্ষলাভের ইচ্ছাও থাকে না, তৎপ্রতি যত্নও হয় না। তন্নিবন্ধন যে দেশে খাদ্য সুলভ, সে দেশের প্রজাবৃদ্ধির নিবারণকারিণী প্রবৃত্তি সকলের অভাব হয়। অতএব যে 'সন্তোষ' কবিদিগের অশেষ প্রশংসার স্থান, তাহা সমাজোন্নতির নিতান্ত অনিষ্টকর।'

লোকরহস্যের 'বর্ষসমালোচনা',—'কমলাকান্তের দপ্তরে'র 'বাঙ্গালীর মনুষ্যত্ব', ইত্যাদি প্রবন্ধে স্বজাতির এই দুর্দশা সম্বন্ধে তাঁর বিশ্লেষণ আগেই লক্ষ্য করা গেছে। এখানে তারই অনুসৃতি! জন্ স্টুয়ার্ট মিলের প্রভাবের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। 'সাম্য' প্রবন্ধের সপ্তম পরিচ্ছেদে স্ত্রী-স্বাধীনতা বিষয়ে মিলের সেই চিন্তা দেখিয়ে দিয়ে, তিনি লেখেন :

> 'এখানে রমণী পিঞ্জরাবদ্ধ বিহঙ্গিনী ; যে বুলি পড়াইবে, সেই বুলি পড়িবে। আহার দিলে খাইবে, নচেৎ একাদশী করিবে।·· দাসীত্ব এতদূর যে পত্নীদিগের আদর্শস্বরূপা দ্রৌপদী সত্যভামার নিকট আপনার প্রশংসা স্বরূপ বলিয়াছিলেন যে, তিনি স্বামীর সন্তোষার্থ সপত্নীগণেরও পরিচর্যা করিয়া থাকেন।'

—এবং মিলের মন্তব্য মনে রেখেই, স্ত্রী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সাম্যবাদী আদর্শটি এ-লেখায় তুলে ধরা হয় :

> 'অস্মদ্দেশে স্ত্রীপুরুষে যে ভয়ঙ্কর বৈষম্য, তাহা এক্ষণে আমাদিগের দেশীয়গণের কিছু কিছু হৃদয়ঙ্গম হইয়াছে, এবং কয়েকটি বিষয়ে বৈষম্য বিনাশ করিবার জন্য সমাজমধ্যে অনেক আন্দোলন চলিতেছে।'

শিক্ষাক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে স্ত্রীলোকের সমান অধিকার,—বিবাহিতা নারীর পতিবিয়োগে পুনর্বিবাহের অধিকার,—নারীর অবরোধ-মোচন, —স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের পক্ষেই 'সতীত্ব' রক্ষার প্রয়োজনীয়তা,—নারীর উপার্জন-সামর্থ্য,—এবং স্ত্রীলোকের পক্ষে অর্থোপার্জনে আনুকূল্যের জন্যেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের সংকল্প গ্রহণ—ইত্যাদি তৎকালীন আন্দোলনের কথা এখানে এইভাবে এসে পড়ে। কিন্তু সময়োচিত সতর্কতার সঙ্গে তিনি এখানে আবার মন্তব্য করেন :

> 'আমরা এ সকল আপত্তির মীমাংসায় এক্ষণে প্রবৃত্ত নই। আমরা দেখাইতে চাই যে, যদি তোমরা সাম্যবাদী হও, তাহা হইলে যতদিন না সম্পূর্ণরূপে সর্ববিষয়ক সাম্যের ব্যবস্থা করিতে পার, ততদিন কেবল আংশিক সাম্যের বিধান করিতে পারিবে না।' সাম্যতত্ত্বান্তর্গত সমাজনীতিসকল পরস্পর দৃঢ়সূত্রে গ্রথিত, যদি স্ত্রী-পুরুষ সর্বত্র সমানাধিকারবিশিষ্ট হয়, তবে ইহা স্থির যে, কেবল শিশুপালন ও শিশুকে স্তন্যপান করান স্ত্রীলোকের ভাগ নহে, অথবা একা স্ত্রীরই ভাগ নহে।'

শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য কী?—এই প্রশ্ন তুলে, এখানে তিনি তাঁর নিজের আদর্শের পরিচয় দিয়েছেন। তবে তা খুবই সংক্ষেপে। এবং তারপরেই বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে তাঁর নিজের মত জানিয়ে গেছেন খুবই স্পষ্ট ভাষায় :

> 'আমরা বলিব, বিধবাবিবাহ ভালও নহে, মন্দও নহে; সকল বিধবার বিবাহ হওয়া কদাচ ভাল নহে, তবে বিধবাগণের ইচ্ছামত বিবাহে অধিকার থাকা ভাল।'

অতঃপর বিদ্যাসাগরের কথাও উঠেছিল। প্রথমতঃ—'পণ্ডিত প্রবর শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও ব্রাহ্মসম্প্রদায়' যে অনেক যত্নে সমাজে নর-নারীর সাম্য বিধানের চেষ্টা ক'রেছেন, সে-কথা স্বীকার ক'রে, তিনি বলেন যে, দু'চারজন

নেতার যেটুকু সাধ্য, তা তাঁরা ক'রেছিলেন বটে,—কিন্তু 'বঙ্গসংসাররূপ পশুশালার' সত্যিই যাতে সংস্কার হ'তে পারে, সে-রকম ব্যাপক আন্দোলন দেশে তখনো দেখা দেয় নি। দ্বিতীয়তঃ —

> 'যাঁহারা ইংরেজি শিক্ষার ফলে, অথবা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বা ব্রাহ্মধর্মের অনুরোধে, ইহা স্বীকার করেন, তাঁহারা ইহাকে কার্যে পরিণত করেন না।'

বঙ্কিমচন্দ্রের মতে,—তার আসল কারণ, সমাজ-ভয়! তিনি যে ব্রাহ্ম-বিদ্বেষী ছিলেন না,—এবং বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও তিনি যে প্রকাশ্যে বিদ্বেষ বা অনুচিত বিরোধিতা প্রকাশ করেন নি, এ-থেকে এই দুটি দিকই বোঝা যায়। আবার, এও অনুভব করা যায় যে, তাঁর বন্ধু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে, আর কতকটা ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনন-প্রকৃতির মিল ছিল।

১২৮০র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গদর্শনে যখন প্রথম প্রস্তাব [৮৭৩] বের হয়, তখন থেকে শুরু ক'রে, 'সাম্য' বইখানির প্রকাশ-কাল ১৮৭৯-র মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র সমাজ, সাহিত্য, রাষ্ট্র, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে অনেক ভাবনা ভেবেছেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সার চার্লস উডের 'এডুকেশন ডেস্‌প্যাচে' শিক্ষা-সংস্কার ঘোষণা,—১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগরের 'বিধবা বিবাহ' প্রথম ও দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশ,—১৮৫৬তে বিধবা-বিবাহ আইন পাশ,—১৮৫৭ তে সিপাহী-যুদ্ধ,— বিশ্ববিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা,—১৮৫৯-এ জন্ স্টুয়ার্ট মিল্-এর 'On liberty' প্রবন্ধ প্রকাশ—এবং সেই একই সময়ে 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায় নীলকর-অত্যাচারের বিরুদ্ধে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের আন্দোলন,—ঐ সময়ে ডারুইনের বিবর্তনবাদ-সম্পর্কিত গ্রন্থপ্রকাশ,— ৮৬০-এ 'নীলদর্পণ'-এর আবির্ভাব,—তারই পরের বছর হার্বার্ট স্পেন্সারের শিক্ষা-সংক্রান্ত বই 'Education, Intellectual, Moral, Physical', ১৮৭১-এ তাঁর 'Principles of Psychology' এবং ১৮৭৭-এর Principles of Sociology' প্রথম ভাগ প্রকাশ,—১৮৬১তে মিল্-এর 'Utilitarianism', ১৮৬৫ তে 'Comte and Positivism', ১৮৬৯-এ 'Subjection of Women', ইত্যাদি ঐতিহাসিক ঘটনা ও রচনার কথা স্মরণীয়! ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার তাঁর 'বঙ্কিম-মানস'-এর পরিশিষ্ট অংশে এ-সব ঘটনার তালিকা সাজিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর এই চিন্তা-বিচিত্রার পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'সাম্য' চিন্তা দেখা দেয়। উপসংহারে বঙ্কিম ব'লে গেছেন—'সকলের উন্নতির পথ মুক্ত চাহি'!

গুরু প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্ব

'বিবিধ প্রবন্ধ'

কৃষ্ণকথার সূচনা ও পরিণতি

ম্যাথ্যু আর্নল্ড্-এর পক্ষপাতিত্ব ছিল 'ক্ল্যাসিক্যাল' আদর্শের অনুকূলে। তারই ফলে, তিনি পরিচ্ছন্ন এক মননপ্রকৃতির অধিকারী হ'তে পেরেছিলেন। আত্মপ্রাধান্যময় রোম্যান্টিক মনোভাবের প্লাবনে বাস ক'রেও আত্মসর্বস্বতা তিনি পরিহার করেন। নিজের ব্যক্তিগত কোনো ঝোঁক তাঁর রচনার কোনো অংশেই যে না প'ড়েছিল, তা নয়। শেলীর কাব্য সম্পর্কে তাঁর সমালোচনা প'ড়ে তাঁর পাঠকের পক্ষে তাঁর পক্ষপাতশূন্যতার তারিফ করা সহজ নয়। কাব্যের আদর্শ সম্বন্ধে সেখানে তাঁর নিজের বিশিষ্ট মতই তিনি প্রকাশ ক'রে গেছেন। কিন্তু এরকম দু'একটি দৃষ্টান্ত সত্ত্বেও 'ক্ল্যাসিক্যাল' আদর্শের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল নির্ভেজাল! এই কারণেই, সমসাময়িক ফরাসী সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ দেখা গেছে। প্রাচীন গ্রীসের কথাসূত্রে তিনি ব'লে গেছেন যে,—এথেন্সের অধিবাসীরা ছিলেন এক উদারচিত্ত, নমনীয়-বুদ্ধিসমৃদ্ধ জাতির উপাদান; আধুনিক [ম্যাথ্যু আর্নল্ডের সমসাময়িক] ফরাসী জাতির মধ্যে এই দু'টি গুণ,—অর্থাৎ চিত্তের ঔদার্য এবং বুদ্ধির নমনীয়তা বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে। সুতরাং ফরাসী সাহিত্যের দিকে ইংরেজদের দৃষ্টি ফেরানো দরকার।[১]

সংস্কৃতির প্রতিশব্দ Culture-কথাটির ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে তিনি তাঁর এই ধারণাই জানিয়ে গেছেন যে, মানুষের যাবতীয় প্রয়োজন বা অবস্থা সম্বন্ধে জগতে শ্রেষ্ঠ যা কিছু ভাবা হয়েছে, বলা হ'য়েছে, লেখা হ'য়েছে,—সে-সব তত্ত্ব-তথ্যের জ্ঞান আহরণ ক'রে, আমাদের অভ্যস্ত মতামত আর সংস্কারের যান্ত্রিক শাসন থেকে অব্যাহতি দেবার জন্যেই Culture দরকার। এই অর্থে, Culture শুধু বিদ্যার সঞ্চয় নয়,—বিদ্যার ব্যবহার।[২] বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'অনুশীলনধর্মে' এই কথাটিই নানা ভাবে ব'লে গেছেন। মানুষের শক্তিপুঞ্জের তিনি যে চারটি শ্রেণীবিভাগ করেন, 'ধর্মতত্ত্বে' সেগুলিকে এক-একটি

১। Literary Influence of Academies—M. Arnold.

২। Culture and Anarchy—M. Arnold.

'বৃত্তি' নামে অভিহিত করা হয়। এই চারটি বৃত্তির নাম: শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্য-কারিণী এবং চিত্তরঞ্জিনী। এই চাতুর্বিধ্য প্রতিপন্ন ক'রে তিনি জানান:

> 'মানুষের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম। সেই অনুশীলনের সীমা—পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য। তাহাই সুখ।'

মানুষের সর্বশক্তির সুসমঞ্জস সার্বিক সমন্বয়ের চেষ্টাই যে culture-এর লক্ষ্য, একথা ম্যাথ্যু আর্নল্ডও স্বীকার ক'রেছেন। লেসিং এবং হার্ডার,—জার্মানীর এই দুই মহারথীর প্রশংসা ক'রে,—এঁদের কৃতিত্বের হেতু দেখাতে গিয়ে তিনি লেখেন—'Because they humanised knowledge; because they broadened the basis of life and intelligence; because they worked powerfully to diffuse sweetness and light, to make reason and the will of God prevail.'

বঙ্কিমচন্দ্র যাকে ব'লেছেন 'সুখ',—ম্যাথ্যু আর্নল্ড তাকেই বলেন 'sweetness and light'। আর্নল্ডের কথা ছিল এই:

> 'Culture looks beyond machinery, culture hates hatred, culture has one great passion, the passion for sweetness and light. It has one even yet greater!—the passion for making them prevail.'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধ' বিষয়ে এ-আলোচনার সূচনায় Matthew Arnold-এর নাম উল্লেখ করবার কারণ আছে। প্রথম কারণটি 'বিবিধ প্রবন্ধের' তথ্যগত; দ্বিতীয়টি, প্রকাশ-কালগত।

'কমলাকান্ত' সম্পর্কে অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের যে মন্তব্যটি দেওয়া হ'য়েছে,—'বিবিধ প্রবন্ধে'র ওপর সমগ্রভাবে আলোকপাতে সমর্থ সে-রকম কোনো মন্তব্য চোখে প'ড়েনি। সে-রকম মন্তব্য হাতে থাকলে ম্যাথ্যু আর্নল্ডের প্রসঙ্গ উত্থাপনের হেতু সম্বন্ধে দীর্ঘ আলাপ না ক'রলেও চ'লতো। কিন্তু তা' যখন হাতে নেই, তখন বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগ ছাপা হয় ১৮৮৭-র জুলাই মাসে,—দ্বিতীয়

ভাগ, ১৮৯২-এ। প্রথম ভাগটি, পূর্ববর্তী দু'খানি বইয়ের সমাহার।—'বিবিধ সমালোচনা' [১৮৭৬] এবং 'প্রবন্ধ পুস্তক' [১৮৭৯]—এই দু'খানি বইয়ের নবকলেবর। বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর অনতিকাল পূর্বে অত্যন্ত এলোমেলো ভাবে দ্বিতীয় ভাগটি সম্পাদিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বিষয়বস্তুর ধারণা পাওয়া যাবে পর পর দুটি খণ্ডের বিষয়সূচী থেকে :—উত্তরচরিত, গীতিকাব্য, প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত, বিদ্যাপতি ও জয়দেব, আর্যজাতির সূক্ষ্ম শিল্প, দ্রৌপদী [১ম ও য় প্রস্তাব], অনুকরণ, শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা [১ম ও ২য়], বাঙ্গালীর বাহুবল, ভালবাসার অত্যাচার, জ্ঞান, সাংখ্যদর্শন, ভারত-কলঙ্ক, ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং পরাধীনতা, প্রাচীন ভারতবর্ষের রাজনীতি, প্রাচীনা ও নবীনা—এই হোলো প্রথম ভাগের বিষয়-তালিকা। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রবন্ধগুলি 'বঙ্গদর্শনে' এবং 'প্রচারে' প্রথম প্রকাশিত হয়। এই খণ্ডের বিষয়সূচী যথাক্রমে : ধর্ম এবং সাহিত্য, চিত্তশুদ্ধি, গৌরদাস বাবাজীর ভিক্ষার ঝুলি [তিনটি প্রস্তাবে সম্পূর্ণ], কাম, বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন, ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে, বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা, সংগীত, বঙ্গদেশের কৃষক [চার প্রস্তাবে সম্পূর্ণ], বহুবিবাহ, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার [দুই প্রস্তাবে সম্পূর্ণ], বাঙ্গালা শাসনের কল, বাঙ্গালার ইতিহাস, বাঙ্গালার কলঙ্ক, বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙ্গালীর উৎপত্তি [সাত পরিচ্ছেদে সম্পূর্ণ], বাহুবল ও বাক্যবল, বাঙ্গালা ভাষা, মনুষ্যত্ব কি, লোকশিক্ষা,—এবং রামধন পোদ।

বঙ্কিম-রচনাবলীর বিভিন্ন অংশে জন স্টুয়ার্ট মিল, ফিক্টে, হার্বার্ট স্পেন্সার, সীলি, ক্যাণ্ট, লক্, হিউম্, জেরেমি বেন্থাম, ডারুইন, অগস্ত কোম্‌ত্, বার্ক, মেকলে, ম্যাক্সমুলার, রসায়নাচার্য বাক্, বৈজ্ঞানিক কাবালো, স্যার জন্ হার্শেল, ঐতিহাসিক এল্‌ফিনস্টোন ইত্যাদি বহু পাশ্চাত্ত্য ধীমানের উল্লেখ আছে।[৩] মিল-এর Utilitarianism প্রকাশিত হয় ১৮৬২-তে; বেন্থাম-এর

৩। অক্টোবর, ১৯৫১-তে 'বিবিধ প্রবন্ধ' সম্পর্কিত আমার এ-আলোচনা 'সাহিত্য পাঠকের ডায়ারি' [প্রথম খণ্ড] বইয়ে প্রথম প্রকাশিত হয়। ম্যাথু আর্নল্ড সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ দৃষ্টি বা মনোযোগ ছিল। ম্যাথ্যু আর্নল্ড ছাড়া আরো নানা পাশ্চাত্ত্য, চিন্তানায়কের প্রসঙ্গ তাঁর রচনাবলীতে বিদ্যমান। ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দারের 'বঙ্কিম-মানস' [জুলাই, ১৯৫১] সেইসব পাশ্চাত্ত্য মতামতের দিক থেকে বিশ্লেষণ-প্রধান আলোচনা। তারপর, অধ্যাপক ভবতোষ দত্তের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' বইখানিও ['জিজ্ঞাসা' : ১৯৬১, এপ্রিল] ইতিমধ্যে প্রকাশিত হ'য়েছে।

Principles of Morals and Legislation ১৭৮০-তে,—এবং Introduction to the Principles of Morals and Legislation ১৭৮৯ তে। ১৮৭৩-এ মিল-এর মৃত্যুর পরে 'বঙ্গদর্শনে' [বৈশাখ ১২৮১] বঙ্কিমচন্দ্রের 'মিল, ডার্বিন ও হিন্দুধর্ম' প্রকাশিত হয়। 'বিবিধ প্রবন্ধের' দ্বিতীয় ভাগে এই প্রবন্ধটিই 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে'—নামে সংকলিত হয়। সমসাময়িক বিশ্বসংস্কৃতি সম্বন্ধে তিনি যে কতো সজাগ ছিলেন, এইসব উল্লেখ-আলোচনা থেকেই তা বেশ বোঝা যায়। বলা বাহুল্য, এই তালিকা আরো দীর্ঘ করা যেতে পারে। তবে, এখানে সে-উদ্যম নিষ্প্রয়োজন।

এ থেকে অনুমান করা স্বাভাবিক যে, ম্যাথ্যু আর্নল্ড-এর Culture and Anarchy এবং Last Essays on Church and Religion-এর সঙ্গেও তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। Culture and Anarchy ছাপা হয় ১৮৬৯-এ,—Last Essays on Church and Religion ১৮৭৭-এ,—পর্যালোচনামূলক গদ্যসংকলন Essays in Criticism আরো আগে—১৮৬৫-তে। অনুমানটি দৃঢ়তর হয় বঙ্কিমের 'ধর্মতত্ত্বে'র প্রথম অধ্যায়ে পৌঁছে। 'অনুশীলন'-এর লেখাগুলি ১৮৮৮-তে গ্রন্থভুক্ত হয়,—তার আগে ১২৯১-৯২ সালের 'নবজীবনে' 'এই গ্রন্থের কিয়দংশ' ছাপা হ'য়েছিল।

'ধর্মতত্ত্বে-র প্রথম অধ্যায়ের গুরুশিষ্য-সংবাদে গুরু জানিয়েছেন,—'Culture বিলাতী জিনিস নহে। ইহা হিন্দু ধর্মের সারাংশ'। এবং এই তত্ত্বটি বিশদ ভাবে আলোচনার পূর্বে গুরু আবার মন্তব্য ক'রেছেন :

> '…তোমার Matthew Arnold প্রভৃতি বিলাতি অনুশীলন-বাদীদিগের বুঝিবার সাধ্য আছে কি না সন্দেহ।'

নিজের অধ্যয়নসূত্রে, যাঁদের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছিল, ম্যাথ্যু আর্নল্ড যে তাঁদেরই অন্যতম ছিলেন, সে-বিষয়ে নিঃসংশয় হওয়া গেল। কারণ, ঘনিষ্ঠতা না থাকলে তিনি কখনোই এমন মন্তব্য ক'রতেন না। তাঁর দায়িত্ব-জ্ঞান এবং কর্তব্যনিষ্ঠা প্রবচনের মতো সুবিদিত।

Culture and Anarchy-র 'অনুশীলন'-বাদের বিপক্ষে তাঁর বক্তব্য তিনি বিশদভাবে বলেন নি ; তবে, ম্যাথ্যু আর্নল্ড সম্পর্কে তাঁর মনে যে উৎসাহ-মান্দ্য ঘ'টেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। অথচ, আশ্চর্যের কথা এই যে, কোনো কারণ উল্লেখ না ক'রে প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য কোনো মনীষীর কোনো কথাই তিনি

এভাবে কখনো বাতিল করেননি। যাঁদের তিনি প্রত্যাখ্যান ক'রেছেন, তাঁদের সম্পর্কেও তাঁর অহেতুক বাক্-কার্পণ্য ঘটেনি।

শারীরিকী, জ্ঞানার্জনী, কার্যকারিণী ও চিত্তরঞ্জিনী এই চতুর্বৃত্তির 'অনুশীলন', প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতাতেই মনুষ্যত্ব,—এই ছিল তাঁর 'অনুশীলন-ধর্মের' মূল কথা। এদিকে, ম্যাথ্যু আর্নল্ড লিখে গেছেন :

> 'Culture is then properly described not as having its origin in curiosity, but as having its origin in the love of perfection ; it is *a study of perfection.*'

আর্নল্ডের 'culture' এবং বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন'—আপাতদৃষ্টিতে এই দুটি তত্ত্বের মধ্যে লক্ষ্যগত কোনো বিভেদ নেই ব'লেই মনে হয়। তবে দু'য়ের মধ্যে সূক্ষ্মতর ভেদ থাকা অসম্ভব নয়—বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যখন বিশেষ ভাবে নামোল্লেখ ক'রে অমন এক কটাক্ষ ক'রেছেন! হীরেন্দ্রনাথ দত্তের 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' বইখানিতে এই সূক্ষ্ম ভেদের ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে ব'লে আশা ছিল। কিন্তু সেখানেও বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ কটাক্ষটির কোনো কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়নি। ব্যাপক এক মন্তব্য ক'রে হীরেন্দ্রনাথ জানিয়ে গেছেন :

> 'বঙ্কিমচন্দ্র একথাও স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, পাশ্চাত্ত্য অনুশীলন-ধর্মের লক্ষ্য সুখমাত্র, কিন্তু তিনি যে ভারতীয় অনুশীলন-তত্ত্বের পুনঃ প্রচার করিয়াছেন, যাহা তাঁহার মতে হিন্দুধর্মের সারাংশ, এবং জগতের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ ভগবদ্‌গীতা যে অনুশীলন-তত্ত্বের উপর গঠিত, সে অনুশীলন-তত্ত্বের উদ্দেশ্য মুক্তি। ঐ মুক্তি সুখমাত্র নহে—উহা আত্যন্তিক সুখ (গীতা), বিপুলং সুখং (ধম্মপদ) এবং উপনিষদের ভাষায় আনন্দং নন্দনাতীতম্। বঙ্কিমচন্দ্র, এই ভূমানন্দের (বৃহদারণ্যকে, যাহাকে 'অতিঘ্নীম্ আনন্দস্য' বলা হইয়াছে) ইঙ্গিত করিয়াছেন—বিস্তার করেন নাই।'

কেবল প্রকাশ-কালের সামীপ্য দেখে দুই বা ততোধিক প্রবন্ধ-নিবন্ধের মধ্যে আদর্শগত কোনো নৈকট্য বা আত্মীয়তার সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সংগত নয়। ম্যাথ্যু আর্নল্ডের পক্ষে তাঁর গদ্য-রচনার গুণপনার তুলনায় কবিখ্যাতিও বিশেষ কম হয় নি,—পক্ষান্তরে বঙ্কিমের 'ললিতা ও মানস' অতিশয় কাঁচা পদ্য; ম্যাথ্যু আর্নল্ড কিছু দিন শিক্ষা-

বিভাগে পরিদর্শকের কাজ ক'রেছিলেন,—বঙ্কিম কলেজ ছেড়ে, বরাবর ইংরেজ সরকারের হাকিমী ক'রেছেন; বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের প্রথম চমকপ্রদ ঔপন্যাসিক,—ম্যাথ্যু আর্নল্ড একখানিও উপন্যাস লেখেননি;—এই রকম আরো পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দু'জনের মধ্যে সাদৃশ্যও বিরল নয়। সাহিত্য-সমালোচক হিসেবে আপন-আপন ক্ষেত্রে দু'জনেই আপন-আপন কালের নেতৃত্ব ক'রে গেছেন। তাছাড়া হৃদয়-মস্তিষ্কের সমীকরণের চেষ্টায় জীবনব্যাপী আন্তরিকতার গুণেও এঁরা ছিলেন সমধর্মী।

উনিশ শতকের এই দুই মহারথীর মতামতের তুলনামূলক আলোচনা এক চিত্তাকর্ষক দায়িত্ব, সন্দেহ নেই। কিন্তু সেজন্যে দীর্ঘ শ্রম, অধ্যবসায় এবং বিদ্যার মূলধন অবশ্যকাম্য। এখানে প্রধানতঃ 'বিবিধ প্রবন্ধের' ওপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে,—তাঁর স্বাজাত্যবোধ, ধর্মবোধ,—সাহিত্যালোচনা সম্পর্কে তাঁর প্রদর্শিত মূল সূত্রগুলির,—এবং হৃদয়-মস্তিষ্কের সমীকরণ-তত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধির বিষয়ে অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

'বিবিধ প্রবন্ধের' প্রথম খণ্ডে 'জ্ঞান', 'সাংখ্যদর্শন', 'প্রাচীনা ও নবীনা' এবং দ্বিতীয় খণ্ডে 'ধর্ম এবং সাহিত্য', চিত্তশুদ্ধি' প্রভৃতি কয়েকটি প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম-চেতনার অভিব্যক্তি ঘ'টেছে। তাঁর 'অনুশীলন' বইখানিতে দেখা যায় যে, ধর্মসাধনায় ভক্তির বিশিষ্ট স্থান তিনি স্বীকার ক'রেছিলেন। তিনি জানিয়ে গেছেন,—'প্রাচীন বৈদিক ধর্মে ভক্তি নাই'।—উপনিষদের প্রধান উদ্দেশ্য ব্রহ্মনিরূপণ ও আত্মজ্ঞানসাধন,—'শাণ্ডিল্যের ভক্তিসূত্রেই আমরা প্রথম ভক্তির উল্লেখ পাই'। সূক্ষ্ম প্রত্নতাত্ত্বিক বিচারে,—দার্শনিকের তর্কবিতর্কে, অথবা ঐতিহাসিকের নিখুঁৎ তথ্যজ্ঞানের আক্রমণেও তাঁর এইসব মতামত যে সর্বত্র অটুট থাকবে, তা মনে হয় না। হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'উপনিষদে ভক্তিবাদ' প্রবন্ধে, 'গীতায় ঈশ্বরবাদ' নামক গ্রন্থে এইসব মতামত বিচার ক'রেছেন। তাছাড়া 'দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র' গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়েও এ-বিষয়ে তাঁর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা আছে। তিনি নিষ্কাম ভক্তিকেই প্রকৃত 'প্রেম' নামে অভিহিত করেন—প্রহ্লাদকেই তিনি পরম ভক্তের দৃষ্টান্ত ব'লে স্বীকার ক'রেছেন। চৈতন্যদেব-প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিলনা। 'আনন্দমঠে' সন্তান-সম্প্রদায়ের নায়ক সত্যানন্দ ব'লেছেন: 'চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়,

সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। আমরা উভয়েই বৈষ্ণব—কিন্তু উভয়েই অর্ধেক বৈষ্ণব।' হীরেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'প্রেমধর্ম' বইখানিতে এ-সম্পর্কেও আলোচনা ক'রেছেন। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দ্বিতীয় খণ্ডে 'ত্রিদেব সম্বন্ধে বিজ্ঞান শাস্ত্র কি ব'লে [১২৮২ বৈশাখের 'বঙ্গদর্শনে' 'মিল্. ডার্বিন এবং হিন্দুধর্ম' নামে প্রথম প্রকাশিত], 'ধর্ম এবং সাহিত্য' [১২৯২ পোষ সংখ্যা 'প্রচার' পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত], 'চিত্তশুদ্ধি' [ঐ ফাল্গুন সংখ্যায়], 'গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি' [প্রচার, ১২৯১ পৌষ, ১২৯২ বৈশাখ এবং আষাঢ়-এ প্রকাশিত], 'কাম' [ঐ, ১২৯২ আষাঢ়],—এবং প্রথম খণ্ডে 'জ্ঞান', সাংখ্য-দর্শন' ইত্যাদি প্রবন্ধ আছে বটে,—কিন্তু একথা ঠিকই যে এই সব প্রবন্ধে ধর্ম বিষয়ে বিশদ, ধারাবাহিক কোনো আলোচনা নেই। তবে, তাঁর অন্যান্য রচনায় ধর্ম সম্বন্ধে তিনি যে-সব কথা ব'লে গেছেন, এখানে সেইসব উক্তিরই সমর্থন পাওয়া যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের 'চিত্তশুদ্ধি'-প্রবন্ধে তাঁর মন্তব্য : 'হিন্দুধর্মের সার চিত্তশুদ্ধি' ; 'ধর্ম এবং সাহিত্য'-প্রবন্ধে তাঁর অভিমত :

> 'সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে, কেন না সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য তাহা ধর্ম।...কিন্তু সাহিত্যে যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র।...সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।'

বাহ্যসম্পদের প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহের ফলে মানুষের সমাজে দিনে দিনে নানা বিপত্তি যে পুঞ্জিত হ'য়ে উঠছে—একদিকে মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা-কামনা-বাসনা—অন্যদিকে বিবেকের শান্ত সংযমের শাসন,—এই দু'য়ের সংঘাতে মানুষ যে ক্রমশঃ বিহ্বল হ য়ে প'ড়ছে,—মানুষের এ দুর্ভাগ্যই তাঁকে চিন্তার প্রেরণা দিয়েছিল। অনেক লেখাতেই তিনি এ-সব কথার বিশ্লেষণ ক'রে গেছেন। ভগবদ্গীতার কষ্টিপাথরে তিনি এ-সব দ্বন্দ্বের যাচাই ক'রেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাছে উপনিষদ্ যেমন ছিল সমস্ত অন্তর্দ্বন্দ্বের কষ্টিপাথর,—বঙ্কিমচন্দ্র তেমনি শ্রদ্ধা ক'রতেন গীতার আদর্শকে! বিবিধ প্রবন্ধের 'মনুষ্যত্ব কি' প্রবন্ধে তিনি জানিয়ে গেছেন—'বস্তুতঃ সকল প্রকার মানসিক বৃত্তির সম্যক অনুশীলন, সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও যথোচিত উন্নতি ও বিশুদ্ধিই মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য।' তাঁর স্বাজাত্যবোধ, সাহিত্য-প্রীতি, বঙ্গদেশানুরাগ,—সবই এই একটি কেন্দ্রীয় আদর্শের ধ্যানে আশ্রিত! 'ভালবাসার অত্যাচার'-

প্রবন্ধে তিনি লিখেছেলেন: 'পরহিতনীতি এবং আত্মসংস্কার-নীতি একই তত্ত্বের ভিন্ন ব্যাখ্যা মাত্র'।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র দুটি খণ্ডেরই বিষয়-সূচী ইতিমধ্যে দেখা গেছে। সেই তালিকা থেকে লেখাগুলির নিম্নপ্রদর্শিত বিষয় বিভাগ চ'লতে পারে:—সাহিত্য, ধর্ম, শিক্ষা, বিজ্ঞান, রাজনীতি, দর্শন, শিল্প, সংগীত, সমাজ ও আচার,—এবং 'ঐতিহাসিকের চোখে বাংলা'। সমসাময়িক জাতীয় চেতনার সঙ্গে কতো ঘনিষ্ঠ ভাবেই যে তিনি জড়িত ছিলেন,—তাঁর অন্যান্য রচনাবলী উহ্য রেখেও তা শুধু এই 'বিবিধ প্রবন্ধে'র লেখাগুলি থেকেই বোঝা যায়। অতীতে, বর্তমানে, ভবিষ্যতে তাঁর মতামত সমালোচনারসম্ভাবনা সুদূরপ্রসারিত। উনিশ শতকের বঙ্গ-সংস্কৃতির মূল ধারা এবং বিভিন্ন উপধারা তাঁর রচনায় প্রতিফলিত। তাঁর লঘু-প্রবন্ধ, গুরু-প্রবন্ধ,—এদিক থেকে দুই-ই একই সঙ্গে অনুভূতিগ্রাহ্য।

'বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগে 'উত্তরচরিত', গীতিকাব্য', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', 'দ্রৌপদী', 'শকুন্তলা মিরন্দা এবং দেসদিমোনা',—এবং দ্বিতীয় ভাগে—'ধর্ম এবং সাহিত্য', 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন,' 'বঙ্গদর্শনের পত্র-সূচনা,' এবং 'বাঙ্গালা ভাষা'—সর্বসমেত এই দশটি প্রবন্ধে সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত প্রকাশিত হ'য়েছে। সাহিত্যতত্ত্বের উদ্‌ঘাটনই যে এই প্রবন্ধগুলির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, তা নয়। প্রথম ভাগে, সংস্কৃত. ইংরেজি ও বাংলার কয়েকটি প্রসিদ্ধ রচনা সম্বন্ধে লেখক তাঁর মন্তব্য দিতে গিয়ে প্রসঙ্গতঃ সাহিত্যের মূলতত্ত্ব সম্বন্ধে ইঙ্গিত ক'রেছেন। দ্বিতীয় ভাগে, 'বঙ্গদর্শন'-এর উদ্দেশ্যের কথা-প্রসঙ্গে অনুরূপ ভাবে আরো কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। 'বাঙ্গালা ভাষা' প্রবন্ধটিতে ভাষার কথাই মুখ্য'; কিন্তু 'বাঙ্গালার নব্য লেখকদিগের প্রতি নিবেদন' লেখাটি প্রধানতঃ সাহিত্যের আদর্শ-সম্পকে তাঁর স্বমতের ঘোষণা! ১২৯১-এর মাঘ মাসের 'প্রচারে' এই প্রবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়। বাংলার নব্য লেখকদের প্রতি মোট বারো দফায় বিন্যস্ত তাঁর এই নির্দেশবাণী বাংলা সাহিত্যের আদর্শ-সম্পর্কিত যাবতীয় manifesto বা ঘোষণাপত্রের মধ্যে আদিতম। তাঁর পূর্ববর্তী রঙ্গলালের বাংলা কাব্য বিষয়ক প্রবন্ধ [১২৫৯] যেমন বাংলা সমালোচনা-সাহিত্যের এক ঐতিহাসিক সোপান রূপে গ্রাহ্য,—তাঁর এ-রচনাটি সেইরকম আর-এক ঐতিহাসিক সামগ্রী। এই ঘোষণাপত্রের প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয়—'যশের জন্য লিখিবেন না'। 'টাকার জন্য

লিখিবেন না'। পঞ্চম অনুচ্ছেদে বলা হয়—'যাহা লিখিবেন, তাহা হঠাৎ ছাপাইবেন না'। ষষ্ঠ ধারায়, সাহিত্যস্রষ্টাকে আত্মসচেতন হবার পরামর্শ দিয়ে অনধিকার চর্চা যে তাঁর পক্ষে নিষিদ্ধ, সে-কথা মনে ক'রিয়ে দেওয়া হয়। সপ্তম, অষ্টম, নবম ও দশম ধারায় বলা হয় যে, পাণ্ডিত্য জাহির করবার চেষ্টায়, অলঙ্কার ব্যবহারের আতিশয্যে, এবং রসিকতা প্রদর্শনের দিকে অতিরিক্ত উৎসাহের ফলে, সৃষ্টির মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হওয়া খুবই স্বাভাবিক,—অতএব, সাধু সাবধান! অশক্তের অনুকরণস্পৃহা তিরস্কৃত হ'য়েছে একাদশ ধারায়,—এবং দ্বাদশ অনুচ্ছেদে তিনি কার্য-কারণের সংগতি সম্বন্ধে নব্য লেখকদের সতর্ক থাকবার উপদেশ দিয়ে গেছেন। দশটি ধারার মূল কথা এখানে সংক্ষেপে বলা হোলো। বাকি রইলো দুটি অনুচ্ছেদ—তৃতীয় ও চতুর্থ উপদেশ। সেই দু'টির মধ্যেই তাঁর বিশিষ্ট সাহিত্য-বিশ্বাস ধ্বনিত হয়। ইতিপূর্বে [৪৯-৫০ পৃষ্ঠায়] সে-কথা স্মরণ করা হ'য়েছে। এখানে—কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও নিচে যথাযথভাবে সেই দুটি অনুচ্ছেদ তুলে দেওয়া হোলো :

> ৩। যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে, লিখিয়া দেশের বা মনুষ্যজাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন, অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন, তবে অবশ্য লিখিবেন। যাঁহারা অন্য উদ্দেশ্যে লেখেন, তাঁহাদিগকে যাত্রাওয়ালা প্রভৃতি নীচ ব্যবসায়ীদিগের সঙ্গে গণ্য করা যাইতে পারে।
>
> ৪। যাহা অসত্য, ধর্মবিরুদ্ধ, পরনিন্দা বা পরপীড়ন বা স্বার্থসাধন যাহার উদ্দেশ্য, সে সকল প্রবন্ধ কখনও হিতকর হইতে পারে না, সুতরাং তাহা একেবারে পরিহার্য। সত্য ও ধর্মই সাহিত্যের উদ্দেশ্য। অন্য উদ্দেশ্যে লেখনী ধারণ করা পাপ।

এই দুটি ধারায় তিনি যা জানিয়ে গেছেন, তাতে সমাজ সম্বন্ধে তাঁর সর্বদা-স্বীকৃত দায়িত্ববোধ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। বাংলা সাহিত্যের তৎকালীন অথবা পূর্ববর্তী শক্তিমান লেখক-সম্প্রদায় যে এ-বিষয়ে সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন, তা নয়; ঈশ্বর গুপ্তের সমাজবিষয়ক কবিতা-গুলিতে, হেমচন্দ্রের সদৃশ রচনাবলীর মধ্যে, প্যারিচাঁদ মিত্রের এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের সামাজিক রেখাচিত্রে এবং প্রবন্ধমালায় সমাজের কথা দেখা দিয়েছিল বটে, কিন্তু এসব কথা আগে এমন স্পষ্ট ক'রে আর কখনো বলা

হয়নি। হয়তো বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর বাল্যকালের সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তের রচনা থেকেই এই আদর্শের প্রেরণা পেয়েছিলেন। তাঁর অধ্যয়নবৈচিত্র্য সুবিদিত। ঠিক কোন্ কোন্ সূত্রে তিনি যে এই প্রেরণা আত্মসাৎ করেন, সে-প্রসঙ্গ ভাববার বিষয়। কেবল, সাহিত্যের লক্ষ্য সম্পর্কেই আর্নল্ডের ধারণার সঙ্গে তাঁর বিশ্বাসের সাদৃশ্যটুকু এখানে পুনরায় স্মরণীয়। মাথ্যু আর্নল্ডের সম্বন্ধে বলা হয় যে, সমাজের সঙ্গে সাহিত্যিকের সম্পর্কটা তিনিই প্রথম স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দেন।[৪]

বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কেও একই কথা বলা যেতে পারে। সমাজের স্থূল, জৈব প্রকৃতির পরিসীমার মধ্যে দু'জনের একজনও আবদ্ধ থাকেননি। আর্নল্ড চেয়েছিলেন 'perfection'; বঙ্কিমচন্দ্র চেয়েছিলেন 'কল্যাণ'। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক,—সর্বস্তরেই এই কল্যাণবোধ সম পরিমাণে বিদ্যমান। তাঁর উপন্যাসের ক্রম-পরিণতির মধ্যেও এই কল্যাণবোধের ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায়। যদুনাথ সরকার এই কল্যাণবোধেরই নাম দিয়ে গেছেন 'উর্ধ্বপ্রবাহিনী ভাবধারা'।[৫] ম্যাথ্যু আর্নল্ডও তাঁর ধর্ম, সাহিত্য ও অনুশীলন সম্পর্কিত রচনাবলীর অনেক জায়গায় এই 'কল্যাণবোধ' বা 'perfection'-তত্ত্বের প্রসঙ্গই ছুঁয়ে গেছেন।

আগেই বলা হ'য়েছে যে, বিবিধ প্রবন্ধে'র প্রথম ভাগ ছাপা হয় ১৮৮৭তে, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে। 'প্রবন্ধ-পুস্তক' যে-বছর ছাপা হয়, সেই ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর 'সাম্য' বেরিয়েছিল। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে জন স্টুয়ার্ট মিলের মৃত্যুর পরে ১২৮২ সালে বৈশাখের 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর 'মিল, ডর্বিন ও হিন্দুধর্ম' ছাপা হয় এবং 'বিবিধ প্রবন্ধের' দ্বিতীয় ভাগে 'ত্রিদেব' সম্বন্ধে বিজ্ঞানশাস্ত্র কি বলে' নামে সংকলিত হয়। সে-কথাও বলা হ'য়েছে। এই সব—এবং অন্যান্য

৪। 'Matthew Arnold discussed and defined more clearly than any other writer before him the relation of the critic of literature to the society in which he lives. That is the subject of Culture and Anarchy, and of some of the Essays in Criticism. Here lies his distinctive contribution to the study of critical principles.'—The Making of Literature by R. A. Scott-James,

৫। বঙ্কিম প্রতিভার ক্রমবিকাশ—'বঙ্কিম প্রতিভা' দ্রষ্টব্য।

আরো কোনো কোনো রচনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে,—'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হবার আগে থেকেই দেশের দার্শনিক ঐতিহ্য, ধর্মচিন্তার ধারা, আধ্যাত্মিক উপলব্ধির বিভিন্ন সম্ভাবনা ইত্যাদি বিষয়গুলি তাঁর সতর্ক মনোযোগের লক্ষ্য হ'য়ে ওঠে,—এবং তাঁর ধর্ম্ম চিন্তা আর সাহিত্য-চিন্তা তাঁর ইতিহাস-চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গে অনুস্যুত হ'য়ে দেখা দেয়।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ১০ই অক্টোবর [২৫-এ আশ্বিন, ১২৯২] তারিখে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারকে তিনি যে চিঠি লেখেন, তাতে এ-সঙ্গে দুটি স্মরণীয় খবর ছিল—প্রথম, রবীন্দ্রনাথের উল্লেখ আর তাঁর অকুণ্ঠ প্রশংসা,—দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণ-চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মূল কথার সুস্পষ্ট প্রকাশ। সেই চিঠির আনুষঙ্গিক অংশ এখানে তুলে দেওয়া হোলো। প্রথমে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদার সম্বন্ধে তাঁর প্রশংসার কথা :

> 'পদরত্নাবলী পাইয়াছি। কিন্তু সুখ্যাতি কাহার করিব? কবিদিগের না সংগ্রহকারদিগের? যদি কবিদিগের প্রশংসা করিতে বল, বিস্তর প্রশংসা করিতে পারি। আর যদি সংগ্রহকারদিগের প্রশংসা করিতে বল, তবে কি কি বলিব আমায় লিখিবে, আমি সেইরূপ লিখিব। তুমি এবং রবীন্দ্রনাথ যখন সংগ্রহকার, তখন সংগ্রহ যে উৎকৃষ্ট হইয়াছে তাহা কেহই সন্দেহ করিবে না এবং আমার সার্টিফিকেট নিষ্প্রয়োজন। তথাপি তোমরা যাহা লিখিতে বলিবে লিখিব।'

দ্বিতীয়তঃ 'কৃষ্ণচরিত্রে'র অন্তর্নিহিত কথা বা অভিপ্রেত তত্ত্ব :

> 'কৃষ্ণ সম্বন্ধে যে প্রশ্ন করিয়াছ, পত্রে তাহার উত্তর সংক্ষেপে দিলেই চলিবে। আমি যাহা লিখিয়াছি [নবজীবনে ও প্রচারে] ও যাহা লিখিব, তাহাতে এই দুইটি তত্ত্ব প্রমাণিত হইবে।
>
> ১। শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছাক্রমে কদাপি যুদ্ধে প্রবৃত্ত নহেন।
>
> ২। ধর্মযুদ্ধ আছে। ধর্মার্থেই মনুষ্যকে অনেক সময়ে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হয় [যথা William the Silent]—ধর্মযুদ্ধে অপ্রবৃত্তি অধর্ম। সে সকল স্থানে ভিন্ন শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধে কখনও প্রবৃত্ত নহেন।
>
> ৩। অন্যে যাহাতে ধর্মযুদ্ধ ভিন্ন কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত না হয়, এ চেষ্টা তিনি সাধ্যানুসারে করিয়াছিলেন।

মনুষ্যে ইহার বেশি পারে না। কৃষ্ণচরিত্র মনুষ্যচরিত্র। ঈশ্বর লোকহিতার্থে মনুষ্যচরিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।'

১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যা 'বঙ্গদর্শনে' [১০৭৪] অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' সম্বন্ধে সমালোচনাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ প্রকাশ করেন। ১২৯০ সালের আশ্বিন সংখ্যা 'প্রচার' পত্রিকায় তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হ'তে শুরু হয়। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র—প্রথমভাগ' বই প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি লেখেন: 'আগে অনুশীলনধর্ম পুনর্মুদ্রিত হইয়া তৎপরে 'কৃষ্ণচরিত্র' পুনর্মুদ্রিত হইলেই ভাল হইত। কেন না 'অনুশীলনধর্মে' যাহা তত্ত্ব মাত্র, 'কৃষ্ণচরিত্রে' তাহা দেহবিশিষ্ট। অনুশীলনে যে আদর্শের উপস্থিত হইতে হয়, কৃষ্ণচরিত্র কর্মক্ষেত্রস্থ সেই আদর্শ। আগে তত্ত্ব বুঝাইয়া, তারপর উদাহরণের দ্বারা তাহা স্পষ্টীকৃত করিতে হয়। কৃষ্ণচরিত্র সেই উদাহরণ।'

এই প্রথমভাগ যখন বই হ'য়ে বেরোয়, 'প্রচার' পত্রিকায় তাঁর সে-আলোচনার ধারা তখনো এগিয়ে চলছিল। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে তিনি সে-সময়ে ব্যাপকভাবে চিন্তা ক'রছিলেন। সেই চিন্তার তাগিদেই 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' পত্রিকায় তিনি তিনটি প্রবন্ধ শুরু করেন—একটি অনুশীলনধর্ম বিষয়ে, দ্বিতীয়টি দেবতত্ত্ব বিষয়ে, তৃতীয়টি কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে। পর পর দু'বছরের মধ্যেও সেই ধারাবাহিক লেখা শেষ হয়নি ব'লেই 'কৃষ্ণচরিত্র প্রথমভাগ' তিনি 'অনুশীলনধর্মে'র আগেই ছেপে বের ক'রেছিলেন। ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পূর্ণ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' আলোচনা-সূত্রে তিনি এদেশের কাব্যে কৃষ্ণভক্তি এবং 'কৃষ্ণগীতির' দীর্ঘস্থায়িত্ব সম্বন্ধে মন্তব্য করেন। কৃষ্ণগীতি যদি কেবল অশ্লীল ইন্দ্রিয়-বিলাস অবলম্বনেই রচিত হ'য়ে থাকে, তাহলে দেশের পাঠক-সমাজে তা কখনোই সুদীর্ঘকাল সমাদৃত হোতো না। এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য। কৃষ্ণ যেমন আধুনিক বৈষ্ণব কবিদের নায়ক, জয়দেবের 'গীতিগোবিন্দে',—আরো আগে 'শ্রীমদ্‌ভাগবতে' তিনি সেই ভাবেই সমাদৃত। মহাভারতে,—শ্রীমদ্‌ভাগবতে,—জয়দেবের গীতগোবিন্দে এবং বিদ্যাপতির কাব্যে কৃষ্ণকে ঐশিক অবতার ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া হ'য়েছে। এই বিভিন্ন লেখক ও রচনাকালের মধ্যে ব্যবধান ও প্রভেদের তত্ত্ব

ভেবে দেখা দরকার। এক কাব্যের সঙ্গে অন্য কাব্যের প্রভেদের নানা কারণ থাকে। সেই কারণগুলি তিনি এইভাবে ভেবে দেখেছিলেন :

'কাব্যবৈচিত্র্যের তিনটি কারণ—জাতীয়তা, সাময়িকতা এবং স্বাতন্ত্র্য। যদি চারিজন কবি কর্তৃক গীত কৃষ্ণচরিত্রে প্রভেদ পাওয়া যায়, তবে সে প্রভেদের কারণ তিন প্রকারেই থাকিবার সম্ভাবনা। বঙ্গবাসী জয়দেবের সঙ্গে, মহাভারতকার বা শ্রীমদ্‌ভাগবতকারের জাতীয়তাজনিত পার্থক্য থাকিবারই সম্ভাবনা ; তুলসীদাসে এবং কৃত্তিবাসে আছে। আমরা জাতীয়তা এবং স্বাতন্ত্র্য পরিত্যাগ করিয়া, সাময়িকতার সঙ্গে এই চারিটি কৃষ্ণচরিত্রের কোন সম্বন্ধ আছে কিনা ইহারই অনুসন্ধান করি।'

এই প্রস্তাবের পরে, প্রথমে মহাভারত-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—মহাভারত প'ড়লে বোঝা যায় যে, সে-কাব্যের রচনাকাল গেছে দ্বাপর যুগে। সত্যযুগ এবং ত্রেতাযুগ দুইই তখন অতিক্রান্ত। তখন এ-দেশে আর্য পৌরুষ বাহুশক্রর ভয় থেকে নিশ্চিন্ত,—এবং আর্যজাতি তখন দেশের আভ্যন্তরিক সমৃদ্ধি সম্পাদনে উদ্যোগী। ভারতবাসীর মনে তখন এই প্রশ্নই সর্বাধিক জাগরূক যে, 'যাহা সকলে জয় করিয়াছে তাহা কে ভোগ করিবে?' মহাভারত সেই দ্বাপরের রচনা। তিনি ব'লে গেছেন :

'এরূপ সমাজে দুই প্রকার মনুষ্য সংসারচিত্রের অগ্রগামী হইয়া দাঁড়ান ; এক সমরবিজয়ী বীর, দ্বিতীয় রাজনীতিবিশারদ মন্ত্রী। এক মল্টকের, দ্বিতীয় বিসমার্ক ; এক গারিবল্‌দি, দ্বিতীয় কাবুর ; মহাভারতেও এই দুই চিত্র প্রাধান্য লাভ করিয়াছে, এক অর্জুন, দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণ।'

এই মন্তব্যের পরে তিনি লেখেন :

'এই মহাভারতীয় কৃষ্ণচরিত্র কাব্য, সংসারের তুলনারহিত যে ব্রজলীলা জয়দেব ও বিদ্যাপতির কাব্যে একমাত্র অবলম্বন, যাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে অত্যন্ত পরিস্ফুট, ইহাতে তাহার সূচনাও নাই। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণ অদ্বিতীয় রাজনীতিবিদ্—সাম্রাজ্যের গঠন বিশ্লেষণে বিধাতৃতুল্য কৃতকার্য—সেইজন্য ঈশ্বরাবতার বলিয়া কল্পিত, কিন্তু মহাভারতে ইনি অস্ত্রধারী নহেন, সামান্য জড়শক্তি বাহুবল ইঁহার বল নহে ; উচ্চতর মানসিক বলই ইঁহার বল। যে অবধি ইনি

> মহাভারতে দেখা দিলেন, সেই অবধি এই মহেতিহাসের মূল গ্রন্থি-রজ্জু ইঁহার হাতে—প্রকাশ্যে কেবল পরামর্শদাতা—কৌশলে সর্বকর্তা। ইঁহার কেহ মর্ম বুঝিতে পারেনা, কেহ অন্ত পায় না, সে অনন্ত চক্রে কেহ প্রবেশ করিতে পারে না।'

মহাভারতের কৃষ্ণচরিত্রের এই আলোচনা-ধারায়,—১২৮১ সালের সেই প্রবন্ধেই জানানো হয় যে, সেই অতিক্রান্ত আর্য পৌরুষের যুগে ভারতবর্ষ ছিল নানা খণ্ডে, নানা রাজ্যে বহুধা-বিচ্ছিন্ন। ভারতবর্ষের শান্তির জন্যেই কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের দরকার ছিল। শ্রীকৃষ্ণ ছিলেন পাণ্ডবদের পরমাত্মীয়, কিন্তু যেহেতু তিনি ঈশ্বরাবতার ব'লে কল্পিত, সেই কারণেই তিনি নিজে অস্ত্র ধারণ করেন নি। পাণ্ডবদের একেশ্বর করাও তাঁর অভীষ্ট ছিল না। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের ঐক্যসাধন। তাই মহাভারতের সেই কৃষ্ণচরিত্রের—'বিলাসপ্রিয়তার লেশমাত্র নাই—গোপবালকের চিহ্ন মাত্র নাই।'

মহাভারতের পরে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে আলোচনায় এগিয়ে গিয়ে, সেই প্রবন্ধেই তিনি দেখান যে, ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের অন্যতর অভ্যুদয় ঘ'টেছিল। নৈসর্গিক শক্তিকে দেবতা কল্পনা ক'রে আদিকালে যে পূজার রেওয়াজ ছিল, বৈদিক ও পৌরাণিক সেই দেবোপাসনার আদর্শে তখন মার্জিতবুদ্ধি আর্যজাতির আর তৃপ্তি ছিল না। তখন তাঁরা বুঝেছেন যে, সব শক্তিই কোনো-এক মূল শক্তির বিকাশবৈচিত্র্য মাত্র। জগৎকর্তা যদি এক এবং অদ্বিতীয় হন,—মন যদি সেই উপলব্ধিতে পৌঁছোয়, তাহলেই অতৃপ্ত বুদ্ধির সন্তুষ্টি ঘ'টতে পারে। কিন্তু ভক্তির মূল তখন নানা সংশয়ে শিথিল হ'য়ে গিয়েছিল। ফলে,—

> 'অর্ধাধিক ভারতবর্ষ নিরীশ্বর বৌদ্ধমত অবলম্বন করিল। সনাতন ধর্ম মহাসংকটে পতিত হইল। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইরূপে কাটিয়া গেলে শ্রীমদ্‌ভাগবতকার সেই ধর্মের পুনরুদ্ধারে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহাতে দ্বিতীয় কৃষ্ণচরিত্র প্রণীত হইল।'

শ্রীমদ্‌ভাগবতকারকে তিনি একাধারে দার্শনিক এবং কবি ব'লে গেছেন। সেই সূত্রে তাঁর একটি কথা খুবই স্মরণীয়। কথাটি এই—'আচার্য টিণ্ডল একস্থানে ঈশ্বর নিরূপণের কাঠিন্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি একাধারে উৎকৃষ্ট কবি, এবং উৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হইবে, সেই ঈশ্বর নিরূপণে সক্ষম হইবে।' অতঃপর দর্শনের কথা থেকে সাংখ্যদর্শনের কথা উঠেছিল। সাংখ্যকার যে

জগৎকে বিশ্লিষ্ট ক'রে পুরুষ এবং প্রকৃতি—এই দ্বি-প্রকৃতিতে ভাগ ক'রে দেখেছেন, সে-তত্ত্ব স্মরণ ক'রে তিনি বলেন—'ইহা প্রাচীন দর্শনশাস্ত্রের শেষ সীমা।' শুধু তাই নয়, সেই কথা থেকেই পাশ্চাত্ত্য দর্শনের কথা ওঠে। তিনি বলেন—'গ্রীক পণ্ডিতেরা বহু কষ্টে এই তত্ত্বের আভাসমাত্র পাইয়াছেন। অদ্যাপি ইউরোপীয় দার্শনিকেরা এই তত্ত্বের চতুঃপার্শ্বে অন্ধ মধুমক্ষিকার ন্যায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন।'

কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কিত তাঁর এই প্রবন্ধটি যে-সংখ্যায় ছাপা হয়, ঠিক তার আগের সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে'—১২৮১ সালের ফাল্গুনে হরিকিশোর তর্কবাগীশ প্রণীত 'ন্যায়পদার্থতত্ত্ব' বইখানির আলোচনাসূত্রে ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর ব্যক্তিগত অধিকারের ইশারা দেখা গেছে। সেই আলোচনায় তিনি লেখেন যে গোতম, কণাদ ঠিক কোন্ দেশবাসী তা নিশ্চিন্তভাবে বলা না গেলেও পরবর্তী যুগের উদয়নাচার্য যে সম্ভবতঃ বাঙালী ছিলেন—এবং রঘুনাথ শিরোমণি, মথুরানাথ তর্কবাগীশ, সিদ্ধান্তবাগীশ, কৃষ্ণদাস সার্বভৌম, গদাধর তর্কালঙ্কার, জগদীশ ভট্টাচার্য প্রভৃতি নৈয়ায়িকেরা যে বাঙালী ছিলেন,—ভারতবর্ষের মধ্যে নবদ্বীপেই যে ন্যায়শাস্ত্র সর্বাধিক মার্জিত এবং পরিপুষ্ট হয়,—আর, ন্যায়শাস্ত্রে এই অতিমনোযোগ ঘ'টেছিল ব'লেই নবদ্বীপ 'বাঙালীর প্রধান কীর্তি ও অকীর্তির জন্মভূমি'—এসব কথা তিনিই ব'লে গেছেন! সেই লেখাটিতে যেমন ন্যায়শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁর এই অনুসন্ধিৎসা দেখা গিয়েছিল, আলোচ্য 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রসঙ্গ থেকে এই সাংখ্যদর্শনের উল্লেখ-সূত্রে তেমনি সাংখ্যমতে তাঁর আগ্রহের কথা জানা যায়। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'সাংখ্যদর্শন' কৃষ্ণচরিত্রের আগেই লেখা হ'য়ে গিয়েছিল। তাঁর সে-লেখাটি ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের 'প্রবন্ধ-পুস্তকে' আগেই গ্রন্থভুক্ত হ'য়েছে। ১২৮১ সালের 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রবন্ধে তিনি তাঁর সেই লেখাটির কথাই স্মরণ করেন। সাংখ্যমতে প্রকৃতি ও পুরুষ পরস্পরে আসক্ত। যেমন স্ফটিকের পাত্রে জবা ফুলের ছায়া, প্রকৃতিতে পুরুষ সেইভাবে সংযুক্ত; এঁদের মধ্যে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদেই জীবের মুক্তি ঘ'টে থাকে,—অল্প কথায় সাংখ্যদর্শনের আসল কথার এই আভাস দেওয়া হ'য়েছিল।

এসব দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব। বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়ে গেছেন যে, শ্রীমদ্‌ভাগবতকার এই অঞ্চলটিকেই জনসাধারণের বোধগম্য ক'রে তুলেছিলেন। দেশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বঙ্কিম তাঁর নিজের কালকে এইভাবে সচেতন ক'রে

আমাদের সেকালের নিষ্প্রাণ ধর্ম-জিজ্ঞাসায় যেন নবজীবন সঞ্চার ক'রে গেছেন। তিনি ব'লে গেছেন :

'মহাভারতে যে বীর ঈশ্বরাবতার বলিয়া লোকমণ্ডলে গৃহীত হইয়াছিল, তিনি তাঁহাকেই পুরুষ স্বরূপে স্বীয় কাব্যমধ্যে অবতীর্ণ করিলেন, এবং স্বকপোল হইতে গোপকন্যা রাধিকাকে সৃষ্ট করিয়া, প্রকৃতিস্থানীয় করিলেন। প্রকৃতি পুরুষের যে পরস্পরাসক্তি, বাল্যলীলায় তাহা দেখাইলেন, এবং তদুভয়ে যে সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, জীবের মুক্তির জন্য কামনীয়, তাহাও দেখাইলেন। সাংখ্যের মতে ইহাদিগের মিলনই জীবের দুঃখের মূল—তাই কবি এই মিলনকে অস্বাভাবিক এবং অপবিত্র করিয়া সাজাইলেন।'

অতঃপর সংক্ষেপে তাৎপর্যের কথাও বলা হ'য়েছে :

'শ্রীমদ্‌ভাগবতের গূঢ় তাৎপর্য, আত্মার ইতিহাস—প্রথমে প্রকৃতির সহিত সংযোগ, পরে বিয়োগ, পরে মুক্তি।'

তারপর—

'জয়দেব প্রণীত তৃতীয় কৃষ্ণচরিত্রে এই রূপক একেবারে অদৃশ্য। তখন আর্য-জাতির জাতীয় জীবন দুর্বল হইয়া আসিতেছে। রাজকীয় জীবন নিবিয়াছে—ধর্মের বার্ধক্য আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। উগ্রতেজস্বী, রাজনীতিবিশারদ আর্য বীরেরা বিলাসপ্রিয় এবং ইতিহাসপরায়ণ হইয়াছেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি মার্জিতচিত্ত দার্শনিকের স্থানে অপরিণামদর্শী স্মার্ত এবং গৃহসুখবিমুগ্ধ কবি, অবতীর্ণ হইয়াছেন। ভারত দুর্বল, নিশ্চেষ্ট, নিদ্রায় উন্মুখ, ভোগপরায়ণ। অস্ত্রের ঝঞ্ঝনার স্থানে রাজপুরীসকলে নূপুরনিক্কণ বাজিতেছে—বাহ্য এবং আভ্যন্তরিক জগতের নিগূঢ়তত্ত্বের আলোচনার পরিবর্তে কামিনীগণের ভাবভঙ্গির নিগূঢ় তত্ত্বের আলোচনার ধুম পড়িয়া গিয়াছে। জয়দেব গোস্বামী এই সময়ের সামাজিক অবতার; গীতগোবিন্দ এই সমাজের উক্তি। অতএব গীতগোবিন্দের শ্রীকৃষ্ণ, কেবল বিলাসরসে রসিক কিশোর নায়ক। সেই কিশোর নায়কের মূর্তি, অপূর্ব মোহন মূর্তি; শব্দ-ভাণ্ডারে যত সুকুমার কুসুম আছে, সকলগুলি বাছিয়া বাছিয়া চতুর গোস্বামী এই কিশোর কিশোরী রচিয়াছেন; আদিরসের ভাণ্ডারে

যতগুলি স্নিগ্ধোজ্জ্বল রত্ন আছে, সকলগুলিতে ইহা সাজাইয়াছেন ; কিন্তু যে মহাগৌরবের জ্যোতি মহাভারতে ও ভাগবতে কৃষ্ণচরিত্রের উপর নিঃসৃত হইয়াছিল, এখানে তাহা অন্তর্হিত হইয়াছে। ইন্দ্রিয়পরতার অন্ধকার ছায়া আসিয়া, প্রখর সুখতৃষাতপ্ত আর্য পাঠককে শীতল করিতেছে।'

এইভাবে, মহাভারত, শ্রীমদ্‌ভাগবত এবং গীতগোবিন্দ,—যথাক্রমে এই তিন কাব্যে কৃষ্ণচরিত্রের বিবর্তন দেখিয়ে,—ইতিহাসের ধারায়—দ্বাদশ শতকের হৃতবীর্য বাঙালীর দুর্দিনের কথায় এসে পৌঁছেছিলেন তিনি :

'তারপর, বঙ্গদেশ যবনহস্তে পতিত হইল। পথিক যেমন বনে রত্ন কুড়াইয়া পায়, যবন সেইরূপ বঙ্গরাজ্য অনায়াসে কুড়াইয়া লইল। প্রথমে নামমাত্র বঙ্গ দিল্লীর অধীন ছিল, পরে যবনশাসিত বঙ্গরাজ্য সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইল। আবার বঙ্গদেশের কপালে ছিল, যে, জাতীয় জীবন কিঞ্চিৎ পুনরুদ্দীপ্ত হইবে। সেই পুনরুদ্দীপ্ত জীবন-বলে, বঙ্গভূমে রঘুনাথ ও চৈতন্যদেব অবতীর্ণ হইলেন। বিদ্যাপতি তাঁহাদিগের পূর্বগামী,—পুনরুদ্দীপ্ত জাতীয় জীবনের প্রথম শিখা। তিনি জয়দেবের প্রণীত চিত্রখানি তুলিয়া লইলেন—তাহাতে নূতন রঙ ঢালিলেন। জয়দেব অপেক্ষা বিদ্যাপতির দৃষ্টি তেজস্বিনী—তিনি শ্রীকৃষ্ণকে কিশোরবয়স্ক বিলাসরত নায়কই দেখিলেন বটে, কিন্তু জয়দেব কেবল বাহ্য প্রকৃতি দেখিয়াছিলেন—বিদ্যাপতি অন্তঃপ্রকৃতি পর্যন্ত দেখিলেন। যাহা জয়দেবের চক্ষে কেবল ভোগতৃষা বলিয়া প্রকটিত হইয়াছিল—বিদ্যাপতি তাহাতে অন্তঃপ্রকৃতির সম্বন্ধ দেখিলেন।'

জয়দেব এবং বিদ্যাপতির সময়গত বিভেদের কথা-প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য :

'জয়দেবের সময় সুখভোগের কাল, সমাজের দুঃখ ছিল না। বিদ্যাপতির সময় দুঃখের সময়। ধর্ম লুপ্ত, বিধর্মিগণ প্রভু, জাতীয় জীবন শিথিল, সবেমাত্র পুনরুদ্দীপ্ত হইতেছে—কবির চক্ষু ফুটিল। কবি, সেই দুঃখে, দুঃখ দেখাইয়া, দুঃখের গান গাইলেন। আমরা বঙ্গদর্শনের দ্বিতীয় খণ্ডে মানসবিকাশের সমালোচনা উপলক্ষে বিদ্যাপতি ও জয়দেবে প্রভেদ সবিস্তারে দেখাইয়াছি ; সেই সকল কথার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই। এস্থলে, কেবল

ইহাই বক্তব্য যে, সাময়িক প্রভেদ, এই প্রভেদের একটি কারণ। বিদ্যাপতির সময়ে, বঙ্গদেশে চৈতন্যদেবকৃত ধর্মের নবাভ্যুদয়ের, এবং রঘুনাথকৃত দর্শনের নবাভ্যুদয়ের পূর্বসূচনা হইতেছিল; বিদ্যাপতির কাব্যে সেই নবাভ্যুদয়ের সূচনা লক্ষিত হয়। তখন বাহ্য ছাড়িয়া, আভ্যন্তরিকে দৃষ্টি পড়িয়াছে। সেই আভ্যন্তরিক দৃষ্টির ফল ধর্ম ও দর্শন শাস্ত্রের উন্নতি।'

গ্রন্থ-সমালোচনার মূল দায়িত্ব উপলক্ষ ক'রে, এই প্রবন্ধে তিনি এইভাবে কৃষ্ণকথা আলোচনা করেন। লেখাটির শেষ দিকে সেই 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'র কথা স্মরণ ক'রে মাত্র এই ক'টি কথা বলা হয়:

'আমরা যে গ্রন্থকে উপলক্ষ করিয়া, এই কয়টি কথা বলিলাম, তৎসম্বন্ধে এক্ষণে কিছু বলা কর্তব্য। শ্রীযুক্ত বাবু অক্ষয়চন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত বাবু সারদাচরণ মিত্র 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' প্রকাশ করিয়াছেন। যে দুই খণ্ড আমরা দেখিয়াছি, তাহাতে কেবল বিদ্যাপতিরই কয়েকটি গীত প্রকাশিত হইয়াছে। বিদ্যাপতি প্রভৃতি উৎকৃষ্ট প্রাচীন কবিদিগের রচনা এক্ষণে অতি দুষ্প্রাপ্য। যাহাতে উহা পাওয়া যায়, তাহাতে এত ভেজাল মিশান, যে খাঁটি মাল বাছিয়া লইতে কাহারও প্রবৃত্তি হয় না। অক্ষয়বাবু ও সারদাবাবু উৎকৃষ্ট গীত সকল বাছিয়া শ্রেণীবদ্ধ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বিদ্যাপতির রচনা পাঠ পক্ষে সাধারণ পাঠকের একটি প্রতিবন্ধক এই যে তাঁহার ভাষা আধুনিক প্রচলিত বাঙ্গালা নহে—সাধারণ পাঠকের তাহা বুঝিতে বড় কষ্ট হয়। প্রকাশকেরা টীকায় দুরূহ শব্দ সকলের সদর্থ লিখিয়া সে প্রতিবন্ধকের অপনয়ন করিতেছেন। যে কার্যে ইঁহারা প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা গুরুতর, সুকঠিন, এবং নিতান্ত প্রয়োজনীয়। ইঁহারা সে কার্যের উপযুক্ত ব্যক্তি। উভয়েই কৃতবিদ্য এবং অক্ষয়বাবু সাহিত্যসমাজে সুপরিচিত। তিনি কাব্যের সুপরীক্ষক, তাঁহার রুচি সুমার্জিত, এবং তিনি বিদ্যাপতির কাব্যের মর্মজ্ঞ। দুরূহ শব্দ সকলের ইঁহারা যে প্রকার সদর্থ করিয়াছেন, তাহাতে আমরা বিশেষ সাধুবাদ করিতে পারি। ভরসা করি, পাঠকসমাজ ইঁহাদিগের উপযুক্ত সহায়তা করিবে।'

তাঁর রচনাধারায়—শুরু প্রবন্ধের দ্বিতীয় পর্বে, এই কৃষ্ণকথার সূচনায় পৌঁছে,— একটু বিস্তৃতভাবে তাঁর ঐতিহ্যচিন্তা,—প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য মতামতের ক্ষেত্রে তাঁর নিজস্ব ভাবনার প্রকৃতি,—সমকালীন কয়েকজন মনীষীপ্রসঙ্গ,—বাংলা সাহিত্যে 'ব্রাহ্ম-যুগ' আর 'বঙ্কিম-যুগের' ভাবনাভেদ,—উনিশ শতকের রেনেশাঁস সম্বন্ধে দু'একটি মতামত ইত্যাদির কথা উঠবে। ১২৮১ সালের বর্ষশেষ সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বোদ্ধৃত লেখাটি যখন ছাপা হয়, তার প্রায় সাত বছর আগে,—১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে [চৈত্র মাসে] নবগোপাল মিত্রের উদ্যোগে 'হিন্দু মেলা' প্রবর্তিত হয়। ১৮৬৮ তে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর অনুগামী ব্রাহ্মদের সঙ্গে নিয়ে নগর কীর্তন করেন। তারপর ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে,—অর্থাৎ যে বছর 'বঙ্গদর্শন' শুরু হয়, সেই বছরেই বিবাহবিধি সম্বন্ধে হিন্দুধর্মের পূর্বাভ্যস্ত সংস্কার ত্যাগ ক'রে, কেশবচন্দ্র 'সিভিল ম্যারেজ' আইন পাশ ক'রিয়েছেন। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন আদি-ব্রাহ্ম-সমাজের মানুষ। কেশবচন্দ্রের ঐ ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হ'য়ে, তিনি 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বিষয়ে বক্তৃতা দেন। বিদ্যাসাগরের 'বহুবিবাহ' প্রথম খণ্ড বেরিয়ে গেছে ১৮৭১-এ, দ্বিতীয় খণ্ড বেরোয় ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের মন্তব্য উচ্চারিত হয়—এবং তারই ফলে 'অমৃতবাজার পত্রিকায়' [২৩এ অক্টোবর, ১৮৭৩] তাঁর সে-মন্তব্যের বিরুদ্ধে সমালোচনা হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তখন বহরমপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট। সেই বছরেই ১৫ই ডিসেম্বর তিনি যখন পালকিতে বাড়ি ফিরছিলেন, সেই সময়ে বহরমপুর ক্যান্টনমেণ্ট-কম্যাণ্ডিং-অফিসার লেফ্‌টেনাণ্ট-কর্নেল ডাফিন তাঁকে অপমান করেন। মৌখিক অপমান আর শারীরিক বলপ্রয়োগ দুইই ঘ'টেছিল! ডাফিনের বিরুদ্ধে বঙ্কিম আদালতে মামলা দায়ের করেন। অপরাধী ডাফিন তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে বাধ্য হন এবং তিনিও অতঃপর অভিযোগ প্রত্যাহার করেন। সেই বহরমপুরে অবস্থান-পর্বে তাঁর সরকারী কর্মজীবন এবং ব্যক্তিগত ভাবজীবন —দুইই সক্রিয়তায়, গৌরবে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেই পরিপূর্ণতার প্রহরেই 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্বন্ধে গভীর অনুভূতি-চিহ্নিত তাঁর এই আলোচনা ছাপা হয়।

দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর যে বন্ধুত্ব ছিল,—কেশবচন্দ্র সেন সম্বন্ধেও তিনি যে অনুরাগী ছিলেন,—আরো পরে প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের সম্পর্কেও যে তিনি আগ্রহ প্রকাশ করেন,—আবার ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শশধর তর্কচূড়ামণি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী, রামকৃষ্ণ পরমহংস ইত্যাদি মনীষী ও

সাধকদের সাধনাতে-চিন্তাতে হিন্দুধর্মের যে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ দেখা দেয়, তিনি যে সেদিকেও অনুরাগী ছিলেন, সে-সব প্রসঙ্গ অনেকেই আলোচনা ক'রেছেন।

কোনো কোনো বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের যে মতভেদ ছিল—বা কোনো কোনো বিষয়ে পরস্পরের সমর্থনের যে অভাব ছিল, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্যের 'স্মৃতিকথা' থেকে তার নজির পাওয়া যায়। এইসব 'স্মৃতিকথা' বিপিনবিহারী গুপ্তের নিজস্ব সংগ্রহ। ১৩২০ সালে প্রকাশিত তাঁর 'পুরাতন প্রসঙ্গ' বইখানিতে সে-সব কথা বলা হ'য়েছিল। বিদ্যাসাগর মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ পছন্দ ক'রতেন না। বিদ্রূপ ক'রে তিনি নাকি ব'লতেন :

'তিলোত্তমা বলে ওহে শুন দেবরাজ,
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব।'

বিপিনবিহারীর এই 'পুরাতন প্রসঙ্গ' থেকেই জানা যায় যে, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলীর বিষয়বস্তু সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের আপত্তি ছিল না, কিন্তু তাঁর প্রকাশ-রীতি সম্বন্ধে তাঁর খুবই আপত্তি ছিল। কৃষ্ণকমলের মতে, ইংরেজি সাহিত্যে ক্র্যাব এবং কাউপার যে পরিবর্তন এনেছিলেন,—ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের রচনাতে যে পরিবর্তন-ধারার একটা চরম বিকাশ দেখা গিয়েছিল,—বঙ্কিমের বিদ্রোহ আর, সে-বিদ্রোহের ফল কতকটা তারই সঙ্গে তুলনীয়। বলা বাহুল্য, এসব কথা ভেবে দেখা দরকার।

ক্র্যাব এবং কাউপার ইংরেজি সাহিত্যে যে-পরিবর্তন আনবার চেষ্টা ক'রেছিলেন বা এনেছিলেন, বঙ্কিমচন্দ্রের সামর্থ্য বা সিদ্ধির সঙ্গে তার তুলনা আদৌ চলে কিনা সেটাও আজ বিচার্য বিষয়। কিন্তু সে-প্রসঙ্গ আপাততঃ স্থগিত থাক। বিদ্যাসাগরের প্রতিবাদে বঙ্কিমচন্দ্র যে বিচলিত হননি, কৃষ্ণকমলের সেই কথাটাই এখানে স্মরণীয়। তিনি ব'লে গেছেন :

'বঙ্কিমের হাতে বাঙ্গালা সাহিত্য নূতন রূপ ধারণ করিল। একদিন বঙ্কিম আমাকে বলিলেন, 'বিদ্যাসাগর বড় বড় সংস্কৃত কথা প্রয়োগ করে বাঙ্গালা ভাষার ধাতটা গোড়ায় খারাপ করে গেছেন'। আমারও অনেকটা ঐরকম মত।'

হুগলী-কলেজের ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র 'সংবাদ প্রভাকরে' যে-কবিতা লিখেছিলেন, তাতে ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবের লক্ষণ স্পষ্ট। পুস্তকাকারে অপ্রকাশিত তাঁর বাল্যরচনার অন্তর্ভুক্ত সেটি। তাঁর এই পদ্যরচনা ১৮৫২

খ্রীষ্টাব্দের পঁচিশে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয়। নিচে লেখাটির অল্প একটু অংশ তুলে দেওয়া হোলো :

চন্দ্রাস্য সহাস্য করে, উষাকালে সতী।
প্রিয়করে করি করে, কহে পতি প্রতি ॥
প্রিয়া প্রতি পতি তার, করিছে উত্তর।
চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্বর ॥

অতঃপর পয়ার ছন্দে স্ত্রী-পুরুষের উক্তি-প্রত্যুক্তি চ'লেছে। এখানে সেই উক্তি-প্রত্যুক্তিরও কিঞ্চিৎ নমুনা দেওয়া হোলো :

স্ত্রী—গন্ধবহ গন্ধ বহে, ভ্রমে কি কারণ।
পুরুষ—পরস্পর সখা তারা, জান না কি প্রাণ ॥
স্ত্রী—সখা হোলে একাঙ্গ কি, হয় গুণমণি।
পুরুষ—ভাবের এমনি ভাব, এভাব এমনি ॥

১৮৭০ থেকে ১৮৯০ এর মধ্যে বঙ্কিম-জীবনের নানা কর্ম, ও বিচিত্র চিন্তার ধারায় এইসব সম্পর্কের কথা বিবেচ্য। বিদ্যাসাগর, গিরিশচন্দ্র, কেশবচন্দ্র সেন, বিপিনচন্দ্র পাল, ইত্যাদি মনীষীদের সঙ্গে তাঁর যথার্থ সম্পর্কের স্বরূপ কী ছিল, তাও ভেবে দেখা দরকার। বঙ্কিমচন্দ্রের গুরু-প্রবন্ধের এই দ্বিতীয় পর্বের আলোচনা-প্রসঙ্গে এসব উল্লেখ অবান্তর মনে করা ঠিক হবে না। ধর্মতত্ত্বে, কৃষ্ণচরিত্রে তিনি দেশের পূর্ব-ঐতিহ্য এবং তাঁর নিজের কালের দাবি,—দু' দিকেই সচেতনতা দেখিয়ে গেছেন। ব্রাহ্ম চিন্তা,—গোঁড়া হিন্দু বিশ্বাস,—পশ্চিমের মতবাদ,—সবই তিনি দেখেছেন,—সবই তিনি ভেবেছেন।

বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিম-যুগের বেশ কিছুকাল পরে,—চিত্তরঞ্জন দাশের [১৮৭০-১৯২৫] 'নারায়ণ পত্রিকা'র উৎসাহী লেখকদের মধ্যে ছিলেন বিপিনচন্দ্র পাল [১৮৫৭-১৯৩২]। তার আগে, রবীন্দ্রনাথ যখন 'বঙ্গদর্শন'-এর সম্পাদনা পরিত্যাগ করেন, সেই সময়ে বিপিনচন্দ্র 'বঙ্গদর্শনে, রবীন্দ্র-সাহিত্যের তথাকথিত বস্তুতন্ত্রতার অভাব উল্লেখ ক'রে বিরুদ্ধ সমালোচনা শুরু করেন। 'বঙ্গদর্শনের' সে-আলোচনার বিরুদ্ধে 'প্রবাসী' পত্রিকায় অজিতকুমার চক্রবর্তী প্রতিবাদমূলক রবীন্দ্রকাব্য-বিশ্লেষণে আত্ম-নিয়োগ করেন। অতঃপর ১৫ই বৈশাখ ১৩২১ প্রমথ চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের কাছে উৎসাহ পেয়ে প্রসিদ্ধ 'সবুজপত্র' সম্পাদনা শুরু করেন। 'চিঠিপত্র' বইয়ের

পঞ্চম খণ্ডে দেখা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ এই 'সবুজপত্রের' জন্যে 'কনিষ্ঠ'-নামটি ভেবে রেখেছিলেন। যাই হোক, 'সবুজপত্র' নামেই সে-পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। এই 'সবুজপত্রের' বিরোধী পত্রিকা হিসেবে ১৩২১ সালের অগ্রহায়ণে চিত্তরঞ্জনের 'নারায়ণ' পত্রিকার আবির্ভাব। এই সময়ে 'সবুজপত্রের' সম্পাদক প্রমথনাথের অনুসৃত চলিত-ভাষার বিরুদ্ধে বিপিনচন্দ্র খুবই উৎসাহের সঙ্গে সমালোচনায় উদ্যত হন। ১৩২৮-৩১ সালে 'বঙ্গবাণী' পত্রিকায় 'বাংলার নবযুগের কথা' নাম দিয়ে তিনি ধারাবাহিক ভাবে ষোলটি প্রবন্ধ লেখেন। ১৩৬২ সালের বৈশাখে সেই লেখাগুলি 'নবযুগের বাংলা' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হ'য়েছে। তাঁর এই বইখানিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে পর পর চারটি প্রবন্ধ আছে—'সাহিত্যে নবযুগ—বঙ্গদর্শন ও বঙ্কিমচন্দ্র,' 'বঙ্কিম সাহিত্য', 'বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মব্যাখ্যা', এবং 'বঙ্কিম-সাহিত্যে রাষ্ট্রনীতি'। উনিশ শতকে বাংলা ভাষায় ধর্মতত্ত্ব, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক গবেষণা, গল্প-উপন্যাস, কবিতা, নাটক-নাটিকা,—এমনকি গ্রাম্যগাথা ইত্যাদি যাবতীয় রচনা এবং আলোচনা—যা কিছু ভাবা হ'য়েছে, লেখা হ'য়েছে—সেই সমগ্রতাকে তিনি 'নবযুগের সাহিত্য' ব'লে অভিহিত করেন। তাঁর নিজের কথায়—'যে সাহিত্য সৃষ্টির মধ্যে এই প্রাণবস্তু বিশেষভাবে ফুটিয়াছে, তাহাকে বিশিষ্ট অর্থে বাংলার নবযুগের সাহিত্য কহিতে পারা যায়।' রামমোহন থেকে আরম্ভ ক'রে, কেশবচন্দ্র পর্যন্ত বাংলার সাহিত্য-প্রবাহে তিনি ব্রাহ্মসমাজের নেতৃবৃন্দের বিশেষ অধিকার লক্ষ্য ক'রে গেছেন। তারপর 'বঙ্গদর্শনের' আমল থেকে তিনি দেখেছেন বঙ্কিম-যুগের সূচনা। আবার, তাঁরই নিজের কথায়:

> 'বঙ্গদর্শনের' পূর্বেকার আধুনিক বাংলা সাহিত্যকে মোটের উপরে ব্রাহ্মযুগের সাহিত্য বলিতে পারা যায়। ব্যক্তিগত চরিত্রের শুদ্ধতা সাধন এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার প্রেরণায় সমাজ-সংস্কার ইহাই আধুনিক বাংলার ব্রাহ্মযুগের প্রধান লক্ষণ। এই দুইটি লক্ষণই এই যুগের বাংলা সাহিত্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস মোটামুটি দুইভাগে বিভক্ত। এক ব্রাহ্মযুগ, আর এক বঙ্কিম-যুগ। 'বঙ্গদর্শন' এই বঙ্কিমযুগের সূচনা করে।'

ব্রাহ্মযুগের বাংলা সাহিত্যে যথার্থ মৌলিকতার অভাব ছিল,—এই মন্তব্য জানিয়ে তিনি বলেন যে, রামমোহনের পরবর্তী ব্রাহ্মসমাজ ইউরোপীয়

চিন্তার প্রভাবে অনেকটা বদলে গিয়েছিল ব'লেই সাহিত্যে যথার্থ মৌলিক রচনার অভাব ঘ'টেছিল। কিন্তু এখানে এ নিয়ে চুল-চেরা আলোচনা বাহুল্য। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, তাঁর এ যুক্তি অবান্তর। আসল কথা, সৃজনধর্মী রচনা যে-শ্রেণীর মন থেকে নিঃসৃত হয়, তখনো সত্যিকার সেই মনেরই অভ্যুদয় ঘটেনি। বঙ্কিম-যুগেই যে প্রথম মৌলিক বাংলা সাহিত্যের অভ্যুদয় ঘ'টেছিল, সে-কথা তিনিও ব'লে গেছেন। এই সূত্রে বিপিনচন্দ্রের বিষয়ে ধূর্জটিপ্রসাদের মন্তব্য মনে আসে। ধূর্জটিপ্রসাদ লিখেছিলেন :

> 'শ্রীঅরবিন্দের পর স্বদেশী-বিদেশী চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রেই বিপিনচন্দ্র পালকে বাংলার জাতীয়তাবোধের প্রধান দার্শনিক ব্যাখ্যাকার ভেবে এসেছেন। তাঁরই কল্যাণে আমরা বুঝেছি যে, বাংলার বৈশিষ্ট্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও বৈষ্ণব পদাবলী। তাঁর ব্যাখ্যার প্রচার-কার্যে সহায়ক হ'য়েছিলেন চিত্তরঞ্জন, তাঁর সমসাময়িক নেতাদের মধ্যে মতিলালবাবু নিতান্ত পরিচিত কারণে এই মতেরই প্রচার করেন। তাই আজ আমাদের বিশ্বাস, বাংলার কৃষ্টি আর বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্য এক বস্তু।
>
> এই মতটি সম্পূর্ণ ভুল। যদিও স্বীকার ক'রতে হবে যে, আমাদের সমাজে, বিশেষতঃ সাহিত্যে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব খুবই ব্যাপক। সমাজের অন্তরে কোন্ প্রভাবের কতটুকু ব্যাপ্তি মাপা না গেলেও বলা চলে যে, উচ্চশ্রেণীর মধ্যে পৌরাণিক হিন্দুয়ানি এবং নিম্নশ্রেণীর মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসারই বেশি, যদিও খুব কম বৈষ্ণবই দেখেছি যাঁরা পৌরাণিক হিন্দুয়ানির শাক্ত-অংশটুকুর সঙ্গে অন্য অংশগুলি বাদ দেন। আদমশুমারিতে খাঁটি বৈষ্ণবদের সংখ্যা দু' লক্ষের কিছু বেশি। চলতি হিন্দুয়ানির মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের ছাপও যথেষ্ট। তা ছাড়া ইস্‌লাম ও খ্রীষ্টান সভ্যতার বিপক্ষে আত্মরক্ষা ও তাদের সঙ্গে আদান-প্রদানে হিন্দু-সমাজে বিস্তর পরিবর্তন ঘ'টেছে—যার ফলে হিন্দু-সমাজ বর্তমান আকার ধারণ ক'রেছে। আমার বক্তব্য হল এই—আদান-প্রদানেই বাংলার বৈশিষ্ট্য, ভাবের উচ্ছ্বাসে নয়।'[৬]

সেকালের এইসব ব্যক্তিত্বের—এবং এইসব ভাবাদর্শ-তাড়িত,—বা এই ধরনের

৬। বক্তব্য : পৃঃ ১৭৬-১৮৭ দ্রষ্টব্য।

আদর্শ-সংঘাতময় নবযুগোন্মেষের কথাসূত্রে এখানে আরো একটি মন্তব্য স্মরণীয়। ১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীসুবোধকৃষ্ণ ঘোষালের সঙ্গে স্বর্গত অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকারের যে আলোচনা হয়, তা'তে ঘোষাল মশায়ের প্রশ্নের উত্তরে অধ্যাপক সরকার ব'লেছিলেন—'বাঙালী জাতের অন্যতম গঠনকর্তা গিরিশ।' তাঁরই নিজের কথায়—'স্রষ্টাদের যে-শতকে শেক্সপীয়র, মোলিয়েয়ার, গ্যেটে আর ভিক্তর হ্যুগোর ঠিকানা, সেই শতকেই গিরিশেরও ঠিকানা।' তিনি আরো বলেছিলেন—'রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণের কাহিনীও গিরিশের মারফৎ উনবিংশ শতাব্দীর বঙ্গ-দর্শনরূপে দেখা দিয়েছে।' শুধু তাই নয়,—'গিরিশ-সাহিত্য বিশ্বকোষ। তার ভেতর ধর্ম আছে, হাসি আছে, ইতিহাস আছে, রাজনীতি আছে।'

কিন্তু এতৎসত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের রচনা নিয়ে দেশে যে-রকম ব্যাপক উৎসাহ দেখা গিয়েছিল, গিরিশচন্দ্রের লেখা অবলম্বন ক'রে ঠিক সে-অনুপাতে যথার্থ উত্তেজনা-উদ্দীপনা দেখা দেয়নি কেন,—সে-প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন যে, শহর থেকে দূরে থেকেও গল্প-উপন্যাসের পাঠকসমাজ নিজেদের ইচ্ছে-মতন গল্প-উপন্যাস প'ড়তে পারেন। তাঁদের তো তৃতীয় কোনো পক্ষের ওপর নির্ভর ক'রতে হয় না। অন্য দিকে, এও ঠিক যে, নাটক তো শুধু পড়বার জিনিস নয়, নাটকের অভিনয় দেখতে হয়। আর, সারা দেশের সর্বত্র অভিনয় দেখাবার মতন উপযুক্ত আয়োজন কোথায়? তাই কথা-সাহিত্যিক যতো খ্যাতি পেয়ে থাকেন, নাট্যকারের পক্ষে ঠিক সে-রকম সুবিস্তীর্ণ খ্যাতির অধিকারী হওয়া সহজ নয়। সেখানে এই খ্যাতিভেদের উল্লেখ ক'রে তিনি পুনরায় ব'লে গেছেন—'ঘটনাচক্রে আমরা 'বঙ্কিমের যুগ' দেখতে পাই। কিন্তু গিরিশের 'যুগ' আজও কেহ বলে না। আমার বিবেচনায় গিরিশের যুগ' ও বঙ্কিমের যুগের সঙ্গে-সঙ্গেই চলা উচিত ছিল।' তাঁর মতে, দেশে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্বন্ধে পাঠক-সমাজের আগ্রহ ছ'ড়িয়ে পড়বার সঙ্গে-সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের অভ্যুদয় ঘ'টেছিল ব'লেই গিরিশচন্দ্র সম্বন্ধে সমুচিত উৎসাহ ছড়াতে পারেনি। তাছাড়া গিরিশচন্দ্রের অনুকূলে শক্তিশালী পত্রিকার অভাবও একটা কারণ। প্রশ্নকর্তা জিগেস ক'রেছিলেন যে, স্বদেশী-আন্দোলনের সময়ে [১৯০৫-১৪] বঙ্কিমচন্দ্র আর রবীন্দ্রনাথ দুজনেরই সমাদর হ'য়েছিল, কিন্তু গিরিশচন্দ্রের তা হয়নি কেন? তার উত্তরে অধ্যাপক ব'লেন যে, গিরিশ-চন্দ্রের সমুচিত প্রচার ছিল না ব'লেই তা হয়নি!

এসব প্রসঙ্গ থেকে পুনরায় এই ধারণাই সমর্থিত হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র যখন পূর্ণ শক্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন, বাংলা দেশে তখন এক ব্যাপক জাগরণের কাল গেছে। সে এক রেনেশাঁস-পর্ব! বাংলার 'রেনেশাঁস' কথাটী যে একালে অনেক আলোচকের আলোচনায় দেখা যাচ্ছে এবং বর্তমানে বিপুলসংখ্যক লেখক যে এ-শব্দটি কিঞ্চিৎ অসতর্কভাবে ব্যবহার ক'রছেন, সে-বিষয়ে বাগ্‌বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। ১৯৫৪ খ্রীষ্টাব্দের একটি লেখাতে শ্রীযুক্ত অন্নদাশঙ্কর রায় যা জানিয়েছেন, তার মূল কথাটা এই: 'বিদেশ থেকে বাংলায় এসে 'রেনেশাঁস' শব্দটির এক রকম অর্থবিকৃতি ঘ'টেছে। অভিধান অনুসারে এ-কথার মানে 'নবজন্ম'। কিন্তু যে-কোনো 'নবজন্মের' নাম 'রেনেশাঁস' নয়। অন্নদাশঙ্কর পৃথিবীর ইতিহাসের সুদীর্ঘ এবং বিচিত্র ধারা ধ'রে 'রেনেশাঁসের' ঐতিহাসিক বিবর্তন বিশ্লেষণের সূত্র-নির্দেশের চেষ্টা করেন নি। তবে, 'রেনেশাঁসের' ইতিহাস সম্বন্ধে স্পষ্ট কোনো ধারণা না থাকলে ও-শব্দ যেখানে-সেখানে প্রয়োগ করা যে অন্যায়, সে-কথা তিনি স্পষ্টভাবেই জানিয়েছেন।

রেনেশাঁসের লক্ষণ সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য:

> 'রেনেশাঁসের প্রথম লক্ষণ অন্তহীন জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল। ...শাস্ত্র কিংবা সংঘ কিংবা গুরু কিংবা সাধু কেউ অভ্রান্ত নন। মানুষ তার স্বাধীন চিন্তা ও পরীক্ষার দ্বারা সত্য নির্ণয় করবে।... দ্বিতীয় লক্ষণ অশঙ্কিত রূপভোগ সৌন্দর্যভোগ।...তৃতীয় লক্ষণ মানবের আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। সে শক্তি শয়তানের চেয়েও বেশি, দেবদেবীর চেয়েও বেশি, প্রায় ভগবানের সমান।'[৭]

এই তিন লক্ষণ সম্বন্ধে তর্জনী নির্দেশ ক'রে, মানুষের অন্তহীন জিজ্ঞাসা,—তার বিচার-প্রয়াস,—এবং তার আত্মশক্তির অনুশীলনের কথাসূত্রে মানুষের চন্দ্রলোক-পরিক্রমার আসন্ন সম্ভাবনা সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হ'য়েছিল তাঁর সেই ছোট লেখাটিতে।

লঘু আর গুরু—দু'রকম প্রবন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের ভাবের ক্ষেত্রে সেই স্বাধীনতা, ঐতিহ্যবোধ এবং আত্মপ্রত্যয় জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর সাহিত্য-প্রেরণার মূলে ছিল রেনেশাঁসের অনুভূতি। উনিশ শতকে এই

৭। কণ্ঠস্বর [শ্রাবণ ১৩৬১]—'রেনেশাঁস' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

রেনেশাঁসের প্রধান হোতা কে কে ছিলেন, তা নিয়ে দেশে মতভেদ ঘ'টেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যকীর্তি বিচারের সময়ে সে-সব মত বা মতান্তরের কথা অবান্তর মনে করা ঠিক হবেনা। সেই কারণেই এখানে কথায়-কথায় কথা বেড়ে গেল।

মোহিতলাল মজুমদার মনে করেন যে, বাংলার প্রথম রেনেশাঁস ঘ'টেছিল ষোড়শ শতাব্দীতে। আমাদের দ্বিতীয় রেনেশাঁসের যুগ ব'লে উনিশ শতকের দিকে তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এই দ্বিতীয় যুগেই বাংলার সাধনা সমগ্র-ভারতে পরিব্যাপ্ত হ'য়েছে ব'লে তিনি বিশেষ গৌরব বোধ ক'রেছিলেন। তাঁর 'বাংলার নবযুগ' বইখানিতে এ বিষয়ে আলোচনা আছে। তাছাড়া 'বাংলা ও বাঙালী' [১৩৫৮] বইয়েও এ বিষয়ে তিনি দু-একটি কথা ব'লে গেছেন। উনিশ শতকে বাঙালী যে অন্ধভাবে স্বধর্ম ত্যাগ ক'রে বিদেশীভাবের সাধনায় আত্মনিয়োগ ক'রেছিল,—তাঁর মতে, সে কথা মোটেই গ্রাহ্য নয়। মোহিতলাল সমুচিত জোরের সঙ্গেই তা অস্বীকার ক'রেছেন। ইংরেজি শিক্ষা মধ্যযুগের বাঙালীর মনের [প্রধানতঃ হিন্দু-বাঙালী সম্বন্ধেই মোহিতলালের এই মন্তব্য] আত্মসংকোচ বা কমঠবৃত্তির অবসান ঘ'টিয়েছিল ; তারই ফলে এক 'নবীভূত জীবনী-শক্তির অকুতোভয়তায়' সেই মন জেগে ওঠে! সেই জাগরণের ফলে,—তাঁরই নিজের কথায় বলা যেতে পারে :

> 'এ যুগের প্রথমভাগে তিনজন বাঙালী ঐ নবযুগের নূতন ভাবগঙ্গার গঙ্গাধর হইয়াছিলেন—তিনজন তিনরূপে। প্রথম রামমোহন, দ্বিতীয় বিদ্যাসাগর, তৃতীয় মধুসূদন ; রামমোহনের বুদ্ধি, বিদ্যাসাগরের হৃদয়বল, এবং মধুসূদনের স্বাধীনতা। এই তিনজনের প্রথম দুইজনের জীবনে—সেই ব্রাহ্মণ্য-যুগের বাঙালী-সংস্কৃতিরই দুইটি চরিত্র-ভঙ্গি দেখিতে পাওয়া যায় ; একটিতে—নৈয়ায়িক বুদ্ধির ব্যক্তি-স্বতন্ত্র তত্ত্বনিষ্ঠা, অপরটিতে—ব্যক্তির আত্মচর্চার উপরে সামাজিক ন্যায় ও ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করিবার হৃদয়বত্তা ও তেজস্বিতা। কিন্তু আমরা বাঙালীর যে স্বধর্ম বা ধাতুগত বৈশিষ্ট্যের বিকাশ অনুসরণ করিতেছি, তাহার দিক দিয়া 'এহ বাহ্য'। এ-যুগে সেই বাঙালী প্রাণের একটি প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কবি মধুসূদনের জীবনে ও চরিত্রে।'

মধুসূদনের জীবনে ও চরিত্রে মোহিতলাল যে অনন্যসাধারণ 'খাঁটি

'বাঙালী' ভাব লক্ষ্য ক'রেছিলেন, তাঁর সে দৃষ্টি যে সত্যিই বিশিষ্টতার দাবি করে, তাতে সন্দেহ নেই। এ প্রতিভাকে তিনি বলেছেন 'বাঙালীত্বেরই একটি প্রবলতম প্রকাশ'। তাঁরই নিজের কথায় বলা যায়:

> 'আর কিছুকেই মানিব না, নিজ-প্রাণের সেই প্রবল স্বাধীন আহুতিকে ছাড়া—এই ভাবতান্ত্রিক স্বভাবচর্যার মধ্যে সেই সহজিয়া ধর্মের প্রেরণা রহিয়াছে।······মধুসূদনের সাহেবিয়ানা, তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম-গ্রহণ প্রভৃতির অন্তরালে যে কোন্ বাঙালী-স্বভাব সেই ব্রাহ্মণ্য শাসনের নির্জীব নিয়মতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছিল, তাহা আমরা আজও ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই; বুঝিতে পারি নাই যে, ঐ পুরুষ হিন্দুও নয়, খ্রীষ্টানও নয়—একেবারে সেই আদি ও অকৃত্রিম বাঙালী।'[৮]

এদেশে উনিশ শতকের রেনেশাঁস প্রধানতঃ বাংলা ও বাঙালীরই আত্মাবিষ্কার,—এই ছিল মোহিতলালের ধারণা। এই রেনেশাঁসকে যাঁরা ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজের দান ব'লে মনে করেন, মোহিতলাল তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ব্যঙ্গবিদ্রূপের শরাঘাতে তাঁদের খুবই আঘাত করবার চেষ্টা ক'রেছেন। এ-রেনেশাঁসকে তিনি কিছুতেই ইংরেজি প্রভাবের ফল ব'লতে চাননি। উনিশ শতকের হীনচিত্ত বাঙালীর ইংরেজিয়ানার ফলেই বিজাতি-প্রভাব সম্বন্ধে পূর্বোক্ত মহিমাবোধ জেগেছিল,—এই তাঁর বিশ্বাস! যদুনাথ সরকার তাঁর মোগল ইতিহাসের শেষ পর্বে 'ইণ্ডিয়ান রেনেশাঁস' নামটি ব্যবহার ক'রেছেন ব'লে তাঁর উদ্দেশেও মোহিতলালের তিরস্কার বর্ষিত হয়। কারণ, তিনি মনে করেন—

> 'প্রকৃতপক্ষে উহা ভারতের কিছু নয়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের সেই সর্বব্যাপী অন্ধকারে একমাত্র এই বাংলাদেশেই আলোক জ্বলিয়াছিল; অতএব উহা বাংলার রেনেশাঁস, ভারতের নহে। বাংলার বাহিরে এখানে ওখানে দুই একটি বর্তিকা জ্বলিয়া থাকিলেও তাহাতে সেই প্রতিভার উদ্দীপ্তি ছিল না।''

উনিশ শতকের বাঙালীর মানস-জীবন ও পারিপার্শ্বিক পরিবেশ সম্বন্ধে মোহিতলালের বিশ্লেষণের আদর্শ তাঁর নিজের কথাতেই আর-একভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। এখানে-সে-কথাগুলিও উদ্ধারযোগ্য:

৮। বাংলার নবযুগ: মোহিতলাল মজুমদার

'বিষয়টি ঐতিহাসিক, সে কারণে আলোচনাও খাঁটি ইতিহাসসম্মত হওয়াই উচিত ; কিন্তু আমি ঐতিহাসিক নই, বরং ইতিহাস রচনায় অধুনা যে কঠোর বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি পালনীয় হইয়াছে তাহার প্রতি আমার শ্রদ্ধা নাই। তথাপি, ইতিহাস বলিতে ঘটনার যে কালক্রমিক তরঙ্গ-পরম্পরাও বুঝায় আমি তাহার একটি উদার দৃশ্যপট সম্মুখে প্রসারিত রাখিয়াছি, সেই তরঙ্গরাজির উন্নত-শীর্ষমালাই আমার ধ্যান-চিন্তার প্রধান সহায় হইয়াছে। কোন যুগের ভাবধারা—জাতির জীবনের গতি ও পরিণাম—বুঝিয়া লইবার পক্ষে, ঐতিহাসিক মালমশলার যুক্তিসংগত ব্যবহারও একটা প্রাথমিক প্রয়োজন বটে, কিন্তু তদপেক্ষা অধিকতর প্রয়োজনীয় যাহা তাহা ঐ জাতির বিশিষ্ট সাধনা ও তাহার চরিত্ররূপ নিয়তির সহিত যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠ ও সশ্রদ্ধ পরিচয়।'

কথায় কথায় বঙ্কিম-প্রসঙ্গ থেকে অন্যান্য নানা কথা এসে পড়লো। কিন্তু এসব তথ্য স্মরণ না ক'রেও উপায়ান্তর নেই।

বাঙালী যে আজকাল বর্তমান নিয়ে বড়োই বিভ্রান্ত, এবং বর্তমান ছাড়া অন্য কোনো কিছুকে মূল্য দেওয়ার দিকে সত্যিই যে তার দৃষ্টি নেই, সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ ক'রে,—উনিশ শতকের তথ্যাদি আহরণে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রম-সমৃদ্ধ গবেষণার দিকটি তাঁর এ-প্রবন্ধে স্মরণ করা হয়। সেই সূত্রে তিনি বলেন যে, শুধু তথ্যাহরণ নয়,—সে যুগের গূঢ়তম প্রকৃতি, এবং জাতির সেই নবজাগরণের মূল প্রেরণার স্বরূপ আবিষ্কার ক'রতে হ'লে 'শুধুই পাণ্ডিত্য নয়, একটি বিশেষ দৃষ্টিশক্তি আবশ্যক,—উপরকার সেই তরঙ্গগুলির পারম্পর্যও যেমন, তাহাদের তলবর্তী গভীরতর অন্তঃস্রোতকেও তেমনই, আদ্যন্তের সহিত মিলাইয়া মূলধারা নির্ণয় করিতে হইবে।' তাঁর সেই ভূমিকার [পৌষ, ১৩৫২ সালে লেখা ভূমিকায়] পরবর্তী অংশে তিনি ব'লে গেছেন যে, সে-যুগের কয়েকটি বিরাট পুরুষের চরিত্র কালক্রমিক যথাস্থানে স্থাপিত ক'রে, একটি বিশেষ ধারার একটি পরিণাম-অভিমুখিতা পর্যালোচনার চেষ্টা ক'রেছেন তিনি। সে পরিণাম—'জাতির আত্মপরিচয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা, এক নূতন জাতীয়তা-বোধ।' ভূমিকাতেই সে-প্রসঙ্গ বিস্তৃত ক'রে তিনি জানান :

'উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর বহির্জীবনে বড় কিছু ঘটে নাই, সে একটা জাগরণ মাত্র—তাহার প্রাণ, মন ও আত্মার সুপ্তিভঙ্গ।

বাঙালীজাতীর জাতিগত সংস্কারই সেই জাগরণের সহায় হইয়াছে, কারণ, বাঙালীর জীবনে ভাব-চিন্তার প্রভাবই সবচেয়ে বেশি; ব্যবহারিক জীবনে সে অনেক সংকট অনেক সমস্যাকে এড়াইয়া চলে, অথবা অতিশয় লজ্জাজনক ভাবে সহ্য করে; বাস্তবের আঘাতে সে তেমন সাড়া দেয় না, দেশের জলমাটি বা প্রাকৃতিক প্রভাবই ইহার কারণ, জাতির রক্তও কতক পরিমাণে দায়ী।'

মোহিতলালের এ মতের কথা এখানেই স্থগিত থাক। এ-আলোচনায় নিয়ে তর্কবিতর্ক অতিবিস্তৃত হওয়া ঠিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লঘু-প্রবন্ধমালার বক্তব্য মনে রেখে,—তাঁর গুরু-প্রবন্ধাবলীর আলোচনাধারায় সংক্ষেপে, এইসব নানা উল্লেখ ও আলোচনার মূল কথাটা এইবার এইভাবে বলা যেতে পারে :

বঙ্কিমচন্দ্রের ওপর পাশ্চাত্য দার্শনিকদের প্রভাবের কথা অনেকেই ব'লে থাকেন। বিশেষভাবে বেন্থাম, মিল, কোম্‌তে, স্পেনসার প্রভৃতির চিন্তার কথা এবং বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তায় এঁদের প্রভাব-প্রসঙ্গও বহুখ্যাত। বঙ্কিমচন্দ্র এঁদের দর্শন-ভাবনার দ্বারা কিছু পরিমাণে প্রভাবিত হ'য়েছিলেন ঠিকই, তবে পরিপূর্ণভাবে এঁদের অনুসরণ না ক'রে স্বধর্ম রক্ষার কথাও তিনি ব'লে গেছেন। ঐতিহ্য, অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন এবং এই সবের সঙ্গে জড়িত তাঁর নিজের মনন-উপলব্ধিই স্বতন্ত্র বিচারধারার অনুসন্ধানে তাঁকে অনুপ্রেরিত ক'রেছিল। তিনি এই সবের ওপর ভিত্তি করে নিজস্ব একটি জীবনদর্শন গ'ড়ে তুলতে উদ্যোগী হ'য়েছিলেন।

এভাবে চিন্তা করলে একথা স্বীকার করতে হয় যে, তাঁর ভাবনা সেকালের পাশ্চাত্ত্য দার্শনিকদের ভাবনা থেকে পৃথক। সেই পার্থক্যের বিভিন্ন দিকের সামগ্রিক আলেচনা দরকার।

তাঁর অন্যান্য লেখাতে তো বটে,—বিশেষভাবে 'ধর্মতত্ত্বে' বঙ্কিমচন্দ্রের প্রয়াস নিবদ্ধ হ'য়েছে একটি সর্বাঙ্গীন জীবনদর্শন উপলব্ধির লক্ষ্যবোধে। 'ধর্মতত্ত্বে'র গুরুশিষ্য-সংবাদমূলক রচনারীতি প্লেটোর রচনারীতি স্মরণ ক'রিয়ে দেয়। অবশ্য আমাদের দেশেও কড়চা ও গুরুশিষ্য-সংবাদ রীতিতে তত্ত্বব্যাখ্যার রীতি নতুন নয়।

প্লেটোর প্রসিদ্ধ সংলাপমালায় সক্রেটিস ও তাঁর শিষ্যবর্গের প্রশ্নোত্তর-রীতির মধ্যস্থতায় অভিপ্রেত বিশেষ বিশেষ সিদ্ধান্তে পৌঁছোবার চেষ্টা দেখা যায়। প্লেটো সক্রেটিসের নাম ব্যবহার ক'রেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র সে-জায়গায়

'গুরু'কে দাঁড় করিয়েছেন। কেবল এই সাদৃশ্যটুকু থেকেই এ-কথা মনে করা ঠিক নয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র প্লেটোর দ্বারা প্রভাবিত হ'য়েছেন। 'সিম্পোজিয়াম'-এ কিংবা 'রিপাবলিক'-এ দেখা যায়, প্লেটোর 'সক্রেটিস' কতকগুলি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। তবে, সে-সব কেবল তত্ত্বব্যাখ্যা মাত্র নয়। নীরসভাবে নয়,—গল্প বা রম্য কাহিনী পরিবেষণের মধ্য দিয়ে প্লেটো তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্রের 'গুরু'ও তাই ক'রেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও প্লেটোর দর্শন আর বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তা ভিন্ন পথে চ'লেছে।

প্লেটো ভাবতেন যে, জগতের সত্য হোলো ভাবসত্য। দেশকাল-পাত্রের মধ্যে ধরা দিলেও সে-আইডিয়া স্বাধীন! মানুষ সত্যের ধ্যান করে। প্লেটোর মতে ধ্যান করা মানুষের কর্তব্য, কিন্তু মানুষ সত্য বা আদর্শকে সম্পূর্ণরূপে অধিগত ক'রতে পারে না। পারে না, কারণ, মানুষ অসম্পূর্ণ। এটা ধ'রে নিয়ে অতঃপর সেই অসম্পূর্ণ মানুষের পরিপূর্ণতার রাস্তা তৈরি করবার দিকেই প্লেটোর সাধনা, প্লেটোর অভিপ্রায়।

মানুষ অপূর্ণ,—এই ধারণা থেকে, সেই অপূর্ণ মানুষ কোন্ পথে পরিপূর্ণতার লক্ষ্যে এগুতে পারবে, তারই নির্দেশ দিতে গিয়ে নানা দর্শনের উদ্ভব ঘ'টেছে।

ইউরোপে মধ্যযুগে মানুষের এই অসম্পূর্ণতার বোধ এক ব্যাপক বিশ্বাসের জায়গা জুড়েছিল। মানুষ পাপী বলেই তাকে এই মরজগতে আসতে হ'য়েছে,—এই খ্রীষ্টান বিশ্বাসই ছিল মধ্যযুগের ইউরোপের বিশ্বাস। তখন মুক্তির আশায় ধর্মের রাস্তাতেই,—অর্থাৎ ধর্মযাজকদের ওপরেই বিশেষ ভাবে নির্ভর ক'রতে হ'য়েছে। ইউরোপে গির্জার প্রতাপ বেড়েছে এই কারণেই।

কালান্তরে, মানব-সমাজের পরিবর্তিত অবস্থায়, আবার নতুন অভিমুখিতা দেখা দিয়েছে। ধর্মগত বিশ্বাসের বদলে নতুন কালে মানুষ নতুন মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ ক'রেছে।

ব্যক্তিত্ব-সচেতন মানুষকে তার পূর্ণবিকাশের উপযোগী জীবনদর্শনের সন্ধানে আত্মনিয়োগ ক'রতে হ'য়েছে। বহির্জগতের যে-সব সম্ভাব্য বাধার কথা মনে জেগেছিল,—হয় তাদের উৎখাত করবার, নতুবা তাদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার চেষ্টা ক'রতে হ'য়েছে। ঐকান্তিক ব্যক্তিত্ব আস্বাদনের বিরুদ্ধে নিযুক্ত সবচেয়ে বড় যে প্রতিকূলশক্তির কথা স্বভাবতই মনে এসেছিল, সে হোলো রাষ্ট্রশক্তি। ফলে, একদিকে নৈরাজ্যবাদী চিন্তার প্রসার, অন্যদিকে সামঞ্জস্যবাদী চিন্তার উদ্ভব ঘটেছে এই ভাবেই।

বঙ্কিম-রচনাপ্রবাহে কৃষ্ণকথার সূচনাকাল সেই ১২৮১ সালে। অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' সমালোচনাসূত্রে এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের সেই আদিপ্রয়াস দেখা গেছে। এইবার তাঁর সে-চিন্তার পরিণতির দিক বিবেচ্য।

কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যা, আর, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম —বঙ্কিমচন্দ্রের ঐ চারটি গভীর রচনাকে তাঁর গুরু প্রবন্ধমালার পরিণততর অংশ বললে অন্যায় হয় না। শেষ বয়সে, 'নবজীবন' এবং 'প্রচার' পত্রিকায় তিনি ধারাবাহিক তিনটি রচনা শুরু করেন ; সেই তিনটির একটি অনুশীলনধর্ম সম্বন্ধে,—দ্বিতীয়টিতে ছিল দেবতত্ত্বের আলোচনা,—তৃতীয়টি তাঁর কৃষ্ণচরিত্র। প্রথমটি তাঁর আয়ুষ্কালের মধ্যেই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়,—তৃতীয়টিও তাই, কিন্তু দেবতত্ত্ব সম্পর্কিত আলোচনা বই হয়ে বেরোয় তাঁর মৃত্যুর পরে। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম ভাগের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি এই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন রচনার লক্ষ্যগত ঐক্য বা সংযোগের কথা জানাতে গিয়ে লিখেছিলেন যে, এই সব প্রবন্ধে তিনি ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর বক্তব্য বিষয়গুলি সর্বসাধারণকে জানাতে উদ্যোগী হন। তাঁর নিজের কথায়—'উক্ত তিনটি প্রবন্ধের প্রথম প্রবন্ধ 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইতেছে ; দ্বিতীয় ও তৃতীয় 'প্রচার' নামক পত্রে প্রকাশিত হইতেছে।'

এইসব প্রবন্ধের জন্যে তাঁকে যে বিশেষ পরিশ্রম করতে হয়েছিল এবং জীবনের বাকি সময়টুকুর মধ্যে আরব্ধ কাজ শেষ করে যাবার আশা যে তখন খুবই কম, ঐ 'বিজ্ঞাপনে' সে-কথারও উল্লেখ ছিল। 'অনুশীলনধর্মে' যে তত্ত্ব তিনি উত্থাপন করেছিলেন, কৃষ্ণচরিত্র যে তারই দৃষ্টান্ত—তাঁর এ-কথা আগেই স্মরণ করা হয়েছে। মোট পাঁচ-ছয় খণ্ডে তাঁর এই ত্রিধা-বিভক্ত রচনা সমাপ্ত হতে পারে বলে তিনি আশা করেছিলেন। আবার, তাঁর মৃত্যুর বছর-দুয়েক আগে, ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র দ্বিতীয় বারের 'বিজ্ঞাপনে' তিনি জানান যে, 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮১ সালের চৈত্র সংখ্যায় অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত প্রাচীন কাব্যসংগ্রহের সমালোচনাসূত্রে তিনি কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন বা গ্রন্থাকারে প্রথম ভাগে যেসব প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছিলেন, সে-সব ইতিমধ্যে তাঁকে অনেক জায়গায় বদলাতে হয়। পরিত্যাগ, পরিবর্তন দুই-ই হয়েছিল। কিন্তু নিজের এই মত পরিবর্তনের জন্যে কোনো ক্ষোভ বা ত্রুটি স্বীকার করতে হয়নি তাঁকে। তিনি নিজেই বলে গেছেন—'মত পরিবর্তন,

বয়োবৃদ্ধি, অনুসন্ধানের বিস্তার, এবং ভাবনার ফল।' আবার, তিনি আরো বলেছিলেন :

> 'এ গ্রন্থে ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত অনেক স্থলেই অগ্রাহ্য করিয়াছি, কিন্তু তাঁহাদের নিকট সন্ধান ও সাহায্য না পাইয়াছি এমত নহে। Wilson, Goldstucker, Weber, Muir—ইঁহাদের নিকট আমি ঋণ স্বীকার করিতে বাধ্য। দেশী লেখকদিগের মধ্যে আমাদের দেশের মুখোজ্জ্বলকারী শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত, সি. আই. ই., শ্রীযুক্ত সত্যব্রত সামশ্রমী এবং মৃত মহাত্মা অক্ষয়কুমার দত্তের নিকট আমি বাধ্য। অক্ষয়বাবু উত্তম সংগ্রহকার। সর্বাপেক্ষা আমার ঋণ মৃত মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট গুরুতর।'

কালীপ্রসন্নের অনূদিত মহাভারত বঙ্কিমচন্দ্রের কাজে লেগেছিল। যাই হোক্, সেই দ্বিতীয় বারের 'বিজ্ঞাপনের' শেষ কথাটি প্রণিধানযোগ্য :

> 'পরিশেষে বক্তব্য, কৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রতিপন্ন করা এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। তাঁহার মানবচরিত্র সমালোচনা করাই আমার উদ্দেশ্য। আমি নিজে তাঁহার ঈশ্বরত্বে বিশ্বাস করি;—সে বিশ্বাসও আমি লুকাই নাই। কিন্তু পাঠককে সেই মতাবলম্বী করিবার জন্য কোন যত্ন পাই নাই।'

দরকার মতন কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত থেকে তিনি বঙ্গানুবাদ ব্যবহার করেন; হরিবংশ আর পুরাণের উদ্ধৃতিগুলির অনুবাদ তাঁর নিজের।

ধর্মতত্ত্ব-ব্যাখ্যান আর প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা, একযোগে দুই ব্যাপারের স্ফুরণ তাঁর, এই 'কৃষ্ণচরিত্র'। হীরেন্দ্রনাথ সেকথা বলেছেন। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা দেখিয়ে গেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। 'কৃষ্ণচরিত্র, প্রথমভাগ' বই হয়ে বেরুবার বছর সাতেক পরে, ১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে—'ধর্মতত্ত্ব। প্রথম ভাগ। অনুশীলন'—নামে তাঁর সমধর্মী দ্বিতীয় বই প্রকাশিত হয়। ১২৯১ সালের শ্রাবণে অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন' পত্রিকার প্রথম সংখ্যা থেকেই এই আলোচনা ছাপা হতে থাকে। ১২৯২ সালের চৈত্র পর্যন্ত, অর্থাৎ প্রায় দেড় বছরের মধ্যে কোনো কোনো সংখ্যা বাদ দিয়ে, 'ধর্মজিজ্ঞাসা', 'মনুষ্যত্ব' ইত্যাদি পৃথক পৃথক প্রবন্ধের আকারে এগুলি প্রকাশিত হয়। 'কৃষ্ণচরিত্র',

'ধর্মতত্ত্ব'তে এবং অনুরূপ বিষয়াবলম্বী এই সময়ের অন্যান্য লেখাগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের সারা জীবনের অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন, অনুসন্ধিৎসা আর অনুভূতির অভিব্যক্তি ঘটেছিল। সেদিক থেকে বলা যেতে পারে, এই তাঁর সারা জীবনের চিন্তার পরিণতি। এই শেষ পর্বে—১২৯২ সালের পৌষের 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর 'ধর্ম এবং সাহিত্য' প্রবন্ধের কথা আগেই বলা হয়েছে।[১] সে-প্রবন্ধে তাঁর নিজের এই উক্তিটি পুনরায় স্মরণীয়—'সাহিত্য যে সত্য ও যে ধর্ম, সমস্ত ধর্মের তাহা এক অংশ মাত্র ' তিনি সেই কারণেই বলেছিলেন—'সাহিত্য ত্যাগ করিও না, কিন্তু সাহিত্যকে নিম্ন সোপান করিয়া ধর্মের মঞ্চে আরোহণ কর।' তাঁর নিজের জীবনে তিনি এই সত্যেরই প্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছিলেন। তাঁর মন তখনো তর্কে-বিতর্কে নিযুক্ত; সেই কারণেই, তাঁর শেষ পর্বের এইসব রচনাতেও অনেক পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। 'ধর্মতত্ত্ব' সম্বন্ধেও একই কথা। তাঁর মৃত্যুর পরে 'ধর্মতত্ত্বের' দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়। বইয়ের শিরোনামে 'প্রথম ভাগ'—এই ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায় যে, এ বিষয়ে তাঁর আরো কোনো পরিকল্পনা ছিল। আরো আলোচনা করতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু নিজের ইচ্ছামতন কাজ শেষ করবার আগেই তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছিল। তাই 'দ্বিতীয় ভাগ ধর্মতত্ত্ব' লেখা হয়ে ওঠেনি।

'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' সম্বন্ধে 'কৃষ্ণচরিত্র—প্রথম ভাগে'র 'বিজ্ঞাপন' অংশের উল্লেখটুকু লক্ষ্য করা গেছে। 'প্রচার' পত্রিকার প্রথম দু'বছরে টুকরো টুকরো প্রবন্ধের আকারে তাঁর এ লেখা আত্মপ্রকাশ করে। স্বর্গত সজনীকান্ত দাশ ১৩৪৫ সালের ২৯এ শ্রাবণ শ্রীরামপুর মহকুমা বঙ্কিম-শতবার্ষিকী উৎসবের সভাপতি হিসেবে একালের পাঠক-সমাজের স্মৃতিতে বঙ্কিমচন্দ্রের এই রচনার কথা নতুন করে জাগিয়ে দেন। 'কৃষ্ণচরিত্র প্রথম ভাগের' 'বিজ্ঞাপনে' এ-রচনার বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের উল্লেখ অনুসরণ করেই সজনীকান্ত এ আলোচনার নাম রাখেন 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম'। প্রথম বছরের 'প্রচার' পত্রিকায় এই নব-সংযোজিত প্রবন্ধমালার প্রথম প্রবন্ধ 'হিন্দুধর্ম' বেরিয়েছিল। তার প্রথম অনুচ্ছেদেই তিনি জানিয়েছিলেন—'জাতীয় ধর্মের পুনর্জীবন ব্যতীত ভারতবর্ষের মঙ্গল নাই, ইহা আমাদিগের দৃঢ় বিশ্বাস।' হিন্দুধর্মের মূল কথা কী, সেই প্রসঙ্গই এ-প্রবন্ধের আলোচ্য। নিজের অভিপ্রায় এবং প্রবন্ধের লক্ষ্য, দুটি দিকই ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন

১। পৃঃ ১৫৩ দ্রষ্টব্য।

যে, মনু প্রভৃতি বিভিন্ন শাস্ত্রে যে হিন্দুধর্মের লক্ষণাদি দেখা যায়,—'সর্বাংশে শাস্ত্রসম্মত যে হিন্দুধর্ম তাহা কোন রূপে এক্ষণে পুনঃসংস্থাপিত হইতে পারে না ; কখন হইয়াছিল কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহ।' অতএব হয় সেরকম হিন্দুধর্ম একেবারে পরিত্যাগ করতে হয়, নয়তো হিন্দুধর্মের যে সারভাগটুকু নিয়ে একালের সমাজ চলতে পারে, সেইটুকুই নেওয়া দরকার। কিন্তু ধর্ম [রিলিজন অর্থে] ছেড়ে, কেবলমাত্র নীতি অবলম্বন ক'রে মানব-সমাজ কখনো উন্নত হতে পারে বলে তিনি বিশ্বাস করতেন না। নীতিবাদীরা যাকে 'নীতি' বলেন, সে দিকটির উল্লেখ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র বলে গেছেন যে, সে-নীতিও 'বাস্তবিক ধর্ম বা ধর্মমূলক'। তাই এ বিষয়ে তাঁর মোট কথাটা এই :

> 'যাহাতে মনুষ্যের যথার্থ উন্নতি, শারীরিক, মানসিক এবং সামাজিক সর্ববিধ উন্নতি হয়, তাই ধর্ম। এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্ব লইয়া সকল ধর্মেরই সারভাগ গঠিত, এইরূপ উন্নতিকর তত্ত্বসকল, সকল ধর্মাপেক্ষা হিন্দুধর্মেই প্রবল। হিন্দুধর্মেই তাহার প্রকৃত সম্পূর্ণতা আছে। হিন্দুধর্মে যেরূপ আছে, এরূপ আর কোন ধর্মেই নাই। সেইটুকুই সারভাগ। সেইটুকুই হিন্দুধর্ম। সেটুকু ছাড়া আর যাহা থাকে—শাস্ত্রে থাকুক, অশাস্ত্রে থাকুক বা লোকাচারে থাকুক—তাহা অধর্ম। যাহা ধর্ম তাহা সত্য, যাহা অসত্য তাহা অধর্ম।'

কিন্তু, বেদে অসত্য আছে, এ কথা শুনলে এ মতের প্রতি অনেকের ঘৃণা জাগতে পারে। সে সম্ভাবনার দিকটি বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই জানিয়ে গেছেন। জানিয়ে লিখেছেন :

> 'যাঁহারা হিন্দুধর্মে আস্থাশূন্য হইয়াছেন, অথচ অন্য কোন ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই লিখিতেছি।'

তাঁর 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' এই দৃষ্টিতেই দেখা। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রবিধির এ পর্যালোচনাও তাঁর পরিণত আত্মচিন্তা। 'হিন্দুধর্ম', 'বেদ', 'বেদের দেবতা', 'ইন্দ্র', 'কোন্ পথে যাইতেছি'. 'বরুণাদি', 'সবিতা ও গায়ত্রী', 'বৈদিক দেবতা', 'দেবতত্ত্ব', 'দ্যাবা পৃথিবী', 'চৈতন্যবাদ', উপাসনা', 'হিন্দু কি জড়োপাসক', 'হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূল কথা', 'বেদের ঈশ্বরবাদ', 'হিন্দুধর্মে ঈশ্বর ভিন্ন দেবতা নাই'—মোট এই ষোলোটি প্রবন্ধ এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। এই ষোলোটির মধ্যে পঞ্চম প্রবন্ধে তিনি তাঁর বিশেষ দৃগ্‌ভঙ্গি পুনরায় জানিয়েছেন। ধর্মব্যাখ্যাতাদের মধ্যে একদল বলে থাকেন যে, ধর্ম ঈশ্বরোক্ত

বা ঈশ্বর-প্রেরিত ব্যাপার। তাঁর মতে খ্রীষ্টান, ব্রাহ্মণ, মুসলমান, য়ীহুদী এই দলের। দ্বিতীয় শ্রেণীতে আছেন বৌদ্ধ, কোম্‌ত, ব্রাহ্ম এবং নব্য হিন্দুব্যাখ্যাকারদল। তাঁর নিজের কথায়—'ইঁহারা কোন গ্রন্থকেই ঈশ্বরোক্তি বলিয়া স্বীকার করেন না।' এই শ্রেণীবিভাগ দেখিয়ে, তিনি নিজেকে দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত বলে স্বীকার করেছেন।

আগেই বলা হয়েছে যে, 'নবজীবন' পত্রিকায় তাঁর অনুশীলনধর্ম-সম্পর্কিত ধারাবাহিক প্রবন্ধ ছাপা হয়,—'প্রচার' পত্রিকায় দেবতত্ত্ব সম্বন্ধে লেখাগুলি, আর, 'কৃষ্ণচরিত্র'। ভিন্ন ভিন্ন পত্রিকায় এই লেখাগুলি পৃথক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ বয়সের এই লেখাগুলির মূলে তাঁর নিজস্ব যে পরিকল্পনা ছিল, সেই আদর্শের কথা মনে রাখলে এগুলির যোগ সহজেই অনুভব করা যায়। এই পর্যায়বিভাগের আদর্শ তিনি তাঁর 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' পর্যায়ের 'কোন্ পথে যাইতেছি' প্রবন্ধে জানিয়ে গেছেন। এক মতে ধর্ম ঈশ্বর-প্রেরিত; আবার,—অন্য মতে ঈশ্বর প্রেরিত বলে মানতে বাধা আছে বটে, কিন্তু ধর্মের যে 'নৈসর্গিক ভিত্তি' আছে, তাতে সন্দেহ নেই; এই দুটি মতের উল্লেখ করে তিনি হিন্দুধর্মের কথা-সূত্রে বলেছেন যে, হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব এই কারণে যে, বেদকে যাঁরা ঈশ্বরোক্ত বা ঈশ্বরের ন্যায় নিত্য বলে মানতে নারাজ, তাঁরাও হিন্দুধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তি মানতে পারেন। এই কথা ব্যাখ্যা করাই তাঁর আলোচ্য লেখাগুলির উদ্দেশ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্যটুকু তাঁরই নিজের কথায় ব্যক্ত হয়েছে:

> 'ধর্মের যে নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, হিন্দুধর্ম তাহার উপর স্থাপিত, তাই ঈশ্বর প্রণীত ধর্ম না মানিয়াও হিন্দুধর্মের যাথার্থ্য ও শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করা যাইতে পারে। মাহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের সময় হইতে এই কথা ক্রমে পরিস্ফুট হইতেছে।
>
> যাঁহারা এই কথা বলেন. তাঁহাদের উপর এই কথা প্রমাণের ভার আছে। তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম ধর্মের নৈসর্গিক মূলের উপর স্থাপিত। যদি তাহা না দেখাইতে পারেন, তবে এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, 'হিন্দুধর্ম তবে ধর্মই নহে, মিথ্যা ধর্ম।' আর এক শ্রেণীর লোক বলিবেন, 'ধর্মের নৈসর্গিক ভিত্তির কথা ছাড়িয়া দাও—বেদ নিত্য বা বিধিবাক্য বলিয়া স্বীকার কর।'
>
> অতএব হিন্দুধর্মের ব্যাখায় আমাদের দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম ধর্মের

নৈসর্গিক ভিত্তির উপরে স্থাপিত। ইহা দেখাইতে গেলে প্রথমে বুঝাইতে হইবে, ধর্মের সেই নৈসর্গিক মূল কি? তাহার পর দেখাইতে হইবে যে, হিন্দুধর্ম সেই মূলের উপরেই স্থাপিত।

প্রথমটি অর্থাৎ ধর্মের নৈসর্গিক তত্ত্ব আমি 'নবজীবনে' বুঝাইতেছি; দ্বিতীয়টি 'প্রচারে' বুঝাইতে প্রয়াস পাইতেছি।'

তাঁর ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে 'প্রচারে' প্রকাশিত 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' পর্যায়ের লেখাগুলি এখানে তিনি এইভাবে সংযুক্ত দেখিয়ে গেছেন। আর, তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্রে'র প্রথম পরিচ্ছেদে গ্রন্থের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি ভারতবর্ষের 'অধিকাংশ হিন্দুর' এবং বাংলার 'সকল হিন্দুর' দৃঢ় বিশ্বাস 'কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং' উল্লেখ ক'রে বলেছেন—'জানিয়াছি-ঈদৃশ সর্বগুণান্বিত, সর্বপাপ-সংস্পর্শশূন্য, আদর্শ চরিত্র আর কোথাও নাই।' একথাও তিনি বলে গেছেন যে, কৃষ্ণের ঐশী শক্তিতে বিশ্বাসী হলেও তাঁর ঈশ্বরত্ব সংস্থাপন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না, তিনি কৃষ্ণচরিত্রে আদর্শ মানবচরিত্রেরই অভিব্যক্তি দেখেছিলেন।

'ধর্মতত্ত্বে' প্রচারিত অনুশীলনবাদের মূল কথা তিনি 'কৃষ্ণচরিত্রে'র এই প্রথম পরিচ্ছেদে স্মরণ করে গেছেন। এদেশে তখনকার ব্যাপক ধর্ম আন্দোলনের অনুকূল লগ্নটির তিনি যথাসাধ্য সুযোগ নিয়েছিলেন। ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার টীকা—পরিণত জীবনের এই সব রচনাই তাঁর এই এক প্রেরণায় সংযুক্ত। কৃষ্ণচরিত্রের প্রথম পরিচ্ছেদেই তিনি লিখে গেছেন:

'ইতিপূর্বে ধর্মতত্ত্ব নামে গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছি। তাহাতে যে কয়টি কথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহা এই:

১। মনুষ্যের কতকগুলি শক্তি আছে। আমি তাহার বৃত্তি নাম দিয়াছি। সেইগুলির অনুশীলন, প্রস্ফুরণ ও চরিতার্থতায় মনুষ্যত্ব।

২। তাহাই মনুষ্যের ধর্ম।

৩। সেই অনুশীলনের সীমা, পরস্পরের সহিত বৃত্তিগুলির সামঞ্জস্য।

৪। তাহাই সুখ।'

এই সার কথা বলে নিয়ে তিনি আরো জানান—'এখানে আমি স্বীকার করি যে, সমস্ত বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ অনুশীলন, প্রস্ফুরণ, চরিতার্থতা ও সামঞ্জস্য একাধারে দুর্লভ।' 'ধর্মতত্ত্ব' আলোচনাতেই তাই তিনি পুনরায় জানিয়েছেন

যে, এ-রকম আদর্শ মানুষ সত্যিই সমাজে দুর্লভ! 'ধর্মতত্ত্বে' গুরু বলেছিলেন—'মনুষ্য না দেখ ঈশ্বর আছেন। ঈশ্বরই সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তির ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ।' এই ছিল তাঁর শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের তাৎপর্য।

কৃষ্ণচরিত্র সম্বন্ধে ১২৮১ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের যে মূলকথা প্রকাশিত হয়, বর্তমান আলোচনার ১৫৮-১৬১ পৃষ্ঠায় সে-প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। এই সূত্রে তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাসে ধর্ম-সম্পর্কিত মতামতের কথাও বিবেচ্য। ব্যাপক ভাবে, তাঁর এই চিন্তার নানা দিক তাঁর নানা রচনায় ছড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর সে-কালের মতান্তরের দিকটিও ধর্তব্য। একে একে সে-সব দিক দেখা যাবে। যাই হোক্, কৃষ্ণচরিত্রের সপ্তম পরিচ্ছেদে তিনি লিখে গেছেন :

> 'মনুষ্যত্ব কি, ধর্মতত্ত্বে তাহা বুঝাইবার চেষ্টা পাইয়াছি। মনুষ্যের সকল বৃত্তিগুলির সম্পূর্ণ স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্যে মনুষ্যত্ব। যাঁহাতে সে সকলের চরম স্ফূর্তি ও সামঞ্জস্য পাইয়াছে, তিনিই আদর্শ মনুষ্য। খ্রীষ্টে তাহা নাই—শ্রীকৃষ্ণে তাহা আছে। যিশুকে যদি রোমক সম্রাট য়িহুদার শাসনকর্তৃত্বে নিযুক্ত করিতেন, তবে কি তিনি সুশাসন করিতে পারিতেন? তাহা পারিতেন না—কেন না, রাজকার্যের জন্য যে সকল বৃত্তিগুলি প্রয়োজনীয়, তাহা অনুশীলিত হয় নাই। অথচ এরূপ ধর্মাত্মা ব্যক্তি রাজ্যের শাসনকর্তা হইলে সমাজের অনন্ত মঙ্গল। পক্ষান্তরে শ্রীকৃষ্ণ যে সর্বশ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ, তাহা প্রসিদ্ধ। শ্রেষ্ঠ নীতিজ্ঞ বলিয়া তিনি মহাভারতে ভূরি ভূরি বর্ণিত হইয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠির বা উগ্রসেন শাসনকার্যে তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন কোন গুরুতর কাজ করিতেন না। যিশু অশিক্ষিত, কৃষ্ণ সর্বশাস্ত্রবিদ্। অন্যান্য গুণ সম্বন্ধেও ঐরূপ। উভয়েই শ্রেষ্ঠ ধার্মিক ও ধর্মজ্ঞ। অতএব কৃষ্ণই যথার্থ আদর্শ মনুষ্য—'Christian Ideal' অপেক্ষা 'Hindu Ideal' শ্রেষ্ঠ।'

মহাভারতে যে অনেক প্রক্ষিপ্ত অংশ বিদ্যমান, সে কথাও তিনি স্বীকার করেছেন। জরাসন্ধ পর্বাধ্যায়ে তিনি 'দুই হাতের কারিগরি' দেখেছেন, শিশুপালবধ সম্বন্ধে বলেছেন,—'শিশুপালবধ স্থূলতঃ মৌলিক বটে, কিন্তু ইহাতে

দ্বিতীয় স্তরের কবির বা অন্য পরবর্তী লেখকের অনেক হাত আছে।' এই শিশুপালবধে ভীষ্মের উক্তি উল্লেখ করা হয়েছে। সেই সূত্রে তাঁর নিজের কথাগুলি এই ঃ

> 'ভীষ্ম বলিয়াছেন কৃষ্ণের পূজার দুইটি কারণ—(১) যিনি বলে সর্বশ্রেষ্ঠ, (২) তাঁহার তুল্য বেদবেদাঙ্গ পারদর্শী কেহ নহে। অদ্বিতীয় পরাক্রমের প্রমাণ এই গ্রন্থে অনেক দেওয়া গিয়াছে। কৃষ্ণের অদ্বিতীয় বেদজ্ঞতার প্রমাণ গীতা। যাহা আমরা ভগবদ্গীতা বলিয়া পাঠ করি তাহা কৃষ্ণ-প্রণীত নহে। উহা ব্যাস-প্রণীত বলিয়া খ্যাত—"বৈয়াসিকী সংহিতা" নামে পরিচিত। উহার প্রণেতা ব্যাসই হউন আর যেই হউন, তিনি ঠিক কৃষ্ণের মুখের কথাগুলি নোট করিয়া রাখিয়া ঐ গ্রন্থ সংকলন করেন নাই। উহাকে মৌলিক মহাভারতের অংশ বলিয়াও আমার বোধ হয় না। কিন্তু গীতা কৃষ্ণের ধর্মমতের সংকলন, ইহা আমার বিশ্বাস। তাঁহার মতাবলম্বী কোন মনীষী কর্তৃক উহা এই আকারে সংকলিত, এবং মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া প্রচারিত হইয়াছে, ইহাই সংগত বলিয়া বোধ হয়। এখন বলিবার কথা এই যে, গীতোক্ত ধর্ম যাঁহার প্রণীত তিনি স্পষ্টতঃই অদ্বিতীয় বেদবিৎ পণ্ডিত ছিলেন। ধর্ম সম্বন্ধে তিনি বেদকে সর্বোচ্চ স্থানে বসাইতেন না—কখন বা বেদের একটু একটু নিন্দা করিতেন। কিন্তু তথাপি অদ্বিতীয় বেদজ্ঞ ব্যতীত অন্যের দ্বারা গীতোক্ত ধর্ম প্রণীত হয় নাই, ইহা যে গীতা ও বেদ উভয়ই অধ্যয়ন করে, সে অনায়াসেই বুঝিতে পারে।' যিনি এইরূপ, পরাক্রমে ও পাণ্ডিত্যে, বীর্যে ও শিক্ষায়, কর্মে ও জ্ঞানে, নীতিতে ও ধর্মে, দয়ায় ও ক্ষমায়, তুল্যরূপেই সর্বশ্রেষ্ঠ, তিনিই আদর্শ পুরুষ।'

শ্রীকৃষ্ণকে তিনি যেমন সর্বাঙ্গীন স্ফূর্তি ও চরম পরিণতির একমাত্র উদাহরণ বলে মেনেছিলেন, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাকে তিনি সেইরকম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থ বলে স্বীকার করেছেন। ১২৯৩ সালের শ্রাবণে 'প্রচার' পত্রিকায় গীতার ব্যাখ্যা শুরু হয়। ১২৯৫ সালের ফাল্গুন পর্যন্ত চ'লে এই আলোচনার দ্বিতীয় অধ্যায় পর্যন্ত শেষ হয়। তাঁর আলোচনার পরবর্তী অংশ অতঃপর অন্য কোথাও প্রকাশিত হয় নি বটে, কিন্তু চতুর্থ অধ্যায়ের ১৯ সংখ্যক শ্লোক

অবধি তাঁর নিজের পাণ্ডুলিপি ছিল। সেই পাণ্ডুলিপি পেয়ে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর দৌহিত্র দিব্যেন্দুসুন্দর বন্দ্যোপাধ্যায় আগেকার ছাপা অংশের সঙ্গে সেটুকু যোগ করে, কালীপ্রসন্ন সিংহের বাকি অংশের অনুবাদ সংযোজিত করে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন।

গীতার কথাসূত্রে এখানে একটি কথা স্মরণীয়। মহাভারতের মতন গীতাও এক লেখকের লেখা নয়। আগেই হীরেন্দ্রনাথ দত্তের বঙ্কিম-আলোচনার উল্লেখ করা হয়েছে। হীরেন্দ্রনাথ জানিয়ে গেছেন যে, গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বিশ্বরূপ দর্শনেই মূল গীতার পরিসমাপ্তি চিহ্নিত, পরের ছ'টি অধ্যায় সংযোজন মাত্র। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ভূমিকায় গীতার প্রচলিত নানা টীকা ও ব্যাখ্যার উল্লেখ করে নিজের প্রয়াসের ব্যাখ্যা হিসেবে যে-সব কথা লেখেন, তার মধ্যে শঙ্করাদি প্রাচীন ভাষ্যকারের বঙ্গানুবাদের উল্লেখ এবং নতুন বাংলা অনুবাদের প্রয়াস, এই দুটি ধারারই উল্লেখ ছিল। দ্বিতীয় ধারা সম্বন্ধেই তাঁর যে নিজের বিশেষ আগ্রহ ছিল, সে-দিকটির সমর্থন আছে এই ভূমিকায়। তিনি জানিয়ে গেছেন —'শ্রীযুক্তবাবু শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন দ্বিতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি নিজকৃত অনুবাদের সহিত গীতাসন্দীপনী নামে একখানি বাঙ্গালী টীকা প্রকাশ করিতেছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্র নিজে তাঁর সমকালীন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙালী পাঠকের জন্যে 'গীতা' অনুবাদে ব্রতী হন। তিনি বলেন, 'পাশ্চাত্য চিন্তা-প্রণালী প্রাচীন ভারতবর্ষীয়দিগের চিন্তা-প্রণালী হইতে এত বিভিন্ন যে ভাষার অনুবাদ হইলেই ভাবের অনুবাদ হৃদয়ঙ্গম হয় না।' জাতির অতীতের ভাব-ভাবনা নতুন কালের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশিত হওয়া উচিত,—এই ধারণা তিনি আরো অনেক জায়গায় বলে গেছেন। এখানে তিনি আরো বলেন:

> 'যে সকল পণ্ডিতগণ গীতার ব্যাখ্যা বাঙ্গালায় প্রচার করিয়াছেন বা করিতেছেন, আমি তাঁহাদিগের প্রতিযোগী নহি; যথাসাধ্য তাঁহাদিগের সাহায্য করি, ইহাই আমার ক্ষুদ্রাভিলাষ। আমিও যত দূর পারিয়াছি, পূর্ব পণ্ডিতদিগের অনুগামী হইয়াছি। আনন্দ-গিরি-টীকা-সম্বলিত শঙ্করভাষ্য, শ্রীধরস্বামিকৃত টীকা রামানুজভাষ্য, মধুসূদন সরস্বতীকৃত টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী কৃত টীকা ইত্যাদির

প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই টীকা প্রণয়ন করিয়াছি। তবে ইহাও আমাকে বলিতে হইতেছে যে, যে ব্যক্তি পাশ্চাত্য সাহিত্য বিজ্ঞান এবং দর্শন অবগত হইয়াছে, সকল সময়েই যে, সে প্রাচীনদিগের অনুগামী হইতে পারিবে, এমন সম্ভাবনা নাই। আমিও সর্বত্র তাঁহাদিগের অনুগামী হইতে পারি নাই। যাঁহারা বিবেচনা করেন, এদেশীয় পূর্বপণ্ডিতেরা যাহা বলিয়াছেন, তাহা সকলই ঠিক এবং পাশ্চাত্যগণ জাগতিক তত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা বলেন, তাহা সকলই ভুল, তাঁহাদিগের সহিত আমার কিছুমাত্র সহানুভূতি নাই।

টীকাই আমার উদ্দেশ্য, কিন্তু মূল ভিন্ন টীকা চলে না; এই জন্য মূলও দেওয়া গেল। অনেক পাঠক অনুবাদ ভিন্ন মূল বুঝিতে সক্ষম নহেন, এজন্য একটা অনুবাদও দেওয়া গেল। বাঙ্গালা ভাষায় গীতার অনেক উৎকৃষ্ট অনুবাদ আছে। পাঠক যেটা ভাল বিবেচনা করেন, সেইটা অবলম্বন করিতে পারেন। সচরাচর যাহাতে অনুবাদ অবিকল হয়, সেই চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু দুই এক স্থানে অর্থব্যক্তির অনুরোধে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।'

এইসূত্রে তাঁর শেষ পর্বের উপন্যাসের কথাও স্মরণীয়। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের 'ধর্মানুশীলনে বঙ্কিমচন্দ্র' বইখানিতে [১৩৬১] বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলীর মধ্যে চন্দ্রশেখর ও রজনীর যোগবল আর সিদ্ধযোগের[১০] উল্লেখ করে ক্রমশঃ আনন্দমঠ, সীতারাম, রাজসিংহের কথা তোলা হয়েছে। জীবনে পাপের নিবৃত্তি আর পুণ্যে প্রবৃত্তি সঞ্চারিত হওয়া দরকার: এইসব উপন্যাসে এই নীতি প্রচারের দিকে তাঁর লক্ষ্য ছিল। দেবীচৌধুরাণীতে প্রফুল্ল নিষ্কাম ধর্মে নিজেও শিক্ষিত হয়েছিলেন, পরকেও সেই আদর্শের কথা জানিয়ে গেছেন। শ্বশুরবাড়িতে প্রফুল্ল শ্বশুর-শাশুড়ী, নয়ান বৌ ইত্যাদি সকলকেই এই নিষ্কাম সেবাধর্মের গুণে জয় করেছিলেন 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রথম খণ্ডের ষোড়শ পরিচ্ছেদে ভবানী ঠাকুরের কাছে প্রফুল্লর পাঁচ বছরের শিক্ষা সমাপ্ত হয়েছে যখন, তখন অনাসক্ত কর্মের রহস্য বুঝিয়ে দিয়েছিলেন ভবানী ঠাকুর। ইন্দ্রিয় সংযমের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে শ্রীকৃষ্ণে কর্ম-সমর্পণের

১০। এই বইয়ের প্রথম পরিচ্ছেদের অষ্টম বিভাগ [পৃষ্ঠা ৫৫-৫৭] এই সূত্রে দ্রষ্টব্য।

আদর্শ দেখিয়ে দেওয়া হয়েছিল। দেবীচৌধুরাণীর তৃতীয় খণ্ডের চতুর্দশ অর্থাৎ শেষ পরিচ্ছেদে লেখক স্বয়ং উচ্ছ্বসিত হয়ে বলেছিলেন :

> 'এখন এসো প্রফুল্ল! একবার লোকালয়ে দাঁড়াও—আমরা তোমায় দেখি। একবার এই সমাজের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বল দেখি, 'আমি নূতন নহি, আমি পুরাতন। আমি সেই বাক্য মাত্র; কতবার আসিয়াছি; তোমরা আমায় ভুলিয়াছ, তাই আবার আসিলাম—।'

অতঃপর গীতার শ্লোক স্মরণ করা হয়—

> পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
> ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

তাঁর সীতারাম আরো পরের উপন্যাস। ১২৯১ সালের শ্রাবণ থেকে 'প্রচারে' সে-রচনা প্রকাশিত হয়। 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে' —তাঁর একথা সেই আমলের কথা। সেই ১২৯১ সালের শ্রাবণ সংখ্যার 'প্রচার' পত্রিকায় তাঁর 'বাঙ্গালীর কলঙ্ক' ছাপা হয়। 'প্রচার' পত্রিকাতেই সীতারাম চরিত্রের অন্তর্নিহিত এই সত্য উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপনের মধ্য দিয়েই এদেশে ধর্মরক্ষার সংকল্প সার্থক হয়ে উঠতে পারে। পরে উপন্যাস থেকে কিছু কিছু অংশ বর্জন করা হয় বটে, কিন্তু সে অন্য কারণে। উপন্যাসের আখ্যান-পরিকল্পনার মধ্যে অবান্তর প্রসঙ্গ এবং মতবাদের বাড়াবাড়ি বাদ দেবার চেষ্টাই ছিল সে-সব পরিবর্তনের আসল কারণ।

দেশের রাজনৈতিক দুরবস্থা, সাংস্কৃতিক অধঃপতন, নৈতিক বিপর্যয় ইত্যাদি নানা দুর্যোগের ভাবনা ভাবতে-ভাবতে মানব-জীবনের যথার্থ সার্থকতার লক্ষ্য খুঁজছিলেন তিনি। বাংলাদেশের কথা আর ভারতবর্ষের ঐতিহ্য দুইই তার চিন্তায় দেখা দিয়েছিল। 'বাঙ্গালীর কলঙ্ক' প্রকাশিত হবার বছর-চারেক আগে ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণের 'বঙ্গদর্শনে' তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' প্রকাশিত হয়। তার বছর দুয়েক পরে ১২৮৯ এর 'বঙ্গদর্শনে'র জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাসের ভগ্নাংশ' ছাপা হয়। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ঐতিহাসিক সন্ধানের সশ্রদ্ধ উল্লেখ ছিল এইসব লেখার মধ্যে। বাংলায় মুসলমান সমাগমের আগে পালরাজ্য আর সেনরাজ্য যে একীকৃত হয়েছিল, রাজেন্দ্রলালের সে-ঘোষণা উল্লেখ করে সে-পর্বের বিস্তৃততর ইতিহাস দাবি করেছিলেন তিনি।

এইবার এইসব ধর্মতত্ত্বানুসন্ধানপ্রধান লেখাগুলিতে তাঁর অনুসৃত রীতির বিশেষত্ব দেখবার জন্যেই বিস্তৃতভাবে তাঁর কয়েকটি রচনার চিন্তাধারা এবং ভাষাভঙ্গি, দুইই দেখা দরকার। সে সময়ে 'প্রচার' পত্রিকায় প্রকাশিত 'হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে একটি স্থূলকথা' প্রবন্ধে বলা হয়:

> 'এই গুরুতর কথা, যাহা আজিও কৃতবিদ্য সভ্য মনুষ্যরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিতেছে না, তাহা কি আদিম অসভ্য জাতিদিগের জানা ছিল? ইহা অসম্ভব। বিজ্ঞান প্রভৃতি ক্ষুদ্রতর জ্ঞানের উন্নতি অতি ক্ষুদ্র বীজ হইতে ক্রমশঃ হইয়া আসিতেছে: তখন সর্বাপেক্ষা দুষ্প্রাপ্য ও দুর্বোধ্য যে জ্ঞান তাহাই আদিম মনুষ্য সর্বাগ্রে লাভ করিবে, ইহা সম্ভব নহে। অনেকে বলিবেন ও বলিয়া থাকেন, ঈশ্বরকৃপায় তাহা অসম্ভব নহে; যাহা মনুষ্য উদ্ধারের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় তাহা কৃপা করিয়া তিনি অপক্কবুদ্ধি আদিম মনুষ্যের হৃদয়ে প্রকটিত করিতে পারেন; এবং এখনও দেখিতে পাই যে সভ্য সমাজস্থিত অনেক অকৃতবিদ্য মূর্খেরও ঈশ্বরজ্ঞান আছে। এ উত্তর যথার্থ নহে। কেন না এখন পৃথিবীতে যে সকল অসভ্য জাতি বর্তমান আছে, তাহাদের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া দেখা হইয়াছে যে তাহাদের মধ্যে প্রায়ই ঈশ্বরজ্ঞান নাই। একটা মনুষ্যের আদি পুরুষ কিংবা একটা বড় ভূত বলিয়া কোন অলৌকিক চৈতন্যে কোন কোন অসভ্য জাতির বিশ্বাস থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা ঈশ্বরজ্ঞান নহে। তেমনি সভ্য সমাজস্থ নির্বোধ মূর্খ ব্যক্তি ঈশ্বর নাম শুনিয়া তাহার মৌখিক ব্যবহার করিতে পারে, কিন্তু যাহার চিত্তবৃত্তি অনুশীলিত হয় নাই, তাহার পক্ষে ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। বহি না পড়িলে যে চিত্তবৃত্তি সকল অনুশীলিত হয় না এমত নহে। কিন্তু যে প্রকারেই হউক, বুদ্ধি, ভক্তি প্রভৃতির সম্যক্ অনুশীলন ভিন্ন ঈশ্বরজ্ঞান অসম্ভব। তাহা না থাকিলে, ঈশ্বর নামে কেবল দেবদেবীর উপাসনাই সম্ভব।'

হিন্দুধর্মের মূল কথা খুঁজতে গিয়ে তিনি জগতের নানা ধর্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন। ঈশ্বর-জ্ঞানের কথা-সূত্রে তিনি এই প্রবন্ধে অতঃপর বলেন:

> 'অতএব বুদ্ধির মার্জিতাবস্থা ভিন্ন মনুষ্যহৃদয়ে ঈশ্বর জ্ঞানোদয়ের সম্ভাবনা নাই। কোন জাতি যে পরিমাণে সভ্য হইয়া মার্জিতবুদ্ধি হয়,

সেই পরিমাণে ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করে। এ কথার প্রতিবাদে যদি কেহ প্রাচীন য়িহুদীদিগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলেন যে, তাহারা প্রাচীন গ্রীক প্রভৃতি জাতির অপেক্ষায় সভ্যতায় হীন হইয়াও ঈশ্বরজ্ঞান লাভ করিয়াছিল, তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, য়িহুদীদিগের সে ঈশ্বরজ্ঞান বস্তুতঃ ঈশ্বরজ্ঞান নহে। জিহোবাকে আমরা আমাদের পাশ্চাত্য শিক্ষকদিগের কৃপায় ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস করিতে শিখিয়াছি, কিন্তু জিহোবা য়িহুদীদিগের একমাত্র উপাস্য দেবতা হইলেও ঈশ্বর নহেন। তিনি রাগদ্বেষপরতন্ত্র পক্ষপাতী মনুষ্যপ্রকৃতি দেবতামাত্র। পক্ষান্তরে সুশিক্ষিত গ্রীকেরা ইহার অপেক্ষা উন্নত ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিল। খৃষ্টানধর্মাবলম্বী-দিগের যে ঈশ্বরজ্ঞান, যিশু য়িহুদী হইলেও, সে জ্ঞান কেবল য়িহুদীদিগেরই নিকট প্রাপ্ত নহে। খৃষ্টধর্ম্মের যথার্থ প্রণেতা সেণ্টপল। তিনি গ্রীকদিগের শাস্ত্রে অত্যন্ত সুশিক্ষিত ছিলেন।'

উনিশ শতকের ব্যাপক অনুসন্ধিৎসা বশতঃ ধর্মালোচনায় তাঁর তুলনামূলক দৃষ্টিই প্রধান হয়ে উঠেছিল। বৈদিক হিন্দুদের সেই প্রাচীন ঈশ্বরজ্ঞানের কথা-সূত্রে তিনি বলেন :

'সর্বাপেক্ষা বৈদিক হিন্দুরাই অল্পকালে সভ্যতায় পদবীতে আরূঢ় ঈশ্বরজ্ঞানে উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমরা এ পর্যন্ত বৈদিক ধর্মের কেবল দেবতাতত্ত্বই সমালোচনা করিয়াছি। কেননা সেইটা গোড়া, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পরিপক্ক যে বৈদিক ধর্ম, তাহা অতি উন্নত ধর্ম, এবং এক ঈশ্বরের উপাসনাই তাহার স্থূল মর্ম। তবে বলিবার কথা এই যে, প্রথম হিন্দুরা, একেবারে গোড়া হইতেই ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্ত হয় নাই। জাতিকর্তৃক ঈশ্বরজ্ঞান প্রাপ্তির সচরাচর ইতিহাস এই যে, আগে নৈসর্গিক পদার্থ বা শক্তিতে ক্রিয়মান্ চৈতন্য আরোপ করে, অচেতনে চৈতন্য আরোপ করে। তাহাতে কি প্রকারে দেবোৎপত্তি হয় তাহা পূর্বে দেখাইয়াছি। এই প্রণালী অনুসারে, বৈদিকেরা কি প্রকারে ইন্দ্রাদি দেব পাইয়াছিলেন, তাহা দেখাইয়াছি। এই অবস্থায় জ্ঞানের উন্নতি হইলে উপাসকেরা দেখিতে পান যে, আকাশের উপাসনা করি, বায়ুরই উপাসনা করি, মেঘেরই উপাসনা

করি, আর অগ্নিরই উপাসনা করি, এই সকল পদার্থই নিয়মের অধীন। এই নিয়মেও সর্বত্র একত্ব, এক স্বভাব দেখা যায়। ঘোল মউনির তাড়নে ঘোল, আর বাত্যাতাড়িত সমুদ্র এক নিয়মে বিলোড়িত হয়; যে নিয়মে আমার হাতের গণ্ডুষের জল পড়িয়া যায়, সেই নিয়মেই আকাশের বৃষ্টি পৃথিবীতে পড়ে। এক নিয়তি সকলকে শাসন করিতেছে; সকলই সেই নিয়মের অধীন হইয়া আপন আপন কর্ম সম্পাদন করিতেছে, কেহই নিয়মকে ব্যতিক্ষুণ্ণ করিতে পারেন না। তবে ইহাদেরও নিয়মকর্তা, শাস্তা, এবং কারণ স্বরূপ আর একজন আছেন। এই বিশ্বসংসারে যাহা কিছু আছে সকলই সেই এক নিয়মে চালিত; অতএব এই বিশ্বজগতের সর্বাংশই সেই নিয়মকর্তার প্রণীত এবং শাসিত। ইন্দ্রাদি হইতে রেণু কণা পর্যন্ত সকলই এক নিয়মের অধীন, সকলই একজনের সৃষ্ট ও রক্ষিত, এবং একজনই তাহার লয়কর্তা। ইহাই সরল ঈশ্বরজ্ঞান। জড়ের উপাসনা হইতেই ইহা অনেক সময়ে উৎপন্ন হয়, কেননা জড়ের একতা ও নিয়মাধীনতা ক্রমশঃ উপাসকের হৃদয়ঙ্গম হয়।'

এই তুলনাভিত্তিক, বিস্তৃত আলোচনার ধারাতেই বলা হয়:

'তবে ঈশ্বরজ্ঞান উপস্থিত হইলেই যে দেবদেবীর উপাসনা লুপ্ত হইবে এমন নহে। যাহাদিগকে চৈতন্যবিশিষ্ট বলিয়া পূর্বে বিশ্বাস হইয়াছে, জ্ঞানের আরও অধিক উন্নতি না হইলে, বিজ্ঞান শাস্ত্রের বিশেষ আলোচনা ব্যতীত, তাহাদিগকে জড় ও অচেতন বলিয়া বিবেচনা হয় না। ঈশ্বরজ্ঞান এই বিশ্বাসের প্রতিশেধক হয় না। ঈশ্বর জগৎস্রষ্টা হউন, কিন্তু ইন্দ্রাদিও আছে, এই বিশ্বাস থাকে—তবে ঈশ্বরজ্ঞান হইলে উপাসক ইহা বিবেচনা করে যে, এই ইন্দ্রাদিও সেই ঈশ্বরের সৃষ্ট, এবং তাঁহার নিয়োগানুসারেই স্ব স্ব ধর্ম পালন করে। ঈশ্বর যেমন মনুষ্য ও জীবগণকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনি ইন্দ্রাদিকেও সৃষ্টি করিয়াছেন; এবং মনুষ্যও জীবগণকে যেমন পালন ও কল্পে কল্পে ধ্বংস করেন, ইন্দ্রাদিকেও সেইরূপ করিয়া থাকেন। তবে ইন্দ্রাদিও মনুষ্যের উপাস্য, এ কথাতেও বিশ্বাস থাকে, কেননা ইন্দ্রাদিকেও লোকোত্তর শক্তিসম্পন্ন ও ঈশ্বরকর্তৃক লোকরক্ষায় নিযুক্ত বলিয়া বিশ্বাস থাকে। এই কারণে ঈশ্বরজ্ঞান

জন্মিলেও, জাতিমধ্যে দেবদেবীর উপাসনা উঠিয়া যায় না। হিন্দুধর্মে তাহাই ঘটিয়াছে। ইহাই প্রচলিত সাধারণ হিন্দুধর্ম— অর্থাৎ লৌকিক হিন্দুধর্ম, বিশুদ্ধ হিন্দু ধর্ম নহে। লৌকিক হিন্দু এই যে একজন ঈশ্বর সর্বস্রষ্টা, সর্বকর্তা, কিন্তু দেবগণও আছেন, এবং তাঁহারা ঈশ্বর কর্তৃক নিযুক্ত হইয়া লোক রক্ষা করিতেছেন। বেদে এবং হিন্দুশাস্ত্রের অন্যান্য অংশে স্থানে স্থানে এই ভাবের বাহুল্য আছে।'

এই প্রবন্ধেরই উপসংহারে তিনি বৈদিক ধর্মের তিন অবস্থা দেখিয়ে বলেন :

(১) প্রথম, দেবোপাসনা—অর্থাৎ জড়ে চৈতন্য আরোপ, এবং তাহার উপাসনা।

(২) ঈশ্বরোপাসনা, এবং তৎসঙ্গে দেবোপাসনা।

(৩) ঈশ্বরোপাসনা, এবং দেবগণের ঈশ্বরে বিলয়।

বৈদিক ধর্মের চরমাবস্থা উপনিষদে। সেখানে দেবগণ একেবারে দূরীকৃত বলিলেই হয়।

কেবল আনন্দময়। ব্রহ্মই উপাস্যস্বরূপ বিরাজমান। এই ধর্ম অতিবিশুদ্ধ, কিন্তু অসম্পূর্ণ। ইহাই চতুর্থাবস্থা।

শেষে গীতাদি ভক্তিশাস্ত্রের আবির্ভাবে এই সচ্চিদানন্দের উপাসনার সঙ্গে ভক্তি মিলিতা হইল। তখন হিন্দুধর্ম সম্পূর্ণ হইল। ইহাই সর্বাঙ্গ-সম্পূর্ণ ধর্ম, এবং ধর্মের মধ্যে জগতে শ্রেষ্ঠ। নির্গুণ ব্রহ্মের স্বরূপ জ্ঞান, এবং সগুণ ঈশ্বরের ভক্তিযুক্ত উপাসনা ইহাই বিশুদ্ধ হিন্দুধর্ম।'

তাঁর এই লেখাটি বিস্তৃতভাবে এখানে কেন যে স্মরণ করা হোলো, সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। এইভাবে তাঁর আরো নানা লেখা থেকে উদ্ধৃতি তুলে দেখানো যেতে পারে। এখানে তাঁর আর-একটি উক্তি স্মরণীয়। 'প্রচার'-এর ঐ প্রবন্ধটিতেই একেবারে শেষ অনুচ্ছেদে তিনি বলেন যে, এখানে তাঁর এই যেসব দিক প্রদর্শিত হয়, এসব তিনি যথোচিতভাবে প্রমাণ করবার চেষ্টা করবেন। তিনি তাঁর 'দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম' পর্যায়ের লেখাগুলিতে এই সংকল্পই পালন করবার চেষ্টা ক'রে গেছেন। পাঠককে সতর্ক করে তিনি লিখেছিলেন,—'হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে প্রচারে যে সকল প্রবন্ধ প্রকাশ পায়, তাহা

ধারাবাহিক ক্রমে না পড়িয়া মাঝে মাঝে পড়িলে সে সকলের মর্ম গ্রহণের সম্ভাবনা নাই। হস্তীই হউক, আর শৃগালই হউক, অন্ধের ন্যায় কেবল তাহার কর চরণ বা কর্ণ স্পর্শ করিয়া তাহার স্বরূপ অনুভব করা যায় না। এই প্রবন্ধের পরে, 'বেদের ঈশ্বরবাদ' প্রবন্ধে তিনি বলেন, এক ঈশ্বরের উপাসনাই বিশুদ্ধ ধর্ম। বেদে যে ইন্দ্রাদির উপাসনা আছে, তার তাৎপর্য কী, সে-প্রশ্নের জবাবে তিনি স্পষ্টই লিখেছিলেন, 'স্থূলতঃ উহা জড়ের উপাসনা'। এই বৈদিক ধর্মের স্বরূপ-সন্ধান, আর বাংলাদেশ, তথা ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য-সন্ধান একই প্রেরণার ফল। ভারতবর্ষের প্রাচীন জ্ঞান চাবি-তালার বাঁধনে আবদ্ধ ছিল বলে অনুভব করেছিলেন তিনি,—এবং সেই কারণেই শেষ জীবনের অক্লান্ত পরিশ্রমে, একালের পাশ্চাত্য শিক্ষায় 'শিক্ষিত' বাঙালী পাঠককে সেই বিস্মৃতপ্রায় জ্ঞান ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। তখন মহেশচন্দ্র পালের উপনিষদ অনুবাদ, সত্যব্রত সামশ্রমীর যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতার অনুবাদ এবং রমেশচন্দ্র দত্তের ঋগ্‌বেদ সংহিতার অনুবাদ প্রকাশিত হতে শুরু হয়েছে দেখে তিনি খুবই খুশি হন। রমেশচন্দ্র দত্তের ঐ অনুবাদ বিষয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি লেখেন,—

> 'যিনি যাহাই বলুন রমেশচন্দ্রের এই কীর্তিটি চিরস্মরণীয় হইবে। ইউরোপে যখন বাইবেল প্রথম ইংরেজি প্রভৃতি প্রচলিত ভাষায় অনুবাদিত হয়, তখন রোমকীয় পুরোহিত এবং অধ্যাপক-সম্প্রদায় অনুবাদের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন। রমেশবাবুর প্রতিও সেইরূপ অত্যাচার হওয়াই সম্ভব। কিন্তু যেমন বাইবেলের সেই অনুবাদে ইউরোপ উপধর্ম হইতে মুক্ত হইল, ইউরোপীয় উন্নতির পথ অনর্গল হইল, রমেশবাবুর এই অনুবাদে তদ্রূপ সুফল ফলিবে। বাঙালী ইহার ঋণ কখনো পরিশোধ করিতে পারিবে না।'

'প্রচারে' তিনি রমেশচন্দ্রের প্রথম অষ্টকের অনুবাদ সমালোচনার জন্যে উপহার পেয়েছিলেন। কিন্তু 'প্রচারে' গ্রন্থসমালোচনার ব্যবস্থা ছিল না। তাই সমালোচনা হয় নি। কিন্তু নিজের এই শেষপর্বের আধ্যাত্মিক লেখাগুলির সঙ্গে রমেশচন্দ্রের এই অনুবাদ রচনার গভীর যোগ অনুভব করেছিলেন তিনি। তাঁদের সেই উদ্দেশ্যের ঐক্যবোধ এখানে উল্লেখ করা দরকার। তিনি নিজে এই কথাটি পরিস্ফুট ক'রে রমেশচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁর পূর্বোদ্ধৃত মন্তব্যের ব্যাখ্যাসূত্র লিখেছিলেন—'যে উদ্দেশ্যে প্রচারে এই বৈদিক

প্রবন্ধগুলি লিখিত হইতেছে, এই অনুবাদ সেই উদ্দেশ্যের সহায় ও সাধক। এইজন্য এই অনুবাদ সম্বন্ধে এই কয়টি কথা প্রয়োজন বিবেচনা করিলাম।'

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁর পিতৃবিয়োগের পর থেকেই তাঁর লেখায় কোনো-না-কোনো ভাবে হিন্দুধর্মের আদর্শ ব্যাখ্যানের চেষ্টা দেখা দিতে থাকে,—বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে এইরকম একটি প্রচলিত বিশ্বাসের কথা আগেই বলা হয়েছে। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের শ্রাবণ সংখ্যার 'সাধনা' পত্রিকায় শ্রীশবাবুর স্মৃতিকথায় দেখা গেছে—বঙ্কিম নিজে বলতেন যে, আগে তিনি নাস্তিক ছিলেন এবং একসময়ে তাঁর চিন্তায় জন স্টুয়ার্ট মিলের খুবই প্রভাব ছিল, কিন্তু তাঁর এই উক্তির সমকালে,—অর্থাৎ ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে সে-সব নাকি অন্তর্হিত হয়। এই কথাটি,—এবং এই প্রসঙ্গেই ১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ঈশ্বর-বিশ্বাসের অভাব সম্বন্ধে কালীনাথ দত্তের যে মন্তব্য একই সঙ্গে এ-আলোচনায় স্মরণ করা হয়েছে, এই দুটি ইঙ্গিতই পুনরায় বিবেচ্য।[১১] তাঁর রচনায় কৃষ্ণকথার পরিণতি সম্বন্ধে এই

১১। পৃষ্ঠা ১১-১২ দ্রষ্টব্য। হেস্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধের কিঞ্চিৎ নমুনা হিসেবে স্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত এবং শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা বঙ্কিমের 'জীবন-চরিতে' [১৩১৮] সংকলিত উভয়েব চিঠিব অংশ তুলে দেখা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র সাংখ্যকার কপিলকে প্রকৃতি-পুরুষের আদি ভেদ-প্রদর্শক বলে সম্মান জানান। হেস্টি বলেন অ্যারিস্টট্‌ল্‌ ভারতবর্ষে দর্শনশাস্ত্র সরবরাহ করবার অনেক পরে কপিলের আবির্ভাব হয়। হেস্টির শেষ চিঠির পরে বেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এক চিঠিতে বঙ্কিমের বেদ-অস্বীকৃতির (?) ও তন্ত্র-সম্পর্কিত মতামতের তীব্র সমালোচনা করেন। সেই চিঠির উত্তরে ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই নভেম্বর বঙ্কিম স্বনামে তাঁর শেষ চিঠি লেখেন।

'রামচন্দ্র' ছদ্মনামে বঙ্কিম লেখেন: 'Will you allow me to suggest to Mr Hastie who is so ambitous of earning distinction as a sort of Indian St. Paul, that it is fit that he should render himself better acquainted with the doctrines of the Hindu religion before he seeks to demolish them. As matters stand with him, his arguments are simply contemptible; and I think the columns of the Statesman might have been more usefully occupied by advertisements about Doorga Puja Holiday goods than by trash which render the champion of Christianity contemptible in the eyes of idolators. This may be harsh language, but the writer who mistakes Vedantism for Hindooism, and goes to Mr. Monier Williams for an exposition of that doctrine, hardly deserves better treatment. Mr. Hastie's attempt to storm the 'inner citadel' of the Hindoo religion forcibly reminds us another equally heroic achievement—that of the redoubted knight of La Mancha before the windmill.

'Let Mr. Hastie take my advice, and obtain some knowledge of the Sanskrit scriptures in the *original*. Let him study then critically all the systems of Hindu Philosophy the *Bhagabat Gita* and *Bhakti Sutra* of Sandilya, and such

আলোচনায় এ পর্যন্ত তাঁর ভিন্ন ভিন্ন যে সব রচনার কথা উঠলো, সেগুলিতে ধর্ম-আলোচনা সম্পর্কে তাঁর দীর্ঘস্থায়ী আগ্রহ ব্যক্ত হয়েছে। চন্দ্রশেখর, রজনী ইত্যাদি উপন্যাসের মধ্যে তিনি যে ক্ষণে-ক্ষণে যোগবল ইত্যাদির কথা

other works. Let him not study them under European scholars, for they cannot teach what they don't understand ; the blind cannot lead the blind. Let him study them with a Hindoo, with one who *belives* in them. And then, if he should still entertain his present inclination, to enter on an apostolic career, let him hold forth at his pleasure, and if we do not promise to be convinced by him, we promise not to laugh at him. At present arguments would be thrown away on him. There can be no controversy on a subject when one of the controversialists is in utter ignorance on the subject-matter of the controversy ; and if under such circumstances the 'Olympians only yawn', and do not assert, Mr. Hastie has only to thank his own precipitate ignorance'. এতে হেস্টি খুবই রেগে যান। ছদ্মনামা রামচন্দ্রকে তিনি 'Supercilious' ও 'Self-confident' বলেন।

হেস্টি লেখেন: 'I do not intend to ask space for a reply to any of the special criticism of your numerous correspondents upon my letters, until they say something relevant and worthy of being dealt with. But I hope you will allow me to return grateful thanks to the valiant hero of the modern Brahmans, *Ram Chandra*, *Redivivus*, for the kind advice so bountifully tendered to me in your columns to-day, which I sincerely promise to put into practice, as soon as he shows that I have need of it. Your readers, who may be better acquainted with Sanskrit literature than he seems to be, will have already judged whether I confounded Vedantism with Hinduism'.

তিনি আরো লেখেন: 'I publicly challange him to substantiate his allegation of the 'contemptible' inferiority of 'blind' European learning, by giving, without its aid, an intelligible explanation of the simple Vedic verses. "Chatustrinsadvajino devabandhorvankrirasvasya svadhitih sameti". I give him the whole of the Durga Puja holidays even to discover the difficulty involved in the expression, and if he does find out so much, I will give him and the other 4000 *Adhyapaks* to boot, who were present at the great *Shradh* as many months as they like, to search through all the Sanskrit literature known to them for an explanation.'

এবং—'I am waiting patiently for a reply to my last letter from the learned Ram Chandra and the 4000 *Adhyapaks* of the *Shradh*. It is really a challenge to all the Pundits of Bengal to show that they understand their own sacred literature, and are able to defend it at the bar of modern science, If none of them—not even the modern Ramchandra himself—can come forward and bend this bow of a Western Janaka, let the champions of Hindu idolatry henceforth 'hide their diminished heads' before the more powerful scholars of Europe, and let the last abominations of that idolatry, even in these Durga Puja days, sink into utter darkness and shame.'

উত্থাপন করে গেছেন, সে তো আগেই বলা হয়েছে। শোভাবাজার রাজবাড়িতে মহারাজ কালীকৃষ্ণের স্ত্রীর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে, শ্রাদ্ধ-সভায় গোপীনাথ-বিগ্রহ স্থাপিত হতে দেখে হেস্টি খুবই রাগ করেন। সেই সূত্রেই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে রেভারেণ্ড হেস্টির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তর্কবিতর্ক শুরু হয়।

'আনন্দমঠে' জাতীয়তা আর ধর্মচিন্তার অবিচ্ছেদ্য সংযোগ সুস্পষ্ট। হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত জানিয়েছেন যে, এই আনন্দমঠেই সনাতন-ধর্ম প্রচারের আগ্রহ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আনন্দমঠের চিকিৎসকের মুখে যে কথাগুলি দেওয়া হয়েছিল, বঙ্কিমচন্দ্রের পিতৃবিয়োগে দুবছর পরে, ১২৮৯ সালের জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গদর্শনে' সে অংশ প্রথম প্রকাশিত হয়। তারই উল্লেখ করে হেমেন্দ্রনাথ বলে গেছেন,—'এইখানে প্রথম দেখিতে পাই উগ্র স্বাদেশিকতার সহিত ধর্মভাবের সংমিশ্রণ।' অতঃপর তিনি পূর্ণচন্দ্রের কথা তুলে দিয়েছেন। পূর্ণচন্দ্র লিখে গেছেন যে, পিতৃদেবের উপদেশে এবং সংস্কৃত গ্রন্থাদির প্রভাবেই বঙ্কিমের মনে প্রথম ধর্মের উদ্দীপনা দেখা দেয়। তাঁর মাতামহের উৎসাহে সংগৃহীত সংস্কৃত বইগুলি বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর মাতুলের কাছ থেকে উপহার পান। তিনি যখন হুগলীতে বদলি হয়ে আসেন, পিতার কাছে তখন তিনি বেশ কিছুদিন ধর্মালোচনা শোনবার সুযোগ পান। পরিণত জীবনের এই শিক্ষাই তাঁর এইসব আলোচনার প্রধান অবলম্বন হিসেবে স্বীকার্য। তবে, এতৎসত্ত্বেও একথা বলা দরকার যে, ১৮৮২র কালনির্দেশটি নানা জনে সমর্থন করে গেলেও, তাঁর আধ্যাত্মিক আলোচনার সূত্রপাত যে ঠিক তখন থেকেই, এ-কথা পুরোপুরি মেনে নেওয়া চলে না। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে 'মুখার্জিস ম্যাগাজিনে' হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে তাঁর ইংরেজি প্রবন্ধ প্রকাশের কথা স্মরণীয়।[১২] ১২৭৯ সালের চৈত্রের বঙ্গদর্শনে রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা' বইখানির তিনি সমালোচনা করেন। ১২৮০র জ্যৈষ্ঠের বঙ্গদর্শনে 'দুর্গা' প্রবন্ধে হিন্দুধর্মের দেবদেবীর কথা এবং বেদেরও উল্লেখ ছিল। ডঃ জন মিয়োরের সংস্কৃত শাস্ত্রগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ থেকে সে-প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র কিছু বঙ্গানুবাদও পরিবেষণ করেন। ১২৮১র অগ্রহায়ণের 'ভ্রমরে' 'বঙ্গে দেবপূজা' প্রবন্ধের প্রতিবাদ-সূত্রে তিনি পুনরায় সাকার-নিরাকার ঈশ্বর উপাসনার কথা তুলেছিলেন। ১২৮১র

১২। এই গ্রন্থের ১২৫-১২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' সমালোচনা-সূত্রে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র সম্পর্কিত নানা মন্তব্যের কথা ইতিপূর্বে অনেকবার স্মরণ করা গেছে। এই লেখাগুলির একটিও ১৮৮২র পরের আমলের নয়, বরং অনেকগুলিই তার বেশ কিছু আগেকার লেখা। দেবতত্ত্ব, হিন্দুধর্ম, ঈশ্বরোপাসনা, তথা কৃষ্ণচরিত্র বিষয়ে এই নজিরগুলিই তাঁর সুদীর্ঘকালের অনুধ্যানের সূচক।

১২৯১-এর শ্রাবণে 'প্রচার' প্রথম প্রকাশিত হয়। সেই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'সূচনায়' তিনি পূর্ব-পত্রিকা 'বঙ্গদর্শন' বন্ধ হওয়ার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করে, বঙ্গদর্শনের বড়ো আয়তন আর প্রচার-এর ছোটো আয়তনের কথা তুলে জানিয়েছিলেন—'যেখানে জাহাজ চলে না, আমরা সেইখানে ডিঙ্গী চালাইব। চড়ায় ঠেকিয়া বঙ্গদর্শন-জাহাজ বানচাল হইয়া গেল —প্রচার ডিঙ্গী, এক হাঁটু জলেও নির্বিঘ্নে ভাসিয়া যাইবে ভরসা আছে।' গম্ভীর বিষয়ের আলোচনায় বাঙালী পাঠক-সমাজের স্বভাব-বিমুখতার কথা তিনি সেখানেও উল্লেখ করতে ভোলেন নি। তাঁর শেষ পর্বের এই লেখাগুলি সম্বন্ধে সেই 'সূচনা' থেকে তাঁর নিজেরই একটি বিশেষণ মনে করা যেতে পারে। তিনি তাঁর প্রিয় 'বঙ্গদর্শন'-এর কথা-প্রসঙ্গে 'জ্ঞানবুদ্ধিবিস্তারসপরিপূর্ণ মাসিক' কথাটি ব্যবহার করেছিলেন। 'নবজীবন' পত্রিকা তখন শুরু হয়েছে। সে-পত্রিকার স্বীকৃত আদর্শের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জানিয়ে, 'প্রচার'-এর কথা-প্রসঙ্গে তিনি লেখেন—'আমরা সেই মহাদৃষ্টান্তের অনুগামী হইয়া এই ব্রত পালন করিতে যত্ন করিব। 'সত্য', 'ধর্ম' এবং 'আনন্দের' প্রচারের জন্যই আমরা এই সুলভ পত্র প্রচার করিলাম এবং সেই জন্যই ইহার নাম দিলাম 'প্রচার'। এই সময়ে তিনি যে বহু প্রযত্নে, ঈশ্বরে নির্ভর ক'রে, তাঁর এ-কাজ শুরু করেছিলেন, 'সূচনার' শেষ অনুচ্ছেদে তারও ইঙ্গিত আছে। সম্পাদকের নাম দেন নি তিনি। নিজের ব্যক্তিগত প্রয়াস-প্রযত্নে কোনো রকম কার্পণ্য ছিলনা, কিন্তু নামের কামনা রাখেননি তিনি! উপসংহারে লিখেছিলেন—'সম্পাদকের এমন কোন দাবি দাওয়া নাই যে, তিনি আত্মপরিচয় দিয়া পাঠকদিগের সম্মুখীন হইতে পারেন। তাঁহার কাজ যাঁহারা বিদ্বান, ভাবুক, রসজ্ঞ, লোকহিতৈষী এবং সুলেখক, তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধসকল সংগ্রহ করিয়া পাঠকদিগকে উপহার প্রদান করেন। এ কাজ তিনি পারিবেন, এমন ভরসা করেন।' নিজের এই সংকল্প প্রকাশের,

—এবং ঈশ্বর স্মরণ ক'রে নিজের সামর্থ্য সম্বন্ধে এই প্রত্যয় জানাবার মাত্র কয়েক মাস পরেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে,—তথা আদি-ব্রহ্মসমাজের ব্যাপারে মতানৈক্য জানাতে হয় তাঁকে। 'কৃষ্ণচরিত্র' সম্পর্কিত আলোচনার পরিণতি-পর্বের এই ঘটনাটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র বক্তব্য ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোচিত হবার আগে, সেই ঘটনার আসল দিকটি দেখা দরকার। তাঁর সুদীর্ঘ প্রতিবাদপত্র পুরোপুরি তুলে দেখাই সংগত। তারপর, তাঁর 'Letters on Hinduism'-এর প্রসঙ্গও বিবেচ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনে, সত্য, ধর্ম, কল্যাণ, আনন্দ ইত্যাদি চিন্তার সঙ্গে তাঁর 'কৃষ্ণচরিত্র' জড়িত। বঙ্গদর্শন, নবজীবন, তত্ত্ববোধিনী প্রভৃতি সেকালের পত্র-পত্রিকার মধ্য দিয়ে দেশে যে ধর্মালোচনা ব্যাপক ভাবে প্রকাশোন্মুখ হয়ে ওঠে, সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা বাদ দিয়ে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র কথা ভাবা যায় না। রবীন্দ্রনাথের সামর্থ্যের অনেক প্রশংসা ছিল সেই প্রবন্ধে। তাতে অকুণ্ঠ সমালোচনাও ছিল। এখানে তাঁর সে-লেখাটি প্রায় পুরোপুরি তুলে দেখলেই আলোচনার ধারা ঠিক ঠিক বজায় রাখা যায়। অগ্রহায়ণের 'ভারতী'তে 'একটি পুরাতন কথা' নামে রবীন্দ্রনাথের এক বক্তৃতা ছাপা হয়। সেই বক্তৃতা পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্র ১২৯১ সালের অগ্রহায়ণের 'প্রচারে' 'আদি-ব্রাহ্ম-সমাজ ও নব হিন্দু সম্প্রদায়' নামে তাঁর এই প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে আহত হয়ে তিনি জানান:

> 'ইহা আমার পক্ষে কিছুই নূতন নহে। রবীন্দ্রবাবু যখন ক, খ, শিখেন নাই, তাহার পূর্ব হইতে এরূপ সুখ দুঃখ আমার কপালে অনেক ঘটিয়াছে। আমার বিরুদ্ধে কেহ কখনও কোন কথা লিখিলে বা বক্তৃতায় বলিলে এ পর্যন্ত কোন উত্তর করি নাই। কখন উত্তর করিবার প্রয়োজন হয় নাই। এবার উত্তর করিবার একটু প্রয়োজন পড়িয়াছে। না করিলে যাহারা আমার কথা বিশ্বাস করে, [এমন কেহ থাকিলে থাকিতে পারে] তাহাদের অনিষ্ট ঘটিবে।
>
> 'কিন্তু সে প্রয়োজনীয় উত্তর দুই ছত্রে দেওয়া যাইতে পারে। রবীন্দ্রবাবুর কথার উত্তরে ইহার বেশি প্রয়োজন নাই। রবীন্দ্রবাবু প্রতিভাশালী, সুশিক্ষিত, সুলেখক, মহৎস্বভাব, এবং আমার বিশেষ

প্রীতি, যত্ন এবং প্রশংসার পাত্র। বিশেষতঃ তিনি তরুণ বয়স্ক। যদি তিনি দুই একটা কথা বেশি বলিয়া থাকেন, তাহা নীরবে শুনাই আমার কর্তব্য।

'তবে যে এ কয় পাতা লিখিলাম, তাহার কারণ, এই রবির পিছনে একটা বড় ছায়া দেখিতেছি। রবীন্দ্রবাবু আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক। সম্পাদক না হইলে আদি ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ যে বিশেষ ঘনিষ্ঠ, তাহা বলা বাহুল্য। বক্তৃতাটি পড়িয়া আমার আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্বন্ধে কতকগুলি কথা মনে পড়িল। আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের নিকট আমার কিছু নিবেদন আছে। সেইজন্যই লিখিতেছি। কিন্তু নিবেদন জানাইবার পূর্বে পাঠককে একটা রহস্য বুঝাইতে হইবে।'

এই প্রথম কয়েক অনুচ্ছেদে এবং শেষে আরো ক'টি অনুচ্ছেদে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত স্নেহ-সম্পর্ক ও উচ্চ প্রত্যাশার কথা জানান। অতঃপর এ বিতর্কের মূল কথার পরিচয়:

'গত শ্রাবণ মাসে, 'নবজীবন' প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহাতে সম্পাদক একটি সূচনা লিখিয়াছিলেন। সূচনায়, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রশংসা ছিল, বঙ্গদর্শনেরও প্রশংসা ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তত্ত্ববোধিনীর অপেক্ষা বঙ্গদর্শনের প্রশংসাটা একটু বেশি ঘোরাল হইয়া উঠিয়াছিল।

'তারপর সঞ্জীবনীতে একখানি প্রেরিত পত্র প্রকাশিত হইল। পত্রখানির উদ্দেশ্য নবজীবন-সম্পাদককে এবং নবজীবনের সূচনাকে গালি দেওয়া। এই পত্রের লেখকের স্বাক্ষর ছিল না—কিন্তু অনেকেই জানে যে,—আদি ব্রাহ্ম সমাজের একজন প্রধান লেখক ঐ পত্রের প্রণেতা। তিনি আমার বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এবং শুনিয়াছি, তিনি নিজে ঐ পত্রখানির জন্য পরে অনুতাপ করিয়াছিলেন, অতএব নাম প্রকাশ করিলাম না। যদি এই সকল কথা অস্বীকার করেন, তবে নাম প্রকাশ করিতে বাধ্য হইব।

'নবজীবন সম্পাদক অক্ষয়বাবু এ পত্রের কোন উত্তর দিলেন না। কিন্তু নবজীবনের আর একজন লেখক এখানে চুপ করিয়া থাকা উচিত বোধ করিলেন না। আমার প্রিয়বন্ধু বাবু চন্দ্রনাথ বসু

ঐ পত্রের উত্তর দিয়াছিলেন ; এবং গালাগালির রকমটা দেখিয়া 'ইতর' শব্দটা লইয়া একটু নাড়াচাড়া করিয়াছিলেন।

'তদুত্তরে সঞ্জীবনীতে আর একখানি বেনামি পত্র প্রকাশিত হইল। নাম নাই বটে, কিন্তু নামের আদ্য অক্ষর ছিল,—"র"। লোকে কাজেই বলিল পত্রখানি রবীন্দ্রনাথের লেখা। রবীন্দ্রবাবু 'ইতর' শব্দটা চন্দ্রবাবুকে পাল্টাইয়া বলিলেন।'

১২৯১ সালে যখন অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' [শ্রাবণ], এবং বঙ্কিমচন্দ্রের জামাতা রাখালচন্দ্রের সম্পাদনায় 'প্রচার' [১৫ই শ্রাবণ] প্রকাশিত হয়, তার বছর তিনেক আগেই ১২৮৮ সালের ২৬শে অগ্রহায়ণ থেকে 'বঙ্গবাসী' সাপ্তাহিক দেখা দিয়েছে। এই তিনখানি পত্রিকাতেই সনাতন হিন্দু আদর্শে যুগোচিত সংস্কার মাত্র মেনে নেবার চিন্তা প্রকাশিত হয়। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মসমাজের যে-দল দেবেন্দ্রনাথের সমাজ-সংস্কারবিরোধী মনোভাবের জন্যে তাঁকে ত্যাগ করেছিলেন, তাঁদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধেও বিরূপ মনোভাব দেখা দিতে থাকে। কেশবচন্দ্রকে ত্যাগ করে, এঁরা নিজেদের ফরাসীবিপ্লবের স্বাধীনতা, সাম্য, মৈত্রীর আদর্শে অনুরাগী বলে পরিচয় দিতে থাকেন। এই দলের নেতা কৃষ্ণকুমার মিত্র 'সঞ্জীবনী' সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। 'সঞ্জীবনী'তে প্রগতির নামে ভাঙন, এবং 'বঙ্গবাসী'তে সংরক্ষণের নামে গোঁড়ামি দেখা দিয়েছিল ব'লে সমালোচক উল্লেখ করেছেন। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রজীবনী' থেকে এখানে এইসূত্রে কিঞ্চিৎ স্মরণীয়। পাদটীকায় সেই কথাগুলি তুলে দেওয়া গেল।[১৩] যাই হোক্, অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন :

১৩। 'আদি ব্রাহ্মসমাজ সমাজ-সংস্কার সম্বন্ধে কোনো প্রকার কালাপাহাড়ী বা radical মত পোষণ করিতেন না ; তাঁহারা হিন্দুশাস্ত্র ও তত্ত্ববিদ্যাদির আলোচনায় রত থাকিয়া মনে করিতেন তাঁহাদের ধর্মমতই হইতেছে মূল হিন্দুধর্মসম্মত, আদর্শ হিন্দুর অনুকরণীয়। সুতরাং হিন্দুর যাহা কিছু গৌরবের তাহার রক্ষী তাঁহারাই, নূতন সংস্কারপন্থী ও নূতন সংরক্ষণপন্থী উভয়েই ভ্রান্ত। সেইজন্য হিন্দুসমাজবিরোধী কোনো অনুষ্ঠান তাঁহাদের সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিত না। কেশবচন্দ্রের অসবর্ণবিবাহ বিলও [১৮৭২] তাঁহাদের সমর্থন পায় নাই ; বিদ্যাসাগরের বিধবাবিবাহও তাঁহারা অনুমোদন করিতে পারেন নাই। এতদসত্ত্বেও বঙ্কিমপ্রমুখ নব্য হিন্দু নেতারা আদিব্রাহ্মসমাজের এই দাবি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না ; রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব' বঙ্গদর্শনে সর্বান্তঃকরণে অভিনন্দিত হয় নাই এবং সে রচনার লেখক স্বয়ং বঙ্কিমচন্দ্রই। আদিসমাজের বিশ্বাসের মূলতত্ত্ব নিরাকার পরমেশ্বরের আরাধনা, নব্য হিন্দুরা এই তত্ত্বকেও পরম সত্য বলিয়া মানিতে একেবারে নারাজ। তাই অচিরেই নব্য হিন্দুসমাজের সহিত আদিসমাজের মধ্যে বিরোধ বাধিল। এই ইতিহাসটুকু বলা প্রয়োজন, কারণ অবশেষে এই বিবাদ বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মসীযুদ্ধে পরিণত হইয়াছিল।'—রবীন্দ্র-জীবনী [পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ, ১৩৫৩], প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৫৬।

'নবজীবনের পনর দিন পরে, প্রচারের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইল। প্রচার, আমার সাহায্যে ও আমার উৎসাহে প্রকাশিত হয়। নবজীবনে আমি হিন্দুধর্ম—যে হিন্দুধর্ম আমি গ্রহণ করি—তাহার পক্ষ সমর্থন করিয়া নিয়মক্রমে লিখিতেছিলাম। প্রচারেও ঐ বিষয়ে নিয়মক্রমে লিখিতে লাগিলাম। সেই ধর্ম আদি ব্রাহ্ম সমাজের অভিমত নহে। যে কারণেই হউক, প্রচার প্রকাশিত হইবার পর আমি আদি ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত লেখকদিগের দ্বারা চারিবার আক্রান্ত হইয়াছি। রবীন্দ্রবাবুর এই আক্রমণ চতুর্থ আক্রমণ। গড় পড়তায় মাসে একটি। এই সকল আক্রমণের তীব্রতা একটু পরদা পরদা উঠিতেছে। তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক।

প্রথম। তত্ত্ববোধিনীতে হিন্দু সম্প্রদায় এই শিরোনামে একটি প্রবন্ধে আমার লিখিত 'ধর্মজিজ্ঞাসা' সমালোচিত হয়। সমালোচনা আক্রমণ নহে। এই লেখক বিজ্ঞ, গম্ভীর এবং ভাবুক। আমার যাহা বলিবার আছে, তাহা সব শুনিয়া, যদি প্রথম সংখ্যার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর না করিয়া, তিনি সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইতেন, তবে তাঁহার কোন দোষই দিতে পারিতাম না। তিনি যদি অকারণে আমার উপর নিরীশ্বরবাদ প্রভৃতি দোষ আরোপিত না করিতেন, তবে আজ তাঁহার প্রবন্ধ এই গণনার ভিতর ধরিতে পারিতাম না। তিনি যে দয়ার সহিত সমালোচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি আমার ধন্যবাদের পাত্র। বোধ হয়, বলায় দোষ নাই যে, এই লেখক স্বয়ং তত্ত্ববোধিনী সম্পাদক বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর।[১৪]

১৪। শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় লিখিছেন: 'বঙ্কিমের সহিত আদিসমাজের মতের পার্থক্য কোথায় এবং কিসের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় [১২৯১ ভাদ্র] বন্ধুর অমন উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন, তাহা নিম্নলিখিত উক্তি হইতে স্পষ্ট হইবে।'

"সম্প্রতি...কোন কোন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ব্যক্তি একটি নূতন ধর্মমত উদ্ভাবিত করিয়াছেন। সে মত এই যে কোম্‌তের মতই প্রকৃত হিন্দুধর্ম। 'নবজীবন' নামক অভিনব সাময়িক পত্রিকায় এই মত সমর্থিত হইতে দেখিয়া অতিশয় দুঃখিত হইলাম।...লেখক এই মত সমর্থন করিয়াছেন যে চিরচমৎকৃতি ও সুখই ধর্ম এবং হিন্দুশাস্ত্রসকল এই মত প্রতিপাদন করিতেছেন। এই মত একটি অদ্ভুত মত বলিতে হইবে। আমরা যদি উক্ত প্রস্তাবের লেখক বঙ্কিমবাবুকে দিনরাত্রি চমৎকারভাবে দেখি, তাহা কি ধর্ম বলা যাইতে পারে?'—ঐ, পৃষ্ঠা ১৫৭।

রাজনারায়ণ বসুর কথা আগেই বলা হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের এই লেখাটিতে অতঃপর সে-প্রসঙ্গেরও উল্লেখ দেখা যায় :

দ্বিতীয়। তত্ত্ববোধিনীর ঐ সংখ্যায় 'নূতন ধর্মমত' ইতিশীর্ষক দ্বিতীয় এক প্রবন্ধে অন্য লেখকের দ্বারা প্রচার ও নবজীবনে প্রথম সংখ্যায় ধর্ম সম্বন্ধে আমার যে সকল মত প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা—সমালোচিত নহে—তিরস্কৃত হয়। লেখকের নাম প্রবন্ধে ছিল না। লেখক কে তাহা জানিনা, কিন্তু লোকে বলে, উহা বিজ্ঞবর শ্রীযুক্ত বাবু রাজনারায়ণ বসুর লেখা। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সভাপতি। উহাতে 'নাস্তিক' 'জঘন্য কোম্‌ত মতাবলম্বী' ইত্যাদি ভাষায় অভিহিত হইয়াছিলাম। এই লেখক যিনিই হউন, বড় উদার প্রকৃতির। তিনি উদারতা প্রযুক্ত, ইংরেজেরা যাহাকে ঝুলির ভিতর হইতে বিড়াল বাহির করা বলে, তাহাই করিয়া বলিয়াছেন। একটু উদ্ধৃত করিতেছি।

ধর্ম-জিজ্ঞাসা প্রবন্ধ-লেখক তাঁহার প্রস্তাবের শেষে বলিয়াছেন 'যে ধর্মের তত্ত্বজ্ঞানে অধিক সত্য, উপাসনা যে ধর্মের সর্বাপেক্ষা চিত্তশুদ্ধিকর এবং মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্তিদায়ক, যে ধর্মের নীতি সর্বাপেক্ষা ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, সেই ধর্মই অবলম্বন করিবে। সেই ধর্ম সর্বশ্রেষ্ঠ। হিন্দুধর্মের সার ব্রাহ্মধর্মই এই সকল লক্ষণাক্রান্ত। আমাদিগের ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের প্রথম খণ্ডে তত্ত্বজ্ঞান বিষয়ক যে সকল শ্লোক আছে, সকলই সত্য। ব্রহ্মোপাসনা যেমন চিত্তশুদ্ধিকর ও মনোবৃত্তি সকলের স্ফূর্তিদায়ক, এমন অন্য কোন ধর্মের উপাসনা নহে। ঐ ধর্মের নীতি যেমন ব্যক্তিগত এবং জাতিগত উন্নতির উপযোগী, এমন অন্য কোন ধর্মের নীতি নহে। ব্রাহ্মধর্মই বঙ্গদেশের শিক্ষিত লোকমাত্রেরই গ্রহণযোগ্য। তাহাতে জাতীয় ভাব ও সত্য উভয়ই রক্ষিত হইয়াছে। উহা দেশের উন্নতির সঙ্গে সুসঙ্গত। উহা সমস্ত বঙ্গদেশের লোক গ্রহণ করিলে বঙ্গদেশের অশেষ কল্যাণ সাধিত হইবে'। [তত্ত্ববোধিনী—ভাদ্র, ৯১ পৃষ্ঠা]। ইহার পরে আবার নূতন হিন্দুধর্ম সংস্কারের উদ্যম, নবজীবন ও প্রচারের ধৃষ্টতার পরিচয় বটে।

তৃতীয়। তৃতীয় আক্রমণ, তত্ত্ববোধিনীতে নহে, এবং ধর্ম সম্বন্ধে

কোন বিচারেও নহে। প্রচারের প্রথম সংখ্যায় 'বাঙ্গালায় কলঙ্ক' বলিয়া একটি প্রবন্ধ লিখিত হয়। নব্যভারতে বাবু কৈলাসচন্দ্র সিংহ নামে একজন লেখক উহার প্রতিবাদ করেন। তত্ত্ববোধিনীতে দেখিয়াছি যে, ইনি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক। শুনিয়াছি, ইনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর মহাশয়দিগের একজন ভৃত্য—নায়েব কি কি আমি ঠিক জানি না। যদি আমার ভুল হইয়া থাকে, ভরসা করি, ইনি আমাকে মার্জনা করিবেন। ইনি সকল মাসিক পত্রে লিখিয়া থাকেন, এবং ইঁহার কোন কোন প্রবন্ধ পড়িয়াছি। আমার কথার দুই এক স্থানে কখন কখন প্রতিবাদ করিয়াছেন দেখিয়াছি। সে সকল স্থলে কখন অসৌজন্য বা অসভ্যতা দেখি নাই। কিন্তু এবারকার এই প্রবন্ধে ভাষাটা সহসা বড় নাএবি রকম হইয়া উঠিয়াছে। পাঠককে একটু উপহার দিতেছি।

'হে বঙ্গীয় লেখক! যদি ইতিহাস লিখিতে চাও, তবে রাশি রাশি গ্রন্থ অধ্যয়ন কর। আবিষ্কৃত শাসনপত্রগুলির মূল শ্লোক বিশেষরূপে আলোচনা কর—কাহারও অনুবাদের প্রতি অন্ধভাবে নির্ভর করিও না। উইলসন, বেবার, মেক্‌সমুলার, কনিংহাম প্রভৃতি পণ্ডিতগণের পদলেহন করিলে কিছুই হইবে না। কিম্বা মিওর, ভাউদাজি, মেইন, মিত্র, হাণ্টার প্রভৃতির কুসুম-কাননে প্রবেশ করিয়া তস্করবৃত্তি অবলম্বন করিওনা। স্বাধীনভাবে গবেষণা কর। না পার গুরুগিরি করিও না।'—[নব্যভারত—ভাদ্র, ২২৫ পৃষ্ঠা]

এখন এই লেখকের কথা উত্থাপন করার আমার এমন উদ্দেশ্য নাই যে, কেহ বুঝেন, প্রভুদিগের আদেশানুসারে ভৃত্যের ভাষার এই বিকৃতি ঘটিয়াছে। তিনি আদি ব্রাহ্ম সমাজের সহকারী সম্পাদক বলিয়াই, তাঁহার উল্লেখ করিলাম।

চতুর্থ আক্রমণ, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদকের দ্বারা হইয়াছে। গালিগালাজের বড় ছড়াছড়ি, বড় বাড়াবাড়ি আছে। আমরা প্রায়ই দেখিয়াছি গালিগালাজে প্রভুর অপেক্ষা ভৃত্য মজবুত। এখানে বলিতে হইবে, প্রভুই মজবুত। তবে প্রভু, ভৃত্যের মত মেছোহাটা হইতে গালি আমদানি করেন নাই। প্রার্থনা-মন্দির হইতে আনিয়াছেন। উদাহরণ—'অসাধারণ প্রতিভা

ইচ্ছা করিলে স্বদেশের উন্নতির মূল শিথিল করিতে পারেন, কিন্তু সত্যের মূল শিথিল করিতে পারেন না।' আরও বাড়াবাড়ি আছে। মেছোহাটার ভাষা এত দূর পৌঁছে না। পাঠক মনে করিবেন, রবীন্দ্রবাবু তরুণবয়স্ক বলিয়াই এত বাড়াবাড়ি হইয়াছে। তাহা নহে। সুর কেমন পরদা পরদা উঠিতেছে, তাহা দেখাইয়া আসিয়াছি। সমাজের সহকারী সম্পাদকের কড়ি মধ্যমের পর, সম্পাদক স্বয়ং পঞ্চমে না উঠিলে (সুর) লাগাইতে পারিবার সম্ভাবনা ছিল না।'

মূল রচনার পাদটীকা বর্জন ক'রে, এখানে তাঁর আসল বক্তব্যেরই পরিচয় দেওয়া হোলো। বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের কথায় খুবই আহত হয়েছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে অংশ তুলে তুলে তাঁর মনোবেদনার কারণটি পাঠকের গোচরে এনেছিলেন। অতঃপর তিনি জানান :

'রবীন্দ্রবাবু বলেন যে, আমার এই মত যে, সত্য ত্যাগ করিয়া প্রয়োজন মতে মিথ্যা কথা বলিবে। বরং আরও বেশি বলেন ; পাঠক বিশ্বাস না করেন, তাঁহার লিপি উদ্ধৃত করিতেছি, পড়ুন।

"আমাদের দেশের প্রধান লেখক প্রকাশ্য ভাবে, অসঙ্কোচে, নির্ভয়ে, অসত্যকে সত্যের সহিত একাসনে বসাইয়াছেন, সত্যের পূর্ণ সত্যতা অস্বীকার করিয়াছেন, এবং দেশের সমস্ত পাঠক নীরবে নিস্তব্ধভাবে শ্রবণ করিয়া গিয়াছেন। সাকার নিরাকারের উপাসনা ভেদ লইয়াই সকলে কোলাহল করিতেছেন, কিন্তু অলক্ষ্যে ধর্মের ভিত্তিমূলে যে আঘাত পড়িতেছে, সেই আঘাত হইতে ধর্মকে ও সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য কেহ দণ্ডায়মান হইতেছেন না। এ কথা কেহ ভাবিতেছেন না যে, যে সমাজে প্রকাশ্যভাবে কেহ ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে সাহস করে, সেখানে ধর্মের মূল না জানি কতখানি শিথিল হইয়া গিয়াছে। আমাদের শিরার মধ্যে মিথ্যাচরণ ও কাপুরুষতা যদি রক্তের সহিত সঞ্চালিত না হইত, তাহা হইলে, কি আমাদের দেশের মুখ্য লেখক পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া স্পর্দ্ধা সহকারে সত্যের বিরুদ্ধে একটি কথা কহিতে সাহস করেন?" ইত্যাদি, ইত্যাদি। [ভারতী—অগ্রহায়ণ ৩৪৭ পৃঃ]

'সর্বনাশের কথা বটে, আদি ব্রাহ্ম সমাজ না থাকিলে আমার

হাত হইতে দেশ রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ। হয়ত পাঠক জানিতে ইচ্ছা করিতেছেন, কবে এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার ঘটিল! কবে আমি পথের মধ্যে দাঁড়াইয়া, স্পর্দ্ধা সহকারে, লোক ডাকিয়া বলিয়াছি, 'তোমরা ছাই ভস্ম সত্য ভাসাইয়া দাও—মিথ্যার আরাধনা কর।' কথাটার উত্তর দিতে পারিলাম না। ভরসা ছিল, রবীন্দ্রবাবু এ বিষয়ে সহায়তা করিবেন, কিন্তু বড় করেন নাই। তাঁহার কুড়ি স্তম্ভ বক্তৃতার মধ্যে মোটে ছত্র ছয় প্রমাণ প্রয়োগ খুঁজিয়া পাইলাম। তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

'লেখক মহাশয় একটি হিন্দুর আদর্শ কল্পনা করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি যদি মিথ্যা কহেন, তবে মহাভারতীয় কৃষ্ণোক্তি স্মরণপূর্বক যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয় অর্থাৎ যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়, সেইখানেই মিথ্যা কথা কহিয়া থাকেন।"

'প্রমাণ প্রয়োগ এই পর্যন্ত; তার পর আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক বলিতেছেন, "কোনখানেই মিথ্যা সত্য হয় না; শ্রদ্ধাস্পদ বঙ্কিমবাবু বলিলেও হয় না, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও হয় না।"

তীব্র ব্যঙ্গের সঙ্গে এই অভিযোগের জবাব দিয়েছিলেন তিনি:

'আমি বলিলেও মিথ্যা সত্য না হইতে পারে, শ্রীকৃষ্ণ বলিলেও না হইতে পারে, কিন্তু বোধ করি আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ কেহ বলিলে হয়। উদাহরণস্বরূপ 'একটি আদর্শ হিন্দু কল্পনা' সম্পাদক মহাশয়ের মুখ-নিঃসৃত এই চারিটি শব্দ পাঠককে উপহার দিতেছি।

প্রথম 'কল্পনা' শব্দটি সত্য নহে। আমি আদর্শ হিন্দু 'কল্পনা' করিয়াছি, এ কথা আমার লেখার ভিতর কোথাও নাই। আমার লেখার ভিতর এমন কিছুই নাই যে, তাহা হইতে এমন অনুমান করা যায়। প্রচারের প্রথম সংখ্যার হিন্দু ধর্ম শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে কথাটা রবীন্দ্রবাবু তুলিয়াছেন। পাঠক ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া দেখিবেন যে, 'কল্পনা' নহে। আমার নিকট পরিচিত দুই জন হিন্দুর দোষ গুণাগুণ বর্ণনা করিয়াছি। এক জন সন্ধ্যা আহ্নিকে রত, কিন্তু পরের অনিষ্টকারী। আদি ব্রাহ্ম সমাজের কেহ যদি চাহেন, আমি তাঁহার বাড়ি তাঁহাদিগকে দেখাইয়া আনিতে পারি। স্পষ্টই বলিয়াছি যে, আমি ঐ ব্যক্তিকে দেখিয়াছি। ঐ ব্যক্তির পরিচয়

দিয়া বলিয়াছি, 'আর একটি হিন্দুর কথা বলি।' ইহাতে কল্পনা বুঝায় না, পরিচিত ব্যক্তির পরিচয় বুঝায়।

তারপর 'আদর্শ' কথাটি সত্য নহে। 'আদর্শ' শব্দটা আমার উক্তিতে নাই। ভাবেও বুঝায় না। যে ব্যক্তি কখন কখন সুরা পান করে, সে ব্যক্তি আদর্শ হিন্দু বলিয়া গৃহীত হইল কি প্রকারে?

এই দুইটি কথা 'অসত্য' বলিতে হয়। অথচ সত্যের মহিমা কীর্তনে লাগিয়াছে। অতএব কৃষ্ণের আজ্ঞায় মিথ্যা সত্য হউক না হউক, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকের বাক্যবলে হইতে পারে।

প্রয়োজন হইলে ঐরূপ উদাহরণ আরও দেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে এরূপ বিচারে আমার প্রবৃত্তি নাই। আমার যদি মনে থাকিত যে, আমি রবীন্দ্রবাবুর প্রতিবাদ করিতেছি, তাহা হইলে এতটুকুও বলিতাম না। এই রবির পিছনে যে ছায়া আছে, আমি তাহারই প্রতিবাদ করিতেছি, বলিয়া এত কথা বলিলাম।

এখন এ সকল বাজে কথা ছাড়িয়া দেওয়া যাক। স্থূল কথার মীমাংসায় প্রবৃত্ত হওয়া প্রয়োজন। 'যেখানে মিথ্যাই সত্য হয়'—এ কথার কোন অর্থ আছে কি? যদি বলা যায় 'একটা চতুষ্কোণ গোলক'—তবে অনেকেই বলিবেন, এমন কথার অর্থ নাই। যদি রবীন্দ্র বাবু আমার উক্তি তাই মনে করিতেন, তবে গোল মিটিত। তাঁহার বক্তৃতাও হইত না—আমাকেও এ পাপ প্রবন্ধ লিখিতে হইত না। তাহা নহে। ইহা অর্থযুক্ত বাক্য বটে, এবং তিনিও ইহাকে অর্থযুক্ত বাক্য মনে করিয়া, ইহার উপর বক্তৃতাটি খাড়া করিয়াছেন।

যদি তাই, তবে জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তিনি এমন কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি, যাহাতে লেখক যে অর্থে এই কথা ব্যবহার করিয়াছিল, সেই অর্থটি তাঁহার হৃদয়ঙ্গম হয়? যদি তাহা না করিয়া থাকেন, তবে গালিই তাঁহার উদ্দেশ্য—সত্য তাঁহার উদ্দেশ্য নহে। তিনি বলিবেন, 'এমন কোন চেষ্টার প্রয়োজনই হয় নাই। লেখকের যে ভাব, লেখক নিজেই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন—বলিয়াছেন, যেখানে লোকহিতার্থে মিথ্যা নিতান্ত প্রয়োজনীয়।' ঠিক কথা, কিন্তু এই কথা বলিয়াই আমি শেষ করি নাই।

মহাভারতীয় একটি কৃষ্ণোক্তির উপর বরাত দিয়াছি। এই কৃষ্ণোক্তিটি কি, রবীন্দ্রবাবু তাহা পড়িয়া দেখিয়াছেন কি? যদি না দেখিয়া থাকেন, তবে কি প্রকারে জানিলেন যে, আমার, কথার ভাবার্থ তিনি বুঝিয়াছেন?

প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রবাবু বলিতে পারেন, 'অষ্টাদশপর্ব মহাভারত সমুদ্রবিশেষ, আমি কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি খুঁজিয়া পাইব? তুমি ত কোন নিদর্শন লিখিয়া দাও নাই।' কাজটা রবীন্দ্রবাবুর পক্ষে বড় কঠিন ছিল না। ১৫ই শ্রাবণ আমার ঐ প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তারপর, অনেকবার রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছে। প্রতিবার অনেকক্ষণ ধরিয়া কথাবার্তা হইয়াছে। কথাবার্তা প্রায় সাহিত্য বিষয়েই হইয়াছে। এতদিন কথাটা জিজ্ঞাসা করিলে আমি দেখাইয়া দিতে পারিতাম, কোথায় সে কৃষ্ণোক্তি। রবীন্দ্রবাবুর অনুসন্ধানের ইচ্ছা থাকিলে, অবশ্য জিজ্ঞাসা করিতেন।

ঐ কৃষ্ণোক্তির মর্ম পাঠককে এখন সংক্ষেপে বুঝাই। কর্ণের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া যুধিষ্ঠির শিবিরে পলায়ন করিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া কৃষ্ণার্জুন সেখানে উপস্থিত হইলেন। যুধিষ্ঠির কর্ণের পরাক্রমে কাতর ছিলেন, ভাবিতেছিলেন, অর্জুন এতক্ষণ কর্ণকে বধ করিয়া আসিতেছে। অর্জুন আসিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন কর্ণ বধ হইয়াছে কিনা। অর্জুন বলিলেন, না হয় নাই। তখন যুধিষ্ঠির রাগান্ধ হইয়া, অর্জুনের অনেক নিন্দা করিলেন, এবং অর্জুনের গাণ্ডীবের অনেক নিন্দা করিলেন। অর্জুনের একটি প্রতিজ্ঞা ছিল—যে গাণ্ডীবের নিন্দা করিবে, তাহাকে তিনি বধ করিবেন। কাজেই এক্ষণে "সত্য" রক্ষার জন্য তিনি যুধিষ্ঠিরকে বধ করিতে বাধ্য—নহিলে "সত্য" চ্যুত হয়েন। তিনি জ্যেষ্ঠ সহোদরের বধে উদ্যত হইলেন—মনে করিলেন, তারপর প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ, আত্মহত্যা করিবেন। এই সকল জানিয়া, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বুঝাইলেন যে, এরূপ সত্য রক্ষণীয় নহে। এ সত্য—লঙ্ঘনই ধর্ম। এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য হয়।

এটা যে উপন্যাস মাত্র, তাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের শিক্ষিত

লেখকদিগকে বুঝাইতে হইবে না। রবীন্দ্রবাবুর বক্তৃতার ভাবে বুঝায় যে, যেখানে কৃষ্ণনাম আছে, সেখানে আর আমি মনে করি না যে, এখানে উপন্যাস আছে—সকলই প্রতিবাদের অতীত সত্য বলিয়া ধ্রুব জ্ঞান করি। আমি যে এমন মনে করিতে পারি যে, এ কথাগুলি সত্য সত্য কৃষ্ণ স্বয়ং যুধিষ্ঠিরের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া বলেন নাই, ইহা কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের কবিকৃত উপন্যাসযুক্ত ব্যাখ্যা মাত্র, ইহা বোধ হয়, তাঁহারা বুঝিবেন না। তাহাতে এখন ক্ষতি নাই। আমার এখন এই জিজ্ঞাস্য যে, তিনি আমার কথার অর্থ বুঝিতে কি গোলযোগ করিয়াছেন, তাহা এখন বুঝিয়াছেন কি? না হয় একটু বুঝাই।

রবীন্দ্রবাবু "সত্য" এবং "মিথ্যা" এই দুইটি শব্দ ইংরেজি অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। সেই অর্থেই আমার ব্যবহৃত 'সত্য' 'মিথ্যা' বুঝিয়াছেন। তাঁহার কাছে সত্য, *Truth* মিথ্যা, *Falsehood*। আমি সত্য মিথ্যা শব্দ ব্যবহার কালে ইংরেজির অনুবাদ করি নাই। এই অনুবাদপরায়ণতাই আমার বিবেচনায়, আমাদের মৌলিকতায়, স্বাধীন চিন্তা ও উন্নতির এক বিঘ্ন হইয়া উঠিয়াছে।[১৫] "সত্য" "মিথ্যা" প্রাচীনকাল হইতে যে অর্থে ভারতবর্ষে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে আমি সেই অর্থে ব্যবহার করিয়াছি। সে দেশী অর্থে, সত্য **Truth** আর তাহা ছাড়া আরও কিছু। প্রতিজ্ঞা-রক্ষা, আপনার কথা রক্ষা, ইহাও সত্য। এইরূপ একটি প্রাচীন ইংরেজি কথা আছে—'*Troth*'। ইহাই *Truth* শব্দের প্রাচীন রূপ। এখন, *Truth* শব্দ *Troth* হইতে ভিন্নার্থ হইয়া পড়িয়াছে। ঐ শব্দটি এখনও আর বড় ব্যবহৃত হয় না। *Honour, Faith* এই সকল শব্দ তাহার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। এ সামগ্রী চোর ও অন্যান্য দুষ্ক্রিয়াকারীদিগের মধ্যেও আছে। তাহারা ইহার সাহায্যে পৃথিবীর পাপ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যাহা *Truth*—রবীন্দ্রবাবুর **Truth**, তাহার দ্বারা পাপের সাহায্য হইতে পারে না।

১৫। ইংরেজি শব্দের—তথা পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের 'অনুবাদ' সম্বন্ধে তাঁর এই সতর্কতার দিকটি বিশেষ বিবেচ্য। ২০৪ পৃষ্ঠায় 'কল্পনা' শব্দ নিয়ে বঙ্কিম-রবীন্দ্র বিতর্কের যে আভাস পাওয়া যাচ্ছে, সেই সূত্রে এই গ্রন্থের ২৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

এক্ষণে রবীন্দ্রবাবুর সম্প্রদায়কে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহাদের মতে আপনার পাপপ্রতিজ্ঞা [সত্য] রক্ষার্থ নিরপরাধী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে বধ করাই কি অর্জুনের উচিত ছিল ? যদি কেহ প্রাতে উঠিয়া সত্য করে যে, আজ দিবাবসানের মধ্যে পৃথিবীতে যত প্রকার পাপ আছে—হত্যা, দস্যুতা, পরদার, পরপীড়ন,—সকলই সম্পন্ন করিব—তাঁহাদের মতে কি ইহার সেই সত্য পালনই উচিত ? যদি তাঁহাদের সে মত হয়; তবে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, তাঁহাদের সত্যবাদ তাঁহাদেরই থাক, এদেশে যেন প্রচারিত না হয়। আর তাঁহাদের মত যদি সেরূপ না হয়, তবে অবশ্য তাঁহারা স্বীকার করিবেন যে, এখানে সত্যচ্যুতিই ধর্ম। এখানে মিথ্যাই সত্য।

এ অর্থে "সত্য" "মিথ্যা" শব্দ ব্যবহার করা আমার উচিত হইয়াছে কি না, ভরসা করি, এ বিচার উঠিবে না। সংস্কৃত শব্দের চিরপ্রচলিত অর্থ পরিত্যাগ করিয়া, ইংরেজি কথার অর্থ তাহাতে লাগাইতে হইবে, ইহা আমি স্বীকার করি না। হিন্দুর বর্ণনার স্থানে যে খ্রীষ্টীয়ানের বর্ণনা করিতে হইবে, তাহাও স্বীকার করি না।'

'সত্য' কথাটির মর্মার্থ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের এ লেখায় এই নির্দেশই ছড়িয়ে আছে। অতঃপর তিনি যা ব'লেছেন, তাতে পুনরায় ব্যক্তিগত মনান্তরের কথাই প্রধান হয়ে উঠেছে। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র অনুসন্ধান-পরিণতির সমকালীন তাঁর ব্যক্তিগত ভাব-ভাবনা হিসেবেই পরের কথাগুলি স্মরণীয়। তাছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের তখনকার সম্পর্কের ওপর এসব উক্তি আলোকপাত করে ব'লেও পরের কথাগুলি তুলে দেওয়া হোলো :

'রবীন্দ্রবাবু, "সত্য" শব্দের ব্যাখ্যায় যেমন গোলযোগ করিয়াছেন, লোকহিত লইয়াও তেমনি—বরং আরও বেশি গোলযোগ করিয়াছেন। কিন্তু আর কচকচি বাড়াইতে আমার ইচ্ছা নাই। এখন আর আমার সময়ও নাই। প্রচারে আর স্থানও নাই। বোধ হয় পাঠকের আর ধৈর্যও থাকিবে না। সুতরাং ক্ষান্ত হইলাম।

এখন রবীন্দ্রবাবু বলিতে পারেন যে, "যদি বুঝিতে পারিতেছ যে, তোমার ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝিতে না পারিয়া, আমি ভ্রমে পতিত হইয়াছি—তবে আমার ভ্রম সংশোধন করিয়াই তোমার ক্ষান্ত হওয়া উচিত ছিল—আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়াইতেছ কেন"? এই

কথার উত্তরে, যে কথা সাধারণ পাঠ্য প্রবন্ধে বলা রুচিবিগর্হিত, যাহা personal, তাহা বলিতে বাধ্য হইলাম। আমার সৌভাগ্যক্রমে, আমি রবীন্দ্রবাবুর নিকট বিলক্ষণ পরিচিত। শ্লাঘাস্বরূপ মনে করি,—এবং ভরসা করি, ভবিষ্যতেও মনে করিতে পারিব যে, আমি তাঁহার সুহৃজ্জন মধ্যে গণ্য হই। চারি মাস হইল প্রচারের সেই প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। এই চারি মাস মধ্যে রবীন্দ্রবাবু অনুগ্রহপূর্বক অনেকবার আমাকে দর্শন দিয়াছেন। সাহিত্য বিষয়ে অনেক আলাপ করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গ কখনও উত্থাপিত করেন নাই। অথচ বোধ হয়, যদি ঐ প্রবন্ধ পড়িয়া রবীন্দ্রবাবুর এমন বিশ্বাসই হইয়াছিল যে, দেশের অবনতি, এবং ধর্মের উচ্ছেদ, এই দুইটি আমি জীবনের উদ্দেশ্য করিয়াছি, তবে যিনি ধর্ম প্রচারে নিযুক্ত, আদি ব্রাহ্ম সমাজের সম্পাদক, এবং স্বয়ং সত্যানুরাগ প্রচারে যত্নশীল, তিনি এমন ঘোর পাপিষ্ঠের উদ্ধারের জন্য যে সে প্রসঙ্গ ঘুণাক্ষরেও উত্থাপিত করিবেন না, তার পর চারি মাস বাদে সহসা পরোক্ষে বাগ্মিতার উৎস খুলিয়া দিবেন, ইহা আমার অসম্ভব বোধ হয়। তাই মনে করি, এ উৎস তিনি নিজে খুলেন নাই, আর কেহ খুলিয়া দিয়াছে। এক্ষণে আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাজ, গোড়ায় যাহা বলিয়াছি, পাঠক তাহা স্মরণ করুন। আদি ব্রাহ্ম সমাজকে জড়াইতে, আমার কোন দোষ আছে কি না, বিচার করুন।'

১২৯১এর পৌষের 'ভারতী'তে এই প্রবন্ধের উত্তরে রবীন্দ্রনাথ 'কৈফিয়ৎ' প্রবন্ধে লেখেন 'আমি বঙ্কিমবাবুর সহিত মুখোমুখি উত্তর প্রত্যুত্তর করিবার যোগ্য নহি, তিনিই আমার স্পর্ধা বাড়াইয়াছেন। তবে বঙ্কিমবাবুর হস্ত হইতে বজ্রাঘাত পাইবার সুখ ও গর্ব অনুভব করিবার জন্যই আমি লিখি নাই, বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া আমার জ্ঞান হইয়াছিল তাই আমার কর্তব্য সাধন করিয়াছি। নহিলে সাধ করিয়া বঙ্কিমবাবুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে আমার প্রবৃত্তি হয় না, ভরসাও হয় না।'

এই সূত্রে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের আর একটি মন্তব্য স্মরণীয়: 'আদিব্রাহ্ম-সমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের এই আগ্রহ দেখিয়া মহর্ষি বোধ হয় মনে মনে খুশি হইলেন; মৃতকল্প আদিসমাজের মধ্যে পুনরায় প্রাণ সঞ্চার

করা যায় ভাবিয়া তিনি দ্বিজেন্দ্রনাথকে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র সম্পাদক ও রবীন্দ্রনাথকে আদি ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক পদে নির্বাচিত করাইলেন [১২৯১ আশ্বিন]।'

যাই হোক্, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধের পরবর্তী অংশে বলা হয়:

'তাই, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের কাছে আমার একটা নিবেদন আছে। আদিব্রাহ্ম সমাজকে আমি বিশেষ ভক্তি করি। আদি ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা এ দেশে ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ উন্নতি সিদ্ধ হইয়াছে ও হইতেছে জানি। বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাবু রাজনারায়ণ বসু, বাবু দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে সমাজের নেতা, সে সমাজের কাছে অনেক শিক্ষা লাভ করিব, এমন আশা রাখি। কিন্তু বিবাদ বিসম্বাদে সে শিক্ষা লাভ করিতে পারিব না। বিশেষ আমার বিশ্বাস, আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকদিগের দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের অতিশয় উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। সেই বাঙ্গালা সাহিত্যের কার্যে আমরা জীবন সমর্পণ করিয়াছি। আমি ক্ষুদ্র, আমার দ্বারা এমন কিছু কাজ হয় নাই, বা হইতে পারে না, যাহা আদি ব্রাহ্ম সমাজের লেখকেরা গণনার মধ্যে আনেন। কিন্তু কাহারও আন্তরিক যত্ন নিষ্ফল হয় না। ফল যতই অল্প হউক, বিবাদ বিসম্বাদে কমিবে বই বাড়িবে না। পরস্পরের আনুকূল্যে ক্ষুদ্রের দ্বারাও বড় কাজ হইতে পারে। তাই বলিতেছি, বিবাদ বিসম্বাদে, স্বনামে বা বিনামে, স্বতঃ বা পরতঃ, প্রকাশ্যে বা পরোক্ষে, বিবাদ বিসম্বাদে তাঁহারা মন না দেন। আমি এই পর্যন্ত ক্ষান্ত হইলাম, আর কখন এরূপ প্রতিবাদ করিব এমন ইচ্ছা নাই। তাঁহাদের যাহা কর্তব্য বোধ হয়, অবশ্য করিবেন।'

কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর অভিমানের ব্যাকুলতা এসব কথাতেও ক্ষান্ত হয়নি। তিনি আরো লিখেছিলেন:

'উপসংহারে, রবীন্দ্রবাবুকেও একটা কথা বলিবার আছে। সত্যের প্রতি কাহারও অভক্তি নাই, কিন্তু সত্যের ভানের উপর আমার বড় ঘৃণা আছে। যাহারা নেড়া বৈরাগীর হরিনামের মত মুখে সত্য সত্য বলে, কিন্তু হৃদয় অসত্যে পরিপূর্ণ, তাহাদের সত্যানুরাগকেই সত্যের ভান বলিতেছি। এ জিনিষ, এ দেশে

বড় ছিল না,—এখন বিলাত হইতে ইংরেজির সঙ্গে দ্বন্দ্ব বড় বেশি পরিমাণে আমদানি হইয়াছে। সামগ্রীটা বড় কদর্য। মৌখিক 'Lie direct' সম্বন্ধে তাঁহাদের যত আপত্তি—কার্যতঃ সমুদ্রপ্রমাণ মহাপাপেও আপত্তি নাই। সে কালের হিন্দুর এই দোষ ছিল বটে যে, 'Lie direct' সম্বন্ধে তত আপত্তি ছিল না, কিন্তু ততটা কপটতা ছিল না। দুইটিই মহাপাপ। এই ইংরেজি শিক্ষায় হিন্দু পাপটা হইতে অনেক অংশে উদ্ধার পাওয়া যাইতেছে, কিন্তু ইংরেজি পাপটা বড় বাড়িয়া উঠিতেছে। মৌখিক অসত্যের আপেক্ষা আন্তরিক অসত্য যে গুরুতর পাপ, রবীন্দ্রবাবু বোধ হয় তাহা স্বীকার করিবেন। সত্যের মাহাত্ম্য কীর্তন করিতে গিয়া কেবল মৌখিক সত্যের প্রচার, আন্তরিক সত্যের প্রতি অপেক্ষাকৃত অমনোযোগ, রবীন্দ্রবাবুর যত্নে এমনটা না ঘটে, এইটুকু সাবধান করিয়া দিতেছি। ঘটিয়াছে, এমন কথা বলিতেছি না, কিন্তু পথ বড় পিচ্ছিল, এজন্য এটুকু বলিলাম, মার্জনা করিবেন। তাঁহার কাছে অনেক ভরসা করি, এই জন্য বলিলাম। তিনি এত অল্প বয়সেও বাঙ্গালার উজ্জ্বল রত্ন—আশীর্বাদ করি, দীর্ঘজীবী হইয়া আপনার প্রতিভার উপযুক্ত পরিমাণে দেশের উন্নতি সাধন করুন।'

তাহলে এই লেখাটি থেকে দেখা গেল যে, 'নবজীবন'-এর অন্যতম লেখক চন্দ্রনাথ বসু 'সঞ্জীবনী'তে প্রকাশিত বঙ্কিম-বিরোধী একখানি চিঠির কিছু সমালোচনা করায় 'সঞ্জীবনী'তে রবীন্দ্রনাথের 'বেনামি' এক চিঠি বেরোয়; তাতে চন্দ্রনাথের সমালোচনা ছিল। ধর্ম-সম্পর্কে তাঁর মতামতের জন্যে বঙ্কিমচন্দ্র সে সময়ে, তাঁর নিজের হিসেব মতন, আদি ব্রাহ্মসমাজের লেখকদের দ্বারা পর পর চারবার আক্রান্ত হন। প্রথম আক্রমণ করেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর লেখাটির নাম ছিল 'নব্য হিন্দু সম্প্রদায়'। দ্বিতীয় আক্রমণ, বঙ্কিমচন্দ্রের মতে,—সম্ভবতঃ আদি ব্রাহ্মসমাজের তখনকার সভাপতি রাজনারায়ণ বসুর লেখাতে। সে লেখাটিও তত্ত্ব-বোধিনীতে প্রকাশিত হয়। তৃতীয় আক্রমণ ঘটে, 'প্রচার'-এর প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত বঙ্কিমচন্দ্রের 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধের সূত্র ধরে। ঠাকুরবাড়ির কর্মচারী এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের সহকারী সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র

সিংহ 'নব্যভারত' পত্রিকায় তাঁকে তিরস্কার করেন। চতুর্থ আক্রমণ 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের পূর্বোক্ত রচনা।

হিন্দুধর্মের স্বরূপ-সন্ধান এবং কৃষ্ণচরিত্রের স্বরূপ-জিজ্ঞাসা তাঁর মনে যে অনেক দিন থেকেই দেখা দিয়েছিল,—তা যে ঠিক পিতৃবিয়োগের অব্যবহিত পরবর্তী চিন্তা নয়, সে-সত্য এর আগে অনেকগুলি নজির তুলে দেখা গেছে। এ জিজ্ঞাসা তাঁর প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে সূচিত হয়ে, শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। কৃষ্ণতত্ত্ব সম্বন্ধে, তথা হিন্দু-ধর্মমতের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে সে সময়ে দেশে যে ব্যাপক অনুসন্ধানের মনোযোগ দেখা দিয়েছিল, এসব বৃত্তান্ত সেই প্রসঙ্গেই কিঞ্চিৎ বিস্তৃতভাবে লক্ষ্য করা গেল। হিন্দুধর্মের আদর্শ সম্বন্ধে তিনি সুনিশ্চিত এক ধারণায় পৌঁছোবার চেষ্টা করছিলেন। তাঁর মৃত্যুর বছর দুয়েক আগে, হিন্দুর সমুদ্রযাত্রা শাস্ত্রসম্মত কি না, এই প্রশ্ন জানান কুমার বিনয়কৃষ্ণ দেব। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে জানান—'যাহা ধর্মানুমোদিত, কিন্তু ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য? অনেকে বলিবেন যে, যাহা ধর্মশাস্ত্র-সম্মত, তাহাই ধর্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রবিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম।' কিন্তু তিনি নিজে ছিলেন সে রকম চিন্তার বিরুদ্ধে। স্পষ্টভাবে তিনি বলে গেছেন—'একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি।' এই মত জানিয়ে, মহাভারতের কর্ণপর্বের ৬৯-এর অধ্যায় থেকে ৫৯ সংখ্যক শ্লোক তুলে তিনি দেখিয়ে দেন:

ধারণাদ্ধর্ম্মমিত্যাহুর্দ্ধর্ম্মো ধারয়তে প্রজাঃ
যৎ স্যাদ্ধারণ প্রযুক্তং স ধর্ম্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।

অর্থাৎ—'ধর্ম সকল লোককে ধারণ [রক্ষা] করেন, এই জন্য ধর্ম বলে। যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম নিশ্চিত জানিবে।'

স্মার্ত রঘুনন্দন প্রভৃতির হাতে পড়ে, সনাতন হিন্দুধর্ম বহুপরিমাণে সংকীর্ণ হয়ে গেছে। বিনয়কৃষ্ণের উদ্দেশ্যে লেখা তাঁর সেই চিঠিতে [১৮৯২, ২৭এ জুলাই] বলা হয়—'যেখানে এরূপ বিরোধ দেখিবে, সেখানে সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করাই উচিত। ধর্মে এবং হিন্দুধর্মে কোন বিরোধ আমি স্বীকার করিতে পারি না। ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যদি কোন বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্মের গৌরব কি? উহাকে সনাতন ধর্ম বলিব কেন?' কৃষ্ণচরিত্র অবলম্বন করেও তাঁর এই একই বিবেকের অভিব্যক্তি ঘটেছিল। বাঙালীর কৃষ্ণানুরাগের উল্লেখ করে 'কৃষ্ণচরিত্রে'র সূচনাতেই তিনি লিখেছিলেন—'ইঁহারা ভগবানকে কি রকম ভাবেন? ভাবেন ইনি বাল্যে

চোর—ননী মাখন চুরি করিয়া খাইতেন; কৈশোরে পারদারিক—অসংখ্য গোপনারীকে পাতিব্রত্যধর্ম হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছিলেন; পরিণত বয়সে বঞ্চক ও শঠ—বঞ্চনার দ্বারা দ্রোণাদির প্রাণ হরণ করিয়াছিলেন। ভগবচ্চরিত্র কি এইরূপ? যিনি কেবল শুদ্ধসত্ত্ব, যাঁহা হইতে সর্বপ্রকার শুদ্ধি, যাঁহার নামে অশুদ্ধি, অপুণ্য দূর হয়, মনুষ্যদেহ ধারণ করিয়া সমস্ত পাপাচরণ কি সেই ভগবচ্চরিত্র-সঙ্গত?' এই প্রশ্ন তুলে, আদিতেই তিনি অকুণ্ঠ উত্তর দিয়েছেন—'আমি নিজেও কৃষ্ণকে স্বয়ং ভগবান বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস করি; পাশ্চাত্য শিক্ষার পরিণাম আমার এই হইয়াছে যে, আমার সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের যথার্থ কিরূপ চরিত্র পুরাণেতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা জানিবার জন্য, আমার যতদূর সাধ্য, আমি পুরাণ ইতিহাসের আলোচনা করিয়াছি।' এই অনুসন্ধানের ফলে তিনি নিশ্চিত বিশ্বাসে পৌঁছেছিলেন যে, কৃষ্ণসম্পর্কিত শৈথিল্যের প্রচলিত বিবরণ অমূলক!

বঙ্কিমচন্দ্রের শতবার্ষিকী জন্ম-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত বিমলচন্দ্র সিংহের 'বঙ্কিম-প্রতিভা'তেই তাঁর 'Letters on Hinduism' প্রথম একালের পাঠকের চোখে পড়ে। ১৮৮৮তে 'ধর্মতত্ত্ব' প্রকাশিত হবার আগেই তাঁর নিশ্চয়বাদী [Positivist] বন্ধু যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষের সঙ্গে তাঁর হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত মতামতের বাদ-প্রতিবাদ দেখা দেয়। তারই চিহ্ন এই 'Letters on Hinduism'। প্রথম চারখানি চিঠির পরে, এই আলোচনাগুচ্ছের প্রথম এবং ষষ্ঠ রচনা পর পর দুটি অধ্যায়ে ভাগ করা। এই বিন্যাসভঙ্গি থেকে মনে হয় যে, বঙ্কিমচন্দ্র পরে কোনো সময়ে এগুলি বিস্তৃত অধ্যায়-বিভাগে সাজিয়ে প্রকাশ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা আর হয়ে ওঠেনি।

বাংলা-সরকারের ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের আদমসুমারি-বিবরণীতে হিন্দুত্বের কোনো নির্ভরযোগ্য, নিশ্চিত নিরিখ যে সরকারের জানা ছিল না,—বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই আলোচনার প্রথম পত্রে সে কথা জানিয়ে গেছেন। ঐ চিঠিতেই তিনি আরো জানিয়ে গেছেন যে, স্যার আলফ্রেড লায়াল তাঁর 'Asiatic Studies' বইয়ে ভারতবর্ষের হিন্দুধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে, খ্রীষ্টান অথবা ইসলাম একেশ্বরবাদে অদমিত এক ধর্ম-বিশৃঙ্খলার ['a religious chaos'] কথা বলে গেছেন। প্রথম আদম-সুমারির বিবরণী দিতে গিয়ে বেভারলি সাহেবকেও অনুরূপ ভাবে নাকাল হতে হয়েছিল বলে বঙ্কিমচন্দ্র মন্তব্য করেন। প্রথম পত্রেই তিনি জানান যে,

'হিন্দু' শব্দটি কখনো জাতিবাচক, কখনো ধর্মবাচক। জাতি-প্রসঙ্গে আর্য অনার্য দুইই এ শব্দের অন্তর্ভুক্ত; ধর্ম-অর্থে শাক্ত-বৈষ্ণব নানা সম্প্রদায়ই এ শব্দের বিষয়ীভূত। উনিশ শতকের শেষার্ধে ইউরোপের পণ্ডিতরা হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে আলোচনা-সূত্রে অনেক ভ্রান্ত অনুসন্ধানের পথে চলেছিলেন, এ পত্রে সে কথারও উল্লেখ ছিল। হিন্দুধর্মের সংস্কার যে দরকার, সমকালীন যুগোচিত সেই প্রয়োজনবোধের উল্লেখসূত্রে তিনি দয়ানন্দ সরস্বতীর প্রাচীন আচার-আনুগত্যের বিরোধিতা করেন।[১৬] 'কৃষ্ণচরিত্রে'র আলোচনা তাঁর এই ব্যাপক যুগ-সচেতনতার সঙ্গেই জড়িত।

কৃষ্ণচরিত্র সর্বসমেত সাতটি খণ্ডে প্রবাহিত। প্রথম খণ্ডে গ্রন্থের উদ্দেশ্য বর্ণনা ক'রে, কৃষ্ণচরিত্র অনুসন্ধানের উপায় নির্ধারণ সম্বন্ধে কয়েকটি ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা বিচারসূত্রে, সেখানকার প্রক্ষিপ্ত রচনা এবং মূল রচনার বিভেদের কথা উঠেছে। পৃথিবীতে মর মানবদেহে ঈশ্বর অবতীর্ণ হতে পারেন কিনা, তারই মীমাংসার জন্যে হিন্দুর প্রাচীন পুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদির উল্লেখ দেখা দিয়েছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই যদুবংশের কথা। তারপর কৃষ্ণের জন্ম, শৈশব, কৈশোর-লীলা ইত্যাদি সূত্র ধ'রে তিনি ব্রজগোপী প্রসঙ্গে এগিয়ে গেছেন। ভাগবতের রাসলীলার কথা উঠেছে। দশম পরিচ্ছেদে বিশেষ ভাবে রাধা-প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছে। এবং বৃন্দাবন-লীলার পরিসমাপ্তির প্রসঙ্গ ধ'রে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে, অর্থাৎ একাদশ পরিচ্ছেদে, তিনি লিখেছেন যে, কৃষ্ণ

১৬। 'I have certainly no serious hope of progress in India except in Hinduism,—in Hinduism reformed, regenerated and purified. To such reformation, it is by no means necessary that we should revert, like the late Dayananda Saraswati to old and archaic types. That which was suited to people who lived three thousand years ago, may not be suited to the present and future generations. Principles are immutable but the modes of their application vary according to time, to circumstances. The great principles of Hinduism are good for all ages and all mankind—for they are based on what Carlyle would call the 'Eternal verities,' but its non-essential adjuncts have become effete and even pernicious in an altered state of society. It will be one of the objects of these letters to show what these non-essential adjuncts are. I shall describe what true Hinduism is by showing what false and corrupt Hinduism pretends to be.'—পৃ ১২

সম্বন্ধে চৌরবাদ, পরদারবাদ, ইত্যাদি যেসব প্রবাদ আছে, সে-সবই অমূলক। বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত, হরিবংশ, গোপালতাপনী উপনিষদ ইত্যাদি নানা গ্রন্থ মন্থন ক'রে, এই খণ্ডের উপসংহারে তিনি জানিয়েছেন, 'ঐতিহাসিক তত্ত্ব যদি কিছু পাইয়া থাকি, তবে সেটুকু এই,—অত্যাচারকারী কংসের ভয়ে বসুদেব আপন পত্নী রোহিণী এবং পুত্রদ্বয় রাম ও কৃষ্ণকে নন্দালয়ে গোপনে রাখিয়াছিলেন। কৃষ্ণ শৈশব ও কৈশোর সেইখানে অতিবাহিত করেন। তিনি শৈশবের রূপলাবণ্যে এবং শিশু সুলভ গুণসকলে সর্বজনের প্রিয় হইয়াছিলেন। কৈশোরে তিনি অতিশয় বলশালী হইয়াছিলেন' ইত্যাদি।

তৃতীয় খণ্ডে কৃষ্ণ-জীবনের মথুরা-দ্বারকা পর্ব। প্রথমেই কংস-বধের কথা-সূত্রে এই ঐতিহাসিক তত্ত্ব দেখানো হয়েছে যে, কৃষ্ণ কংসকে বধ ক'রে কংসের পিতা উগ্রসেনকে যাদবরাজ্যের অধিপতি করেন। কংসবিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসে মথুরার সিংহাসন অধিকার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। কারণ, ধর্মত সে রাজ্য উগ্রসেনের। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—'ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবধিই ধর্মাত্মা।' তিনি আরো বলেছেন—'এই কংসবধে আমরা প্রথমে প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে তিনি আদর্শ মানুষ।' অতঃপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, কাশীতে সান্দীপনী ঋষির কাছে কৃষ্ণ বলরামের শিক্ষা-প্রাপ্তি এবং গুরুদক্ষিণা প্রদানান্তে চৌষট্টি দিনের মধ্যে কৃষ্ণের মথুরায় প্রত্যাগমনের উল্লেখ আছে। মহাভারতে কৃষ্ণের বেদজ্ঞতার উল্লেখও দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে। ছান্দোগ্য উপনিষদের উল্লেখ ক'রে, কৃষ্ণ যে আঙ্গিরসবংশীয় ঘোর ঋষির কাছে পাঠ নিয়েছিলেন, তাও বলা হয়েছে। তারপর তৃতীয় পরিচ্ছেদে জরাসন্ধের কথা। চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের বিবাহ, পঞ্চমে নরকাসুর বধ, ষষ্ঠে কৃষ্ণের দ্বারকা বাস, এবং সপ্তম অধ্যায়ে তাঁর একাধিক বিবাহের কথা আলোচনা ক'রে নিয়ে, তৃতীয় খণ্ড শেষ ক'রেছেন তিনি।

মহাভারতের কৃষ্ণকে যে প্রথম দ্রৌপদী-স্বয়ংবরে দেখা গেছে, চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে তার উল্লেখ দেখা যায়। এই অংশের মৌলিকতায় বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো সন্দেহ ছিল না।

অন্যান্য ক্ষত্রিয়দের মতন অন্যান্য যাদবদের সঙ্গে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরসভায়

নিমন্ত্রিত হয়ে কৃষ্ণও পাঞ্চালে আসেন। পাণ্ডবেরা এই সভায় বিনা নিমন্ত্রণেই উপস্থিত হন এবং ইতিপূর্বে দুর্যোধন তাঁদের প্রাণহানি ঘটাবার চেষ্টা করেছিলেন বলেই তাঁরা ছদ্মবেশে বনে বনে ঘুরছিলেন। কৃষ্ণ যে কেবলমাত্র অলৌকিক ক্ষমতাবলেই পাণ্ডবদের চিনতে পারেন তা নয়, বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন যে, অর্জুনের বীরত্ব এবং বলিষ্ঠতা দেখেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে চিনতে পারেন,—একথা তিনি বলদেবকে বলেছিলেন। পরে, যুধিষ্ঠির যখন তাঁকে জিগেস করেন যে কী কৌশলে তিনি তাঁদের চিনতে পারেন, তার উত্তরে কৃষ্ণ বলেছিলেন যে, ভস্মাচ্ছাদিত হলেও আগুনকে আগুন বলে চেনা যায়। এইসব নিদর্শন থেকে বঙ্কিমচন্দ্র দেখান যে, কোনো রকম অলৌকিক শক্তিতে নয়, মানুষের বুদ্ধিতেই কৃষ্ণ পাণ্ডবদের চিনতে পেরেছিলেন; তবে বিশেষত্ব এই যে, শ্রীকৃষ্ণের বুদ্ধি খুবই তীক্ষ্ণ ছিল। তারপর অর্জুন যখন লক্ষ্যভেদের জন্যে প্রস্তুত হয়ে এলেন, তখন ভিক্ষুক-ব্রাহ্মণের বেশধারী অর্জুনকে দেখে, রাজাদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। কৃষ্ণ যে কীভাবে সেই বিবাদ মিটিয়েছিলেন, আলোচ্য চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র সেকথাও একটু বিস্তৃতভাবে জানিয়ে গেছেন। ক্রোধান্ধ হয়েছিলেন বলেই রাজারা সাময়িকভাবে ধর্মের কথা ভুলে যান। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন—'সেকালের অনেক ক্ষত্রিয়রাজা ধর্মভীরু ছিলেন। রুচিপূর্বক কখনও অধর্মে প্রবৃত্ত হইতেন না। কিন্তু এ সময়ে রাগান্ধ হইয়া ধর্মের কথাটা ভুলিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু যিনি প্রকৃত ধর্মাত্মা, ধর্মবুদ্ধিই যাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য, তিনি এবিষয়ের ধর্ম কোন্ পক্ষে, তাহা ভুলেন নাই।' তাই কৃষ্ণ তাঁদের বলেন যে, পাণ্ডবরাই রাজকুমারী দ্রৌপদীকে ধর্মতঃ লাভ করেন। অতএব, আর যুদ্ধের প্রয়োজন ছিল না!

এই বিবরণ দিয়ে, ঐ প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে, সেই সভায় কৃষ্ণের এই প্রাধান্যের কারণ দেখিয়ে, বঙ্কিমচন্দ্র আরো জানিয়ে গেছেন—'সকল বৃত্তিগুলিই সম্পূর্ণরূপে অনুশীলিত করিয়াছিলেন, তাহারই ফল এই প্রাধান্য। সকল বৃত্তিগুলিই অনুশীলিত না হইলে কেহই তাদৃশ ফলদায়িনী হয় না। এইরূপ কৃষ্ণচরিত্রের দ্বারা ধর্মতত্ত্ব পরিস্ফুট হইতেছে।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে কৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির সংবাদ। অর্জুনের লক্ষ্যভেদের পরে রাজারা সকলেই নিজের নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। কিন্তু বলদেবকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণ ভিক্ষুক-বেশধারী পাণ্ডবদের কাছে গিয়ে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আলাপ করেন। এর আগে কিন্তু যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তাঁর আলাপ ছিল না! বঙ্কিম

দেখিয়েছেন যে, মহাভারতে কৃষ্ণ-পাণ্ডবের এইটিই প্রথম সাক্ষাৎ। যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে সদালাপ ক'রে পাণ্ডবদের বিবাহ-সমাপ্তি পর্যন্ত কৃষ্ণ পাঞ্চালে নিজের শিবিরে বাস করেন। বিবাহের পরে, যৌতুক হিসেবে তিনি নিঃস্ব পাণ্ডবদের অনেক উপহার-সামগ্রী দান করেন। তারপর আর তাঁদের সঙ্গে দেখা না করেই কৃষ্ণ স্বস্থানে ফিরে যান। পাণ্ডবরা ইন্দ্রপ্রস্থে নগর নির্মাণ ক'রে বাস ক'রতে থাকেন। এই ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের নিঃস্বার্থতা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে কয়েকটি কথা জানিয়ে গেছেন। ধর্মতত্ত্বে তিনি যে সর্বানুশীলনের আদর্শ দেখিয়ে গেছেন, শ্রীকৃষ্ণ নিজেই যে সেই আদর্শের দৃষ্টান্ত, তাঁর এ-মন্তব্যে সেই দিকটি পুনরায় বিশেষ ভাবে সমর্থিত হয়েছে এবং প্রসঙ্গত তথাকথিত পাশ্চাত্য সমালোচনায় কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যেসব কুকর্মানুরক্তির প্রচার দেখা যায়, তার বিরুদ্ধে তিনি তিরস্কার প্রকাশ করেন। তিনি বলেন: 'বিস্ময়ের বিষয় এই যে, যিনি এইরূপ নিঃস্বার্থ আচরণ করিতেন, যিনি দুরবস্থাগ্রস্তমাত্রেরই হিতানুসন্ধান করা নিজ জীবনের ব্রতস্বরূপ করিয়াছিলেন, পাশ্চাত্য মূর্খেরা এবং তাঁহাদের শিষ্যগণ সেই কৃষ্ণকে কুকর্মানুরত, দুরভিসন্ধিযুক্ত, ক্রূর এবং পাপাচারী বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ঐতিহাসিক তত্ত্বের বিশ্লেষণের শক্তি বা তাহাতে শ্রদ্ধা এবং যত্ন না থাকিলে, এইরূপ ঘটাই সম্ভব।' যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ যে রকম ব্যবহার করেছিলেন, তা কেবল অনেকদিনের বন্ধুর পক্ষেই স্বাভাবিক। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়—'যিনি অপরিচিত এবঞ্চ দরিদ্র ও হীনাবস্থাপন্ন কুটুম্বকে খুঁজিয়া লইয়া আপনার কার্য ক্ষতি করিয়া তাঁহার উপকার করেন, তাঁহার প্রীতি আদর্শ প্রীতি।' আবার, তিনি তাঁর এই কৃষ্ণচরিত্র সমালোচনার আদর্শ সম্বন্ধে জানান যে, হরিবংশ অথবা পুরাণগুলিতে বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়না,—তাই, মহাভারত আলোচনায় কৃষ্ণের ছোটো-বড়ো সবরকম কাজেরই সমালোচনায় প্রবৃত্ত হ'তে হ'য়েছিল তাঁকে। আমাদের দেশে এই উদার সমালোচনারীতির অভাব লক্ষ্য ক'রে তিনি ব'লে গেছেন—'আমাদের দুর্ভাগ্য এই যে, আমরা এ প্রণালীতে কখন কৃষ্ণকে বুঝিবার চেষ্টা করি নাই। তাহা না করিয়া কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে কেবল 'অশ্বত্থামা হত ইতি গজঃ' এই কথাটি শিখিয়া রাখিয়াছি। অর্থাৎ যাহা সত্য এবং ঐতিহাসিক, তাহার কোন অনুসন্ধান না করিয়া, যাহা মিথ্যা এবং কল্পিত, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া আছি।' দ্রোণবধ পর্বাধ্যায়ের আলোচনায়,—'কৃষ্ণচরিত্রে'র ষষ্ঠ খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে, সেই 'অশ্বত্থামা হত ইতি

গজ্রঃ' কথাটি যে মহাভারতে প্রক্ষিপ্ত অংশ মাত্র, সে-কথা প্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন তিনি।

এইখানে তাঁর দৃষ্টির বিশেষত্ব সম্বন্ধে একটি কথা বলা দরকার। এইসব প্রক্ষিপ্ত অংশের বহু পরিশ্রমসাধ্য নির্দেশনা, এবং সেগুলি পরিবর্জনের পরামর্শ দিতে দিতে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণচরিত্র' এগিয়েছে। প্রথম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে তিনি লিখে গেছেন :

'স্থূলকথা এই যে, যে গ্রন্থে অমৌলিক, অনৈসর্গিক, উপন্যাসভাগ যত বাড়িয়াছে, সেই গ্রন্থ তত আধুনিক। এই নিয়মানুসারে আলোচ্য গ্রন্থসকলের পৌবাপর্ব এইরূপ অবধারিত হয়।

প্রথম। মহাভারতের প্রথম স্তর।

দ্বিতীয়। বিষ্ণুপুরাণের পঞ্চম অংশ।

তৃতীয়। হরিবংশ।

চতুর্থ। শ্রীমদ্ভাগবত।

ইহা ভিন্ন আর কোন গ্রন্থের ব্যবহার বিধেয় নহে। মহাভারতের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর অমৌলিক বলিয়া অব্যবহার্য, কিন্তু তাহার অমৌলিকতা প্রমাণ করিবার জন্য, ঐ সকল অংশের কোথাও কোথাও সমালোচনা করিব। ব্রহ্মপুরাণ ব্যবহারের প্রয়োজন নাই, কেন না, বিষ্ণুপুরাণে যাহা আছে, ব্রহ্মপুরাণেও তাহা আছে। ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ পরিত্যাজ্য, কেন না মৌলিক ব্রহ্মবৈবর্ত লোপ পাইয়াছে। তথাপি শ্রীরাধার বৃত্তান্ত জন্য একবার ব্রহ্মবৈবর্ত ব্যবহার করিতে হইবে।[১৭] অন্যান্য পুরাণে কৃষ্ণকথা অতি সংক্ষিপ্ত, এজন্য সে সকলের ব্যবহার নিষ্ফল।'

পুরাণের ওপর তাঁর যে একেবারেই নির্ভর ছিল না, তা নয়। কৃষ্ণচরিত্রের ঐতিহাসিকতা স্থাপন ক'রতে উদ্যত হ'য়ে তিনি যে প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই ঐতিহাসিকতার প্রাথমিক আলোচনা ক'রে নিয়েছিলেন, আগেই তা বলা হয়েছে। সেখানে ইতিহাসের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে সংস্কৃত

১৭। দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে 'শ্রীরাধা' প্রসঙ্গে।

শ্লোকের ব্যাখ্যা [১৮] দিয়ে বলা হয়—'বস্তুত যাহাতে পুরাবৃত্ত, অর্থাৎ পূর্বে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার আবৃত্তি আছে, তাহা ভিন্ন আর কিছুকেই ইতিহাস বলা যাইতে পারে না।' সেই সূত্রেই আরো বলা হয়—'এখন, ভারতবর্ষের প্রাচীন গ্রন্থসকলের মধ্যে কেবল মহাভারতই অথবা কেবল মহাভারত ও রামায়ণ ইতিহাস নাম প্রাপ্ত হইয়াছে।' ইতিহাসের সঙ্গে—সব দেশেই—কিছু কিছু কল্পকথা মিশে যাওয়া খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। সে-কথার নজির দেখাতে গিয়ে তিনি জানান—'রোমক ইতিহাসবেত্তা লিবি প্রভৃতি, যবন ইতিহাসবেত্তা হেরোডোটাস্ প্রভৃতি,মুসলমান ইতিহাসবেত্তা ফেরেশতা প্রভৃতি এইরূপ ঐতিহাসিক বৃত্তান্তের সঙ্গে অনৈসর্গিক এবং অনৈতিহাসিক বৃত্তান্ত মিশাইয়াছেন। তাঁহাদিগের গ্রন্থসকল ইতিহাস বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে—মহাভারতই অনৈতিহাসিক বলিয়া একেবারে পরিত্যক্ত হইবে কেন?' Livy, Herodotus প্রভৃতি ঐতিহাসিকরা সেকালের কথা লিখে গেছেন। কিন্তু তাঁরা যেহেতু তখনকার সমসাময়িক কোনো ঐতিহাসিকের সাহায্য পাননি, সেই কারণেই তাঁদের দেওয়া বৃত্তান্তের ওপর আধুনিক কালের ঐতিহাসিকদের বিশেষ নির্ভর নেই। সে-কথা উল্লেখ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র যা মন্তব্য করেন, এখানে পর পর ইতিহাস এবং পুরাণের সত্য সম্বন্ধে তাঁর মতামতের সার কথা অনুভব করবার জন্যেই সেই কথাগুলি দেখা দরকার। তিনি লিখেছিলেন যে, ইতিহাসে দুটি কারণে অনৈসর্গিক বা মিথ্যা ঘটনা জায়গা পেয়ে থাকে—প্রথমত লেখকরা বিনা-বিচারে জনশ্রুতির ওপর নির্ভর ক'রে থাকেন ব'লে; দ্বিতীয়তঃ পরবর্তী লেখক পূর্বগামীর রচনায় নিজের রচনা প্রক্ষিপ্ত হ'তে দেন ব'লে। মহাভারতে কাল্পনিক বৃত্তান্ত অন্যান্য দেশের অন্যান্য দৃষ্টান্তের তুলনায় কিছু বেশি পরিমাণেই প্রবেশ করেছিল। এ তাঁর প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথা। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের মধ্যে ভারতীয় সভ্যতাকে অর্বাচীন প্রমাণ করবার অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে প্রসঙ্গতঃ তিনি বেশ তিরস্কার ক'রে লিখেছেন:

> 'বিখ্যাত Weber সাহেব পণ্ডিত বটে, কিন্তু আমার
> তিনি যেক্ষণে সংস্কৃত শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন,

১৮। 'ধর্মার্থকামমোক্ষাণামুপদেশ সমন্বিতম্,
পূর্ব্ববৃত্তকথাযুক্তমিতিহাসং প্রচক্ষতে॥'

> ভারতবর্ষের পক্ষে সে অতি অশুভলক্ষণ। ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব সেদিনকার জার্মণীর অরণ্যনিবাসী বর্বরদিগের বংশধরের পক্ষে অসহ্য।...তাঁহার বিবেচনায় যিশুখ্রীষ্টের জন্মের পূর্বে যে মহাভারত ছিল, এমন বিবেচনা করিবার মুখ্য প্রমাণ কিছু নাই। এতটুকু প্রাচীনতা স্বীকার করিবারও একমাত্র কারণ এই যে Chrysostom নামা একজন ইউরোপীয় ভারতবর্ষে আসিয়া দাঁড়ি-মাঝির মুখে মহাভারতের কথা শুনিয়া গিয়াছিলেন। পাণিনির সূত্রে মহাভারত শব্দও আছে, যুধিষ্ঠিরাদিরও নাম আছে। কিন্তু তাহাতে তাঁহার বিশ্বাস হয় না।'[১৯]

পঞ্চম পরিচ্ছেদে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের তারিখ অনুসন্ধানে তাঁর বিশেষ অভিনিবেশের কারণটি এই চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষদিকেই চোখ পড়ে। প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য, দুই অঞ্চলের পণ্ডিতদের দু'রকম ধারণার কথা আছে এখানে। ওয়েবরের মত সম্পূর্ণ উপেক্ষা না ক'রে, কোনো-কোনো পাশ্চাত্য পণ্ডিত বলেন যে, মহাভারত প্রাচীন বটে, কিন্তু তা খ্রীষ্টজন্মের আগে চতুর্থ বা পঞ্চম শতাব্দীর লেখা। আর,—'আদিম মহাভারতে পাণ্ডবদিগের কোন কথা ছিল না। পাণ্ডব ও কৃষ্ণ প্রভৃতি কবি-কল্পনা মাত্র।' অপর পক্ষে দেশীয় পণ্ডিতরা বলেছেন যে, কলিযুগ শুরু হবার ঠিক আগে ব্যাসদেব জীবিত ছিলেন এবং মহাভারত সেই আমলেরই রচনা। অর্থাৎ সে প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগেকার ঘটনা। পঞ্চম পরিচ্ছেদে এগিয়ে যাবার আগে, চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে তাই বঙ্কিমচন্দ্র বলে নিয়েছেন—'দুটি মতই ঘোরতর ভ্রম পরিপূর্ণ। দুই দলের মতেরই খণ্ডন আবশ্যক।'

বিষ্ণুপুরাণের নির্দেশ অনুসারে ১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। বেণ্টলি সাহেব তাঁর 'Historical View of the Hindu Astronomy' গ্রন্থে যুধিষ্ঠিরের সময় ধরেছেন ৫৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। মার্কিন পণ্ডিত Whitney

১৯। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Weber-এর ইংরেজি অনুবাদ 'History of Sanskrit Literature' থেকে এই সূত্রে লেখকের এই কথাগুলি তুলে দেওয়া হয়—'Since Megasthenes says nothing of this epic, it is not an improbable hypothesis that its origin is to be placed in the interval between his time and that of Chrysostom; for what ignorant sailors took note of would hardly have escaped his observation'.

ব'লেছেন, হিন্দু জ্যোতিষ-গণনা খুবই অশুদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র এসব উল্লেখ ক'রে, বিষ্ণুপুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ইত্যাদির নজির তুলে, প্রমাণ করবার চেষ্টা ক'রেছেন যে, মহাভারতের যুদ্ধের সময় ১৪৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। মৎস্য ও বায়ুপুরাণে যে প্রায় অনুরূপ সময়েরই নির্দেশ পাওয়া যায়, তিনি তাও দেখিয়েছেন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কোলব্রুক, উইল্‌সন, এলফিনস্টোন, উইলফোর্ড, প্রাট—এক নিঃশ্বাসে এই পাঁচজন ইউরোপীয় পণ্ডিতের নাম ক'রে বলা হ'য়েছে যে, 'মহাভারতের যুদ্ধকাল সম্বন্ধে ইউরোপীয়দিগের সঙ্গে আমাদিগের কোন মারাত্মক মতভেদ হইতেছে না।' লাসেন জার্মান পণ্ডিত। মহাভারতের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিকতা তিনি স্বীকার ক'রেছেন। তিনি কুরুপাঞ্চালের যুদ্ধটা মেনে নিলেও পাণ্ডবদের অস্তিত্ব কবি-কল্পনাপ্রসূত ব'লতে দ্বিধা করেন নি! ওয়েবর, সার মনিয়র উইলিয়াম্‌স,—এবং বঙ্কিমচন্দ্রের বন্ধু রমেশচন্দ্র দত্ত কুরু-পাঞ্চালের এই যুদ্ধ-প্রসঙ্গটুকুই ঐতিহাসিক ব'লে মেনেছিলেন। ওয়েবর সাহেবের ধারণা—'শতপথব্রাহ্মণে অর্জ্জুন শব্দ আছে, কিন্তু ইহা ইন্দ্রার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে—কোন পাণ্ডবকে বুঝায়, এমন অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।' ওয়েবরের সমালোচনা ক'রতে গিয়ে, অজস্র ধারায় 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' প্রভৃতির রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্রের সুপরিচিত তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবাণ বর্ষিত হয়েছে!

ললিতবিস্তরে পাণ্ডবদের নাম আছে। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতদের ধারণা তারা পার্বত্য দস্যু মাত্র! সে ধারণারও তীব্র সমালোচনা ক'রেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। Talboys Wheeler ব'লে গেছেন, পাণ্ডবদের সঙ্গে অসুর ও রাক্ষসের যুদ্ধ কল্পনার বস্তু! সেই সূত্রে ধ'রে বলা হয়েছে—'যখন হস্তী, অশ্ব তলগামী, তখন মেঘের জল পরিমাণেচ্ছার প্রতি বেশি শ্রদ্ধা করা যায় না।' এইরকম অসংখ্য মতামত আর বিচিত্র ব্যঙ্গ-বচনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে,—সপ্তম পরিচ্ছেদে, পাণ্ডবদের ঐতিহাসিকতা আলোচনা শুরু হয়েছে। তার পরের পরিচ্ছেদে কৃষ্ণের ঐতিহাসিকতা বিচারের আয়োজন। ইতিহাস সম্বন্ধে এই ধরনের অনুসন্ধান এবং ইতিহাসের সত্য সম্বন্ধে নানা তর্ক-বিতর্ক একদিকে,—অন্যদিকে 'পুরাণ' সম্বন্ধে দেশী-বিদেশী বিভিন্ন ভুলের প্রকৃতিভেদ ও বিদেশী পণ্ডিতদের হাতে ভারতীয় পুরাণের লাঞ্ছনা সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য দুই-ই তিনি দেখিয়ে গেছেন। প্রথম খণ্ডের চতুর্দশ-পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে পুরাণের আলোচনাই প্রধান। আদিতেই তিনি সংক্ষেপে জানিয়েছেন—'পুরাণ সম্বন্ধেও দুই রকম ভ্রম আছে, দেশী ও বিলাতী।

দেশী ভ্রম এই যে, সমস্ত পুরাণগুলিই এক ব্যক্তির রচনা।' বিলাতী ভ্রম এই যে, এক একখানি পুরাণ এক ব্যক্তির রচনা।' উইলসন সাহেব লিঙ্গপুরাণ, মার্কণ্ডেয় পুরাণকে অষ্টম থেকে দশম খ্রীষ্টীয় শতকে স্থাপন ক'রে অন্যান্য সবগুলিকেই হাজার বছরের মধ্যে ধরেছেন। পুনরায় তীব্র তিরস্কার করে বঙ্কিমচন্দ্র সে-চিন্তা সম্বন্ধে জানিয়েছেন :

> 'পাঠক দেখিবেন, ইঁহার মতে [এই মতই প্রচলিত] কোনও পুরাণই সহস্র বৎসরের অধিক প্রাচীন নয়। বোধ হয়, ইংরাজি পড়িয়া যাঁহার নিতান্ত বুদ্ধি-বিপর্যয় না ঘটিয়াছে, তিনি ভিন্ন এমন কোন হিন্দুই নাই, যিনি এই সময়নির্ধারণ উপযুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিবেন।'

তাঁর এই ভূরিপরিমাণ পরিশ্রমের দিকে লক্ষ্য রেখে 'কৃষ্ণচরিত্র' রচনার আসল প্রেরণা বোঝবার জন্যেই এখানে এসব কথার উল্লেখ করা গেল। তিনি যেসব মতামত জানিয়ে গেছেন,সেগুলির পুনর্বিচার এ-আলোচনার লক্ষ্য নয়। শেষ বয়সে, ভারতবর্ষের পুরাণ, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রের কী সুপ্রচুর তথ্যজ্ঞান এবং কী গভীর শ্রদ্ধা অবলম্বন ক'রে তিনি কৃষ্ণ-চরিত্র সন্ধানে আত্মনিয়োগ ক'রেছিলেন, সেইটুকু দেখে যাওয়াই বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠের এ অংশের লক্ষ্য।

ষষ্ঠ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদটি বঙ্কিমচন্দ্রের এ-আলোচনার সর্বাধিক স্মরণীয় অংশ। এই অধ্যায়ে 'কৃষ্ণকথিত ধর্মতত্ত্ব' জায়গা পেয়েছে। যখন কর্ণের সঙ্গে অর্জুনের যুদ্ধ চলছিল, সেই সময়ে যুদ্ধবিজয়ী অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধক্ষেত্রে না দেখতে পেয়ে, তাঁকেই খুঁজতে শিবিরে ফিরে যান। যুধিষ্ঠির শোনেন যে, কর্ণবধ তখনো অসমাপ্ত। তাতে অত্যন্ত উত্তেজিত হ'য়ে অর্জুনকে তিনি খুবই ভর্ৎসনা করেন। তিনি অর্জুনকে আদেশ দেন—'তুমি কৃষ্ণকে গাণ্ডীব শরাসন প্রদান কর।' উপাংশুব্রতধারী অর্জুন এতে উত্তেজিত হয়ে যুধিষ্ঠিরকে হত্যা করতে উদ্যত হন। কারণ, যিনি অন্যকে গাণ্ডীব দেবার আদেশ দেবেন, তাঁকে হত্যা করাই অর্জুনের অঙ্গীকার ছিল।[২০] অর্থাৎ অর্জুন

২০। ইতিপূর্বে বঙ্কিম-রবীন্দ্র বাদ-প্রতিবাদের আলোচনায় এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে। পৃঃ ২০৬ দ্রষ্টব্য।

এই 'সত্য'রক্ষাই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলে জানতেন। কৃষ্ণ তখন তাঁকে বুঝিয়ে দেন যে অহিংসাই পরম ধর্ম, 'সত্য'রক্ষার স্থান তার পরে! ধর্ম তা-ই,—যা প্রাণীকে ধারণ করে, রক্ষা করে। বঙ্কিমচন্দ্রের কথায়:

> 'এই হইল কৃষ্ণকৃত ধর্মের লক্ষণ নির্দেশ। কথাটায় এখনকার Herbert Spencer, Bentham, Mill ইতি সম্প্রদায়ের শিষ্যগণ কোনপ্রকার অমত করিবেন না জানি। কিন্তু অনেকে বলিবেন এ যে ঘোরতর হিতবাদ—বড় utilitarian রকমের ধর্ম। বড় utilitarian রকম বটে, কিন্তু আমি গ্রন্থান্তরে বুঝাইতেছি যে ধর্মতত্ত্ব হিতবাদ হইতে বিযুক্ত করা যায় না; জগদীশ্বরের সার্বভৌমিকত্ব এবং সর্বময়তা হইতেই ইহাকে অনুমিত করিতে হয়। সংকীর্ণ খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে হিতবাদের বিরোধ হইতে পারে, কিন্তু যে হিন্দুধর্মে বলে যে, ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন, হিতবাদ সে ধর্মের প্রকৃত অংশ। এই কৃষ্ণবাক্যই যথার্থ ধর্মলক্ষণ।'

এইভাবে কৃষ্ণচরিত্রের মধ্যে তাঁর প্রথম জীবনের পাশ্চাত্য দর্শনের অনুরাগ আর, শেষ জীবনের অন্যতর সন্ধান, দুই-ই এসে মিলেছিল! তিনি হিন্দু হিতবাদে পাশ্চাত্য হিতবাদ অন্বিত করেন। এই পরিচ্ছেদের উপসংহারে তিনি বলেন:

> ১। যাহা ধর্মানুমোদিত, তাহাই সত্য, যাহা ধর্মবিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।
>
> ২। যাহাতে লোকের হিত, তাহাই ধর্ম।
>
> ৩। অতএব যাহাতে লোকের হিত, তাহাই সত্য। যাহা তদ্বিরুদ্ধ, তাহা অসত্য।
>
> ৪। এইরূপ সত্য সর্বদা সর্বস্থানে প্রযোক্তব্য।

বেন্থামের কথা ইংলণ্ড শুনেছে, কৃষ্ণের কথা ভারতবর্ষ শুনবে না কেন?—এই ছিল 'কৃষ্ণচরিত্রে'র বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যতম প্রধান প্রশ্ন। এই পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক ছত্রে এই কথাই তিনি পুনর্বার জানিয়ে গেছেন।

এই ষষ্ঠ খণ্ডের ষষ্ঠ-পরিচ্ছেদের উপসংহারে তিনি আরো লিখে গেছেন—'যদ্দ্বারা লোকরক্ষা বা লোকহিত সাধিত হয়, তাহাই ধর্ম।' তাঁর মননে ধর্মচিন্তা আর সমাজচিন্তা,—একটি অন্যটির দ্বারা সমর্থিত। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ

সরাসরি পরিহার করবার কথা তিনি কখনোই বলেন নি। এদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বিদেশের ভাব-ভাবনা সমুচিতভাবে অন্বিত করবারই পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। মিল-বেন্থাম-কোম্‌তের সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত হয়েও বাংলার ভাবজীবনে উনিশ শতকের নবজাগরণকে তিনি এক বিশিষ্ট জাতীয় ঐতিহ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ক'রে গেছেন।

সত্য, সামঞ্জস্য, অহিংসা, লোকহিত, প্রীতি ইত্যাদি চিন্তা রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য রচনায় বার বার দেখা দিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের এবং তাঁর সমকালীন ও পূর্ববর্তী এইসব পর্যালোচনার ফলেই সেই ভাবের দরজা খুলে গিয়েছিল। সেই মুক্ত পথেই আমাদের পরবর্তী ভাবনা এগিয়েছে। 'কৃষ্ণচরিত্রে'র ষষ্ঠ খণ্ডের এই পরিচ্ছেদে তিনি কৃষ্ণোক্ত সত্যতত্ত্বের কথা তুলে এই আলোচনা ক'রে গেছেন; আর তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ব্যাখ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের কথা-প্রসঙ্গে তিনি 'স্বধর্ম' শব্দটির অভিপ্রেত অর্থ কী, তারই ব্যাখ্যা ক'রে গেছেন। তিনি দেখিয়েছেন, জ্ঞান ও কর্মই মানুষের স্বধর্ম— 'জ্ঞানের চরমোদ্দেশ্য ব্রহ্ম; সমস্ত জগৎ ব্রহ্মে আছে। এ জন্য জ্ঞানার্জন যাঁহাদিগের স্বধর্ম, তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলা যায়।'

কর্মের শ্রেণী বিশ্লেষণ-সূত্রে কৃষির দৃষ্টান্ত দিয়ে, তিনি উৎপাদন-মূলক বৃত্তির কথা বলেছেন; আবার তাঁর মতে, শিল্প, বাণিজ্য হোলো 'সংযোজন' বা 'সংগ্রহ' শ্রেণীর কর্মের উদাহরণ; যুদ্ধধর্মে নিয়োগ হোলো 'রক্ষা' কর্মের অন্তর্ভুক্ত। অতঃপর একালের সমাজের দিকে লক্ষ্য রেখে কর্মের এই পাঁচটি শ্রেণী নির্দেশিত হয়েছে—১] জ্ঞানার্জন বা লোকশিক্ষা, ২] যুদ্ধ বা সমাজরক্ষা, ৩] শিল্প বা বাণিজ্য, ৪] উৎপাদন বা কৃষি—এবং ৫] পরিচর্যা।

এই কর্মভেদ অনুসারে সকল সমাজেই পাঁচটি জাতির অস্তিত্ব লক্ষ্য ক'রে তিনি 'স্বধর্মে'র এই ব্যাখ্যা দিয়েছেন:

> 'এই…কর্মের মধ্যে যিনি যাহা গ্রহণ করেন, উপজীবিকার জন্যই হউক, আর যে কারণেই হউক, যাহার ভার আপনার উপর গ্রহণ করেন, তাহাই তাঁহার অনুষ্ঠেয় কর্ম, তাঁহার Duty। তাহাই তাঁহার স্বধর্ম। ইহাই আমার বুদ্ধিতে গীতোক্ত স্বধর্মের উদার ব্যাখ্যা। যাঁহারা ইহার কেবল প্রাচীন হিন্দুসমাজের উপযোগী অর্থ নির্দেশ করেন, তাঁহারা ভগবদ্ভক্তিকে অতি সংকীর্ণার্থক বিবেচনা করেন। ভগবান কখনই সংকীর্ণবুদ্ধি নহেন।'

'স্বধর্ম' যে কেবল হিন্দুর বর্ণাশ্রমধর্ম নয়, সেই কথাটা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত করাই ছিল তাঁর এই উদার ব্যাখ্যার আসল অভিপ্রায়। অতঃপর সেই সূত্রে আত্মার অবিনাশিতার প্রসঙ্গে এগিয়ে, একালে বিজ্ঞান যে এই সত্য উপলব্ধির প্রতিবাদী, তাও দেখিয়ে দিয়ে, বিজ্ঞানের সত্যানুসন্ধিৎসার সীমা দেখিয়েছেন তিনি। প্রত্যক্ষ, অনুমান, উপমান [analogy] ইত্যাদি প্রমাণের উপায়গুলি উল্লেখ ক'রে, জার্মান দার্শনিক কাণ্টের Transcendental Philosophy-র প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন :

> 'কাণ্ট এবং তাঁহার পরবর্তী কতকগুলি লব্ধপ্রতিষ্ঠ দার্শনিকদের মত এই যে, প্রত্যক্ষ এবং প্রত্যক্ষমূলক অনুমান ভিন্ন জ্ঞানের অন্য কারণ আছে। তাঁহারা বলেন কতকগুলি তত্ত্ব মনুষ্যচিত্তে স্বতঃসিদ্ধ। তাঁহারা কেবল 'বলেন' ইহাই নয়, কাণ্ট এই তত্ত্বের যে প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, তাহা মনুষ্যবুদ্ধির আশ্চর্য পরিচয়স্থল।'

এবং সেখানেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের বিশ্বাসের দিকটি উদ্ঘাটিত করেছেন, —'আমার নিজের বিশ্বাস এই যে, চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জিত হইলে আত্মসম্বন্ধীয় এই জ্ঞান স্বতঃসিদ্ধ হয়।' পাদটীকায় তিনি আরো লিখেছেন —'অনেকে বলিবেন, তবে কি Huxley, Tyndall প্রভৃতির মত লোকের চিত্তবৃত্তি সকল সমুচিত মার্জিত হয় নাই? উত্তর—না, সকলগুলি হয় নাই।'

কথায় কথায় তাঁর পর্যালোচনার বিস্তার বেড়ে গেছে। কৃষ্ণচরিত্র, ধর্মতত্ত্ব, গীতার ব্যাখ্যা, দেবতত্ত্ব ও হিন্দুধর্ম ইত্যাদি আলোচনায় তিনি প্রাচ্য-পাশ্চাত্য অসংখ্য সাধক ও জ্ঞানীর নাম ক'রে গেছেন; তাঁদের উক্তির সত্য-অসত্যের নানাবিধ উল্লেখও দেখা দিয়েছে। সে-সব কথার ধারাবাহিক পুনরুল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন। তাঁর অধ্যয়নের বিস্তার এবং তাঁর অভিনিবেশের একাগ্রতা লক্ষ্য ক'রে তাঁর অভিপ্রেত অর্থ অনুভব করাই বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠকের আসল কাজ।

'কৃষ্ণচরিত্রে'র ষষ্ঠ খণ্ডের আলোচনা থেকে গীতার ব্যাখ্যার কথা উঠলো। পঞ্চম ও চতুর্থ খণ্ডের আরো দু'একটি কথা স্মরণীয়। কৃষ্ণের ঐশী শক্তির ওপর জোর দেননি বঙ্কিমচন্দ্র। উনিশ শতকের বাঙালী জীবনের ভাবাদর্শে যে

নতুন উৎসাহ দেখা দিয়েছিল, সেই ঐতিহাসিক ভূমিকা বাদ দিয়ে, তাঁর এই ধর্মতত্ত্ব আলোচনার বিশেষত্ব অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাঁর 'বাঙ্গালার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা' ছাপা হয় ১২৮৭ সালের অগ্রহায়ণের 'বঙ্গদর্শনে', এবং 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' ১২৯১-এর শ্রাবণে। 'বাঙ্গালার কলঙ্ক' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন—'যাহা ভারতের কলঙ্ক, বাঙ্গালারও সেই কলঙ্ক'। কৃষ্ণকে তিনি বাঙালী বলেননি। ভারতের, তথা বাংলার কলঙ্ক অপনোদনের আগ্রহ বশেই এসব প্রবন্ধ লেখা হয়। 'কৃষ্ণচরিত্রে' হিন্দু-ভারতবর্ষের স্বধর্মনিষ্ঠার আদর্শ উজ্জ্বল হ'য়ে উঠছে। এ জাতির তেজ, বীর্য, শান্ত উৎসাহের ভাবই এই চরিত্রে ব্যক্ত হ'য়েছে।

'কৃষ্ণচরিত্রে'র ষষ্ঠ খণ্ডের একাদশ পরিচ্ছেদে ভীষ্মের স্বর্গারোহণের পরে যুধিষ্ঠিরের ব্যাকুল কান্নার মূলে তিনি দেখেছেন অহঙ্কারের তাড়না! কৃষ্ণ তখন তাঁকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন—'আপনার এখনও শত্রু অবশিষ্ট আছে। আপনার শরীরের অভ্যন্তরে যে অহঙ্কার-রূপ দুর্জ্জয় শত্রু রহিয়াছে, তাহা কি আপনি নিরীক্ষণ করিতেছেন না?' তারপর নিষ্কাম ধর্ম সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেওয়া হয়। তারই নাম 'কামগীতা'।

বঙ্কিম বলে গেছেন যে, ধর্মরাজ্য সংস্থাপনের পরেই মহাভারতের আসল কৃষ্ণের অন্তর্ধান ঘটা উচিত ছিল; কিন্তু 'রচনাকণ্ডুতিপীড়িতে'রা তত সহজে কৃষ্ণকে ছাড়তে রাজী নন! তাই অর্জুনকে কৃষ্ণের নামে প্রচারিত 'অনুগীতা' শুনতে হয়েছিল! বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের ধারণা—অনুগীতা এবং অনুগীতারই এক অংশ ব্রাহ্মণগীতা, —দুইই প্রক্ষিপ্ত!

কৃষ্ণচরিত্রে 'সত্যে'র চেয়ে 'অহিংসা'কে উচ্চতর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে, এ-কথায় নানা পাঠকের মনে নানা সমালোচনা দেখা দিতে পারে। 'স্বধর্মে'র অভিপ্রেত অর্থ অনুধাবন করা সে-দিক থেকেও বিশেষ দরকার। পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেও বঙ্কিমচন্দ্র আগেই 'ধর্ম' কথাটির মানে নিয়ে কয়েকটি কথা ব'লে নিয়েছেন। ধর্মরাজ্যসংস্থাপন ও ধর্মপ্রচারই শ্রীকৃষ্ণের জীবনের প্রধান কাজ। মহাভারতের ভীষ্মপর্বের অন্তর্গত গীতা-পর্বাধ্যায়ে সে-কথা বিস্তৃত ভাবে বলা হ'য়েছে। এই গীতা-পর্বাধ্যায় ছাড়া মহাভারতের অন্যান্য অংশেও ধর্মের কথা আছে। মহাভারতকার কৃষ্ণের মুখে যে ধর্মব্যাখ্যান আরোপ ক'রেছেন, গীতার ধর্ম-ব্যাখ্যার সঙ্গে তার ঐক্য অনুভব ক'রেই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন। পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে

তিনি যা লিখেছিলেন, ষষ্ঠ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের পূর্বোক্ত মতামতের সঙ্গে সে-কথার পূর্ণ সংগতি বিদ্যমান। পঞ্চম খণ্ডে তিনি জানিয়ে গেছেন :

'কর্মবাদ কৃষ্ণের পূর্বেও প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে প্রচলিত মতানুসারে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডই কর্ম। মনুষ্যজীবনের সমস্ত অনুষ্ঠেয় কর্ম, যাহাকে পাশ্চাত্যেরা Duty বলেন—সে অর্থে সে প্রচলিত ধর্মে 'কর্ম' শব্দ ব্যবহৃত হইত না। গীতাতেই আমরা দেখি, কর্ম শব্দের পূর্বপ্রচলিত অর্থ পরিবর্তিত হইয়া, যাহা কর্তব্য, যাহা অনুষ্ঠেয়, যাহা Duty, সাধারণতঃ তাহাই কর্ম নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। আর এইখানে [সঞ্জয়ের প্রতি কৃষ্ণের ধর্মব্যাখ্যান অংশে] হইতেছে। ভাষাগত বিশেষ প্রভেদ আছে—কিন্তু মর্মার্থ এক। এখানে যিনি বক্তা, গীতাতেও তিনিই প্রকৃত বক্তা, একথা স্বীকার করা যাইতে পারে।'

এবং এই মন্তব্যের ঠিক পরেই পুনরায় জানানো হয়েছে—'অনুষ্ঠেয় কর্মের যথাবিহিত নির্বাহের অর্থাৎ ডিউটির সম্পাদনের নাম স্বধর্মপালন'। তাঁর মতে,—এই অর্থেই, অহিংসা পরম ধর্ম !

প্রথম খণ্ডে দ্রৌপদী চরিত্রের উল্লেখ আছে। 'বঙ্গদর্শনে' তিনি একটি প্রবন্ধে 'দ্রৌপদী' চরিত্রের আলোচনা ক'রেছিলেন। মহাভারত সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ যে কেবলমাত্র তাঁর আয়ুষ্কালের শেষ পর্বের ব্যাপার নয়, এই আলোচনা থেকে সে-সত্যের আর একটি সমর্থন পাওয়া যায়। পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে কৌরবদের সঙ্গে সন্ধি-স্থাপনের জন্যে শ্রীকৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার কথা-প্রসঙ্গে যুধিষ্ঠিরের প্রতি কৃষ্ণের পুরুষকার অবলম্বনের উপদেশ বর্ণনাসূত্রে গীতায় অর্জুনের প্রতি তাঁর অনুরূপ পরামর্শের কথা স্মরণ করা হ'য়েছে। কৃষ্ণ মানুষী শক্তিরই অভিব্যক্তি,—এই কথাটিই তিনি এখানে জোরের সঙ্গে উপস্থাপিত ক'রেছেন। যেখানে কৃষ্ণ মানবিক শক্তির প্রকাশ নন, যে-সব বর্ণনায় তাঁর অলৌকিক বা অবিশ্বাস্য শক্তির কথা আছে, সে-সব অংশ তিনি উপেক্ষা ক'রে গেছেন। সে যাই হোক, কৃষ্ণ যে কেবল ঐশী শক্তির প্রকাশ নন, তাঁর মধ্যে মানবিক পুরুষকার ও দৈবশক্তির স্বীকৃতি, একযোগে দুইয়েরই যে প্রকাশ ঘটেছিল, সেই সত্যের নজির দেখাতে গিয়ে এখানে কৃষ্ণের হস্তিনা-যাত্রার আগে দ্রৌপদীর এই উক্তিটি স্মরণ করা হয়—'অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেই পাপ হইয়া থাকে।' জরাসন্ধ-বধের কথাসূত্রে চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ-সপ্তম পরিচ্ছেদেও অনুরূপ কথা

আছে। দ্রৌপদীর পক্ষে,—নারীর পক্ষে, এই মন্তব্য একটু অস্বাভাবিক বটে, কিন্তু দ্রৌপদীর কথা তো কৃষ্ণকথারই প্রতিধ্বনি! জরাসন্ধ-বধের কথাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়ে গেছেন যে, জরাসন্ধের সঙ্গে কৃষ্ণের ব্যক্তিগত মনোমালিন্য গৌণ ব্যাপার। 'যে মনুষ্য জাতির শত্রু, সে কৃষ্ণের শত্রু।' কৃষ্ণ জরাসন্ধকে বলেছিলেন :

'তুমি রাজগণকে মহাদেবের নিকট বলি দিবার জন্য বন্দী করিয়াছ। তাই যুধিষ্ঠিরের নিয়োগক্রমে, আমরা তোমার প্রতি সমুদ্যত হইয়াছি।'

তিনি আরো বলেন :

'হে বৃহদ্রথনন্দন! আমাদিগকেও ত্বৎকৃত পাপে পাপী হইতে হইবে, যেহেতু আমরা ধর্মচারী এবং ধর্মরক্ষণে সমর্থ।'

এই শেষ উক্তিটি স্থূল হরপে ছেপে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রতে চেয়েছিলেন তিনি। এই কথারই ব্যাখ্যাসূত্রে লেখা হয় :

'যে ধর্মরক্ষণে ও পাপের দমনে সক্ষম হইয়াও তাহা না করে, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম। 'আমি ত কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি? যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী।'

শাক্যসিংহ, যিশুখ্রীষ্ট ইত্যাদি প্রত্যেকেই নরোত্তম, প্রত্যেকেই ধর্মরক্ষা ও পাপ নিবারণব্রত, দুইই একসঙ্গে গ্রহণ করেন। কৃষ্ণ আবার এঁদেরই মধ্যে পতিতপাবন এবং পতিতনিপাতী! যীশু খ্রীষ্টের জীবনাদর্শে যেমন Christian Ideal-এর অভিব্যক্তি, শ্রীকৃষ্ণের জীবনে সেই রকম Hindu Ideal-এর প্রকাশ ঘটেছিল। 'রামচন্দ্রাদি ক্ষত্রিয়গণ সেই আদর্শ প্রতিমার নিকটবর্তী, কিন্তু যথার্থ হিন্দু আদর্শ শ্রীকৃষ্ণ।'

এ সবই বঙ্কিমচন্দ্রকৃত-সমালোচনা। কৃষ্ণচরিত্রে সত্য, অহিংসা, ধর্ম ইত্যাদি পরিণত মানবমনের নিরন্তর জিজ্ঞাসার বিষয়গুলি এইভাবে বিভিন্ন প্রসঙ্গে দেখা দিয়ে গেছে। দ্রৌপদীর উক্তি স্মরণ ক'রে অতঃপর তিনি কৃষ্ণের সান্ত্বনার কথাগুলি উল্লেখ করেন। দ্রৌপদীকে সান্ত্বনা দিয়ে কৃষ্ণ ব'লেছিলেন—'আমি যুধিষ্ঠিরের নিয়োগানুসারে ভীমার্জুন নকুল সহদেব সমভিব্যাহারে কৌরবগণের বধ সাধনে প্রবৃত্ত হইব।' গীতার সমত্ব-রক্ষার আদর্শ যে কৃষ্ণের এ-উক্তিতেও উচ্চারিত হয়েছিল, পঞ্চম খণ্ডের চতুর্থ

পরিচ্ছেদের শেষ কয়েকটি ছত্রে সেই দিকটি দেখিয়ে দেওয়া হয়। কৃষ্ণ জানতেন যে, রাজ্যের অংশ ফিরিয়ে দিয়ে, সন্ধি ক'রতে দুর্যোধন কিছুতেই রাজী হবেন না। কিন্তু তা জেনেও, যে কর্ম অবশ্যই অনুষ্ঠেয়, কৃষ্ণ সেই কাজেই আত্মনিয়োগ ক'রতে প্রস্তুত হন। কারণ,

'সিদ্ধি ও অসিদ্ধি তুল্য জ্ঞান করিতে হইবে। ইহাই তাঁহার মুখবিনির্গত গীতোক্ত অমৃতময় ধর্ম। তিনি নিজেই অর্জুনকে শিখাইয়াছেন যে, সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে।'

সপ্তম খণ্ডে দুটি মাত্র পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে যদুবংশধ্বংসের উল্লেখ; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে 'কৃষ্ণচরিত্র' আলোচনার উপসংহার। মহাভারতে মৌসল পর্বে দুর্নীতিগ্রস্ত যাদবদের ধ্বংসের কথা আছে। মুসল ব্যাপারটি অনৈসর্গিক বটে,—অতএব বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনা অনুসারে তার গুরুত্ব কম,—কিন্তু যাদব-বিনাশে কৃষ্ণের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁকে কিছু ব'লতে হ'য়েছে। তিনি জানিয়েছেন যে, সে-বিবরণ যদি সত্যও হয়, তাতে কৃষ্ণচরিত্রের অসংগতি বা অগৌরবের কিছু নেই। কারণ, তিনি আদর্শ পুরুষ। ধর্মই তাঁর একমাত্র অবলম্বন। কৃষ্ণ সেক্ষেত্রেও ধর্মাচরণই ক'রে গেছেন।

উপসংহারে কৃষ্ণের শারীরিক বল, জ্ঞানার্জনী ও কার্যকারিণী বৃত্তিগুলির আদর্শ পরিস্ফুরণের তত্ত্ব পুনরায় উল্লেখ করে, তিনি বৃন্দাবনলীলায় কৃষ্ণের চিত্তরঞ্জিনী বৃত্তির চরম পরিস্ফুরণের দিকে তর্জনী নির্দেশ করেন। সে দিক-টির বিস্তৃত আলোচনা তিনি যে নিজের ইচ্ছা অনুসারেই করেন নি, সে-কথাও জানানো হয়েছে। তাঁর সে কথাগুলিও উল্লেখযোগ্য—'যে জন্য বৃন্দাবনে ব্রজলীলা, পরিণত বয়সে সেই উদ্দেশ্যে সমুদ্রবিহার, যমুনাবিহার, রৈবতক-বিহার। তাহার বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক বিবেচনা করি নাই।'

এই উপসংহারে, এই সূত্রেই আর-একটি কথা আছে:

'কেবল একটা কথা এখন বাকি আছে। ধর্মতত্ত্বে বলিয়াছি, ভক্তিই মনুষ্যের প্রধানা বৃত্তি। কৃষ্ণ আদর্শ মনুষ্য, মনুষ্যত্বের আদর্শ প্রচারের জন্য অবতীর্ণ—তাঁহার ভক্তির স্ফূর্তি দেখিলাম কই? কিন্তু যদি তিনি ঈশ্বরাবতার হয়েন, তবে তাঁহার এই ভক্তির পাত্র কে? তিনি নিজে। নিজের প্রতি যে ভক্তি, সে কেবল আপনাকে পরমাত্মা হইতে অভিন্ন [বোধ] হইলেই উপস্থিত হয়। ইহা জ্ঞানমার্গের চরম। ইহাকে আত্মরতি বলে। ছান্দোগ্য উপনিষদে উহা এইরূপ কথিত

হইয়াছে—'য এব পশ্যন্নেবং মন্বান এবং বিজানন্নাত্মরতিরাত্মক্রীড় আত্মমিথুন আত্মানন্দঃ স স্বরাড়্ ভবতীতি'।

'যে ইহা দেখিয়া, ইহা ভাবিয়া, ইহা জানিয়া, আত্মায় রত হয়, আত্মাতেই ক্রীড়াশীল হয়, আত্মাই যাহার মিথুন [সহচর] আত্মাই যাহার আনন্দ, সে স্বরাট।'

'ইহাই গীতায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কৃষ্ণ আত্মারাম; আত্মা জগন্ময়; তিনি সেই জগতে প্রীতিবিশিষ্ট। পরমাত্মার আত্মরতি আর কোন প্রকার বুঝিতে পারি না। অন্ততঃ আমি বুঝাইতে পারি না।'

সাহিত্যতত্ত্বব্যাখ্যা ক'রতে গিয়ে তিনি যেমন 'সৃষ্টি'-রহস্যের কথায় পৌঁছে, আর এগিয়ে যেতে রাজী হন নি, 'কৃষ্ণচরিত্রে'র উপসংহারে পৌঁছে পরমাত্মার আত্মরতি প্রসঙ্গের তেমনি আর বিস্তার ঘটাতে চান নি! যুক্তির পথ যতোদূর যেতে পারে, তাঁর যাত্রার লক্ষ্য সেই পর্যন্তই। বুদ্ধিনিষ্ঠ, যুক্তিবাদী, বহু অধ্যয়নশীল বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবই এ-সব ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট।

অতঃপর গল্প উপন্যাসের কথায় এগিয়ে যাবার আগে তাঁর কাব্যপ্রয়াসের দিকটি বিবেচ্য।

পদ্যলেখক ও কবি

ললিতা ও মানস

গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে, অর্থাৎ ১৮২৫ থেকে ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাংলার সবচেয়ে প্রতিষ্ঠিত আধুনিক কবি ছিলেন ঈশ্বর গুপ্ত। রঙ্গলাল আর ঈশ্বর গুপ্ত পরস্পরের সমসাময়িক কবি। দুজনের লেখাতেই কবিওয়ালার ঐতিহ্য সুস্পষ্ট। বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতা-চর্চার গুরু ছিলেন সেই ঈশ্বর গুপ্ত। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই সেপ্টেম্বর তারিখের 'সংবাদ-প্রভাকর' পত্রিকায় গুরুর প্রভাবের বহুচিহ্নবাহী 'বর্ষা বর্ণনার ছলে দম্পতির রসালাপ' নামে তাঁর একটি পদ্য-রচনা বেরিয়েছিল। তখন তাঁর বয়স মাত্র চোদ্দ-পনেরো বছর। আবার, ১২৭৯ সালের ফাল্গুনের 'বঙ্গদর্শনে' আটটি স্তবকে তাঁর 'বিরহিণীর দশ দশা' নামে আর-একটি লেখা ছাপা হয়। তাতেও তাঁর বাল্যকালের গুরু সেই ঈশ্বর গুপ্তেরই প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। অথচ, বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্য-রচনায় তখন পরিণতির লক্ষণ সংশয়াতীত। তবু 'কবিতার' ক্ষেত্রে কিছু লঘু পরিহাসের ভঙ্গি, কিছু সাময়িক প্রসঙ্গ, আর দেশপ্রেমের সুর—এই ছিল তাঁর প্রধান নিবেদন। 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত নিজের কবিতাগুলি তিনি 'গদ্যপদ্য বা কবিতাপুস্তক' নামে প্রকাশ করেন। তাতে 'মেঘ', 'বৃষ্টি' এবং 'খদ্যোৎ' নামে তিনটি গদ্য-কথিকা সংকলিত হয়। 'বিজ্ঞাপনে' তিনি জানান:

> 'কবিতাপুস্তকের ভিতর তিনটি গদ্য প্রবন্ধ সন্নিবেশিত হইয়াছে। কেন হইল, আমাকে জিজ্ঞাসা করিলে আমি ভাল করিয়া বুঝাইতে পারিব না। তবে, এক্ষণে যে রীতি প্রচলিত আছে যে, কবিতা পদ্যেই লিখিতে হইবে, তাহা সঙ্গত কি না, আমার সন্দেহ আছে। ভরসা করি, অনেকেই জানেন যে, কেবল পদ্যই কাব্য নহে। আমার বিশ্বাস আছে যে, অনেক স্থানে পদ্যের অপেক্ষা গদ্য কাব্যের উপযোগী। …যে স্থানে ভাষা ভাবের গৌরবে আপনা আপনি ছন্দে বিন্যস্ত হইতে চাহে, কেবল সেই স্থানেই পদ্য ব্যবহার্য। নহিলে কেবল কবিনাম কিনিবার জন্য ছন্দ মিলাইতে বসা এক প্রকার সং সাজিতে বসা। কাব্যের পদ্যে উপযোগিতার

উদাহরণস্বরূপ তিনটি গদ্য কবিতা এই পুস্তকে সন্নিবেশিত করিলাম'।

সেকালের পক্ষে, তাঁর এই দৃষ্টি যে বিশিষ্ট এবং খুবই আধুনিক ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। 'সংবাদ-প্রভাকরে'র কালেজীয় কবিদের মধ্যে দীনবন্ধু, দ্বারকানাথ অধিকারী, যাদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়, গোপালচন্দ্র সেন, ভুবনমোহন দত্ত, আনন্দচন্দ্র গুহ ইত্যাদি আরো কেউ কেউ ছিলেন। কিন্তু বঙ্কিমের এ দৃষ্টি তাঁদের একজনেরও ছিল না।

চোদ্দ-পনেরো বছর বয়সে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁর কৈশোরের কবিতাগুলি প্রকাশিত হ'তে আরম্ভ করে। 'সমাচার দর্পণে' সেই সময়েই তাঁর একটি কবিতা ছাপা হয়।[১] আঠারো বছর বয়সে তিনি তাঁর প্রথম কবিতাসংগ্রহ প্রকাশ করেন। পরিণত বয়সে, ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'কবিতাপুস্তক' নামে তাঁর আর কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়। আর, তাঁর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের সেই আঠারো বছর বয়সের কবিতা-সংগ্রহ 'ললিতা' ইত্যাদির নতুন সংস্করণ প্রকাশের সময়ে তিনি লেখেন :

> 'এই কবিতাগুলি লেখকের পঞ্চদশ বৎসর বয়সে লিখিত। লিখিত হওয়ার তিন বৎসর পরে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত হইয়া বিক্রেতার আলমারীতেই পচে—বিক্রয় হয় নাই। তাহার পর আর এ সকল পুনর্মুদ্রিত করিবার যোগ্য বিবেচনা করি নাই, এখনও আমার এমন বিবেচনা হয় না যে, ইহা পুনর্মুদ্রিত করা বিধেয়। বাল্যকালে কিরূপ লিখিয়াছিলাম,তাহা দেখাইয়া বাহাদুরী করিবার ভরসা কিছুমাত্র নাই; কেন না, অনেকেই অল্প বয়সে এরূপ কবিতা লিখিতে পারে।'

'ললিতার' লেখাগুলি তিনি এই সময়ে নিজে সংশোধন করে দেন। কিন্তু 'মানস' কাবতা-সংগ্রহের বিষয়ে তিনি বলেন—'মানস' নামক কাব্যখানিতে পরিবর্তন বড সহজ নহে, এজন্য সে চেষ্টা করিলাম না।'

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আধুনিক সাহিত্য' প্রবন্ধ-সংগ্রহে বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-গুরু ঈশ্বর গুপ্তের কথা বিশেষভাবে স্মরণ ক'রেছিলেন। দীনবন্ধু যে তাঁরই সমকালীন লেখক ছিলেন, সেই প্রবন্ধে সে-তথ্য উল্লেখ ক'রে, দীনবন্ধুর

১। এই গ্রন্থের প্রথম পৃষ্ঠায় 'বিরলে বাস' নামে তাঁর সেই কবিতাটির উল্লেখ করা হয়েছে।

লেখাতে বঙ্কিমচন্দ্রের মতন 'ব্রাহ্মণোচিত শুচিতা' যে ছিল না, রবীন্দ্রনাথ সে প্রসঙ্গও চিহ্নিত ক'রে গেছেন। সমকালীন সাহিত্য-স্রষ্টাদের সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের লেখাগুলির মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, দীনবন্ধু, মিত্র, মধুসূদন দত্ত, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইত্যাদি কয়েকজনের সম্বন্ধে কয়েকটি রচনা পাওয়া যায়। ইতিপূর্বে তা উল্লেখ করা হ'য়েছে। মধুসূদনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে, ১২৮০ সালের ভাদ্রের 'বঙ্গদর্শনে' তিনি লিখেছিলেন—'কাল প্রসন্ন—ইউরোপ সহায়,—সুপবন বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়া দাও—তাহাতে নাম লেখ শ্রীমধুসূদন'।[২] 'ঈশ্বরগুপ্তের জীবনচরিত ও কবিত্ব' প্রবন্ধের 'উপক্রমণিকা'য় বাংলার কবিতা-প্রবাহের সমৃদ্ধির কথাসূত্রে তিনি লিখেছিলেন যে, বিদ্যাপতি থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত অনেক সুকবি বাংলায় জন্মগ্রহণ করেছেন। বিদ্যাপতি বাঙালী না হলেও বাংলাদেশে তিনি যে বাঙালী হয়েই বিরাজ করছেন, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস লিখতে বসে বঙ্কিম-যুগের পরবর্তী পর্বে, দীনেশচন্দ্র সেন সে-কথা খুবই সংগতভাবে জানিয়ে গেছেন। সে যাই হোক্, ঈশ্বর গুপ্তের পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর পূর্বোক্ত প্রবন্ধে কোনো এক বর্ষা-সন্ধ্যায় গঙ্গাতীরে তাঁর নিজের এক অভিজ্ঞতা স্মরণ ক'রে লিখেছিলেন :

> 'আকাশে নক্ষত্র, নদীবক্ষে নৌকায় আলো, তরঙ্গে চন্দ্ররশ্মি! কাব্যের রাজ্য উপস্থিত হইল। মনে করিলাম কবিতা পড়িয়া মনের তৃপ্তি সাধন করি। ইংরেজি কবিতায় তাহা হইল না—ইংরেজির সঙ্গে এ ভাগীরথীর ত কিছুই মিলে না। কালিদাস ভবভূতিও অনেক দূরে।'

মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের লেখাতেও সেই সন্ধ্যায় সেই বাঞ্ছিত অনুভূতির সমর্থন পাননি তিনি! তাঁর মতে, এঁদের লেখায় খাঁটি বাংলা ভাব অনুপস্থিত। গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহ সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিশেষ ইচ্ছা বা আগ্রহ তাঁর এই আকাংক্ষার সঙ্গে জড়িত। এই 'খাঁটি বাংলা'র আকাংক্ষা! সে-কথা তিনি তাঁর এই প্রবন্ধটিতেই লিখে জানিয়ে গেছেন। তাঁর নিজের কবিতাগুলি দেখে নেবার আগে এ-কথার মর্মার্থ অনুভব করা দরকার। তিনি লিখেছিলেন :

২। এই গ্রন্থের ১২১-১২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।

'খাঁটি বাঙ্গালী কথায় খাঁটি বাঙ্গালীর মনের ভাব ত খুঁজিয়া পাইনা। তাই ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছি। এখানে সব খাঁটি বাঙ্গালী। মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কবি—ঈশ্বর গুপ্ত বাঙ্গালীর কবি। এখন আর খাঁটি বাঙ্গালী কবি জন্মে না—জন্মিবার যো নাই—জন্মিয়া কাজ নাই। বাঙ্গালীর অবস্থা আবার ফিরিয়া অবনতির পথে না গেলে খাঁটি বাঙ্গালী কবি আর জন্মিতে পারে না।'

কিন্তু খাঁটি বাংলার জন্যে এই ব্যাকুলতা সত্ত্বেও কবিতার সমকালীন আদর্শ,—এবং জীবনবোধে বাস্তবতার দাবি তিনি কখনোই 'অবাস্তব' বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করেন নি। বরং খুবই সোজাসুজি তিনি লিখতে পেরেছিলেন—'আমরা 'বৃত্রসংহার' পরিত্যাগ করিয়া 'পৌষপার্বণ' চাই না।' মধুসূদনের কবিপ্রতিভার উদ্দেশ্যে বন্দনা জানাতে গিয়ে তিনি যেমন এদেশের কবিমানসে পাশ্চাত্য সংস্কৃতির নতুন প্রভাবের জয়গান ক'রেছিলেন, এই লেখাটিতেও সেই রকম নতুন কালের নতুন আদর্শচেতনার জয়গান ছিল। কিন্তু নতুন কালের এই বিচিত্র নতুনত্বে যে ঠিক বাংলার নিজস্ব স্বভাবের অভিপ্রেত প্রকাশ ঘটছিল না, সেকথাও তিনি ব'লেছেন!

বাঙালী-জীবনের আশা-নৈরাশ্য সম্বন্ধে তাঁর কয়েকটি পদ্যরচনা আছে। 'অধঃপতন সঙ্গীত'-এর দশম স্তবকে তিনি লেখেন:

মনুষ্যত্ব? কাকে বলে? স্পিচ দিই টৌনহলে,
লোকে আসে দলে দলে, শুনে পায় প্রীত
নাটক নবেল কত, লিখিয়াছি শত শত
এ কি নয় মনুষ্যত্ব? নয় দেশহিত?
ইংরেজি বাঙ্গালা ফেঁদে, পলিটিক্‌স্ লিখি কেঁদে
পদ্য লিখি নানা ছাঁদে বেচি সস্তা দরে।
অশিষ্টে অথবা শিষ্টে, গালি দিই অষ্টে পৃষ্টে,
তবু বল দেশহিত কিছু নাহি করে?
নিপাত যাউক দেশ! দেখি বসে ঘরে।

তাঁর 'ভাই ভাই' নামে অন্য একটি পদ্য-রচনার তৃতীয় স্তবকের শেষ লাইনে ধিক্কার-সূচক এগারোটি 'ছি' ধ্বনি আছে। সমবেত বাঙালীদের এক সভা

দেখে তাঁর এ-কবিতা লেখা হয়। বাঙালীর দৈন্য দেখে,—বাঙালীর লোকবিশ্রুত কোমলতা সম্বন্ধে ধিক্কার দিয়ে, ঐ তৃতীয় স্তবকে তিনি লেখেন :

শিখিয়াছ শুধু উচ্চ চীৎকার।
ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! ভিক্ষা দাও! সার
দেহি দেহি দেহ বল বার বার
না পেলে গালি দাও মিছামিছি
দানের অযোগ্য চাও তবু দান
মানের অযোগ্য চাও তবু মান
বাঁচিতে অযোগ্য রাখ তবু প্রাণ,
ছি ছি ছি ছি ছি ছি! ছি ছি ছি ছি ছি!

'দুর্গোৎসব' নামে তৃতীয় এক কবিতার দ্বিতীয় স্তবকে দেখা যায় :

কি সাজ সেজেছ মাতা রাঙ্গতার সাজে!
এ দেশে যে রাঙ্গই সাজ কে তোরে শিখালে?
সন্তানে রাঙ্গতা দিলে আপনি তাই পরিলে,
কেন মা রাঙ্গের সাজে এ বঙ্গ ভুলালে?
ভারত রতন খনি, রতন কাঞ্চন মণি,
সে কালে এ দেশে মাতা কত না ছড়ালে?

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যগুরু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত যথাক্রমে 'সংবাদ প্রভাকর' [প্রথম প্রকাশ ১২৩৭, ১৬ই মাঘ], 'সংবাদ-রত্নাবলী' [১০ই শ্রাবণ, ১২৩৯], 'পাষণ্ড পীড়ন' [৭ই আষাঢ়, ১২৫৩] এবং 'সংবাদ-সাধুরঞ্জন' [ভাদ্র, ১৩৫৪], এই চারখানি সাময়িক-পত্র সম্পাদনা ক'রে গেছেন। এইসব পত্র-পত্রিকায় তখনকার নতুন কবিদের কবিতা ছাপা হোতো। বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু, দ্বারকানাথ অধিকারী, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার ইত্যাদি অনেকেই এইসব পত্রিকায় লিখেছেন। ১২৮৭ সালের ফাল্গুন সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখে গেছেন যে, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু আর দ্বারকানাথ অধিকারী ছিলেন গুপ্তকবির মন্ত্রশিষ্য। এঁরা তিনজনেই কবিতা লিখে পুরস্কার পেয়েছিলেন।[১৪] বঙ্কিমচন্দ্রের কবিতার সঙ্গে সমকালীন সহযোগী কবির রচনা

১৪। হুগলী কলেজের অধ্যক্ষ জে. কের সাহেব তখনকার Council of Education এর Secretaryকে ২০. ২. ১৮৫৪ তারিখে লেখেন :

মিলিয়ে দেখতে হ'লে দ্বারকানাথের কবিতা-সংগ্রহ 'সুধীরঞ্জন' [১৮৫৫] এবং দীনবন্ধুর 'সুরধুনী' [১৮৬২] কাব্যের কথা মনে পড়ে। সরস পদ্যে সাময়িক ঘটনা বা উৎসব ইত্যাদি বর্ণনার দিকে ঈশ্বর গুপ্তের স্বাভাবিক আগ্রহ বর্তেছিল দীনবন্ধুর কলমে। 'দীনবন্ধু মিত্রের কবিত্ব' প্রবন্ধে তাই বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন—'ঈশ্বরচন্দ্রের কাব্যশিষ্যদিগের মধ্যে দীনবন্ধু গুরুর যতটা কবি-স্বভাবের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন, এত আর কেহ নহে।' আবার—'বাঙালীর প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে দীনবন্ধুর কবিতার যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, তাহাও গুরুর অনুকারী। যে রুচির জন্য দীনবন্ধুকে অনেকে দূষিয়া থাকেন, সে রুচিও গুরুর।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভাই ভাই' পদ্য-রচনাটিতে যে এগারোটি 'ছি'-ধ্বনির উল্লেখ করা হোলো, সেও ঐ অপরিণত রুচির নমুনা। বিষয়বস্তুতে, আঙ্গিকে—এঁদের কবিতা-চর্চার সর্বত্র সেই একই অপরিণতির প্রকাশ ঘটেছে। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই লিখে গেছেন—'ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লেখকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন।'

ললিতার আদিতেই 'Gertrude of Wyoming' থেকে কয়েক ছত্র উদ্ধৃতি দেখা যায়। শিরোনামে 'ললিতা' শব্দের নিচে 'ভৌতিক গল্প' এই কথা দুটি যোগ করা হয়েছে। তারপর সর্গ-বিভাগে রচনা এগিয়েছে। মোট দুটি সর্গ। প্রথম সর্গে ললিতা আর মন্মথ, এই দুই তরুণের মিলনে বাধা-সঞ্চার; দ্বিতীয় সর্গে অরণ্যে ঝড় ওঠে; সেই ঝড়ে সেই অরণ্যেই বহু

Sir,

I have the honour to report for the information of the Council of Fducation that I have received twenty rupees to be awarded to Bankim Chunder Chatterjee, a pupil of the first class of the senior school, for some good poetical compositions in Bengalee. The poetical compositions appeared in the Prabhakar Newspaper. The prize of twenty rupees was awarded by Baboos Romonymohun Roy and Kally Churn Roy Chowdhury, Zemindars of Rungpore and was sent through Baboo Isser Chunder Goopto, the Editor of the above mentioned Journal.

J. Kerr
Principal

১৮ই মার্চ ১৮৫৩ তারিখের সংবাদ-প্রভাকরে বঙ্কিমচন্দ্রের 'কামিনীর প্রতি উক্তি। তোমাতে লো বড়ঋতু' রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের কবিতা-প্রতিযোগিতায় এই রচনার জন্যেই তিনি পুরস্কৃত হন।

যন্ত্রণাহত এই তরুণ-তরুণীর মৃত্যু ঘটে যায়! রাজকন্যা ললিতা মাতৃহীনা এবং পিতা ও বিমাতার স্নেহে বঞ্চিতা। ললিতাকে তাঁরা যার সঙ্গে বিবাহ দিতে উদ্যোগী হন, সে লোকটি দুর্জন। প্রথম সর্গের তৃতীয় অংশে সেই কাহিনীরই অনাড়ম্বর বর্ণনা আছে :

'ললিতা তাহার নাম রাজার নন্দিনী
জননী না ছিল তার বিমাতা বাঘিনী।
রাজা বড় নিষ্ঠুর সতত দেয় জ্বালা ;
গোপনে কতই কাঁদে মাতৃহীনা বালা
দুর্জনের সাথে তার বিবাহ সম্বন্ধ—
শুনে কেঁদে কেঁদে তার চক্ষু যেন অন্ধ।'

এই অবস্থায় মন্মথ নামে এক সুন্দর যুবকের প্রতি অনুরাগের ফলে গোপনে ললিতার বিয়ে হয়ে যায়। রাজা সে-খবর জানতে পেরে তাকে তাড়িয়ে দেন। তখন—'ভয়ে বালা সেই দণ্ডে করিলা প্রস্থান।'—এবং—

'মন্মথ লইয়া তারে তুলিল নৌকায়।
ভয়ে ভীত দুই জনে নদী বেয়ে যায়॥
পথিমধ্যে দস্যুদল আসিয়া রোধিল।
ললিতারে কাড়ি লয়ে বনে প্রবেশিল
অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে ছেড়ে দিল তারে
ললিতা একাকী ফিরে নদী ধারে ধারে।'

এদিকে, মন্মথ বনের অন্ধকারে বসে গান গাইতে গাইতে তারই প্রতীক্ষায় ছিল। সেই গান শুনে ললিতা তার কাছে গিয়ে পৌঁছোয়। তখন আকাশে চাঁদ উঠেছে। দুই প্রেমিক-প্রেমিকার এই পুনর্মিলন-বর্ণনা কিশোর কবির উচ্ছ্বাসে দীর্ঘ-বিস্তৃত! কেউ কাউকে আর চোখের আড়ালে যেতে দেবে না, এই তাদের মিলিত প্রতিজ্ঞা। প্রথম সর্গের শেষে ললিতা আর মন্মথ, দুজনের দুটি উচ্ছ্বাস পাশাপাশি সাজিয়ে দিয়েছেন লেখক। ত্রিপদীতে মন্মথ ব'লেছে :

'হে বিধি হে বিধি   কর কর বিধি
এই কপালে আমার।
বল তার চেয়ে   স্বর্গপদ পেয়ে
কি সুখ আছে হে আর॥

বিচ্ছেদ যাতনা, দিব না দিব না,
এ জনমে প্রেয়সীরে।
কাল পূর্ণ হলে, সুখে তব কোলে
ঘরে যাব ধীরে ধীরে।'

নব-পরিণীতা এই প্রেমিক-যুগলের সুখের ছবি সাজিয়ে দ্বিতীয় সর্গের সূচনা হয়েছে :

'মরি প্রেম যার মনে, সে কি চায় রাজ্যধনে
প্রিয়মুখ ত্রিসংসার তায়।
হৃদে তার যে রতন, আলো করে ত্রিভুবন
অন্য মণি নিবায় বিভায়।
এক মোহে সদা মত্ত, না জানে আপনি মর্ত্য
যাহা দেখে তাই প্রেমাকুল
রবি শশী তারাকাশ, পয়োদ পবন শ্বাস,
সাগর শিখর বনফুল॥'

সেই অরণ্যে হঠাৎ তারা দুজনেই অদ্ভুত এক শব্দ শুনতে পায়! সেই শব্দের সন্ধান ক'রতে ক'রতে এক নিকুঞ্জে প্রবেশ করে।

'এ কুঞ্জ হইতে যেন আসিছে সংগীত।
হেন ভাবি দুইজনে আইল ত্বরিত॥
নিকুঞ্জ প্রবেশ মাত্র থামিল সে ধ্বনি।
কানন পূর্বের মত নীরব অমনি॥
আশ্চর্য হইয়া দোঁহে রহিলেক স্থির।
দেখিতেছে শোভা কুঞ্জ গগন শরীর॥
কেহ নাই বন কিংবা গগন ভিতর
তথাপি কেমনে এলো এ মধুর স্বর।'

সেই কুঞ্জবনের মধ্যেই অপূর্ব সেই সংগীতের ধ্বনি শোনা গেছে। নিকুঞ্জে প্রবেশ-কালেই—

'ললিতার জ্ঞান হোলো প্রবেশ সময়
যেন কোনো স্বপ্ন-দৃষ্ট মত শোভাময়
দুই মনোরম রূপ নারী নরাকারে,
দেখিল চকিত মত নিকুঞ্জের ধারে॥'

সেই শব্দের রহস্য-সন্ধানে উদ্যোগী হ'য়ে তারা সে-রাত্রি নিকুঞ্জেই যাপন করে। কিন্তু পরের রাত্রে সে-শব্দ স্থানান্তরে সরে যায়। তৃতীয় রাত্রে সে-গান আবার অন্যত্র সরে যায়। চতুর্থ রাত্রেও তাই। পঞ্চম রাত্রে—

'অকস্মাৎ কোথা হয় গভীর গর্জ্জন
কাঁপিল গভীর বন কাঁপিল দুজন ॥
অদ্ভুত নিনাদ উড়ে যায় বন দিয়ে.
অন্ধকার ভীমতর হইল আসিয়ে ॥
ভীমতর নাদে যেন কাঁপে নভহৃদি
কাঁদিয়া উঠিল দোঁহে "হা বিধি! হা বিধি।"

প্রচণ্ড ঝড়ের দাপটে সমস্ত বনভূমি কেঁপে ওঠে। এদিকে—

'ভীষণ নীরব! যেন মরেছে ধরণী
হে ধাতঃ কাঁপালো স্তব্ধ আবার কি ধ্বনি ॥
বলিছে গম্ভীর স্বরে, রে নরযুগল
দেবের নিকুঞ্জে এসে পাও কর্ম্মফল।'

সর্গবন্ধে প্রবাহিত এই বিয়োগান্তক আখ্যান-কাব্যের প্রথম কয়েক ছত্রে অরণ্য-বর্ণনার মধ্যে,—নদীর স্রোতে, পাতার মর্মরধ্বনিতে যে অপূর্ব ধ্বনির অনুভূতি ব্যক্ত হ'য়েছে, রবীন্দ্রনাথের প্রথম পর্বের কবিতায়, তারই অনুরূপ স্বাদ অনুভব করা যায়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এইসব বাল্য-রচনায় কৈশোরের রোমান্টিক বেদনার কথাই ব'লে গেছেন। তবে, সে-বর্ণনা তাঁরই নিজের উক্তি হিসেবে তিনি ঘোষণা করেন নি,—একটি অপ্রত্যাশিত বিচ্ছেদের পূর্বপ্রস্তুতি হিসেবে সে বিষাদবোধ পাঠকের মনের গোচর করা হয়েছে:

'কি কারণে দুঃখোদয় কিসের কারণে,
কিছুই বুঝিনা তবু, উচাটন মনে ॥
ফুলিয়ে উঠেছে ধ্বনি, স্থির শূন্য কেটে।
ইচ্ছা করে গগনেতে উঠে যাই ফেটে ॥
ছেঁড়ে হৃদয়ের ডোর গভীর যাতনে
ইচ্ছা করে গলি গিয়ে মিশি গান সনে।
আরে যদি সংগীতের দেহ দেখা পাই
যতনেতে আলিঙ্গিয়া, মোহে মরে যাই ॥'

এই কাব্য-কাহিনীর একেবারে শেষ অংশে, ললিতা-মন্মথর মৃত্যুর পরে প্রকৃতির শান্ত স্তব্ধতার দিকে মনোযোগ আকর্ষণ ক'রে কবি আবার সেই ভয়াবহ আঘাতের স্মৃতি জাগিয়ে তুলেছেন। সে অংশে 'মেধার মারুতোপরি', আর 'গুল্মিনী'—অন্ততঃ এই দুটি অদ্ভুত শব্দ-প্রয়োগের নমুনা আছে!

সমকালীন বাঙালী কবিদের মধ্যে, তাঁর এ রচনায় ঈশ্বর গুপ্তের চেয়ে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের [১৮১৫-১৮৫৮] প্রতিধ্বনিই হয়তো বেশি অনুভব করা যায়। ভারতচন্দ্রের ছায়ায় বাস ক'রেও মদনমোহন কিছু আদিরসের সংস্কৃত কাব্যের কতকটা স্বাধীন অনুবাদ ক'রে গেছেন। রোমান্টিক বেদনা প্রকাশে বা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মধ্যে ভয় বা বিস্ময় উপলব্ধির সামর্থ্যে তিনি মোটেই স্মরণীয় নন। তবু, মদনমোহনের কবিতা-চর্চায় কিঞ্চিৎ স্বাতন্ত্র্য যে ছিল, সেটুকুই এখানে ভাববার কথা। বঙ্কিমচন্দ্রের তরুণ মনে সেই ক্ষীণ বিশিষ্টতাই হয়তো কিছু প্রভাব রেখে গেছে। আবার, বলদেব পালিত ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়ে মাত্র কয়েক বছরের বড়ো [১৮৩৫-১৯০০]। বিষাদ, বিস্ময়, প্রেমের কবিতা তিনিও কিছু কিছু লিখে গেছেন। গত শতাব্দের পঞ্চাশের দশকে, তাঁরও কবিতা-চর্চার প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হ'য়েছে। তা'ছাড়া মনোমোহন বসুর [১৮৩১-১৯১২] কথাও মনে পড়তে পারে। কিন্তু প্রাচীন বিষয়বস্তু আর রীতির অনুসরণে এবং নতুন ভাবেরও অনুমোদনে মনোমোহনই ঈশ্বর গুপ্তের বেশি নিকটবর্তী শিষ্য; সরসতায় এবং কটুক্তিতে দীনবন্ধু আর দ্বারকানাথ অধিকারীই বঙ্কিমের তুলনায় গুরুর বেশি সন্নিহিত ছিলেন বলে মনে হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের পথ যে আলাদা হ'য়ে যাবে, তা তাঁর এই ললিতা ও মানস বাল্য-রচনা থেকেই অনুমান করা যেত। কিন্তু, কবিতার পথ তিনি পুরোপুরি ছেড়েই দিলেন। কবিতা কেবল তাঁর কৈশোরের কৌতুক আর কৌতূহল রূপেই দেখা দিয়েছিল। উত্তরকালে, কবিতার পক্ষে যা প্রত্যাশিত,—সেই ভয়, বিস্ময়, প্রেম, প্রতীক্ষা সবই তাঁর গদ্যে আত্মপ্রকাশ ক'রেছে। কবিতা যে গদ্যেও প্রকাশিত হ'তে পারে, তাঁর 'মেঘ', 'বৃষ্টি', 'খদ্যোতে'র কথা-প্রসঙ্গে সে তো তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন। কিন্তু শুধু ঐ তিনটি লেখাতেই নয়,—তাঁর কমলাকান্তের দপ্তরে, কপালকুণ্ডলায় এবং আরো নানা গদ্য-রচনায় কবিতার গভীর আবেগের স্পন্দন বারে বারে অনুভব করা যায়। তাঁর উপন্যাসের আলোচনায় আরো অনেক কথা বলবার আছে। তাই সে-অঞ্চলে কবিতার প্রসঙ্গ ধরে যা বলবার আছে, এখানেই সে-দিকটির

একটু নমুনা তুলে দেওয়া যেতে পারে। 'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের সমুদ্রের দৃশ্যটুকু তাঁর সেই নিবিড় রূপানুভূতিরই পরিচায়ক :

'ফেনিল, নীল, অনন্ত সমুদ্র। উভয় পার্শ্বে যত দূর চক্ষু যায়, তত দূর পর্যন্ত তরঙ্গভঙ্গপ্রক্ষিপ্ত ফেনার রেখা; স্তূপীকৃত বিমল কুসুমদামগ্রথিত মালার ন্যায় সে ধবল ফেনরেখা হেমকান্ত সৈকতে ন্যস্ত হইয়াছে; কাননকুন্তলা ধরণীর উপযুক্ত অলকাভরণ। নীল জলমণ্ডলমধ্যে সহস্র স্থানেও সফেন তরঙ্গভঙ্গ হইতেছিল। যদি কখন এমত প্রচণ্ড বায়ুবহন সম্ভব হয় যে, তাহার বেগে নক্ষত্রমালা সহস্রে সহস্রে স্থানচ্যুত হইয়া নীলাম্বরে আন্দোলিত হইতে থাকে, তবেই সে সাগরতরঙ্গক্ষেপের স্বরূপ দৃষ্ট হইতে পারে। এ সময়ে অস্তগামী দিনমণির মৃদুল কিরণে নীলজলের একাংশ দ্রবীভূত সুবর্ণের ন্যায় জ্বলিতেছিল।'

আবার, সেই সমুদ্রতীরে কপালকুণ্ডলাকে প্রথম দর্শনের অভিজ্ঞতায়—

'সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণীমূর্তি। কেশভার—অবেণীসম্বদ্ধ, সংসর্পিত, রাশীকৃত, আগুল্‌ফলম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন; যেন চিত্র-পটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে। অলকাবলীর প্রাচুর্যে মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ হইতেছিল না—তথাপি মেঘবিচ্ছেদনিঃসৃত চন্দ্ররশ্মির ন্যায় প্রতীত হইতেছিল। বিশাল লোচনে কটাক্ষ অতি স্থির, অতি স্নিগ্ধ, অতি গম্ভীর, অথচ জ্যোতির্ময়; সে কটাক্ষ, এই সাগরহৃদয়ে ক্রীড়াশীল চন্দ্রকিরণলেখার ন্যায় স্নিগ্ধোজ্জ্বল দীপ্তি পাইতেছিল। কেশরাশিতে স্কন্ধদেশ ও বাহুযুগল আচ্ছন্ন করিয়াছিল। স্কন্ধদেশ একেবারে অদৃশ্য; বাহুযুগলের বিমলশ্রী কিছু কিছু দেখা যাইতেছিল। রমণীদেহ একেবারে নিরাভরণ। মূর্তিমধ্যে যে একটি মোহিনী শক্তি ছিল, তাহা বর্ণিতে পারা যায় না। অর্ধচন্দ্রনিঃসৃত কৌমুদীবর্ণ; ঘনকৃষ্ণ চিকুরজাল; পরস্পরের সান্নিধ্যে কি বর্ণ, কি চিকুর, উভয়েরই যে শ্রী বিকশিত হইতেছিল, তাহা সেই গম্ভীরনাদী সাগরকূলে, সন্ধ্যালোকে না দেখিলে তাহার মোহিনী শক্তি অনুভূত হয় না।'

'মৃণালিনীর তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে, গিরিজায়া যখন পাটনীর বাড়ির কাছে এক পুষ্করিণী-তীরে ব'সেছে, তাঁর সে-বর্ণনাও এই বর্ণনার স্মারক। আনন্দমঠের প্রকৃতি-বর্ণনাও সুপরিচিত।

বঙ্কিমচন্দ্র যে কবি ছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর প্রকৃতি-বর্ণনার ঝোঁক তাঁর বাল্যকালের পদ্যগুলির মধ্যেও নজরে পড়বার মতন। পদ্যে রসালাপের সমকালীন আগ্রহ তাঁর মধ্যে যে একেবারেই ব্যক্ত না হ'য়েছিল, তা নয়। পুরোনো রীতি যে তিনি ত্যাগ ক'রতে পেরেছিলেন, তাও নয়। 'আকবর শাহের খোষ রোজ' বা 'সংযুক্তা'—তাঁর পদ্য-রচনার মধ্যে এইসব বিষয়বস্তু সেকালের সাধারণ কবিকর্মেরই পরিচায়ক। মধুসূদন তাঁর সমকালীন কবি। কিন্তু মধুসূদনের কবি-ব্যক্তিত্ব তাঁর ছিলনা! তা'হলেও মধুসূদনকে অভিনন্দন জানাবার মতন কবিদৃষ্টি ছিল তাঁর। নবীনচন্দ্রকে তিনিই বলে-ছিলেন বাংলার বাইরণ! বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্বের দিকটি তাঁর ব্যক্তিত্বের গৌণ দিক। কিন্তু নবীনচন্দ্রকে তিনি যে এই 'বাইরণ' অভিধায় গৌরবান্বিত ক'রেছিলেন, কাব্যবিচারে তাঁর সামর্থ্য-অসামর্থ্যের সেই দিকটি এখানে সংক্ষেপে আলোচ্য। সে-বিষয়ে দু'এক কথা বলে নিয়েই এ অধ্যায় শেষ করা যাবে। তবে, সংক্ষিপ্ত হলেও এখানে এ আয়োজন এ-প্রসঙ্গে একটু বিস্তৃত মনে হ'তে পারে। তাই পাঠকের ধৈর্য ভিক্ষা ক'রে কথাটার মূল দিকটিতেই নজর দেওয়া যাক।

'অবকাশরঞ্জিনীর' সমালোচনা লিখতে গিয়ে 'গীতিকাব্য' প্রবন্ধে তিনি গীতিকাব্যের এই সংজ্ঞা দিয়েছিলেন যে—'গীতের যে উদ্দেশ্য, যে কাব্যের সেই উদ্দেশ্য, তাহাই গীতিকাব্য। বক্তার ভাবোচ্ছ্বাসের পরিস্ফুটতামাত্র যাহার উদ্দেশ্য, সেই কাব্যই গীতিকাব্য।' ভারতচন্দ্রের রসমঞ্জরী, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা, হেমচন্দ্রের কবিতাবলী—এইগুলিকেই তিনি সেকালের উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য বলেছিলেন। যে বাক্য ব্যক্তব্য, সেইটুকুই নাট্যকারের সীমা,—'যাহা অব্যক্তব্য, তাহাতে গীতিকাব্যকারের অধিকার।'—এ তাঁরই কথা। বিবিধ প্রবন্ধের প্রথম খণ্ডে তাঁর এই লেখাটি ছাড়া উত্তরচরিতের সুদীর্ঘ সমালোচনা,—'প্রকৃত এবং অতিপ্রকৃত', 'বিদ্যাপতি ও জয়দেব', 'দ্রৌপদী', 'অনুকরণ', 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রভৃতি কাব্যসাহিত্য-সম্পর্কিত আরো কয়েকটি প্রসিদ্ধ রচনা দেখা যায়। সংস্কৃত সাহিত্যে, ইংরেজি সাহিত্যে এবং তাঁর সমকালীন বাংলা কাব্য-কবিতা সম্বন্ধে তাঁর এইসব

মতামতের মধ্যে তাঁর কবিদৃষ্টির দ্রষ্টব্য বিশেষত্বটুকু নিহিত। এখানে এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। এখানে শুধু একটি মাত্র দৃষ্টান্ত নিয়ে,—সমকালীন বাংলা কবিতার আস্বাদন-সামর্থ্যে তিনি যে সত্যিই কিছু স্বকীয়তার প্রমাণ রেখে গেছেন, সেই কথাই স্মরণীয়।

বায়রনের প্রসিদ্ধ একটি কবিতা অনুবাদ ক'রেছিলেন 'ভারতী'-দলের কবি কিরণধন চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সে-অনুবাদ বেরিয়েছিল ১৩৩০ সালের পৌষ সংখ্যার 'বঙ্গবাণীতে'। কিরণধনের সে-অনুবাদ একালের পাঠক হয়তো ভুলে গেছেন, হয়তো তাঁদের চোখে পড়েনি। তাই সেটি এখানে তুলে দেওয়া গেল:

নেই কোন ফল ইতিহাসের পাতায় বেঁচে যশ নিয়ে
যৌবনেরি দিনগুলি সব লেখা সোনার জল দিয়ে;
চাইনে যশের হিরের মুকুট—নই মনে যশ-ধন-কামী
প্রিয়ার হাতের ফুলের মালা এদের চেয়ে ঢের দামী।

বুড়োর মাথায় ফুলের মুকুট পরালে কি খাপ খাবে?
শিশির ছিটে লাগলে মরা ফুল কি ফিরে প্রাণ পাবে?
পক্ক কেশের উপর থেকে দাও তা ফেলে টান মেরে
নিছাঁক শুধু যশের তরে যশের মালা চায় কে রে?

ও খ্যাতি তোর প্রশংসাবাদ শুনেই শুধু গাল ভরা
আনন্দ পাই ভাবিস যদি মস্ত যে তোর ভুল করা,
আনন্দ পাই যখন উজল প্রিয়ার আমার দুচোখ গো
বলতে থাকে নেহাত আমি নইক প্রেমের অযোগ্য।

সেথাই তারে বিশেষ করে খোঁজ কবি আর পাই খুঁজে
তোরে ঘেরা কিরণ সেরা হানে প্রিয়ার চক্ষু যে,
আমার গুণে মুগ্ধ হয়ে উজল যবে হয় আঁখি
বুঝি মনে প্রেম ত ইহাই গৌরবেরো নেই বাকি।

এই যৌবন-বন্দনার আবেগের সঙ্গে কবি বায়রনের [১৭৮৮-১৮২৪] নাম অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। ইংরেজি সাহিত্যে যাঁরা বিশেষ অধিকারী, সেই রকম নানা মনীষী একবাক্যে বলেছেন যে, বায়রনের মতন প্রভূত প্রাণ-শক্তিময় মানুষ সত্যিই বিরল। কিন্তু নিজের শক্তিকে তিনি কখনোই যেন পুরোপুরি অধিকার ক'রতে পারেন নি। কেমন যেন দ্বৈতসত্তার আবেশ ছিল তাঁর মধ্যে—কেমন যেন শান্তির অভাব! এক দিক থেকে তিনি তাঁর

জীবনের দুঃখবোধকে যেমন এক ব্যক্তিগত গৌরবের বিষয় ব'লে বর্ণনা ক'রেছেন, অন্যদিকে আবার তাঁর রচনায়, সেই দুঃখে ভেঙে পড়বার নমুনাও বিরল নয়। আত্মশোচনায় তিনি নিত্য উদ্যোগী। তিনি যেমন আবেগধন্য, তেমনি বিষাদক্ষুব্ধ! তাঁর সমালোচকরা—তাঁর কাব্যে প্রাচীন লেখকদেরও প্রভাব লক্ষ্য ক'রেছেন, আবার, পোপ ও পোপের গোষ্ঠীর প্রভাবও তিনি পুরোপুরি পরিহার ক'রতে পারেননি ব'লে শোনা যায়। আঠারো শতকের ইংরেজি কবিতার দিকে প্রথম যৌবনে তিনি খুবই উন্মুখ ছিলেন। উনিশ শতকের রোমান্টিক কবিদলেরই অন্তর্ভুক্ত তিনি; তবু সে-দলের ওয়ার্ডস্বার্থ প্রভৃতি নেতৃস্থানীয় কবিদের বিরুদ্ধে তাঁর কঠোর মন্তব্যও ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ব্যাপার। শেলির তীব্র ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ তিনি এড়িয়ে চলতে পারেন নি, কিন্তু কাব্যের পূর্বাগত প্রথা তিনি নিজে কখনোই পরিত্যাগ করেন নি,—এই ছিল তাঁর আত্মধারণা! সমালোচকরা একথাও বলেছেন যে, ইংরেজি কাব্যে ইতিহাসে বায়রন যতটা পরিতৃপ্ত, যতটা অনুকরণকারী কবি, সে-পরিমাণে মৌলিক স্রষ্টা নন। তাঁর পিতা ছিলেন ইংরেজ, জননী একজন স্কচ মহিলা। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে লর্ড হন,—হ্যারোতে, কেম্ব্রিজে তাঁর ছাত্রজীবন কাটে। ১৮০৭-এ তাঁর প্রথম কবিতার বই "আওয়ারস অফ আইডলনেস্' ছাপা হয়। 'এডিনবারা রিভিয়ু' পত্রিকায় তাঁর এক বিরুদ্ধ সমালোচনা ছাপা হওয়ায় ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দে 'ইংলিশ বার্ডস্ এণ্ড স্কচ রিভ্যুয়াস" নামে তিনি এক ব্যঙ্গরচনা লিখে ফেলেন। তারপর স্পেন ও অন্যান্য পূর্বাঞ্চলে ভ্রমণ শেষ ক'রে ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁর সুপ্রসিদ্ধ কাব্য 'চাইল্ড্ হ্যারল্ডের' প্রথম দুটি সর্গ প্রকাশ করেন। অতঃপর আরো সব রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮১৫তে তাঁর বিবাহ হয়; ১৮১৬তে তাঁর স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ ক'রে যান। কলঙ্কে, যন্ত্রণায়,—নানা কারণে, বায়রন অতঃপর সুইজারল্যাণ্ডে যান,—ভেনিসে বাস করেন,—র‍্যাভেন্নাতেও ছিলেন। ১৮২২-২৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গ্রীসের স্বাধীনতার জন্যে লড়েন! বায়রন যে প্রাণশক্তিতে ভরপুর মানুষ ছিলেন, তাঁর জীবনের এই সব ঘটনাই তার সমুচিত প্রমাণ। তাঁর 'ডন জুয়ান' [১৮১৯-২৪] কাব্যের নাম জগৎ-বিখ্যাত।

বাংলা কবিতার ইতিহাসে উনিশ শতকের শেষার্ধে নবীনচন্দ্র সেন [১৮৪৭ —১৯০৯] ছিলেন এই বায়রনের ব্যক্তিত্বগৌরব-সমৃদ্ধ কবি। সে-কালের সমালোচকদল তাঁকে বাংলার বায়রন ব'লে মেনে নিয়েছিলেন। বর্তমান

শতাব্দীর প্রথম দিকে 'বঙ্গবাসী প্রেস' থেকে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের 'বঙ্গভাষার লেখক' বেরিয়েছিল [১৩১১ সাল]। নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে হরিমোহন তাঁর কবিপ্রতিভার উল্লেখ করেন নি, শুধু তাঁর তেরটি গদ্য-পদ্য রচনার কথা ব'লে গেছেন। তাঁর সে-বই প্রধানতঃ লেখকদের জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য জীবনী-তথ্যে পূর্ণ। নবীনচন্দ্রের উৎসাহী অনুরাগী ছিলেন হীরেন্দ্রনাথ দত্ত। তাঁর আলোচনা প্রসিদ্ধ। তাছাড়া বীরেশ্বর পাঁড়ের আক্রমণসর্বস্ব বই আছে নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে। শিবনাথ শাস্ত্রী ছিলেন তাঁর কবি-জীবনের প্রথম পর্বের আদর্শ। বায়রনের 'আওয়ারস্ অফ আইডলনেস' গ্রন্থনামের প্রতিধ্বনি অনুভব করা যায় নবীনচন্দ্রের প্রথম বইখানির নামে। সেই 'অবকাশ-রঞ্জিনী'তেই তাঁর স্বভাবগত আত্মম্ভরিতা চোখে পড়ে। তিনি যে একজন বড় কবি,—তাঁকে যে সকলেই সুকান্তি মনে করেন, এই ধরনের নানা ধারণা ও মন্তব্যের সাক্ষ্য-প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর 'আমার জীবন' গদ্যরচনায়। বাংলায় তিনিই প্রথম খণ্ড-কবিতা লিখে গেছেন, তাঁর এ-দাবিও ভ্রান্ত। ডক্টর সুকুমার সেন দেখিয়েছেন যে, শিবনাথ, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, বিহারীলাল প্রভৃতি সে-কালের নানা কবির প্রভাবাধীন তিনি। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ কাব্য রৈবতক, কুরুক্ষেত্র ও প্রভাস—এক বন্ধনে তিনখানির নাম 'ত্রয়ীকাব্য'। সে-কাব্যে তিনি যথাক্রমে সুভদ্রা-হরণ, অভিমন্যু-বধ ও যদুবংশ-ধ্বংসের কথা অবলম্বন ক'রে গীতার নিষ্কাম কর্মবাদের ভিত্তিতে আর্য-অনার্যের মিলন ও অখণ্ড হিন্দু-সংস্কৃতির সম্প্রসারণ কামনা ক'রেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণতত্ত্ব বুঝিয়ে গেছেন উনিশ শতকের চতুর্থ পাদে,—নবীনচন্দ্রের আসল প্রেরণা ছিলেন তিনিই। সেই ত্রয়ী কাব্যের অনেক আগে, কতকটা বোধ হয় রঙ্গলালের পদ্মিনী-উপাখ্যানের ধারায়—নবীনচন্দ্রের একখানি গাথাকাব্য বেরিয়েছিল—'পলাশীর যুদ্ধ' [১৮৭৬]। বায়রনের প্রভাব ছিল সে কাব্যে। এবং এখানে 'প্রভাব' মানে প্রায় অনুবাদ, অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী ব'লেছেন, 'চাইল্ড হ্যারল্ড'এর আক্ষরিক অনুবাদই 'পলাশীর যুদ্ধের' অনেক জায়গায় চোখে পড়ে। কিছু উদ্দীপনা, কিছু আত্মম্ভরিতা—এই দুটি দিক ছাড়া বায়রনের সঙ্গে নবীনচন্দ্রের তৃতীয় যে মিল, সে কেবল ঐ 'অবকাশরঞ্জিনী' গ্রন্থ নামে। এ মন্তব্য নবীনচন্দ্রের অনুরাগী পাঠকদের হয়তো ভালো লাগবে না; কিন্তু ইতিহাসের সত্য রক্ষার জন্যে এসব কথা সমুচিত সতর্কতার সঙ্গে ভেবে দেখা দরকার। ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে শশাঙ্কমোহন সেনের 'বঙ্গবাণী' বেরিয়েছিল।

নবীনচন্দ্র সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশংসার কথা ব'লে তিনি ঠিকই বলেছিলেন যে, নবীনচন্দ্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কবির গাম্ভীর্যও ছিল না, আর, তাঁর শিল্প-সংযমও বিরল।

এতৎসত্ত্বেও একথা মানতেই হয় যে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাঠকরা, এমন কি কবিরাও তাঁদের সমকালীন কবিদের সম্বন্ধে অভ্রান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন না। রবীন্দ্রনাথ তাঁর একখানি চিঠিতে সে-কালে নবীন-চন্দ্রকে জানিয়েছেন—'আপনি নবীন কবি, আমি নবীনতর। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের ঐতিহাসিক পর্যায় রক্ষা করিয়া আপনার নিম্নে আমার নাম লিপিবদ্ধ হইয়াছে। অতএব সর্বসম্মতিক্রমে আপনার নামের নিম্নে নাম স্বাক্ষর করিবার অধিকার আমি প্রাপ্ত হইয়াছি—আশা করি ইতিহাসের শেষ অধ্যায় পর্যন্ত এই অধিকারটি রক্ষা করিতে পারিব।'

রবীন্দ্রনাথ হয়তো তাঁর স্বভাববশেই সমকালীন কবির সম্বন্ধে এই বিনয় প্রকাশ ক'রে গেছেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র নিজে যদিও কবিখ্যাতিতে ঊর্ধ্ববর্তী নন, তবু ১২৮২ সালের কার্তিক সংখ্যার 'বঙ্গদর্শনে' তিনি নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' সম্বন্ধে যা লিখেছিলেন, সে-সব কথা তাঁর সমুচিত বিবেচনারই নিদর্শনবাহী। তিনিই প্রথম নবীনচন্দ্রকে বায়রনের প্রতিধ্বনি ব'লে অনুভব করেন। বায়রনের উদ্দীপনা ও জ্বালাবোধটুকু বিশেষভাবে স্মরণ ক'রিয়ে দিয়ে, নবীনচন্দ্রের সেই স্বধর্মের সাদৃশ্য দেখিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। স্বদেশবাৎসল্য প্রকাশে, বর্ণনাশক্তিতে নবীনচন্দ্র বায়রনের স্মারক! এই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের অভিমত। বর্ণনাশক্তির উদাহরণ দিতে গিয়ে, তিনি 'পলাশীর যুদ্ধের' ক্লাইভের নৌকারোহণ প্রসঙ্গটি উল্লেখ করেন। স্নেহাস্পদ নবীন লেখকের সমালোচনাসূত্রে তো বটেই, তা ছাড়া সেকালের স্বদেশ-বাৎসল্যের কাব্য-উদ্দীপনার, এবং বিশেষ পরিস্থিতি বর্ণনার সাফল্য দেখাতে গিয়ে তিনি বুঝেছিলেন যে, আমাদের অধিগম্য ক্ষেত্রের সীমানা ছিল ঐ 'পলাশীর যুদ্ধ' অবধি। তবু বঙ্কিমচন্দ্র আসল কথার ইশারা দিয়ে যেতে কুণ্ঠিত হন নি। তাঁর সেই ইশারাটুকু এইবার স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি লিখেছিলেন :

> 'বাইরনের ন্যায় বর্ণনায় নবীনবাবু অত্যন্ত ক্ষমতাশালী। বাইরনের ন্যায়, তাঁহারও শক্তি আছে যে, দুই চারিটি কথায়, তিনি উৎকৃষ্ট বর্ণনার অবতরণ করিতে পারেন। ক্লাইবের নৌকারোহণ ইহার দৃষ্টান্তস্থল। কিন্তু অনেক সময়েই, নবীনবাবু সে প্রথা পরিত্যাগ করিয়া, বর্ণনায় অনর্থক কালহরণ করেন।

যাহাই হউক, কবিদিগের মধ্যে নবীন বাবুকে আমরা অধিকতর উচ্চ আসন দিতে পারি না পারি, তাঁহাকে বাঙ্গালার বাইরন বলিয়া পরিচিত করিতে পারি'।

কিরণধনের অনুবাদ কবিতাটি পুনর্বার মনে পড়ে। ধরা যাক, রবীন্দ্রনাথ জন্মাননি। তিনি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত! সে অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র যদি তাঁর নিজের কালের আরো বছর ষাটেক পরে সে-বই সমালোচনা ক'রতেন,—অর্থাৎ নবীনচন্দ্রের চেয়ে বয়সে অনেক ছোট হয়ে, নবীনচন্দ্রের মৃত্যুর [১৯০৯] পরে,—'ভারতী' দলের মোহিতলাল মজুমদার, হেমেন্দ্রকুমার রায়—এবং তাঁদেরই সমকালীন নবধারার প্রবর্তক নজরুল ইসলামের আমলে তিনি যদি 'পলাশীর যুদ্ধ' কাব্যটি প্রথম পড়বার সম্ভাবনায় অবতীর্ণ হ'তেন, তাহ'লে তিনি বোধ হয়, এঁদেরই বলতেন 'বাঙ্গলার বাইরন';—নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' থাকতো রঙ্গলালের 'পদ্মিনী উপাখ্যানের' সঙ্গেই ধূলিমলিন অতীতে নিমজ্জিত! এবং যে তিন জনের নাম করা গেল, তাঁরা কেউই নবীনচন্দ্রকে মনে রেখে কবিতা লিখতে উদ্যোগী হননি। অর্থাৎ নবীনচন্দ্র যে পরিমাণে বায়রনের স্মারক ছিলেন, সেটুকু বায়রনী ভাব তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই বাংলা কাব্যের আসর পরিত্যাগ ক'রেছে। বঙ্কিম সেইটুকু ব'লেছিলেন। কবিতার আস্বাদনে তিনি যে কেবলমাত্র ঈশ্বরগুপ্তের শিষ্য ছিলেন না, তিনি যে বিস্তীর্ণতর কাব্যলোকে বিচরণ ক'রে গেছেন,—তাঁর নিজস্ব অধিকারের সেই দিকটি দেখিয়ে দেওয়াই এ-আলোচনার উদ্দেশ্য।

অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের কথা-সাহিত্যের কথা।

কথাসাহিত্যের ধারা

প্রথম পর্ব :

দুর্গেশনন্দিনী থেকে কৃষ্ণকান্তের উইল

১৮৬৫তে 'দুর্গেশনন্দিনী', পরের বছর 'কপালকুণ্ডলা,'—১৮৬৯-এ 'মৃণালিনী', ১৮৭৩-এ 'বিষবৃক্ষ' এবং 'ইন্দিরা,'—১৮৭৪-এ 'যুগলাঙ্গুরীয়,'—১৮৭৫-এ 'চন্দ্রশেখর' আর 'রাধারাণী,'—১৮৭৭-এ 'রজনী,'—১৮৭৮-এ 'কৃষ্ণকান্তের উইল,' —এই পর্যন্ত ছোটো-বড়ো দুরকম রচনা মিলিয়ে মোট এই দশখানি উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রবাহের সূচনা থেকে পরিণতির পর্ব ধরা যেতে পারে। তারপর বছর চারেকের একটি ছেদ চোখে পড়ে। ১৮৮২তে তাঁর 'রাজসিংহ' বের হয়। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ তাঁর মৃত্যুর আগের বছর 'রাজসিংহে'র 'পুনঃপ্রণীত' চতুর্থ সংস্করণ ছাপা হয়। যে-বছর 'রাজসিংহ' প্রথম সংস্করণ আত্মপ্রকাশ করে, সেই ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দেই তাঁর 'আনন্দমঠ' প্রকাশিত হয়। তার দুবছর পরে, ১৮৮৪তে 'দেবীচৌধুরাণী',—এবং 'দেবীচৌধুরাণী'র তিন বছর পরে তাঁর শেষ উপন্যাস 'সীতারাম' বই হ'য়ে বেরোয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' যখন লেখা হয়, তখন তাঁর বয়স ছিল পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর। তার আগেও তিনি নাকি দু'একটি গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন। তাঁর ইংরেজি উপন্যাস 'রাজ-মোহন্‌স্ ওয়াইফ' 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের দু'বছর আগে লেখা হয়। ডক্টর হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত লিখেছেন যে, আঠারো বছর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র একটি ছোট্ট গল্প লিখেছিলেন এবং 'দুর্গেশনন্দিনী'র আগে তিনি দুখানি উপন্যাস লেখেন।[১] কিন্তু সে পূর্বকথা এখন স্থগিত থাক। সে-সব আদি রচনা দুষ্প্রাপ্য নয়, সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন! 'দুর্গেশনন্দিনীর' আগে বাংলা কথা-সাহিত্যে আদি-প্রবর্তকদের মধ্যে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্যারীচাঁদ মিত্র, মধুসূদন মুখোপাধ্যায়, শ্রীমতী মুলেন্স ইত্যাদি লেখক-লেখিকার নাম প্রসিদ্ধ। ইতিহাসের কীর্তিকথার তালিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের নাম এক্ষেত্রে কয়েকজনের পরে ব'সলেও বাংলা উপন্যাসে প্রথম বিস্ময়কর আবির্ভাবের স্মৃতি অনুসন্ধান ক'রলে তাঁর নামই সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তিনি যে পাঠককে বিস্মিত করেন এবং নিজে বিস্মিত হ'তে ভালোবাসেন,

১। 'বঙ্কিমচন্দ্র' প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড,—যথাক্রমে ১৮৯-৯০ ও ১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সে-কথা তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই প্রথম সুচিহ্নিত ব'লে চেনা গিয়েছিল। ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁর প্রথম ঔৎসুক্যময় সাহিত্য-শিক্ষানবিশী পর্ব উদ্‌যাপিত হয়, সে কথা আগেই বলা হ'য়েছে। তারপর ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি 'এডুকেশন গেজেটে' লিখেছেন। ১৮৬৪তে কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান ফিল্ড্' পত্রিকায় তাঁর ইংরেজি উপন্যাস 'Rajmohon's Wife' বেরিয়েছে ধারাবাহিকভাবে। কিন্তু ইংরেজি থেকে অচিরেই তিনি মাতৃভাষার আসরে সরে আসেন। ১৮৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে—অর্থাৎ ইংরেজি উপন্যাস রচনার সমকালেই খুলনায় বাস করবার সময়ে 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখা আরম্ভ হয়।

মুর্শিদাবাদ বহরমপুরে থাকতে থাকতে বাংলার সমাজ, ইতিহাস, লোক-উৎসব ও লোক-সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর তথ্যানুসন্ধান-প্রধান অনুশীলনের দু'একটি নজির দেখা দেয়। ১৮৬৯এ বহরমপুরে যাবার আগেই কলকাতায় 'বেঙ্গল সোশ্যাল সায়ান্স অ্যাসোসিয়েশনে' On the Origin of Hindu Festivals' সম্বন্ধে তিনি এক প্রবন্ধ পাঠ করেন; ১৮৭০-এ 'A Popular Literature for Bengal' পড়া হয় সেই প্রতিষ্ঠানেরই পরবর্তী এক অধিবেশনে; ১৮৭১-এ 'ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় তাঁর 'Bengali Literature' প্রবন্ধ ছাপা হয়; ১৮৭২-এর ডিসেম্বরে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের 'মুখার্জিস্ ম্যাগাজিন'-এ তাঁর লেখা 'The Confessions of a Young Bengal' প্রকাশিত হয়।

'দুর্গেশনন্দিনী' আর 'কপালকুণ্ডলা'র পরেই ১৮৬৯-এ 'মৃণালিনী' প্রকাশের সময় থেকে 'যুগলাঙ্গুরীয়' প্রকাশ অবধি প্রায় ছ'বছর তিনি বহরমপুরে ছিলেন। 'রাশভারী' বঙ্কিমচন্দ্র যে বহরমপুরেই নানা সুধী সাহিত্যানুরাগীর সংস্পর্শে যথার্থ 'সামাজিক' হ'য়ে ওঠেন, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল সে-কথা একালে স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন।[২] ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সেই বহরমপুর থেকেই প্রথম 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শন' ভবানীপুরে

২। বঙ্কিম-রচনাবলী : সাহিত্য-সংসদ ; প্রথম খণ্ড [আশ্বিন ১৩৬০] ভূমিকা 'বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়' পৃঃ ১৬ দ্রষ্টব্য। বহরমপুরে সে-সময়ে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিমণ্ডলভুক্ত ছিলেন যাঁরা, তাঁদের মধ্যে যোগেশচন্দ্র এঁদের নাম করেছেন—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রামদাস সেন, লালবিহারী দে, রামগতি ন্যায়রত্ন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, লোহারাম শিরোরত্ন, গঙ্গাচরণ সরকার, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, বৈকুণ্ঠনাথ সেন, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।

প্রথম ছাপা হোতো। তারপর বঙ্কিমের অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে 'বঙ্গদর্শন প্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। অতঃপর সেখান থেকেই 'বঙ্গদর্শন' ছাপা হ'তে থাকে।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-প্রবাহে যে দুটি পর্ব-বিভাগের ধারণা মনে রেখে এই আলোচনা শুরু করা গেল, সেই দুই পর্বেই—অর্থাৎ ১৮৬৫ থেকে ১৮৭৮ পর্যন্ত প্রথম পর্বেও যেমন, ১৮৮২ থেকে ১৮৮৭ পর্যন্ত দ্বিতীয় পর্বেও তেমনি—তিনি ছিলেন ইতিহাস-অনুসন্ধানী, সমাজ-নিরীক্ষাপটু লেখক। এই বিশেষ দৃষ্টি নিয়েই তিনি উপন্যাসের আসরে প্রবেশ করেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র রোম্যান্স-লক্ষণ সম্বন্ধে সমালোচকরা অনেক আলোচনা ক'রেছেন। কাহিনী শুরু ক'রে প্রথমেই তিনি এক বিস্ময়কর দৃশ্য দেখিয়েছেন। বাংলা উপন্যাসে,—তাঁর নিজের একটি বিশেষণ ব্যবহার ক'রে বলা যেতে পারে—সে যেন বিদ্যুদ্দীপ্তিপ্রদর্শিত পথ !

'দুর্গেশনন্দিনী'র রচনাকাল ১৮৬২-৬৪। বঙ্কিমচন্দ্রের বয়স তখন চব্বিশ থেকে ছাব্বিশ বছর। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার যে বিবরণ দিয়েছেন[৩] তা থেকে জানা যায় যে, তাঁদের 'খুল্লপিতামহ' বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁদের ছেলেবেলায় গল্প শোনাতেন। বাংলার মুসলমান রাজত্বের শেষ অবস্থার এই সব গল্পের মধ্যেই বঙ্কিম প্রথম গড়মান্দারণের ঘটনা শুনেছিলেন। তাঁদের 'মেজ-ঠাকুরদাদা' মাঝে মাঝে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যেতেন। মান্দারণ গ্রাম জাহানাবাদ আর বিষ্ণুপুরের মধ্যবর্তী। মেজ-ঠাকুরদা সেই গ্রামে ঐ কাহিনী শুনেছিলেন। তিনি সেখানকার প্রাচীন গড় এবং প্রাসাদেরও ভগ্নাবশেষ দেখেছিলেন। পূর্ণচন্দ্রের কথায়—"তাঁহারই মুখে প্রথম শুনি যে, উড়িষ্যা হইতে পাঠানেরা মান্দারণ গ্রামের জমিদারীর পুরী লুটপাট করিয়া তাঁহাকে ও তাঁহার স্ত্রী ও কন্যাকে বন্দী করিয়া লইয়া যায়, রাজপুত কুলতিলক কুমার জগৎসিংহ তাঁহাদের সাহায্যার্থ প্রেরিত হইয়া বন্দী হইয়াছিলেন।' আঠার উনিশ বছর বয়সে বঙ্কিম এ কাহিনী প্রথম শোনেন।

'দুর্গেশনন্দিনী' কাহিনীর সঙ্গে স্কটের 'আইভান হো'-র সাদৃশ্যের কথা সুপরিচিত। কেউ কেউ মনে করেন, স্কটের 'আইভান হো'র ছায়া অবলম্বনেই বঙ্কিম তাঁর এ বইখানি লিখেছিলেন। সেকালের 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকায়

৩। প্রাসঙ্গিক অংশ 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' বইখানির ৪৯-৫০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশের পরে এ বিষয়ে কিছু আলোচনাও হ'য়েছিল। কিন্তু তাঁর নিজের কথা এই যে, দুর্গেশনন্দিনী লেখার আগে তিনি 'আইভান হো' পড়েন নি। যখন দুর্গেশনন্দিনী লেখা হয়, প্রাচীন ইতিহাসের অনেক তথ্যই তখন আমাদের অজ্ঞাত ছিল। প্রচলিত ইতিহাসের ওপর নির্ভর ক'রে তিনি তাঁর এ-কাহিনী রচনা করেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এ-উপন্যাসের ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে জানিয়েছেন :

"মানসিংহ, জগৎসিংহ, কুৎলু খাঁ, খাজা ইসা, উসমান—ইহারা সকলেই ঐতিহাসিক পুরুষ এবং সে যুগে বঙ্গের ঠিক সেই স্থলে বাস করিতেন। ইহাও সত্য ইতিহাস যে, জগৎসিংহ অগণিত পাঠানদের নিকট পরাজিত হইয়া এক দুর্গে আশ্রয় লন এবং তাহার কিছুদিন পরেই কুৎলু খাঁর মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার দেওয়ান খাজা ইসা কুৎলুর বালক পুত্রদের রাজ্য বাঁচাইবার জন্য মানসিংহের সঙ্গে দেখা করিয়া বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া সন্ধি করেন। ইহা ভিন্ন দুর্গেশ-নন্দিনীর আর সব কথা কাল্পনিক। এই সন্ধিতে জগৎসিংহ মধ্যস্থ ছিলেন না। তবে বঙ্কিম কি বাকী সব ঐতিহাসিক দৃশ্যপট নিজ কল্পনা হইতে সৃষ্টি করিয়াছেন! আয়েষা, তিলোত্তমা, বিমলা সকলেই কাল্পনিক। একথা পাঠক সহজেই ধরিয়া ফেলিবেন, এবং তাহাতে কিছু আসে যায় না। কিন্তু জগৎসিংহ আহত হওয়া, কুৎলুর দুর্গে আবদ্ধ থাকা, এবং তাহার দ্বারা কুৎলুর মরণকালে সন্ধি ভিক্ষা করা, এই শাখা পল্লবগুলি ইতিহাসের বাহিরে হইলেও বঙ্কিমের নিজ কল্পনার সৃষ্টি নহে।

এগুলি আসিয়াছে ঐতিহাসিক নামজাদা একজন ঘোর কাল্পনিক সাহেবের লেখা হইতে, তিনি কাপ্তান আলেকজাণ্ডার ডাও (Captain Alexander Dow) এই সাহেবটি ফিরিস্তার রচিত হিন্দুস্থানের ইতিহাস ইংরাজিতে প্রায়শঃ অনুবাদ করিয়া দিতেছেন বলিয়া এবং নিজগ্রন্থের নামপত্রে ফিরিস্তার নাম সংযোগ করিয়া দিয়া অপর্যাপ্ত মেকী কথা চালাইয়াছেন, যাহা ফিরিস্তাতেও লেখেন নাই; এমনকি, কোন পারসিক লেখকের পক্ষে সেরূপ লেখাও সম্ভব ছিল না।"

'দুর্গেশনন্দিনীর' পাণ্ডুলিপি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের জামাতা তারাপ্রসাদ

চট্টোপাধ্যায় এবং সেকালের প্রসিদ্ধ সমালোচক ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য প্রথম প'ড়ে দেখেছিলেন। বইখানি প'ড়ে ক্ষেত্রনাথ বঙ্কিমের অবশ্যম্ভাবী প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাণ্ডুলিপি বঙ্কিম নিজে যাঁদের প্রথম প'ড়ে শোনান, তাঁদের প্রতিক্রিয়ার বৈচিত্র্য এর আগেই উল্লেখ করা হ'য়েছে।[৪]

'দুর্গেশনন্দিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-ধারার কয়েকটি স্থায়ী বা প্রধান প্রধান লক্ষণ দেখা যায়—যেমন প্রকৃত বা কল্পিত ইতিহাসের সুদূর কালে কাহিনীর উপস্থাপনা,—ক্ষণে ক্ষণে পাঠকের সঙ্গে তাঁর একতরফা আলাপ,—তাঁর কবিত্বের ভঙ্গি,—তৎসম সমাসবদ্ধ শব্দে ক্ষণে ক্ষণে প্রকৃতি বা মানুষের রূপবর্ণনা,—অভিরাম স্বামীর মধ্যে তাঁর পরবর্তী নানা উপন্যাসের সাধু-সন্ন্যাসী ও ছদ্মবেশী চরিত্রের পূর্বাভাস,—জ্যোতিষ-বিচারে তাঁর আগ্রহ,—নায়ক-নায়িকা বা অন্যান্য চরিত্রের পত্র-রচনা, এবং চিঠিতে আত্মপরিচয় দান,—এখানে যেমন দ্বিতীয় খণ্ডে বিমলার পত্র,—প্রতি পরিচ্ছেদে শিরোনাম ব্যবহার ইত্যাদি। প্লটের দিকে তাঁর বিশেষ নজর ছিল। এ-উপন্যাসে সে-আগ্রহও চোখে পড়বার মতন।

ভূদেবের 'ঐতিহাসিক উপন্যাসে'র পরে প্রকাশিত হ'লেও 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকেই বাংলায় ঐতিহাসিক উপন্যাসের উল্লেখযোগ্য স্থষ্টি-কর্মের সূত্রপাত; একথা শ্রীযুক্ত অপর্ণাপ্রসাদ সেনগুপ্তের 'বাঙ্গালা ঐতিহাসিক উপন্যাস' [১৩৬৭] বইখানিতেও বলা হ'য়েছে। ১৮৭২-এ, অর্থাৎ দুর্গেশনন্দিনী বই হয়ে বেরিয়ে যাবার সাত-আট বছর পরে 'বঙ্গদর্শন' প্রকাশিত হ'লে যখন সেই পত্রিকায় 'বিষবৃক্ষ' ধারাবাহিক ভাবে ছাপা হতে থাকে, তখন থেকে, শুরু ক'রে তাঁর তিরোধানের সময় অবধি, প্রায় দুটি পুরো দশকের মধ্যে তিনিই যে বাংলা সাহিত্য-জগতের সর্ববরেণ্য নেতা ছিলেন, সে-কথা সুপরিচিত। বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠী তাঁরই ব্যক্তিত্বে এবং রচনা-শক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে সংঘবদ্ধ হন। এই সময়ে তাঁর সাক্ষাৎ প্রেরণায় যাঁদের আবির্ভাব ঘটে, রমেশচন্দ্র দত্তের নাম সেই সব ঔপন্যাসিকদের মধ্যে গণ্য। রমেশচন্দ্র নিজে সে কথা জানিয়ে গেছেন।[৫] শ্রীযুক্ত অপর্ণাপ্রসাদ

৪। এই গ্রন্থের চতুর্থ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

৫। রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁর 'The Literature of Bengal'-এ লিখে গেছেন: 'It was in 1872, when the *Banga Darsan* was started, that Bankimchandra suggested to me to write in Bengali tongue. As the incident throws some light on Bankimchandra's zeal for his country's literature, the reader will pardon my

সেনগুপ্ত পূর্ববর্তী আলোচকদের মন্তব্য অনুসরণ ক'রেই স্কটের কথা-প্রসঙ্গে লিখেছেন যে, ঐতিহাসিক উপন্যাসের লক্ষণ ব'লতে বোঝায় কল্পনা আর ইতিহাসের 'সুষ্ঠু সংমিশ্রণ'; বাংলায় ভূদেবের লেখাতেই প্রথম এ-আদর্শ আত্মপ্রকাশ করে; বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর ঐতিহাসিক উপন্যাসের ধারণা পরে পরিবর্তন করেন; রাজসিংহের চতুর্থ সংস্করণের [১৮৯৩] ভূমিকায় তিনি দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম, এই তিনখানি বইকে ঐতিহাসিক উপন্যাস ব'লে মানেন নি; অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার সেন প্রভৃতির পরিচিত মতামত তুলে দিয়ে তিনি পূর্বোক্ত 'সুষ্ঠু সংমিশ্রণ' ব্যাপারে আলোকপাতের উদ্দেশ্যেই 'ইতিহাস' পত্রিকার প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যায় [জৈষ্ঠ ১৩৫৮] প্রকাশিত সুকুমার বাবুর এই মন্তব্য তুলে দিয়েছেন যে—'গল্পরসের স্বাদের উপরই উপন্যাসে ঐতিহাসিকত্ব অনৈতিহাসিকত্ব নির্ভর করে।' সাহিত্য-সৃষ্টির আবেদনের দিক থেকে এ মন্তব্য শিরোধার্য। কিন্তু শুধু গল্পরসের সার্থক স্বাদের কথাটাই যথেষ্ট নয়। এ বিষয়ে উপযুক্ত নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে ঐ বইয়েতেই উদ্ধৃত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের উক্তি থেকে। 'বিংশ শতাব্দী' পত্রিকার ১৩৬৩ সালের শারদীয় সংখ্যা থেকে সে-মন্তব্য উদ্ধৃত হ'য়েছে—'যাহার যে চরিত্র তাহার মূল প্রকৃতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া গল্পাংশ

narrating it. Bankimchandra was a young Deputy Collector when my father, twenty years his senior, was an honoured and experienced Deputy Collector and was meditating retirement from service. Bankimchandra was often in the same district with my father, regarded him with the highest respect, and lamented his death, when my father died in the performance of public duty in 1861, like that of an elder and honoured relation.' ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে একদিন রমেশচন্দ্র বঙ্কিমচন্দ্রেরই উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছিলেন। কথায়-কথায় বঙ্কিম তাঁকে বাংলা সাহিত্যের লেখক হিসেবে যোগ দিতে অনুরোধ করেন। রমেশচন্দ্র বলেন যে, বাংলা স্টাইলে তাঁর কোনো অধিকার নেই। তখন বঙ্কিম তাঁকে বলেন—'Why? what a man of your education will write will be Bengali style, and your cultured feelings will do the rest!' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে এই কথাটি খুব জোরের সঙ্গে জানিয়ে দেন যে, বাঙালী লেখকদের বাংলাতেই লেখা উচিত। উদাহরণ উল্লেখ করে তিনি বলেন—'Your uncle Gobind Chandra and Sashi Chandra, and Madhusudan Datta were the best educated men of the Hindu College in their day. Govind Chandra and Sashi Chandra's English poems will never live, Madhusudan's Bengali poetry will live as long as the Bengali Language will live.'—'Cultural Heritage of Bengal' পর্যায়ে 'পুঁথি পুস্তক' থেকে প্রকাশিত [১৯৬২] তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৪৬-১৪৭ দ্রষ্টব্য।

সরল, সরস ও সহজে বোধগম্য করিবার জন্য অবান্তর বিষয়ের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন করিলে ইতিহাসের ক্ষতি নাই—সাহিত্যের বিলক্ষণ লাভ।'[৬]

১৮৭১-এ, ১৮৭৪-এ, ১৮৭৯-তে, এবং ১৮৮২-তে যথাক্রমে 'দুর্গেশনান্দিনী'র চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম ও নবম সংস্করণে বইয়ের নামপত্রে 'ইতিবৃত্তমূলক উপন্যাস' কথাদুটি ছাপা হ'য়েছিল।

তাঁর কথাসাহিত্যে মাঝে মাঝে কিঞ্চিৎ স্থূল হাস্যরসের আগ্রহও ব্যক্ত হ'য়েছে,—অবশ্য 'স্থূল' মানে এখানে কদর্য বা অমার্জিত' নয়। গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে এ-উপন্যাসে প্রথম দেখা যায় প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে। গড়মান্দারণে বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গ-প্রাসাদে বিমলা ছিলেন বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত। সেইখানেই অভিরাম স্বামীর শিষ্য গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজকে প্রথম দেখা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তার পরিচয় দিয়েছেন অল্প কয়েকটি কথায়—

> 'তাঁহার অলঙ্কারশাস্ত্রে যত ব্যুৎপত্তি থাকুক বা না থাকুক, রসিকতা প্রকাশ করার তৃষ্ণাটা বড় প্রবল ছিল। তিনি বিমলাকে দেখিয়া বলিতেন, 'দাই যেন ভাণ্ডস্থ ঘৃত ; মদন-আগুনে যত শীতল হইতেছে, দেহখানি ততই জমাট বাঁধিতেছে।'

বিমলা তাই তার নাম রেখেছিলেন 'রসিকরাজ রসোপাধ্যায়'! এসব ক্ষেত্রে উপন্যাসে গম্ভীর দৃশ্যের আগে-পরে সরসতা রক্ষার আয়োজনটাই প্রধান। একদিকে সরসতা রক্ষার এই চেষ্টা,—অন্যদিকে বিমলার মতন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্না, সুরসিকা রমণীর—রূপে, চাতুর্যে, প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উদাহরণে এবং কতকটা রহস্যময়তার সাহায্যে, কৌতূহল ও সরসতা সমন্বিত ক'রে তোলবার সামর্থ্য,—'দুর্গেশনন্দিনী'র এই দক্ষতাই তাঁর পরবর্তী কোনো কোনো উপন্যাসে অন্যভাবে পুনর্ব্যবহৃত হ'য়েছে।

বিমলার বয়স পঁয়ত্রিশ বছর। প্রথম খণ্ডের প্রথম ও দশম পরিচ্ছেদে এই উল্লেখটুকু চোখে পড়ে। মোগল-পাঠানের যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশের অস্থির অদৃষ্টের ভয়াবহতা আভাসিত ক'রে, কালবৈশাখীর ঝড়-বৃষ্টিতে দেবমন্দিরে আশ্রয়সন্ধানী দুটি রমণী এবং একটি অজ্ঞাতপরিচয় যোদ্ধবেশী যুবকের সাক্ষাৎ ঘটানো হ'য়েছে আদিতেই। প্রথম পরিচ্ছেদের এই সমাবেশে তিলোত্তমা, বিমলা,—আর মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ তিনজনেই উপস্থিত। তখন

৬। পৃষ্ঠা ৪, ৫, ৭

আকাশে মেঘ কেটে গেছে। গ্রীষ্মঋতুর মধ্যরাত্রি। যুবকের বয়স—'পঞ্চবিংশতি বৎসরের কিঞ্চিন্মাত্র অধিক হইবে।' মন্দির-রক্ষক প্রদীপ এনে দিয়েছে। সেই প্রদীপের আলোয় দেববিগ্রহের পশ্চাদ্ভাগে সেই দুটি রমণী-মূর্তিকে দেখা গেছে :

'যিনি নবীনা, তিনি দীপ দেখিবামাত্র সাবগুণ্ঠনে নম্রমুখী হইয়া বসিলেন। পরন্তু তাঁহার অনাবৃত প্রকোষ্ঠে হীরকমণ্ডিত চূড় এবং বিচিত্র কারুকার্যখচিত পরিচ্ছদ, তদুপরি রত্নাভরণপারিপাট্য দেখিয়া পান্থ নিঃসন্দেহে জানিতে পারিলেন যে, এই নবীনা হীন-বংশসম্ভূতা নহে। দ্বিতীয়া রমণীর পরিচ্ছদের অপেক্ষাকৃত হীনার্ঘতায় পথিক বিবেচনা করিলেন যে, ইনি নবীনার সহচারিণী দাসী হইবেন ; অথচ সচরাচর দাসীর অপেক্ষা সম্পন্না।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে জগৎসিংহ আত্মপরিচয় দিয়েছেন। এ পরিচয় চমকপ্রদ। লেখক জানিয়েছেন—'যদি তন্মুহূর্তে 'মন্দির মধ্যে বজ্রপতন হইত, তাহা হইলেও মন্দিরবাসিনী স্ত্রীলোকেরা অধিকতর চমকিত হইয়া উঠিতেন না।' মার্জিতভাষিণী, সুচতুরা বিমলা তখনি—'গলদেশে অঞ্চল দণ্ডবৎ হইলেন ; অঞ্জলিবদ্ধ করে কহিলেন, যুবরাজ! না জানিয়া সহস্র অপরাধ করিয়াছি, অবোধ স্ত্রীলোকদিগকে নিজ গুণে মার্জনা করিবেন।' এইবার জগৎ-সিংহ তাঁদের পরিচয় জানতে চেয়েছেন। কিন্তু বিমলা 'কোন বিশেষ কারণে নবীনার পরিচয় দিল্লীশ্বরের সেনাপতির নিকট দিতে সম্মতা ছিলেন না।' ইতিমধ্যে অনতিদূরে অশ্বের পদধ্বনি হ'য়েছে,—অশ্বারোহী অনুচরদের আসতে দেখে জগৎসিংহ ধরমসিংহকে শিবিকা আনবার আদেশ দিয়েছেন। কিন্তু সে আদেশ পালিত হবার আগেই বিমলা-তিলোত্তমার পালকি-বাহকেরা ফিরে এসেছে। জগৎসিংহ ব'লেছেন—'তবে আমি আর এখানে দাঁড়াইব না ; আমার সহিত ইহাদিগের সাক্ষাতে অনিষ্ট ঘটিতে পারে।' নিজের উষ্ণীশ থেকে মুক্তাহার খুলে নিয়ে, স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে বিমলাকে উপহার দিয়ে, তিনি বলেন—'আমি তোমার প্রভুকন্যার যে পরিচয় পাইলাম না, এই কথাই আমার হৃদয়ে স্মরণার্থ চিহ্নস্বরূপ রহিল।' বিমলা জিগেস করেন—'অদ্য হইতে পক্ষান্তরে আপনার সহিত কোথায় সাক্ষাৎ হইতে পারিবে বলিয়া দিন।' জগৎসিংহ জবাব দিয়েছেন—'অদ্য হইতে পক্ষান্তরে রাত্রিকালে এই মন্দির মধ্যেই আমার সাক্ষাৎ পাইবে। এই স্থলে দেখা না পাও—সাক্ষাৎ হইল না।'

এই রহস্য-বিস্ময়-কৌতূহল-স্পন্দিত নিশীথ দৃশ্যের পরেই, তৃতীয় পরিচ্ছেদে সে-কালের যুগরুচির প্রত্যাশিত ইতিহাস-কথন শুরু হ'য়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'দেবমন্দির'; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের 'আলাপ'; তৃতীয় পরিচ্ছেদের 'মোগল পাঠান'।[৭] এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হ'য়েছে :

> 'জগৎসিংহ রাজপুত, কি প্রয়োজনে বঙ্গদেশে আসিয়াছিলেন, কেনই বা প্রান্তর মধ্যে একাকী গমন করিতেছিলেন, তৎপরিচয় উপলক্ষে এই সময়ের বঙ্গদেশ সম্বন্ধীয় রাজকীয় ঘটনা কতক কতক সংক্ষেপে বিবৃত করিতে হইল। অতএব এই পরিচ্ছেদ ইতিবৃত্ত সম্পর্কীয়। পাঠকবর্গ একান্ত অধীর হইলে ইহা ত্যাগ করিতে পারেন, কিন্তু গ্রন্থকারের পরামর্শ এই যে, অধৈর্য ভাল নহে।'

অতঃপর পর পর আটটি অনুচ্ছেদে বখতিয়ার খিলিজির বিজয়-বৃত্তান্ত থেকে শুরু ক'রে, ৯৭২ হেঃ অব্দে দিল্লীর রণক্ষেত্রে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত ক'রে সুলতান বাবরের সিংহাসন অধিকার,—৯৮২ অব্দে আকবরের সেনাপতি

৭। ডক্টর জয়ন্তকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'A Critical study of the Life and Novels of Bankim Chendra' [১৯৩৭] বইয়ের ৩৮-৩৯ পৃষ্ঠার জানিয়েছেন :

'The novel takes the reader to the days of Pathan rule in Bengal. Was there any particular reason why Bankimchandra chose this period of history as the background of his first novel? Professor Cowell thinks that the author placed the story in the times of Akbar as that ruler had left such a deep mark on the Hindu mind. [১৮৭১-৭২ খ্রীষ্টাব্দের Macmillan's Magazine, পৃষ্ঠা ৪৪৫ দ্রষ্টব্য।] It might have been Bankimchandra's sympathy for the Pathans of Bengal that led him to picture a time when they challenged the supremacy of the Mughals. Moreover in some accounts of this period the Pathan rebellion was not impartially treated as the sympathy of the historians was with the Mughals. [এই সূত্রে ডক্টর দাশগুপ্ত লিখেছেন : 'In Riyazu-s-Salatin p. 175, one of the bravest Pathan Generals is called "that wretched man". For the Afghan insurrections, see Briggs Ferishta, Vol. II.']. Writing long after even a modern historian like Vincent Smith remarks about the end of the independent Kingdom of Bengal, "Its disappearance need not excite the slightest feeling of regret The Kings, mostly of Afghan origin, were mere military adventurers, lording it over a submissive Hindu population, the very existence of which is ignored by history.' [Vincent Smith-এর Akbar the Great Mogul. পৃষ্ঠা ১৪৬ দ্রষ্টব্য]. Bankimchandra introduced the Pathans in a more favourable light than they had been placed hitherto. He thought that the ancient traditions and high spirit of the Pathans would not only be a subject worthy of a novel, but it would also go a long way towards vindicating those virtues of the Pathans that had received scant justice at the hands of historians.'

মনাইম খাঁর হাতে পাঠান দাউদ খাঁর পরাজয় ও উড়িষ্যায় পলায়ন এবং তারই ফলে বাংলাদেশে মোগল শাসনের সূচনা,—৯৮৬তে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি খাঁ-জাহাঁ-খাঁর হাতে উড়িষ্যার পাঠান-দমন,—তারপর আকবর বাদশাহের নব-প্রবর্তিত কর-প্রথায় অসন্তুষ্ট জায়গীরদারদের বিক্ষোভ এবং সেই সুযোগে উড়িষ্যায় এবং মেদিনীপুরে পাঠানের পুনরভ্যুদয়ের কথা বিবৃত হ'য়েছে। এই বিক্ষোভের ফলেই উড়িষ্যায় পাঠান-প্রতিনিধি কৎলু খাঁ অধিপতি হ'য়ে ওঠেন। আর, সেই কৎলু খাঁকে দমন করবার জন্যেই সম্রাট আকবর মানসিংহকে নিযুক্ত করেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র এই ঐতিহাসিক পটভূমি জানাতে-জানাতেই বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন :

> 'আখ্যায়িকাবর্ণিত কালে যে সকল রাজপুত উচ্চপদাভিষিক্ত ছিলেন, তন্মধ্যে মানসিংহ একজন প্রধান। তিনি স্বয়ং আকবরের পুত্র শেলিমের শ্যালক। আজিম খাঁ ও শাহবাজ খাঁ উৎকলজয়ে অক্ষম হইলে, আকবর এই মহাত্মাকে বঙ্গ ও বেহারের শাসনকর্তা করিয়া পাঠাইলেন।'

৯৯৬ সালে মানসিংহ পাটনায় উপদ্রব প্রশমিত ক'রে, সৈদ খাঁকে বাংলার শাসনভার দিয়ে, উৎকল-বিজয়ের অভিপ্রায় ঘোষণা করেন। সৈদ খাঁকে তিনি সৈন্য সংগ্রহের আদেশ দিয়ে বর্ধমানে তাঁর সঙ্গে দেখা হবে,—এই আশা করেন। কিন্তু সৈদ খাঁ জানান যে, সৈন্য সংগ্রহ ক'রতে বর্ষাকাল অতিক্রান্ত হবে। অগত্যা তারুকেশ্বর নদীর তীরে শিবির সংস্থাপন ক'রে মানসিংহ প্রতীক্ষা ক'রতে থাকেন। ইতিমধ্যে—

> 'তথায় অবস্থিতিকালে লোকমুখে রাজা সংবাদ পাইলেন যে কতলু খাঁ তাঁহার আলস্য দেখিয়া সাহসিক হইয়াছে, সেই সাহসে মান্দারণের অনতিদূর মধ্যে সসৈন্য আসিয়া দেশ লুঠ করিতেছে। রাজা উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া, শত্রুবল কোথায় এবং কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছে, কি করিতেছে, এই সকল সংবাদ নিশ্চয় জানিবার জন্য তাঁহার একজন প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে প্রেরণ করা উচিত বিবেচনা করিলেন। মানসিংহের সহিত তাঁহার প্রিয়তম পুত্র জগৎসিংহ যুদ্ধে আসিয়াছিলেন। জগৎসিংহ এই দুঃসাহসিক কার্যের ভার লইতে সোৎসুক জানিয়া, রাজা তাঁহাকেই শতেক অশ্বারোহী সেনা সমভিব্যাহারে শত্রুশিবিরোদ্দেশে প্রেরণ করিলেন।'

পাঠকের সঙ্গে সাগ্রহ আলাপের ভঙ্গিতে আরো বলা হয়েছে :

> 'রাজকুমার কার্য সিদ্ধ করিয়া অচিরাৎ প্রত্যাবর্তন করিলেন। যৎকালে কার্য সমাধান করিয়া শিবিরে প্রত্যাগমন করিতেছিলেন, তখন প্রান্তর মধ্যে পাঠক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হইয়াছে।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদেও এই ইতিহাসের ধারা। মানসিংহের কাছে ফিরে জগৎসিংহ জানান যে, ধরপুর গ্রামের কাছে পঞ্চাশ হাজার পাঠান-সৈন্যের সমাবেশ ঘ'টেছে এবং তারা গ্রাম লুঠ ক'রছে। জগৎসিংহ তখন মাত্র পাঁচহাজার সৈন্য নিয়ে কতলু খাঁকে সুবর্ণরেখার পরপারে রেখে আসবার সামর্থ্য প্রকাশ করেন। মানসিংহ সে-প্রস্তাবে সম্মত হন। তারপর জগৎসিংহের যুদ্ধযাত্রা!

পঞ্চম পরিচ্ছেদে গড় মান্দারণের পরিচয় :

> 'যে পথে বিষ্ণুপুর প্রদেশ হইতে জগৎসিংহ জাহানাবাদে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন, সেই পথের চিহ্ন অদ্যাপি বর্তমান আছে। তাহার কিঞ্চিৎ দক্ষিণে মান্দারণ গ্রাম। মান্দারণ এক্ষণে ক্ষুদ্র গ্রাম, কিন্তু তৎকালে ইহা সৌষ্ঠবশালী নগর ছিল। যে রমণীদিগের সহিত জগৎসিংহের মন্দিরমধ্যে সাক্ষাৎ হয়, তাঁহারা মন্দির হইতে যাত্রা করিয়া এই গ্রামাভিমুখে যাত্রা করেন।'

গড় মান্দারণে অনেক দুর্গ ছিল। সেই সব দুর্গের মধ্যে একটি দুর্গের ভগ্নস্তূপ একালেও বিদ্যমান। বাংলার পাঠান সম্রাট হোসেন শাহের সেনাপতি ইস্‌মাইল গাজি এই দুর্গ নির্মাণ করেন। জয়ধরসিংহ নামে এক হিন্দু সৈনিক তার জায়গীর পান। কালে, সেই জয়ধরসিংহের বংশধর বীরেন্দ্র সিংহ দুর্গের অধিকারী হন।

এই ইতিহাস-বিবৃতির মধ্যে,—এই পঞ্চম পরিচ্ছেদেই রোম্যান্সের আবহ-পরিমণ্ডল ও ঘটনাসন্ধি দেখা দিয়েছে। পিতার অমতে, বীরেন্দ্র সিংহ সেই পল্লীর পতিপুত্রহীনা এক দরিদ্রার কন্যাকে গোপনে বিবাহ করেন। পিতা তাঁকে পরিত্যাগ করেন। যোদ্ধা হবার আশা নিয়ে পুত্র দিল্লি যাত্রা করেন। তখন তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা। তাই বীরেন্দ্রকে একলা পথে বেরুতে হয়। তারপর, পুত্রবধূকে দুর্গে নিয়ে আসেন বীরেন্দ্রের অনুতপ্ত পিতা। একটি কন্যা জন্ম গ্রহণ করবার অল্পকাল পরেই বধূ লোকান্তরিতা হন। তারপর, বীরেন্দ্রের পিতারও মৃত্যু হয়।

এই পঞ্চম পরিচ্ছেদেই বিমলার পরিচয় দেওয়া হয়েছে। দিল্লীতে বীরেন্দ্র মোগল সম্রাটের রাজপুত সেনাদলে নিযুক্ত হন। পিতার মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে দেশে ফেরবার সময়ে, তিনি অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গে এক 'পরমহংস'কে, আর, এক পরিচারিকাকে এনেছিলেন। সেই পরমহংসের নাম অভিরাম স্বামী। আর, পরিচারিকা এই বিমলা। এই পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে জানানো হয়েছে যে, অভিরাম স্বামী, আর বিমলা ছাড়া আশমানি নামে এক 'দাসী'ও দিল্লি থেকে বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে আসেন।

এই পাঁচটি পরিচ্ছেদের উপস্থাপনাভঙ্গি বিস্ময়কর। বঙ্কিমচন্দ্রের এ দক্ষ-তার তুলনা বিরল! প্রথম দৃশ্যটিই অভূতপূর্ব! এ পর্যন্ত কাহিনীর গতি কতকটা লক্ষ্য করা গেছে। এখন এ-কাহিনীর সূচনাংশের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হোলো :

> '৯৯৭ বঙ্গাব্দের শেষে একদিন একজন অশ্বারোহী পুরুষ বিষ্ণুপুর হইতে মান্দারণের পথে একাকী গমন করিতেছিলেন। দিনমণি অস্তাচলে গমনোদ্যোগী দেখিয়া অশ্বারোহী দ্রুত বেগে অশ্ব সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন। কেননা দেখা গেল প্রকাণ্ড প্রান্তর; কি জানি, যদি কালধর্মে প্রদোষকালে প্রবল ঝটিকা বৃষ্টি আরম্ভ হয়, তবে সেই প্রান্তরে, নিরাশ্রয়ে যৎপরোনাস্তি পীড়িত হইতে হইবে। প্রান্তর পার হইতে না হইতেই সূর্যাস্ত হইল : ক্রমে নৈশ গগন একসঙ্গে নীলনীরদমালায় আবৃত হইতে লাগিল। নিশারম্ভেই এমন ঘোরতর অন্ধকার দিগন্তসংস্থিত হইল যে, অশ্ব চালনায় অতি কঠিন বোধ হইতে লাগিল। পান্থ কেবল বিদ্যুৎদীপ্তিপ্রদর্শিত পথে কোন মতে চলিতে লাগিলেন।'

বাংলা সাহিত্যে 'দুর্গেশনন্দিনী'র আগেই ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক উপন্যাস [১৮৫৭] 'সফল স্বপ্ন' আর 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়' নামে দুটি কাহিনী ছাপা হয়। শিবাজী, আওরঙ্গজেব, শাজাহান, রোসিনারা জয়সিংহ, রামদাস স্বামী—এই সব ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পাত্র-পাত্রীকে নিয়ে ভূদেব তাঁর 'অঙ্গুরীয় বিনিময়' লিখেছিলেন। তাতে দাক্ষিণাত্য আক্রমণকালে শিবাজীর সঙ্গে আওরঙ্গজেবের সংঘর্ষের বিবরণটুকু ইতিহাস-সমর্থিত বটে, জয়সিংহের হাতে শিবাজীর সাময়িক পরাজয় এবং দিল্লীশ্বরের কাছে বশ্যতা স্বীকারের প্রসঙ্গও তাই; কিন্তু রোসিনারা-শিবাজীর প্রণয় ও রোসিনারা

কর্তৃক শিবাজীর বিবাহ-প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ইত্যাদি ব্যাপার ভূদেবের নিজস্ব কল্পনার দান। 'দুর্গেশনন্দিনী'ও যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস নয়। এ বিষয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের মতের কথা আগেই বলা হ'য়েছে। এখানে একথাও স্মরণীয় যে, ইতিহাসের আখ্যানে প্রাণসঞ্চারের প্রয়াস এখানেও বিদ্যমান।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-চর্চার প্রথম পর্বে ইতিহাসের প্রতি তাঁর আগ্রহের লক্ষণ সন্দেহাতীত; সেদিক থেকে আমাদের সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাসের অগ্রগামী ব'ললে অন্যায় হয় না।[৮] ভূদেবের ঐতিহাসিক উপন্যাসে আড়ষ্টতা থাকলেও তাঁর কিন্তু এমন কিছু কিছু গুণ ছিল যা রমেশচন্দ্র দত্তের লেখাতে প্রভাব রেখে গেছে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যেও যেসব গুণ বর্তেছিল ব'লে সমালোচকরা স্বীকার ক'রেছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র এই প্রথম কয়েক ছত্রে নির্দিষ্ট একটি প্রাচীন তারিখ দেখিয়ে, সুদূর অতীতের এক অপরাহ্নের দৃশ্যই যে শুধু দেখানো হয়েছে, তা নয়,—দিগন্তসংস্থিত অন্ধকার প্রেক্ষাপটে অজ্ঞাত অশ্বারোহীর এই কঠিন যাত্রাপথ ভয়ে, বিস্ময়ে, কৌতূহলে পাঠকের মনকে অভিভূত করে! এ ঠিক ভূদেবের প্রভাব নয়। কিন্তু সাদৃশ্যের লক্ষণগুলি বিচার ক'রে দেখতে হ'লে ভূদেব এবং রমেশচন্দ্রের কথা অবশ্যই মনে পড়ে। শ্রীকুমারবাবু সেই ইঙ্গিতই করেছেন।[৯]

প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কাহিনীর ধারা দেখা গেছে। তারপর ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে মোগল-পাঠানের সৈন্য-সমাবেশের আয়োজন লক্ষ্য ক'রে

৮। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা [১৩৬৯] বইখানির ৩৭ পৃষ্ঠায় লিখেছেন: 'ক্রমপরিণতির দিক দিয়া বোধ হয় ঐতিহাসিক উপন্যাসই সামাজিক উপন্যাসের পূর্ববর্তী। আমাদের বাস্তব পর্যবেক্ষণশক্তি উপন্যাস-ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিকশিত হইবার পূর্বেই আমরা ইতিহাসের কল্পনাময়, অনেকটা অবাস্তব রাজ্যে স্বচ্ছন্দগতিতে বিচরণ করিতেছিলাম।'

৯। 'ভূদেবের প্রভাব বঙ্কিমচন্দ্রের উপর যতটা হউক বা না হউক রমেশচন্দ্রের উপর উহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। শিবাজীর পার্বত্য-যুদ্ধ-বর্ণনা ও জয়সিংহের নিকট তাঁহার উচ্ছ্বসিত স্বদেশ-প্রেমাত্মক আবেদন রমেশচন্দ্রের 'জীবন-প্রভাত' উপন্যাসটিকে গভীরভাবে, সময় সময় আক্ষরিক-ভাবেও প্রভাবিত করিয়াছে। যে সরস মন্তব্য ও পাঠকের সরাসরি সম্বোধন বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে লেখক ও পাঠকের মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ-স্থাপনের হেতু হইয়াছে ও পাঠককে এই নূতন ধরণের সাহিত্যের মধ্যে রসগ্রহণে সহায়তা করিয়াছে তাহারও প্রথম সূচনা ভূদেবচন্দ্রে দেখা যায়।'

অভিরাম স্বামী বীরেন্দ্রকে বলেছেন—'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ,—যে পক্ষ অবলম্বন করিলে অধর্ম নাই, সেই পক্ষে যাও, রাজবিদ্রোহিতা মহাপাপ, রাজপক্ষ অবলম্বন কর।' কিন্তু ক্রুদ্ধ, গর্বিত, বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে মানসিংহের শত্রুতা। আকবর বাদশাহের পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিতে গেলে মানসিংহের অধীনেই তাঁকে যুদ্ধ ক'রতে হবে। বীরেন্দ্র তাতে অসম্মত। তিনি পাঠান পক্ষেই যোগ দিতে আগ্রহী। তখন অভিরাম স্বামী তাঁর গণনার কথা জানান—মোগল সেনাপতির হাতে তিলোত্তমার মহৎ অমঙ্গল আসন্ন! কন্যাস্নেহে বীরেন্দ্র অগত্যা মত পরিবর্তন ক'রে মানসিংহের অনুগামী হবার সম্মতি দেন। বাইরে তখন কতলু খাঁর দূত উপস্থিত! পাঠানের প্রতি আনুকূল্য প্রকাশে বীরেন্দ্রের বিমুখতার খবর নিয়ে দূত ফিরে যায়। অন্তরালে থেকে বিমলা সব কথাই শুনতে পান। গড় মান্দারণে আসন্ন দুর্যোগের অন্ধকার ছায়াপাতের এই সূচনা!

সপ্তম পরিচ্ছেদে ষোড়শ বর্ষীয়া, বালিকাস্বভাবময়ী তিলোত্তমার রূপবর্ণনার মধ্যেই লেখক জানিয়ে দেন যে, অভিরাম স্বামীর কাছে তিলোত্তমা সংস্কৃতচর্চা করেছেন। দুর্গের যে দিকে আমোদর নদী প্রবাহিত, সেই দিকের এক জানলায় বসে, সেই সন্ধ্যায় তিলোত্তমা একে একে কাদম্বরী, বাসবদত্তা, গীতগোবিন্দ ইত্যাদি দেখতে-দেখতে অন্যমনস্ক অবস্থায় তাঁর একান্ত আকাংক্ষিত 'কুমার জগৎসিংহে'র নাম লিখে ফেলেন! পরের পরিচ্ছেদেই দেখা যায় যে, তাঁর এই অনুরাগ-সঞ্চারের খবরটি অভিরাম স্বামীকে বিমলা নিজে গিয়ে জানিয়েছেন। অভিরাম স্বামী প্রথমে একে সাময়িক মনশ্চাঞ্চল্য ভেবেছেন, কিন্তু পক্ষকালের মধ্যে তিলোত্তমার সত্যিই স্বভাব বদলে গেছে শুনে তিনি বলেন—'আমার বোধ ছিল যে দর্শনমাত্র গাঢ় অনুরাগ জন্মিতে পারে না; তবে স্ত্রীচরিত্র, বিশেষতঃ বালিকাচরিত্র ঈশ্বরই জানেন।'

এই অষ্টম পরিচ্ছেদে যদুবংশীয় জয়ধরসিংহ-পরিবারের কন্যা তিলোত্তমার সঙ্গে জগৎসিংহের বিবাহ ঘটাবার পরামর্শ নিতে গিয়ে, বিমলা অভিরাম স্বামীর কাছে তিরস্কৃত হন। চরিত্রের রহস্য, ঘটনার আকস্মিকতা, আবহের আকর্ষণ,—সব একসঙ্গে, একযোগে দেখা দেয়! জগৎসিংহের সঙ্গে তিলোত্তমার মিলনের প্রস্তাব শুনে ক্রুদ্ধ অভিরাম স্বামী বিমলাকে বলেন—"পাপীয়সি! নিজের হতভাগ্য বিস্মৃত হও নাই? দূর হও!'

নবম পরিচ্ছেদে পাঠান-দমনে রণকুশল জগৎসিংহের কৃতিত্বের খবর জানিয়ে, দশম পরিচ্ছেদে পূর্বনিয়োগ অনুসারে জগৎসিংহের সঙ্গে দেখা করবার

জন্তে বিমলার প্রস্তুতির বর্ণনা—এবং তারই মধ্যে দুর্গের নিভৃত কক্ষে বীরেন্দ্র সিংহ ও বিমলার এই কথোপকথনটুকু দেওয়া হয়েছে :

বীরেন্দ্র। বিমলা, তোমার আজ এ বেশ কেন ?

বিমলা। আমার প্রয়োজন আছে।

বীরেন্দ্র। কি প্রয়োজন আছে আমি শুনিব।

বিমলা। 'তবে শুনুন' বলিতে বলিতে বিমলা মন্মথশর্ষ্যারূপী চক্ষুর্দ্বয়ে বীরেন্দ্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, 'তবে শুনুন আমি এখন অভিসারে গমন করিব।'

বীরেন্দ্র। যমের সঙ্গে না কি ?

বিমলা। কেন, মানুষের সঙ্গে কি হইতে নাই ?

বীরেন্দ্র। সে মানুষ আজিও জন্মে নাই।

বিমলা। একজন ছাড়া।

এই বলিয়া বিমলা বেগে প্রস্থান করিল।

কাহিনীর ক্রমোদ্ঘাটনের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের মনে এইভাবে কৌতূহল ক্রমবর্ধিত হতে থাকে। বীরেন্দ্র সিংহের দুর্গপ্রাসাদের ভেতরে এই নাটকীয় যোগাযোগ, আর, বাইরে মোগল-পাঠানের সংঘাত,—ভয়ঙ্কর, আর মনোহরের এই সমাবেশের মধ্যে রোম্যান্সের আবেদন ঘনীভূত হয়ে ওঠে! তারপর, একাদশ থেকে পঞ্চদশ পর্যন্ত পর পর পাঁচটি পরিচ্ছেদে গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ আর আশমানির হাসি-ঠাট্টা, ভূতের ভয়, প্রেমের অভিনয় ইত্যাদি আয়োজনে গম্ভীর পরিবেশ হালকা ক'রে দিয়েছেন লেখক। ষোড়শ পরিচ্ছেদে নির্দিষ্ট দিনে শৈলেশ্বর মন্দিরে জগৎসিংহের সঙ্গে বিমলার সাক্ষাৎ ঘটেছে। জগৎসিংহ তিলোত্তমার অনুরাগী,—এই কথাটিই এই পরিচ্ছেদের বিশেষ সংবাদ।

শ্রোতাকে অনেকক্ষণ সংশয়াচ্ছন্ন রেখে, জগৎসিংহের অনুরাগ সম্বন্ধে নিশ্চিত হয়ে, বিমলা অবশেষে সেই যুদ্ধাবহ-পরিবৃত শৈলেশ্বর-মন্দিরে প্রদীপালোক-উদ্ভাসিত, কৃপাণকোষধারী দীর্ঘাকার জগৎসিংহকে খুবই সংক্ষেপে জানিয়ে দেন—'গড়মান্দারণে আমার সখীর দেখা পাইবেন। তিলোত্তমা সুন্দরী বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা।' সেই ঘোষণা শুনে—

'জগৎসিংহের বোধ হইল যেন তাঁহাকে কালসর্প দংশন করিল। তরবারে ভর করিয়া অধোমুখে দণ্ডায়মান হইয়া রহিলেন। অনেকক্ষণ

পরে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, 'তোমারই কথা সত্য হইল। তিলোত্তমা আমার হইবে না। যুদ্ধক্ষেত্রে চলিলাম; শত্রুরক্তে আমার সুখাভিলাষ বিসর্জন দিব।'

বিমলা রাজপুত্রের কাতরতা দেখিয়া বলিলেন, 'যুবরাজ! স্নেহের যদি পুরস্কার থাকিত; তবে আপনি তিলোত্তমালাভ করিবার যোগ্য। একেবারেই বা কেন নিরাশ হন? আজ বিধি বৈরী, কাল বিধি সদয় হইতে পারেন।'

এর পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব ভঙ্গিতে মানব-জীবনের এই আশাবাদ সম্বন্ধে মন্তব্য দেখা দেয়:

'আশা মধুরভাষিণী। অতি দুর্দিনে মনুষ্য-শ্রবণে মৃদু মৃদু কহিয়া থাকে, 'মেঘ ঝড় চিরস্থায়ী নহে, কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।' বিমলার মুখে আশা কথা কহিল, 'কেন দুঃখিত হও? আমার কথা শুন।'

এই আশায় আশান্বিত হ'য়ে রাজপুত্র বলেন:

'এই শৈলেশ্বর সাক্ষাৎ কহিতেছি যে, তিলোত্তমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও ভালবাসিব না। তোমার কাছে আমার এই ভিক্ষা যে, তুমি আমার সকল কথা তোমার সখীর সাক্ষাতে কহিও; আর কহিও যে, আমি কেবল একবার মাত্র তাঁহার দর্শনের ভিখারী, দ্বিতীয়বার আর এ ভিক্ষা করিব না, স্বীকার করিতেছি।'

কিন্তু চারদিকে তখন শত্রুভয়। বিমলার পক্ষে পুনর্বার শৈলেশ্বর-মন্দিরে এসে খবর জানানো বিপজ্জনক দায়িত্ব। তাই রাজপুত্র নিজেই সেই রাত্রে বিমলার সঙ্গে গড়মান্দারণে গিয়ে 'উপযুক্ত স্থানে' অপেক্ষা ক'রে খবর জেনে আসবেন, এই আগ্রহ প্রকাশ করেন। তখন—

'বিমলা হৃষ্টচিত্তে কহিলেন, তবে চলুন।

উভয়ে মন্দির হইতে নির্গত হইতে যান, এমন সময়ে মন্দিরের বাহিরে সাবধান-ন্যস্ত মনুষ্য-পদ-বিক্ষেপের শব্দ হইল। রাজপুত্র কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইয়া বিমলাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তোমার কেহ সমভিব্যাহারী আছে?'

বিমলা কহিলেন, 'না'।

তবে কার পদধ্বনি হইল? আমার আশঙ্কা হইতেছে, কেহ অন্তরাল হইতে আমাদিগের কথোপকথন শুনিতেছে।'

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে বিমলা আর জগৎসিংহ চলেছেন গড় মান্দারণ দুর্গের অভিমুখে, আর সেই পদধ্বনি তাঁদের অনুসরণ ক'রেছে। পথে যেতে যেতে বিমলার পরিচয় জানতে চান যুবরাজ। জগৎসিংহ বিমলাকে বলেন—'বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা যে অম্বরপতির পুত্রবধূ হইতে পারেন না, তাহার বিশেষ কারণ আছে। সে অতি গুহ্য বৃত্তান্ত; তুমি পরিচারিকা হইলে সে গুহ্য কাহিনী কি প্রকারে জানিবে?'

এই প্রশ্ন শুনে বিমলার মনে পরিতাপ দেখা দেয়। তবু, তখনো আত্মপরিচয় গোপন রাখতে হয় তাঁকে। কিন্তু দুর্গের কাছাকাছি পৌঁছে, দুর্গস্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে দুর্গে প্রবেশ ক'রতে জগৎসিংহ যখন পুরোপুরি অসম্মত হন, তখন নিরুপায় হ'য়ে 'রাজপুত্রের কর্ণে লোল' হয়ে তিনি আত্মপরিচয় জানান।

এই 'লোল' শব্দটিও অভিনব, এই পরিস্থিতিও কৌতূহলোদ্দীপক। রোম্যান্সের ঘটনা-সমারোহ, পরিস্থিতিগত বিস্ময়, শব্দ-ব্যবহারের রমণীয়তা গুপ্ত অনুসরণকারীর পদধ্বনি-তাড়িত এই রাত্রির অন্ধকার,—এই দীর্ঘাকার সশস্ত্র যুবরাজ আর প্রচ্ছন্নপরিচয়া নারী,—সমস্ত মিলিয়ে অদ্ভুত এক সমাবেশ এখানে প্রাধান্য লাভ করে—এই মধুরে-ভয়ঙ্করে সমাবেশ! পরিচয় শুনে, সম্ভ্রমের সঙ্গে যুবরাজ বলেন—'চলুন'! বিমলা বলেন—'যুবরাজ, আমি দাসী, দাসীকে 'চল' বলিবেন'। পঞ্চম পরিচ্ছেদের বিমলা-চরিত্রের অবতারণা ঘটেছিল; তারপর এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদে তার বিস্তৃততর পরিচয়ের আভাস পাওয়া গেল। কিন্তু তাও পাঠকের শ্রুতির অধিগম্য নয়!

এই সপ্তদশ পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'বীর পঞ্চমী'। দুর্গের প্রবেশ-পথে বিশাল আমবাগানে আবার অনুসরণকারীর পদধ্বনি শোনা গেছে। যুবরাজের অনুরোধে শেলখানায় গিয়ে বিমলা তাড়াতাড়ি দুটি শাণিত বর্শা নিয়ে জগৎসিংহের কাছে ফিরে আসেন।

ইতিমধ্যে প্রতীক্ষারত, অনুসরণকারী দুজন যোদ্ধার একজন নিঃশব্দে দুর্গে প্রবেশ করে; অন্য জন জগৎসিংহের অব্যর্থ শস্ত্রাঘাতে নিহত হয়। নিহত ব্যক্তির পরিচয় জানা যায় একটি সংক্ষিপ্ত চিঠি থেকে—পাঠানের গুপ্তচর তারা!

দুর্গের বাইরে এই হত্যা অনুষ্ঠিত হবার পরেই যুবরাজ জগৎসিংহ দুর্গের ভেতরে গিয়ে বিমলার ঘরে প্রবেশ করেন। সেই—'সুবাসিত কক্ষ; রজত প্রদীপ জ্বলিতেছে; কক্ষপ্রান্তে অবগুণ্ঠনবতী রমণী,—সে তিলোত্তমা।'

প্রথম খণ্ডের শেষ চারটি পরিচ্ছেদের শিরোনাম যথাক্রমে—'চতুরে চতুরে',—'প্রেমিকে প্রেমিকে',—'প্রকোষ্ঠে প্রকোষ্ঠে',—এবং 'খড়্গে খড়্গে'! নাটকীয় আকস্মিকতার সঙ্গে ঘটনাস্রোত এখানে দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে এগিয়ে গেছে। আঠারোর পরিচ্ছেদে ওসমানের হাতে বিমলা বন্দিনী! দু'জনেই প্রত্যুৎপন্নমতি। উনিশের পরিচ্ছেদে ওস্‌মানের প্রহরীর সঙ্গে প্রেমাভিনয় ক'রে বিমলা পালিয়ে গেছেন। পরিচ্ছেদের শেষে লেখক বলেছেন—ওস্‌মানের কথা যথার্থ, 'বিমলার কটাক্ষকেই ভয়।' কুড়ির পরিচ্ছেদে দুর্গের ঘরে ঘরে অততায়ী পাঠান সৈন্যের প্রবেশে সারা দুর্গ বিচলিত। বীরেন্দ্র সিংহের ঘরে 'বীরেন্দ্র সিংহের মুষ্টি দৃঢ়বদ্ধ, হস্তে নিষ্কোষিত অসি, অঙ্গে রুধিরধারা!' প্রথম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদেই তিলোত্তমাও বন্দিনী হন!

দুর্গেশনন্দিনীর দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী-বিশ্লেষণে এগিয়ে যাবার আগে, বাংলা উপন্যাসের সেই গঠন-পর্বের সাধারণ রুচি বা অভ্যাসের কথায়,—সে-সময়ে এ-জগতের হাওয়া কী রকম ছিল, সে-তত্ত্ব অনুধাবনের জন্যে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আর-একটি মন্তব্য এখানেই স্মরণ করা দরকার। সংবাদপত্রের সঙ্গে উপন্যাস-চর্চার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ দেখিয়ে, তিনি ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দের ২৪এ ফেব্রুয়ারি ও ৯ই জুনের 'সমাচারদর্পণে' প্রকাশিত 'বাবু' রেখাচিত্রের উদাহরণ উল্লেখ ক'রে জানিয়েছেন যে, 'বাবু'-র তিলকচন্দ্রই' 'উপন্যাস জগতের প্রায় আধুনিককাল পর্যন্ত প্রসারিত বাবু-বংশের আদি-পুরুষ।' 'সমাচার-চন্দ্রিকা' ও 'সংবাদ-কৌমুদী'র সম্পাদক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের [ছদ্মনাম: প্রমথনাথ শর্মা] ১৮২৩-এ প্রকাশিত—'নববাবু বিলাস', আর ১৮৫৮তে প্রকাশিত প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'—সামাজিক এই দুটি রেখাচিত্রের তুলনা ক'রে তিনি নববাবুবিলাসের বাবুকে 'ব্যক্তিত্বহীন, পরবুদ্ধি-চালিত পুত্তলিকা' ব'লেছেন; তাঁর মতে, 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর মতিলাল সে-তুলনায় আর-একটু ব্যক্তিত্বময়। নববাবু-বিলাস'-এ তত্ত্ব প্রধান, মানুষ গৌণ; 'আলাল'-এ মানবিকতা রক্তমাংস-সংযোগে আর একটু সুপরিস্ফুট'।

এইসব 'বাবু'র উচ্ছৃঙ্খলতা, ঠিক পাশ্চাত্য শিক্ষার ফল নয়। 'আলাল'-এর মতিলাল মাত্র কয়েকদিনের জন্যে শেরবোর্ন সাহেবের ইস্কুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু মধুসূদনের সমগোত্রীয় সে-কালের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নবযুবকরা যথার্থ 'সমাজবিদ্রোহী',—যথার্থ 'ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের আদর্শে অনুপ্রাণিত! আবার, তাঁর নিজের কথায়—'মতিলাল ও মাইকেল মধুসূদনের মুখে হয়ত একই রকমের বুলি, তাহাদের বিলাতী খানাপিনা ও সুরার দিকে সাধারণ প্রবণতা—কিন্তু মানস আদর্শের দিক দিয়া ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্নজাতীয়।'[১০] 'আলালের ঘরের দুলাল'-কে তিনি—বাস্তব বর্ণনা, চরিত্র-চিত্রণ ও মননশীলতা —তিনগুণে সমৃদ্ধ উপন্যাস ব'লেই অভিহিত ক'রেছেন। কিন্তু কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা' [১৮৬২] উপন্যাস নয়,—'নবপ্রতিষ্ঠিত কলিকাতা নগরীর উচ্ছৃঙ্খল, অসংযত আমোদ-উৎসবের বিচ্ছিন্ন খণ্ড-চিত্রের ও সরস ব্যঙ্গাত্মক বর্ণনার শিথিল-গ্রথিত সমষ্টি।'[১১] ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত শ্রীমতী হ্যানা ক্যাথারিন মুলেন্স-এর 'করুণা ও ফুলমণির বিবরণ' পূর্বোক্ত আলাল, হুতোম ইত্যাদির অগ্রবর্তী। তাতে ভাষার বিশেষত্ব ছিল: নিম্নশ্রেণীর লোকের কথ্যরীতির সঙ্গে বাংলা খ্রীষ্টীয় সাহিত্যের 'বৈদেশিক পন্থী বাগ্‌ধারার' মিশ্রণও দেখা যায় সেখানে। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের অতি-উৎসাহ সে-বইখানির সর্বত্র ব্যক্ত। আর এতে নির্জীব, নিষ্প্রভ চরিত্র থাকলেও, শ্রীকুমারবাবুর কথায়—'ইহা সর্বপ্রথম জীবনের গভীর সমস্যা, পারিবারিক জীবনের সুখশান্তি, জীবনের সুমিত নীতিনিয়ন্ত্রণ; দুষ্প্রবৃত্তির উন্মূলন প্রভৃতি অবলম্বনে রচিত কাহিনী।'[১২] তাই এই বইখানিকে তিনি বাংলা উপন্যাসের সূচনান্তরের দৃষ্টান্ত বলেছেন। আলালের মধ্যে চরিত্ররূপায়ণে আনুনাসিক উচ্চারণ, সংগীতপ্রিয়তা ইত্যাদি বাহ্য বৈশিষ্ট্যের ওপর ঝোঁক আর ব্যঙ্গাত্মক অতিরঞ্জনের লক্ষণ দেখে, তিনি ডিকেন্সের রীতির সাদৃশ্য অনুভব ক'রেছেন। তারপর, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি বঙ্কিমের প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হবার পরে,—প্যারীচাঁদের নক্সা-শ্রেণীর দ্বিতীয় কথাসাহিত্য-গ্রন্থ 'মদ খাওয়া বড় দায়'-এর পরবর্তী দুখানি বই 'অভেদী' [১৮৭১] আর 'আধ্যাত্মিকা'-কে [১৮৮০] তিনি ব'লেছেন নতুন ধরনের উপন্যাস।

১০। ঐ, পৃষ্ঠা ২৪।

১১। ঐ, পৃষ্ঠা ২৫।

১২। ঐ, পৃষ্ঠা ২৬।

এই দুটিকে তিনি বাংলা সাহিত্যে একক ও অদ্বিতীয় রূপক বা আধ্যাত্মিক উপন্যাস ব'লে অভিহিত ক'রেছেন। সে-সময়ে ব্রাহ্মসমাজে দেবেন্দ্রনাথ-কেশবচন্দ্রের যে মতবিরোধ ঘটে, প্যারীচাঁদের 'অভেদী'তে তার ছায়া দেখা দিয়েছিল। এই তত্ত্বপ্রবণতা সত্ত্বেও বাস্তব রসসৃষ্টিতে তাঁর সিদ্ধির অনন্যতা শ্রীকুমারবাবু স্বীকার করেছেন।[১৩] প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরের দুলাল' এ ১৭৭৫ থেকে ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি আমাদের পঞ্চাশ বছরের সমাজ-লক্ষণ আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল ব'লে তাঁর বিশ্বাস। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত সে-কালের তরুণদলের বিদ্রোহ-চেতনার অভিব্যক্তি নেই তাতে। উপন্যাসে সে বিদ্রোহচিন্তার প্রকাশ শিবনাথ শাস্ত্রীর আগে আর চোখে পড়ে না। বঙ্কিমচন্দ্রের দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, চন্দ্রশেখর,—এসব অন্য স্তরের, অন্য মনোভঙ্গির রচনা। 'দুর্গেশনন্দিনী'র পাণ্ডুলিপি বঙ্কিম যাঁদের পড়ে শুনিয়েছিলেন, তাঁরা গল্পে মুগ্ধ হ'য়ে তামাক খেতেও ভুলে গিয়েছিলেন! সে-কথা আগেই বলা হয়েছে। উপন্যাসে সমকালীন বাস্তব জীবনের সার্থক প্রতিফলন সম্বন্ধে পাঠক মনে তখনো কিন্তু যথার্থ ঔৎসুক্য জাগেনি। অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সে কথাও লিখেছেন :

> 'যাহারা বিদ্রোহের পতাকা লইয়া সমাজ ও পরিবারের বন্ধন কাটিয়া বাহির হইয়াছিল, বঙ্গসাহিত্যের চর্চা করা বা নিজেদের অভিজ্ঞতার বিষয় লইয়া উপন্যাস লেখা তাহাদের কল্পনাতেও আসে নাই। এই বিদ্রোহী তরুণদলের মধ্যে দুই একজন ভবিষ্যৎ জীবনে দুঃখ-দারিদ্র্যের মধ্যে সাহিত্য-সেবাকে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন বটে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বোধ হয় অনুকূল দৈবপ্রেরিত হইয়াই তাঁহার সমস্ত বিজাতীয় আচার-ব্যবহারের মধ্যে তাঁহার মনঃকোকনদে দেশীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরাগমধু গোপনে সঞ্চয় করিতেছিলেন। রাজনারায়ণ বসুর ন্যায় কেহ কেহ-বা পরিণত বয়সে আত্মজীবন-কাহিনী লিখিয়া তাঁহাদের তরুণ-জীবনের উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতি একটা স্নেহবিদ্রূপমণ্ডিত কটাক্ষপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের এই প্রবল ভাবাবেগ উপন্যাসে প্রতিফলিত করার কথা শিবনাথ শাস্ত্রীর পূর্বে কাহারও মনে হয় নাই।'[১৪]

১৩। ঐ, পৃষ্ঠা ২৯।
১৪। ঐ, পৃষ্ঠা, ৩২।

বঙ্কিমচন্দ্র-রমেশচন্দ্রের যুগেই একসঙ্গে উচ্চাঙ্গের ঐতিহাসিক উপন্যাস আর গম্ভীরতাময়, বাস্তবতা-প্রধান সামাজিক ও পারিবারিক উপন্যাসের সূচনা ঘটে। প্রথম যুগে 'সত্য-কল্পনাজড়িত' অস্পষ্ট ও অসংলগ্ন ঐতিহাসিক উপন্যাসেরই প্রাচুর্য দেখা দেয়! সে-সব রচনায় না ছিল ব্যক্তিত্বের প্রকাশ, না ছিল ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সংযোগ। অনেক ক্ষেত্রেই প্রকৃত ইতিহাসের বদলে কল্পকথার অবলম্বন লক্ষ্য ক'রে শ্রীকুমার বাবু তাঁর ঐ অধ্যায়ের উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> 'বিষয়-নির্বাচন সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের সহিত এই সমস্ত লেখকের বিশেষ কোন প্রভেদ ছিল না। গৃহস্থ-সুন্দরীর প্রতি প্রবল অত্যাচারীর রূপমোহ অনেকটা 'চন্দ্রশেখর-এর বিষয়বস্তু; মুসলমানীর হিন্দুবীরের সহিত প্রেম 'দুর্গেশনন্দিনী'র আখ্যায়িকার সারাংশ-সংকলন বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু এই সমস্ত অতি সাধারণ নিতান্ত বিশেষত্ব-বর্জিত বিষয়ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার দ্বারা...... আশ্চর্যভাবে রূপান্তরিত হইয়াছে......।'[১৫]

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে বিভিন্ন খণ্ডের বিভাগ একটি সাধারণ লক্ষণ হিসেবে স্মর্তব্য। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী' পর পর দুটি খণ্ডে প্রবাহিত। 'কপালকুণ্ডলায়' চারটি,—'মৃণালিনী'তেও চারটি,—'বিষবৃক্ষে', 'ইন্দিরায়', 'যুগলাঙ্গুরীয়'-তে একটি করে,—চন্দ্রশেখরে 'উপক্রমণিকা'র পরে মোট আরো ছ'টি,—'রজনী'তে মোট পাঁচটি,—'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ দুটি, আর সেই সঙ্গে এক 'পরিশিষ্ট' খণ্ড,—'রাজসিংহ'তে আটটি এবং পরিশেষে 'উপসংহার' খণ্ড,—'আনন্দমঠ'-এ চারটি,—'দেবী চৌধুরাণী'তে তিনটি—এবং 'সীতারাম'-এ তিনটি, আর, সেই সঙ্গে 'পরিশিষ্ট' খণ্ড দেখা যায়।

'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রথম খণ্ডে মোট একুশটি পরিচ্ছেদে ৯৯৭ বঙ্গাব্দের গ্রীষ্মঋতুর সেই ঝড়ের রাত্রে শৈলেশ্বর-মন্দিরে অশ্বারোহী জগৎ সিংহের সঙ্গে বিমলা ও তার প্রভুকন্যা তিলোত্তমার অভাবিতপূর্ব সাক্ষাতের দৃশ্য থেকে শুরু ক'রে কৎলু খাঁর সেনাপতি ওসমান কর্তৃক মান্দারণ দুর্গ আক্রমণ ও বীরেন্দ্র সিংহের বন্ধন, আক্রমণকারী পাঠান সৈন্যের অস্ত্রাঘাতে মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের মৃতপ্রায় অবস্থা, এবং করিম বক্স্ নামে এক পাঠান সৈন্যের হাতে বিমলা ও তিলোত্তমার বন্দী অবস্থা পর্যন্ত বর্ণিত হ'য়েছে।

১৫। ঐ, পৃষ্ঠা ৪১।

করিম বক্‌স্‌ পুরস্কার চেয়েছে ; ওস্‌মান তার পরিচয় জানতে চাইলে সে বলে—'গোলামের নাম করিমবক্‌স্‌, কিন্তু করিমবক্স বলিলে কেহ চেনে না। আমি পূর্বে মোগল-সৈন্য ছিলাম, এজন্য সকলে রহস্যে আমাকে মোগল-সেনাপতি বলিয়া ডাকে।' বিমলা তাই শুনে শিউরে উঠেছেন। তাঁর মনে পড়েছে অভিরাম স্বামীর জ্যোতিষগণনার স্মৃতি! প্রথম খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিমলার প্রথম সংক্ষিপ্ত পরিচয়,—অষ্টম পরিচ্ছেদে অভিরাম স্বামীর তিরস্কার,—দশম পরিচ্ছেদে বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতার দৃশ্যটি,—সপ্তদশ পরিচ্ছেদে জগৎ সিংহের কাছে তাঁর আত্মপরিচয় দান—এবং একুশের পরিচ্ছেদে এই জ্যোতির্গণনার স্মৃতি ও শিহরণ,—এই অস্ফুট পরিচয় যেমন রহস্যাবৃত, তেমনি চমকপ্রদ! রোম্যান্স সৃষ্টির এই আবহ-পরিমণ্ডলটি লক্ষণীয়।

দ্বিতীয় খণ্ডে আহত জগৎসিংহের শুশ্রূষা-নিযুক্তা আয়েষাকে দেখা যায়। ওসমান আয়েষার প্রতি অনুরক্ত, কিন্তু তাঁর অভিজ্ঞতায়, আয়েষা যেন 'কুসুমের মধ্যে পাষাণ'! আয়েষা দুর্গবিজয়ী কৎলু খাঁর কন্যা, তাঁর বয়স 'দ্বাবিংশতিবর্ষ'।

দ্বিতীয় খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে—দুর্গজয়ের দু'দিন পরে, সেই দুর্গেই বীরেন্দ্র সিংহের বিচার হ'য়েছে। বিমলা যে বীরেন্দ্রের স্ত্রী, তাও জানা গেছে। নিধনভূমিতে বীরেন্দ্রের সঙ্গে বিমলা আর অভিরাম স্বামীর দেখা হয়। স্বামীর অপঘাত-মৃত্যু দেখতে হয় বিমলাকে! এই হত্যার প্রতিশোধ নেবার প্রতিজ্ঞা জাগে তাঁর মনে। সদ্য-বিধবা, বন্দিনী বিমলা একটি চিঠিতে জগৎসিংহের কাছে আত্মপরিচয় দিয়ে, সেই চিঠিখানি ওসমানের হাতে দেন। তিনি অভিরাম স্বামীর [শশিশেখর ভট্টাচার্য] কন্যা। দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম পরিচ্ছেদে এই চিঠি আর আত্মপরিচয়-প্রসঙ্গ ছড়িয়ে আছে। ওসমানের শৈশব অবস্থায় বিমলা [মাহরু] তাঁকে একবার দস্যুর কবল থেকে রক্ষা করেন। বিমলার চিঠি প'ড়ে, তাঁর দুর্দশার বিবরণ জেনে, ওসমান সেই উপকারের প্রতিদান হিসেবে কৎলু খাঁর জন্মদিনে বিমলাকে মুক্ত করবার প্রতিশ্রুতি দেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদেই দেখানো হয়েছে যে, তিলোত্তমা আর বিমলা উভয়েই কৎলু খাঁর উপপত্নীদের মহলে অবরুদ্ধ!

কয়েকটি রূপসীর রূপের আলোয় এই নির্মম অদৃষ্ট-চক্রান্তের অন্ধকার মাঝে মাঝে অপসারিত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে আয়েষার রূপ-বর্ণনা :

প্রসঙ্গে 'সরস মন্তব্য' আর 'পাঠকের সরাসরি সম্বোধন'—অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়-কথিত এই দুটি বিশেষত্বই একযোগে দেখা দিয়েছে। নারীর রূপবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের একরকম অতি-প্রগল্‌ভতা দেখা যায়। তিলোত্তমা, আয়েষা, বিমলার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। অতি-প্রগল্‌ভতা ঠিক নিন্দার্থে নয়, তাঁর কবি-দৃষ্টির বিশেষ প্রকৃতিটি সূচিত করবার জন্যেই এ-শব্দের প্রয়োগ করা হোলো। উদাহরণ দিয়ে প্রসঙ্গটি আরো পরিস্ফুট করা দরকার। আয়েষা-বিমলা-তিলোত্তমার সৌন্দর্য তুলনা ক'রে দেখবার চেষ্টা আছে এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে। তিনি লিখেছেন :

> 'কোন কোন তরুণীর সৌন্দর্য বাসন্তী মল্লিকার ন্যায় ; নবস্ফুট, ব্রীড়াসংকুচিত, কোমল, নির্মল, পরিমলময়। তিলোত্তমার সৌন্দর্য সেইরূপ। কোন রমণীর রূপ অপরাহ্নের স্থলপদ্মের ন্যায় ; নির্বাস, মুদিতোন্মুখ, শুষ্কপল্লব, অথচ সুশোভিত, অধিক বিকশিত, অধিক প্রভাবিশিষ্ট, মধুপরিপূর্ণ। বিমলা সেইরূপ সুন্দরী। আয়েষার সৌন্দর্য নব-রবিকর-ফুল্ল জলনলিনীর ন্যায় ; সুবিকশিত, সুবাসিত, রসপরিপূর্ণ, রৌদ্রপ্রদীপ্ত ; না সংকুচিত, না বিশুদ্ধ ; কোমল অথচ প্রোজ্জ্বল ; পূর্ণ দলরাজি হইতে রৌদ্র প্রতিফলিত হইতেছে, অথচ মুখে হাসি ধরে না।'

তিলোত্তমা, বিমলা, আর আয়েষার রূপ যথাক্রমে বাসন্তী মল্লিকা, স্থলপদ্ম, আর জলপদ্ম—এই তিনটি ফুলের সঙ্গে উপমিত হ'য়েছে। মনে পড়ে, তাঁর 'গদ্যপদ্য বা কবিতা পুস্তক' বইখানিতে 'পুষ্পনাটক' নামে একটি রচনা সংকলিত হ'য়েছিল। তাতে বৃষ্টিবিন্দু ছিল নায়ক, আর যূথিকা নায়িকা। কৃষ্ণকলি, টগর, আর পদ্ম সেখানে এই যূথিকা আর বৃষ্টিবিন্দুর প্রণয়ে ঈর্ষাগ্রস্তা প্রতিবেশিনী! বাতাস সেখানে অসুরস্বভাব প্রতিনায়ক! বাতাসের তাড়নায় যূথিকার বুক থেকে বৃষ্টিবিন্দু মাটিতে পড়ে যায়। সেই বৃষ্টির জলেই যূথিকা তার মধু সমর্পণ করে ; বাতাস তার পরিমল লুট ক'রে নেয়। বাতাসের দুঃসহ তাড়নায় ফুলটিও শেষে মাটিতে ঝরে যায়!

দুর্গেশনন্দিনীর দ্বিতীয় খণ্ডে এই বাসন্তী মল্লিকা, স্থলপদ্ম আর জলনলিনীর সাদৃশ্য ব্যবহার করবার অনেক পরে, সম্ভবতঃ ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে তাঁর 'পুষ্পনাটক' লেখা হয়।[১৬] 'কমলাকান্তে'র চতুর্থ রচনা 'পতঙ্গ'-তেও জীবন-

১৬। 'পুষ্পনাটক'-এর শেষে Epilogue অংশে এই তারিখের উল্লেখ আছে। তাঁর

বোধসূচক একটি গভীর উক্তিতে 'কুসুমের মধু চুম্বন'-প্রসঙ্গ ছিল। পতঙ্গকে সেখানে বলতে শোনা গেছে—'নিত্য নিত্য কুসুমের মধু চুম্বন করি, নিত্য নিত্য বিশ্ব-প্রফুল্লকর সূর্যকিরণে বিচরণ করি তাহাতে কি সুখ?' তাঁর কবিকল্পনার এই বিশেষ ভঙ্গি তাঁর উপন্যাসেও বিদ্যমান। প্রসঙ্গতঃ এখানে সে-দিকটি দেখে নেওয়া গেল।[১৭] উপন্যাসে রূপবর্ণনার কাজটি কখনো তিনি লেখকের ভূমিকায় নিজেই এইভাবে পালন করেন, কখনো বা নায়ককে

ক্ষুদ্রায়তন লেখাগুলির মধ্যে এই লেখাটি অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। Epilogue অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত হোলো :

প্রথম শ্রোতা। নাটককার মহাশয়! এ কি ছাই হইল?

দ্বিতীয় ঐ। তাই ত, একটা যুঁই ফুল নায়িকা, আর এক ফোঁটা জল নায়ক। বড় ত Drama।

তৃতীয় ঐ। হতে পারে, কোন Moral আছে। নীতিকথা মাত্র।

চতুর্থ ঐ। না হে—এক রকম Tragedy।

পঞ্চম ঐ। Tragedy, না একটা Farce?

ষষ্ঠ ঐ। Farce না—Satire—কাহাকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করা হইয়াছে।

সপ্তম ঐ। তাহা নহে। ইহার গূঢ় অর্থ আছে। ইহা পরমার্থবিষয়ক কাব্য বলিয়া আমার বোধ হয়। 'বাসনা' বা 'তৃষ্ণা' নাম দিলেই ইহার ঠিক নাম হইত। বোধ হয় গ্রন্থকার ততটা ফুটিতে চান না।

অষ্টম ঐ। আচ্ছা গ্রন্থকারই বলুন না কি এটা।

গ্রন্থকার। ও সব কিছুই নহে। ইহার ইংরাজী Title দিব—

"A true and faithful account of a lamentable Tragedy which occurred in a flower-pot on the evening of the 19th July, 1885, Sunday. and of which the writer was an eye-witness"

১৭। প্রথম খণ্ডের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে আশমানির রূপ-বর্ণনাতেও বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্ব-কথিত সেই বিশেষ প্রকৃতির লক্ষণ চোখে পড়ে। আদিতেই তিনি মঙ্গলাচরণ ক'রেছেন :

'হে বাগ্‌দেবি! হে কমলাসনে! শরদিন্দুনিভাননে! অমল কমল দলনিন্দিত চরণ-ভক্তজন-বৎসলে! আমাকে সেই চরণকমলের ছায়া দান কর; আমি আশমানির রূপ বর্ণন করিব। হে অরবিন্দানন সুন্দরীকুল গর্ব খর্বকারিণি! হে বিশাল রসাল দীর্ঘ-সমাস-পটল-সৃষ্টিকারিণি! একবার পদনখের এক পার্শ্বে স্থান দাও আমি রূপ বর্ণনা করিব। সমাস-পটল, সন্ধি-বেগুন, উপমা-কাঁচকলার চড়চড়ি রাঁধিয়া এই খিচুড়ি তোমায় ভোগ দিব। হে পণ্ডিত-কুলেপ্সিত: পয়ঃপ্রস্রবিণি? হে মূর্খজন প্রতি কচিত কৃপাকারিণি! হে অঙ্গুলি-কণ্ডুয়ন-বিষমবিকার সমুৎপাদিনী! হে বটতলা বিদ্যাপ্রদীপ তৈল প্রদায়িনি! আমার বুদ্ধির প্রদীপ একবার উজ্জ্বল করিয়া দিয়া যাও। মা তোমার দুই রূপ; যে রূপে তুমি কালিদাসকে বরপ্রদা হইয়াছিলে, যে প্রকৃতির প্রভাবে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, শকুন্তলা জন্মিয়াছিল, যে প্রকৃতির ধ্যান করিয়া বাল্মীকি রামায়ণ, ভবভূতি উত্তররামচরিত; ভারবি কিরাতার্জ্জুনীয় রচনা

সে-কাজে নিযুক্ত করেন,—যেমন 'বিষবৃক্ষে'র পঞ্চম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথ কলকাতা থেকে হরদেব ঘোষালকে চিঠি লিখেছিলেন—'বল দেখি, কোন্ বয়সে স্ত্রীলোক সুন্দরী? তুমি বলিবে, চল্লিশ পরে, কেন না, তোমার ব্রাহ্মণীর আরও দুই এক বৎসর হইয়াছে। কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাহার বয়স তের বৎসর। তাহাকে দেখিয়া বোধ হয় যে, এই সৌন্দর্যের সময়।' আর সূর্যমুখীকে নগেন্দ্রনাথ যে চিঠি লেখেন, তার উত্তরে তিনি লেখেন—'একটি বালিকা কুড়াইয়া পাইয়া কি আমাকে ভুলিলে? অনেক জিনিষের কাঁচারই আদর। নারিকেলের ডাবই শীতল। এ অধম স্ত্রীজাতিও বুঝি কেবল, কাঁচামিটে? নহিলে বালিকাটি পাইয়া আমায় ভুলিবে কেন?'

তাঁর উপন্যাসের বিভিন্ন খণ্ড-বিভাগ,—বিশিষ্ট শব্দ ব্যবহারের অনন্যতা,—রূপ-বর্ণনায় তাঁর বিশেষ ভঙ্গি ইত্যাদি প্রসঙ্গগুলি লক্ষ্য করা গেল। এইবার আবার 'দুর্গেশনন্দিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যানধারার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যেতে পারে।

করিয়াছিলেন, সে রূপে আমার স্কন্ধে আরোহণ করিয়া পীড়া জন্মাইও না; যে মূর্তি ভাবিয়া শ্রীহর্ষ নৈষধ লিখিয়াছিলেন, যে প্রকৃতিপ্রসাদে ভারতচন্দ্র বিদ্যার অপূর্ব রূপবর্ণন করিয়া বঙ্গদেশের মনোমোহন করিয়াছেন, যাহার প্রসাদে দাশরথি রায়ের জন্ম, যে মূর্তিতে আজও বটতলা আলো করিতেছে, সেই মূর্তিতে একবার আমার স্কন্ধে আবির্ভূত হও, আমি আশমানির রূপ বর্ণন করি।'

এই মঙ্গলাচরণের ভাষায়, ভঙ্গিতে 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্ত' ইত্যাদির প্রতিধ্বনি স্পষ্ট। এই মঙ্গলাচরণের আগেই বলা হয়েছে:

'দিগ্‌গজ গজপতির মনোমোহিনী আশমানি কিরূপ রূপবতী, জানিতে পাঠক মহাশয়ের কৌতূহল জন্মিয়াছে সন্দেহ নাই। অতএব তাঁহার সাধ পুরাইব! কিন্তু স্ত্রীলোকের রূপ বর্ণনা বিষয়ে গ্রন্থকারগণ যে পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া থাকেন, আমার সদৃশ অকিঞ্চন জনের তৎপদ্ধতি-বহির্ভূত হওয়া অতি ধৃষ্টতার বিষয়।'

এই ব'লে তিনি পূর্বোক্ত মঙ্গলাচরণে উদ্যত হন। লঘু পরিহাসের ভঙ্গি এখানে সহজেই চোখে পড়ে। বটতলায় উল্লেখও অর্থময়। এখানে বাংলা সাহিত্যের প্রচলিত সুলভ রূপ বর্ণনার বিরুদ্ধে তাঁর মন্তব্যও পাওয়া গেল। অতঃপর আশমানির রূপ-বর্ণনায় 'ফণিনীর ন্যায় বেণী', 'নাসিকা গরুড়ের নাসার ন্যায়' ইত্যাদি উপমা, এবং সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মার উল্লেখ ক'রে কিছু কল্পিত কাহিনীও দেওয়া হয়েছে। 'কপালের মিলন দোষে আশমানি বিধবা'—এই খবরটিও এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদের অন্তর্ভুক্ত। দিগ্‌গজের আহার এবং আশমানির 'উপকথা' বর্ণনা ইত্যাদি ঘটনাও এই অংশেই দেখা যায়। কিন্তু সেসব অন্য প্রসঙ্গ। আসল কথা, গম্ভীর ভাবেই হোক, আর, হাল্‌কা ভাবেই হোক্, নারীর রূপ বর্ণনার কাজটি বঙ্কিমচন্দ্রকে কখনো পরিহাসে, কখনো সূক্ষ্ম সাদৃশ্যবোধে প্রগল্‌ভ করে তোলে! তিনি কবিপ্রসিদ্ধি বর্জন ক'রে চ'লতে নারাজ। পুরোনো উপমাই তাঁর প্রতিভার গুণে তীব্রতর স্বাদে সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে। যেখানে তিনি পরিহাস-ভঙ্গি ছেড়ে গম্ভীর ভঙ্গি গ্রহণ করেন, সেখানে এই উপমাদি; অলঙ্কারের ঐশ্বর্য আরো সমারোহময় হয়ে ওঠে।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে রোগশয্যায় গুরুতর আহত জগৎ সিংহ চোখ খুলেই দেখেছিলেন নবযৌবনবতী আয়েষাকে। সেই সূত্রে আয়েষা-বিমলা-তিলোত্তমার তুলনামূলক রূপবর্ণনার উৎসাহ এতক্ষণ লক্ষ্য করা গেল। দুর্গেশনন্দিনীর প্রথম খণ্ডে নায়িকা তিলোত্তমার দিকেই পাঠকের দৃষ্টি ছিল। দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনাতে আয়েষা এসে সে-দৃষ্টির অর্ধেক দাবি করেন। সেইখানে লেখক জানিয়েছেন—'যেমন উদ্যানমধ্যে পদ্মফুল, এ আখ্যায়িকা-মধ্যে তেমনিই আয়েষা ; এইজন্য তাঁহার অবয়ব পাঠক মহাশয়ের ধ্যানপ্রাপ্য করিতে চাহি।'

এই ব'লে তিনি অলঙ্কারসমৃদ্ধ সরস ভাষায় আয়েষার সুদীর্ঘ রূপবর্ণনা যোগ ক'রেছেন। জগৎসিংহের স্বাস্থ্যোদ্ধার সম্বন্ধে পাঠান-পক্ষের প্রযত্নের আসল কারণটি দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে আয়েষাকে ওসমানই শুনিয়ে দিয়েছেন—'তুমি দেখিতেছ না, জগৎসিংহ প্রাণ পাইলে আমাদের কত লাভ …যদি জগৎসিংহ জীবিত থাকিয়া আমাদিগের হস্তে কারারুদ্ধ থাকেন, তবে মানসিংহকে হাতে পাইলাম ; সে প্রিয় পুত্রের মুক্তির জন্য অবশ্য আমাদিগের সহিত মঙ্গলজনক সন্ধি করিবে।

কিন্তু ওসমান কেবলমাত্র স্বার্থান্ধ সেনাপতি ছিলেন না। আয়েষার কাছে নিজেকে কঠোরচিত্ত সৈনিক হিসেবে জানালেও তাঁর আসল প্রকৃতি যে অন্যরকম,—এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র সে-কথারও ইঙ্গিত দিয়েছেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক ছত্রে আয়েষা-ওসমানের এই সংলাপটুকু এঁদের উভয়ের সম্পর্কের ওপর আলোকপাত করে :

> 'ওসমান কিঞ্চিৎকাল ইতস্তত: করিয়া মৃদুতরস্বরে কহিলেন, আমি যে পরম স্বার্থপর তাহার আর এক প্রমাণ দিতেছি।
>
> আয়েষা নিজ সবিদ্যুৎ মেঘতুল্য চক্ষু: ওসমানের প্রতি স্থির করিলেন।
>
> ওসমান কহিলেন, 'আমি আশা-লতা ধরিয়াছি, আর কতকাল তাহার তলে জলসিঞ্চন করিব ?'
>
> আয়েষার মুখশ্রী গম্ভীর হইল। ওসমান এ ভাবান্তরেও নূতন সৌন্দর্য দেখিতে লাগিলেন। আয়েষা কহিলেন, 'ওসমান ভাই বহিন

বলিয়া তোমার সঙ্গে বসি দাঁড়াই। বাড়াবাড়ি করিলে, তোমার সাক্ষাতে বাহির হইব না।

ওসমানের হর্ষোৎফুল্ল মুখ মলিন হইয়া গেল। কহিলেন, 'ঐ কথা চিরকাল! সৃষ্টিকর্তা! এ কুসুমের দেহমধ্যে তুমি কি পাষাণের হৃদয় গড়িয়া রাখিয়াছ?'

এর পর আয়েষার মাতৃগৃহে আয়েষাকে রেখে এসে ওসমান বিষণ্ণ চিত্তে নিজের ঘরে ফিরেছেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে জগৎসিংহের জ্ঞান ফিরেছে। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে আয়েষা নিজের পরিচয় দিয়েছেন—'কতলু খাঁর কন্যা'। জগৎ সিংহ বলেন,—'আমি পীড়ার মোহে স্বপ্নে দেখিতাম স্বর্গীয় দেবকন্যা আমার শিয়রে বসিয়া শুশ্রূষা করিতেছেন, সে তুমি না তিলোত্তমা?' তার উত্তরে আয়েষা বলেছেন—'আপনি তিলোত্তমাকে স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবেন।' তারপর চতুর্থ পরিচ্ছেদে বীরেন্দ্র সিংহের বিচার শেষ হয়েছে। নিধনভূমিতে অভিরাম স্বামীর সঙ্গে অবগুণ্ঠনবতী বিমলা তাঁর স্বামী বীরেন্দ্র সিংহের সাক্ষাৎ লাভ করেন। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের পর পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিধবা বিমলা আর পিতৃহীনা তিলোত্তমা দুজনকে দুই পৃথক কক্ষে অবরুদ্ধ দেখা যায়। সেখানে সংক্ষিপ্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদে পুনরায় বঙ্কিমচন্দ্রের কবি মনের আত্মপ্রকাশ:

'বিমলা ও তিলোত্তমা পৃথক পৃথক কক্ষে রক্ষিত হইয়াছিলেন। তথায় পিতৃহীনা নবীনার ধূলিধূসরা দেহলতা ধরাতলে পড়িয়া আছে। পাঠক! তথায় নেত্রপাত করিয়া কাজ নাই। কাজ কি? তিলোত্তমা প্রতি কে আর এখন নেত্রপাত করিতেছে? মধূদয়ে নববল্লরী যখন মন্দ বায়ুহিল্লোলে বিধূত হইতে থাকে, কে না তখন সুবাসাশয়ে সাদরে তাহার কাছে দণ্ডায়মান হয়? আর যখন নৈদাঘ ঝটিকাতে অবলম্বিত বৃক্ষসহিত সে ভূতলশায়িনী হয়, তখন উন্মূলিত পদার্থরাশি মধ্যে বৃক্ষ ছাড়িয়া কে লতা দৃষ্টি করে? কাঠুরিয়ারা কাঠ কাটিয়া লইয়া যায়, লতাকে পদতলে দলিত করে মাত্র।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে বিমলার চিঠিতে তাঁর আত্মপরিচিতির মধ্যেই অভিরাম স্বামীর পূর্বপরিচয় পাওয়া যায়—গড়মান্দারণের কাছাকাছি এক গ্রামের সম্পন্ন এক ব্রাহ্মণের সন্তান তিনি। শশিশেখর যথারীতি লেখাপড়া

শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর আত্মসংযম ছিল না। বিমলার চিঠিতেই দেখা যায়—'গড়মান্দারণে জয়ধর সিংহের কোন অনুচরের বংশে একটি পতিবিরহিণী রমণী ছিল। তাহার সৌন্দর্য অলৌকিক। তাহার স্বামী রাজসেনা মধ্যে সিপাহী ছিল, এজন্য বহুদিন দেশত্যাগী। সেই সুন্দরী শশিশেখরের নয়নপথের পথিক হইল। অল্পকাল মধ্যেই তাঁহার ঔরসে পতিবিরহিতার গর্ভসঞ্চার হইল।' শশিশেখরের পিতা নিজের অনাচারী পুত্রকে তাই বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেন। সেখান থেকে কাশীতে গিয়ে দর্শন ও জ্যোতিষ শাস্ত্রের এক পণ্ডিতের কাছে তিনি অধ্যয়ন করেন। —'শশিশেখর একজন শূদ্রীর গৃহের নিকটে বাস করিতেন। শূদ্রীর এক নবযুবতী কন্যা ছিল। ব্রাহ্মণে ভক্তিপ্রযুক্ত যুবতী আহারীয় আয়োজন প্রভৃতি শশিশেখরের গৃহ-কার্য সম্পাদন করিয়া দিত। মাতৃপিতৃদুষ্কৃতিভারে আবরণ নিক্ষেপ করাই কর্তব্য। অধিক কি কহিব, শূদ্রী-কন্যার গর্ভে শশিশেখরের ঔরসে এ অভাগিনীর জন্ম হইল।' একথা জানতে পেরে, অধ্যাপকও তাঁর ছাত্রকে তাড়িয়ে দেন! নিজের জননীর সেই সময়কার দুরবস্থা জানাতে গিয়ে বিমলা লিখেছেন—'মাতাকে মাতামহ দুশ্চারিণী বলিয়া গৃহ-বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।' বিমলার জননী কন্যাকে নিয়ে অতঃপর কাশীতেই অতিকষ্টে বাস করেন। কিছুদিন পরে এক ধনী পাঠান বাংলাদেশ থেকে সস্ত্রীক দিল্লি যাত্রা ক'রে পথে এক রাত্রে সেই দুঃখিনীর কুটীরে আশ্রয় নেন। বিমলার বয়স তখন ছ'বছর। গভীর রাত্রে এক চোর এসে সেই পাঠান-দম্পতির শিশু-পুত্রটিকে চুরি করে। বিমলার চীৎকারেই সকলের ঘুম ভেঙে যায় এবং ছেলেটিকে চোরের হাত থেকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

চিঠির এই অংশটুকু পড়ে ওস্‌মান জিগেস করেন, 'তোমার কখন কি অন্য কোন নাম ছিল না?' বিমলা বলেন, সেই নামান্তরই 'মাহরু'! ওস্‌মান বলেন—'আমিই সেই অপহৃত বালক।'

এই আকস্মিক অভূতপূর্ব যোগাযোগ রোম্যান্সেরই অন্যতম লক্ষণ। বিমলার জননীর অনুরোধে, সেই পাঠানের চেষ্টায়, সে-ঘটনার চোদ্দ বছর পরে অভিরাম স্বামীর খবর পাওয়া যায়। বিমলার ঐ চিঠি থেকেই জানা যায়—'যখন এই সংবাদ আসিল, তখন মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছিলেন। মন্ত্রপূত

ব্যতীত যাহার পাণিগ্রহণ হইয়াছে, তাহার যদি স্বর্গারোহণে অধিকার থাকে, তবে মাতা স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, সন্দেহ নাই।'

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' রোহিণীর অপঘাত-মৃত্যু সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে যে নির্মমতার অভিযোগ করা হয়, নিজের জননী সম্বন্ধে বিমলার এই শ্রদ্ধার কথাগুলি তারই বিপরীত দৃষ্টান্ত হিসেবে স্মরণীয়। তিনি নির্মম ছিলেন না। কিন্তু এখানে সে-বিষয়ে বেশি কথা নিষ্প্রয়োজন। বিমলা কাশী থেকে একলা দিল্লি চলে যান। সেখানে পিতৃসেবায় তাঁর দিন কাটতে থাকে।

সপ্তম পরিচ্ছেদেও এই চিঠিরই জের চলেছে। সেখানে তিলোত্তমার পরিচয়:

> 'আমি পূর্বেই বলিয়াছি যে, গড় মান্দারণের কোন দরিদ্রা রমণী আমার পিতার ঔরসে গর্ভবতী হলেন। আমার মাতার যেরূপ অদৃষ্টলিপির ফল, ইঁহারও তদ্রূপ ঘটিয়াছিল। ইঁহার গর্ভেও একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে, এবং কন্যার মাতা অচিরাৎ বিধবা হইলে, তিনি আমার মাতার ন্যায় নিজ কায়িক পরিশ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া কন্যা প্রতিপালন করিতে লাগিলেন। বিধাতার এমন নিয়ম নহে যে, যেমন আকর, তদুপযুক্ত সামগ্রীরই উৎপত্তি হইবে। পর্বতের পাষাণেও কোমল কুসুমলতা জন্মে; অন্ধকার খনিমধ্যেও উজ্জ্বল রত্ন জন্মে। দরিদ্রের ঘরেও অদ্ভুত সুন্দরী কন্যা জন্মিল। বিধবার কন্যা গড়মান্দারণ গ্রামের মধ্যে প্রসিদ্ধ সুন্দরী বলিয়া পরিগণিত হইতে লাগিলেন। কালে সকলেরই লয়; কালে বিধবার কলঙ্কেরও লয় হইল। বিধবার সুন্দরী কন্যা যে জারজা, একথা অনেকে বিস্মৃত হইল। অনেকে জানিত না। দুর্গমধ্যে প্রায় একথা কেহই জানিত না। আর অধিক কি বলিব? সেই সুন্দরী তিলোত্তমার গর্ভধারিণী হইলেন।'

বিমলার এই চমকপ্রদ আত্মবিবরণীর পরের অংশে আরো বলা হয়:

> 'তিলোত্তমা যখন মাতৃগর্ভে তখন এই বিবাহ কারণেই আমার জীবনমধ্যে প্রধান ঘটনা ঘটিল। সেই সময়ে একদিন পিতা তাঁহার জামাতাকে সমভিব্যাহারে করিয়া আশ্রমে আসিলেন। আমার নিকট মন্ত্রশিষ্য বলিয়া পরিচয় দিলেন, স্বর্গীয় প্রভুর নিকট [অর্থাৎ স্বর্গত বীরেন্দ্র সিংহের কাছে] প্রকৃত পরিচয় পাইলাম।'

কিন্তু বিবাহ ব্যতিরেকে বীরেন্দ্র-বিমলার পুনর্মিলনে অভিরামস্বামীর অনুমোদন ছিল না। তিনি বিমলাকে বীরেন্দ্রের নাগালের বাইরে রাখবার জন্যেই 'মহারাজ মানসিংহের নবোঢ়া মহিষীর সাহচর্যে' নিযুক্ত করেন। তখন জগৎসিংহের বয়স মাত্র দশ বছর। যোধপুর-কন্যা উর্মিলা দেবী এই 'নবোঢ়া মহিষী'। আশমানি ছিল তাঁরই পরিচারিকা। সেই আশমানির সাহায্যেই বিমলা সেই রাজপুরীতেই বীরেন্দ্র সিংহের সঙ্গে সংযোগ রক্ষা করেন। একে একে তিনটি বছর অতিবাহিত হয়। তারপর এক গভীর রাত্রে, মানসিংহের সেই প্রাসাদের সুরক্ষিত অন্তঃপুরে বীরেন্দ্র এসে বিমলার ঘরে প্রবেশ করেন।

> 'যখন আমার বাক্যস্ফূর্তি হইল, তখন তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তুমি কেমন করিয়া এ পুরীর মধ্যে আসিলে?'
>
> তিনি কহিলেন, 'আশমানিকে জিজ্ঞাসা কর; তাঁহার সমভিব্যাহারে বারিবাহক দাস সাজিয়া পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম; সেই পর্যন্ত লুক্কায়িত আছি।'

স্বয়ং মহারাজ মানসিংহের নজরে পড়ে গিয়ে, বীরেন্দ্র সিংহ বিমলার সেই নিশীথ কক্ষ থেকে একেবারে কারাগার অপসারিত হন! উর্মিলা দেবীর চেষ্টায় মানসিংহের কাছে মার্জনা পান তিনি, কিন্তু—বিমলাকে বিবাহ ক'রতে হবে এই শর্তে। দুঃসহ কারাযন্ত্রণা থেকে অব্যাহতি লাভের জন্যেই বীরেন্দ্র পরিশেষে বলেন—'বিমলা যদি আমার গৃহে পরিচারিকা হইয়া থাকিতে পারে, বিবাহের কথা আমার জীবিতকালে কখন উত্থাপন না করে, আমার ধর্মপত্নী বলিয়া কখন পরিচয় না দেয়, তবে শূদ্রীকে বিবাহ করি, নচেৎ নহে।' সেই শর্তেই বিবাহ হয়। মানসিংহ সম্বন্ধে বীরেন্দ্রের অসন্তোষের কথা আগেই দেখা গেছে। এখানে সে-অসন্তোষের গভীর কারণটি দেখা গেল। এই চিঠি থেকেই আরো জানা যায়—'কালে আমি পুনর্বার স্বামিপ্রণয়ভাগিনী হইয়াছিলাম, কিন্তু অম্বরপতির প্রতি তাঁহার পূর্ববৎ বিষদৃষ্টি রহিল। কপালের লিখন। নচেৎ এসব ঘটিবে কেন?' চিঠির শেষে জগৎসিংহের কাছে মর্মান্তিক একটি অনুরোধ ছিল—'এই পত্রে কেবল আত্মবিবরণই লিখিলাম। যাহার সংবাদ জন্য আপনি চঞ্চলচিত্ত, তাহার নামোল্লেখও করিলাম না। মনে করুন,

সে নাম এ পৃথিবীতে লোপ হইয়াছে। তিলোত্তমা বলিয়া যে কেহ কখন ছিল, তাহা বিস্মৃত হউন।'

কতলু খাঁর জন্মদিনে, ওসমানের দেওয়া আংটি দেখিয়ে বিমলা যে মুক্তি পেতে পারেন, ওস্‌মানের এই ইঙ্গিতের কথা আগেই বলা হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষদিকে ওস্‌মান সে-প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে সাবধান ক'রে দেন—'একাকিনী আসিবেন।' তখন—'বিমলা বুঝিতে পারিলেন যে, ওস্‌মান তিলোত্তমাকে সঙ্গে আনিতে নিষেধ করিতেছেন। মনে মনে ভাবিলেন, 'ভাল দুইজন না যাইতে পারি, তিলোত্তমা একাই আসিবে।'

অষ্টম পরিচ্ছেদের প্রথমেই, কালের অনিবার্য পরিবর্তনবেগ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবসুলভ কিঞ্চিৎ মন্তব্য,—কিঞ্চিৎ দার্শনিকতা দেখা দিয়েছে। তারপর সেই ভূমিকাতেই বিমলা আর জগৎসিংহের মানসিক অবস্থার বিশ্লেষণ দেখা দেয়—'বিমলার হৃৎপদ্মে প্রতিহিংসা কালফণী বসতি করিয়া সর্বশরীর বিষে জর্জর করিতেছে. এক মুহূর্ত তাহার দংশন অসহ্য; একদিনে কত মুহূর্ত!' আর জগৎসিংহের—'প্রথমে শরীরের গ্লানি দূর; পরে আহার; পরে বল, শেষে চিন্তা।' পর পর তিনটি অনুচ্ছেদে যুবরাজের এই চিন্তার বিষয়গুলি দেখানো হয়েছে: প্রথম চিন্তা—তিলোত্তমা কোথায়? দ্বিতীয় চিন্তা—নিজের ভবিষ্যৎ। তৃতীয় চিন্তা—আয়েষা। জগৎসিংহ ভেবেছেন—'আয়েষা। এ চমৎকারিণী, পরহিতমূর্তিমতী, কেমন করিয়া এই মৃন্ময় পৃথিবীতে অবতরণ করিল?' অবস্থাটি আরো ব্যাখ্যা ক'রে লেখক জানিয়েছেন—'কে রুগ্নশয্যায় না শয়ন করিয়াছেন? যদি কাহারও রুগ্নশয্যায় শিয়রে বসিয়া মনোমোহিনী রমণী ব্যজন করিয়া থাকে, তবে সেই জানে রোগেও সুখ।' তারপর আবার পাঠককে সম্বোধন ক'রে অভ্যস্ত রীতিতে রূপবর্ণনা চলেছে—আয়েষা 'পূর্ণবিকসিত পদ্ম'!—'দেখিয়াছ কি সুন্দর গ্রীবাভঙ্গি? দেখিয়াছ প্রস্তর-ধবল গ্রীবার উপর কেমন নিবিড় কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ পড়িয়াছে?'

জগৎসিংহ ক্রমশঃ যখন সুস্থ হয়ে উঠলেন, এই সেবিকার শুশ্রূষাও তখন বন্ধ হোলো। আয়েষার এই ধীরে ধীরে স্বেচ্ছাপসরণের কথা-প্রসঙ্গে এখানে পরমাশ্চর্য একটি উপমা দেখা দিয়েছে—'যেমন শীতার্ত ব্যক্তির অঙ্গ হইতে ক্রমে ক্রমে বেলাধিক্যে রৌদ্র সরিয়া যায়, আয়েষা

সেইরূপ ক্রমে ক্রমে জগৎসিংহ হইতে আরোগ্যকালে সরিয়া যাইতে লাগিলেন।'

এই সময়ে, একদিন বিকেলে, জানালায় দাঁড়িয়ে দুর্গের পরিবেশ দেখতে-দেখতে জগৎসিংহ গজপতি বিদ্যাদিগ গজকে দেখতে পান। তার চেহারা—'মনুষ্য বলিলেও বলা যায়, বজ্রাঘাতে পত্রভ্রষ্ট মধ্যমাকার তালগাছ বলিলেও বলা যায়'! অনেক লোকের ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে মানিকপীরের পুঁথি পড়ছিল গজপতি। ওস্‌মানের অনুমোদন পেয়ে সে জগৎসিংহের কাছে আসতে পেরেছে। নবম পরিচ্ছেদে,—সেই সূত্রেই অনেকদিন পরে রুদ্ধ দুর্গের বাইরের হাওয়া পাওয়া যায়! দিগ্‌গজের ভীরুতা, সারল্য, চালাকি,—সব নিয়ে তার অদ্ভুত হাস্যকর ব্যক্তিত্বের যে বিশিষ্টতা,—সেই পরিহাসব্যঞ্জনারই সুকৌশল প্রয়োগ ঘটেছে আবার। প্রথম খণ্ডে, শৈলেশ্বর-মন্দিরের দুশ্চিন্তায়, এবং প্রতীক্ষাভারে অন্ধকার পথে সে যেমন বিমলার সঙ্গী হয়েছিল, দ্বিতীয় খণ্ডের এই অষ্টম নবম পরিচ্ছেদে জগৎসিংহের রোগ আর কারাযন্ত্রণার গুরুভার লঘু করবার জন্যেই সে যেন তেমনি আবার এসে দাঁড়ায়! রাষ্ট্রদুর্যোগের তাড়নায় গজপতি ধর্মান্তর গ্রহণ ক'রেছে; জগৎসিংহকে সে বলে—'আর আর ব্রাহ্মণ অনেকেই ঐরূপ মোছলমান হইয়াছে।' জগৎসিংহের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি লক্ষ্য ক'রে ওস্‌মান বলে—'রাজপুত্র ইহাতে দোষ কি? মোছলমানের বিবেচনায় মহম্মদীয় ধর্মই সত্য ধর্ম; বলে হউক ছলে হউক, সত্যধর্ম প্রচারে আমাদের মতে অধর্ম নাই, ধর্ম আছে।'

দিগ্‌গজের কাছে বহির্জগতের আরো কয়েকটি খবর পাওয়া যায়—অভিরামস্বামী পালিয়ে গেছেন,—বীরেন্দ্র সিংহকে নবাব কতলু খাঁ কেটে ফেলেছেন,—বিমলা এখন নবাবের উপপত্নী,—তিলোত্তমাও তাই!—'দাসদাসী লইয়া তাহারা স্বচ্ছন্দে আছে।'

যথার্থ খবর জানবার আগ্রহেই দিগ্‌গজের হাত চেপে ধ'রেছিলেন জগৎসিংহ। এই খবর শুনে তিনি জোরে সে-হাত ছেড়ে দেন। নবম পরিচ্ছেদের এই শেষ দিকে—'ওস্‌মান লজ্জিত হইয়া মৃদুভাবে কহিলেন, 'আমি সেনাপতি মাত্র। রাজপুত্র উত্তর করিলেন, আপনি পিশাচের সেনাপতি।'

দ্বিতীয় খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'প্রতিমা বিসর্জন।' সে রাত্রে জগৎসিংহের চোখে ঘুম নেই। 'শয্যা অগ্নিবিকীর্ণবৎ, হৃদয়মধ্যে অগ্নি

জ্বলিতেছে।' গভীর রাত পর্যন্ত এই জ্বালা ভোগ ক'রে কখন একসময়ে তাঁর ঘুম এসেছিল। সকালে ওস্মান তাঁর ঘুম ভাঙিয়ে বিমলার সেই চিঠি প'ড়তে দেন। সে চিঠি প'ড়ে যুবরাজ সেটি আগুনে ফেলে দেন। তারপর পূজাহ্নিক শেষ ক'রে,—ইষ্টদেব স্মরণ ক'রে সংকল্প গ্রহণ করেন—'আমি রাজধর্ম পালন করিব···বিধর্মীর উপপত্নীকে এ চিত্ত হইতে দূর করিব।' অর্থাৎ এই পরিচ্ছেদে জগৎসিংহের মনে তিলোত্তমা-প্রতিমার বিসর্জন ঘটে গেল!

একাদশ পরিচ্ছেদে প্রথমেই দেখা যায়—ওসমান জগৎসিংহের কাছে বিমলার চিঠির জবাব চেয়েছেন। জগৎসিংহ কয়েকটিমাত্র কথায় তাঁর জবাব লিখে দেন—'মন্দভাগিনী। আমি তোমার অনুরোধ বিস্মৃত হইব না। কিন্তু তুমি যদি পতিব্রতা হও, তবে শীঘ্র পতি-পথাবলম্বন করিয়া আত্মকলঙ্ক লোপ করিবে।'

সেই চিঠি নিয়ে, নিজে সে চিঠি পড়ে, জগৎসিংহকে ওসমান বলেন 'রাজপুত্র! আপনার হৃদয় অতি কঠিন।' জগৎসিংহ জবাব দেন—'পাঠান অপেক্ষা নহে।' ঈষৎ কথা-কাটাকাটির পরে, কতলু খাঁর হুকুম-মতন জগৎসিংহের কাছে সন্ধির প্রস্তাব করেন ওসমান; কিন্তু জগৎসিংহ তাতে রাজী নন। ফলে, সেই আরামের আশ্রয় থেকে কারাগারের যথার্থ যন্ত্রণার জায়গায় তাঁকে সরে যেতে হয়। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, ঠিক এই ঘটনার পরেই দৃশ্য বদ্‌লে গিয়ে দেখা দেয় কতলু খাঁর জন্মোৎসব-সমারোহ! 'রঙ্গ, নৃত্য, দান, আহার,—ভিক্ষুক, মদ্যপ, নট, নর্তকী,—গায়ক, বাদক, ঐন্দ্রজালিক, পুষ্পবিক্রেতা'—নানা জনের সেই বিচিত্র সমাবেশের মধ্যেই অন্দরমহলের এক কোণে তিলোত্তমার ঘরে গিয়ে, বিমলা তাঁর নিজের সংকল্প এবং তিলোত্তমার উদ্ধারের আশা দুই-ই ব্যক্ত করেন। আশমানিকে দিয়ে অভিরাম স্বামীর কাছ থেকে তিনি ছোরা আনিয়েছেন, আর ওস্মানের কাছ থেকে পাওয়া আংটিটি তিলোত্তমাকে দিয়ে তাঁর মুক্তির উপায় বলে দেন। তিলোত্তমাকে তিনি বলেন—'এখনও আমাদিগের প্রাণ আছে, ধর্ম আছে; যত দিন প্রাণ আছে, তত দিন ধর্ম রাখিব।'

এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদের শেষে জগৎসিংহ সম্বন্ধে বিমলা শুধু এইটুকুই বলেন যে,—'জৎগসিংহ এই দুর্গমধ্যেই আছেন; তিনি শারীরিক কুশলে আছেন।' তিলোত্তমার মনে তখনো জগৎসিংহের জন্যে গভীর ব্যাকুলতা!

তাই, বিমলা তাঁকে আঘাত দিতে চাননি! যুবরাজের খবর সম্বন্ধে এখানে তাই তাঁর এই লক্ষণীয় সংযম। এ ছাড়া দ্বাদশ পরিচ্ছেদের আরো একটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। আঘাতে তিলোত্তমা আর লজ্জাশীলা বালিকা মাত্র ছিলেন না—'তিলোত্তমা আর ব্রীড়াবিবশ বালিকা নহে। তদ্দণ্ডে তাঁহাকে সেই ক্ষীণালোকে দেখিলে বোধ হইত যে, দশ বৎসর পরিমাণ বয়োবৃদ্ধি হইয়াছে।' তবু জগৎসিংহের বিষয়ে বিমলাকে তিলোত্তমা সোজাসুজি কিছু জিগেস ক'রতে পারেন নি, শুধু ব'লেছিলেন—'দেখিতেছি, তুমি দুর্গের সকল সংবাদ পাইয়াছ, আমাদিগের আত্মীয়বর্গ কোথায়?'

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, বিমলা চলে যাবার পরে, একলা ঘরে—'সকল চিন্তার সমতা করিয়া আর এক চিন্তা মনোমধ্যে প্রদীপ্ত হইতে লাগিল।—রাজকুমার তবে কুশলে আছেন? কোথায় আছেন? কি ভাবে আছেন? তিনি কি বন্দী?' এই ভাবনার তাড়নাতেই দ্বিপ্রহর রাত্রে বিমলার দেওয়া আংটি নিয়ে তিনি নিজের মুক্তির পথে পা বাড়াতে পারেননি। তিনি গেছেন যুবরাজ জগৎসিংহের কারাকক্ষে! জগৎসিংহ জিগেস ক'রেছেন—'বীরেন্দ্রসিংহের কন্যা? এখানে কি অভিপ্রায়ে?' অনেকক্ষণ তাঁকে নিরুত্তর দেখে যুবরাজ বলেন—'তুমি যন্ত্রণা পাইতেছ, ফিরিয়া যাও, পূর্বকথা বিস্মৃত হও।'

সেই নির্মম নিয়তির অপ্রত্যাশিত আঘাতে তিলোত্তমার মূর্চ্ছা হয়।

এ অবস্থায় নবাবপুত্রী আয়েষাকে মনে পড়া জগৎসিংহের পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। প্রহরীর কাছে খবর শুনে আয়েষা এসেছেন এক পরিচারিকাকে সঙ্গে নিয়ে। তিলোত্তমা তখন ঈষৎ সুস্থ হ'য়েছেন। আয়েষার সেবায় সম্পূর্ণ জ্ঞান ফিরে এলে তিনি তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে চেষ্টা করেন। আয়েষা তাঁকে আশ্বস্ত ক'রে—দাসী, তিলোত্তমা আর তিনি নিজে—তিনজনে একসঙ্গে বিদায় নিতে উদ্যত হন। কিন্তু, চতুর্দশ পরিচ্ছেদের এই শেষ কয়েক ছত্রের মধ্যেই আর একটি ইঙ্গিত আছে—'আয়েষাও রাজপুত্রের নিকট বিদায় হয়েন; রাজপুত্র তাহার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিলেন, যেন কিছু বলিবেন। আয়েষা ভাব বুঝিতে পারিয়া দাসীকে কহিলেন, 'তুমি ইঁহাকে আমার শয়নাগারে বসাইয়া পুনর্বার আসিয়া আমাকে লইয়া যাইও।'

যেতে যেতে যতদূর থেকে দেখা যায়, জগৎসিংহকে দেখতে-দেখতে তিলোত্তমা দৃষ্টির বাইরে চলে গেলেন!

চতুর্দশ, পঞ্চদশ পর পর দুটি পরিচ্ছেদই সমান চমকপ্রদ। প্রথমটির নাম 'মোহ', দ্বিতীয়টির 'মুক্ত কণ্ঠ'! এই পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে,—সেই গভীর রাত্রে জগৎসিংহের কারাকক্ষে—আয়েষা শয্যায় বসে আছেন, জগৎসিংহ তাঁর কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। সেই সময়ে—

> 'আয়েষা কবরী হইতে একটি গোলাব খসাইয়া তাহার দলগুলি নখে ছিঁড়িতে ছিঁড়িতে কহিলেন, রাজকুমার ভাবে বোধ হইতেছে যে, আপনি আমাকে কি বলিবেন। আমা হইতে যদি কোন কর্মসিদ্ধ হইতে পারে, তবে বলিতে সংকোচ করিবেন না; আমি আপনার কর্ম করিতে পরম সুখী হইব।'

জগৎসিংহের মন অত্যন্ত কাতর, তাঁর কণ্ঠস্বর নৈরাশ্যব্যঞ্জক। সেই গভীর হতাশার ফলে, জীবনে তিনি বীতস্পৃহ বোধ করেন। আয়েষা বলেন 'যুবরাজ! আজ যে তোমার নিকট এভাবে বিদায় লইব, তাহা মনে ছিল না। আমি অনেক সহ্য করিতে পারি, কিন্তু কারাগারে তোমাকে একাকী যে এ মনঃপীড়ার যন্ত্রণা ভোগ করিতে রাখিয়া যাইব, তাহা পারিতেছি না। জগৎসিংহ! তুমি আমার সঙ্গে বাহিরে আইস; অশ্বশালায় অশ্ব আছে, দিব, অদ্য রাত্রেই শিবিরে যাইও।'

জগৎসিংহ তাতে রাজী হননি।

আয়েষা অশ্রুবর্ষণ করেন।

জগৎসিংহ বলেন, 'যদি আমার প্রাণদান করিলে তোমার নীরব রোদনের কারণ নিরাকরণ হয়, তাহা আমি করিব।'—কিন্তু জগৎসিংহই তো একমাত্র বন্দী নন, কতলুখাঁর কারগারে আরো অনেক বন্দী আছে! আয়েষাকে তিনি এই আত্মচিন্তা এবং এই সমালোচনা জানাতেও ইতস্তত: করেন নি।

ঠিক এই সময়ে—'প্রকোষ্ঠ-প্রাকারে আর এক ব্যক্তির ছায়া পড়িল; কেহ তাহা দেখিতে পাইলেন না। ক্ষণেক স্তম্ভের ন্যায় স্থির দাঁড়াইয়া, পরে ক্রোধকম্পিত স্বরে আগন্তুক কহিল, 'নবাবপুত্রি! এ উত্তম।'

ওসমান-জগৎসিংহ-আয়েষা প্রণয়-কাহিনীর ত্রিভুজের এই তিন চরিত্রের সমাবেশ এখানে এক পরমাশ্চর্য ঘটনা! বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই প্রথম উপন্যাসে চরিত্র-রূপায়ণে যে একেবারেই মনোযোগী ছিলেন না, তা নয়। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে একথা বলতেই হয় যে, ঘটনা-সমারোহ আর কবিত্বের পরিচয়ই এখানে বেশি। রমণীর রূপ-বর্ণনায় তিনি তাঁর কল্পনাশক্তির বিশিষ্টতা দেখিয়েছেন,—আবহ-বর্ণনায় তিনি বার বার উদ্যত হয়েছেন,—গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজের সারল্যের রূপায়ণে হাস্য-পরিহাসও কম ঘটেনি। কিন্তু উচ্চ-পরিবারের সম্ভ্রান্ত নর-নারীর প্রণয়-পরিণতি ফুটিয়ে তোলবার নৈপুণ্যই এখানে সর্বাধিক! অপ্রত্যাশিত ও চমকপ্রদ ঘটনাস্রোতে সে প্রণয় নিত্য-আন্দোলিত!

ওসমানের ব্যাঙ্গোক্তি শুনে আয়েষার মুখের রঙ হয়েছে 'রক্তবর্ণ'! ওসমানের তিরস্কার অতঃপর তীব্র, তিক্ত, অপমানকর। সেই অবস্থায়—

> 'আয়েষা দাঁড়াইয়া উঠিলেন। কিয়ৎক্ষণ পূর্ববৎ স্থিরদৃষ্টিতে ওসমানের প্রতি নিরীক্ষণ করিলেন; তাঁহার বিশাল লোচন আরও যেন বর্ধিতায়তন হইল। মুখপদ্ম যেন অধিকতর প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল। ভ্রমরকৃষ্ণ অলকাবলীর সহিত শিরোদেশ ঈষৎ একদিকে হেলিল; হৃদয় তরঙ্গান্দোলিত নিবিড় শৈবালজালবৎ উৎকম্পিত হইতে লাগিল; অতি পরিষ্কার স্বরে আয়েষা কহিলেন, 'ওসমান, যদি তুমি জিজ্ঞাসা কর, তবে আমার উত্তর এই যে, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর!'

এই নাটকীয় ঘটনা-সংস্থান ও পরমাশ্চর্য স্পষ্টোক্তির আঘাতে প্রতিপক্ষের মানসিক অবস্থা যে কী দাঁড়াতে পারে, পাঠকের সে-অনুমান এবং সে-জিজ্ঞাসার দিকে লক্ষ্য রেখে তিনি লিখেছেন:

> 'যদি তন্মুহূর্তে কক্ষমধ্যে বজ্রপতন হইত, তবে রাজপুত কি পাঠান অধিকতর চমকিত হইতে পারিতেন না। রাজপুত্রের মনে অন্ধকার-মধ্যে যেন কেহ প্রদীপ জ্বালিয়া দিল। আয়েষার নীরব রোদন এখন তিনি বুঝিতে পারিলেন। ওসমান কতক কতক ঘৃণাক্ষরে পূর্বেই এরূপ সন্দেহ করিয়াছিলেন, এবং সেইজন্যই আয়েষার প্রতি এরূপ তিরস্কার করিতেছিলেন, কিন্তু আয়েষা

তাঁহার সম্মুখেই মুক্তকণ্ঠে কথা ব্যক্ত করিবেন, ইহা তাঁহার স্বপ্নেরও অগোচর। ওসমান নিরুত্তর হইয়া রহিলেন।'

আয়েষার আরো অনেক কথা বলবার ছিল,—সেই উত্তেজনার মুহূর্তে তিনি নিঃশেষে সবই বলেছেন! বলেছেন—'শুন ওসমান, আবার বলি, এই বন্দী আমার প্রাণেশ্বর,—যাবজ্জীবন অন্য কেহ আমার হৃদয়ে স্থান পাইবে না…।'

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে জগৎসিংহকে তিনি বলেন—'রাজপুত্র, তুমিও অপরাধ ক্ষমা কর। যদি ওসমান আজ আমাকে মনঃপীড়িত না করিতেন, তবে এ দগ্ধ হৃদয়ের তাপ কখনও তোমার নিকট প্রকাশ পাইত না, কখনও মনুষ্যকর্ণগোচর হইত না।'

ওসমানের কাছেও তিনি মার্জনা চেয়েছেন—'ওসমান আবার বলি, যদি দোষ করিয়া থাকি, দোষ মার্জনা করিও। আমি তোমার পূর্ববৎ স্নেহপরায়ণা ভগিনী…।'

এই নাটকীয় ঘটনা-সংঘাতের পরেই, পরের পরিচ্ছেদে আবার দেখা দিয়েছে রমণীর রূপ-বর্ণনা, আবার সমারোহময় উৎসবদৃশ্য!—'ঐ দেখ পাঠক! যেন পদ্মবনে হংসী সমীরণোত্থিত তরঙ্গহিল্লোলে নাচিতেছে; প্রফুল্ল পদ্মমুখী সবে ঘিরিয়া রহিয়াছে। দেখ, দেখ, ঐযে সুন্দরী নীলাম্বরপরিধানা, ঐ যার নীল বাস স্বর্ণতারাবলীতে খচিত, দেখ! ঐ যে দেখিতেছ, সুন্দরী সীমন্ত-পার্শ্বে হীরকতারা ধারণ করিয়াছে, দেখিয়াছ উহার কি সুন্দর ললাট। প্রশান্ত, প্রশস্ত, পরিষ্কার; এ ললাটে কি বিধাতা বিলাসগৃহ লিখিয়াছিলেন?' কতলু খাঁর জন্মোৎসবের বিলাস-দৃশ্যে নারী আর পুষ্পসম্ভার,—নীল বসনের বর্ণপ্রভা আর সুকেশীর বেণীসজ্জা—মধুরে ভয়ঙ্করে আবার সেই পরমাশ্চর্য সমাবেশ!

এই বর্ণনার মধ্যেই আশ্চর্য একটি সাদৃশ্যের চিন্তা সত্যিই স্বাতন্ত্র্য দাবি করে। এক রূপসীকে সম্বোধন ক'রে তিনি লিখেছেন—'পদ্মবৃক্ষে কেমন করিয়া কালফণিনী জড়ায়, তাহাই কি দেখাইতেছ?'

কিন্তু পদ্ম-লতার খ্যাতিই পরিচিত; 'পদ্মবৃক্ষ' শব্দটি অপ্রত্যাশিত। মধুর আর ভয়ানকের সমাবেশ-অনুভূতি থেকেই বঙ্কিমচন্দ্র এখানে এই বিশেষ

ভাষা-সন্ধান ক'রেছিলেন বলে মনে হয়। কালফণিনীর নির্ভরযোগ্য অবলম্বন বা আশ্রয়ের ভাবনা থেকেই হয়তো 'পদ্মবৃক্ষ' শব্দটি দেখা দিয়েছে! ষোড়শ পরিচ্ছেদে, পর-পর তিনটি অনুচ্ছেদে এই পরিবেশ বর্ণনা ক'রে, চতুর্থ অনুচ্ছেদে সেই ধারাতেই তিনি লিখেছেন—'আর তুমি কে সুন্দরী, যে কতলু খাঁর পার্শ্বে বসিয়া হেমপাত্রে সুরা ঢালিতেছ? কে তুমি যে সকল রাখিয়া তোমার পূর্ণলাবণ্য দেহপ্রতি কতলু খাঁ ঘন ঘন সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতেছে? কে তুমি অব্যর্থ কটাক্ষে কতলু খাঁর হৃদয় ভেদ করিতেছ? ও মধুর কটাক্ষ চিনি; তুমি বিমলা।' রূপজ আকর্ষণের তীব্রতম ভাবাচিত্র এই অনুচ্ছেদেই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিমলার নৃত্য, গীত, কটাক্ষ, আর অঙ্গভঙ্গি দেখে 'সুরাস্বাদপ্রমত্ত' কতলু খাঁ তখন মোহগ্রস্ত। প্রমত্ততার সেই বিশেষ ছন্দটিও এখানকার ভাষায় ধ্বনিত :

> 'কতলু খাঁ, এ কি? মন কোথায় তোমার? কি দেখিতেছ? সমে সমে হাসিয়া কটাক্ষ করিতেছে; ছুরির অধিক তোমার হৃদয়ে বসাইতেছে, তাহাই দেখিতেছ? অমনি কটাক্ষে প্রাণহরণ করে, আবার সংগীতের সন্ধিসম্বন্ধ কটাক্ষ! আরও দেখিয়াছ কটাক্ষের সঙ্গে আবার অল্প মস্তক দোলন? দেখিয়াছ, সঙ্গে সঙ্গে কেমন কর্ণাভরণ দুলিতেছে? হাঁ। আবার সুরা ঢাল, দে মদ দে, এ কি! বিমলা উঠিয়া নাচিতেছে। কি সুন্দর! কিবা ভঙ্গী! দে মদ! কি অঙ্গ! কি গঠন! কতলু খাঁ! জাঁহাপনা! স্থির হও! স্থির! উঃ! কতলুর শরীরে অগ্নি জ্বলিতে লাগিল। পিয়ালা। আহা! দে পিয়ালা! আহা দে পিয়ালা। মেরি পিয়ারী! আবার কি? এর উপর হাসি, এর উপর কটাক্ষ? সরাব! দে সরাব!'

এই প্রমত্ততার উত্তাল ঊর্ধ্বগতির পরেই বিমলার সংকল্প-সিদ্ধির আকস্মিক অভিঘাত! প্রত্যুৎপন্নমতি বিমলা তাঁর এই সংকল্প সাধনের পরেই অভিরাম স্বামীর কুটীরে গিয়ে পৌঁছেছেন। আয়েষার অনুগ্রহে আশমানির সঙ্গে তিলোত্তমা সেখানে আগেই উপস্থিত!

এই চতুর্দশ, পঞ্চদশ, ষোড়শ পরিচ্ছেদে রোমান্সের চমক ও দ্রুতগতি যেন চরম দৃষ্টান্ত রেখে গেছে! ঘটনা-স্রোত এখানে দ্রুত বটে, কিন্তু কার্য-কারণের

সম্ভাব্যতা সর্বত্র নিখুঁত ভাবে মেনে চলা হয়েছে বলা যায় না। অক্ষত দেহে বিমলার অভিরাম স্বামীর কুটীরে এসে পৌঁছোনো অবিশ্বাস্য ব্যাপার। কিন্তু সে অন্য কথা। বাংলা উপন্যাসের সেই আদিপর্বে, দুরাত্মার নিশ্চিত কবল থেকে বীরাঙ্গনা সুন্দরী সতীর এই অবিশ্বাস্য মুক্তি-অর্জনের নমুনা দেখে পাঠক-মনে যে গভীর তৃপ্তি জেগেছিল, সে অনুমান সংশয়াতীত!

মৃত্যুর পূর্বে কতলু খাঁর সঙ্গে জগৎসিংহের সাক্ষাৎ হয়। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে সেইটিই প্রধান কথা। মুমূর্ষু কতলু খাঁ তখন মাত্র দুটি কথা জানিয়েছেন,—পাঠান চায় মোগল-শক্তির সঙ্গে সন্ধি এবং উড়িষ্যায় নিজেদের অধিকার অব্যাহত রাখতে; দ্বিতীয়তঃ বীরেন্দ্র সিংহের কন্যা তিলোত্তমা সাধ্বী!

প্রিয় কন্যার নাম ক'রতে-ক'রতে তাঁর জীবনান্ত হয়। আয়েষাকে কতলু খাঁ খুবই ভালোবাসতেন।

'দুর্গেশনন্দিনী'র মূল কথা যে এতক্ষণে প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আঠারোর পরিচ্ছেদের প্রথম কয়েকটি বাক্যে সে-ধারণার আভাস পাওয়া যায়। মোগল-পাঠানের সন্ধি বর্ণনায় বঙ্কিম কালক্ষেপ ক'রতে চাননি। এ পরিচ্ছেদের নাম 'প্রতিযোগিতা'। বিদায়ের আগে জগৎসিংহ আয়েষার সঙ্গে দেখা ক'রতে যান। কিন্তু আয়েষা দেখা করেননি। তাই জগৎসিংহ যখন নিজের শিবিরে ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন ওসমানের আমন্ত্রণে, অন্য সহচরহীন অবস্থায় তিনি এক প্রাঙ্গণে এসে উপস্থিত হন। নিবিড় এক শালবনে, সেই নির্জন ভগ্নকুটীরের প্রাঙ্গণে একদিকে মুসলমানের জন্যে কবর, অন্যদিকে রাজপুতের উপযুক্ত চিতাশয্যা প্রস্তুত! দুজনেই অস্ত্রধারী। ওসমান জগৎসিংহকে যুদ্ধে আহ্বান জানান। জগৎসিংহ প্রথমে পরাভব স্বীকার করেন, তারপরে বলেন, 'আমি আয়েষার অভিলাষী নহি।' কিন্তু ওসমানের দৃঢ় বিশ্বাস—'এই পৃথিবীর মধ্যে আয়েষার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তির স্থান হয় না, একজন এইখানে প্রাণত্যাগ করিব।' তাই অসিযুদ্ধ অনিবার্য! সেই জনহীন শালবনে, সেই কবর আর চিতাশয্যার সামনে দাঁড়িয়ে, দুই বীরের প্রতিযোগিতা শেষ হয়। ওসমান পরাজিত হন বটে, কিন্তু বীর নায়কের মহিমা অক্ষুণ্ন রেখে, জগৎসিংহ তাঁকে জীবিত অবস্থায়, নিরস্ত্র দেহে ফিরে যেতে দেন।

পরিচ্ছেদ শেষ হবার আগেই আর-একটি অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত ব্যাপার দেখা দেয়। জগৎসিংহের ঘোড়া বাঁধা ছিল এতক্ষণ। সেই ঘোড়ার বল্গায় গোপনে কে একখানি চিঠি রেখে গেছে। চিঠির ওপরেই সংক্ষেপে এই নির্দেশটি চোখে পড়ে—'এই পত্র দুই দিবস মধ্যে খুলিবেন না, যদি খুলেন, তবে ইহার উদ্দেশ্য বিফল হইবে।' বলা বাহুল্য, এও পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপনার আর-এক কৌশল। কিন্তু এই চিঠির বিষয়বস্তুতে পৌঁছোবার আগেই উনিশের পরিচ্ছেদে আর একখানি চিঠির বিবরণ পাওয়া যায়। সে পরিচ্ছেদের নাম 'আয়েষার পত্র।'

আয়েষার এই চিঠিতেই তাঁর জীবন-নাটকের এই ভূমিকার শেষ বক্তব্য পরিবেশিত! মোগল-পাঠানের প্রতিদ্বন্দ্বিতা শেষ হবার নয়, কিন্তু জগৎ সিংহের সঙ্গে পাঠানদের আবার যদি দেখা হয়, তাহলেও আয়েষার সঙ্গে জগৎসিংহের আর দেখা হবে না। কারণ,—আয়েষার নিজের কথায়—'রমণীহৃদয় যেরূপ দুর্দমনীয়, তাহাতে অধিক সাহস অনুচিত'! কিন্তু রমণী-হৃদয়ের আরো একটি কামনা সেই চিঠিতেই উচ্চারিত—আর একবার মাত্র তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিব মানস আছে। যদি তুমি এ প্রদেশে বিবাহ কর, তবে আমায় সংবাদ দিও; আমি তোমার বিবাহকালে উপস্থিত থাকিয়া তোমার বিবাহ দিব। যিনি তোমার মহিষী হইবেন, তাঁহার জন্য কিছু সামান্য অলঙ্কার সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম, যদি সময় পাই, স্বহস্তে পরাইয়া দিব।'

এ চিঠির উত্তরে জগৎসিংহ লেখেন—'আয়েষা তুমি রমণীরত্ন। জগতে মনঃপীড়াই বুঝি বিধাতার ইচ্ছা! আমি তোমার কোন প্রত্যুত্তর লিখিতে পারিলাম না। · আমাকে ভুলিও না। যদি বাঁচিয়া থাকি, তবে এক বৎসর পরে ইহার উত্তর দিব।'

অতঃপর আর তিনটি মাত্র পরিচ্ছেদেই 'দুর্গেশনন্দিনী' শেষ হয়েছে। জগৎসিংহ-তিলোত্তমার পরিণয়-সম্ভাবনার সমর্থন আছে কুড়ির পরিচ্ছেদে। শালবনের সেই ঘোড়ার বল্গায় বাঁধা চিঠি প'ড়ে,—সেই নির্দেশ অনুসারেই জগৎসিংহ আবার সেখানে ফিরে গিয়ে—অভিরাম স্বামীর, রোগগ্রস্ত তিলোত্তমার, এবং বিমলার সাক্ষাৎ পান। চিঠিতে স্বাক্ষর ছিল 'অহং ব্রাহ্মণঃ'। সেই ব্রাহ্মণই অভিরাম স্বামী। বঙ্কিমচন্দ্রের বর্ণনা অনুসারে—বিমলা তখন নিরাভরণা, মলিনা, দীনা।

একুশের পরিচ্ছেদে তিলোত্তমার পরমাশ্চর্য স্বপ্ন! জগৎসিংহ-তিলোত্তমার অনুরাগ তখনো অপরিম্লান, অনির্বাপিত। তিলোত্তমাকে জগৎসিংহ বিবাহ ক'রতে প্রস্তুত,—এই প্রার্থনা শুনে অভিরাম স্বামী এবং বিমলা দুজনেরই মনে অদ্ভুত আনন্দ বিহ্বলতা দেখা দেয়। এই বিহ্বলতার দৃশ্যটি একভাবে 'চন্দ্রশেখরে'র পূর্বাভাস বলা চলে।

'তিলোত্তমা লজ্জায় অধোমুখী হইয়া রহিলেন।'

> 'সেই দিন প্রদোষকালে অভিরাম স্বামী কক্ষান্তরে প্রদীপের আলোকে বসিয়া পুতি পড়িতেছিলেন: রাজপুত্র তথায় গিয়া সবিনয়ে কহিলেন, 'মহাশয়, আমার এক নিবেদন, তিলোত্তমা এক্ষণে স্থানান্তরে গমনের কষ্ট সহ্য করিতে পারিবেন, অতএব আর এ ভগ্ন গৃহে কষ্ট পাইবার প্রয়োজন কি? কাল যদি মন্দ দিন না হয়, তবে গড়মান্দারণে লইয়া চলুন। আর যদি আপনার অনভিমত না হয়, তবে অম্বরের বংশে দৌহিত্রী সম্প্রদান করিয়া আমাকে কৃতার্থ করুন।'

এই কথা শুনে—

> 'অভিরাম স্বামী পুতি ফেলিয়া উঠিয়া রাজপুত্রকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, পুতির উপর যে পা দিয়া দাঁড়াইয়াছেন, তাহা জ্ঞান নাই।'

এই সময়ে বিমলার বিহ্বলতা তাঁর মস্তিষ্ক-বিকৃতিরই নামান্তর! অতঃপর বাইশের পরিচ্ছেদে গড়মান্দারণে বিবাহের আয়োজন। জাহানাবাদ থেকে জগৎসিংহ নিজের বন্ধুবান্ধবদের অনেককেই নিমন্ত্রণ ক'রে আনেন। আয়েষাও আমন্ত্রিত হয়ে আসেন। তিলোত্তমা হাসতে হাসতে তাঁকে বলেন—'আয়েষাকে ভুলিলে যুবরাজ আমার মুখ দেখিবেন না।' আয়েষা তাতে গম্ভীর হয়ে বলেন, 'এ কথায় আমি সন্তুষ্ট হইলাম না। তুমি আমার কথা কখন যুবরাজের নিকট তুলিও না। এ কথা অঙ্গীকার কর।'

তারপর তিলোত্তমাকে অলঙ্কার পরিয়ে তিনি পুনরপি বলেন—'আমি যে রত্নগুলি দিলাম, অঙ্গে পরিও। আর আমার—তোমার সার রত্ন হৃদয়মধ্যে রাখিও।'

গভীর রাত্রে নিজের আশ্রয়ে ফিরে, কক্ষবাতায়নে দাঁড়িয়ে, আকাশের অগণ্য তারা দেখলেন তিনি! জীবনের পরমাশ্চর্য নাটকের কথা ভাবতে ভাবতে আত্মহত্যার সংকল্প দূর ক'রে গরলাধার অঙ্গুরীয়টি তিনি দুর্গ-পরিখার জলে ফেলে দেন!

'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে প্রায় প্রত্যেক পরিচ্ছেদ ধ'রে এই বিস্তৃত আলোচনার বিশেষ কারণ আছে। এইখানিই তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস। ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর স্বভাবের বিশেষ প্রবণতাগুলি তাঁর এই আদি রচনাতেই অল্পবিস্তর প্রতিফলিত হ'য়েছে। এই ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাসের উপাদান যে সামান্য পরিমাণেই গৃহীত হয়েছিল, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। মোগল-পাঠানের শক্তি-পরীক্ষার বৃহৎ আলোড়নের ফলে,— গৃহীত দেশকালের বিস্তীর্ণতর ক্ষেত্রে যে তরঙ্গাভিঘাত ঘটে, এ-উপন্যাসে তিনি তারই কতকটা পরিচয় দিয়েছেন। তবে মানসিংহ প্রভৃতি চরিত্রগুলিও তাঁর পূর্ণ মনোযোগের বিষয় হয়ে ওঠেনি, বিশেষ যুগের সর্বাঙ্গীন প্রকৃতি-রূপায়ণও তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল না। কয়েকটি মাত্র পরিচ্ছেদে [প্রথম খণ্ডের শেষে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পাঁচটিতে] তিনি দুর্গস্বামী কতলুখাঁর ভাগ্যবিপর্যয়ের রূপ দেখিয়ে গেছেন। এই আবহের ভয়ঙ্করতা তাঁর শিল্পিমনের সৃষ্টি। মোহিতলাল মজুমদার তাঁর সেই শিল্পিমনের কথাসূত্রেই লিখেছেন :

> 'তাঁহার প্রথম উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'তে সাহিত্যিক প্রেরণা ছাড়া আর কিছু ছিল না। 'দুর্গেশনন্দিনী' বাংলা ভাষার প্রথম রোমান্স—ইংরেজি রোমান্সের বাঁধা আদর্শে রচিত। 'মৃণালিনী', 'যুগলাঙ্গুরীয়', 'রাধারাণী'ও এই একই আদর্শে রচিত। কেবল, 'মৃণালিনী'র কল্পনা-মূলে স্বদেশপ্রেম প্রথম দেখা দিয়াছে। দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা' একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। তারপর সমাজ-সমস্যা ও চরিত্রনীতির প্রেরণায় রচিত চতুর্থ উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এই একই প্রেরণার ফল। 'আনন্দমঠ' ও 'রাজসিংহে'র দেশাত্মবোধ, 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারামে' ধর্মসমস্যা, 'রজনী'তে মনস্তত্ত্ব, এবং 'ইন্দিরা'য় শুধু গল্প-রচনার আনন্দ আছে। যাঁটি উপন্যাস, অর্থাৎ যেগুলিতে সমাজনৈতিক বা ধর্মনৈতিক কোনও অভিপ্রায় নাই, সেগুলির

সংখ্যা কম, এবং তাহার মধ্যে 'কপালকুণ্ডলা'ই উৎকৃষ্ট কাব্য হইয়াছে। যেগুলিতে স্বদেশ, সমাজ, ধর্ম ও নীতির প্রেরণা আছে, সেইগুলিতেই স্থানে স্থানে বঙ্কিমের কল্পনার চরম স্ফূর্তি হইয়াছে; চরিত্রের মহিমা ও ঘটনাসন্নিবেশের চাতুর্যে সেগুলি নাটকীয় সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। সমস্যার আওতায় বহুস্থানে গুরুতর ত্রুটি ঘটিলেও বঙ্কিমের যাহা কিছু শক্তি, তাহা যেন এই সমস্যার সংঘাতে উপলাহত ইস্পাতফলকের মত স্ফুলিঙ্গবৃষ্টি করিয়াছে। অথচ এই ব্যক্তিই ভারতীর অতুলন স্নেহ-হাস্য উপেক্ষা করিয়া, বেদীর নীচে না বসিয়া মন্দির-রক্ষায় তৎপর হইয়াছিল। চিত্তশুদ্ধি ও মনুষ্যত্ব আগে, কাব্য পরে—একথা বলিবার বঙ্কিমের কি প্রয়োজন ছিল? এ ভাবনা তাঁহার কেন?—কি জন্য; বঙ্কিম সম্বন্ধে সেই কথাটাই ভাবিবার সময় আসিয়াছে।'

'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে শুরু ক'রে উত্তরোত্তর তাঁর অন্যান্য উপন্যাসে রোম্যান্স-রচনার প্রেরণা থেকে বঙ্কিমচন্দ্র যে ক্রমশঃ স্বদেশপ্রেমে, সমাজচিন্তায়, ধর্ম ও নীতির প্রেরণায়—এবং সর্বোপরি মনুষ্যত্বের আদর্শেই সর্বাধিক মনোযোগী হয়েছিলেন, এই অত্যাবশ্যক দিকটি সংক্ষেপে উল্লেখ ক'রে তিনি আরো বলেন:

'তথাপি বঙ্কিমের উপন্যাসের চেয়ে বঙ্কিম বড়। তিনি শুধু সাহিত্যস্রষ্টা শিল্পী নহেন, নব্য বঙ্গসাহিত্যের প্রতিষ্ঠাতা। যে গুণে তাহা সম্ভব হইয়াছিল তাহা এই যে, তিনি যত বড় শিল্পী ছিলেন তার চেয়ে বড় ছিল তাঁহার ব্যক্তিত্ব, তাঁহার পৌরুষ। তাঁহার গ্রন্থাবলী পাঠ করিতে করিতে সর্বাগ্রে এবং সর্বদাই মনে হয়—Ecce Homo! Behold the Man. 'The first and last word in literature as in life is Character'। এই Character আমাদের সাহিত্যে এত বড় আর কাহারও ছিল না।'

মোহিতলালের আগেও 'দুর্গেশনন্দিনী'র কবিত্বের প্রশংসা অনেকেই ক'রেছেন। ভবিষ্যতেও সমালোচক-সমাজে বঙ্কিমচন্দ্রের পরিকল্পনার এই রকম প্রশংসার প্রতিধ্বনি আরো বিভিন্ন কণ্ঠে প্রচারিত হওয়াই প্রত্যাশিত। 'দুর্গেশনন্দিনী'র ঘটনা-প্রবাহের দ্রুতগতি এবং কবিকল্পনার সমৃদ্ধি সম্বন্ধে শ্রীকুমারবাবুও প্রশংসার কথা লিখেছেন। এ-রচনায় বঙ্কিমের ঐতিহাসিক

মনোযোগ সত্যিই অপেক্ষাকৃত কম। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কয়েকটি মাত্র পরিচ্ছেদ অবলম্বন ক'রে একজন সাধারণ দুর্গস্বামীর ভাগ্যবিপর্যয় এখানে 'প্রলয় ঝটিকার' বেগে প্রদর্শিত হ'য়েছে। এই দুটি কথা জানিয়ে তিনি আরো লিখেছেন :

> 'পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে দিগ্‌গজ-বিমলার সমস্ত লঘুহাস্য-পরিহাসের অবাস্তবতাকে ছাপাইয়া এক অজ্ঞাত অনন্ত আসন্ন বিপদের শঙ্কা ঘনাইয়া উঠিয়াছে। দুর্গজয়ের বিবরণে বীরেন্দ্রসিংহের বিচারের দৃশ্যে ও কতলুখাঁর হত্যাবর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র উচ্চাঙ্গের বর্ণনা ও কবিত্ব-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কারাগারে আয়েষার প্রেমাভিব্যক্তির দৃশ্যটিই উপন্যাসের কেন্দ্রস্থল। এখানে বঙ্কিমের প্রণালী বাস্তব ঔপন্যাসিকের প্রণালী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন : তিনি আয়েষার মনে প্রথম প্রণয়সঞ্চার ও উহার ক্রমবৃদ্ধির কোন সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেন নাই। তাহার সেবা ও সহানুভূতি যে কোন্ গোপন মুহূর্তে প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল বা ওসমানের প্রতি স্নেহের সহিত এই নবজাত প্রেমের কোন বিরোধ-সংঘর্ষ হইয়াছিল কি না, তাহার কোন পরিচয় তিনি দেন নাই; একেবারে অনিবার্য প্রেমের পূর্ণ বিকাশ দেখাইয়া আমাদিগকে চমৎকৃত করিয়া গিয়াছেন।'

এই ত্রুটির দিকগুলি দেখিয়ে তিনি লিখেছেন :

> 'পারিবারিক বা সামাজিক উপন্যাসে আমরা এই সমস্ত ভাব বিকাশের একটি সূক্ষ্মতর বিশ্লেষণ, একটি প্রকৃতি-মূলক বাখ্যা আশা করিয়া থাকি; এবং বঙ্কিমচন্দ্রও বর্তমান উপন্যাসে তিলোত্তমার ক্ষেত্রে ও তাঁহার পরবর্তী দুই-একখানি উপন্যাসে—'কৃষ্ণকান্তের উইল' ও 'বিষবৃক্ষ'-এ—এইরূপ বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই প্রথম উপন্যাসে, কতকটা ঐতিহাসিক ঘটনা-বাহুল্যের জন্য ও কতকটা রোমান্সসুলভ অপ্রত্যাশিত পরিণতির অবতারণার দ্বারা গল্পাংশের আকর্ষণ বৃদ্ধি করিবার জন্য, তিনি এরূপ মনস্তত্ত্বমূলক বিশ্লেষণে হস্তক্ষেপ করেন নাই। মনস্তত্ত্ব আলোচনার দিক হইতে ইহাকে একটি ত্রুটি বলিয়াই মনে করিতে হইবে।'

তারপর আরো একটি দিক্ বিবেচ্য। এ-উপন্যাসে চরিত্র-রূপায়ণের

দিকেও যে সমুচিত বিশ্লেষণের ওপর নির্ভর করা হয়নি, বা লেখক সে দায়িত্বে মনোযোগী ছিলেন না, সে-কথাও বলা হয়েছে। শ্রীকুমার বাবু লিখেছেন—'ঐতিহাসিক স্রোতের মধ্যে গভীর চরিত্রবিশ্লেষণের অবসর পান নাই।' কিন্তু তা সত্ত্বেও দু'একটি চরিত্র যে অল্প দু'একটি রেখায় জীবন্ত হয়ে উঠেছে, সে বৃত্তান্তও সুপরিচিত। তাঁরই কথায়:

> 'দুই-তিনটি দৃশ্যের মধ্যেই বীরেন্দ্রসিংহের চরিত্রের অসীম দার্ঢ্য ও অহংকার ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওসমানের হৃদয়ে অনির্বাণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তীব্র হিংসার বিকাশ দেখাইয়া বঙ্কিম তাহাকে একটি বাস্তব মূর্তি করিয়া তুলিয়াছেন, একটা বিশেষত্বহীন আদর্শমাত্রে পর্যবসিত হইতে দেন নাই। এই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য ক্রোধই তাহাকে একটি বিশেষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, দেশকালোচিত উপযোগিতা আনিয়া দিয়াছে। স্ত্রীচরিত্রগুলির মধ্যে তিলোত্তমা, বিমলা ও আয়েষার রূপ ও প্রকৃতির বিভিন্নতা বঙ্কিম কেবল অদ্ভুত শব্দ-সম্পদের দ্বারাই ফুটাইয়াছেন। তিলোত্তমা ও আয়েষা প্রায়ই নীরব, নিতান্ত স্বল্পভাষিণী; অথচ কেবলমাত্র নিপুণ শব্দচয়নের দ্বারা লেখক তাঁহাদের প্রকৃতিগত প্রভেদটি কবিত্বপূর্ণভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।'

তাঁর এই শব্দকৌশলের দিকটি আগেই আলোচিত হয়েছে। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে কেবল পরিবেশ-বর্ণনাতেই যে এই শব্দের ইন্দ্রজাল দেখা দেয়, তা নয়; তাঁর শব্দগুণে চরিত্রগত বিশেষত্বও এখানে সুচিহ্নিত। শ্রীকুমারবাবুর কথায়—'তিলোত্তমার বালিকাসুলভ, ব্রীড়াবনত প্রেম-বিহ্বলতা, ও আয়েষার মহীয়ান্ গাম্ভীর্য ও গভীর আত্মসংযম—ইহাদের মধ্যে [অর্থাৎ নিপুণ শব্দ-চয়নে] এরূপ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছে যে, তাহাদের পরস্পরের সম্বন্ধে ভুল করিবার আমাদের কোনও অবসর থাকেনা।' দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে বিমলা, তিলোত্তমা, আয়েষার রূপ-বর্ণনায় এ দিকটি আগেই দেখা গেছে।

এই বিশ্লেষণসূত্রেই গল্প-রচনার দিকে এখানকার ত্রুটি-বিচ্যুতির আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে:

> 'বিমলা ও বীরেন্দ্রসিংহের মধ্যে সম্বন্ধটি অনাবশ্যক জটিলতা ও রহস্যে আবৃত করা হইয়াছে; এবং বিমলার দীর্ঘ আত্মপরিচয়পত্রে

কতকগুলি ব্যাপারের অসম্ভাব্যতা পাঠকের অবিশ্বাস জাগাইয়া তোলে। দিগ্‌গজ উপাখ্যানের সমস্তটাই, স্থানে স্থানে প্রকৃত রসিকতা থাকা সত্ত্বেও মোটের উপর আতিশয্য ও অতিরঞ্জনের দ্বারা বিকৃত হইয়া উঠিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যেক উপন্যাসেই যে সন্ন্যাসী-জাতীয় একটা চরিত্র আনয়ন করিয়া অতিপ্রাকৃতের অবতারণা করিবার পথটি খুলিয়া রাখেন, তাহার প্রথম নিদর্শন আমরা অভিরাম স্বামীতে পাইয়া থাকি। অভিরাম স্বামীর আখ্যায়িকার মধ্যে বিশেষ কোন কার্য নাই; তিনি কেবল বিমলা বীরেন্দ্র সিংহের গোপন সম্বন্ধের একটা জীবন্ত নিদর্শন-স্বরূপেই উপন্যাস-মধ্যে স্থান লাভ করিয়াছেন; আর বীরেন্দ্র সিংহকে মোগল পক্ষ অবলম্বনের প্রবৃত্তি দিয়া গল্পের tragedy-কে আসন্নতর করিয়া দিয়াছেন। তবে বঙ্কিম এই প্রথম উপন্যাসে তাঁহার সন্ন্যাসীকে একেবারে রমানন্দ স্বামী বা সত্যানন্দের মত আদর্শলোকের কুহেলিকার মধ্যে লইয়া যান নাই। তাঁহাকে এক জ্যোতিষজ্ঞান ছাড়া আর কোন অতিমানবোচিত গুণের অধিকারী করিয়া দেখান নাই; এমন কি তাঁহার যৌবনের পদস্খলনের পরিচয় দিয়া তাঁহাকে সাধারণ লোকের সমশ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রথম বাংলা উপন্যাসে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর স্বভাবের সমস্ত লক্ষণই দেখা দিয়েছিল। তিনি তাঁর পরবর্তী লেখাগুলিতে তাঁর ত্রুটির দিকগুলি সাধ্যানুসারে সংশোধন ক'রেছেন, তাঁর কবি-কল্পনার ঐশ্বর্য উত্তরোত্তর আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। শব্দ-প্রয়োগ, চরিত্র-সৃষ্টি, আখ্যান-গঠন,—ইতিহাসের ক্ষীণ সূত্রে রোমান্সের কুহকজাল বিস্তৃত করবার প্রবণতা—ইত্যাদি যাবতীয় ব্যাপার এই 'দুর্গেশনন্দিনী'তেই প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে। সন্ন্যাসী-চরিত্র এবং বাস্তবের সঙ্গে অতিপ্রাকৃতের সমাবেশও এখানে দেখা গেছে। এই দ্বিতীয় দিকটির কথাসূত্রে শ্রীকুমারবাবু আরো জানিয়েছেন :

'বঙ্কিম তাঁহার প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই বাস্তব বর্ণনার মধ্যে অতিপ্রাকৃতের ছায়াপাত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কোন কোন উপন্যাসে এই অতিপ্রাকৃতের ছায়া সম্ভব-অসম্ভবের সীমারেখা

অতিক্রম করিয়া যায় না, মানুষের মানসিক অবস্থার সহিত একটি গূঢ় সাংকেতিকতার সম্বন্ধে আবদ্ধ থাকে।'

ইউরোপের আধুনিক গল্প-নাটকে এই ধরনের প্রতীক-চর্চা বা রহস্যবাদের উল্লেখ ক'রে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনীর এবং 'রজনী'তে শচীন্দ্রের স্বপ্নের কথা মনে ক'রিয়ে দিয়েছেন। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে তিলোত্তমার স্বপ্ন এই সূত্রেই স্মরণীয়। 'চন্দ্রশেখরে' যোগবলের গুণে শৈবলিনীর অসীম শক্তিলাভের কথাও বিবেচ্য। তাছাড়া—শৈবলিনীর বিকারগ্রস্ত মস্তিস্কে 'নরকবিভীষিকার প্রতিচ্ছায়া'র কথাও শ্রীকুমারবাবু উল্লেখ ক'রেছেন। 'আনন্দমঠে'র মহাপুরুষও স্মরণীয়।

এই বিস্তৃত আলোচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যধারায় 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র গুরুত্বের কারণগুলি অনুভব করা যাবে। অতঃপর তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'কপালকুণ্ডলা'র কথা বিবেচ্য।

'দুর্গেশনন্দিনী'র রোম্যান্স-রসের মূল অবলম্বন নায়ক-নায়িকার প্রেম। ইতিহাসের দূরত্ব এখানকার যোগ্য পটভূমি। বাস্তব পরিবেশে প্রতিদিনের বিভিন্ন আদান-প্রদান, মনন-বচনের বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রেমের সঞ্চার এক বিস্ময়-কর অনুভূতি! প্রেম চিরন্তন বটে, কিন্তু তা প্রতিদিনের অভ্যস্ত বাস্তবতার উর্ধ্ববর্তী সত্য। তাই সাধারণ সামাজিক উপন্যাসেও প্রেমের রূপায়ণই ঔপন্যাসিকদের সর্বাধিক অনুসৃত লক্ষ্য। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিমচন্দ্র রোম্যান্স-রসের অন্য একটি অবলম্বন দেখিয়ে দেন। সাগরসঙ্গম-সন্নিহিত জনহীন বনাঞ্চল,—সেখানে ভয়াল কাপালিকের তন্ত্র-সাধনা,—এবং সেই ভূমিকাতেই সমাজ-সম্পর্ক-বঞ্চিতা স্বভাবকোমলা, সুন্দরী রমণীর রমণীয়তা—'কপালকুণ্ডলা'র ভয়ঙ্কর ও মধুরের এই সমাবেশই দ্রষ্টব্য বিষয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' লেখবার সময়ে তিনি বোধ হয় মাঝে মাঝে এই রকম সমাবেশের তাগিদ অনুভব ক'রেছেন। 'কালফণিনী' আর 'পদ্মবৃক্ষে'র সংযোগ সেই অনুভূতির উদাহরণ। কৎলু খাঁর হত্যার দৃশ্যটি তিনি বোধ হয়,—অন্য আয়োজনে, অন্য উপাদানে, অন্য লক্ষ্যবোধে রূপান্তরিত ক'রতে চেয়েছিলেন। বিশেষ দেশ-কালের অতি সংকীর্ণ পরিবেষ্টনী থেকে উদ্ধার ক'রে সেই মধুর ও ভয়ঙ্করের সমাবেশ-রসকে তিনি মানবমনোজিজ্ঞাসার এক চিরন্তন প্রশ্নচিহ্নে চিহ্নিত ক'রে গেছেন। 'কপালকুণ্ডলা' তাঁর সেই কাব্যানুভূতির উত্তরণ বা রূপান্তরণের দৃষ্টান্ত!

কপালকুণ্ডলার সংহতিগুণ সুপরিচিত। এই—একান্ত-ভাবেই লক্ষ্য সন্ধানের বাহুল্যবর্জিত অবাধ গতি দেখে, শ্রীকুমারবাবু গ্রীক-ট্র্যাজেডির সঙ্গে এর সাদৃশ্যের কথা তুলেছেন। মাত্র সাতটি সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদে বিজন বনভূমি থেকে একযোগে কপালকুণ্ডলা আর নবকুমার দুজনেরই নিষ্ক্রমণ দেখানো হয়েছে। প্রথম খণ্ডের বাকি দুটি পরিচ্ছেদে কপালকুণ্ডলা-নবকুমারের বিবাহ উদ্‌যাপিত! দ্বিতীয় খণ্ডে প্রবেশ ক'রেই দেখা যায়—মেদিনীপুরে উপস্থিত হয়ে কপালকুণ্ডলার জন্যে নবকুমার এক দাসী, রক্ষক ও শিবিকাবাহক নিযুক্ত ক'রেছেন। কিন্তু এই খবরটুকু দিতে গিয়ে কোথাও অযথা কালক্ষেপের চিহ্ন নেই। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম দুটি অনুচ্ছেদেই পথের দুর্ঘটনার খবর জানা গেছে এবং রহস্য-রোমাঞ্চময় অদ্ভুত পরিবেশের যোগ্য আবেদন অবলম্বন ক'রেই সগৌরবে এ-কাহিনীর প্রতিনায়িকা প্রবেশ ক'রেছেন।

পথে, কপালকুণ্ডলা মেদিনীপুর থেকে শিবিকায় এগিয়ে ছিলেন,—নবকুমার পদব্রজে। সেই অন্ধকার রাত্রে দস্যুর আক্রমণে আহত অন্য এক রমণীকে উদ্ধার ক'রে ব্যগ্র হয়ে তিনি প্রশ্ন করেন—'কপালকুণ্ডলা না কি?' পরিহাস-রসিকা দ্বিতীয়া রমণী বলেন—'কপালকুণ্ডলা কে, তা জানিনা—আমি পথিক, আপততঃ দস্যুহস্তে নিষ্কুণ্ডলা হইয়াছি।' মুক্ত হয়ে রমণী বলেন—'অন্ধকারে একাকিনী মাঠে বসিয়া কি করিব, আপনার সঙ্গে চটি পর্যন্ত যাওয়াই উচিত। বোধ হয় কোন কিছুর উপর ভর করিতে পারিলে, চলিতে পারিব।' তখন নবকুমার বলেন—'বিপৎকালে সংকোচ মূঢ়ের কাজ। আমার কাঁধে ভর করিয়া চল।'—এবং লেখক জানিয়েছেন—'স্ত্রীলোকটি মূঢ়ের কার্য করিল না। নবকুমারের স্কন্ধেই ভর করিয়া চলিল।'

চটিতে পৌঁছে তাঁরা দেখেছেন—কপালকুণ্ডলা সেখানে আগেই উপস্থিত। দ্বিতীয় রমণীর জন্যে সন্নিহিত আর-একটি ঘর ঠিক ক'রে দেওয়া হয়। তারপর ঘরে আলো জ্বলে।—'যখন দীপরশ্মিস্রোতঃ তাঁহার সঙ্গিনীর শরীরে পড়িল, তখন নবকুমার দেখিলেন যে, ইনি অসামান্যা সুন্দরী। রূপরাশি-তরঙ্গে, তাঁহার যৌবনশোভা শ্রাবণের নদীর ন্যায় উছলিয়া পড়িতেছিল।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই রূপ-যৌবনের পূর্ণতর পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'তে রূপ-বর্ণনা যেমন এক স্বতন্ত্র আগ্রহের বিষয়,—ঘটনাস্রোতের গতি যেমন পৃথকভাবে নিজস্ব আবেদনে নির্ভর ক'রে এগিয়ে গেছে,

'কপালকুণ্ডলা'য় সে-রকম নয়। দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অভ্যস্ত ভঙ্গিতেই তিনি পাঠক-পাঠিকাকে সেই রূপ-সৌন্দর্যের আস্বাদনে তাঁর সাগ্রহ আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তাঁর অভ্যস্ত রীতিতেই কপালকুণ্ডলার প্রতিনায়িকা মতিবিবির বয়সের হিসেব দিয়েছেন। শব্দৈশ্বর্যে এ-বর্ণনা তাঁর পূর্বাদর্শেরই যোগ্য অনুসৃতি,—তবু এখানে এই একটিমাত্র পরিচ্ছেদে ঔপন্যাসিকের অনেক আবশ্যিক কর্তব্য একসঙ্গে সাধিত হয়েছে। বিদেশিনী এই দ্বিতীয়া রমণীর রূপও দেখা গেছে, যোগ্য গোপনতা রক্ষা ক'রে তিনি তাঁর আত্মপরিচয়ও সংক্ষেপে বিবৃত ক'রেছেন। মতিবিবি নবকুমারের পরিচয়ও জানতে চেয়েছেন, কপালকুণ্ডলার রূপের খ্যাতিও শুনেছেন।

উজ্জ্বল ক'রে দেওয়া প্রদীপের আলো নিভে গেছে সেই মুহূর্তেই! পান্থনিবাসের সেই বিশেষ রাত্রির বিশেষ পরিবেশ থেকে নবকুমার আর মতিবিবি উভয়েরই দৃষ্টি তৎক্ষণাৎ অতীতের প্রায়ান্ধকার সুদূর স্মৃতিলোকে জীবনের লুপ্তসম্পর্কের ক্ষীণ সূত্রগুলি পুনরুদ্ধারপ্রয়াসে উদ্যত! পাঠক-পাঠিকাকেও সেই অনতিদৃষ্ট সংযোগের ভাবনা ভাববার অবসর দেওয়া দরকার।

> 'যুবতী আপন পরিচ্ছদের প্রতি দৃষ্টি করিয়া কহিলেন, 'অভাগিনী বাঙ্গালী নহে; পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানী।' নবকুমার পর্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলেন, পরিচ্ছদ পশ্চিমপ্রদেশীয়া মুসলমানীর ন্যায় বটে। কিন্তু বাঙ্গালা ত ঠিক বাঙ্গালীর মতই বলিতেছে। ক্ষণ পরে তরুণী বলিতে লাগিলেন।
>
> 'মহাশয় বাগ্‌বৈদগ্ধ্যে আমার পরিচয় লইলেন; আপন পরিচয় দিয়া চরিতার্থ করুন। যে গৃহে সেই অদ্বিতীয়া রূপসী গৃহিণী, সে গৃহ কোথায়?
>
> নবকুমার কহিলেন, 'আমার নিবাস সপ্তগ্রাম।'
>
> বিদেশিনী কোন উত্তর করিলেন না। সহসা তিনি মুখাবনত করিয়া, প্রদীপ উজ্জ্বল করিতে লাগিলেন।
>
> ক্ষণেক পরে মুখ না তুলিয়া বলিলেন, দাসীর নাম মতি। মহাশয়ের নাম কি শুনিতে পাই না?'
>
> নবকুমার বলিলেন, 'নবকুমার শর্মা'
>
> প্রদীপ নিবিয়া গেল।'

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদের এই দ্রুততা, আকস্মিকতা এবং বিস্ময়ের দিকটি আগেই দেখা গেল। এইবার এ-উপন্যাসের সূচনার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক্। কাহিনী শুরু হয়েছে এই ভাবে:

> 'প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এক দিন মাঘ মাসের রাত্রিশেষে একখানি যাত্রীর নৌকা গঙ্গাসাগর হইতে প্রত্যাগমন করিতেছিল। পর্তুগিস্ ও অন্যান্য নাবিকদস্যুদিগের ভয়ে যাত্রীর নৌকা দলবদ্ধ হইয়া যাতায়াত করাই তৎকালের প্রথা ছিল; কিন্তু এই নৌকারোহীরা সঙ্গিহীন। তাহার কারণ এই যে, রাত্রিশেষে ঘোরতর কুজ্ঝটিকা দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়াছিল, নাবিকেরা দিঙ্‌নিরূপণ করিতে না পারিয়া বহর হইতে দূরে পড়িয়াছিল। এক্ষণে কোন্ দিকে কোথায় যাইতেছে, তাহার কিছুই নিশ্চয়তা ছিল না। নৌকারোহিগণ অনেকেই নিদ্রা যাইতেছিলেন। একজন প্রাচীন এবং একজন যুবা পুরুষ এই দুই জন মাত্র জাগ্রত অবস্থায় ছিলেন। প্রাচীন যুবকের সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন। বারেক কথাবার্তা স্থগিত করিয়া বৃদ্ধ নাবিকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মাঝি, আজ কত দূর যেতে পারবি; মাঝি কিছু ইতস্তত: করিয়া বলিল, বলিতে পারিলাম না।'

এক বৃদ্ধ আর এক যুবকের সামান্য কথোপকথন অবলম্বন ক'রে এই দুটি চরিত্রের পার্থক্য বা বিশেষত্বের দিক এখানে অল্প কথাতেই সুব্যক্ত। প্রকৃতির সৌন্দর্য দেখে যুবকের মনে পড়ে কালিদাসের রঘুবংশ কাব্য! এই কবিতা আস্বাদন,—তীর্থদর্শনের ফলাফল সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশ—'তীর্থ দর্শনে যেরূপ পরকালের কর্ম হয়, বাটী বসিয়াও সেরূপ হইতেপারে'—ইত্যাদি সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উল্লেখের মধ্য দিয়েই নবকুমার-চরিত্রের যৌবনসুলভ বিশেষত্ব ব্যক্ত হ'য়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিত্বের এখানে আরো এক পরিচয় আছে। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'র প্রতি পরিচ্ছেদের শিরোনামে কেবল বিষয়বস্তুর ইঙ্গিত ছিল। 'কপালকুণ্ডলা'তেও অনুরূপ সংকেত আছে, যেমন—প্রথম পরিচ্ছেদে 'সাগরসঙ্গমে'; দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে উপকূলে। অনুরূপভাবে যথাক্রমে 'বিজনে,' 'স্তূপশিখরে', 'সমুদ্রতটে', 'কাপালিক সঙ্গে', 'অন্বেষণে', আশ্রয়ে', 'দেবনিকেতনে',—এইভাবে পর পর প্রথম খণ্ডের ন'টি পরিচ্ছেদে যোগ্য বিষয়-

সংকেত দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী খণ্ডগুলিতেও এই একই রীতি অনুসৃত। কিন্তু 'কপালকুণ্ডলা'য় এ-ছাড়া পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ হিসেবে আরো একটি নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। শেকস্‌পীয়রের কমেডি-অব্-এরার্‌স, হ্যামলেট, কিং লীয়র, ওথেলো,—বায়রনের ডন জুয়ান, ম্যানফ্রেড,—কালিদাসের রঘুবংশ, কুমারসম্ভব,—মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য, বীরাঙ্গনা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য,—শ্রীহর্ষের রত্নাবলী,—বিদ্যাপতি ও কীটস্‌-এর কাব্যাংশ,—দীনবন্ধুর 'নবীনতপস্বিনী' ইত্যাদি নানা রচনা থেকে এখানে বিভিন্ন অংশ ব্যবহৃত হয়েছে। এইসব উদ্ধৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের রসবোধ আর কবিকল্পনার স্বাক্ষরবাহী। এক-একটি পরিচ্ছেদে এইভাবে তিনি বিষয়বস্তুর সংকেতও দিয়েছেন, তা ছাড়া ভাব-সংকেতও দেওয়া হয়েছে। শেক্‌স্‌পীয়র এবং মধুসূদনের উদ্ধৃতিগুলি গভীর তাৎপর্যময়। এ বিষয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা দরকার।

'দুর্গেশনন্দিনী'র পরে 'কপালকুণ্ডলা'তে এইসব আয়োজন নিঃসন্দেহে পরিণতির চিহ্নবাহী। প্রধানতঃ কবিকল্পনা আর ঘটনা-সমারোহ,—অর্থাৎ ঘটনাস্রোতের গতি ও সংঘাত প্রদর্শনই ছিল 'দুর্গেশনন্দিনী'র অবলম্বন। সেখানে কোনো কোনো জায়গায় উচ্ছ্বাস মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। হাস্য-পরিহাসের কয়েকটি দৃশ্যে, রূপবর্ণনার কয়েকটি উদাহরণে শিল্পীর ভাবানুভূতি তাঁর অগোচরেই কতকটা প্রগল্‌ভতায় এবং ভাবোচ্ছ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছে। কিন্তু সেদিক থেকে, 'কপালকুণ্ডলা'য় তাঁর সংযততর শিল্পদক্ষতার পরিচয় আছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম দুটিমাত্র পরিচ্ছেদেই সাগরযাত্রী নৌকারোহীদের সঙ্গী নবকুমারকে রসুলপুরের মোহানার পরপারে সাগরসঙ্গমে পরিত্যক্ত অবস্থায় দেখা যায়। কার্য-কারণের যোগাযোগ রক্ষায় সতর্কতা,—পাঠকের সম্ভাব্যতাবোধ সমুচিতভাবে পরিতৃপ্ত রাখবার সামর্থ্য,—অনুচিত বাগ্‌বিস্তার-বর্জন ইত্যাদি ব্যাপার এই দুই পরিচ্ছেদের সংকীর্ণ অবকাশেও বিদ্যমান। যেমন, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেস দিকে তিনি বলেছেন :

> 'যখন জলবেগ এমত মন্দীভূত হইয়া আসিল যে, নৌকার গতি সংযত করা যাইতে পারে, তখন যাত্রীরা রসুলপুরের মোহানা অতিক্রম করিয়া অনেকদূর আসিয়াছেন এখন নবকুমারের জন্য প্রত্যাবর্তন করা যাইবে কিনা, এ বিষয়ের মীমাংসা আবশ্যক হইল। এই স্থানে বলা আবশ্যক যে, নবকুমারের সহযাত্রীরা

তাহার প্রতিবেশী মাত্র, কেহই আত্মবন্ধু নহে। তাঁহারা বিবেচনা করিয়া দেখিলেন যে, তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করা এক ভাঁটার কর্ম। পরে রাত্রি আগত হইল; আর রাত্রে নৌকা চালনা হইতে পারিবে না, অতএব পরদিনের জোয়ারের প্রতীক্ষা করিতে হইবে। একাল পর্যন্ত সকলকে অনাহারে থাকিতে হইবে।'

এইসব কারণ ছিল ব'লেই, নাবিকরা সিদ্ধান্ত করে যে—'নবকুমারকে ব্যাঘ্রে হত্যা করিয়াছে।' প্রথম খণ্ডের এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ অন্য এক ধরনের আর-একটি মন্তব্য আছে। এ রীতি তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনীতে'ও দেখা গেছে,—উত্তরকালের অন্যান্য উপন্যাসেও বিদ্যমান। এইসব ক্ষেত্রে বর্ণনীয় কাহিনীর অবস্থানভূমি থেকে লেখক যেন বিস্তৃততর মানবজীবনের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করেন। তাঁর এই জাতীয় মন্তব্যে কখনো উদাস, গভীর সুর,—কখনো বা সরস পরিহাস-ভঙ্গি দেখা দেয়। আলোচ্য শেষ অনুচ্ছেদটি এই:

'ইহা শুনিয়া যদি কেহ প্রতিজ্ঞা করেন, কখনো পরের উপবাস নিবারণার্থ কাষ্ঠাহরণে যাইবেন না, তবে তিনি উপহাসাস্পদ! আত্মোপকারীকে বনবাসে বিসর্জন করা যাহাদিগের প্রকৃতি, তাহারা চিরকাল আত্মোপকারীকে বনবাস দিবে।—কিন্তু যতবার বনবাসিত করুক না কেন, পরের কাষ্ঠাহরণ করা যাহার স্বভাব, সে পুনর্বার পরের কাষ্ঠাহরণে যাইবে। তুমি অধম—তাই বলিয়া আমি উত্তম না হইব কেন।'

এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ হিসেবেই 'কিং লীয়র' থেকে 'Ingratitude ! Thou marble-hearted fiend !'—কথাগুলি স্মরণ করা হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই অকৃতজ্ঞতার বিশদতর ফল-বর্ণনা দেখা দেয়—নিঃসঙ্গ নবকুমারের মনের চাঞ্চল্য,—আর পৃথিবীতে মহাকাশে দিন-রাত্রির পট-পরিবর্তন!

'ক্রমে অন্ধকার হইল। শিশিরাকাশে নক্ষত্রমণ্ডলী নীরবে ফুটিতে লাগিল, যেমন নবকুমারের স্বদেশে ফুটিতে থাকে, তেমনি ফুটিতে লাগিল। অন্ধকারে সর্বত্র জনহীন;—আকাশ, প্রান্তর, সমুদ্র, সর্বত্র নীরব, কেবল অবিরল কল্লোলিত সমুদ্রগর্জন আর কদাচিৎ বন্য পশুর রব। তথাপি নবকুমার সেই অন্ধকারে,

হিমবর্ষী আকাশতলে বালুকাস্তূপের চতুঃপার্শ্বে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।'

এই তৃতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদেই—নবকুমার যে অঞ্চলে এই বিজন বনবাসের যন্ত্রণা ভোগ ক'রতে বাধ্য হন, সেই বিশেষ অঞ্চলের উল্লেখ আছে—'তাহার অনতিদূরে দৌলতপুর ও দরিয়াপুর নামে দুই ক্ষুদ্র গ্রাম এক্ষণে দৃষ্ট হয়।' পরিশ্রান্ত হয়ে নবকুমার ঘুমিয়ে পড়েন। তারপর চতুর্থ পরিচ্ছেদে,—গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙেছে। হঠাৎ অনেক দূরে একটু আলো দেখতে পেয়ে, সেই আলোর দিকে এগিয়ে যেতে-যেতে উঁচু এক বালুকাস্তূপে উপবিষ্ট এক মনুষ্য-মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তিনি!

> 'শিখরাসীন মনুষ্য নয়ন মুদ্রিত করিয়া ধ্যান করিতেছিল—নবকুমারকে প্রথমে দেখিতে পাইল না। নবকুমার দেখিলেন, তাহার বয়ঃক্রম প্রায় পঞ্চাশৎ বর্ষ হইবে। পরিধানে কোনো কার্পাস বস্ত্র আছে কিনা তাহা লক্ষ্য হইল না; কটিদেশ হইতে জানু পর্যন্ত শার্দ্দূলচর্মে আবৃত। গলদেশে রুদ্রাক্ষমালা; আয়ত মুখমণ্ডল শ্মশ্রুজটা পরিবেষ্টিত। সম্মুখে কাষ্ঠে অগ্নি জ্বলিতেছিল—সেই অগ্নির দীপ্তি লক্ষ্য করিয়া নবকুমার সেস্থলে আসিতে পারিয়াছিলেন। নবকুমার একটা বিকট দুর্গন্ধ পাইতে লাগিলেন; ইহার আসন প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহার কারণ অনুভূত করিতে পারিলেন। জটাধারী এক ছিন্নশীর্ষ গলিত শবের উপর বসিয়া আছেন। আরো সভয়ে দেখিলেন যে, সম্মুখে নরকপাল রহিয়াছে, তন্মধ্যে রক্তবর্ণ দ্রব পদার্থ রহিয়াছে। চতুর্দিকে স্থানে স্থানে অস্থি পড়িয়া রহিয়াছে—এমন কি, যোগাসীনের কণ্ঠস্থ রুদ্রাক্ষমালামধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড গ্রথিত রহিয়াছে। নবকুমার মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া রহিলেন। অগ্রসর হইবেন, কি স্থান ত্যাগ করিবেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। তিনি কাপালিকদের কথা শ্রুত ছিলেন। বুঝিলেন যে, এ ব্যক্তি কাপালিক।'

এই অসাধারণ নৈসর্গিক দৃশ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রোম্যান্স-প্রীতির চিহ্ন এখানেও তীব্রভাবে বিদ্যমান বটে, কিন্তু 'দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনায় এখানে তিনি যে অনেক বেশি সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, তাও স্বীকার্য।

এই চতুর্থ পরিচ্ছেদের শিরোভূষণ হিসেবে ব্যবহৃত মেঘনাদবধকাব্যের উদ্ধৃতিতেই এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের সংকেত চিহ্নিত। মেঘনাদবধকাব্য থেকে বঙ্কিম এখানে স্মরণ ক'রেছেন—'সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে, ভীষণ-দর্শন মূর্তি'!

তাঁর ছোট ভাই পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা থেকে কাপালিক সম্বন্ধে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। 'বঙ্কিম-প্রসঙ্গ' বইখানিতে পূর্ণচন্দ্রের লেখা থেকেই জানা যায় যে, তিনি যখন নেগুঁয়া মহকুমায় ছিলেন [বর্তমান কাঁথি], তখন এক কাপালিক প্রায়ই রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে আসতেন। কাঁথির ঐ অঞ্চলে সমুদ্রতীরে দরিয়াপুর ও চাঁদপুর অঞ্চলই বোধ হয় কাপালিকের সাধনা-ক্ষেত্র। ঐ কাপালিকের কথা তিনি ভুলতে পারেন নি। কিছুদিন পরে, কাঁঠালপাড়ার বাড়িতে দীনবন্ধু মিত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র জিগেস করেন—'যদি শিশুকাল হইতে ষোল বৎসর পর্যন্ত কোনও স্ত্রীলোক সমুদ্রতীরে বনমধ্যে কাপালিক কর্তৃক প্রতিপালিত হয়, কখনও কাপালিক ভিন্ন অন্য কাহারও মুখ না দেখিতে পায় এবং সমাজের কিছুই জানিতে না পায়, কেবল বনে বনে সমুদ্রতীরে বেড়ায়,—পরে সেই স্ত্রীলোক-টিকে কেহ বিবাহ করিয়া সমাজে লইয়া আইসে, তবে সমাজ-সংসর্গে তাহার কতদূর পরিবর্তন হইতে পারে এবং তাহার উপরে কাপালিকের প্রভাব কি একেবারেই অন্তর্হিত হইবে?'

দীনবন্ধু এ-প্রশ্নের জবাব দেন নি। সঞ্জীবচন্দ্র বলেন—'কিছুকাল সন্ন্যাসীর প্রভাব থাকিবে, পরে সন্তানাদি হইলে স্বামিপুত্রের প্রতি স্নেহ জন্মাইলে সমাজের লোক হইয়া পড়িবে; সন্ন্যাসীর প্রভাব তাহার মন হইতে একেবারে তিরোহিত হইবে।'

তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার এই কাপালিক,—এবং তৎসংক্রান্ত এই চিন্তাই 'কপালকুণ্ডলা'য় আত্মপ্রকাশ ক'রেছিল। রোম্যান্সের পক্ষে প্রয়োজনীয় সমারোহের অবলম্বন হিসেবে তো বটেই, তাছাড়া মানুষের সমাজ-সংসর্গের ফলাফল সম্বন্ধে এই বিতর্কের হেতু হিসেবে এই কাপালিক-প্রসঙ্গ অবশ্যই তাঁর কাজে লেগেছিল। কিন্তু সাহিত্য-সৃষ্টির উপাদান হিসেবে জীবনের এই অভিজ্ঞতাকে তিনি সমুচিত সতর্কতার সঙ্গেই মণ্ডিত ক'রে নিয়েছিলেন। ভবভূতির 'মালতী-মাধব' নাটকে কাপালিক অঘোরঘণ্টের শিষ্যার নাম 'কপালকুণ্ডলা'। কিন্তু অঘোরঘণ্টের শিষ্যা সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্র। নবকুমারের পত্নী কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তাঁর কোনোরকম সাদৃশ্যের দাবি নেই।

প্রথম খণ্ডের এই চতুর্থ পরিচ্ছেদে নবকুমার যখন কাপালিকের প্রথম দর্শন পান, তখন কাপালিক যোগাসীন,—নবকুমারকে দেখেও সে ভ্রূক্ষেপ করেনি। অনেকক্ষণ পরে সংস্কৃত ভাষায় প্রশ্ন শোনা গেছে 'কস্ত্বং?'। নবকুমার আত্মপরিচয় দিতে গিয়ে শুধু একটি শব্দই ব্যবহার করেন—'ব্রাহ্মণ'। উত্তরে আবার কাপালিকের একটি কথা—'তিষ্ঠ'। তারপর আরো অর্ধ-প্রহর পরে, উঠে দাঁড়িয়ে সে বলেছে—'মামনুসর'। এই সহজবোধ্য সংক্ষিপ্ত সংস্কৃত বচনে সেই ভয়াবহ, অন্ধকার রাত্রির অবিশ্বাস্য সুদূরত্বও যেমন পরিবর্ধিত হয়েছে, তেমনি পাঠকের পক্ষে এই সংলাপ অনুসরণ ক'রতেও কোনো বাধা ঘটেনি। নবকুমার অতঃপর বাংলায় জবাব দেন; কিন্তু কাপালিক পূর্বানুরূপ সহজ সংস্কৃত ভাষায় বলে—'ভৈরবীপ্রেরিতোঽসি; মামনুসর; পরিতোষঃ তে ভবিষ্যতি।' তারপর কুটীরে পৌঁছে, কাপালিক—'অবোধগম্য কোন উপায়ে একখণ্ড কাষ্ঠে অগ্নি জ্বালিত করিল'! এই অদ্ভুত অলৌকিক পরিবেশ,—এই সংস্কৃত বচন,—চারিদিকে ব্যাঘ্রভয়,—এবং কুটীরে এক কলস জল, কিছু ফলমূল আর কয়েকখানা ব্যাঘ্রচর্ম,—পারিপার্শ্বিক এই সব উপকরণের সমন্বয়ে এ দৃশ্যের অভিপ্রেত অদ্ভুতরস সার্থক হয়ে উঠেছে। অতঃপর আর সংস্কৃত ভাষার প্রয়োজন নেই! অলৌকিক উপায়ে আগুন জ্বালবার পরে তাই কাপালিক বাংলাতেই বলে—'ফলমূল যাহা আছে, আত্মসাৎ করিতে পার। পর্ণপাত্র রচনা করিয়া কলসজল পান করিও। ব্যাঘ্রচর্ম আছে, অভিরুচি হইলে শয়ন করিও। নির্বিঘ্নে তিষ্ঠ—ব্যাঘ্রের ভয় করিও না। সময়ান্তরে আমার সহিত সাক্ষাৎ হইবে। যে পর্যন্ত সাক্ষাৎ না হয়, সে পর্যন্ত এ কুটির ত্যাগ করিও না।'

কাপালিক চলে যাবার পরে নবকুমার আহার শেষ ক'রে সেই ব্যাঘ্রচর্মে নিদ্রাভিভূত হন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদের সূচনা পরদিন সকালের ঘটনায়! 'প্রাতে উঠিয়া নবকুমার সহজেই বাটী গমনের উপায় করিতে ব্যস্ত হইলেন; বিশেষ, এ কাপালিকের সান্নিধ্য কোনক্রমেই শ্রেয়স্কর বলিয়া বোধ হইল না।'

এই দুশ্চিন্তা নিয়েই নবকুমার সেদিন শয্যাত্যাগ করেন। কাপালিকের নিষেধ স্মরণ ক'রে পথে বেরুতে তিনি শঙ্কিত হন। কিন্তু অপরাহ্নকাল পর্যন্ত কাপালিকের দেখা না পেয়ে,—'ক্ষুধার পীড়নে নবকুমার ফলান্বেষণে বাহির হইলেন।' তারপর 'অপূর্বপরিচিত' বনভূমি আর—'সম্মুখেই সমুদ্র'! সেই

সমুদ্রদর্শনের গন্ধ-কবিতা এর আগের অধ্যায়ে স্মরণ করা হয়েছে।[১৮] তারপর অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে চারদিকের দৃশ্যক্ষেত্র যখন ম্লান হয়ে এসেছে, তখন কুটীরে ফেরবার কথা মনে পড়ে।—'ফিরিবামাত্র দেখিলেন অপূর্ব মূর্তি'!

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের এই প্রথম দর্শনের ছবিটিও একই জায়গায় পূর্ব-প্রসঙ্গে উদ্ধৃত হয়েছে। দুর্গম বনে সেই দৈবী মূর্তি দেখে, নিস্পন্দ শরীরে নবকুমার স্থির হয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেছেন।—'রমণীও স্পন্দহীন, অনিমেষ লোচনে বিশাল চক্ষুর স্থিরদৃষ্টি নবকুমারের মুখে ন্যস্ত করিয়া রাখিলেন।' এই কবিত্বের মধ্যেও বিশ্লেষণ-দায়িত্ব সচেতন ঔপন্যাসিকের মনোযোগ অব্যাহত। দুটি যুবক-যুবতীর এই দৃষ্টি-বিনিময়ের প্রকৃতিভেদটুকু দেখিয়ে দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— উভয় মধ্যে প্রভেদ এই যে, নবকুমারের দৃষ্টি চমকিত লোকের দৃষ্টির ন্যায়, রমণীর দৃষ্টিতে সে লক্ষণ কিছুমাত্র নাই, কিন্তু তাহাতে বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ হইতেছিল।'

তারপর রমণীর প্রশ্ন—'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ?'

সেই প্রশ্ন শুনে—

> 'এই কণ্ঠস্বরের সঙ্গে নবকুমারের হৃদয়বীণা বাজিয়া উঠিল। বিচিত্র হৃদয়যন্ত্রের তন্ত্রীচয় সময়ে সময়ে এরূপ লয়হীন হইয়া থাকে যে, যত যত্ন করা যায়, কিছুতেই পরস্পর মিলিত হয় না। কিন্তু একটি শব্দে, একটি রমণীকণ্ঠসম্ভূত স্বরে সংশোধিত হইয়া যায়। সকলই লয় বিশিষ্ট হয়। সংসার যাত্রা সেই অবধি সুখময় সংগীত-প্রবাহ বলিয়া বোধ হয়। নবকুমারের কর্ণে সেইরূপ এ ধ্বনি বাজিল।'

এর পরেই দ্বিতীয় একটি অনুচ্ছেদে কবিপ্রাণ ঔপন্যাসিকের ভাবোজ্জ্বল আরো কয়েকটি কথা—

> 'পথিক তুমি পথ হারাইয়াছ? এ ধ্বনি নবকুমারের কর্ণে প্রবেশ করিল। কি অর্থ কি উত্তর করিতে হইবে, কিছুই মনে হইল না। ধ্বনি যেন হর্ষবিকম্পিত হইয়া বেড়াইতে লাগিল; যেন পবনে সেই ধ্বনি বহিল; বৃক্ষপত্রে মর্মরিত হইতে লাগিল; সাগরনাদে যেন মন্দীভূত হইতে লাগিল। সাগরবসনা পৃথিবী

১৮। পৃঃ ২৪১ দ্রষ্টব্য।

সুন্দরী ; রমণী সুন্দরী ; ধ্বনিও সুন্দর ; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিলিতে লাগিল।'

তারপর—

'রমণী কোন উত্তর না পাইয়া কহিলেন, 'আইস। এই বলিয়া তরুণী চলিল ; পদক্ষেপ লক্ষ্য হয় না। বসন্তকালে মন্দানিল-সঞ্চালিত শুভ্র মেঘের ন্যায় ধীরে ধীরে, অলক্ষ্য পাদবিক্ষেপে চলিল ; নবকুমার কলের পুত্তলীর ন্যায় সঙ্গে চলিলেন। একস্থানে একটা ক্ষুদ্র বন পরিবেষ্টন করিতে হইবে, বনের অন্তরালে গেলে, আর সুন্দরীকে দেখিতে পাইলেন না। বনবেষ্টনের পর দেখেন যে, সম্মুখে কুটীর।'

এইখানেই পঞ্চম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নবকুমারের মুগ্ধ ভাবেরই অনুবৃত্তি চলেছে এবং সেই সঙ্গে সম্ভবতঃ কাপালিকের অলৌকিক মায়াবলেই সে রাত্রের আহারের উপকরণও প্রস্তুত! পরদিন সকালেও কাপালিকের দেখা পাওয়া যায়নি। সূর্যাস্তের পরে সন্ধ্যায় কুটীরে ফিরে তার দেখা পেয়ে তিনি বাড়ি ফেরবার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। সেই প্রস্তাব শুনেই কাপালিক তাঁকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ে। সেই যাত্রায়, পথে আবার সেই 'আগুল্ফলম্বিত-নিবিড়কেশরাশিধারিণী বন্যদেবীমূর্তি'কে দেখা যায়! কপালকুণ্ডলা বলেন—'কোথা যাইতেছ? যাইও না। ফিরিয়া যাও—পলায়ন কর।'

নবকুমার সে-কথা শুনে অভিভূত বোধ করেন। তারপর মনে হয়—'এ কাহার মায়া? না আমারই ভ্রম হইতেছে। যে কথা শুনিলাম—সে ত আশঙ্কাসূচক, কিন্তু কিসের আশঙ্কা? তান্ত্রিকেরা সকলই করিতে পারে। তবে কি পলাইব? পলাইব বা কেন? সেদিন যদি বাঁচিয়াছি, আজিও বাঁচিব। কাপালিক মনুষ্য, আমিও মনুষ্য।'

নবকুমারের এই চিন্তা এখানকার এই অসাধারণ ঘটনাসন্ধির সম্ভাব্যতা বা বিশ্বসযোগ্যতা রক্ষার পক্ষে অত্যাবশ্যক উপাদান। প্রাণভয়ে নবকুমারের পলায়নই এ-অবস্থায় প্রত্যাশিত স্বাভাবিক আচরণ। কিন্তু এখানে না-পালাবার দুটি মাত্র হেতু বিশ্বাস করা যেতো। এক, যদি তখনি নবকুমারের মনে কপালকুণ্ডলাকে উদ্ধার করবার তীব্র আগ্রহ দেখা দিতো,—দ্বিতীয়তঃ

তিনি যদি নিজের জীবন সম্বন্ধে তীব্র কোনো নৈরাশ্য বা অবসাদ বোধ করেন। সেই আপৎকালে নবকুমারের মনে কিন্তু প্রথম হেতুটিই আভাসমাত্রও বঙ্কিমচন্দ্র দেখাননি। অতএব দ্বিতীয় হেতুটিই সংগত। কিন্তু কাপালিক যখন তাঁকে 'সৈকতের মধ্যস্থানে' নিয়ে গিয়ে, মত্ত হস্তীর বলে লতাবন্ধনে বাঁধতে আরম্ভ করেন, তখন নবকুমার আত্মরক্ষার জন্যে বলপ্রয়োগ ক'রেছেন।

ইতিমধ্যে ঘাতকের হননাস্ত্রটি নিখোঁজ হয়। কপালকুণ্ডলার এই কৌশলও ভোলবার নয়। তিনি সমাজ-সংসর্গ পাননি বটে, কিন্তু সহানুভূতি বা সমবেদনার অভাব ছিল না তাঁর মনোগঠনে। আর, প্রয়োজনীয় উপস্থিত-বুদ্ধি বা চাতুর্যেরও দৈন্য ছিল না। সেই আশঙ্কা-স্পন্দিত দুর্যোগের প্রহরে, কাপালিক বাধ্য হ'য়ে কুটীর থেকে খড়্গ আনতে গেছে,—

> 'এমত সময়ে নিকটে বালুকার উপর অতি কোমল পদধ্বনি হইল—এ পদধ্বনি কাপালিকের নহে। নবকুমার নয়ন ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই মোহিনী—কপালকুণ্ডলা। তাঁহার করে খড়্গ দুলিতেছে।
>
> কপালকুণ্ডলা কহিলেন, 'চুপ! কহিও না—খড়্গ আমারই কাছে—চুরি করিয়া রাখিয়াছি।'
>
> এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা অতি শীঘ্রহস্তে নবকুমারের লতাবন্ধন খড়্গ দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন। নিমিষমধ্যে তাঁহাকে মুক্ত করিলেন। কহিলেন, 'পলায়ন কর; আমার পশ্চাৎ আইস, পথ দেখাইয়া দিতেছি।'
>
> এই বলিয়া কপালকুণ্ডলা তীরের ন্যায় বেগে পথ দেখাইয়া চলিলেন। নবকুমার লাফ দিয়া তাহার অনুসরণ করিলেন।'

অতঃপর সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম 'অন্বেষণ'। কুটীরে খড়্গ না পেয়ে, কাপালিক ফিরে এসে নবকুমারকেও না দেখতে পেয়ে,—'স্বরূপ অনুভূত' হ'লে অবিলম্বে পলাতকদের অনুসন্ধানে এগিয়েছে। তখন চারিদিক অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন! কণ্ঠস্বরও সব সময়ে শোনা যায় না! কোনোমতে, অনেক কষ্টে পথ খুঁজে-খুঁজে কাপালিক এক বালিয়াড়িতে উঠেছিল। সেখান থেকে সে নিচে পড়ে যায়,—'পতনকালে পর্বতশিখরচ্যুত মহিষের ন্যায় কাপালিকও তৎসঙ্গে পড়িয়া গেল।'

এ-উপমার ঔচিত্য সন্দেহাতীত! 'কপালকুণ্ডলা'র সংক্ষিপ্ততম পরিচ্ছেদগুলির মধ্যে গণ্য—প্রথম খণ্ডের এই সপ্তম পরিচ্ছেদের সমাপ্তি এই একটি মাত্র অনুচ্ছেদে। তারপর অষ্টম পরিচ্ছেদের সূচনাতেই 'রোমিও জুলিয়েটের' দুটি পংক্তি উদ্ধৃত হয়েছে। এ-পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'আশ্রয়ে।' অমাবস্যার অন্ধকার রাত্রে তরুণ-তরুণী ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটে অন্ধকার বনপথ অতিক্রম ক'রে,—বাইরে গিয়ে পোঁছেচেন। ক্রমশঃ তাঁদের গতিবেগ মন্দীভূত হয়েছে।—'অন্ধকারে কিছুই লক্ষ্য হয় না; কেবল কখন কোথাও নক্ষত্রালোকে কোন বালুকাস্তূপের শুভ্র শিখর অস্পষ্ট দেখা যায়—কোথাও খদ্যোৎমালাসংবৃত বৃক্ষের অবয়ব জ্ঞানগোচর হয়।'

দ্বিপ্রহর রাত্রে নিভৃত এক দেবমন্দির-সংলগ্ন এক বাড়িতে পৌঁছে, তাঁরা বন্ধ দরজায় করাঘাত করেন। দরজা খুলে দিয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি স্নেহশীল পঞ্চাশোত্তীর্ণ অধিকারী সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে বলেন—'এ বড় বিষম ব্যাপার।' যাই হোক্, নবকুমার তাঁরই কাছে আশ্রয় পান। এবং—'নবকুমার শয়ন করিলে, কপালকুণ্ডলা সমুদ্রতীরে প্রত্যাগমন করিবার উদ্যোগ করিলেন।' কিন্তু তাঁর কাছে তখন তিনি 'ভিক্ষা' চেয়েছেন—'তোমাকে দেখিয়া পর্যন্ত মা বলিয়া থাকি, দেবীর পাদস্পর্শ করিয়া শপথ করিতে পারি যে, মাতার অধিক তোমাকে স্নেহ করি। আমার ভিক্ষা অবহেলা করিবেনা?'

অধিকারী আর কপালকুণ্ডলার এই সংলাপ খুবই সংক্ষিপ্ত, অথচ এই অল্প কয়েকটি বাক্য-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে ঘটনাস্রোতের অভিমুখিতা স্থির হয়ে গেছে। অধিকারী বলেন—'এই পথিকের সঙ্গে দেশান্তরে যাও।' কপালকুণ্ডলা প্রথমে এ-কথার কোনো উত্তর দেননি। অধিকারী জবাব চাইলে তিনি বলেন—'যখন তোমার শিষ্য আসিয়াছিল, তখন তুমি কহিয়াছিলে যে, যুবতীর এরূপ যুবা-পুরুষের সহিত যাওয়া অনুচিত; এখন যাইতে বল কেন?' অধিকারী বলেন, তখন সে প্রস্তাব 'সদুপায়' বলে মনে হয়নি, কিন্তু অবস্থা-পরিবর্তনের ফলে, অতঃপর এই সিদ্ধান্তই অনুকূল!

কপালকুণ্ডলার এই চিন্তার মধ্য দিয়ে তাঁর স্বভাবের সারল্যও ফুটেছে, —আবার, তিনি যে অন্ততঃ কতকটা সমাজ-সংসর্গ পেয়েছিলেন,—সে পরিচয়ও এতে বিদ্যমান। কিন্তু দেবীকে অর্ঘ্যদান ক'রে,—শুভ ভবিষ্যতের ভরসা পেয়ে,—অধিকারী যখন তাঁকে নবকুমারের সঙ্গে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পথে বেরিয়ে পড়বার প্রস্তাব জানান, তখন—

'বি-বা-হ!' এই কথাটি কপালকুণ্ডলা অতি ধীরে ধীরে উচ্চারণ করিলেন। বলিতে লাগিলেন, 'বিবাহের নাম ত তোমাদিগের মুখে শুনিয়া থাকি, কিন্তু কাহাকে বলে, সবিশেষ জানি না। কি করিতে হইবে?'

স্মিতহাস্যের সঙ্গে অধিকারী জবাব দেন—'বিবাহ স্ত্রীলোকের একমাত্র ধর্মের সোপান; এইজন্য স্ত্রীকে সহধর্মিণী বলে। জগন্মাতাও শিবের বিবাহিতা।' এই প্রশ্নোত্তরের সঙ্গে লেখক তাঁর নিজের মন্তব্য যোগ ক'রেছেন—'অধিকারী মনে করিলেন, সকলই বুঝাইলেন। কপালকুণ্ডলা মনে করিলেন, 'সকলই বুঝিলেন।'

অর্থাৎ বিবাহের তাৎপর্য বোঝেন নি তিনি! কাপালিকের সম্বন্ধে তাঁর মনে একরকম টানও ছিল। এই পরিস্থিতিতেই তাঁকে বলতে শোনা যায়—'কিন্তু তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।'

কাপালিকের গূঢ় উদ্দেশ্যের কথা তখন তাঁকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু তাতেও দুর্যোগের আশঙ্কায় তিনি অণুমাত্র অভিভূত হয়েছিলেন কি না, তার কোনো উল্লেখ নেই। সে-রাত্রের অপ্রত্যাশিত ঘটনা-প্রবাহের দ্রুতগতির মধ্যেই এইসব প্রশ্ন-উত্তর-ব্যাখ্যার স্রোত বয়ে গেছে! সব শুনে, কপালকুণ্ডলা বিবাহে সম্মত হন। অধিকারী তৎক্ষণাৎ নবকুমারের সঙ্গে কথা শুরু করেন। হঠাৎ পরিবেশের প্রকৃতি বদলে যায়! গভীর গাম্ভীর্য থেকে আবহাওয়া যেন বাস্তব জগতের অভ্যস্ত সতর্কতায় এবং চাতুর্যে সরে আসে:

'এক কক্ষমধ্যে কপালকুণ্ডলাকে বসাইয়া, অধিকারী নবকুমারের শয্যাসন্নিধানে গিয়া তাঁহার শিওরে বসিলেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, 'মহাশয় নিদ্রিত কি?'

নবকুমারের নিদ্রা যাইবার অবস্থা নহে; নিজদশা ভাবিতেছিলেন। বলিলেন, আজ্ঞে না।'

অধিকারী কহিলেন, 'মহাশয়! পরিচয়টা লইতে একবার আসিলাম, আপনি ব্রাহ্মণ?'

নব। আজ্ঞা হাঁ।

অধি। কোন্ শ্রেণী?

নব। রাঢ়ীয় শ্রেণী।

অধি। আমরাও রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ—উৎকল ব্রাহ্মণ বিবেচনা করিবেন না। বংশে কুলাচার্য, তবে এক্ষণে মায়ের পদাশ্রয়ে আছি। মহাশয়ের নাম?

নব। নবকুমার শর্মা

অধি। নিবাস?

নব। সপ্তগ্রাম।

অধি। আপনারা কোন্ গাঁই?

নব। বন্দ্যঘটী।

অধি। কয় সংসার করিয়াছেন?

নব। এক সংসার মাত্র।

এই সংলাপের পরেই লেখকের কিঞ্চিৎ টিপ্পনী আছে—'নবকুমার সকল কথা খুলিয়া বলিলেন না। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার এক সংসারও ছিল না। তিনি রামগোবিন্দ ঘোষালের কন্যা পদ্মাবতীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।' পদ্মাবতীর বয়স যখন 'ত্রয়োদশ বৎসর',—তখন রামগোবিন্দ পুরী তীর্থদর্শনে যান। পাঠানরা তখন উড়িষ্যায়। রামগোবিন্দ যখন পুরী থেকে ফিরছিলেন, তখন মোগল-পাঠানের যুদ্ধ চলছে। পথে পাঠানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে তিনি সপরিবারে মুসলমান হতে বাধ্য হন। তখন নবকুমারের পিতা জীবিত। জাতিভ্রষ্ট বৈবাহিকের সঙ্গে জাতিভ্রষ্ট পুত্রবধূকেও তিনি ত্যাগ করেন। সেই স্ত্রীর সঙ্গে নবকুমারের আর দেখা হয়নি।

রামগোবিন্দ ঘোষাল অতঃপর সপরিবারে রাজধানী রাজমহলে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। 'বিরাগবশতঃ' নবকুমার আর বিবাহ করেন নি। তাই, নতুন পরিস্থিতিতে,—এই প্রস্তাব শুনে তিনি কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ ক'রতে রাজী হন।

অধিকারী অবশ্য এ-প্রস্তাব ধীরে ধীরে শুনিয়েছেন। প্রথমে বলেছেন, কপালকুণ্ডলার বাঁচবার একমাত্র উপায়—'আপনার সহিত ইহার পলায়ন'। নবকুমার বলেন—'আমার প্রাণরক্ষয়িত্রীর জন্য কোন কার্য আমার অসাধ্য নহে। ইনি আমার আত্মপরিবারস্থা হইয়া থাকিবেন।' তারপর অধিকারী জিগেস করেন—'কিন্তু যখন আপনার আত্মীয়-স্বজন জিজ্ঞাসা করিবে যে, এ কাহার স্ত্রী, কি উত্তর দিবেন?' নবকুমার বলেন

—'আপনিই ইহার পরিচয় আমাকে দিন। আমি সেই পরিচয় সকলকে দিব।' সেই সুযোগের সদ্ব্যবহার ক'রে অন্য পক্ষ বলেন—'পক্ষান্তরের পথ, যুবক যুবতী অনন্যসহায় হইয়া কি প্রকারে যাইবে? লোকে দেখিয়া শুনিয়া কি বলিবে? আত্মীয়-স্বজনের নিকট কি বুঝাইবে? আর আমিও এই কন্যাকে মা বলিয়াছি, আমিই বা কি প্রকারে ইঁহাকে অজ্ঞাত-চরিত্র যুবার সহিত একাকী দূরদেশে পাঠাইয়া দিই?'

নবকুমার তখনো বোধ হয়, অধিকারীর আসল প্রস্তাবটি অনুমান ক'রতে পারেননি। তিনি তাঁকেই সহযাত্রী হতে অনুরোধ করেন। অধিকারী বলেন—'আমি সঙ্গে যাইব? ভবানীর পূজা কে করিবে?' তাই শেষ উপায়ই একমাত্র গ্রাহ্য উপায়! কপালকুণ্ডলার পূর্ব-ইতিহাস বর্ণনা এবং নবকুমারের সঙ্গে পরিণয়-বন্ধনের প্রস্তাব,—দুটিই অতঃপর সংক্ষিপ্ত কয়েকটিমাত্র বাক্যে উচ্চারিত হয়:

> 'শুনুন। ইনি ব্রাহ্মণকন্যা। ইঁহার বৃত্তান্ত আমি সবিশেষ অবগত আছি। ইনি বাল্যকালে দুরন্ত খ্রীষ্টিয়ান তস্কর কর্তৃক অপহৃত হইয়া যানভঙ্গপ্রযুক্ত তাঁহাদিগের দ্বারা কালে এ সমুদ্রতীরে ত্যক্ত হয়েন। সে সকল বৃত্তান্ত পশ্চাৎ ইঁহার নিকট আপনি সবিশেষ অবগত হইতে পারিবেন। কাপালিক ইঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন। ইনি এ পর্যন্ত অনূঢ়া; ইঁহার চরিত্র পরম পবিত্র। আপনি ইঁহাকে বিবাহ করিয়া গৃহে লইয়া যান। কেহ কোন কথা বলিতে পারিবে না। আমি যথাশাস্ত্র বিবাহ দিব।'

নবকুমার যে এ-প্রস্তাব এতক্ষণ অনুমান করতে পারেননি, তার সমর্থন আছে ঠিক এই উক্তির পরের অংশে:

> 'নবকুমার শয্যা হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অতি দ্রুত-পাদবিক্ষেপে ইতস্তত: ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কোন উত্তর করিলেন না। অধিকারী কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন, 'আপনি এক্ষণে নিদ্রা যান। কল্য প্রত্যূষে আপনাকে আমি জাগরিত করিব। ইচ্ছা হয়, একাকী যাইবেন। আপনাকে মেদিনীপুরের পথে রাখিয়া আসিব।' এই বলিয়া অধিকারী বিদায় লইলেন। গমন-

কালে মনে মনে কহিলেন, 'রাঢ়দেশের ঘটকালি কি ভুলিয়া' গিয়াছি নাকি ?'

অষ্টম পরিচ্ছেদটির এই বিশেষ আবহধারা আর বিচিত্র ঘটনাস্রোত,—বিবাহ সম্বন্ধে কপালকুণ্ডলার সরল মনের কৌতূহল, আর নবকুমারের পক্ষে, দায়িত্ব-স্বীকৃতির আবশ্যিক পূর্ব-চিন্তা,—অধিকারীর স্নেহ-কাতর, সময়োচিত, সুসংগত সতর্কতা,—নবকুমারের সুবিবেচিত উত্তরপরম্পরা,—সমস্ত দিক থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের দক্ষতার পরিচয় এখানে সুচিহ্নিত। নবম পরিচ্ছেদের প্রথমেই দেখা যায়, নবকুমার বলেন—'আজি হইতে কপালকুণ্ডলা আমার ধর্মপত্নী। ইহার জন্য সংসার ত্যাগ করিতে হয়, তাহাও করিব।' অতঃপর —'গোধূলিলগ্নে নবকুমারের সহিত কাপালিক-পালিতা সন্ন্যাসিনীর বিবাহ হইল।'

পরদিন প্রত্যুষেই তিন জনের যাত্রার আয়োজন। অধিকারী নবদম্পতিকে মেদিনীপুরের পথ পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। যাত্রার আগে 'নিতান্ত ভক্তিপরায়ণা' কপালকুণ্ডলা কালীপ্রণাম ক'রে প্রতিমার পায়ে বিল্বপত্র রেখেছিলেন। কিন্তু—'পত্রটি পড়িয়া গেল।' সেই অশুভ সংকেতে কপালকুণ্ডলা আর অধিকারী দুজনেই বিষণ্ণ হন। কিন্তু স্নেহের কন্যাকে তিনি বলেন—'এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে।' কন্যাকে বিদায় দেবার সময়ে তিনি তার কানে কানে বলেন—মা! তুই জানিস, পরমেশ্বরীর প্রসাদে তোর সন্তানের অর্থের অভাব নাই। হিজলীর ছোটবড় সকলেই তাঁহার পূজা দেয়। তোর কাপড়ে যাহা বাঁধিয়া দিয়াছি, তাহা তোর স্বামীর নিকট দিয়া তোকে পাল্কী করিয়া দিতে বলিস্।—সন্তান বলিয়া মনে করিস্।'

প্রথম খণ্ডের এই নটি পরিচ্ছেদেই 'কপালকুণ্ডলা'-কাহিনীর প্রথম পর্ব শেষ হয়েছে। এ-অংশে নবকুমার-কপালকুণ্ডলাই প্রধান। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে মেদিনীপুরে পৌঁছে, অধিকারীর দেওয়া অর্থসাহায্যে নির্ভর ক'রে নবকুমার তাঁর নব-পরিণীতার জন্যে দাসী, রক্ষক ও শিবিকার ব্যবস্থা করেন।

প্রথম পরিচ্ছেদের স্বল্প পরিসরের মধ্যেই এ-উপন্যাসের শাখা-কাহিনীর নায়িকা মতিবিবির প্রবেশ ঘটেছে। মতিবিবির সেই প্রবেশ-দৃশ্যের কথা দিয়েই এ-আলোচনা শুরু করা হয়েছিল। এখানে তার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, চটিতে পৌঁছে মতিবিবির সঙ্গে নবকুমারের যেটুকু আলাপ লক্ষ্য করা গেছে, তারই মধ্যে এ-আখ্যানের আসন্ন জটিলতার আভাস আছে। মেদিনীপুরের পথে বেরুবার আগে কপালকুণ্ডলার দেওয়া বিল্বপত্র প্রতিমার পা থেকে পড়ে যায়। আর, দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে মতিবিবি যে-মুহূর্তে নবকুমারের নাম উচ্চারিত হ'তে শুনেছেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই প্রদীপ নিভে গেছে! আত্মগোপনের সহজ এবং অনিবার্য তাড়নায় নিজের অজ্ঞাতসারে হয়তো মতিবিবিই প্রদীপ নিভিয়ে দিয়েছিলেন, হয়তো বা তাঁর দীর্ঘশ্বাসে সে শিখা নিভে যায়! কিন্তু, যে কারণেই তা ঘটুক,—এই দুটি চিহ্নই অদৃশ্য অদৃষ্টের সংকেত! ঘটনার দ্রুত গতি, দেশ-কালের সেই অনিশ্চিত প্রকৃতি,—নায়ক-নায়িকার জীবনের পূর্ব-ইতিহাস, আর ঘটমান বিস্ময়ের মহাসমারোহ অবলম্বন ক'রে দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পৌঁছে, ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র অবশেষে কবি মধুসূদন দত্তের কয়েকটি ছত্র স্মরণ করেন:

'ধর দেবি মোহন মূরতি
দেহ আজ্ঞা সাজাই ও বরবপু আনি
নানা আভরণে।'

মধুসূদন আর শেক্‌স্‌পীয়রের সম্বন্ধে তাঁর এই অনুরাগই সেকালের অন্যান্য গৌণ লেখকদের মধ্যে কতকটা ব্যাপকভাবে ছড়িয়েছিল। বাংলা উপন্যাসের আদিপর্বে বিশেষতঃ শেক্‌স্‌পীয়রের প্রভাব গভীর বিশ্লেষণের বিষয়। এ-আলোচনায় আবার সে-প্রসঙ্গে ফেরা যাবে।

এ-পরিচ্ছেদের শিরোভূষণটির ইশারা স্পষ্টতঃ কপালকুণ্ডলার রূপ-যৌবনের ঐশ্বর্যের দিকেই! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ অংশে,—প্রদীপ নিভে যাবার পরে,—তৃতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায় আবার নতুন প্রদীপ এসেছে। তার আগেই, অন্ধকারে মতিবিবির দীর্ঘশ্বাস শোনা যায়! ইতিমধ্যে ঘরে আলোও আনা হয়েছে, বিদেশিনীর পলাতক শিবিকা-বাহকেরাও এসে পড়েছে। তাদের সঙ্গে কথা ব'লে, তাদের বিদায় দিয়ে—'বিদেশিনী কিয়ৎকাল করলগ্ন-

কপোলা হইয়া বসিয়া রহিলেন।' নবকুমার অচিরেই বিদায়প্রার্থী হন,—'মতি স্বপ্নোত্থিতার ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া পূর্ববৎভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনি কোথায় অবস্থিতি করিবেন?'

জীবনের কোনো-এক গভীর আবেগে সে রাত্রে মতিবিবি যে খুবই বিচলিত হন, তাঁর এইসব আচরণই তার অভ্রান্ত ইঙ্গিত! তাঁরই অনুরোধে,—তাঁকে দেখাবার জন্যেই নবকুমার তাঁকে কপালকুণ্ডলার কাছে নিয়ে যান। তার আগে, মতিবিবির ঘর থেকে বেরিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে নবকুমার বিশ্রাম করছিলেন। বিদেশিনীর আহ্বানে তাঁর ঘরে ফিরে গিয়ে দেখেন—

> 'এবার আবার রূপান্তর। মতিবিবি পূর্বপরিচ্ছদ ত্যাগ করিয়া, সুবর্ণমুক্তাদিশোভিতকারুকার্যযুক্ত বেশভূষা ধারণ করিয়াছেন; নিরলঙ্কার দেহ অলঙ্কারখচিত করিয়াছেন। যেখানে যাহা ধরে—কুন্তলে, কবরীতে, কপালে, নয়নপার্শ্বে, কর্ণে, কণ্ঠে, হৃদয়ে, বাহুযুগে, সর্বত্র সুবর্ণমধ্য হইতে হীরকাদি রত্ন ঝলসিতেছে। নবকুমারের চক্ষু অস্থির হইল। প্রভূত নক্ষত্রমালা-ভূষিত আকাশের ন্যায়—মধুরায়ত শরীর সহিত অলঙ্কারবাহুল্য সুসঙ্গত বোধ হইল, এবং তাহাতে আরও সৌন্দর্যপ্রভা বর্ধিত হইল।'

মতিবিবি নবকুমারকে বলেন—'মহাশয়, চলুন আপনার পত্নীর নিকট পরিচিত হইয়া আসি।'

নবকুমার বলেন—'সেজন্য অলঙ্কার পরিবার প্রয়োজন ছিল না। আমার পরিবারের কোন গহনাই নাই।'

তার জবাবে মতিবিবি সপ্রতিভ ভাবেই বলেন—'গহনাগুলি না হয়. দেখাইবার জন্যই পরিয়াছি। স্ত্রীলোকের গহনা থাকিলে সে না দেখাইলে বাঁচে না।'

কপালকুণ্ডলার রূপ দেখে সত্যিই মুগ্ধ হতে হয় তাঁকে! নিজের অসংখ্য অলঙ্কার তাঁকে উপহার দিয়ে—দাসী পেষমনের সঙ্গে তিনি নিজের ঘরে ফিরলে পেষমন জিগেস করে—'বিবিজান! এ ব্যক্তি কে?' যবনবালা বলেন—'মেরা শৌহর।'

কপালকুণ্ডলা'তে বঙ্কিমের এই শিল্পবোধ,—এই সংযম,—এবং এই পরিণতির প্রকাশ ঘটেছে। তাঁর লেখায় এসব বিশেষত্ব এরকম পূর্ণতরভাবে এর আগে আর দেখা যায়নি।[১৯]

১৯। দুর্গেশনন্দিনী থেকে পরবর্তী উপন্যাস-ধারার সংক্ষিপ্ত সমালোচনায় অধ্যাপক সুকুমার সেন লিখেছেন—'His first attempt was a novelette in Bengali submitted for a declared prize. The prize did not come to him and the novelette was never published. His first fiction to appear in print was *Rajmohan's Wife* (published serially in *Indian Field* in 1864). It is written in English and is probably a translation of the novelette submitted for the prize. *Durgesnandini* (Daughter of the Feudal Lord), his first Bengali romance, was published next year (1865). Bhudev Mukherji's tale *(Anguriyavinimay)* supplied the nucleus of the plot which was modelled somewhat after Scott's *Ivanhoe*. The high style of Vidyasagar is followed and the influence of the contemporary predilection for low humour and buffoonery is admitted in the superfluous character of the idiotic brahman. But the tale was something that was undoubtedly new and entirely delightful. The pseudo-historical background was a justification for a pure love romance intended for readers who know only married love. তারপর 'কপালকুণ্ডলা' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'The next novel *Kapalkundala* (1866) is one of the best romances written by Chatterji. The theme is lyrical and, gripping and, in spite of the melodrama and the dual story, the execution is skilful. The heroine, named after the mendicant woman in Bhavabhuti's *Malatimadhava*, is modelled after Kalidasa's Sakuntala and partly after Shakespeare's Miranda. The diction matches the lyrical nature of the main story.' তারপর 'মৃণালিনী' সম্বন্ধে—The next romance *Mrnalini* (1869) indicates an amateurishness and a definite falling off from the standard. It is a love romance against a historical background sadly neglected and confused. The main characters are inchoate and undeveloped, and the story unconvincing. The parallel story of Pasupati and Manorama could have been better developed into a separate novel. It is not unlikely that *Mrnalini* was actually written before *Kapalkundala*.' অতঃপর 'বিষবৃক্ষ' প্রভৃতি আরো দু' একখানি বইয়ের কথা বলে 'চন্দ্রশেখরে'র কথা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন—'*Chandrasekhar* (1877) suffers markedly from the impact of two parallel plots which have little common ground. The scene is once again shifted back to the eighteenth century.' এবং—'But the novel is not historical. It has however one remarkable feature; it is the only novel of Chatterji that depicts the full development of a character, viz. the heroine Saivalini. The plot has suffered from the author's weakness for the occult.' 'চন্দ্রশেখর' সম্বন্ধে এই মন্তব্যের পরে, 'রজনী' সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য: 'The next novel *Rajani* (1877) followed the autobiographical technique of Wilkie Collin's *A Woman in White*. The title role is modelled after Bulwar Lytton's Nydia in *Last Days of Pompeii*. In this romance of a blind girl Chatterji is at his best as a literary artist. Characterization is uniformly

তৃতীয় পরিচ্ছেদের সূচনায় মেঘনাদবধকাব্যের যে-কয়েকটি ছত্র শিরোভূষণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে, সেগুলি আগেই লক্ষ্য করা গেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে ঐ কাব্যের চতুর্থ সর্গ থেকেই আর কয়েকটি লাইন তোলা হয়েছে,—সরমাকে যেখানে জানকী ছদ্মবেশী রাবণ-কর্তৃক তাঁর অপহরণ ও তার পরবর্তী বর্ণনা শুনিয়েছেন—

'খুলিনু সত্বরে
কঙ্কণ, বলয়, হার, সীঁথি, কণ্ঠমালা
কুণ্ডল নূপুর, কাঞ্চি।'

পরদিন, শিবিকা-বাহনে সপ্তগ্রামের পথে যেতে-যেতে, অলঙ্কার সম্বন্ধে সংস্কারহীনা কপালকুণ্ডলা এক ভিক্ষুকের কথা শুনে, মতিবিবির দেওয়া অলঙ্কারের প্রায় সবই সেই ভিক্ষুককে দান করেন। এই খবরটুকুই চতুর্থ পরিচ্ছেদের একমাত্র প্রসঙ্গ। প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে যেমন বালিয়াড়ি থেকে কাপালিকের পতন-বৃত্তান্তটুকুই একমাত্র বক্তব্য,— চতুর্থ খণ্ডের এই পরিচ্ছেদটিও তেমনি।

প্রথম খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে অধিকারীর প্রশ্নের উত্তরে নবকুমার যে আত্মপরিচয় দেন, দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদটি তারই অনুস্মৃতি হিসেবে ধর্তব্য। ঔপন্যাসিক এ-অংশে লিখেছেন—

'নবকুমার পিতৃহীন, তাঁহার বিধবা মাতা গৃহে ছিলেন, আর দুই ভগিনী ছিল। জ্যেষ্ঠা বিধবা; তাহার সহিত পাঠক মহাশয়ের পরিচয় হইবে না। দ্বিতীয়া শ্যামাসুন্দরী সধবা হইয়াও বিধবা; কেননা তিনি কুলীনপত্নী। তিনি দুই একবার আমাদের দেখা দিবেন।'

good and the style easy and unaffected.' তারপর আবার 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'In *Krisnakanter Uil* (1878).. Chatterji added some amount of feeling to imagination, and as a result it approaches nearest to the Western novel. The plot is somewhat akin to that of *The Poison Tree*. The story opens with an episode of domestic intrigue leading to the infatuation of a married man for a young widow with better looks than his wife and ends with the ruin it brought upon the family. The lesson is that the self-sacrifice of a loyal wife can ultimately save the soul of a man, and that purely carnal love can only lead to ruin.'—'History of Bengali Literature' [সাহিত্য-অ্যাকাডেমি, ১৯৬০ ; পৃষ্ঠা ২৩২-২৩৫] দ্রষ্টব্য।

স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনের পরে নবকুমার এবং তাঁর নবপরিণীতা বধূ সেখানে কীভাবে গৃহীত হন, এখানে সেই কথাই বলা হয়েছে। নবকুমারকে বাঘে নিয়ে গেছে,—এই খবর পেয়ে বাড়িতে শোকের ঢেউ উঠেছিল। তাঁকে ফিরে পেয়ে সকলেই খুশি হন,—শোকবিহ্বলতার পরে আনন্দবিহ্বলতা দেখা দেয়—'এমত সময়ে যখন নবকুমার সস্ত্রীক হইয়া বাটী আগমন করিলেন, তখন তাঁহাকে কে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার বধূ কোন্ জাতীয়া বা কাহার কন্যা? সকলেই আহ্লাদে অন্ধ হইল।'

কপালকুণ্ডলা তখন 'সাদরে গৃহীতা'! ফলে, নবকুমারের দুর্ভাবনা কেটে গিয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁর নিজের মনোভাবটি দেখিয়ে দেবার সুযোগ এসেছে এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে। এ-পরিচ্ছেদের শিরোনাম 'স্বদেশে' এবং এখানকার শিরোভূষণ 'মেঘদূত'-এর উত্তরমেঘ অংশের ৪২ সংখ্যক শ্লোকের প্রথম দুটি লাইন। শিরোনাম আর শিরোভূষণ, দুটিই একসঙ্গে এ-পরিচ্ছেদের বিষয়-সংকেত হিসেবে ধর্তব্য। নবকুমার দেশে ফিরে সস্ত্রীক স্বগৃহে গৃহীত হয়েছেন, এও একটি খবর,—আবার, কপালকুণ্ডলার প্রতি তাঁর আন্তরিক স্নেহানুভূতির প্রকাশ,—সেও একটি তথ্য।

এছাড়া এইসূত্রেই অন্য একটি কথা স্মরণীয়। 'দুর্গেশনন্দিনী' আলোচনায় 'লোল' শব্দটি দেখা গেছে। কালিদাসের এই উক্তিতে এখানে সেই 'লোল' শব্দটিই পুনরায় দেখা যায়—

> শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ
> কর্ণে লোলং কথয়িতুমভূদাননস্পর্শলোভাৎ।

অর্থাৎ—সখীদের উপস্থিতিতে যে-কথা উচ্চকণ্ঠে বললেও অসংগত হয় না, তোমার স্পর্শলোভে যে-ব্যক্তি সেই কথাই তোমার কানে কানে বলবার জন্যে ব্যগ্র হোতো।

নবকুমারের এই ব্যগ্রতার দিকটি সতর্কতার সঙ্গে বিবেচ্য। কপালকুণ্ডলা সমাজের বাইরে মানুষ হয়েছেন, এ বৃত্তান্তটি সুপরিচিত,—তবু জন্মগত প্রবৃত্তি, এবং তারপর কিছু পরিণত বয়সে হলেও পরিবেশের প্রভাব,—এই দুই শক্তির যোগে তাঁর মানসিক বিকাশ কতোটুকু ঘটেছিল বা ঘটতে পারে বলে আশা করা যায়,—এ-ভাবনায় সে-দিকটি এড়িয়ে চলা সম্ভব নয়। নবকুমারের অনুরাগের কথা এই প্রথম স্পষ্টভাবে জানা গেল—

> 'অনাদরের ভয়ে তিনি কপালকুণ্ডলাকে লাভ করিয়াও কিছুমাত্র আহ্লাদ বা প্রণয়লক্ষণ প্রকাশ করেন নাই, অথচ তাঁহার হৃদয়াকাশ কপালকুণ্ডলার মূর্তিতেই ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছিল। এই আশঙ্কাতেই তিনি কপালকুণ্ডলার পাণিগ্রহণ প্রস্তাবে অকস্মাৎ সম্মত হয়েন নাই, এই আশঙ্কাতেই পাণিগ্রহণ করিয়াও গৃহাগমন পর্যন্তও বারেকমাত্র কপালকুণ্ডলার সহিত প্রণয়সম্ভাষণ করেন নাই, পরিপ্লবোন্মুখ অনুরাগসিন্ধুতে বীচিমাত্র বিক্ষিপ্ত হইতে দেন নাই। কিন্তু সে আশঙ্কা দূর হইল ; জলরাশির গতিমুখ হইতে বেগনিরোধ-কারী উপলমোচনে যেমন দুর্দম স্রোতোবেগ জন্মে, সেইরূপ বেগে নবকুমারের প্রণয়সিন্ধু উছলিয়া উঠিল।'

এই প্রণয়োচ্ছলতার বর্ণনাসূত্রে আবার বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবসিদ্ধ মন্তব্য-ভঙ্গি দেখা দিয়েছে। অনুচ্ছেদের শেষ ক'টি পংক্তিতে তিনি লিখেছেন—'প্রণয় এইরূপ। প্রণয় কর্কশকে মধুর করে, অসৎকে সৎ করে, অপুণ্যকে পুণ্যবান করে, অন্ধকারকে আলোকময় করে।' 'দুর্গেশনন্দিনী'র উপান্ত পরিচ্ছেদে [দ্বিতীয়, ২১শ] তিলোত্তমার কথা-প্রসঙ্গে প্রায় একই ভঙ্গিতে তিনি লিখেছিলেন—'এ সংসারের প্রধান ঐন্দ্রজালিক স্নেহ! ব্যাধি প্রতিকারে প্রধান ঔষধ প্রণয়। নহিলে হৃদয়-ব্যাধি কে উপশম করিতে পারে?' তাঁর এ-ভঙ্গিও শেক্‌স্‌পীয়রের স্মারক!

নতুন পরিবেশে কপালকুণ্ডলার মনোভাবের কিছু পরিবর্তন ঘটেছিল কি না, সে-পরিচয় কিন্তু এখনো দেওয়া হয়নি। এই পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদ-টিতে তারই ঘোষণা আছে—'আর কপালকুণ্ডলা? তাহার কি ভাব! চল পাঠক তাহাকে দর্শন করি।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে হৃতগৌরব সপ্তগ্রামের নির্জন ঔপনগরিক অঞ্চলে, নবকুমারের বাসস্থানের বর্ণনায় দেখা যায়—'বাটীর পশ্চাদ্ভাগেই এক বিস্তৃত নিবিড় বন। বাটীর সম্মুখে প্রায় ক্রোশার্ধ দূরে একটি ক্ষুদ্র খাল বহিত ; সেই খাল একটা ক্ষুদ্র প্রান্তর বেষ্টন করিয়া গৃহের পশ্চাদ্ভাগস্থ বনমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল।'

সেই বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে শ্যামাসুন্দরী তাঁর ভ্রাতৃজায়ার সঙ্গে আলাপ ক'রছিলেন। কপালকুণ্ডলার নাম রাখা হয়েছিল 'মৃন্ময়ী'। মৃন্ময়ী তাঁর এই নতুন পরিবেশে সুখী নন। তাই পরিচ্ছেদের নাম 'অবরোধে'।

শ্যামাসুন্দরীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন—'বোধ করি, সমুদ্রতীরে সেই বনে বনে বেড়াইতে পারিলে আমার সুখ জন্মে।' তাঁর মনে পড়েছে যে, মেদিনীপুরের পথে যাত্রা করবার আগে—'ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না!' সে-কথা শুনে শ্যামাসুন্দরী শিউরে ওঠেন!

'কপালকুণ্ডলা'র প্রথম খণ্ড শেষ হয়েছিল অধিকারীর আশ্রয় ছেড়ে পথে বেরিয়ে পড়বার ঘটনায়; দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ এই সপ্তগ্রামের অবরোধ-যন্ত্রণাবোধে। এই অশান্তির বিবরণেও বঙ্কিম রূপ-বর্ণনার অভ্যাস ত্যাগ করেননি। দ্বিতীয় খণ্ডের এই শেষ পরিচ্ছেদেই দেখা যায়—

> 'যে নবীনাদ্বয় প্রাসাদোপরি দাঁড়াইয়াছিলেন, তন্মধ্যে একজন চন্দ্ররশ্মি-বর্ণাভা: অবিন্যস্ত কেশভারমধ্যে প্রায় অর্ধলুক্কায়িতা। অপরা কৃষ্ণাঙ্গী; তিনি সুমুখী ষোড়শী, তাঁহার ক্ষুদ্র দেহ, মুখখানি ক্ষুদ্র, তাহার উপরার্ধে চারিদিক দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত কুন্তলদাম বেড়িয়া পড়িয়াছে; যেন নীলোৎপল দলরাজি উৎপলমধ্যকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। নয়নযুগল বিস্ফারিত, কোমল শ্বেতবর্ণ, সফরীসদৃশ; অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র, সঙ্গিনীর কেশতরঙ্গমধ্যে ন্যস্ত হইয়াছে। পাঠক মহাশয় বুঝিয়াছেন যে, চন্দ্ররশ্মিবর্ণশোভিনী কপালকুণ্ডলা; তাঁহাকে বলিয়া দিই, কৃষ্ণাঙ্গী তাঁহার ননন্দা শ্যামাসুন্দরী।'[২০]

দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় খণ্ডের আলোচনায় এগিয়ে যাবার আগে—'বিবিধ প্রবন্ধে'র 'শকুন্তলা, মিরন্দা এবং দেস্‌দিমোনা' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র শকুন্তলা এবং

২০। বঙ্কিমচন্দ্রের এই দুখানি উপন্যাসের আলোচনাসূত্রে ইতিমধ্যে দুটি লক্ষণীয় বিশেষত্বের কিছু কিছু উদাহরণ পাওয়া গেল। তার মধ্যে একটি তাঁর অপেক্ষাকৃত স্থায়ী স্বভাবের মধ্যে গণ্য,—অন্যটি তাঁর নানা চিন্তার অন্যতম চিন্তা। রূপ-বর্ণনা—এবং নায়ক-নায়িকার বা প্রায় প্রত্যেক চরিত্রেরই বয়স উল্লেখ করা তাঁর স্বভাব। দ্বিতীয়তঃ তাঁর উপন্যাসে সংস্কৃত ভাষার প্রয়োগ কেবলমাত্র 'কপালকুণ্ডলা'তেই নয়,—অন্যত্রও ঘটেছে। 'মৃণালিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পশুপতি আর মহম্মদআলির সংলাপও সংস্কৃত ভাষায় বাহিত। অবশ্য মহম্মদআলির—'সংস্কৃতের তিন ভাগ ফারসী, আর অবশিষ্ট চতুর্থ ভাগ যেরূপ সংস্কৃত, তাহা ভারতবর্ষে কখন ব্যবহৃত হয় নাই। তাহা মহম্মদ আলিরই সৃষ্ট সংস্কৃত।' 'আনন্দমঠে'র প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে ভবানন্দের বন্দেমাতরম্ সংগীতের ভাষার বিস্ময়কর উৎকর্ষ তাঁর সারা জীবনের এই বিশেষ চিন্তা ও ভাষা সন্ধানের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত।

মিরন্দা,—দুই দেশের, দুই কবির, বিভিন্ন কালের এই দুই নায়িকার তুলনাসূত্রে যা লিখেছিলেন, সেই কথাগুলি মনে পড়ে :—

'শকুন্তলা সরলা হইলেও অশিক্ষিতা নহেন। তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন, তাঁহার লজ্জা। লজ্জা তাঁহার চরিত্রে বড় প্রবলা; তিনি কথায় কথায় দুষ্মন্তের সম্মুখে লজ্জাবনতমুখী হইয়া থাকেন—লজ্জার অনুরোধে আপনার হৃদ্গত প্রণয় সখীদের সম্মুখেও সহজে ব্যক্ত করিতে পারেন না। মিরন্দার সেরূপ নহে। মিরন্দা এত সরলা যে তাঁহার লজ্জাও নাই। কোথা হইতে লজ্জা হইবে? তাঁহার জনক ভিন্ন অন্য পুরুষকে কখন দেখেন নাই।'

সমাজপ্রদত্ত যে সকল সংস্কার, শকুন্তলার তাহা সকলই আছে, মিরন্দার তাহা কিছুই নাই।...

'অথচ স্বভাবদত্ত স্ত্রীচরিত্রের যে পবিত্রতা, যাহা লজ্জার মধ্যে লজ্জা, তাহা মিরন্দায় অভাব নাই এজন্য শকুন্তলার সরলতা অপেক্ষা মিরন্দার সরলতায় নবীনত্ব এবং মাধুর্য অধিক।...

আমরা বুঝিতে পারি যে, মিরন্দা সংস্কারবিহীনা, কিন্তু মিরন্দা পরদুঃখকাতরা, মিরন্দা স্নেহশালিনী; মিরন্দার লজ্জা নাই। কিন্তু লজ্জার সারভাগ যে পবিত্রতা, তাহা আছে।'

এই মিরন্দার কথা-প্রসঙ্গেই তিনি আরো লিখে গেছেন :

'যখন রাজপুত্রের সঙ্গে মিরন্দার সাক্ষাৎ হইল, তখন তাঁহার হৃদয় প্রণয়সংস্পর্শশূন্য ছিল; শকুন্তলাও যখন রাজাকে দেখেন, তখন তিনিও শূন্যহৃদয়, ঋষিগণ ভিন্ন পুরুষ দেখেন নাই। উভয়েই তপোবন মধ্যে—একস্থানে কণ্বের তপোবন—অপরস্থানে প্রস্পেরোর তপোবন—অনুরূপ নায়ককে দেখিবামাত্র প্রণয়শালিনী হইলেন। কিন্তু কবিদিগের আশ্চর্য কৌশল দেখ; তাঁহারা পরামর্শ করিয়া শকুন্তলা ও মিরন্দা-চরিত্র প্রণয়নে প্রবৃত্ত হয়েন নাই অথচ একজনে দুইটি চরিত্র প্রণীত করিলে যেরূপ হইত, ঠিক সেইরূপই হইয়াছে। যদি একজনে দুইটি চরিত্র প্রণয়ন করিতেন, তাহা হইলে কবি শকুন্তলার প্রণয়লক্ষণে ও মিরন্দার প্রণয়লক্ষণে কি প্রভেদ রাখিতেন? তিনি বুঝিতেন যে, শকুন্তলা সমাজপ্রদত্ত সংস্কার-সম্পন্না, লজ্জাশীলা, অতএব তাহার প্রণয় মুখে অব্যক্ত থাকিবে,

কেবল লক্ষণেই ব্যক্ত হইবে; কিন্তু মিরন্দা সংস্কারশূন্যা, লৌকিক লজ্জা কি, তাহা জানে না, অতএব তাহার প্রণয়লক্ষণ বাক্যে অপেক্ষাকৃত পরিস্ফুট হইবে। পৃথক পৃথক কবিপ্রণীত চিত্রদ্বয়ে তাহাই ঘটিয়াছে।'

'কপালকুণ্ডলা' চরিত্রটির উদ্ভাবনার মূলে তাঁর এই চিন্তা যে কিছু পরিমাণে কাজ করেছিল, তাতে সন্দেহ নেই। তবে, প্রণয়ানুভূতির ক্ষেত্রে কপালকুণ্ডলা মিরন্দার সমতুল্য নয়। এই একটি কথা। দ্বিতীয়টি তাঁর পূর্বোক্ত রূপবর্ণনার অভ্যাসের সঙ্গেই জড়িত। দ্বিতীয় খণ্ডের এই শেষ পরিচ্ছেদে শ্যামাসুন্দরীর যে রূপ-বর্ণনা দেখা গেল, 'মৃণালিনী'র গিরিজায়া অথবা 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র ভ্রমর-এর সঙ্গে—কিংবা 'বিষবৃক্ষে'র হীরা-তে বা হরিদাসী বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশেও তার সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে'র প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে এক ভোরের আলোয় গোবিন্দলাল ভ্রমরের দিকে অতৃপ্ত নয়নের দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছিলেন—

'সেই সময়ে সূর্যোদয়সূচক প্রথম রশ্মিকিরীট পূর্বগগনে দেখা দিল—তাহার মৃদুল জ্যোতিঃপুঞ্জ ভূমণ্ডলে প্রতিফলিত হইতে লাগিল। নবীনালোক পূর্বদিক হইতে আসিয়া পূর্বমুখী ভ্রমরের মুখের উপর পড়িয়াছিল। সেই উজ্জ্বল, পরিষ্কার, কোমল, শ্যামচ্ছবি মুখকান্তির উপর কোমল প্রভাতালোক পড়িয়া তাহার বিস্ফারিত লীলাচঞ্চল চক্ষের উপর জ্বলিল, তাহার স্নিগ্ধোজ্জ্বল গণ্ডে প্রভাসিত হইল।'

ভ্রমরের রূপ-বর্ণনায় কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যস্ত বিস্তারের অভাব! ভ্রমর কৃষ্ণবর্ণা,—তার যথার্থ নাম কৃষ্ণমোহিনী, কি কৃষ্ণকামিনী, কি অনঙ্গমঞ্জরী যাই থাক না কেন,—গোবিন্দলালের কাছে তার আদরের নাম ছিল 'ভ্রমর' বা 'ভোমরা'। 'মৃণালিনীর' তৃতীয় পরিচ্ছেদেই গিরিজায়ার অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত রূপ-বর্ণনা চোখে পড়ে। তার রূপও সুন্দর, কণ্ঠও মধুর। সে কোমল কণ্ঠে গান গেয়েছে। সেই গান শুনে, মৃণালিনী তাঁর সখী মণিমালিনীকে তার কথা জিগেস করেন। তার পরিচয়জিজ্ঞাসু হয়েই গিরিজায়াকে ঘরে ডেকে এনেছেন তাঁরা। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব বর্ণনা:

'গায়িকার বয়স ষোল বৎসর। ষোড়শী খর্বাকৃতি এবং কৃষ্ণাঙ্গী। সে প্রকৃত কৃষ্ণবর্ণা। তাই বলিয়া তাহার গায়ে

ভ্রমর বসিলে যে দেখা যাইত না, অথবা কালি মাখিলে জল মাখিয়াছে বোধ হইত, কিংবা জল মাখিলে কালি বোধ হইত, এমত নহে। যেরূপ কৃষ্ণবর্ণ আপনার ঘরে থাকিলে শ্যামবর্ণ বলি, পরের ঘরে হইলে পাতুরে কালি বলি, ইহার সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ। কিন্তু বর্ণ যেমন হউক না কেন, ভিখারিণী কুরূপা নহে। তাহার অঙ্গ পরিষ্কার, সুমার্জিত, চাকচিক্যবিশিষ্ট; মুখখানি প্রফুল্ল, চক্ষু দুটি বড়, চঞ্চল, হাস্যময়, লোচনতারা নিবিড়কৃষ্ণ, একটি তারার পার্শ্বে একটি তিল। ওষ্ঠাধর ক্ষুদ্র, রক্তপ্রভ, তদন্তরে অতি পরিষ্কার অমলশ্বেত, কুন্দকলিকাসন্নিভ দুই শ্রেণী দন্ত। কেশগুলি সূক্ষ্ম, গ্রীবার উপরে মোহিনী কবরী, তাহাতে যূথিকার মালা বেষ্টিত। যৌবনসঞ্চারে শরীরের গঠন সুন্দর হইয়াছিল, যেন কৃষ্ণপ্রস্তরে কোন শিল্পকার পুত্তল খোদিত করিয়াছিল। পরিচ্ছদ অতি সামান্য, কিন্তু পরিষ্কার—ধূলিকর্দমপরিপূর্ণ নহে। অঙ্গ একেবারে নিরাভরণ নহে, অথচ অলঙ্কারগুলি ভিখারীর যোগ্য বটে। প্রকোষ্ঠে পিত্তলের বলয়, গলায় কাষ্ঠের মালা, নাসিকায় ক্ষুদ্র একটি তিলক, ভ্রূমধ্যে ক্ষুদ্র একটি চন্দনের টিপ।'

চোখে দেখা এই রূপের সঙ্গে তার কণ্ঠে বেজে ওঠে এই সংকেতময় গান:

মথুরাবাসিনি, মধুরহাসিনি, শ্যামবিলাসিনি—রে।
কহলো নাগরি, গেহ পরিহরি, কাহে বিবাসিনী—রে॥
বৃন্দাবনধন, গোপিনীমোহন, কাহে তু তেয়াগী—রে।
দেশ দেশ পর, সো শ্যামসুন্দর, ফিরে তুয়া লাগি—রে॥
বিকচ নলিনে, যমুনাপুলিনে বহুত পিয়াসা—রে।
চন্দ্রমাশালিনী, যা মধুযামিনী, না মিটল আশা—রে॥
সা নিশা সমরি, কহ লো সুন্দরী, কাঁহা মিলে দেখা—রে।
শুনি যাওয়ে চলি, বাজয়ি মুরলী বনে বনে একা—রে॥

এই রূপ আর এই গান, একযোগে এ-সমাবেশ পরমাশ্চর্য বটে,—কিন্তু সে অন্য কথা। এখানে, 'কপালকুণ্ডলার' তৃতীয় খণ্ডে প্রবেশ করবার আগে শ্যামাসুন্দরীর সঙ্গে ভ্রমর, গিরিজায়া প্রভৃতির এই সাদৃশ্যের দিকটি লক্ষ্য করা গেল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীচরিত্রে রূপবৈশিষ্ট্যের এ এক বিশেষ দিক—বা বঙ্কিম-বর্ণিত সুন্দরীদের এ এক বিশেষ টাইপ ব'ল্লে অন্যায় হয় না।

অতঃপর তৃতীয় খণ্ডের কথা। তৃতীয় খণ্ডে সর্বসমেত ছটি মাত্র পরিচ্ছেদ। এই ছটি পরিচ্ছেদে দেশের তদানীন্তন পরিস্থিতি,—সেই পরিস্থিতিতে মতিবিবি বা লুৎফউন্নিসার পূর্বকথা,—এবং উপন্যাসের পূর্ববর্ণিত পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের গতি-পরিবর্তনের ছবিই প্রধান।

পদ্মাবতীর পিতা যখন ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, তখন কন্যার নাম বদলে নতুন নাম রাখা হয় 'লুৎফউন্নিসা'। কিন্তু, ঔপন্যাসিক জানিয়েছেন,—'মতিবিবি কোন কালেও ইঁহার নাম নহে। তবে কখনও কখনও ছদ্মবেশে দেশবিদেশে ভ্রমণকালে ঐ নাম গ্রহণ করিতেন।' ঢাকা থেকে আগ্রায় গিয়ে ঘোষাল অল্পদিনের মধ্যেই প্রধান ওমরাহদের অন্যতম হন। আগ্রাতে লুৎফ-উন্নিসা—'পারসীক, সংস্কৃত, নৃত্য, গীত,...ইত্যাদিতে সুশিক্ষিতা' হন। কিন্তু—'দুর্ভাগ্যবশতঃ বিদ্যা সম্বন্ধে তাঁহার যাদৃশ শিক্ষা হইয়াছিল, ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কিছুই হয় নাই।'—এবং—'লুৎফউন্নিসার বয়স পূর্ণ হইলে প্রকাশ পাইতে লাগিল যে, তাহার মনোবৃত্তি সকল দুর্দমবেগবতী। ইন্দ্রিয় দমনে কিছুমাত্র ক্ষমতাও নাই, ইচ্ছাও নাই। সদসতে সমান প্রবৃত্তি।' এই নৈতিক দুর্বলতার কথা জানাজানি হওয়ায়—'তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে আপন গৃহ হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিলেন।' সেই সুযোগে যুবরাজ সেলিম তাঁকে নিজের প্রধানা মহিষী মানসিংহের ভগিনীর প্রধানা সহচরী নিযুক্ত করেন।—'লুৎফউন্নিসা প্রকাশ্যে বেগমের সখী, পরোক্ষে যুবরাজের অনুগ্রহ-ভাগিনী হইলেন।' সেলিমের ওপর তাঁর প্রণয়াধিপত্য দেখে তাঁর সম্বন্ধে জনশ্রুতি দাঁড়ায় যে, কালে তিনিই হবেন প্রধানা মহিষী!

এদিকে আকবরের কোষাধ্যক্ষ [আকতিমাদ-উদ্দৌলা] খাজা আয়াসের কন্যা সুন্দরীশ্রেষ্ঠা মেহের-উন্নিসাকে দেখে সেলিম আকৃষ্ট হন। ইতিহাসের পরবর্তী কথা বঙ্কিম নিজেই এই পরিচ্ছেদে কয়েকটি মাত্র বাক্যে জানিয়ে দিয়েছেন। লুৎফউন্নিসা সিংহাসনের আশা ত্যাগ করেন।[২১] কিন্তু উপেক্ষিতা

২১। 'শের আফগান নামক একজন মহাবিক্রমশালী ওমরাহের সহিত কোষাধ্যক্ষের কন্যার সম্বন্ধ পূর্বেই হইয়াছিল। সেলিম অনুরাগান্ধ হইয়া সে সম্বন্ধ রহিত করিবার জন্য পিতার নিকট যাচমান হইলেন। কিন্তু নিরপেক্ষ পিতার নিকট কেবল তিরস্কৃত হইলেন মাত্র। সুতরাং সেলিমকে আপাততঃ নিরস্ত হইতে হইল। আপাততঃ নিরস্ত হইলেন বটে, কিন্তু আশা ছাড়িলেন না। শের আফগানের সহিত মেহের-উন্নিসার বিবাহ হইল। কিন্তু সেলিমের চিত্তবৃত্তিসকল লুৎফ-উন্নিসার নখদর্পণে ছিল,—তিনি নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন যে, শের আফগানের সহস্র প্রাণ থাকিলেও তাঁহার নিস্তার নাই, আকবরশাহের মৃত্যু হইলেই তাঁহার প্রাণান্ত হইবে—মেহের-উন্নিসা সেলিমের মহিষী হইবেন।'

নায়িকা হিসেবে তিনি প্রতিশোধ নেবারও সংকল্প করেন। আকবরের পরমায়ু শেষ হয়ে এলে,—সেলিমের মহিষী মানসিংহের বোনকে—তাঁরই সন্তান খস্রু যাতে বাদশাহ হতে পারে, লুৎফউন্নিসা তখন সেই চেষ্টায় উদ্যত করেন। এই ব্যাপারে বেগম নিজে মানসিংহকে রাজী করাবেন, আর লুৎফউন্নিসা প্রধান রাজমন্ত্রী এবং খস্রুর শ্বশুর খাঁ আজিম খাঁ-কে রাজী করাবেন,—এই স্থির হয়। খাঁ আজিম খাঁ এবং অন্যান্য ওমরাহের দল এতে রাজী হন, তবে, খাঁ আজিম খাঁ লুৎফউন্নিসাকে বলেন—'মনে কর, যদি কোন অসুযোগে আমরা কৃতকার্য না হই, তবে তোমার আমার রক্ষা নাই। অতএব প্রাণ বাঁচাইবার একটা পথ রাখা ভাল।'

উড়িষ্যায় লুৎফউন্নিসার ভাই ছিলেন মন্সবদার। তাঁর সঙ্গে আলোচনা ক'রে উড়িষ্যায় একটা আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবার জন্যেই—খাঁ আজিম খাঁর পরামর্শে—লুৎফউন্নিসাকে সেবার উড়িষ্যায় আসতে হয়।

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে এই পরিচয়ের পরে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বর্ধমানের পথে আর-একটি চটিতে পেষমনের সঙ্গে মতিবিবির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে লুৎফউন্নিসার সংকল্পের আর-এক দিক উদ্ঘাটিত হতে দেখা যায়। তাতে মতিবিবির পরবর্তী জীবন-ধারায় নবকুমারের জন্যে যোগ্য স্থান-সন্ধানের আভাস আছে। বেগম নিজে এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, লুৎফউন্নিসা ওমরাহের বেগম হবেন। সম্ভবতঃ সেই চিন্তার স্রোতেই—নবকুমারের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মতিবিবির মনে বিশেষ এক সম্ভাবনার ইশারা জাগে,—অর্থাৎ—নবকুমার যখন মতিবিবির স্বামী, তখন তিনিই তো ওমরাহ হতে পারেন! কিন্তু অচিরেই সে আশা নির্মূল হয়!

খাঁ আজিম খাঁর এক আশ্রিত ব্যক্তির হাত থেকে ইতিমধ্যে একখানি জরুরি চিঠি পেয়ে জানা যায় যে, আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়েছে। কুমার সেলিমই বাদশাহ হয়েছেন। সেই খবর পেয়ে,—বর্ধমানের পথে,—সেই চটিতেই মতিবিবি পেষমন্‌কে তাঁর এই নতুন আয়োজনের কথা বলেন:

> 'মতি কহিলেন, 'এক ভরসা আছে। মেহের-উন্নিসার চিত্ত জাঁহাগীরের প্রতি কিরূপ? তাহার যেরূপ দার্ঢ্য, তাহাতে যদি সে জাঁহাগীরের প্রতি অনুরাগিনী না হইয়া স্বামীর প্রতি যথার্থ স্নেহশালিনী হইয়া থাকে, তবে জাঁহাগীর শত শের আফগান বধ

করিলেও মেহেরউন্নিসাকে পাইবেন না। আর যদি মেহেরউন্নিসা জাঁহাগীরের যথার্থ অভিলাষিণী হয়, তবে আর কোন ভরসা নাই।'

পেষমন। মেহেরউন্নিসার মন কি প্রকারে জানিবে?

মতি হাসিয়া কহিলেন, 'লুৎফউন্নিসার অসাধ্য কি? মেহের-উন্নিসা আমার বাল্যসখী—কালি বর্ধমানে গিয়া তাহার নিকট দুই দিন অবস্থিতি করিব।'

পেষমন। যদি মেহেরউন্নিসা বাদশাহের অনুরাগিনী হন, তাহা হইলে কি করিবে?

মতি। পিতা কহিয়া থাকেন, ক্ষেত্রে কর্ম বিধীয়তে।'

এই সংকল্প সত্ত্বেও মতিবিবির মনে তখনি আবার নতুন ভাবের উদয় হয়, এবং তাঁর মৃদু হাসিতে সে-ইশারাও ব্যক্ত হয়। তবে, পেষমনকে তিনি সে-কথা খুলে বলেননি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলেছেন—'আমরাও তাহা পাঠককে বলিব না। পশ্চাৎ প্রকাশ পাইবে।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদের শিরোনাম—'প্রতিযোগিনী-গৃহে'। শের আফগান তখন বাংলার সুবাদারের অধীনে বর্ধমানের কর্মাধ্যক্ষ। মতিবিবি সেখানে গিয়ে মেহেরউন্নিসার সঙ্গে দেখা করেন এবং একমাত্র তিনিই যে 'দিল্লীশ্বরের প্রাণেশ্বরী' হবার যোগ্য, তাঁকে এ-কথাও শোনান! শুনে, মেহেরউন্নিসা বলেন যে, তিনি 'শের আফগানের বনিতা',—এবং কায়মনোবাক্যে তিনি তাই-ই! কিন্তু মতিবিবি যখন তাঁকে জানান যে, আকবর বাদশাহের মৃত্যু হয়েছে,—সেলিম দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত,—তখন বেশ বিচলিত হয়েই তিনি বলেন—'সেলিম ভারতবর্ষের সিংহাসনে, আমি কোথায়?' অর্থাৎ সেলিমের প্রতি তাঁর আকাঙ্ক্ষা তখনও অনির্বাপিত! এই খবরটি জানতে পেরে, মতিবিবি প্রশ্ন করেন—মেহেরউন্নিসা সম্বন্ধে সেলিম কিছু জিগেস করলে তাঁকে তিনি কী জবাব দেবেন? মেহেরউন্নিসা বলেন:

'এই কহিও যে, মেহের-উন্নিসা হৃদয় মধ্যে তাঁহার ধ্যান করিবে। প্রয়োজন হইলে তাঁহার জন্য আত্মপ্রাণ পর্যন্ত সমর্পণ করিবে। কিন্তু কখনও আপন কুলমান সমর্পণ করিবে না। দাসীর স্বামী জীবিত থাকিতে সে কখনও দিল্লীশ্বরকে মুখ দেখাইবে না। আর যদি দিল্লীশ্বর কর্তৃক তাহার স্বামীর প্রাণান্ত হয়, তবে স্বামিহন্তার সহিত ইহজন্মে তাহার মিলন হইবেক না।'

জাঁহাঙ্গীরের প্রতি মেহেরউন্নিসার এই অনুরাগ সম্বন্ধে নিঃসংশয় হবার পরে মতিবিবির মনের পরিবর্তন ঘটে। আগ্রায় পৌঁছে সেলিমকে তিনি মেহের-উন্নিসার খবর দেন,—মেহেরউন্নিসা যে দিল্লীশ্বরী হবেন, সে-সম্ভাবনার কথাও শোনান,—পূর্ব-স্বামীকে নিজে আবার বিবাহ করবার অনুমতিও কৌশলে আদায় করেন। বাদশাহ জিগেস করেন—'এক আকাশে কি চন্দ্র সূর্য উভয়েই বিরাজ করেন না? এক বৃন্তে কি দুটি ফুল ফোটে না?' লুৎফ-উন্নিসা জবাব দেন—'ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ফুল ফুটিয়া থাকে, কিন্তু এক মৃণালে দুইটি কমল ফুটে না।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদের এই প্রশ্নোত্তরের পরে পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায়—লুৎফউন্নিসা পেষমনকে তাঁর দামী পোষাক উপহার দিয়ে তাঁর সংকল্পের কথা জানান,—চিরকালের মতন তিনি আগ্রা ত্যাগ ক'রে যাবেন—বাংলায় ফিরে ভদ্রলোকের গৃহিণী হবেন এবার! তাঁর জীবনে—সুখের নিবৃত্তিহীন আগ্রহের কথা এই পঞ্চম পরিচ্ছেদেই তাঁর এক দীর্ঘ উক্তিতে উচ্চারিত। এর আগেও মাঝে মাঝে সংলাপে বাগ্মিতার লক্ষণ দেখা গেছে বটে,—তবে লুৎফউন্নিসার এ-উক্তিটি ঠিক বাগ্মিতার উদাহরণ নয়,—এটিকে বরং আত্মোপলব্ধির গভীর স্বগতোক্তি বলা যেতে পারে। আবার, রাজপ্রাসাদের জীবনের সঙ্গে অন্য জীবনের অন্য অভিজ্ঞতার তুলনা ক'রে তিনি বলেছেন—'তিন বৎসর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসিয়া যে সুখ না হইয়াছে, উড়িষ্যা হইতে প্রত্যাগমনের পথে এক রাত্রে সে সুখ হইয়াছে।' নিজের সম্বন্ধে তাঁর আরো একটি মন্তব্য আছে এই পরিচ্ছেদেই—'আমি এতকাল হিন্দুদিগের দেবমূর্তির মত ছিলাম। বাহিরে সুবর্ণরত্নাদিতে খচিত; ভিতরে পাষাণ। ইন্দ্রিয়সুখান্বেষণে আগুনের মধ্যে বেড়াইয়াছি, কখনও আগুন স্পর্শ করি নাই। এখন একবার দেখি, যদি পাষাণ মধ্যে খুঁজিয়া একটা রক্তশিরাবিশিষ্ট অন্তঃকরণ পাই।'

'চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের আদিতেই দেখা যায় যে, আগ্রায় যেতে, এবং সেখান থেকে সপ্তগ্রামে ফিরে আসতে তাঁর একবছর লেগেছিল।

'কপালকুণ্ডলা'র বিভিন্ন পরিচ্ছেদের অনেকগুলি শিরোভূষণের উদ্ধৃতিতে মধুসূদনের উল্লেখ দেখা যায়। প্রথম খণ্ডে একটি,—দ্বিতীয় খণ্ডে দুটি,—তৃতীয়

খণ্ডে দুটি—এবং চতুর্থ খণ্ডে একটি—মধুসূদনের লেখা থেকে মোট এই ছটি উদ্ধৃতি ব্যবহৃত হয়েছে। পঞ্চমের পরে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে 'বীরাঙ্গনা কাব্যে'র পঞ্চম সর্গ থেকে—'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা' কাব্য-পত্রের এই দুটি লাইন তুলে দিয়ে মতিবিবি সম্বন্ধে বঙ্কিম তাঁর অনুচ্চারিত মন্তব্যেরই ইঙ্গিত দিয়েছেন :

কায় মনঃ প্রাণ আমি সঁপিব তোমারে
ভুঞ্জ আসি রাজভোগ দাসীর আলয়ে॥

লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখার মোহ অবলম্বন ক'রে মধুসূদন তাঁর এই রচনায় মোটেই বাল্মীকি-অনুসৃত পথে চলেননি। মধুসূদনের সূর্পণখা প্রেমবিহ্বলা। লক্ষ্মণকে তিনি লিখেছিলেন :

প্রেমমন্ত্র দিও কর্ণমূলে :
গুরুর দক্ষিণা-রূপে প্রেম-গুরু-পদে
দিব এ যৌবন-ধন প্রেম-কুতূহলে!
প্রেমাধীনা নারীকুল ডরে কি হে দিতে
জলাঞ্জলি, মঞ্জুকেশি, কুল, মান, ধনে
প্রেমলাভ-লোভে কভু?

মধুসূদনের সূর্পণখার এই প্রেমাকুতির সঙ্গেই মতিবিবির মনের মিল! লুৎফউন্নিসা সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে লিখেছেন :

'প্রথম একদিন অকস্মাৎ প্রণয়ভাজনের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তখন প্রণয়সঞ্চার বিশেষ জানিতে পারিলেন না। কিন্তু তখনই অঙ্কুর হইয়া রহিল। তাহার পর আর সাক্ষাৎ হইল না। কিন্তু অসাক্ষাতে পুনঃ পুনঃ সেই মুখমণ্ডল মনে পড়িতে লাগিল, স্মৃতিপটে সে মুখমণ্ডল চিত্রিত করা কতক সুখকর বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। বীজে অঙ্কুর জন্মিল। মূর্তিপ্রতি অনুরাগ জন্মিল। চিত্তের ধর্ম এই যে, যে মানসিক কর্ম যত অধিকবার করা যায়, সে কর্মে তত অধিক প্রবৃত্তি হয়; সে কর্ম ক্রমে স্বভাবসিদ্ধ হয়। লুৎফউন্নিসা সেই মূর্তি অহরহঃ মনে ভাবিতে লাগিলেন। দারুণ দর্শনাভিলাষ জন্মিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সহজস্পৃহাপ্রবাহও দুর্নিবার্য হইয়া উঠিল। দিল্লীর সিংহাসন-লালসাও তাঁহার নিকট লঘু হইল। সিংহাসন যেন মন্মথশরসম্ভূত অগ্নিরাশিবেষ্টিত বোধ হইতে লাগিল। রাজ্য, রাজধানী, রাজসিংহাসন সকল

বিসর্জন দিয়া প্রিয়জন সন্দর্শনে ধাবিত হইলেন, সে প্রিয়জন নবকুমার।'

তাই সপ্তগ্রামে এসে, তিনি এক সুরম্য অট্টালিকায় বসবাস শুরু করেন এবং সেই সুসজ্জিত প্রাসাদেই নবকুমারকে ডেকে আনেন। সপ্তগ্রামে নবকুমারের সঙ্গে ইতিমধ্যে তাঁর আরো দু'একবার দেখা হয়েছে। নবকুমারের কাছে তাঁর আত্মনিবেদনের এই দৃশ্যে দেখা যায়—নবকুমার বিদায় নেবার জন্যে ব্যস্ত,—লুৎফউন্নিসা নীরবে অশ্রু-বিসর্জনরত! 'লক্ষ্মণের প্রতি সূর্পণখা' পত্রে মধুসূদন যেমন দেখিয়েছেন,—লুৎফউন্নিসা ঠিক সেইরকম আন্তরিক আবেগের সঙ্গেই বলেন—'তুমি কি চাও? পৃথিবীতে কিছু কি প্রার্থনীয় নাই? ধন, সম্পদ, মান, প্রণয়, রঙ্গ, রহস্য পৃথিবীতে যাহাকে যাহাকে সুখ বলে, সকলই দিব; কিছুই তাহার প্রতিদান চাহি না; কেবল তোমার দাসী হইতে চাহি। তোমার যে পত্নী হইব, এ গৌরব চাহিনা, কেবল দাসী।'

নবকুমার খুব শক্ত জবাব দেন—'আমি দরিদ্র ব্রাহ্মণ, ইহজন্মে দরিদ্র ব্রাহ্মণই থাকিব। তোমার দত্ত ধনসম্পদ লইয়া যবনীজার হইতে পারিব না।'

কিন্তু লুৎফউন্নিসার সত্যিই বোধ হয় চিত্তপরিবর্তন ঘটেছিল! এ উত্তর শুনেও তিনি উত্তেজিত হন নি। তাঁর স্নেহনিপীড়িত রুদ্ধ মুষ্টি থেকে নবকুমার জোর ক'রে নিজের 'বস্ত্রাগ্রভাগ' মুক্ত ক'রে নেন।

> 'লুৎফউন্নিসা আবার তাঁহার বস্ত্রাগ্র ধরিয়া কহিলেন, 'ভাল সে যাউক। বিধাতার যদি সেই ইচ্ছা, তবে চিত্তবৃত্তিসকল অতল জলে ডুবাইব। আর কিছু চাহি না, এক-একবার তুমি এই পথে যাইও; দাসী ভাবিয়া এক-একবার দেখা দিও, কেবল চক্ষুঃ-পরিতৃপ্তি করিব।'
>
> নব। তুমি যবনী—পরস্ত্রী—তোমার সহিত এরূপ আলাপেও দোষ। তোমার সহিত আর আমার সাক্ষাৎ হইবে না।'

অতঃপর আরো ব্যাকুলতা ব্যক্ত হয়েছে,—নায়িকা আরো অনুনয়-বিনয় ক'রেছেন,—কিন্তু নবকুমার যখন তাতেও অবিচলিত রইলেন, তখন লুৎফ-উন্নিসা সদর্পে নিজের অঙ্গীকার শুনিয়ে দেন—'এ জন্মে তোমার আশা ছাড়িব না'।

সুন্দরীর রূপ-বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্রের নিজস্ব একরকম বিশেষত্বের কথা আগেই

বলা হয়েছে। গিরিজায়া, ভ্রমর, হীরা, শ্যামাসুন্দরীর 'টাইপ'-এর প্রসঙ্গও দেখা গেছে। তাঁর কবি-কল্পনায় 'পদ্মবৃক্ষে কালফণিনী'র রূপ—মধুরে-ভয়ঙ্করে সমাবেশের প্রতীক! নারীর সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রতিহিংসা বা অন্য কোনো উগ্রতার সমাবেশ দেখাতে হ'লেই সংস্কৃত সাহিত্যের কবিপ্রসিদ্ধি অবলম্বন ক'রে,—অথবা সেই ধারার সঙ্গে আত্মিক যোগের ফলে, তিনি জীবজন্তুর চিত্র প্রয়োগ করেন! লুৎফউন্নিসার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।—'স্রোতোদ্বিহারিণী রাজহংসী যেমন গতিবিরোধীর প্রতি গ্রীবাভঙ্গি করিয়া দাঁড়ায়, দলিতফণা ফণিনী যেমন ফণা তুলিয়া দাঁড়ায়, তেমনি উন্মাদিনী যবনী মস্তক তুলিয়া দাঁড়াইলেন।' সেই মূর্তি দেখে নবকুমারের পূর্বকথা মনে পড়ে—

> 'একদিন নবকুমার তাঁহার প্রথমা পত্নী পদ্মাবতীর প্রতি বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে শয়নাগার হইতে বহিষ্কৃতা করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তখন সদর্পে তাঁহার দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল।···বহুকাল সে মূর্তি মনে পড়ে নাই, এখন মনে পড়িল। অমনই সাদৃশ্য অনুভূত হইল। সংশয়াধীন হইয়া নবকুমার সঙ্কুচিত স্বরে, ধীরে ধীরে কহিলেন, 'তুমি কে'?
>
> যবনীর নয়নতারা আরও বিস্ফারিত হইল। কহিলেন, 'আমি পদ্মাবতী।'
>
> উত্তর প্রতীক্ষা না করিয়া লুৎফউন্নিসা স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। নবকুমারও অন্যমনে কিছু শঙ্কান্বিত হইয়া, আপন আলয়ে গেলেন।'

তৃতীয় খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদটি সংক্ষিপ্ত। দু'দিন গভীর ভাবে ভেবে নিয়ে, লুৎফউন্নিসা সূর্যাস্তের পরে, পুরুষের ছদ্মবেশে সপ্তগ্রামের জনবিরল অংশে নবকুমারের বাসস্থানের দিকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় এগিয়ে যান। পেষমনকে তিনি জানিয়ে যান যে, কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তাঁর স্বামীর চিরবিচ্ছেদ ঘটানোই তাঁর উদ্দেশ্য। নবকুমারের গৃহ-সমীপবর্তী বনে লুকিয়ে থেকে, তিনি কাপালিকের মন্ত্রপাঠ শুনতে পান! দূর থেকে হোমাগ্নির আলো দেখতে পেয়ে,—সেই আলোর কাছে গিয়ে, মন্ত্রপাঠরত কাপালিককে 'কপালকুণ্ডলা'র নাম উচ্চারণ ক'রতে শোনেন।

এই যোগাযোগ ঘটিয়ে, তৃতীয় খণ্ডের এই শেষ ঘটনার সূত্র ধ'রেই লেখক চতুর্থ খণ্ডের প্রত্যাশিত নাট্যাবসানে পৌঁছেছেন! তৃতীয় খণ্ডের শেষে,—

কাপালিকের মন্ত্রপাঠে 'কপালকুণ্ডলা'র নামোচ্চারণ শুনেই লুৎফউন্নিসা তাঁর কাছে গিয়ে বসেন। অতঃপর বঙ্কিমচন্দ্রের ঘোষণা—'এক্ষণে তিনি তথায় বসিয়া থাকুন; পাঠক মহাশয় বহুকাল কপালকুণ্ডলার কোন সংবাদ পান নাই, সুতরাং কপালকুণ্ডলার সংবাদ আবশ্যক হইয়াছে।'

প্রথম খণ্ডের মতন এই শেষ খণ্ডেও ন'টি মাত্র পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনায় 'ব্রজাঙ্গনা কাব্যের' ত্রয়োদশ কবিতা 'নায়িকা'র চতুর্থ স্তবকের শেষ ছত্রটি তুলে দেওয়া হয়েছে—'রাধিকার বেড়ি ভাঙ—এ মম মিনতি'; তারপর নবকুমারের 'শয়নাগারে' কপালকুণ্ডলা আর শ্যামাসুন্দরীর কয়েকটি কথা। বলা বাহুল্য, এই 'বেড়ি' মানে, গৃহিণী অবস্থায় কপালকুণ্ডলার বন্ধন!

কুলীন স্বামীর পত্নী শ্যামাসুন্দরী খুবই চিন্তিত! তাঁর স্বামী শ্বশুরবাড়িতে এসেছেন। তাঁকে বশ করবার 'ওযুধ' (ওষধি) চাই। কপালকুণ্ডলা দ্বি-প্রহর রাত্রে, এলোচুলে বন থেকে সেই গাছ আনতে রাজী। নবকুমারের গৃহিণী হয়ে এক বছরে কপালকুণ্ডলার অনেক পরিবর্তন হয়েছিল বটে, কিন্তু তখন তাঁকে দেখে মনে হয়—'যেন আকাশপ্রান্তে কোথায় কালো মেঘ দেখা দিয়াছে'। তাঁর স্বাধীন গতিবিধি স্বামীর অভিপ্রেত নয় শুনে, শ্যামাসুন্দরীকে তিনি বলেন—'যদি জানিতাম যে, স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।' সেই রাত্রে, তাঁকে বাইরে যেতে দেখে নবকুমার কৌতূহল প্রকাশ করেন। এই স্বাভাবিক, সাধারণ প্রশ্নে উত্তেজিত হয়ে উঠে তিনি প্রথমে বলেন—'তুমি পরের উপকারে বিঘ্ন করিও না'; তারপরে বলেন—'আইস' আমি অবিশ্বাসিনী কি না, স্বচক্ষে দেখিয়া যাও।'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, মৃণ্ময়ীর এই অভিযানের কাহিনী এসে পূর্বারব্ধ মতিবিবির কাহিনীর সঙ্গে মিলেছে! অরণ্যের কন্যা সপ্তগ্রামের অরণ্যের সঙ্গে সমুদ্রতটের সেই অন্য এক পরিচিত বনভূমির সাদৃশ্য অনুভব করেন:

> 'কপালকুণ্ডলার সেইরূপ পূর্বস্মৃতি জাগরিত হইতেছিল; বালিয়াড়ির শিখরে যে সাগর-বারিবিন্দুসংস্পৃষ্ট মলয়ানিল তাঁহার লম্বালকমণ্ডলমধ্যে ক্রীড়া করিত, তাহা মনে পড়িল; অমল নীলানন্ত গগন প্রতি চাহিয়া দেখিলেন; সেই অমল নীলানন্ত গগনরূপী সমুদ্র মনে পড়িল। কপালকুণ্ডলা পূর্বস্মৃতি সমালোচনায় অন্যমনা হইয়া চলিলেন।'

সেই অন্যমনা অবস্থাতেই,—কতকটা আবিষ্টভাবে তিনি মন্ত্রণারত কাপালিক আর ছদ্মবেশিনী লুৎফউন্নিসার কাছে গিয়ে অন্তরালে দাঁড়িয়েছেন। তখন—

> 'একজন কহিতেছে, 'আমার অভীষ্ট মৃত্যু, ইহাতে তোমার অভিমত না হয়, আমি তোমায় সাহায্য করিব না; তুমিও আমার সহায়তা করিও না।
>
> অপর ব্যক্তি কহিল, 'আমিও মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী নহি; কিন্তু যাবজ্জীবনের জন্য ইহার নির্বাসন হয়, তাহাতে আমি সম্মত আছি। কিন্তু হত্যার কোন উদ্যোগ আমা হইতে হইবে না; বরং তাহার প্রতিকূলতাচরণ করিব।
>
> প্রথমালাপকারী কহিল, 'তুমি অতি অবোধ, অজ্ঞান। তোমায় কিছু জ্ঞানদান করিতেছি।...চতুর্দিক একবার দেখিয়া আইস, যেন মনুষ্যশ্বাস শুনিতে পাইতেছি।'

সেই অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতিতে ছদ্মবেশিনীর মুখে নিজের নাম উচ্চারিত হতে শুনেও লুৎফউন্নিসাকে চিনতে পারেননি কপালকুণ্ডলা! তাদের মধ্যে একটা কুপরামর্শ যে চলছিল, তিনি কেবল সেইটুকুই বুঝেছিলেন এবং নিজের সম্বন্ধে সেই কুপরামর্শের বিশদ পরিচয় পাবার ভরসাতেই বনে অপেক্ষা করতে থাকেন। 'ব্রাহ্মণবেশী' তখন পুনর্বার কাপালিকের কাছে ফিরে যায়। এদিকে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। সে অবস্থায় আর বিলম্ব সমীচীন নয় ভেবেই কপালকুণ্ডলা ফিরতে উদ্যোগী হন। পথে বৃষ্টি নামে। বাড়ি ফিরে, উঠোন পেরিয়ে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ ক'রতে গিয়ে ক্ষণোদ্ভাসিত বিদ্যুতের আলোয় দেখা যায়—প্রাঙ্গণে সেই কাপালিক উপস্থিত!

'দুর্গেশনন্দিনীর' দ্বিতীয় খণ্ডের একুশের পরিচ্ছেদে যেমন তিলোত্তমার স্বপ্নবৃত্তান্ত দেখা গেছে, 'কপালকুণ্ডলা'র এই চতুর্থ খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে তেমনি কপালকুণ্ডলার স্বপ্নের কথা আছে। এ স্বপ্নও আসন্ন অদৃষ্টের পূর্বাভাস! তিনি স্বপ্ন দেখেন যে, তিনি যেন এক নৌকাযোগে সমুদ্রে ভেসে যাচ্ছেন! ঢেউয়ের মধ্যে এক জটাজুটধারী সন্ন্যাসী এসে বাঁ হাতে সেই নৌকা তুলে ধ'রে সেটি ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করে। এক সুকান্তি ব্রাহ্মণ এসে সেই নৌকা ধরে। কপালকুণ্ডলা নিজেই তাঁকে নৌকা ডুবিয়ে দিতে অনুরোধ

জানান। ফলে ব্রাহ্মণবেশী নৌকা ছেড়ে দেন। তখন নৌকা নিজেই বলে ওঠে—'আমি আর এ ভার বহিতে পারিনা, আমি পাতালে প্রবেশ করি।'

এই স্বপ্ন দেখে তাঁর ঘুম ভাঙে। জানলায় কয়েকটি বন্যলতার মধ্যে ব্রাহ্মণবেশীর একখানি চিঠি চোখে পড়ে। চিঠিতে সেই রাত্রেই ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে দেখা করবার আমন্ত্রণ পেয়ে তিনি খুবই চিন্তাগ্রস্ত হন। কিন্তু পতিব্রতা যুবতীর পক্ষে রাত্রিকালে নির্জনে অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে দেখা করা অন্যায়,—তাঁর মনে এরকম কোনো সংস্কারই ছিলনা! তিনি স্বপ্নের অশুভ সংকেতের কথাই ভেবেছেন। তারপর ব্রাহ্মণকুমারের সঙ্গে সাক্ষাৎ স্থির ক'রে যাত্রার আগে আর-একবার চিঠি পড়ে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু সে চিঠি খুঁজে পাননি। চতুর্থ পরিচ্ছেদে এই সারাদিনের চিন্তা,—দেখা করবার সংকল্প,—চিঠি হারিয়ে ঈষৎ উদ্বেগভোগ,—এবং পরিশেষে যাত্রা,—এই কটি কথাই বলা হয়েছে। তারপর. পঞ্চম এবং ষষ্ঠ—পর-পর দুটি পরিচ্ছেদ জুড়ে নবকুমারের তীব্র হৃদয়-বিদারণ!

সন্ধ্যার আগে কপালকুণ্ডলা যখন গৃহকর্মে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময়ে তাঁব খোঁপা থেকে সেই চিঠি মাটিতে পড়ে যায়। আর, সেই চিঠি পড়েই নবকুমারের অন্তর্জ্বালা তীব্র হয়ে ওঠে—

> 'পতিব্রতা, স্বামীর সহগমনকালে, অথবা অন্য কারণে, যখন কেহ জীবিতে চিতারোহণ করিয়া চিতায় অগ্নি সংলগ্ন করে, তখন প্রথমে ধূমরাশি আসিয়া চতুর্দিক বেষ্টন করে; দৃষ্টিলোপ করে; অন্ধকার করে; পরে ক্রমে কাষ্ঠরাশি জ্বলিতে আরম্ভ হইলে, প্রথমে নিম্ন হইতে সর্পজিহ্বার ন্যায় দুই একটি শিখা আসিয়া অঙ্গের স্থানে স্থানে দংশন করে, পরে সশব্দে অগ্নিজ্বালা চতুর্দিক হইতে আসিয়া বেষ্টন করিয়া অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ব্যাপিতে থাকে; শেষে প্রচণ্ড রবে অগ্নিরাশি গগনমণ্ডল জ্বালাময় করিয়া মস্তক অতিক্রমপূর্বক ভস্মরাশি করিয়া ফেলে!
>
> 'নবকুমারের লিপি পাঠ করিয়া সেইরূপ হইল। প্রথমে বুঝিতে পারিলেন না; পরে সংশয়, পরে নিশ্চয়তা, শেষে জ্বালা। মনুষ্যহৃদয় ক্লেশাধিক্য বা সুখাধিক্য একেবারে গ্রহণ করিতে পারে না, ক্রমে ক্রমে গ্রহণ করে। নবকুমারকে প্রথমে ধূমরাশি বেষ্টন করিল; পরে বহ্নিশিখা হৃদয় তাপিত করিতে লাগিল; শেষে

> বহ্নিরাশিতে হৃদয় ভস্মীভূত হইতে লাগিল। ইতিপূর্বেই নবকুমার দেখিয়াছিলেন যে, কপালকুণ্ডলা কোন কোন বিষয়ে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছেন। বিশেষ কপালকুণ্ডলা তাঁহার নিষেধ সত্ত্বেও যখন যেখানে ইচ্ছা সেখানে একাকিনী যাইতেন ; যাহার তাহার সহিত যথেচ্ছ আচরণ করিতেন ; অধিকন্তু তাঁহার বাক্য হেলন করিয়া নিশীথে একাকিনী বনভ্রমণ করিতেন। আর কেহ ইহাতে সন্দিহান হইত, কিন্তু নবকুমারের হৃদয়ে কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহ উত্থাপিত হইলে চিরানিবার্য বৃশ্চিকদংশনবৎ হইবে জানিয়া, তিনি একদিনের তরে সন্দেহকে স্থান দান করেন নাই। অদ্যও সন্দেহকে স্থান দিতেন না, কিন্তু অদ্য সন্দেহ নহে, প্রতীতি আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে।'

এই হৃদয়-বিদারক ঘটনা-চক্রের ভাব-সাদৃশ্য দেখাতে গিয়ে 'ওথেলো' নাটকের দু'ছত্র উদ্ধৃতি দেওয়া হয়েছে। তাঁর এ-উপন্যাসে শেক্স্‌পীয়রের বিভিন্ন রচনার উদ্ধৃতির কথা আগেই বলা হয়েছে। কিন্তু এখানে,—এই চতুর্থ এবং পঞ্চম, পর পর দুটি পরিচ্ছেদে, শেক্স্‌পীয়রের দুটি ট্র্যাজেডির দুটি উদ্ধৃতি বিশেষ স্মরণীয়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায়—শেক্স্‌পীয়রের 'ওথেলো'র চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের উক্তি! সাইপ্রাসে প্রাসাদের সামনে ইয়াগো আর ওথেলোর মধ্যে আলোচনা চলছিল ; ইয়াগোর চতুর চক্রান্তে ওথেলো দেস্‌দিমোনার সতীত্বে গভীর সন্দিগ্ধ! ক্যাসিও এসে জিগেস করেন, 'কী ব্যাপার?' ইয়াগো জবাব দেয়—এই যে, 'প্রভুর আবার সেই মৃগীর আক্ষেপ হচ্ছে—এই দ্বিতীয়বার'। ক্যাসিওকে সরিয়ে দিয়ে, ওথেলো-কে তাঁর সেই আক্ষেপের কথা ব'লতে গিয়ে সে কিন্তু আর 'মৃগী' শব্দটা ব্যবহার করে না,—বাংলায় ব'ললে তখন হয়তো বলতো—আপনার 'ভাব' লেগেছিল!, ইংরেজিতে *epilepsy* শব্দটা উহ্য রেখে তখন বলে—*ecstasy*!

ওথেলোর প্রতি ইয়াগোর সেই কথাগুলিই বঙ্কিমচন্দ্র অংশতঃ তুলে দিয়েছেন। মাত্র দু'ছত্রই তিনি তুলেছেন। পুরো উক্তিটি তুললে, উপান্ত্য আলোচনায় এই পঞ্চম-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে কাপালিকের সঙ্গে ইয়াগো-মূর্তির পূর্ণতর সাদৃশ্যের ধারণা স্পষ্ট হবে!

Stand you awhile apart ;
Confine yourself but in patient list.
Whilst you were here o'erwhelmed with your grief,—
A passion most unsuiting such a man,—
Cassio came hither ; I shifted him away,
And laid good 'scuse upon your ecstasy ;
Bade him anon return, and here speak with me ;
The which he promis'd. Do but encave yourself,
And mark the fleers, the gibes, and notable scorns,
That dwell in every region of his face ;
For I will make him tell the tale anew,—
Where, how how oft, how long ago, and when
'He hath, and is again to cope your wife :
I say, but mark his gesture, Marry, patience ;
Or I shall say you are all in all in spleen,
And nothing of a man'.

ইয়াগোর চক্রান্তে ওথেলোর মনে যেমন তীব্র জ্বালা জ্বলে উঠেছিল, —কতকটা মতিবিবির,—আর অনেকটাই কাপালিকের এই ষড়যন্ত্রের ফলে, তেমনি নবকুমারের সন্দেহের যন্ত্রণা তীব্র হয়ে ওঠে ! পঞ্চম পরিচ্ছেদের এই 'ওথেলো' নাটকের উক্তির আগে, চতুর্থ পরিচ্ছেদে 'হ্যামলেটের' যে-উক্তিটি ব্যবহৃত হয়েছে, সেটি দ্বিতীয় অঙ্কের দ্বিতীয় দৃশ্য থেকে নেওয়া। সে-দৃশ্যও প্রসিদ্ধ। হ্যামলেট সেখানে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের ডেকে, অভিনয়ের কৌশল আর অভিনেতাদের অনুকরণ-সামর্থ্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলেন। সেই স্বগতোক্তির ধারায় তিনি তাঁর মনের কথা খুলে বলেন। নাটকের অভিনয় দেখে মানুষ সংসারের বাস্তব সত্যেরই ধারণা পায়। অভিনয় দেখার ফলে, অপরাধী অনেক সময়ে অপরাধ সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি ক'রে ফেলে, তাও তিনি শুনেছেন ! নিজের পিতার হত্যা সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য আবিষ্কারের জন্যেই হ্যামলেট তাই এই অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন—

I'll have these players
Play something like the murder of my father

Before mine uncle : I'll observe his looks ;
I'll tent him to the quick : if he but blench,
I know my course. The spirit that I have seen
May be the devil : and the devil hath power
To assume a pleasing shape . yea, and perhaps
Out of my weakness and my melancholy,
As he is very potent with such spirits,
Abuses me to damn me : I'll have grounds
More relative than this : the play's the thing
Wherein I'll catch the conscience of the king.

হ্যামলেটের এই রহস্য-সন্ধানের সঙ্গে 'কপালকুণ্ডলার' শেষ খণ্ডের চতুর্থ পরিচ্ছেদে বিশেষ অবস্থায় কপালকুণ্ডলার কর্তব্য-সন্ধানের সাদৃশ্য অনুভব ক'রে বঙ্কিম শেক্‌স্‌পীয়রের এই লাইনগুলি তাঁর নিজের রচনায় স্মরণ করেন।[২২]

কপালকুণ্ডলার এই শেষ যাত্রার পরেই এ-উপন্যাসে আবার একবার প্রদীপ নিভে গেছে—'সন্ধ্যার পরে গৃহকর্ম কতক কতক সমাপন করিয়া কপালকুণ্ডলা পূর্বমত বনাভিমুখে যাত্রা করিলেন।…যাত্রাকালে শয়নাগারে প্রদীপটি উজ্জ্বল

২২। হ্যামলেট এবং ইয়াগো—এই দুটি চরিত্রের পর্যালোচনায় প্রসিদ্ধ সমালোচক জর্জ ব্র্যাণ্ডেসের যথাক্রমে এই উক্তিগুলি স্মরণীয়। প্রথমে হ্যামলেট সম্বন্ধে—'By nature he is a thinker. He thinks not only when he is contemplating and planning a course of action, but also from a passionate longing for comprehension in the abstract. Though he is merely making use of the players to unmask the murderer, he gives them apt and profound advice with regard to the practice of their art. When Rosencrantz and Guildenstern question him as to the reason of his melancholy, he expounds to them in words of deep significance his rooted distaste for life.' দ্বিতীয়তঃ ইয়াগো সম্বন্ধে—'Believe me, Shakespeare met Iago in his own life, saw portions and aspects of him on every hand throughout his manhood, encountered him piecemeal, as it were, on his daily path, till one fine day, when he thoroughly felt and understood what malignant cleverness and baseness can effect, he melted down all these fragments, and out of them cast this figure. ·· Shakespeare not only knew that such wickedness exists ; he seized it and set his stamp on it, to his eternal honour as a psychologist.'—'William Shakespeare' : George Brandes প্রণীত।

করিয়া গেলেন। তিনি যেমন কক্ষ হইতে বাহির হইলেন অমনি গৃহের প্রদীপ নিবিয়া গেল।'

এই প্রদীপ নির্বাপণেই কপালকুণ্ডলার অবরোধ-মোচনের সূচনা! পঞ্চম পরিচ্ছেদের পূর্বোদ্ধৃত চিত্তদাহ-বর্ণনার পরেই নবকুমার-কে অনেকক্ষণ অশ্রুবিসর্জন ক'রতে দেখা যায়। ইতিমধ্যে কাপালিক এসে দেখা দেয়। জীবনে বীতস্পৃহ হয়ে নবকুমার তখন কাপালিকের হাতেই নিজের প্রাণবিসর্জনে সম্মত! কিন্তু কাপালিকের তখন অন্য সংকল্প, অন্য অভিপ্রায়। আমন্ত্রিত হয়েই সে বাড়িতে ঢোকে,—একেবারে নবকুমারের ঘরে গিয়ে বসে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে নবকুমারের সেই ঘরে কাপালিকের আত্মকথা শুরু হয়।

যে-রাত্রে কপালকুণ্ডলা আর নবকুমার কাপালিকের কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্যে পালিয়ে যান, সেই রাত্রেই বালিয়াড়ি থেকে পড়ে গিয়ে কাপালিকের হাত ভেঙ্গে যায়। সে সংজ্ঞাহারা হয়ে মাটিতে পড়েছিল। দেবী ভবানী তাকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে, কপালকুণ্ডলাকে বলি দেবার আদেশ দেন। সেই সন্ধানে এসে, কাপালিক যা দেখেছে, সে-বর্ণনা শুনে নবকুমারের চিত্তদাহ তীব্রতর হয়ে ওঠে—'কল্য রাত্রে নিকটস্থ বনে হোম করিতেছিলাম, স্বচক্ষে দেখিলাম, কপালকুণ্ডলার সহিত এক ব্রাহ্মণকুমারের মিলন হইল। অদ্যও সে তাহার সাক্ষাতে যাইতেছে। দেখিতে চাও, আমার সহিত আইস, দেখাইব।'

এ যেন ইয়াগোর চক্রান্ত! এ-আহ্বানে নবকুমার নীরবে সম্মত হন।

সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম 'সপত্নীসম্ভাষে'। ব্রাহ্মণবেশী লুৎফউন্নিসা এ-দৃশ্যে কপালকুণ্ডলাকে একান্তে ডেকে নিয়ে আত্মপরিচয় দেন। তাঁদের প্রশ্নোত্তর:

> 'তুমি কি অভিপ্রায়ে আমাদিগের বাটীতে ছদ্মবেশে আসিতে বাসনা করিয়াছিলে?'
>
> লুৎফউন্নিসা কহিলেন, 'তোমার সহিত স্বামীর চিরবিচ্ছেদ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে।'

লুৎফউন্নিসা বলেন—'আমার প্রাণদান দাও—স্বামী ত্যাগ কর। সম্পত্তির লোভ দেখিয়ে, তিনি কপালকুণ্ডলাকে বলেন—'বিদেশে—বহুদূরে—তোমাকে অট্টালিকা দিব,—ধন দিব—দাস দাসী দিব, রাণীর ন্যায় থাকিবে।'

কিন্তু অন্যপক্ষের এসব লোভ ছিল না। জীবনের সেই সন্ধিতে দাঁড়িয়ে তিনি—

> 'পৃথিবীর সর্বত্র মানসলোচনে দেখিলেন—কোথাও কাহাকে দেখিতে পাইলেন না। অন্তঃকরণ মধ্যে দৃষ্টি করিয়া দেখিলেন—তথায় ত নবকুমারকে দেখিতে পাইলেন না, তবে কেন লুৎফ-উন্নিসার সুখের পথ রোধ করিবেন?'

এই আত্মচিন্তা, এই হৃদয়-সন্ধান এ-পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার। মতিবিবিকে তিনি প্রতিশ্রুতি দেন—'কালি হইতে বিঘ্নকারিণীর কোন সংবাদ পাইবে না। আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।'

কার্য-কারণ যোগের এই ব্যাখ্যা,—এই সংহত প্রকাশ,—এই মনোবিশ্লেষণের চেষ্টা—এ সবই কবি-দৃষ্টির দান! বাংলা উপন্যাসে তথ্য-বৈচিত্র্য বা আখ্যানবস্তুর বহুধা বিস্তার অবলম্বন ক'রে যেমন এক প্রবাহ বয়ে এসেছে, তেমনি কবিত্ব-নির্ভরশীল এই আর এক ধারাও একেবারে আধুনিক কাল পর্যন্ত অনুশীলিত হয়ে চলেছে। শ্রীকুমারবাবু এ-দিকটিও দেখিয়েছেন। ২৩ 'কপালকুণ্ডলার' এই কবিত্ব কেবল প্রকৃতি-চিত্রে বা নারী-পুরুষের রূপ-বর্ণনাতেই নিঃশেষিত নয়,—চিত্ত-বিশ্লেষণে, ঘটনা-বিন্যাসে,—ভাষা-প্রকৃতিতে,—জীবন-উপলব্ধির ভঙ্গিতে,—অর্থাৎ উপন্যাসের বিষয় ও রীতি-সম্পর্কিত যাবতীয় উপাদানে বঙ্কিমচন্দ্রের এই কবিত্ব পরিব্যাপ্ত।

২৩। 'বঙ্কিমের অনেক উপন্যাসই গীতিকাব্যের লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথের কবি-প্রতিভা কেবল যে কবিতার অফুরন্ত নির্ঝরে উৎসারিত হইয়াছে তাহা নহে, গদ্যের কারুকার্য-খচিত পাত্রকেও ভরিয়া তুলিয়াছে; তিনি একছত্র কবিতা না লিখিলেও তাঁহার উপন্যাসের প্রকৃতি-বর্ণনা ও চিত্ত-বিশ্লেষণ তাঁহার কবিত্ব-শক্তির অবিসংবাদিত প্রমাণ স্বরূপ দাঁড় করানো যাইত। শরৎচন্দ্র সাধ্যমত কবিত্ব-উচ্ছ্বাস বর্জন করিলেও অসতর্ক মুহূর্তে তাঁহার অন্তর্লীন কাব্য-বীণার ঝংকার দিয়া ফেলিয়াছেন। কিন্তু অচিন্ত্য বুদ্ধদেবের কবিত্ব উপন্যাসের মধ্যে সর্বব্যাপী; তাঁহাদের দৃষ্টি-ভঙ্গি ও বিশ্লেষণ-প্রণালী একান্তভাবে কাব্যধর্মী। তাঁহারা উপন্যাসে যে সমস্ত ঘাত-প্রতিঘাত ও মানসিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করেন তাহাতে মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণের পরিবর্তে কাব্যোচ্ছ্বাসেরই প্রাধান্য। মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ যেন কাব্যের সোনালী কাপড়ের সীমান্তে একটু ছোট পাড়; কবিতার তরঙ্গিত উচ্ছ্বাসকে ধরিয়া রাখিবার জন্য একটু উচ্চ তটভূমি মাত্র।'—'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' [চতুর্থ সংস্করণ, ১৩৬৯] পৃষ্ঠা ৪৪৬ দ্রষ্টব্য।

লুৎফউন্নিসার সঙ্গে কপালকুণ্ডলার এই শেষ বিদায়ের দৃশ্যই কাপালিকের সঙ্গে নবকুমার দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিলেন! এ-দৃশ্যের দৃশ্যরূপটুকুই তাঁদের চোখে পড়েছিল, এঁদের কথাবার্তা তাঁদের কানে পৌঁছোয়নি। ফলে, স্বামীর অধিকারবোধ সম্বন্ধে এই দুই নায়িকার কল্পিত সংঘর্ষের খবর কিংবা কপালকুণ্ডলার এই শূন্যতার বেদনা, কিছুই নবকুমারের উপলব্ধিতে পৌঁছোয়নি। কাপালিকের দেওয়া সুরা পান ক'রে এ-দৃশ্যের আপাতগোচর বিকৃত রূপই তাঁর চোখে পড়ে। ফলে, ঈর্ষা তাঁর বোধে দাহ-সৃষ্টি করে। সেই ক্ষুব্ধ, তপ্ত, উগ্র দৃষ্টি দিয়েই তিনি অন্তরালে দাঁড়িয়ে, সেই ব্রাহ্মণ যুবককে তাঁর স্ত্রী কপালকুণ্ডলাকে একটি আংটি উপহার দিতে দেখেছিলেন!

> 'নবকুমার তাহাও দেখিতে পাইলেন: কাপালিক তাঁহাকে ধরিয়াছিলেন. আবার তাঁহাকে কম্পমান দেখিয়া পুনরপি মদিরা সেবন করাইলেন। মদিরা নবকুমারের মস্তিষ্কে প্রবেশ করিয়া তাঁহার প্রকৃতি সংহার করিতে লাগিল, স্নেহের অঙ্কুর পর্যন্ত উন্মূলিত করিতে লাগিল।
>
> কপালকুণ্ডলা লুৎফউন্নিসার নিকট বিদায় লইয়া গৃহাভিমুখে চলিলেন। তখন নবকুমার ও কাপালিক লুৎফউন্নিসার অদৃশ্য পথে কপালকুণ্ডলার অনুসরণ করিতে লাগিলেন।'

শেষ দুটি পরিচ্ছেদের নাম যথাক্রমে 'গৃহাভিমুখে' এবং 'প্রেতভূমে'। কপালকুণ্ডলা নিজেই যে তাঁর অন্তরের শূন্যতা স্বীকার ক'রে গেছেন, সে-বৃত্তান্ত আগেই দেখা গেছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে সেই শূন্যতার সংগত কারণ প্রদর্শনের চেষ্টা আছে। লেখক জানিয়েছেন—'কপালকুণ্ডলা অন্তঃকরণ সম্বন্ধে তান্ত্রিকের সন্তান; তান্ত্রিক যেরূপ কালিকাপ্রসাদাকাঙ্ক্ষায় পরপ্রাণ সংহারে সংকোচশূন্য, কপালকুণ্ডলা সেই আকাঙ্ক্ষায় আত্মজীবন বিসর্জনে তদ্রূপ।' অরণ্য থেকে সংসারে এসেছিলেন তিনি,—সংসার থেকে আবার 'বনচর' হবার সংকল্প নিয়ে, তিনি চলেছিলেন গভীর চিন্তাচ্ছন্ন মনে। সেই সময়ে—

> 'যেন উর্ধ্ব হইতে তাঁহার কর্ণকুহরে এই শব্দ প্রবেশ করিল, 'বৎসে! আমি পথ দেখাইতেছি।' কপালকুণ্ডলা চকিতের ন্যায়

উর্ধ্বদৃষ্টি করিলেন। দেখিলেন যেন আকাশমণ্ডলে নবনীরদনিন্দিত মূর্তি! গলবিলম্বিত নরকপালমালা হইতে শোণিতস্রুতি হইতেছে; কটিমণ্ডল বেড়িয়া নরকরোটি দুলিতেছে—বাম করে নরকপাল—অঙ্গে রুধিরধারা, ললাটে বিষমোজ্জ্বল জ্বালাবিভাসিত লোচন-প্রান্তে বালশশী সুশোভিত! যেন ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত উত্তোলন করিয়া কপালকুণ্ডলাকে ডাকিতেছে।'

এই চিন্তামগ্নতা,—স্বপ্নাবেশদৃষ্ট এই অলৌকিক রূপ,—আর, অচিরেই ভীমনাদে 'কপালকুণ্ডলে' নাম ধ'রে নবকুমারের সম্বোধন—এই অদ্ভুত, রোমাঞ্চকর পরিস্থিতিতে কাপালিক আর নবকুমার এসে দাঁড়িয়েছেন! আকাশে তখন—'রণরঙ্গিণী খল খল হাসিতেছে।' ...'কপালকুণ্ডলা অদৃষ্ট-বিমূঢ়ার ন্যায় বিনা বাক্যব্যয়ে কাপালিকের অনুসরণ করিলেন।'

শেষ দৃশ্যের নাম 'প্রেতভূমে'। তখন চাঁদ অস্ত গেছে। 'বিশ্বমণ্ডল অন্ধকারে পরিপূর্ণ হইল'! মানুষের দেহাস্থিবিকীর্ণ শ্মশানে শুধু শবভুক্ পশু আর কাপালিক,—কপালকুণ্ডলা আর নবকুমার!

নবকুমার তখন উত্তেজনায় কাঁপছেন। কপালকুণ্ডলা নির্ভীক, নিস্পন্দ! গভীর সমবেদনায় তাঁর গলার স্বর তখন স্নেহ-বিগলিত। গভীর যন্ত্রণায় নবকুমার বলেন—'তুমি কি জানিবে মৃন্ময়ি! তুমি ত কখন রূপ দেখিয়া উন্মত্ত হও নাই!' অনেক ব্যাকুল আবেদন, অনেক মিনতি, অনেক ভিক্ষা তাঁর উক্তিতে। 'মৃন্ময়ী' নামটি তখন নিতান্তই নামমাত্র! বনচারিণী ক্ষণকালের জন্যেও গৃহীর পত্নীর ভূমিকায় ধরা দেননি। কিন্তু নারীর সহজ করুণা-স্বভাবে দৈন্য ছিল না তাঁর। নবকুমারের কৌতূহল-নিবৃত্তির জন্যে কপালকুণ্ডলা জানিয়েছেন—'আজি যাহাকে দেখিয়াছ,—সে পদ্মাবতী।... ভবানীর চরণে দেহ বিসর্জন করিতে আসিয়াছি—নিশ্চিত তাহা করিব।'

তারপর নদীর স্রোতে,—চৈত্রবায়ুতাড়িত বিশাল এক তরঙ্গে কপাল-কুণ্ডলা নিশ্চিহ্ন হন!

নবকুমার জলে ঝাঁপ দেন!

তাঁর এ-উপন্যাসের শেষ বাক্যে বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন—'সেই অনন্ত

গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে, বসন্ত-বায়ুবিক্ষিপ্ত বীচিমালায় আন্দোলিত হইতে হইতে কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার কোথায় গেল ?'

সেকালের পাঠক-মনে এই কৌতূহল তীব্র হয়ে ওঠে ! তাই, দামোদর মুখোপাধ্যায় [১৮৫৩-১৯০৭] 'কপালকুণ্ডলা'র এক উপসংহার লিখেছিলেন। সে-বইয়ের নাম 'মৃন্ময়ী'। ১৮৭৪-এ সে-বই প্রকাশিত হয়। আবার, তিনি 'দুর্গেশনন্দিনী'রও এই রকম এক 'উপসংহার' লেখেন। তাঁর সে রচনার নাম 'নবাবনন্দিনী' বা আয়েষা। সুকুমারবাবু আরো একখানি বইয়ের উল্লেখ ক'রেছেন,—বিশ্বনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আয়েষা' [১৮৯৭]। সেও দুর্গেশনন্দিনীর ছায়া ! বাংলা কথাসাহিত্যে বঙ্কিমের প্রভাব-বিস্তারের সূচনা-কাল গেছে আমাদের বিগত শতকের সেই সুদূর সত্তরের-দশকেই !

অতঃপর 'মৃণালিনী'র প্রসঙ্গ।

'দুর্গেশনন্দিনী'তে ইতিহাস যেমন উপন্যাসের প্রতিবেশ-সৃষ্টির কাজে লেগেছিল, 'মৃণালিনী'তেও তাই হয়েছে। এই ইতিহাস,—কবিত্ব,—প্রণয়াখ্যানে সমারোহ-সৃষ্টি ইত্যাদি আয়োজন বঙ্কিমচন্দ্রই বিশেষভাবে দেখিয়ে গেছেন। তাঁরই অনুসরণ ক'রে বাংলার সেকালের এবং পরবর্তী যুগের কথা-সাহিত্যিকরা এসব ক্ষেত্রে কিছু-কিছু বৈচিত্র্য দেখাবার চেষ্টা ক'রে গেছেন। 'মৃণালিনী'র প্রথম খণ্ডের ছটি পরিচ্ছেদের মধ্যেই বঙ্কিম বখতিয়ার খিলজীর বঙ্গ-বিজয়ের সমকালীন বাংলার অবস্থা,—এবং এ-কাহিনীর নায়ক হেমচন্দ্র,—নায়িকা মৃণালিনী,—সন্ন্যাসী-চরিত্র মাধবাচার্য,—মৃণালিনীর সখী লক্ষ্মণাবতী-নিবাসী হৃষীকেশের কন্যা মণিমালিনী,—ভিখারিণী গিরিজায়া,—হেমচন্দ্রের ভৃত্য দিগ্বিজয়,—হৃষীকেশের দুশ্চরিত্র পুত্র ব্যোমকেশ ইত্যাদির যে চিত্তচমৎকারী পরিচয় দিয়েছেন,—তাঁর সে শিল্প-কৌশল একান্ত-ভাবে তাঁরই ! তবু, 'মৃণালিনী' তাঁর প্রথম পর্বের গৌণ সৃষ্টির মধ্যেই গণ্য। অধ্যাপক সুকুমার সেনের মন্তব্য এর আগেই দেখা গেছে।[২৪] 'কপালকুণ্ডলা'র কবিত্বের তুলনায় 'মৃণালিনী' কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ মনে হলেও 'দুর্গেশনন্দিনী'র তুলনায় 'মৃণালিনী' যে তাঁর শিল্প-সামর্থ্যের ক্ষেত্রে আরো অগ্রগতির পরিচায়ক, সুকুমারবাবু সে-কথা জানাতে দ্বিধা করেননি।

২৪। ৩১৩-১৪ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

'মৃণালিনী'র চরিত্রগুলিতে তিনি বাস্তবতা লক্ষ্য ক'রেছেন। চরিত্র-চিত্রণ আর ঘটনা-বিন্যাস,—দুদিক থেকেই 'মৃণালিনী'তে বঙ্কিমচন্দ্র আগের তুলনায় দক্ষতার পরিচয় রেখে গেছেন।

উপকরণ-সংগ্রহের আগ্রহে অথবা বিশেষ বিশেষ কায়দা-কানুনের অনুকরণে বঙ্কিম-যুগে এবং বঙ্কিমচন্দ্রের মৃত্যুর পরেও—বঙ্কিম-অনুকরণের ব্যাপক প্রভাবের দিকটি এখানে সংক্ষেপে বলে নেওয়া যেতে পারে! মূল আলোচনার ধারায় এই ঈষৎ বিরতির পরে আবার 'মৃণালিনী' প্রসঙ্গে ফেরা যাবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের প্লট এবং আঙ্গিক,—তাঁর সামাজিক, ঐতিহাসিক সব রকম উপন্যাসই আমাদের সে-যুগের লেখক-পাঠক—সকলেরই আগ্রহের বিষয় ছিল। পাঠককে সম্বোধন ক'রে কাহিনী বর্ণনার রীতি তিনি বোধ হয় পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকেই পান। কিন্তু থেকে-থেকে অদৃষ্ট অথবা ঈশ্বর স্মরণ করা তাঁরই নিজের স্বভাব। তাঁকে পথ তৈরি ক'রে নিতে হয়েছে পদে পদে।

তাঁরই আদর্শ,—তাঁরই রীতি অনুকরণের যুগ গেছে অতঃপর বাংলা উপন্যাসের আদি-পর্ব নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন, তাঁরা অম্বিকাচরণের 'পুরাণ কাগজ বা নথীর নকল' [ভূতনাথ সেনগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত] বইখানির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ ক'রে থাকেন। অম্বিকাচরণের নিজের লেখা ভূমিকা থেকেই সে-উপন্যাসের রীতিগত বিশেষত্বের কথা ভেবে দেখা যেতে পারে। তিনি লিখে গেছেন,—'এদেশে ইংরেজ রাজত্বের পূর্বে বাঙ্গালা ভাষার বড়ই শোচনীয় অবস্থা ছিল, কেবলমাত্র ছন্দোবন্ধে গ্রথিত কাব্য ভিন্ন ভাষায় আর কিছু ছিল না। নাটক নভেলের কথা দূরে থাকুক, গদ্য কাব্যও খুঁজিয়া মিলিত না। পাশ্চাত্য শিক্ষার সংঘর্ষণে বাঙ্গালা ভাষার শ্রী ফিরিয়াছে, ঐশ্বর্য বাড়িয়াছে, গদ্যকাব্য, নাটক, নভেল প্রহসনাদিতে বাঙ্গালা ভাষার পরিপুষ্টি জন্মিতেছে। নানারকমের ভাল মন্দ অনেক জিনিস বাঙ্গালা ভাষায় পাওয়া যাইতেছে। 'পুরাণ কাগজ' তাহাদের একটা সংখ্যা বৃদ্ধি করিল মাত্র। এ রকমের উপন্যাস রচনা এই সর্বপ্রথম একথা বলিতে পারা যায়। 'পুরাণ কাগজ'কে উপন্যাস, এমন কি একটা গল্প বলিলেও তাহাতে কোন দোষ হয় না। ইহা যেভাবে রচিত তাহাতে গল্প রচনার প্রধান অঙ্গ ঘটনাবৈচিত্র্যও রক্ষা করা কঠিন। উপাখ্যান-বর্ণিত নায়ক

নায়িকাদি ব্যক্তিগণের চরিত্রগঠন ও তাহার পূর্ণতাসাধন দূরের কথা, তবে যথাসাধ্য চেষ্টার ত্রুটি করা হয় না।'

'পুরাণ কাগজ'-এর এই ছোটো ভূমিকাটির শেষ অনুচ্ছেদে অম্বিকাচরণ নিজের 'শোচনীয়' অবস্থার উল্লেখ ক'রে—যেন বঙ্কিমচন্দ্রের আধ্যাত্মিক প্রবণতা অনুসরণ ক'রেই লেখেন—'যাঁহার ইচ্ছায় সাগর শুকাইতেছে, মহানগরী অরণ্যে পরিণত হইতেছে, অদ্রিশৃঙ্গ চূর্ণিত হইতেছে, তাঁহারই কৃপায় অসম্ভবও সম্ভব হইল।'

অদৃষ্টের উদ্দেশে এ ধরনের কৃতজ্ঞতা-প্রকাশ অম্বিকাচরণের নিজস্ব অনুষ্ঠান মাত্র নয়। উপন্যাসের বর্ণনাধারায় বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ক্ষণে-ক্ষণে এরকম মন্তব্যের অভ্যাস দেখা গেছে। এও সেইরকম অনুষ্ঠান। তাঁর 'কল্যাণী'র প্রথম পরিচ্ছেদটুকু পড়ে দেখলেই এ-মন্তব্যের যাথার্থ্য বোঝা যাবে। 'কল্যাণী' মেয়েটির জন্মকালের তিন পক্ষের মধ্যেই তার পিতৃবিয়োগ হয়। পিতৃবিয়োগের তিন রাত্রির মধ্যেই সে মাতৃহারা হয়। সেই দুর্ঘটনার ঠিক পরের অবস্থায় এগিয়ে যাবার আগে, বঙ্কিম-প্রদর্শিত রীতিতেই অম্বিকাচরণ সুদীর্ঘ এক মন্তব্যে জানিয়েছেন:

> 'সংসারে কে কাহাকে খাওয়ায়, যে যার অদৃষ্টে খায়। যিনি খাওয়াইবার তিনিই খাওয়ান, মনুষ্য উপলক্ষ্য মাত্র। তুমি তোমার পরিবারের কর্তা, তোমায় দশজনকে প্রতিপালন করিতে হয়, তজ্জন্য তুমি ব্যতিব্যস্ত হইয়া সকার বকার কতই না বলিয়া থাক—সংসারের জ্বালা-যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া অনেককেই এরূপ বলিতে শুনা যায়। এটা বড়ই ভুল। পিতা কুপোষ্য পুত্র পালন করিতেছেন, বলিতেছেন 'আর পারি না'। অগ্রজ অনুজকে পালিতেছেন, বলিতেছেন, 'মারা গেলাম। সংসার আর চলে না, আছি তাই দশ হাতে সকলে খায় —চক্ষু মুদিলে সকলে হাড়িগুঁড়ির দ্বারস্থ হইতে হয়।' এরূপ অবস্থায় অনেকে চক্ষুও মুদিয়া থাকে—অনেক স্থলে দেখা যায় প্রতিপাল্যগণকে হাড়িগুঁড়ির দ্বারস্থও হইতে হয় না, বরং ভাল রকমে চলিয়া যায়, কোথাও বা কাহার কষ্ট হয়, কিন্তু সকলেরই উদরান্ন জুটিয়া যায়। ঈশ্বর তাহা জুটাইয়া দেন; কাহাকেও স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বনে বাধ্য করেন, কাহাকেও অপরের গলগ্রহ করিয়া দেন, কাহাকেও হয়ত আমীর করেন, কাহাকেও বা ফকিরী দেন। ফলে

সকলেরই সুখে দুঃখে চলিয়া যায়, কিছুতেই অচল থাকে না। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিশ্ব যাঁহার সংসার, তিনিই চালান। তুমি আমি উপলক্ষ মাত্র। উপলক্ষ মাত্র হইয়া স্পর্ধা করা ভাল নয়।'

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসেও ঈশ্বর-নিয়ন্ত্রিত অদৃষ্টে এই ধরনের বিশ্বাসের চিহ্ন আছে। আবার, রীতির দিক থেকেও তাঁর নানা অনুকরণ হয়েছে। 'চন্দ্রশেখর'-এর আদিতেই যেমন 'উপক্রমণিকা' চোখে পড়ে, সেকালের অনেক উপন্যাসের আদিতে তেমনি 'উপক্রমণিকা' তো থাকতোই,—সেই সঙ্গে, কাহিনীর শেষে 'উপসংহারও' যোগ করা হোতো। চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দুখানি ছবি' [প্রেমমালা ও মনোরমা] প্রথম ছাপা হয় ১২৯৫ সালে। দশ বছর পরে, ১৩০৫ সালের ১৩ই শ্রাবণ সে-বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন' অংশে চণ্ডীচরণ লেখেন,—'গ্রন্থখানির নামকরণে অনেকেই গ্রন্থের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই বলিয়া প্রকাশক মহাশয় কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ ছিলেন। তাই এবার গ্রন্থখানির নামের পরিবর্তন না করিয়া একটু পরিচয়ের পথ করিয়া দিলাম।' প্রথম মুদ্রণের 'বিজ্ঞাপন' অংশে তিনি লিখেছিলেন

'বিধবার ব্রহ্মচর্য্য ও বৈধব্যের সদ্ব্যবহার কিরূপে সহজসাধ্য ও সুখকর হয় এবং বিধবার বিবাহের আবশ্যকতা থাকিলে, কোন্ শ্রেণীর বিধবার বিবাহ হওয়া উচিত, তাহাই দেখান এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য। এই সুমহান উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ হইল, বঙ্গসমাজ ও বঙ্গসাহিত্যের কল্যাণাকাঙ্ক্ষী মহোদয়গণ তাহার বিচার করিবেন। তবে বিচার করিবার সময় আমার উদ্দেশ্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া বিচার করেন, ইহাই আমার একমাত্র বিনীত প্রার্থনা। বর্ণিত বিষয়ের অধিকাংশ কোন বন্ধুর জীবনের ছায়া অবলম্বনে লিখিত হইল।'

এই 'বিজ্ঞাপনে'র তারিখ ১২ই শ্রাবণ, ১২৯৫। 'দুখানি ছবির' 'উপক্রমণিকা'য় রামপুর গ্রামের উদয়চাঁদ ঘোষ নামে এক মধ্যবিত্ত বুদ্ধিমান ও বিচক্ষণ লোকের কথা বলা হয়। সেকালের কৌলীন্য-প্রথায় বিড়ম্বিত বাঙালী সমাজে বাস ক'রে উদয়চাঁদ একে একে দুটি বিবাহ করেন। সংসারে নানা অভাবে তাঁকে খুবই দৈন্য ভোগ ক'রতে হয়। অবশেষে তিনি এবং তাঁর প্রথমা স্ত্রী দুজনে প্রায় একই সময়ে লোকান্তরিত হন।

তাঁদের শ্রাদ্ধশান্তিতে তাঁদের সঞ্চিত অর্থের যেটুকু বাকি ছিল, তাও শেষ হয়ে যায়। তখন জ্যেষ্ঠ পুত্র হৃদয়ভূষণ নিজে উপার্জন ক'রে বিবাহ করেন —আর, তৃতীয় পক্ষের এক প্রৌঢ়ের সঙ্গে তাঁর সেই বালিকা বৈমাত্রেয় ভগিনীর বিবাহ দেন। উদয়চাঁদের বিমাতা তখন বাড়ির কর্ত্রী, কিন্তু টাকাকড়ির ব্যবস্থা উদয়চাঁদ নিজের হাতেই রেখেছিলেন। উদয়চাঁদের একমাত্র কন্যা মনোরমা মাত্র ন' বছর বয়সে বিধবা হয়। চণ্ডীচরণ লিখেছেন,—'মনোরমা বিধবা হইয়াই জননী ও ভ্রাতৃদ্বয় কর্তৃক পিতৃভবনে আনীত হইল এবং সেই অবধি তথায় বাস করিতে লাগিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরে হৃদয়ভূষণ নিকটস্থ কোন গ্রামের কোন মধ্যবিত্ত পরিবারের এক কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন এবং এইরূপে ভগ্নসংসারকে পূর্বাবস্থায় আনিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন।' উদয়চাঁদের বৈমাত্রেয় কনিষ্ঠ বিনয়ভূষণ রামপুর গ্রামেই ইংরেজি ইস্কুলে লেখাপড়া করছিলেন, কিন্তু নানা কারণে তাঁকে তাঁর মাতুলালয়ে যেতে হয়। প্রবেশিকা-পরীক্ষা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণনগরে বিনয়ভূষণ অত্যন্ত পীড়িত হন।

দু'খানি ছবির 'উপক্রমণিকা' এইটুকু। 'উপক্রমণিকা'তেই মনোরমার কথা দেখা গেছে। অতঃপর কাহিনীর ধারা অনুসরণ ক'রে প্রেমমালারও দেখা পাওয়া যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে বিনয়ভূষণের সঙ্গে গৌরমোহন দত্তের কন্যা প্রেমমালার বিবাহ ঘটে। একাদশ পরিচ্ছেদে—সেকালের রীতিতে লেখা, বিনয়ভূষণ এবং প্রেমমালার কয়েকখানি চিঠিও পাওয়া যায়। একে-একে চৌত্রিশটি পরিচ্ছেদ যোজনার পরে, চণ্ডীচরণ তাঁর এই কাহিনীর 'উপসংহার' অংশটুকু যোগ করেন। এই 'উপসংহারে',—সংক্ষেপে হলেও শরচ্চন্দ্র মিত্রের সঙ্গে মনোরমার বিধবা-বিবাহের ছবি লেখক বেশ সমবেদনার সঙ্গেই দেখিয়ে গেছেন। 'উপসংহারে'র শেষ অনুচ্ছেদটি এইরকম: 'পুরাঙ্গনারা শঙ্খধ্বনি সহকারে বরকন্যাকে ঘরে লইয়া গেলেন। শরচ্চন্দ্র ও মনোরমা সংসারের এই দুটি পবিত্র ফুল বিধাতার বিধানে মিলিত হইল। তাঁহারই কৃপায় ইঁহারা সুখ, শান্তি ও উন্নতির পথে অগ্রসর হউন। সুন্দরী —মধুরপ্রকৃতি মনোরমা 'দুখানি ছবি'র আর একখানি ছবি।'

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'বিষবৃক্ষে' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইলে' সামাজিক কল্যাণ-চিন্তার আদর্শ দেখিয়ে গেছেন। গল্প-উপন্যাসের মধ্য দিয়ে কতকটা স্পষ্টভাবে

সমাজের হিত-সাধনের উদ্দেশ্য চরিতার্থ করবার এ-রকম অনেক উদাহরণই সেকালের বাংলা উপন্যাসে পাওয়া যায়।

বরদাকান্ত সেনগুপ্তের 'প্রতিভা' [একটি বালিকার কথা] ছাপা হয় ১২৯১ সালের ফাল্গুন মাসে। বরদাকান্ত দক্ষিণ-বিক্রমপুরের অন্তর্গত কোঁয়রপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি তাঁর এই বইয়ের 'নিবেদন' অংশে লেখেন,—'প্রায় তিন বৎসর গত হইল 'প্রতিভা' লিখা হইয়াছিল। দীর্ঘকাল বিদেশ ভ্রমণে নিযুক্ত থাকাতেই ইহা জনসাধারণে প্রকাশ করিতে পারি নাই। আমাদের বালিকার কথা পড়িয়া যদি সমাজবিশেষের কিছুমাত্রও উপকার সাধিত হয়—শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।'

সামাজিক উপন্যাসে সেকালের বঙ্কিম-অনুস্মৃতির এইসব নজীরের পাশা-পাশি—অপেক্ষাকৃত জনপ্রিয়—ঐতিহাসিক উপন্যাসের রীতি সম্বন্ধে এইবার দু'-একটি কথা বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্র লোকান্তরিত হবার অনেক দিন পরে, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শশাঙ্ক', 'ধর্মপাল' প্রভৃতি ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাস 'ভারতী-সবুজপত্রের' যুগে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করে। 'শশাঙ্ক' আগে লেখা হয়, 'ধর্মপাল' তার পরে। রাখালদাস যে-উদ্দেশ্যে এইসব উপন্যাস লেখায় হাত দিয়েছিলেন, তাঁর এই বইগুলির ভূমিকায় সে-উদ্দেশ্যের উল্লেখ আছে। 'ধর্মপাল'-এর ভূমিকা থেকে প্রাসঙ্গিক অংশটুকু পাদটীকায় তুলে দেওয়া হোলো।[২৫] বইখানির সুদীর্ঘ ভূমিকাতে এই উদ্দেশ্য

২৫। 'ধর্মপাল' ১৩২১ সালের বৈশাখ হইতে ১৩২২ সালের আশ্বিন পর্যন্ত ধারাবাহিকরূপে 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'শশাঙ্ক' লিখিবার সময়ে যে উদ্দেশ্য লইয়া উপন্যাস রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, সেই উদ্দেশ্যেই 'ধর্মপাল'ও রচিত হইয়াছিল। 'শশাঙ্ককে' লইয়া গৌড় দেশের স্বতন্ত্র ইতিহাসের সূচনা হইয়াছে এবং ধর্মপাল হইতে মুসলমান বিজয় পর্যন্ত ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। এইজন্য 'শশাঙ্ক'র পরে 'ধর্মপাল' লিখিত হইয়াছে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষ পাদে উত্তর ভারতে ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীন গুপ্ত সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে বহুকাল যাবৎ কোন রাজবংশই উত্তরাপথে প্রাধান্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ধ্বংস হইয়াছিল এবং নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে ভিল্লমালের গুর্জর প্রতীহার বংশীয় প্রথম ভোজদেব সমগ্র উত্তরাপথ জয় করিয়া পুনরায় সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই চারিশত বৎসরের মধ্যে হূণজাতীয় তোরমাণ মিহিরকুল, মালবের যশোধর্মদেব, মৌখরি বংশীয় ঈশানবর্মা ও শর্ববর্মা, স্থাণ্বীশ্বরের হর্ষবর্ধন, গৌড়ের শশাঙ্ক ও হর্ষের মাতুলপুত্র ভিল্লমালের বৎসরাজ ও নাগভট, গৌড়ের ধর্মপাল ও দেবপাল কিয়ৎকালের জন্য সার্বভৌম পদলাভ করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে

প্রচারিত হলেও উপন্যাসের কোনো অংশেই ইতিহাসের তথ্যগত অতিরেক বা ঐতিহাসিকের উদ্দেশ্যগত ঘোষণা উপন্যাসের কথা-প্রবাহে কোনোরকম বাধা সৃষ্টি করেনি। সর্বসমেত পাঁচটি ভাগে এবং বিভিন্ন পরিচ্ছেদ-বিভাগে 'ধর্মপাল' উপন্যাস সম্পূর্ণ। তারপরেও স্বল্প-পরিমিত এক 'পরিশিষ্ট' আছে। তাতে ধর্মপালের মৃত্যুর পরে বন্নাদেবীর গর্ভজাত পুত্র দেবপালদেবের গৌড়সাম্রাজ্যলাভের কথা আছে,—এবং গৌড়বাসী জনসাধারণ যে সুদীর্ঘকাল কল্যাণীদেবী এবং ভীষ্মদেবের অলৌকিক কীর্তিকাহিনী গান ক'রতেন, সে-কথাও অনুক্ত থাকেনি।

এই তো গেল রাখালদাসের কথা। এই সূত্রেই আরো আগেকার লেখিকা বঙ্কিমের সমকালীন স্বর্ণকুমারী দেবীর প্রসঙ্গ স্মরণীয়—তাঁর 'দীপ-নির্বাণ' [কালীকিঙ্কর চক্রবর্তী প্রকাশিত ও কলিকাতা বাল্মীকি-যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত] ১২৮৩ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। স্বর্ণকুমারী তাঁর এ-বই সত্যেন্দ্রনাথ

মগধের গুপ্ত-রাজবংশ লোপ হইলে গৌড়দেশ বারবার বিদেশীয় রাজগণ কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া অত্যন্ত বিপন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে দয়িতবিষ্ণুর পৌত্র বপ্যটের পুত্র গোপালদেব প্রজাবৃন্দ কর্তৃক রাজপদে বৃত হইয়াছিলেন। গোপালদেবের পুত্র ধর্মপাল রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দের সাহায্যে আশ্রয়ভিখারী চক্রায়ুধকে কান্যকুব্জের সিংহাসন প্রদান করিয়া আর্যাবর্তে সার্বভৌম পদ লাভ করিয়াছিলেন—ইহা সর্ববাদিসম্মত প্রকৃত ইতিহাস। যাঁহারা ঐতিহাসিক সার সত্য অনুসন্ধান করেন, তাঁহারা গৌড়ীয় সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বিবরণ শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ প্রণীত 'গৌড় রাজমালায়' এবং আমার লিখিত 'বাঙ্গালার ইতিহাস প্রথম ভাগের' সপ্তম পরিচ্ছেদে দেখিতে পাইবেন। 'ধর্মপাল' উপন্যাসাকারে বঙ্গবাসী পাঠক-সাধারণের জন্য লিপিবদ্ধ হইল। ধর্মপাল, বাক্‌পাল, প্রধান সচিব গর্গদেব, কান্যকুব্জরাজ ইন্দ্রায়ুধ ও চক্রায়ুধ, গুর্জররাজ নাগভট, গুর্জর মহামণ্ডলেশ্বর বাহুকধবল, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ প্রকৃত ঐতিহাসিক ব্যক্তি; আখ্যায়িকার অপর চরিত্রগুলি কাল্পনিক। তাম্রশাসনে দেখিতে পাওয়া যায় যে, গৌড়ীয় প্রজাপুঞ্জ গোপালদেবকে রাজলক্ষ্মীর করধারণ করাইয়াছিল। অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে যে গৌড়ীয় কৃষকবৃন্দ গোপালদেবকে রাজপদে নির্বাচন করিয়াছিল এবং পরাক্রান্ত সামন্ত রাজগণ তাহা মানিয়া লইয়াছিলেন, তাহা সম্ভব নহে। সম্ভবতঃ ঘোরতর অরাজকতা উপস্থিত হইলে সামন্তরাজগণ তাঁহাদিগের মধ্যে রণনীতিকুশল কোন ব্যক্তিকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জাপানের পুনরভ্যুদয়কালে দায়িমিত নামধেয় সামন্তরাজগণ স্বেচ্ছায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের স্বাধীনতা বিসর্জন দিয়া মিকাডোকে পুনরায় সম্পূর্ণ রাজশক্তি প্রদান করিয়া যে মহত্ত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, গৌড় রাষ্ট্রে অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে বোধ হয় সেইরূপ অভিনয়ই হইয়াছিল। গ্রন্থের কলেবরবৃদ্ধির ভয়ে ধর্মপালের মৃত্যুকাল পর্যন্ত সমস্ত ঘটনা বিবৃত হয় নাই।'

ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করেন। এই বইয়ের 'উপক্রমণিকা'র কথাগুলি পাদটীকায় তুলে দেওয়া হোলো।[২৬]

২৬। 'মুসলমানেরা ভারত আক্রমণ করিতে আসিবার পূর্বে যে সময় হিন্দু রাজদিগের মধ্যে একতার দৃঢ় বন্ধন ক্রমে ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতেছিল, এবং যে সময় পরস্পর সকলেই সর্বপ্রধান হইবার জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া গৃহবিচ্ছেদের সূত্রপাত করিতেছিলেন, সেই সময়ের একটি ঘটনা অবলম্বন করিয়া এই উপন্যাসটি আরম্ভ। এবং এই গৃহবিচ্ছেদ হেতুক সুযোগ বুঝিয়া যবনেরা যে সময় ভারতের চিরপ্রজ্জলিত দীপ নির্বাণ করিল, সেই দীপ-নির্বাণই এই দীপ-নির্বাণের শেষ।'

এই 'উপক্রমণিকা'তেই আরো বলা হয় যে, উপন্যাসমধ্যে দিল্লীই প্রধান রঙ্গভূমি। খ্রীষ্টাব্দের দ্বাদশ শতকে মহম্মদ ঘোরী ভারত আক্রমণ করেন। সে সময়ে আজমীরাধিপতি সোমেশ্বরের পুত্র পৃথ্বীরাজ এবং চিতোরাধিপতি সমরসিংহ সেই যুদ্ধে বিশেষ বীরত্ব দেখান। স্থানেশ্বরের হিন্দু-মুসলমানের সেই বিরোধের ছবি স্বর্ণকুমারীর 'দীপ-নির্বাণের' আখ্যানবস্তুতে কতকটা প্রতিফলিত হয়েছে। তবে, 'উপক্রমণিকা'য় একথাও বলা হয়েছিল: 'স্থানেশ্বরের প্রথম যুদ্ধ-বৃত্তান্তের সঙ্গে আমাদের এই উপন্যাসের কোন সম্পর্ক নাই বলিয়া জয়চন্দ্রকে আর আমরা উপন্যাসের মধ্যে আনি নাই, তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতাও বিশেষ বর্ণনা করি নাই, কোন কোন স্থলে কেবল তাঁহার নামমাত্র উল্লেখ করিয়াছি।'

ঔপন্যাসিকের পক্ষ থেকে—প্রসঙ্গতঃ, সমরসিংহ সম্বন্ধে ইতিহাসের ব্যতিক্রম ঘটাবার দায়িত্বও—এই 'উপক্রমণিকা'তেই স্বীকৃত হয়েছে। অতএব হিন্দু-সমৃদ্ধির কথা-প্রসঙ্গে এদেশে প্রথম কামান ব্যবহারের তারিখ সম্বন্ধেও কয়েকটি মন্তব্য আছে। আরবেরা সম্ভবতঃ ভারতবর্ষ থেকেই যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কামানের ব্যবহার শিখে নিয়ে মুরদের সেই অস্ত্রবিদ্যায় শিক্ষিত করে—এবং ইউরোপে এই মুর জাতির হাত দিয়েই যে কামানের প্রচলন হয়, এই ধরনের অনুমান এই 'উপক্রমণিকা'তেই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ইতিহাসের এইসব গুরু-লঘু তথ্যের কথা অবান্তর। ইতিহাস-আশ্রিত উপন্যাসে ইতিহাস কী পরিমাণে গ্রাহ্য এবং লেখকের কল্পনাই বা কী পরিমাণে স্বীকার্য,—অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের মৌলিক আবেগ, অনুভূতি, মনন ইত্যাদি ইতিহাসের তথ্যসম্ভার কী পরিমাণে লঙ্ঘন করতে পারে,—সে বিষয়ে এখানকার মন্তব্যটুকু তুলে দেখা দরকার। স্বর্ণকুমারী লিখেছেন:

> 'চিতোরাধিপতি সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের পরম বন্ধু ছিলেন, মুসলমানদিগের সহিত তাঁহার যে দুই যুদ্ধ হয়, সেই দুই যুদ্ধেই তিনি বিশেষ সাহায্য করেন। উপন্যাসের অনুরোধে আমরা সমরসিংহ সম্বন্ধে দুই স্থলে ইতিহাসের ব্যতিক্রম করিতে বাধ্য হইয়াছি। প্রথম আমরা সমরসিংহের বয়ঃক্রম চারি বৎসর অধিক করিয়াছি। দ্বিতীয়, সমরসিংহ পৃথ্বীরাজের ভগিনীপতি ছিলেন, কিন্তু উপন্যাসের অনুরোধে আমরা সেই সম্পর্ক রক্ষা করি নাই। যদিও এই পুস্তক উপন্যাসমাত্র, কিন্তু পুস্তক সন্নিবেশিত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ প্রায়ই ইতিহাস হইতে গৃহীত। এবং তাঁহাদের স্বভাব

ইতিহাসের তথ্যভারে,—আহরণ-অন্বেষণের শ্রমে স্বর্ণকুমারীকে যতো ভারাক্রান্ত মনে হয়,—রাখালদাসকে মোটেই সে-রকম নয়। এদিক থেকে, রাখালদাস অনেকটা বঙ্কিমেরই অনুগামী।

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সামাজিক, ঐতিহাসিক—সব রকম উপন্যাসেই যে সহজ সরসতা দেখিয়ে গেছেন, সত্যিই তার তুলনা বিরল। তাঁর সমকালীন লেখক-লেখিকারা তাঁর কিছু কিছু ভঙ্গিমাত্র অনুকরণ ক'রেছিলেন। তাঁর আদর্শ অনুসরণের দিকে লেখকদের ব্যাপক আগ্রহ ছিল। এইসব দৃষ্টান্তে সেই আগ্রহই ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু তাঁর সামগ্রিক দক্ষতার চিহ্ন এঁদের মধ্যে বিরল! 'মৃণালিনী' আলোচনা-সূত্রে তাঁর এই বিশেষত্ব বা দক্ষতার দিকগুলি এইবার কিছু কিছু বলে নেওয়া যেতে পারে।

প্রথমতঃ কাহিনীর সূচনাভঙ্গিতে তাঁর বিশেষত্বের কথা। 'দুর্গেশ-নন্দিনী'তে অথবা 'কপালকুণ্ডলা'য় যেমন গল্প-সূচনার চিত্তাকর্ষক ভঙ্গি দেখা গেছে, 'মৃণালিনী'তেও কাহিনী আরম্ভের সঙ্গে-সঙ্গেই সেইরকম সহজ আকর্ষণ অনুভব করা যায়। কিন্তু তাকে শুধু 'গল্পের আকর্ষণ' বললে এই বিশেষত্ব সম্বন্ধে অভিপ্রেত ব্যাখ্যা সম্পূর্ণ হয় না। সূচনার গুণে একসঙ্গে পরিবেশ, প্লট, চরিত্র,—সবই যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে থাকে!

> ও জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা ইতিহাসানুযায়ীক রাখিতে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি।'

এ-বইয়ে কবিচন্দ্র নামে যে রাজপুত মহাকবির কথা সূচিত, তাঁর প্রকৃত নাম যে চাঁদকবি, এখানে সেকথাও বিশেষভাবে জানানো হয়। এলিয়টের ভারতবর্ষের ইতিহাস, কানিংহামের ভারতীয় প্রত্নকথা-সম্পর্কিত আলোচনা, এলফিনস্টোনের ভারত-ইতিহাস, টডের রাজস্থানের ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখ ক'রে,—উপক্রমণিকার প্রায় উপসংহার অংশে তিনি বলেছেন :

> 'যেমন কুরুক্ষেত্র এখন স্থানেশ্বর নামে অভিহিত, তেমনি কুরুক্ষেত্রের পুণ্যনদী দৃশদ্বতীও অধুনা কাগার নামে খ্যাত। ইহা স্থানেশ্বর প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে প্রবাহিত হইতেছেন।
>
> 'পাগলিনীর ব্যাপারটি আমরা একটি প্রকৃত ঘটনার আভাষ হইতে কল্পিত করিয়া লইয়াছি। কাপ্তেন টডের রাজস্থান পাঠে জানা যায় যে আশাপূর্ণা নামে দেবী যথার্থই দিল্লীর কুলদেবী ছিলেন, এবং সকল রাজপুতেরাই কোন কর্ম করিবার অগ্রে আশাপূর্ণা দেবীর পূজা করিতেন।'

তাঁর শেষ দিকের উপন্যাস 'আনন্দমঠ'-এর 'উপক্রমণিকা' অংশে রাত্রি দ্বিপ্রহরে গভীর অরণ্যের স্তব্ধতায় হঠাৎ এক মনুষ্যকণ্ঠের প্রশ্ন তুলে এবং সেই প্রশ্নের উত্তর শুনিয়ে,—'জীবনসর্বস্বপণ',—'সর্বত্যাগের সাধনা',—আর 'ভক্তির' পথে অগ্রগতির প্রয়োজন সম্বন্ধে একটা ধারণা জাগাবার চেষ্টা ছিল। তারপর, প্রথম পরিচ্ছেদে সুদূর ১১৭৬ সালের পদচিহ্ন গ্রামের দুর্ভিক্ষ, মহামারী ইত্যাদির বিবরণ দেখা দেয়। 'দেবীচৌধুরাণী'তেও প্রথম পরিচ্ছেদেই দেখা যায় অভাবের ছবি। মর্যাদার চিন্তা, আর ক্ষুধার তাড়নার সামনে,—প্রফুল্ল এবং তার মা,—এই দুটি নারী-চরিত্রের স্নেহতাড়িত বাদ-প্রতিবাদ দেখিয়ে,—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রফুল্লমুখীর ধনী শ্বশুর হরবল্লভ বাবুর নিবাস 'ভূতনাথ' গ্রামের পটভূমি বেছে নিয়েছেন লেখক। শ্বশুরবাড়িতে প্রফুল্ল তার ন্যায়সংগত জায়গা দাবি ক'রে প্রত্যাখ্যাত হয়। এইভাবেই 'দেবীচৌধুরাণীর' গল্প এগিয়েছে।

তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী'র সূচনায় কিন্তু ঠিক এরকম কোনো আদর্শ-চিন্তার বা সম্পর্ক-ব্যাখ্যানের আয়োজন নেই। সেখানে বিষ্ণুপুর থেকে মান্দারণের পথে জগৎসিংহকে একলা ফিরতে দেখা গেছে। পথে, সূর্যাস্তকালে 'নৈদাঘ ঝটিকা' দেখা দেয়। এই দুর্যোগের মধ্যেই এ-উপন্যাসের চমকপ্রদ বিশেষ পটভূমিটি তৈরি হয়ে যায়! সেই পটে নায়ক-নায়িকার প্রথম সমাবেশ—এবং আখ্যানের তৎপরবর্তী গতিবেগ সঞ্চারের বিশেষত্বও লক্ষ্য করা গেছে। উপন্যাসের সূচনা-দৃশ্যে এই ধরনের গতিবেগ-সমন্বিত পরিস্থিতি-সৃষ্টিতে তাঁর আগ্রহ একেবারে শুরু থেকেই চোখে পড়ে।

'কপালকুণ্ডলা'য় গ্রন্থরচনার আড়াইশ বছর আগেকার এক মাঘ মাসের রাত্রিশেষের দৃশ্যে গঙ্গাসাগর থেকে যাত্রীবাহী এক নৌকা ফিরছিল। সেও গতির চিত্র, দুর্যোগের পরিবেশ! সমুদ্রতীরে জনশূন্য বনভূমিতে পরিত্যক্ত নবকুমারের কথা উঠেছে সেখানে। সেই সূত্রেই ধীরে ধীরে গল্পের পরবর্তী পর্ব, আর তার বিচিত্র সম্ভাবনার ইশারা সূচিত। সেখানেও এইভাবে কাহিনী শুরু হয়েছে।

অনুরূপভাবে 'মৃণালিনী'তেও প্রথম সূচনাতেই দেখা যায় এক গতির দৃশ্য :

> 'একদিন প্রয়াগতীর্থে, গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমে, অপূর্ব প্রাবৃটদিনান্ত-শোভা প্রকটিত হইতেছিল। প্রাবৃটকাল, কিন্তু মেঘ নাই, অথবা যে মেঘ আছে তাহা স্বর্ণময় তরঙ্গমালাবৎ পশ্চিম গগনে বিরাজ করিতেছিল। সূর্যদেব অস্তে গমন করিয়াছিলেন। বর্ষার

জলসঞ্চারে গঙ্গাযমুনা উভয়েই সম্পূর্ণশরীরে যৌবনের পরিপূর্ণতায় উন্মাদিনী, যেন দুই ভগিনী ক্রীড়াচ্ছলে পরস্পরে আলিঙ্গন করিতেছিল। চঞ্চল বসনাগ্রভাগবৎ তরঙ্গমালা পবনতাড়িত হইয়া কূলে প্রতিঘাত করিতেছিল।'

এই নদীতে একটি নৌকা দেখা দেয়:

'একখানি ক্ষুদ্র তরণীতে দুইজন মাত্র নাবিক। তরণী অসংগত সাহসে সেই দুর্দমনীয় যমুনার স্রোতোবেগে আরোহণ করিয়া, প্রয়াগের ঘাটে আসিয়া লাগিল। একজন নৌকায় রহিল, একজন তীরে নামিল। যে নামিল, তাহার নবীন যৌবন, উন্নত বলিষ্ঠ দেহ, যোদ্ধবেশ। মস্তকে উষ্ণীষ, অঙ্গে কবচ, করে ধনুর্বাণ, পৃষ্ঠে তূণীর, চরণে অনুপদীনা। এই বীরাকার পুরুষ পরম সুন্দর। ঘাটের উপরে, সংসার-বিরাগী পুণ্যপ্রয়াসীদিগের কতকগুলি আশ্রম আছে। তন্মধ্যে একটি ক্ষুদ্র কুটীরে এই যুবা প্রবেশ করিলেন।'

বঙ্কিমচন্দ্রের কবিকল্পনার গুণে,—উপযুক্ত তৎসম শব্দের যোগে,—এ-দৃশ্যের সূচনাটি গাম্ভীর্যময়, অথচ কৌতূহলোদ্দীপক হয়ে উঠেছে। পরবর্তী রচনা 'বিষবৃক্ষ'তেও প্রথম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের নৌকাযাত্রার ছবি আছে,—কিন্তু নগেন্দ্রনাথকে জ্যৈষ্ঠের তুফানের মুখোমুখি হতে দেখা যায়—প্রথম পরিচ্ছেদের চতুর্থ অনুচ্ছেদে। তার আগে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে নদীপথে ভ্রমণের বর্ণনায় পারিপার্শ্বিক শান্ত পৃথিবীরই ছবি ফুটেছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে পৌঁছে দেখা যায়—'ঝড় কিছু গুরুতর বেগে আসিল।'

অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের কাহিনী-সৃষ্টির অন্যতম উদাহরণ তাঁর 'ইন্দিরা'। সেই 'ইন্দিরা'র সূচনাতেও এই দুর্যোগ আর গতিরই ইঙ্গিত। সেখানকার সূচনা-বাক্যটিই তার প্রমাণ। সেটি ইন্দিরার উক্তি—'অনেক দিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ি যাইতেছিলাম।' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে পৌঁছে দেখা যায়, ইন্দিরা সে-যাত্রায় দস্যুর কবলে পড়েন। সেও স্থিতির দৃশ্য নয়, গতিরই। 'রাধারাণী'তে প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদের অতি সংকীর্ণ পরিসরে বঙ্কিম তাঁর অভ্যস্ত রীতিতে জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাঁর নায়িকার 'বয়স একাদশ পরিপূর্ণ হয় নাই'—আগে তাদের অবস্থা ভাল ছিল, কিন্তু পিতার মৃত্যু হওয়ায় এবং মায়ের সঙ্গে কোনো এক জ্ঞাতির মোকদ্দমার ফলে,—হাইকোর্টে হেরে গিয়ে তারা খুবই বিপন্ন হয়। মা রোগাক্রান্ত হন,—নিরুপায় হয়ে রাধারাণী

মাহেশের রথে ফুলের মালা বেচতে আসে! কিন্তু রথের টান শেষ হবার আগেই বর্ষণ শুরু হয়। 'অন্ধকার—পথ কর্দমময়, পিচ্ছিল—কিছুই দেখা যায় না'—এবং সেই দুর্যোগে—'অকস্মাৎ কে আসিয়া রাধারাণীর ঘাড়ে পড়িল,—অর্থাৎ 'রাধারাণী'র সূচনাতেও সেই পূর্বাভ্যস্ত গতির চিত্র, দুর্যোগের দৃশ্য!

'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত তাঁর গল্প-উপন্যাসের ধারায় কেবল এই সূচনাভঙ্গির প্রকৃতি বিচার ক'রে দেখলে এই লেখাগুলিতে যেমন কতকটা নাটকীয় দৃশ্যগৌরবের ওপর জোর দিয়ে বিশেষ বিশেষ গতি-ধর্মী দৃশ্য বা ঘটনার রূপায়ণ অবলম্বিত হতে দেখা যায়,—তেমনি আবার 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ নায়ক-নায়িকা বা অন্যান্য পাত্র-পাত্রীর আলাপ বা মন্ত্রণা বা আত্মকথা অবলম্বনে অন্যভাবে আখ্যান শুরু হয়েছে।

'মৃণালিনী'র আরম্ভ-দৃশ্যের কথা থেকে এই পরিকল্পনাগত বিশেষত্বের আলোচনাসূত্রেই, আবার তাঁর পূর্বালোচিত উপন্যাস-দু'খানির কথায় ফিরতে হচ্ছে। 'দুর্গেশনন্দিনী'র সঙ্গে 'কপালকুণ্ডলা'র পরিকল্পনাগত নানা সাদৃশ্য দেখাবার চেষ্টা আছে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্তের আলোচনায়। তাঁরই সেই বই থেকে কয়েকটি উক্তি সংগ্রহ ক'রে—এই দুই রচনার এইরকম কয়েকটি সাদৃশ্যের লক্ষণ নিচে সাজিয়ে দেওয়া হোলো:

> 'তিলোত্তমা কতলু খাঁর দুর্গে বন্দিনী ছিলেন, মৃণালিনীর অবস্থা অন্যরূপ হইলেও হৃষীকেশ শর্মার গৃহে এক হিসাবে তিনিও বন্দিনী ছিলেন। উভয় ক্ষেত্রেই এই বন্দিদশা অপরিসীম লাঞ্ছনার কারণ হইল; জগৎসিংহ যেমন তিলোত্তমার, হেমচন্দ্র তেমনই মৃণালিনীর চরিত্রে সন্দিগ্ধ হইলেন। এবং উভয়ক্ষেত্রেই নায়িকার রূপলোলুপ দুর্বৃত্তের মৃত্যুকালীন উক্তিতে সন্দেহের নিরাকরণ হইল। অবশ্য 'দুর্গেশনন্দিনী'তে আয়েষার মধ্যবর্তিতায় কতলু খাঁর মৃত্যুকালীন উক্তি অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু মৃণালিনীতে মনে হয় যেমন করিয়া হউক হেমচন্দ্রের সন্দেহ দূর করিবার জন্যই যেন ব্যোমকেশের স্বীকারোক্তি একরূপ জোর করিয়াই আখ্যায়িকার সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।'

শ্রীযুক্ত দাশগুপ্ত আরো লিখেছেন :

> '...মণিমালিনীর কানে কানে মৃণালিনী হেমচন্দ্রের সহিত তাঁহার সম্পর্ক সম্বন্ধে যে পরিচয় দিলেন, তাহা দুর্গপ্রবেশের প্রাক্কালে বিমলা জগৎসিংহের নিকট গোপনে যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলেন তাহার সহিত তুলনীয়। আবার বিমলা চুপি চুপি যাহাই বলুন, তাঁহার সম্বন্ধে পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্ত হইয়াছে উপন্যাসের শেষের দিকে বিমলার আত্মপরিচয়-জ্ঞাপনে। এইরূপ আলোচ্য উপন্যাসে মৃণালিনী যে হেমচন্দ্রের পরিণীতা পত্নী, মণিমালিনীর নিকট তাঁহার গোপন কথায় ইহার সুস্পষ্ট আভাস থাকিলেও মৃণালিনীর জীবনের অজ্ঞাত অধ্যায় বিবৃত হইয়াছে আখ্যায়িকার পরিসমাপ্তির দিকে গিরিজায়ার নিকট তাঁহার বিস্তারিত পরিচয় দেওয়ার ভিতর দিয়া। তফাৎ এই যে, বিমলা তাঁহার পরিচয় দিয়াছেন লিপির সাহায্যে, মৃণালিনীর বিবৃতি মৌখিক।'

এই দুটি উপন্যাসের পরিকল্পনাগত ও চরিত্রগত অল্পবিস্তর সাদৃশ্যের পর্যালোচনায় অধ্যাপক দাশগুপ্ত তিলোত্তমা-মৃণালিনী এবং জগৎসিংহ-হেমচন্দ্রের নৈকট্যের উল্লেখ করেছেন। কতলুখাঁ আর বখতিয়ারের রূপায়ণে তিনি কোনোরকম সাদৃশ্য অনুভব করেন নি বটে,—কিন্তু সুকৌশলে এদের অন্যতর নৈকট্যের ইঙ্গিত দিয়ে লিখেছেন—'বখতিয়ারের পার্শ্বে মহম্মদ আলি কতকটা কতলু খাঁর পার্শ্বে ওসমানের অনুরূপ।' ঠিক এইভাবেই মাধবাচার্য আর অভিরামস্বামীর সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। তিনি লিখেছেন :

> 'উভয়েই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী অথচ আকর্ষণের প্রকারভেদ থাকিলেও উভয়ের ক্ষেত্রেই সংসারের আকর্ষণ রহিয়াছে এবং উভয়েই জ্যোতির্বিৎ। অভিরামস্বামী স্বীয় গণনার উপর নির্ভর করিয়া দৌহিত্রীর কল্যাণ-কামনায় বীরেন্দ্রসিংহকে মোগলের পক্ষাবলম্বনে প্ররোচিত করিলেন, কিন্তু পরবর্তী ঘটনা তাঁহার এই চেষ্টাকে বিদ্রূপ করিয়া অদৃষ্টের প্রাধান্য প্রমাণ করিল। মাধবাচার্য স্বীয় গণনার উপর নির্ভর করিয়া বখতিয়ারের অগ্রগতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে প্রিয় শিষ্যকে লইয়া গৌড়রাজ্যে আগমন করিলেন।'

অতঃপর আর-একটি বিশেষত্ব। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের পৃথক পৃথক খণ্ডে

এবং পরিচ্ছেদে সংকেত-সূচক কোনো কোনো শব্দ-ব্যবহারের দিকটি বিবেচ্য। এও তাঁর অন্যতম অভ্যাস। 'দুর্গেশনন্দিনী', 'কপালকুণ্ডলা', 'মৃণালিনী', এবং পরবর্তী অন্যান্য লেখাতেও এ-অভ্যাস অনুসৃত হয়েছে। তবে, পরিচ্ছেদের বিষয়-সংকেত সর্বত্র দেখা গেলেও, সব ক্ষেত্রে প্রতিটি খণ্ডের এ-রকম ভাব-সংকেত বা বিষয়-নির্দেশনা নেই। 'মৃণালিনী'তেও আলাদা-আলাদা খণ্ডের ভাব-সংকেত নেই। কিন্তু 'সীতারামে' দেখা যায়—প্রথম খণ্ডের সংকেত 'দিবা-গৃহিণী',—দ্বিতীয় খণ্ডের 'সন্ধ্যা-জয়ন্তী,' —তৃতীয় খণ্ডের 'রাত্রি-ডাকিনী'। 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী',—এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস 'রাজসিংহে'র সঙ্গে এদিক থেকে 'সীতারামের' এই বহিরায়োজনগত ঈষৎ সাদৃশ্য অনুভব করা যায়। 'রাজসিংহে' প্রথম খণ্ডে 'চিত্রে চরণ'—দ্বিতীয় খণ্ডে 'নন্দনে নরক,'—তৃতীয়ে 'বিবাহে বিকল্প'—চতুর্থ খণ্ডে 'রন্ধ্রে যুদ্ধ' ইত্যাদি এক-একটি খণ্ডের বর্ণনায় এই সব বস্তু-সংকেত বিদ্যমান। এ ঠিক পরিকল্পনাগত গভীর কোনো বিশেষত্ব নয়,—কাহিনীর এক-একটি পর্ব সম্বন্ধে পাঠককে অবহিত রাখবার কৌশল মাত্র। 'রজনী'তেও এই রীতিরই প্রয়োগ ঘটেছে। সেখানে উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের বস্তু-সংকেত—'রজনীর কথা', দ্বিতীয় খণ্ডের— 'অমরনাথের কথা,'—তৃতীয়ের 'শচীন্দ্র বক্তা'; পর পর এই তিনটি খণ্ডে কেবল এই তিনটি সংকেতই দেওয়া হয়েছে। এই তিন খণ্ডের অন্তর্ভুক্ত আলাদা-আলাদা পরিচ্ছেদে এরকম আর কোনো বিষয়-নির্দেশ নেই। কিন্তু চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে 'সকলের কথা',—এই সংকেত দিয়ে,—প্রথম পরিচ্ছেদের বর্ণনীয় বিষয়-নির্দেশ হিসেবে লেখা হয়েছে 'লবঙ্গলতার কথা', দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—'অমরনাথের কথা', তৃতীয় ও চতুর্থ পরিচ্ছেদে আবার 'লবঙ্গলতার কথা,' পঞ্চম ও ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে যথাক্রমে—'শচীন্দ্রনাথের কথা' ও 'শচীন্দ্রের কথা',—সপ্তম পরিচ্ছেদে পুনরায় 'লবঙ্গলতার কথা'। তারপর পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই সমগ্র খণ্ডটির বিষয়-নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে— 'অমরনাথের কথা'। 'চন্দ্রশেখর'-এর প্রথম খণ্ডের বিষয়-নির্দেশনায় লেখা হয়েছে 'পাপীয়সী',—দ্বিতীয় খণ্ডে 'পাপ'—তৃতীয় খণ্ডে 'পুণ্যের স্পর্শ',— চতুর্থ খণ্ডে 'প্রায়শ্চিত্ত',—পঞ্চমে 'প্রচ্ছাদন,'—এবং ষষ্ঠে 'সিদ্ধি'।

গল্পের সূচনাভঙ্গির বিশেষত্ব,—এবং খণ্ড ও পরিচ্ছেদের বিশেষ বিশেষ বস্তুনির্দেশ-রীতির পরে, অতঃপর তাঁর আর-একটি বিশেষত্বের কথা। তিনি যেমন ইতিহাসের আংশিক অনুসরণে,—অথবা অর্ধ-ঐতিহাসিক জনশ্রুতিতে

নির্ভর ক'রে—উপন্যাসের আখ্যান বয়নের মধ্যে বড়ো বড়ো ঘটনার সমারোহ দেখাতে ভালোবাসেন, তেমনি আবার সংসারের বিভিন্ন প্রীতি-সম্পর্কের রূপায়ণেও তাঁর মনোযোগ দেখা যায়। উপন্যাসের পাত্রেই তিনি এ-রস পরিবেষণ ক'রে গেছেন।

ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ননদ-ভাজ', 'শ্বাশুড়ী-বৌ', 'দুই ভগিনী' [নামান্তর 'বোনে বোনে'] ইত্যাদি প্রবন্ধগুলিতে বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যের বিভিন্ন পাত্রপাত্রী সম্বন্ধে বিশেষ একরকম আলোচনা আছে। ১৩২০ সালের কার্তিক সংখ্যার 'ভারতবর্ষে' প্রথম প্রবন্ধটি ছাপা হয়। দ্বিতীয়টি বেরিয়েছিল ঐ বছরের চৈত্র সংখ্যায়। ১৩২৩ সালের ভাদ্র সংখ্যায় বেরিয়েছিল তৃতীয়টি। 'একান্নবর্তী পরিবার' নামে তাঁর আর একটি প্রবন্ধ ছাপা হয় ১৩২১ সালের বৈশাখ সংখ্যার 'আর্যাবর্ত' পত্রিকায়। ১৩২১-২২ সালের 'ভারতবর্ষে' কয়েক সংখ্যা ধ'রে তাঁর 'সতীন ও সৎমা' এবং 'মা' প্রকাশিত হয়। ১৩২৩এ এইসব প্রবন্ধ 'কাব্যসুধা' নামে গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়। তাঁর 'কপালকুণ্ডলাতত্ত্ব' নামেও একখানি পুস্তিকা বেরিয়েছিল। এই পুস্তিকায় তিনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের সমশ্রেণীব নায়িকাদের কথা স্মরণ করেন—এবং 'কপালকুণ্ডলা' নামের বিচারও তাতে দেখা গেছে। পূর্বোক্ত 'ননদ ভাজ' ইত্যাদি তাঁর তিনটি প্রবন্ধ একই উদ্দেশ্য লেখা হয়। তিনি নিজেই তাঁর 'কাব্যসুধার' ভূমিকায় সে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা ক'রে লেখেন—'এক একটি গার্হস্থ্য সম্পর্ক ধরিয়া সমালোচনা করা হইয়াছে এবং প্রাসঙ্গিক ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যে, প্রাচীন ও বঙ্কিমচন্দ্রের সমসাময়িক বাঙ্গালা সাহিত্যে এবং ইংরেজি সাহিত্যে ঐ শ্রেণীর চিত্র থাকিলে তাহার সহিতও তুলনায় সমালোচনা করা হইয়াছে।'

ইংরেজি উপন্যাসের অনুকরণে বঙ্কিমচন্দ্র কেবল প্রেমের কাহিনী লিখে গেছেন,—এই ধরনের অভিযোগ খণ্ডন করা ললিতকুমারের অন্যতম লক্ষ্য ছিল। তিনি লিখেছেন—'এই সকল প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বঙ্কিমচন্দ্র পারিবারিক জীবনে ননদ-ভাজে, শ্বাশুড়ী-বৌয়ে, বোনে-বোনে, সতীনে-সতীনে ভালবাসা, মাতার সন্তানস্নেহ, বিমাতার সপত্নী-সন্তানের প্রতি অপক্ষপাতে স্নেহ প্রভৃতির সুন্দর ও উজ্জ্বল চিত্র একাধিক স্থলে অঙ্কিত করিয়াছেন।'

তাঁর এই ভূমিকার আর-একটি মন্তব্যে এ-কথা আরো বিশদভাবে বলা হয়েছে :

> 'লোকে বিষবৃক্ষ পড়ে—নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-কুন্দনন্দিনীর প্রেম-কাহিনীর জন্য, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পড়ে—গোবিন্দলাল ভ্রমর-রোহিণীর প্রেমকাহিনীর জন্য, এমন কি দেবীচৌধুরাণী পড়ে—ব্রজেশ্বর-প্রফুল্লর প্রেম-কাহিনীর জন্য, ইহা অস্বীকার করা যায় না। এই সকল প্রেমকাহিনীতে যথেষ্ট মধুর ও করুণ স্বর আছে, তাহাও স্বীকার করি। কিন্তু কমলমণি সূর্যমুখীর অর্থাৎ ননদ-ভাজের সখিত্ব, ভ্রমর ও যামিনী দুই ভগিনীর সখিত্ব, প্রফুল্ল ও সাগর দুই সতীনে সখিত্ব—এগুলিও কি রমণীয় ও দর্শনীয় নহে?'

তাঁর 'মৃণালিনী'তে মৃণালিনী আর মণিমালিনীর সখিত্বের যে ছবি পাওয়া যায়,—আলোচনার এই দিকটি মনে রাখলে, সেদিকেও তাঁর এই স্বভাবগত বিশেষত্বের উদাহরণ চোখে পড়ে।

তারপর তাঁর ইতিহাসের ঝোঁক। এ আগ্রহের দিকটি 'দুর্গেশনন্দিনী'র সমালোচনাসূত্রে ইতিপূর্বে কতকটা দেখা গেছে। 'মৃণালিনী'ও বহু পরিমাণে ইতিহাসের নানা কথায়,—নানা ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে আশ্রিত। সেই সূত্রে এখানে এদিকটিরও পুনরুল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। তাঁর 'দুর্গেশনন্দিনী', 'মৃণালিনী', 'চন্দ্রশেখর', 'রাজসিংহ', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' এবং 'সীতারাম' বই ক'খানির ঐতিহাসিক উপাদান সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত প্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত তাঁর 'উপন্যাস-সাহিত্যে বঙ্কিম' [১৩৬৮] বইয়ের 'পরিশিষ্ট খ' অংশে বিস্তৃত মতামত তুলে দিয়েছেন। এখানে সে-সব প্রসঙ্গের পুনরুদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন। 'দুর্গেশনন্দিনী' সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ সরকারের কয়েকটি কথা এই আলোচনার ২৫১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। স্টুয়ার্ট সাহেবের History of Bengal [ফ্রেড. জে. মোয়াট সম্পাদিত] থেকে ১১৫-১৬ পৃষ্ঠার প্রাসঙ্গিক অংশ প্রফুল্লবাবুর বইয়ের ৫৫৪-৫৫ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে। যদুনাথ 'আকবরনামা'র তৃতীয় খণ্ড থেকে জগৎসিংহের যুদ্ধের বিবরণ 'বাঙালী পাঠকের সুবিধার' জন্যে, বাংলায় অনুবাদ ক'রে দিয়েছেন এবং প্রফুল্লবাবুর বইখানির ৫৫৬-৫৭ পৃষ্ঠায় সে অংশ উদ্ধৃত হয়েছে। ১৩৫০ এর 'সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা'র তৃতীয় সংখ্যায় এই অনুবাদ প্রকাশিত হয়। এই বিবরণ থেকে জানা যায়—৯৯৮ হিজরী সনে—৯৯৭ বঙ্গাব্দে মানসিংহ ঝাড়খণ্ডের পথে উড়িষ্যা জয় করবার

জন্যে রওনা হন। কৎলু যুদ্ধার্থে ধরপুরে আসেন। কৎলুর সেনাপতি বাহাদুর, কুরু,—এবং মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহ নিজের নিজের সৈন্যদল নিয়ে উপস্থিত হন। বাহাদুর কৌশলে জগৎসিংহকে ভুলিয়ে যুদ্ধে পরাজিত করে [২১এ মে ১৫৯০]। কিন্তু জগৎসিংহ পরাজিত হলেও বন্দী হননি। স্টুয়ার্টের ইতিহাসে জগৎসিংহের বন্দী হবার কাহিনী আছে। কিন্তু প্রণয়-কাহিনী কোথাও নেই। এটি বঙ্কিমের কল্পনাপ্রসূত। তবে যদুনাথ জানিয়েছেন—'জয়পুরের রাজপুত্র যে বঙ্গদেশের একজন জমিদার-কন্যাকে বিবাহ করিলেন, এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সহজে বিশ্বাসযোগ্য ব্যাপার।'

'মৃণালিনী'র ঐতিহাসিক উপাদানও স্টুয়ার্টের বই থেকে পাওয়া গিয়েছিল। আবু ওমার মিন্‌হাজউদ্দীনের 'তাবাকৎ-ই নাসিবি' থেকে স্টুয়ার্ট তাঁর কাহিনী নিয়েছিলেন। প্রফুল্লবাবু তাঁর পূর্বোক্ত আলোচনায় ডক্টর রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাংলা দেশের ইতিহাস' থেকেও কিছু উদ্ধৃতি পরিবেষণ করেছেন। রমেশচন্দ্র লিখেছেন—'নদীয়া কিছুদিন বখতিয়ারের অধীনে থাকিলেও ইহা যে আবার সেনরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করাই সংগত।' মিন্‌হাজউদ্দীনের বর্ণনা যে অতিরঞ্জিত, সে-বিষয়ে আধুনিক ঐতিহাসিকেরা একমত।

'চন্দ্রশেখর'-এ মীরকাসেমের সঙ্গে ইংরেজের যে বিরোধের ভূমিকাটুকু মানা হয়েছে, সে-কাহিনী এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য ঐতিহাসিক প্রসঙ্গ—বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথা থেকেই জানা যায় যে, তিনি সয়ের-মুতাক্ষরীণ থেকে পান। মীরকাসেমের জ্যোতিষ-শাস্ত্রে বিশ্বাস,—তাঁর দরবারে গুরগন খাঁর দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকার,—গুরগনের দ্রাম্ভিকতা,—মীরকাসেমের ওপর তার প্রবল আধিপত্য এবং তাতে অন্যান্য কর্মচারীর অসন্তোষ,—তারই নির্দেশে মুঙ্গেরে ইংরেজের অস্ত্রশস্ত্রের নৌকা আটক এবং তাতে ইব্রাহিম খাঁর আপত্তি, —হে সাহেবকে জামীন রেখে নবাবের আদেশে আমিয়ট সাহেবের মুঙ্গের-ত্যাগ,—মুর্শিদাবাদে নবাব-সৈন্যের আক্রমণে আমিয়ট ও তাঁর অনুচরদের মৃত্যু,—মুঙ্গেরে সন্দেহের বশে শেঠভ্রাতৃদ্বয়কে বন্দী রাখার বৃত্তান্ত,—কাটোয়ার যুদ্ধে তকি খাঁর মৃত্যু—এবং ইংরেজের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রের ফলে গুরগনের হত্যা—এ সবই সয়ের-মুতাক্ষরীণ থেকে নেওয়া। এইসব বিবরণ উদ্ধৃত ক'রে প্রফুল্লবাবু অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের 'মীরকাসেম' বইখানির [১৭৮-৭৯ পৃষ্ঠা] উল্লেখ ক'রে জানিয়েছেন—'পরবর্তী কালে ঐতিহাসিক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়

মহাশয় আরও তথ্যাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংরেজের সহিত গুরগন খাঁর গোপন ষড়যন্ত্র ঐতিহাসিক সত্য।'

'রাজসিংহ' প্রভৃতি অন্যান্য ক্ষেত্রের ইতিহাস-আনুগত্যের বিবরণ এ-আলোচনার যথাস্থানে দেখা যাবে। 'মৃণালিনী' প্রসঙ্গে আলোচনাসূত্রে এখানে ঐতিহাসিক কাহিনীর প্রতি তাঁর আগ্রহের দিকটি তাঁর অন্যতম বিশেষত্ব হিসেবে স্মরণ করা গেল।

উপন্যাসের বিশেষ-বিশেষ সন্ধিতে ভয়ঙ্কর আর মধুরের সমাবেশ ঘটিয়ে তোলা তাঁর পঞ্চম বিশেষত্ব। আগেই বলা হয়েছে যে, এ দিকটি তাঁর কবি-স্বভাবের সঙ্গে জড়িত। 'কপালকুণ্ডলা'তে কাপালিক ভয়ঙ্কর,—কপালকুণ্ডলা মধুর। কিন্তু সবক্ষেত্রে তিনি যে কেবল ভয়ানক আর মধুরের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তাও নয়। কখনো বা উজ্জ্বলে-মধুরে সমাবেশ। 'দুর্গেশনন্দিনী'তে কতলু খাঁর হত্যার দৃশ্যে যেমন নৃত্যগীতের সমারোহ আর ভয়াবহ মৃত্যুকে তিনি একই সমাবেশে মিলিয়েছিলেন,—'মৃণালিনী'তে ঠিক সে সুযোগ ছিল না। কিন্তু 'চন্দ্রশেখর'-এর পঞ্চম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদের এই সূচনাটি কতকটা সেই একই রুচির নিদর্শন বললে অন্যায় হবে না:

> 'মুঙ্গেরে প্রশস্ত অট্টালিকামধ্যে স্বরূপচন্দ জগৎশেঠ এবং মহাতাবচন্দ জগৎশেঠ দুই ভাই বাস করিতেছিলেন। তথায় নিশীথে সহস্র প্রদীপ জ্বলিতেছিল। তথায় শ্বেতমর্ম্মরবিন্যাসশীতল মণ্ডপ মধ্যে, নর্ত্তকীর রত্নাভরণ হইতে সেই অসংখ্য দীপমালারশ্মি প্রতিফলিত হইতেছিল। জলে জল বাঁধে—আর উজ্জ্বলেই উজ্জ্বল বাঁধে। দীপরশ্মি, উজ্জ্বল প্রস্তরস্তম্ভে—উজ্জ্বল স্বর্ণ-মুক্তা-খচিত মসনদে, উজ্জ্বল হীরকাদি-খচিত গন্ধপাত্রে, শেঠদিগের কণ্ঠবিলম্বিত স্থূলোজ্জ্বল মুক্তাহারে,—আর নর্ত্তকীর প্রকোষ্ঠ, কণ্ঠ, কেশ এবং কর্ণের আভরণে জ্বলিতেছিল। তাহার সঙ্গে মধুর গীতশব্দ উঠিয়া উজ্জ্বল মধুরে মিশাইতেছিল। যখন নৈশ নীলাকাশে চন্দ্রোদয় হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে, যখন সুন্দরীর সজল নীলেন্দীবর লোচনে বিদ্যুচ্চকিত কটাক্ষ বিক্ষিপ্ত হয়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে; যখন স্বচ্ছ নীল সরোবরশায়িনী উন্মেষোন্মুখী নলিনীর দলরাজি, বালসূর্য্যের হেমোজ্জ্বল কিরণে

বিভিন্ন হইতে থাকে, নীল জলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঊর্মিমালার উপরে দীর্ঘ রশ্মি সকল নিপতিত হইয়া পদ্মপত্রস্থ জলবিন্দুকে জ্বালিয়া দিয়া, জলচর বিহঙ্গকুলের কলকণ্ঠ বাজাইয়া দিয়া, জলপদ্মের ওষ্ঠাধর খুলিয়া দেখিতে যায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে, আর যখন তোমার গৃহিণীর পাদপদ্মে, ডায়মনকাটা মল-ভানু লুটাইতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন সন্ধ্যাকালে, গগনমণ্ডলে সূর্যতেজ ডুবিয়া যাইতেছে দেখিয়া নীলিমা তাহাকে ধরিতে ধরিতে পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়ায়, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে,—আর যখন, তোমার গৃহিণী কর্ণাভরণ দোলাইয়া তিরস্কার করিতে করিতে তোমার পশ্চাদ্ধাবিত হন, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন চন্দ্রকিরণ-প্রদীপ্ত গঙ্গাজলে বায়ু প্রপীড়নে সফেন তরঙ্গ উৎক্ষিপ্ত হইয়া চাঁদের আলোতে জ্বলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন স্পার্ক্লিং শ্যাম্পেন তরঙ্গ তুলিয়া স্ফটিক পাত্রে জলিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে দক্ষিণবায়ু মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে—আর যখন সন্দেশময় ফলাহারের পাতে, রজতমুদ্রা দক্ষিণা মিলে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে। যখন প্রাতঃসূর্যকিরণে হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বসন্তের কোকিল ডাকিতে থাকে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে আর যখন প্রদীপমালার আলোকে রত্নাভরণে ভূষিত হইয়া, রমণী সঙ্গীত করে, তখন উজ্জ্বলে মধুরে মিশে।

উজ্জ্বলে মধুরে মিশিল—কিন্তু শেঠদিগের অন্তঃকরণে তাহার কিছুই মিশিল না। তাহাদের অন্তঃকরণে মিশিল গুরগন খাঁ।'

এখানেও তাঁর এক ধরনের প্রগল্‌ভতার লক্ষণ বিদ্যমান,—কিন্তু এ ঠিক মধুরে-ভয়ানকে সমাবেশ নয়। তাঁর নিজের কথায়—উজ্জ্বলে, মধুরে মিশিল! 'মৃণালিনী'তে এই একই ব্যাপার দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদের নাম 'মোহিনী'। সে-পরিচ্ছেদে, পশুপতি অতৃপ্ত নয়নে মনোরমার রূপ নিরীক্ষণ করেন।

'সেই রত্নপ্রদীপদীপ্ত দেবমন্দিরে, চন্দ্রালোকবিভাসিত দ্বারদেশে, মনোরমাকে দেখিয়া, পশুপতির হৃদয় উচ্ছ্বাসোন্মুখ সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হইয়া উঠিল।

মনোরমার বয়স যতই হউক না কেন, তাঁহার রূপরাশি অতুল—চক্ষুতে ধরে না !'

ক্ষণে ক্ষণে পাঠককে সম্বোধন ক'রে,—সরস বর্ণনাভঙ্গির ওপর নির্ভর ক'রে,—কখনো উপযুক্ত বাক্‌সংযমে,—কখনো বা স্বভাবগত প্রগল্‌ভতায় আত্মসমর্পণ ক'রে 'মৃণালিনী'তেও বঙ্কিমচন্দ্র একটি চিত্তাকর্ষক কাহিনী পরিবেষণ ক'রে গেছেন। তাঁর কয়েকটি বিশেষত্বের উদাহরণ আগেও যেমন দেখা গেছে, 'মৃণালিনী'তেও তেমনি বিদ্যমান। তাঁর অন্যান্য উপন্যাসের আলোচনাসূত্রে আরো কোনো কোনো বিশেষত্ব দেখা যাবে। যেমন, তাঁর সন্ন্যাসী-চরিত্রগুলি,—তাঁর হাস্য-পরিহাস ইত্যাদি। আপাততঃ 'মৃণালিনী'-কাহিনীর দিকে নজর ফেরানো যাক্।

পিতৃশত্রু বখতিয়ার খিলিজীকে ক্রুদ্ধ হস্তীর আক্রমণ থেকে বাঁচিয়ে,—মৃণালিনীর সঙ্গে সাক্ষাতের বাসনায়,—গুরু মাধবাচার্যের নিষেধ সত্ত্বেও,—মগধ-রাজপুত্র, বীর যুবক হেমচন্দ্র দিল্লী থেকে মথুরায় যান! কিন্তু গুরুর কৌশলেই মৃণালিনীকে মথুরা থেকে সরিয়ে, লক্ষ্মণাবতী নগরীর এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের বাড়িতে আনা হয়। তাই হেমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ সম্ভব হয় নি। গ্রন্থসূচনার সঙ্গে-সঙ্গে, প্রথম পরিচ্ছেদেই লেখক এসব কথা জানিয়ে দেন। মাধবাচার্যের সঙ্গে প্রয়াগতীর্থে হেমচন্দ্রের যে সাক্ষাতের দৃশ্যটি দেখা গেছে, সেই দৃশ্যেই মাধবাচার্য তাঁর শিষ্যকে বলেন—'তুমি দেবকার্য না সাধিলে কে সাধিবে?...একবার তুমি মৃণালিনীর আশায় মথুরায় বসিয়াছিলে বলিয়া তোমার বাপের রাজ্য হারাইয়াছ; যবনাগমন কালে হেমচন্দ্র যদি মথুরায় না থাকিয়া মগধে থাকিত, তবে মগধ জয় কেন হইবে?...যেখানে থাকিলে তুমি মৃণালিনীকে পাইবে না, আমি তাহাকে সেইখানে রাখিয়াছি।' এ কথায় হেমচন্দ্র উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন—'আপনার দেবকার্য উদ্ধার করুন; আমি এই পর্যন্ত।' মাধবাচার্য তাঁকে পরীক্ষা করবার জন্যেই বলেন—'আর যদি মৃণালিনী মরিয়া থাকে?' হেমচন্দ্র বলেন—'যে মৃণালিনীর বধকর্তা, সে আমার বধ্য। এই শরে গুরুহত্যা, ব্রহ্মহত্যা উভয় দুষ্ক্রিয়া সাধন করিব'।

কিন্তু, মৃণালিনী যে সত্যিই জীবিত আছেন, কেবল সেই খবরটুকু জানিয়ে, মাধবাচার্য তাঁকে তখনি আশ্রম থেকে চলে যেতে বলেন! অনুচর দিগ্বিজয়কে সঙ্গে নিয়ে হেমচন্দ্র চলে যান; কিন্তু অচিরেই আবার ফিরে আসেন। ফিরে

প্রশ্নে, গুরুকে বলেন—'আপনি যাহা বলিবেন, তাহাই স্বীকার করিব। মৃণালিনী কোথায় আছে আজ্ঞা করুন।' তখন গুরু বলেন—'তুমি সত্যবাদী—আমার আজ্ঞাপালন করিতে স্বীকার করিলে, ইহাতেই আমি সন্তুষ্ট হইলাম। গৌড়নগরে এক শিষ্যের বাড়িতে মৃণালিনীকে রাখিয়াছি। তোমাকেও সেই প্রদেশে যাইতে হইবে। কিন্তু তুমি তাহার সাক্ষাৎ পাইবে না। শিষ্যের প্রতি আমার বিশেষ আজ্ঞা আছে যে, যতদিন মৃণালিনী তাঁহার গৃহে থাকিবে, ততদিন সে পুরুষান্তরের সাক্ষাৎ না পায়।'

এদিকে মাধবাচার্য গণনায় জেনেছেন যে, বাংলাদেশ থেকেই যবন-সাম্রাজ্যের ধ্বংস শুরু হবে, এবং—'যখন পশ্চিমদেশীয় বণিক বঙ্গরাজ্যে অস্ত্রধারণ করিবে, তখন যবনরাজ্য উৎসন্ন হইবেক।' হেমচন্দ্রই সেই বণিক,—কারণ, মৃণালিনীর আশায় একদা মথুরায় বণিকের ছদ্মবেশেই তিনি অনেক-দিন কাটিয়েছিলেন।

হেমচন্দ্রকে গৌড়ে উপস্থিত থাকবার আদেশ দিয়ে, মাধবাচার্য জানান যে, তিনি নিজেও নবদ্বীপ অভিমুখে চলেছেন,—শিষ্যের সঙ্গে তাঁর আবার সেখানেই দেখা হবে।

প্রথম পরিচ্ছেদে এইভাবে এ-উপন্যাসের নায়ক নায়িকাকে দেখিয়ে দিয়ে এবং এ-কাহিনীর অন্তর্ভুক্ত যুদ্ধবিগ্রহের পূর্বাভাস দিয়ে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে লক্ষ্মণাবতী-নিবাসী দরিদ্র ব্রাহ্মণ হৃষীকেশের অন্তঃপুরে হৃষীকেশের কন্যা মণিমালিনী আর হেমচন্দ্রের বাঞ্ছিতা মৃণালিনীর সখী-সম্পর্কের পরিচায়ক একটি দৃশ্য দেখানো হয়েছে। মৃণালিনী প্রশ্ন করেন—'তুমি কুমারী হইয়া কি প্রকারে পুরুষের সহিত গোপনে প্রণয় করিতে?' মৃণালিনী বলেন—'তিনি আমার স্বামী। তিনি ভিন্ন অন্য কেহ কখনও আমার স্বামী হইবে না।' বান্ধবীর কাছে মৃণালিনীর এই আত্মকথার মধ্যেই, বঙ্কিম মাধবাচার্যের প্রতিশ্রুতিটি পাঠককে জানিয়ে দেবার সুযোগ নিয়েছেন। মৃণালিনীকে মাধবাচার্য বলেন: একবৎসর পরে আমি তোমার পিতার নিকট তোমাকে আনিয়া দিব। আর সে সময়ে হেমচন্দ্র যে অবস্থায় থাকুন, তোমার সঙ্গে তাঁহার বিবাহ দেওয়াইব, ইহা সত্য করিলাম।'

দুই সখীর এই আলাপের মধ্যেই গিরিজায়ার পূর্বোক্ত 'মথুরাবাসিনী, মধুরহাসিনি' গানের দৃশ্যটি দেখা দেয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, এইগানেরমাধ্যমেই

হেমচন্দ্রের দূতীর ভূমিকায় গিরিজায়া এসে হেমচন্দ্রের ব্যাকুলতার খবর শুনিয়ে গেছে, আবার মৃণালিনীরও খবর নিয়ে গেছে। সকলের অগোচরে মৃণালিনী সেই ভিখারিনী গায়িকাকে বলেন—আমার ধৈর্য রহিতেছে না, কালি পর্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিব না; তুমি আজ রাত্রে প্রহরেকের সময় আসিয়া এই গৃহের উত্তর দিকে প্রাচীরমূলে অবস্থিতি করিও; তথায় আমার সাক্ষাৎ পাইবে। তোমার বণিক যদি আসেন, সঙ্গে আনিও।' এই মৃদুভাষিত গোপন পরামর্শের আগেই গানে তিনি তাঁর আত্মকথা জানিয়েছেন :

কণ্টকে গঠিল বিধি, মৃণাল অধমে
জলে তারে ডুবাইল পীড়িয়া মরমে ॥
রাজহংস দেখি এক নয়নরঞ্জন
চরণ বেড়িয়া তারে করিল বন্ধন ॥
বলে হংসরাজ কোথা করিবে গমন
হৃদয়কমল মোর, তোমার আসন ॥
আসিয়া বসিল হংস হৃদয়কমলে
কাঁদিল কন্টক সহ মৃণালিনী জলে ॥
হেনকালে কাল মেঘ উঠিল আকাশে
উড়িল মরালরাজ মানস বিলাসে ॥

তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদের এই গানগুলির মধ্যে,—এবং আরো পরে, দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে,—তৃতীয় খণ্ডের চতুর্থ ও অষ্টম পরিচ্ছেদে গানে-গানে একদিকে যেমন ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য এবং পুরোনো যুগের বাংলা কবিতার অনুরাগী বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় আছে,—অন্যদিকে তেমনি আবার এগুলির অনুভবসূত্রে মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা কাব্য' এবং রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলীর' প্রেরণার পূর্ব-ইতিহাস কতকটা অনুমান করবার সূত্র পাওয়া যায়! ব্রজবুলী পদের গভীর আবেদনের বেদনা, আর—কবিওয়ালাদের অনুপ্রাস-প্রীতি এবং শব্দক্রীড়ার তারল্যের স্মৃতি একই সঙ্গে মনে পড়ে। এ-পরিচ্ছেদের একেবারে শেষদিকে, মণিমালিনী যখন জিগেস করেন—'সই ভিখারিনীকে কানে কানে কি বলিতেছিলে?'—তখন মৃণালিনী বলেন :

'কি বলিব সই—
সই মনের কথা সই, সই মনের কথা সই—'

এ যেন রাম বসুর বা দাশরথি রায়ের অনুপ্রাস-প্রগল্‌ভতার প্রতিধ্বনি !

রাজপুত্রের সঙ্গে মৃণালিনীর এই প্রণয়-কাহিনীর পাশে—চতুর্থ পরিচ্ছেদে দিগ্বিজয়-গিরিজায়ার প্রেমের কাহিনী এসে যোগ দেয়। তখন লক্ষ্মণাবতী নগরীর অন্য এক অঞ্চলে সর্বধন বণিকের বাড়িতে হেমচন্দ্রের বাস। মৃণালিনীর খবর নিয়ে, গান গাইতে-গাইতে হেমচন্দ্রের সেই বাসস্থানে গিয়ে পৌঁছোয় গিরিজায়া। পথে দিগ্বিজয়ের সঙ্গে তার দেখা হয়। পরিহাস ক'রে 'দিগ্বিজয়' নামটির সে বিকৃত উচ্চারণ করে। এই বিকৃত 'দিল্বিজয়' উচ্চারণে এবং গিরিজায়া-দিগ্বিজয়ের পরিহাসব্যঞ্জক সংলাপে রাজ-পরিচারক ও সুরসিকা ভিখারিনীর প্রার্থনা ও প্রত্যাখ্যান সরস হয়ে ওঠে। তারপর পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মৃণালিনীর খবর জেনে,—বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের কথায়—'মেঘমুক্ত সূর্যের ন্যায়' হেমচন্দ্র প্রফুল্ল হয়ে ওঠেন। মৃণালিনীর বাসস্থানের খবর জানতে পারেন তিনি,—তাছাড়া সেইদিন এক-প্রহর রাত্রে গিরিজায়া তাঁকে মৃণালিনীর কাছে নিয়ে যাবারও ভরসা দেয়। কিন্তু আগ্রহ দমন ক'রে, গিরিজায়ার হাতে মৃণালিনীর উদ্দেশে হেমচন্দ্র চিঠি পাঠান,—গিরিজায়াকে বলেন—'মৃণালিনীর সহিত সাক্ষাতে আমার এখন অধিকার নাই। তুমি রাত্রে কথামত তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে এবং এই পত্র তাঁহাকে দিবে। কহিবে, দেবতা প্রসন্ন হইলে অবশ্য শীঘ্র বৎসরেকের মধ্যে সাক্ষাৎ হইবে। মৃণালিনী কি বলেন, আজ রাত্রেই আমাকে বলিয়া যাইও।'

এই দৃশ্যে, গিরিজায়া নিষ্ক্রান্ত হবার পরেই মাধবাচার্যের অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটে। শিষ্যের সত্যপালনে তিনি সন্তুষ্ট হন বটে, কিন্তু তাঁর নির্দেশ কঠোর !—'এখানে তোমার আর বিলম্ব করা হইবে না। মৃণালিনীর প্রত্যুত্তরের প্রতীক্ষা করা হইবেনা। বেগবান্ হৃদয়কে বিশ্বাস নাই। আমি আজি নবদ্বীপে যাত্রা করিব। তোমাকে আমার সঙ্গে যাইতে হইবে।'

দৈবাধীন মানব-জীবনে এই অপ্রত্যাশিত ধারা-পরিবর্তনের বাস্তবতা দেখিয়ে দিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এইভাবে তাঁর উপন্যাসে প্লটের চমৎকারিত্ব ঘটান। হেমচন্দ্রকে গুরুর অনুগমন করতে হয়। প্রণয়ী-যুগলের প্রতীক্ষার অন্য প্রান্তে দুর্যোগের ঘনঘটা দেখা দেয় সপ্তম পরিচ্ছেদে। গিরিজায়া সে-রাত্রে মৃণালিনীর সঙ্গে দেখা ক'রে হেমচন্দ্রের চিঠি পৌঁছে দেয়। আলো জ্বালাবার উপকরণ ছিল তার কাছে। সেই আলোতে চিঠি প'ড়ে, মৃণালিনী তাঁর উত্তর

জানাতে গিয়ে শোনেন যে, মাধবাচার্য হঠাৎ এসে হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপে নিয়ে গেছেন! ক্ষুব্ধ হয়ে তিনি বলেন—'মাধবাচার্য আমার কাল'! গিরিজায়া বিদায় নিয়েও তখনি কিন্তু চলে যায়না!

সেই রাত্রেই হৃষীকেশের দুশ্চরিত্র পুত্র ব্যোমকেশের আক্রমণ থেকে মৃণালিনী আত্মরক্ষা করেন বটে,—কিন্তু তাঁর পদাঘাতে এবং গিরিজায়ার দংশনে আহত ব্যোমকেশ বলে—'মৃণালিনী অভিসারে গমন করিয়াছিল, আমি তাহাকে ধৃত করিয়াছি বলিয়া সে আমার পৃষ্ঠে দংশন করিয়াছে।' এই অভিযোগ শুনে, মৃণালিনীর ঘরে এসে হৃষীকেশ তাঁকে 'কুলটাবৃত্তি'র জন্যে তিরস্কার করেন। পঞ্চম থেকে কাহিনী ইতিমধ্যে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পৌঁছোয়। মৃণালিনী বলেন—'আমার কুলটাবৃত্তি যে বলে, সে মিথ্যাবাদী।' উত্তেজিত হৃষীকেশ তাঁকে তাড়িয়ে দেন। কন্যা মণিমালিনীর কাছে বিদায় নেবারও সুযোগ দেন না তিনি। মণিমালিনী কিন্তু নিজের ভাইকে চিনতেন! তার দুষ্কর্মের জন্যে তিরস্কার করছিলেন তিনি,—ইতিমধ্যে মৃণালিনীকে কাঁদতে-কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে তিনি বলেন—'সর্বনাশ! বাবা কি বলিতে না জানি কি বলিয়াছেন।' কিন্তু বান্ধবীকে আর ফেরানো সম্ভব হয় না।

মৃণালিনীর সেই অভিমানাহত মূর্তির ছবিটি সুন্দর,—'পর্বত সানুবাহী শিলাখণ্ডের ন্যায় অভিমানিনী সাধ্বী চলিয়া গেলেন।' হৃষীকেশের আশ্রয় থেকে মৃণালিনীর এই বিদায়-দৃশ্যেই প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি। আর, এই দুর্যোগের মধ্যেও পরিহাসের লঘু, উজ্জ্বল, কয়েকটি আলোক-রেখার উদ্ভাসন-সংযোগও লক্ষণীয়। সেই তীব্র আঘাতের পরে, গিরিজায়ার সংক্ষিপ্ত কয়েকটি উক্তিতে ব্যোমকেশকে দংশনের বৃত্তান্ত জানা যায়,—সমুচিত বিদ্রূপের সঙ্গে অবলার আত্মরক্ষার কৌশলও ব্যক্ত হয়:

> [মৃণালিনী] 'বাহিরে আসিয়া দেখিলেন, পূর্বসংকেতস্থানে গিরিজায়া দাঁড়াইয়া আছে। মৃণালিনী তাহাকে দেখিয়া কহিলেন, 'তুমি এখনও দাঁড়াইয়া কেন?'
>
> গি। আমি যে তোমাকে পলাইতে বলিয়া আসিলাম। তুমি আইস না আইস—দেখিয়া যাইবার জন্য দাঁড়াইয়া আছি।
>
> মৃ। তুমি কি ব্রাহ্মণকে দংশন করিয়াছিলে?
>
> গি। তা ক্ষতি কি? বামুন বৈ ত গরু নয়?

মৃ। কিন্তু তুমি যে গান করিতে করিতে চলিয়া গেলে শুনিলাম?

গি। তারপর তোমাদের কথাবার্তার শব্দ শুনিয়া ফিরিয়া দেখিতে আসিয়াছিলাম। দেখে মনে হোলো, মিন্সে আমাকে একদিন 'কালা পিঁপড়ে' বলে ঠাট্টা করেছিল। সে দিন হুল ফুটানটা বাকি ছিল। সুযোগ পেয়ে বামুনের ঋণ শোধ দিলাম।...'

মৃণালিনী সে-রাত্রে গিরিজায়ার কুটীরে আশ্রয় পান। স্থির হয়, পরদিন তিনি নবদ্বীপ যাত্রা ক'রবেন। গিরিজায়া তাঁর সঙ্গে যেতে চান,—কারণ,—'রাজধানীতে ভিক্ষা বিস্তর!' 'মৃণালিনী'র এই দুই নারী-চরিত্রের সখিত্বের এই নিবিড় বন্ধন বিশেষ স্মরণীয় এক দিক।

দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনাতেই গৌড়েশ্বরের সভা-বর্ণনা,—আর, শেষ অংশে কতকটা নিজের অনুসন্ধানের ফলে, কতকটা মনোরমার পরামর্শ অনুসারে অনুসন্ধানসূত্রে—আসন্ন যুদ্ধায়োজন সম্বন্ধে হেমচন্দ্রের তথ্য-লাভ,—এবং শত্রু-শিবিরের পথে এগিয়ে শান্তশীল ও তার অনুচরদের অস্ত্রাঘাতে তাঁর বিপন্ন অবস্থার বর্ণনা দেখা যায়। দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের সেই সভা-বর্ণনার ভাষা-রীতিটি বিশিষ্ট। এই ধরনের বিভিন্ন বর্ণনা তাঁর উপন্যাসের অন্যতম বিশেষত্ব। তবে, সর্বত্র কেবল রাজসভার বর্ণনাই নয়,—ভিন্ন ভিন্ন কাহিনীর ভিন্ন ভিন্ন প্রসঙ্গ,—এবং এই প্রসঙ্গভেদ অনুসারে তাঁর বর্ণনীয় বিষয়েরও পরিবর্তন হয়। 'মৃণালিনী'তে যেমন গৌড়েশ্বরের সভাবর্ণনা, 'রাজসিংহ' উপন্যাসে তেমনি দেখা যায় প্রাচীন দিল্লীর চাঁদনী-চকের বর্ণনা। এদিক থেকে 'মৃণালিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের সঙ্গে 'রাজসিংহে'র দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের সাদৃশ্য বিবেচ্য। এই তুলনার সম্ভাবনা মনে রেখে, 'মৃণালিনী'র দ্বিতীয় খণ্ডের সূচনা-অনুচ্ছেদটি স্মরণীয়:

'অতি বিস্তীর্ণ সভামণ্ডপে নবদ্বীপোজ্জ্বলকারী রাজাধিরাজ গৌড়েশ্বর বিরাজ করিতেছেন। উচ্চ শ্বেতপ্রস্তরের বেদির উপরে রত্নপ্রবাল-বিভূষিত সিংহাসনে, রত্নপ্রবালমণ্ডিত ছত্রতলে বর্ষীয়ান্ রাজা বসিয়া আছেন। শিরোপরি কনককিঙ্কিণী সংবেষ্টিত বিচিত্র কারুকার্যখচিত শুভ্র চন্দ্রাতপ শোভা পাইতেছে। একদিকে

> পৃথগাসনে হোমাবশেষ-বিভূষিত, অনিন্দ্যমূর্তি ব্রাহ্মণমণ্ডলী সভাপণ্ডিতকে পরিবেষ্টন করিয়া বসিয়া আছেন। যে আসনে একদিন হলায়ুধ উপবেশন করিয়াছিলেন, সে আসনে এক্ষণে এক অপরিণামদর্শী চাটুকার অধিষ্ঠান করিতেছিলেন। অন্যদিকে মহামাত্য ধর্মাধিকারকে অগ্রবর্তী করিয়া প্রধান রাজপুরুষেরা উপবেশন করিয়াছিলেন। মহামাত্য, মহাকুমারামাত্য, প্রমাতা, ঔপরিক, দাসাপরাধিক, চৌরোদ্ধরণিক, শৌল্কিক, গৌল্মিকগণ, ক্যত্রপ, প্রান্তপালেরা, কোষ্ঠপালেরা, কাণ্ডারিক্য, তদাযুক্তক, বিনিযুক্তক প্রভৃতি সকলে উপবেশন করিতেছেন। স্তাবকেরা উভয় পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। সর্বজন হইতে পৃথগাসনে কুশাসনমাত্র গ্রহণ করিয়া পণ্ডিতবর মাধবাচার্য উপবেশন করিয়া আছেন।'

এই সভায় শত্রুদমনের কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, সে-বিষয়ে মাধবাচার্য রাজাকে প্রশ্ন করেন। বর্ষীয়ান রাজা সব কথা শুনতে পান না। পশুপতি নিজের সুবিধা অনুসারে সে-আলোচনা স্থগিত রাখতে বা চাপা দিতে চান। মাধবাচার্য কিন্তু তাতে নারাজ। তিনি আরো উঁচু স্বরে বলেন: 'মহারাজ, তুরকীয়েরা আর্যাবর্ত প্রায় সমুদয় হস্তগত করিয়াছে। আপাততঃ তাহারা মগধ জয় করিয়া গৌড়রাজ্য আক্রমণের উদ্যোগে আছে।'

রাজা সে-কথা শুনতে পান। কিন্তু নিজের বার্ধক্যে এবং পশুপতির বঞ্চনায় চারদিকের পরিবেশ তাঁর প্রায় অজানা! দুর্যোগের খবর রাখেন না তিনি। তিনি জিগেস করেন: 'তুরকীদিগের কথা বলিতেছেন? তুরকীয়েরা কি আসিয়াছে?' তিনি পুনরপি বলেন: 'আমি কি করিব—আমি কি করিব? আমার এই প্রাচীন শরীর, আমার যুদ্ধের উদ্যোগ সম্ভবে না।'

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই এইভাবে দেশে তুর্কী আগমনের আসন্ন সম্ভাবনা এবং গৌড়ের শোচনীয় অপ্রস্তুতির ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজা বলেন—'আমার এক্ষণে গঙ্গালাভ হইলেই হয়। তুরকীয়েরা আসে আসুক। দেশের রাজার এই অসহায় ভাব দেখে সমস্ত সভা স্তব্ধ হয়। ঔপন্যাসিক তারই মধ্যে জানান—'কেবল মহাসামন্তের কোষমধ্যস্থ অসি অকারণ ঈষৎ ঝনৎকার শব্দ করিল। অধিকাংশ শ্রোতৃবর্গের মুখে কোন ভাবই ব্যক্ত হইল না। মাধবাচার্যের চক্ষু হইতে একবিন্দু অশ্রুপাত হইল।' আর,

সভাপণ্ডিত দামোদর মাধবাচার্যকে সম্বোধন ক'রে বলেন—'আচার্য, আপনি কি ক্রুদ্ধ হইলেন? যেরূপ রাজাজ্ঞা হইল, ইহা শাস্ত্রসঙ্গত। শাস্ত্রে ঋষিবাক্য আছে যে, তুরকীয়েরা এদেশ অধিকার করিবে। শাস্ত্রে আছে অবশ্য ঘটিবে—কাহার সাধ্য নিবারণ করে? তবে যুদ্ধোদ্যমে প্রয়োজন কি?'

এই ভয়াবহ মূঢ়তা আর অপরিণামদর্শিতার বিরুদ্ধে একা মাধবাচার্য এ-পরিচ্ছেদে উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন। মূর্খ দামোদরের সঙ্গে মাধবাচার্যের সামান্য কথা-কাটাকাটি হয়। দামোদরের অনুচররা তার পক্ষে যোগ দেয়। একজন পারিষদকে মাধবাচার্য বলেন: মূর্খ তিনজন। যে আত্মরক্ষায় যত্নহীন, যে সেই যত্নহীনতার প্রতিপোষক, আর যে আত্মবুদ্ধির অতীত বিষয়ে বাক্যব্যয় করে, ইহারাই মূর্খ। আপনি ত্রিবিধ মূর্খ।'

এই ক্রোধ-ক্ষোভ-নৈরাশ্যের আবহেই হঠাৎ পশুপতি বলে ওঠেন: 'যবন আইসে, আমরা যুদ্ধ করিব'।

মাধবাচার্য তখন নবদ্বীপে হেমচন্দ্রের উপস্থিতির খবর জানিয়ে দেন। হেমচন্দ্রের নিজের রাজ্যে,—মগধে—তিনি উপস্থিত ছিলেন না বলেই সে-দেশ যবন কর্তৃক অধিকৃত হয়েছে, এবং—গৌড়রাজ তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন ক'রে সম্মিলিতভাবে তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজন করলেই মঙ্গল,—মাধবাচার্যের এই প্রস্তাব শুনে পশুপতি বলেন—'রাজবল্লভেরা অদ্যই তাঁহার পরিচর্যায় নিযুক্ত হইবে। তাঁহার নিবাসার্থ যথাযোগ্য বাসগৃহ নির্দিষ্ট হইবে। সন্ধিনিবন্ধনের মন্ত্রণা যথাযোগ্য সময়ে স্থির হইবে।' এই ঘোষণাতেই প্রথম পরিচ্ছেদ শেষ হয়। অতঃপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এ-উপন্যাসের প্রধান নারী-চরিত্রের অন্যতমা মনোরমা এসে দেখা দেন! আর, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পৌঁছে পশুপতির পরিচয় পাওয়া যায়!

নবদ্বীপের এক প্রান্তে গঙ্গাতীরবর্তী যে অট্টালিকায় হেমচন্দ্রের বাসের আয়োজন হয়, সেই প্রাসাদেই জনার্দন নামে এক অতিবৃদ্ধ, অসহায়, দরিদ্র ব্রাহ্মণ, তাঁর স্ত্রী, এবং পৌত্রী মনোরমার সঙ্গে বাস করতেন। বৃদ্ধ গৌড়েশ্বরের মতন ব্রাহ্মণ জনার্দনও কানে শুনতে পান না। জনার্দন গৃহহীন হয়ে, অতি দুরবস্থায় প'ড়ে, সে-বাড়িতে বাস ক'রতে এসেছিলেন। রাজপুত্র হেমচন্দ্র সেখানে আসছেন শুনে তিনি অন্যত্র যাবার আয়োজন করেন। কিন্তু হেমচন্দ্রের অনুরোধে তিনি সেই বাড়িতেই থেকে যান। প্রথম সাক্ষাতে

হেমচন্দ্র সামান্য কয়েকটি কথা বলেই তাঁর শ্রুতিশক্তির দৈন্য বুঝতে পারেন। বধিরের সঙ্গে আলাপ অসম্ভব জেনে তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে—

> 'পশ্চাৎ হইতে কে তাঁহার উত্তরীয় ধরিয়া টানিল। হেমচন্দ্র ফিরিয়া দেখিলেন, দেখিয়া প্রথম মুহূর্তে তাঁহার বোধ হইল, সম্মুখে একখানি কুসুমনির্মিতা দেবীপ্রতিমা। দ্বিতীয় মুহূর্তে দেখিলেন প্রতিমা সজীব ; তৃতীয় মুহূর্তে দেখিলেন, প্রতিমা নহে, বিধাতার নির্মাণকৌশলসীমারূপিণী বালিকা অথবা পূর্ণযৌবনা তরুণী।'

সুন্দরী নায়িকার এই আবির্ভাবের দৃশ্যে আবার রোম্যান্সের চমক! প্রথম পরিচয়েই মনোরমার সারল্য সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। হেমচন্দ্র আত্মপরিচয় দিয়ে মনোরমাকে জানান যে, সেই বাড়িতেই জনার্দন এবং পরিবারের অন্যান্য সকলেই থাকতে পারেন। তাঁদের অন্যত্র যাবার দরকার নেই।

সে প্রস্তাব শুনে মনোরমা জিগেস করেন—'কেন'?

হেমচন্দ্রের সঙ্গে মনোরমার ভাই-বোন সম্পর্কের সূচনা তাঁদের এই প্রথম পরিচয়ে,—দ্বিতীয় খণ্ডের এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই।

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আবার মৃণালিনীর প্রসঙ্গ। নদীপথে গিরিজায়ার সঙ্গে মৃণালিনী চলেছেন নবদ্বীপে। গিরিজায়ার সঙ্গে মৃণালিনীর সংলাপ অনুসরণ ক'রে এই তৃতীয় পরিচ্ছেদে জানা যায় যে, এক বছরের মধ্যে হেমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁর ব্রতভঙ্গ ঘটাবার অভিপ্রায় নেই মৃণালিনীর। তিনি বলেন—'তিনি আমাকে দেখিতে পাইবেন না। কিন্তু আমি তাঁহাকে দেখিব। তাঁহাকে দেখিতেই যাইতেছি।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদে আবার মনোরমা-প্রসঙ্গ। হেমচন্দ্রের মনে তখন মনোরমার অদ্ভুত প্রকৃতির রহস্য-ভাবনা! সেই উপবনগৃহে অবস্থানকালেই এক রাত্রে হেমচন্দ্রের দৃষ্টিতে বঙ্গে তুরস্ক আগমনের ছায়া ধরা পড়ে। এ পরিচ্ছেদের নাম 'বাতায়নে'। গভীর রাত্রে ঘরের জানলায় দাঁড়িয়ে হেমচন্দ্র তুরকের ছায়া দেখেছিলেন। মাধবাচার্য তাঁকে সেই বাড়িতে অধিষ্ঠিত দেখে দেশ-ভ্রমণে যান। গৌড়ের অধীনস্থ সমস্ত রাজাকে গৌড়েশ্বরের আনুকূল্য করবার জন্যে সম্মিলিত করাই তাঁর অভিপ্রায় ছিল। হেমচন্দ্র তাঁরই প্রত্যাবর্তনের প্রতীক্ষায় দিন যাপন করেন। মনোরমার সম্বন্ধে তাঁর মনে

নানা প্রশ্ন জাগে : 'মনোরমা কি অদ্যাপি কুমারী?' কিন্তু সে-কথার স্পষ্ট উত্তর পাননি তিনি। মনোরমাকে তিনি তার শ্বশুরবাড়ির কথা জিগেস করেন। মনোরমা উত্তর দেয় : 'বলিতে পারি না'। মাধবাচার্যের প্রতীক্ষায় এবং মনোরমার চিন্তায়,—এইভাবে সেই উপবনগৃহে নায়কের নৈষ্কর্ম্যের দিনগুলি কেটে যায়। সেই সময়েই একরাত্রে প্রকৃতির আশ্চর্য শোভা দেখতে-দেখতে পূর্বোক্ত তুরক সৈন্যের ছায়া দেখতে পান তিনি :

> 'একদা প্রদোষকালে তিনি শয়নকক্ষে পর্যঙ্কোপরি শয়ন করিয়া মৃণালিনীর চিন্তা করিতেছিলেন। চিন্তাতেও হৃদয় সুখলাভ করিতেছিল। মুক্ত বাতায়ন-পথে হেমচন্দ্র প্রকৃতির শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। নবীন শরদুদয়। রজনী চন্দ্রিকাশালিনী, আকাশ নির্মল, বিস্তৃত, নক্ষত্র-খচিত, ক্বচিৎ স্তরপরম্পরাবিন্যস্ত শ্বেতাম্বুদ-মালায় বিভূষিত। বাতায়ন-পথে অদূরবর্তিনী ভাগীরথীও দেখা যাইতেছিল; ভাগীরথী বিশালোরসী, বহুদূরবিসর্পিণী, চন্দ্রকর-প্রতিঘাতে উজ্জ্বলতরঙ্গিণী, দূরপ্রান্তে ধূমময়ী, নববারি-সমাগম-প্রহ্লাদিনী।'

প্রকৃতি-বর্ণনার এই ভাষাভঙ্গিও আকস্মিক নয়। কখনো চরিত্র-বর্ণনায়, কখনো পরিবেশ বর্ণনায় ভাষার এই অনুভূতি-সমৃদ্ধ সমারোহভঙ্গি এর আগে 'দুর্গেশনন্দিনী'তে, 'কপালকুণ্ডলাতে'ও দেখা গেছে। গল্পবস্তুর প্রবাহে আসন্ন এক গুরু ঘটনার ছায়া পড়েছে ইতিমধ্যে। প্রকৃতির মুক্ত শোভা,—নদীর আশ্চর্য সৌন্দর্য,—চন্দ্রালোকের সুদূরপরিব্যাপ্তি,—এবং তারই মধ্যে তিনি হঠাৎ দেখতে পান :

> 'অকস্মাৎ বাতায়নপথ অন্ধকার হইল—চন্দ্রালোকের গতি রোধ হইল। হেমচন্দ্র বাতায়ন-সন্নিধি একটি মনুষ্যমুণ্ড দেখিতে পাইলেন। ...মুখখানি অতি বিশাল শ্মশ্রুসংযুক্ত, তাহার মস্তকে উষ্ণীষ।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদের এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে সেই উপবনগৃহে হেমচন্দ্রের সুখের দিন শেষ হয়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে দেখা যায়, তিনি সেই একটি তুরকসেনা দেখেই স্থির ক'রেছেন—'হয় তুরকসেনা নগরসন্নিধানে উপস্থিত হইয়া লুক্কায়িত আছে, নতুবা এই ব্যক্তি তুরকসেনার পূর্বচর।'—যথার্থ অবস্থা জানবার জন্যেই সে-রাত্রে তিনি পথে বেরিয়ে পড়েন। গ্রামের পথ নির্জন। যেতে যেতে সেই পথের পাশে সুরম্য এক পুষ্করিণীর বাঁধানো সিঁড়িতে—

'দেখিলেন, চন্দ্রালোকে সর্বাধঃস্থ সোপানে, জলে চরণ রক্ষা করিয়া শ্বেতবসনপরিধানা কে বসিয়া আছে। স্ত্রীমূর্তি বলিয়া তাঁহার বোধ হইল। শ্বেতবসনা অবেণীসম্বদ্ধকুন্তলা; কেশজাল স্কন্ধ, পৃষ্ঠদেশ, বাহুযুগল, মুখমণ্ডল, হৃদয় সর্বত্র আচ্ছন্ন করিয়া রহিয়াছে।'

এই বিস্ময়কর দৃশ্যের এই নারীই সেই মনোরমা! রোম্যান্সের আকস্মিকতার চমক এইভাবে বারে বারে দেখা দেয়!

মনোরমার বয়স কত,—তার বিবাহ হয়েছে কী না,—ইত্যাদি প্রশ্ন হেমচন্দ্রের মনে এর আগেও দেখা দিয়েছে। তার প্রতি তাঁর মনোভাব যে সহোদরের মমতার মতন, ইতিপূর্বে সে-কথাও জানা গেছে। বৃদ্ধ জনার্দন তার পিতামহ। জনার্দন বা তাঁর ব্রাহ্মণী, দুজনের একজনও কানে শুনতে পান না—দ্বিতায় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তাও দেখা গেছে। প্রথম পরিচয়ে,—অর্থাৎ সেই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদেই—লেখক জানিয়েছেন যে, হেমচন্দ্রের মনে হয়েছিল—'একি অলৌকিক সরলা বালিকা? না উন্মাদিনী?' তারপর, পঞ্চম পরিচ্ছেদের এই অদ্ভুত দৃশ্যে, সেই খাতেই, মনোরমা সম্বন্ধে কৌতূহল আরো ঘনীভূত হয়। হেমচন্দ্র সেইসব পূর্ব-প্রশ্নেরই জবাব খুঁজতে থাকেন। দু'জনের সংলাপ এ-পরিচ্ছেদের অনেকটা জায়গা জুড়েছে। হেমচন্দ্রের সশস্ত্র বেশ, আর তাঁর তলোয়ারের হীরা দেখে, পরিহাস-ভরে হেমচন্দ্রকে মনোরমা প্রশ্ন করে—'তুমি কি বিবাহ করিতে যাইতেছ?' এঁদের এইসব বাক্যালাপের পরে অচিরেই আসল কথায় পৌঁছোনো যায়। মনোরমা তুরকসৈন্য দেখেছেন,—তারা যেখানে আছে, সেই জায়গাটি দেখিয়ে দেবার জন্যে হেমচন্দ্রকে তিনি পথ দেখিয়ে নিয়ে যান। হেমচন্দ্র ভাবেন—'যবনযুদ্ধে এই বালিকা পথপ্রদর্শিনী!'

তারপর ষষ্ঠ-সপ্তম পরিচ্ছেদে গভীর ষড়যন্ত্রের আবহ!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে পশুপতির পরিচয়। তিনি গৌড়দেশের ধর্মাধিকার—অসাধারণ ব্যক্তি.—'তিনি দ্বিতীয় গৌড়েশ্বর'। তাঁর বয়স পঁয়ত্রিশ বছর, চেহারা সুশ্রী, জাতিতে ব্রাহ্মণ। শোনা যায়, শাস্ত্রব্যবসায়ী দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান তিনি। যৌবনে কাশীতে কিছুকাল পিতার কাছে শাস্ত্রপাঠ করেন। সেখানে কেশব নামে এক বাঙালী ব্রাহ্মণের আট বছর বয়সের কন্যা হৈমবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কিন্তু—'অদৃষ্টবশতঃ বিবাহের রাত্রেই

কেশব সম্প্রদানের পর কন্যা লইয়া অদৃশ্য' হয়। পশুপতি অতঃপর আর বিয়ে করেন নি।

পশুপতির পূর্ব-ইতিহাস এখানে এইটুকুই। তারপর,—সে-রাত্রে নিজের প্রাসাদের এক নিভৃত কক্ষে—হেমচন্দ্র যে তুরকসেনাকে দেখেছিলেন,—'তুরকসেনাপতির বিশ্বাসপাত্র' সেই মহম্মদ আলির সঙ্গে সংস্কৃত ভাষায় পশুপতির মন্ত্রণার দৃশ্যটি! এই গুপ্ত মন্ত্রণার দৃশ্যেই পশুপতির উচ্চাশার ইশারা পাওয়া যায়! পশুপতি বলেন:

> 'শুনুন। আমিই এক্ষণে প্রকৃত গৌড়ের ঈশ্বর, কিন্তু লোকে আমাকে গৌড়েশ্বর বলে না। আমি স্বনামে রাজা হইতে বাসনা করি। সেনবংশ লোপ হইয়া পশুপতি গৌড়াধিপতি হউক।'

মহম্মদ আলি বলেন:

> 'আপনি রাজনীতিজ্ঞের ন্যায় বিবেচনা করিয়াছেন। আপনার কথায় আমার সম্পূর্ণ প্রত্যয় জন্মিল। আমিও এইরূপ স্পষ্ট করিয়া খিলিজি সাহেবের অভিপ্রায় ব্যক্ত করি। তিনি এক্ষণে অনেক চিন্তায় ব্যস্ত আছেন যথার্থ, কিন্তু হিন্দুস্থানে যবনরাজ একেশ্বর হইবেন, অন্যরাজার নামমাত্র আমরা রাখিব না। কিন্তু আপনাকে গৌড়ে শাসনকর্তা করিব। যেমন দিল্লিতে মহম্মদ ঘোরির প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন, যেমন পূর্বদেশে কুতবউদ্দীনের প্রতিনিধি বখ্‌তিয়ার খিলিজি, তেমনি গৌড়ে আপনি বখ্‌তিয়ারের প্রতিনিধি হইবেন।'

মহম্মদ আলির প্রস্তাবে পশুপতি সম্মত হন। তিনি বলে দেন, 'পাঁচজন অনুচর লইয়া খিলিজিকে রাজপুরে প্রবেশ করিতে বলিও।' অতঃপর মহম্মদ আলি আরো একটি প্রস্তাব জানান—'এই দেশে যবনের পরম শত্রু হেমচন্দ্র বাস করিতেছে। আজ রাত্রেই তাহার মুণ্ড যবন-শিবিরে প্রেরণ করিতে হইবে।' পশুপতি এ-কথায় প্রথমে শরণাগত-হত্যার পাপ ক'রতে রাজী হন নি। কিন্তু উচ্চাশার সামনে সে-শুভ-সংকল্প ক্ষীণ হয়ে যায়! বলেছেন—'ভাল, ইহাও স্বীকার করিলাম।' নিজের উচ্চাশা আর দেশের বৃহত্তর স্বার্থ,—একযোগে দুইই ছিল। বিবেকের সঙ্গে এই রফার যন্ত্রণাতেই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের সমাপ্তি।

সপ্তম পরিচ্ছেদের সূচনাতেই চৌরোদ্ধরণিক শান্তশীলের প্রবেশ। পশুপতি

তাকে যবন-শিবিরের খবর জানতে পাঠিয়েছিলেন। শান্তশীল প্রায় পঁচিশ হাজার শত্রুসৈন্যের সমাবেশ দেখে এসেছে! মহম্মদ আলি যে অলক্ষিত ভাবে প্রবেশ করেননি, তার কাছ থেকে সে-খবরও পাওয়া যায়। পশুপতি শঙ্কিত হন। হেমচন্দ্রকে হত্যা করবার আদেশ দিয়ে শান্তশীলকে বিদায় দেবার পরেই, অষ্টভুজা দেবীপ্রতিমার কাছে তিনি নিজের গভীর কথা ব্যক্ত করেন। তাতে তাঁর আসল অভিপ্রায়ের পরিচয় পাওয়া যায়:

> 'জননি! বিশ্বপালিনি! আমি অকূল সাগরে ঝাঁপ দিলাম—দেখিও মা! আমায় উদ্ধার করিও। আমি জননীস্বরূপা জন্মভূমি কখন দেবদ্বেষী যবনকে বিক্রয় করিব না। কেবলমাত্র এই আমার পাপাভিসন্ধি যে, অক্ষম প্রাচীন রাজার স্থানে আমি রাজা হইব। যেমন কণ্টকের দ্বারা কণ্টক উদ্ধার করিয়া পরে উভয় কণ্টককে দূরে ফেলিয়া দেয়, তেমনি যবন-সহায়তায় রাজ্য লাভ করিয়া রাজ্য-সহায়তায় যবনকে নিপাত করিব। ইহাতে পাপ কি মা? যদি ইহাতে পাপ হয়, যাবজ্জীবন প্রজার সুখানুষ্ঠান করিয়া সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।'

বঙ্কিম পশুপতিকে সমুচিত সহানুভূতি দিয়েই গড়ে তুলেছেন। অষ্টভুজা-বন্দনার কথাগুলিই তার প্রমাণ। দেশের বৃহত্তর স্বার্থের সঙ্গে তাঁর নিজের স্বার্থ এখানে এক হয়ে গেছে! লোকচক্ষুতে তাঁর উচ্চাশা যতোই সংকীর্ণ বলে মনে হোক্, পশুপতি যে প্রজাবৎসল, বীর, রাজনীতিবিদ্, দেশপ্রেমিক, এখানে সেই ধারণাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

দেবীপ্রতিমাকে প্রণাম ক'রে উঠেই নিজের ঘরের দরজায় তিনি—'জীবনময়ী প্রতিমারূপিণী তরুণী' মনোরমাকে দেখতে পান! সঙ্গে-সঙ্গে হঠাৎ যেন মনোরমা-রহস্যের ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

> 'তরুণী বাণীনিন্দিত স্বরে কহিলেন, 'পশুপতি'!
> পশুপতি দেখিলেন—মনোরমা!'

অষ্টম পরিচ্ছেদের নাম 'মোহিনী,'—নবমের নাম 'মোহিতা'। দুটিতেই মনোরমার রূপ-গুণ-মনোভাবের ইঙ্গিত। পশুপতি মনোরমার রূপে মুগ্ধ! ইতিপূর্বে এই 'মোহিনী' অংশের উল্লেখ করা হয়েছে। পাঠককে সম্বোধন ক'রে এখানে লেখক জানিয়েছেন—'মনোরমার বয়ঃক্রম যথার্থ পঞ্চদশ,

কি ষোড়শ, কি তদধিক, কি তন্ন্যূন, তাহা ইতিহাসে লেখে না, পাঠক মহাশয় স্বয়ং সিদ্ধান্ত করিবেন।' 'মোহিনী' অংশে শুধু এই সুন্দরীর রূপবিভার বর্ণনা,—আর, এই সংক্ষিপ্ত পরিচ্ছেদের শেষ বাক্যে দেখা যায়— 'পশুপতি অতৃপ্তনয়নে দেখিতে লাগিলেন।' নবমের সূচনায় এই একটি বাক্যই পুনর্ব্যবহৃত হয়েছে। পরিচ্ছেদ-সংযোজনার এই বিশেষ ভঙ্গিই এখানে চোখে পড়ে। এই দুটি পরিচ্ছেদ পৃথক ভাবে ভাগ না ক'রে, —অষ্টম-নবমের বক্তব্য বিষয় যদি একই পরিচ্ছেদে পরিবেষিত হোতো, তাহ'লে সত্যিই কোনো ক্ষতি হোতো কি না, সে-কথা বিচার্য। স্বতন্ত্র একটি পরিচ্ছেদে মনোরমার স্নিগ্ধ, কোমল রূপের বর্ণনা দিয়ে, পরের পরিচ্ছেদে মনোরমা-পশুপতি সম্পর্ক,—এবং আড়াল থেকে পশুপতির মন্ত্রণা শুনে পশুপতির প্রতি মনোরমার উক্তি—'তুমি বিশ্বাসঘাতক—আমি বিশ্বাসঘাতককে কি প্রকারে ভক্তি করিব? কি প্রকারে বিশ্বাসঘাতককে ভালবাসিব'— ইত্যাদির উল্লেখ দেখা যায়। পশুপতির মনে রাজ্যাকাঙ্ক্ষা এবং মনোরমাকে লাভ করবার আকাঙ্ক্ষা,—এক সঙ্গে এই দুই তীব্র বাসনার সংঘর্ষ,—এবং সেই সঙ্গে মনোরমার দৃঢ়তা এবং কোমলতারও যুগপৎ প্রকাশ এখানে! নবম পরিচ্ছেদের শেষ অংশটুকুও এদিক থেকে স্মরণীয় :

> 'মনোরমা উত্তর না পাইয়া কহিতে লাগিল, 'শুন পশুপতি, তুমি আমার কথার উত্তর দিলে না। আমি চলিলাম। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে ইহজন্মে আমার সাক্ষাৎ হইবে না।'
>
> এই বলিয়া মনোরমা পশ্চাৎ ফিরিল। পশুপতি রোদন করিয়া উঠিলেন।
>
> অমনই মনোরমা আবার ফিরিল। আসিয়া পশুপতির হস্ত ধারণ করিল।
>
> পশুপতি তাঁহার মুখপানে চাহিয়া দেখিলেন। দেখিলেন তেজোগর্ববিশিষ্টা, কুঞ্চিত ভ্রূবীচিবিক্ষেপকারিণী সরস্বতী মূর্তি আর নাই; সে প্রতিভা দেবী অন্তর্ধান হইয়াছেন; কুসুমসুকুমারী বালিকা তাঁহার হস্তধারণ করিয়া তাঁহার সঙ্গে রোদন করিতেছে।
>
> মনোরমা কহিলেন, 'পশুপতি, কাঁদিতেছ কেন?'
>
> পশুপতি চক্ষুর জল মুছিয়া কহিলেন, 'তোমার কথায়'।

ম। কেন, আমি কি বলিয়াছি ?

প। তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতেছিলে।

ম। আর আমি এমন করিব না।

প। তুমি আমার রাজমহিষী হইবে ?

ম। হইব।

পশুপতির আনন্দসাগর উছলিয়া উঠিল। উভয়ে অশ্রুপূর্ণ লোচনে উভয়ের মুখপ্রতি চাহিয়া উপবেশন করিয়া রহিলেন। সহসা মনোরমা পক্ষিণীর ন্যায় গাত্রোত্থান করিয়া চলিয়া গেলেন।'

দ্বিতীয় খণ্ডের পঞ্চম পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক পংক্তিতে 'যবনযুদ্ধে' মনোরমা হেমচন্দ্রকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন,—এই খবরের পরে,—পর-পর চারটি পরিচ্ছেদে পশুপতি, মহম্মদ আলি, শান্তশীল এবং পশুপতি-মনোরমা প্রসঙ্গ ব্যক্ত হয়েছে। তারপর, দশম পরিচ্ছেদে পৌঁছে, আবার পূর্বকথায় ফেরা যায়। অর্থাৎ, ঐ পরিচ্ছেদের শুরুতেই কাহিনীর ধারা-রক্ষার বিশেষ পরিকল্পনা চোখে পড়ে। বঙ্কিমের এ-উপন্যাসে পরিচ্ছেদ-বিভাগের এই কৌশলের দিকটি বিবেচ্য।

এই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ তিনটি পরিচ্ছেদই আয়তনে সংক্ষিপ্ত। দশমের নাম 'ফাঁদ',—একাদশের 'মুক্ত',—এবং দ্বাদশের 'অতিথি-সৎকার'। দশম পরিচ্ছেদ শুরু হয়েছে এইভাবে :

'পূর্বেই কথিত হইয়াছে যে, বাপীতীর হইতে হেমচন্দ্র মনোরমার অনুবর্তী হইয়া যবন-সন্ধানে আসিতেছিলেন। মনোরমা ধর্মাধিকারের গৃহ কিছু দূরে থাকিতে হেমচন্দ্রকে কহিলেন 'সম্মুখে অট্টালিকা দেখিতেছ ?

হেম। দেখিতেছি।

মনো। ঐখানে যবন প্রবেশ করিয়াছে।'

এইভাবে পশুপতির প্রাসাদের কাছেই—এক গাছের আড়ালে হেমচন্দ্রকে অপেক্ষা ক'রতে ব'লে, মনোরমা গুপ্তপথে সেই অট্টালিকায় প্রবেশ করেন। সপ্তম থেকে নবম পরিচ্ছেদের বিস্তারে,—সেই গভীর রাত্রে,—সেই অট্টালিকায় পূর্বোক্ত দৃশ্যগুলি অতঃপর একে একে দেখা দিয়ে যায়।

ইতিমধ্যে, পশুপতির প্রাসাদের দিকে যেতে-যেতে, গাছের আড়ালে হেমচন্দ্রকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে,—তিনি যে যবন-বিদ্বেষী, এই খবর জেনে নিয়ে,—আরো তথ্যের লোভে প্রলুব্ধ ক'রে,—শান্তশীল তাঁকে কৌশলে বন্দী ক'রে ফেলে। তাই এ-পরিচ্ছেদের নাম 'ফাঁদ'।

এদিকে, পশুপতির সঙ্গে শান্তশীলের গুপ্ত মন্ত্রণা থেকে হেমচন্দ্রের এই অবস্থান্তরের খবর পেয়ে, মনোরমা তাকে মুক্ত ক'রে দেন। তাই একাদশ পরিচ্ছেদের নাম 'মুক্ত'। শত্রুসৈন্যের সংখ্যা যে প্রায় পঁচিশ হাজার, সে-খবরও হেমচন্দ্রের কানে পৌঁছোয়। মনোরমা বলেন—'আরও সংবাদ আছে। আজি রাত্রিতে তোমাকে মারিবার জন্য তোমার ঘরে দস্যু আসিবে। আজি ঘরে যাইও না'।

এই খবর জানিয়ে—'মনোরমা ঊর্ধ্বশ্বাসে পলায়ন করিল।'

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে, শান্তশীল আর তার অনুচরদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে, শত্রু-শিবিরের পথ থেকে ফিরে, আহত অবস্থায় হেমচন্দ্র নগরের পথে এক কুটীর-সন্নিহিত বৃক্ষমূলে বসেন। সে-বৃত্তান্ত আগেই দেখা গেছে। সেখানেই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ।

ইতিপূর্বে পরিচ্ছেদে-পরিচ্ছেদে সংযোগের যে-কৌশলের কথা বলা হয়েছে,—দ্বিতীয় খণ্ডের সঙ্গে তৃতীয়ের যোগ রচনায় আবার তারই অনুরূপ ভঙ্গি দেখা দেয়। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদের শেষ ক'টি লাইনে:

> 'রাত্রিজাগরণ—সমস্ত রাত্রির পরিশ্রম—রক্তস্রাবে বলহানি—এই সকল কারণে হেমচন্দ্রের চক্ষুতে পৃথিবী ঘুরিতে লাগিল। তিনি বৃক্ষমূলে পৃষ্ঠ রক্ষা করিলেন। চক্ষু মুদ্রিত হইল—নিদ্রা প্রবল হইল—চেতনা অপহৃত হইল। নিদ্রাবেশে স্বপ্নে যেন শুনিলেন, কে গায়িতেছে—'কণ্টকে গঠিল বিধি মৃণাল অধমে'।

তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের সূচনায়—সেই তরু-সন্নিহিত কুটীরের কথাই আবার দেখা দেয়:

> 'যে কুটীরের নিকটস্থ বৃক্ষতলে বসিয়া হেমচন্দ্র বিশ্রাম করিতেছিলেন, সেই কুটীরমধ্যে এক পাটনী বাস করিত'।

মৃণালিনী আর গিরিজায়া নবদ্বীপে এসে,—অন্য কোথাও আশ্রয় না পেয়ে,

সেই পাটনীর বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেদিন সকালে তাঁরা হেমচন্দ্র সম্বন্ধেই আলোচনারত,—এমন সময়ে, পাটনীর মেয়ে রত্নময়ী এসে খবর দেয় যে, বটতলায় আশ্চর্য এক পুরুষ ঘুমিয়ে আছেন! গিরিজায়া আর মৃণালিনী তাঁকে দেখেই চিনতে পারেন। 'কণ্টকে গঠিল বিধি'—সেই সময়ের গান! তারপর, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শুধু হেমচন্দ্রের বাড়ি ফেরবার খবর,—আর তাঁর সেবা-শুশ্রূষার বর্ণনা। গিরিজায়া আর মৃণালিনী চুপি চুপি এসে, আড়াল থেকে মনোরমাকে দেখে যান। তাঁদের সংলাপে তখন সন্দেহের ইঙ্গিত :

গিরিজায়া। 'নাম শুনিলাম মনোরমা।'

মৃণালিনী। 'এ কি হেমচন্দ্রের মনোরমা?'

রাজা হয়ে, বিধবা-বিবাহ প্রবর্তিত ক'রে—তিনি নিজেই একদিন মনোরমাকে বিয়ে করবেন,—দ্বিতীয় খণ্ডের নবম পরিচ্ছেদে পশুপতির এই সংকল্প—আর, মৃণালিনীর জন্যে হেমচন্দ্রের ব্যাকুলতা দেখা দেয়। তৃতীয় খণ্ডে, এই দুটি প্রণয়-কামনার পৃথক ধারা পরস্পরের খুবই সন্নিহিত হ'য়ে, আনুষঙ্গিক সন্দেহ-সংশয়ের কুয়াশা সৃষ্টি করে! হেমচন্দ্র-মনোরমার আলোচনা শুনে, তাঁদের নৈশ ভ্রমণের ইশারা থেকে—তৃতীয় পরিচ্ছেদে, গিরিজায়া সন্দেহ করে যে, মনোরমা হেমচন্দ্রের অনুরাগিনী! স্পষ্টভাবে ব্যাপারটি জানবার জন্যেই বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে সে গান শুরু করে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, সেই গান শুনে, হেমচন্দ্রকে গিরিজায়ার কাছে আসতে দেখা যায়। হেমচন্দ্রের মন বোঝবার জন্যে, একটি অসত্যের আশ্রয় নিয়ে গিরিজায়া বলে যে, মৃণালিনীর বিয়ের জন্যে তাঁর পিতা তাঁকে মথুরায় নিয়ে গেছেন! মনে মনে ক্ষুব্ধ হয়ে হেমচন্দ্র বলেন 'সংবাদ শুভ'! গিরিজায়া হেমচন্দ্রের এই অভিমানের কথা বোঝে না।

তারপর, পঞ্চম পরিচ্ছেদ। সেই দিনই মাধবাচার্য নবদ্বীপে ফিরেছেন। মৃণালিনী সম্বন্ধে হৃষীকেশের কাছে তিনি যে মিথ্যা অভিযোগ শুনেছিলেন, হেমচন্দ্রকে সে-কথা জানালে, তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে মৃণালিনীকে হত্যা করবার সংকল্প প্রকাশ করেন! ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, হেমচন্দ্রের শোকাকুল অবস্থা দেখে মনোরমা তাঁর দুঃখের কারণ জানতে চাইলে হেমচন্দ্র বলেন যে, তিনি যাঁকে ভালবাসতেন, তাঁর প্রতি তাঁর আর সে ভালোবাসা নেই! সপ্তম পরিচ্ছেদে, গিরিজায়ার কাছে মৃণালিনী হেমচন্দ্র-মনোরমা

সম্পর্কের বিবরণ শোনেন। গিরিজায়া হেমচন্দ্রকে ভুল বুঝে আঘাত দেয়, কিন্তু মৃণালিনী সব কথা আরো গভীরভাবে ভেবে দেখে, আসল অবস্থাটি কতকটা অনুমান করতে পারেন। হেমচন্দ্রের সাক্ষাৎ কামনা ক'রে, গিরিজায়ার হাতে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়ে দেন। অষ্টম পরিচ্ছেদে, সেই চিঠির দুর্যোগ ঘনিয়ে ওঠে। হেমচন্দ্র সে-চিঠি না পড়েই ছিঁড়ে ফেলেন এবং ক্রোধ-ক্ষোভ-বিরক্তির ফলে গিরিজায়াকে বেত্রাঘাত ক'রতে উদ্যত হন! গিরিজায়া বলে—'তুমি আমারও যোগ্য নহ, মৃণালিনী তো দূরের কথা।'

এসব বিবরণ শুনে মৃণালিনী প্রথমে অশ্রুপাত করেন,—পরে গিরিজায়াকে সঙ্গে নিয়ে হেমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা ক'রতে যান। নবম পরিচ্ছেদে এই সাক্ষাৎ-প্রসঙ্গ। পর পর দুটি পরিচ্ছেদে অতঃপর হেমচন্দ্রের কঠোরতার ছবিই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। মৃণালিনীকে হৃষীকেশ 'কুলটা' বলে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন,—সে অভিযোগ যে মিথ্যা,—মৃণালিনী এই সব কথাই জানাবার চেষ্টা করেন। কিন্তু উগ্র অনাদরে হেমচন্দ্র তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন! শুধু তাই নয়,—'পাপীয়সি—নিজমুখে স্বীকৃতা হইলি।'—এই কথা দন্তমধ্য হইতে ব্যক্ত করিয়া হেমচন্দ্র বেগে প্রস্থান করিলেন।'

মৃণালিনীর প্রতি হেমচন্দ্রের এই নির্মমতার দৃশ্যেই তৃতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি। হেমচন্দ্রের উচ্ছ্বাস, অধৈর্য, রাগ—সবই মাত্রাতিরিক্ত। নায়ক-চরিত্রের এই অস্বাভাবিকতাই বঙ্কিমচন্দ্র এখানে চড়া রঙে আঁকতে চেয়েছিলেন! এখানকার কথা—'লিখিতে লজ্জা করিতেছে—কিন্তু না লিখিলে নয়—হেমচন্দ্র পদাঘাতে গিরিজায়াকে পথ হইতে অপসৃতা করিলেন। বলিলেন, 'তুমি যাহার দূতী তাহাকে পদাঘাত করিলে আমার চরণ কলঙ্কিত হইত।'

অতঃপর 'হেমচন্দ্র' চরিত্রের স্বরূপ সম্বন্ধে লেখকের আরো একটি ছোটো অনুচ্ছেদ :

> 'যাহার ধৈর্য নাই, যে ক্রোধের জন্মমাত্র অন্ধ হয়, সে সংসারের সকল সুখে বঞ্চিত।...হেমচন্দ্রের কেবল অধৈর্য নহে,—অধৈর্য, অভিমান, ক্রোধ।'

চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'ঊর্ণনাভ'। এখানকার মূলকথা—পশুপতি—'ঊর্ণনাভের ন্যায় বিরলে বসিয়া অভাগা জন্মভূমিকে বদ্ধ করিবার জন্য জাল পাতিতেছিল।' তাঁরই হুকুম মতন শান্তশীল নগর-রক্ষকদের বলে

দেয়—'অচিরাৎ যবন-সম্রাটের নিকট হইতে কর লইয়া কয়জন যবন দূতস্বরূপ আসিতেছে, তাহাদিগের গতিরোধ না করে'! এদিকে, দামোদর শর্মা এক পুরোনো পুঁথির একখানি পৃষ্ঠা ব'দলে, সে জায়গায় পশুপতির লেখা কয়েকটি কবিতা সাজিয়ে রেখে,—বৃদ্ধ গৌড়সম্রাটকে সেই লেখাগুলি শোনান এবং মাধবাচার্যের খুবই নিন্দে করেন। বখতিয়ার খিলিজির হাতে গৌড়ের শাসনভার যে অবশ্যই চলে যাবে,—শাস্ত্রগ্রন্থ থেকে এই ইঙ্গিত পেয়ে, লক্ষ্মণ সেন কাঁদতে-কাঁদতে তীর্থযাত্রার আয়োজনের আদেশ দেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, পশুপতি মনোরমাকে বলেন :

> 'আমি এ বয়স পর্যন্ত কেবল বিদ্যা উপার্জন করিয়াছি—বিষয়ালোচনা করিয়াছি, অর্থোপার্জন করিয়াছি। সংসারধর্ম করি নাই। যাহাতে অনুরাগ, তাহাই করিয়াছি, দারপরিগ্রহে অনুরাগ নাই, এজন্য তাহা করি নাই। কিন্তু যে পর্যন্ত তুমি আমার নয়নপথে আসিয়াছ, সেই পর্যন্ত মনোরমালাভ আমার একমাত্র ধ্যান হইয়াছে। সেই লাভের জন্য এই নিদারুণ ব্রতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি জগদীশ্বরী অনুগ্রহ করেন, তবে দুই চারিদিনের মধ্যে রাজ্যলাভ করিব এবং তোমাকে বিবাহ করিব। ইহাতে তুমি বিধবা বলিয়া যে বিঘ্ন, শাস্ত্রীয় প্রমাণের দ্বারা আমি তাহার খণ্ডন করিতে পারিব।…'

মনোরমা তখন বিনিস্সুতার মালা গাঁথছিলেন। সেই ঘটনার সঙ্গে যোগ রেখে, বঙ্কিম এখানে তাঁর প্রিয় এক শিল্প-সংকেত ব্যবহার করেন :

> 'মনোরমা কোন উত্তর করিল না। সে সকল শ্রবণ করিয়াছিল কি না সন্দেহ। একটি কৃষ্ণবর্ণ মার্জার তাহার নিকটে আসিয়া বসিয়াছিল, সে সেই বিনাস্থত্রের মালা তাহার গলদেশে পরাইতেছিল। পরাইতে মালা খুলিয়া গেল।'

প্রেমের এই বরমাল্য পশুপতির গলায় পৌঁছোয়নি! এখানকার এই মার্জার-প্রসঙ্গ থেকে সে-দুর্দৈবের অনতিকথিত ইঙ্গিত-সূত্রটুকুই অনুভব করা যায়! মনে পড়ে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ ভ্রমরের বিড়াল-তাড়নার দৃশ্য! যাই হোক্, এখানে অতঃপর পশুপতির অধৈর্য দেখা দেয়। বিবাহের সম্ভাবনা সম্বন্ধে মনোরমার কোনো জবাব না পেয়ে—'পশুপতি অধিকতর বিরক্ত হইয়া

বিড়ালকে এক চপেটাঘাত করিলেন—বিড়াল উর্দ্ধলাঙ্গুল হইয়া দূরে পলায়ন করিল। মনোরমা সেইরূপ দংশিতাধরে হাসিতে হাসিতে করস্থ মালা পশুপতিরই মস্তকে চাপাইয়া দিল।'

পশুপতির আলিঙ্গন প্রত্যাখ্যান ক'রে, তীব্র কটাক্ষের সঙ্গে মনোরমা প্রশ্ন করেন—'পশুপতি! কেশবের কন্যা কোথায়?'

তাঁর আত্মপরিচয় থেকে জানা যায় যে, তিনিই কেশবের কন্যা! জ্যোতির্বিদ্‌রা বলেছিলেন—'ইনি অল্পবয়সে স্বামীর অনুমৃতা হইবেন।' কেশব ধর্মনাশের ভয়ে মেয়েকে পাত্রস্থ করেন বটে, কিন্তু—'বিধিলিপি খণ্ডাইবার ভরসায়'—বিবাহের রাত্রেই মেয়েকে নিয়ে প্রয়াগে পালিয়ে যান!

পশুপতি-মনোরমার এই নবপরিচয়-সংঘটনই এ-পরিচ্ছেদের মূল কথা। মনোরমা বলেন: 'তোমার রাজ্যলাভের দুরাশা ছাড়। প্রভুর অহিতচেষ্টা ছাড়। এ দেশ ছাড়িয়া চল, আমরা কাশীধামে যাত্রা করি।'

তার উত্তরে পশুপতির কথা: 'মনোরমা—আমিও শপথ করিতেছি, আমার জীবন থাকিতে তুমি আমার বাড়ি ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনোরমা আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, সে পথ হইতে ফিরিবার উপায় থাকিলে আমি ফিরিতাম—তোমাকে লইয়া সর্বত্যাগী হইয়া কাশীযাত্রা করিতাম। কিন্তু অনেক দূরে গিয়াছি, আর ফিরিবার উপায় নাই—যে গ্রন্থি বাঁধিয়াছি তাহা আর খুলিতে পারি না—স্রোতে ভেলা ভাসাইয়া আর ফিরাইতে পারি না। যাহা ঘটিবার তাহা ঘটিয়াছে।...তুমি আমার স্ত্রী, আমার কপালে যাই থাকুক, আমি তোমাকে গৃহিণী করিব।'

এই ব'লে,—সেখান থেকে উঠে গিয়ে, বাড়ির সমস্ত দরজা বন্ধ ক'রে—ফিরে এসে পশুপতি বলেন—'প্রাণাধিকে। আজি আর তুমি আমাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিবে না। আমি সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া আসিয়াছি।'

এ পরিচ্ছেদের নাম 'বিহঙ্গী পিঞ্জরে'। এখানকার শেষ বাক্যে দেখা যায়—'মনোরমা বিহঙ্গী পিঞ্জরে বদ্ধ রহিল।

:

তারপর চতুর্থ পরিচ্ছেদ। বেলা প্রহরেকের সময়ে নগরে সতেরোটি অশ্বারোহী প্রবেশ করে। সেই অশ্বারোহী সৈন্যদের ঋজু, আয়ত, দীর্ঘ

শরীরের দৃঢ় ভঙ্গিরই একরকম প্রভাব অনুভব করা যায় এখানকার ভাষায়। তারপর আবার লেখকের মন্তব্য :

'ষোড়শ সহচর লইয়া মর্কটাকার বখ্‌তিয়ার খিলিজি গৌড়েশ্বরের রাজপুরী অধিকার করিল।

ষষ্টি বৎসর পরে যবন-ইতিহাসবেত্তা মিন্‌হাজউদ্দীন এইরূপ লিখিয়াছিলেন। ইহার কতদূর সত্য, কতদূর মিথ্যা, তাহা কে জানে? যখন মনুষ্যের লিখিত চিত্রে সিংহ পরাজিত, মনুষ্য সিংহের অপমানকর্তা স্বরূপ চিত্রিত হইয়াছিল, তখন সিংহের হস্তে চিত্রফলক দিলে কিরূপ চিত্র লিখিত হইত? মনুষ্য মূষিকতুল্য প্রতীয়মান হইত সন্দেহ নাই। মন্দভাগিনী বঙ্গভূমি সহজেই দুর্বলা আবার তাহাতে শত্রুহস্তে চিত্রফলক'।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে পশুপতির উদ্দেশ্যে বখতিয়ার খিলিজির এই নির্দেশ :

'কুতবউদ্দীন গৌড় শাসনভার আপনার প্রতি অর্পণ করিলেন। আজ হইতে আপনি বঙ্গে রাজপ্রতিনিধি হইলেন। কিন্তু যবন-সম্রাটের সংকল্প এই যে, ইস্‌লাম ধর্মাবলম্বী ব্যতীত কেহ তাঁহার রাজকার্যে সংলিপ্ত হইতে পারিবেনা। আপনাকে ইসলামধর্ম অবলম্বন করিতে হইবে।'

পশুপতি চতুর এবং বলশালী শত্রুর কবলে পড়েছিলেন। কালক্ষেপ না ক'রে, বখ্‌তিয়ার তাঁকে সেই মুহূর্তেই ধর্মান্তরিত করবার আয়োজন করেন। সেই অবকাশে ঔপন্যাসিক আবার একটি মন্তব্য যোগ করেন :

'বঙ্গভূমির অদৃষ্টলিপি এই যে, এ ভূমি যুদ্ধে জিত হইবে না; চাতুর্যেই ইহার জয়। চতুর ক্লাইব সাহেব ইহার দ্বিতীয় পরিচয়স্থান।'

এপক্ষে, পশুপতি সাহসী ছিলেন না। তিনি শুধু উর্ণনাভ! তাই নিজের জালে নিজেই জড়িয়ে প'ড়ে রাজপুরীতে বন্দী হতে হয় তাঁকে। সেই রাত্রে মহাবন থেকে বিশহাজার শত্রুসৈন্য এসে নবদ্বীপবিজয় সম্পূর্ণ করে!

বখতিয়ার খিলিজির সঙ্গে পশুপতি যখন দেখা করতে আসেন, অবরুদ্ধ মনোরমা তখন ঘরের জানলা দিয়ে বাইরে লাফিয়ে প'ড়ে,—জনার্দনের বাড়ির দিকে এগিয়ে যান। তারপর ঘটনাস্রোত দ্রুত এগিয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে শত্রুসৈন্যের নগর-দলনের বর্ণনা। সেই দুর্যোগের আব-

হাওয়াতে, কোনো এক কুটীরে মুমূর্ষু ব্যোমকেশের সঙ্গে হঠাৎ হেমচন্দ্রের দেখা হয়ে যায়। মৃত্যুর আগে ব্যোমকেশ জানিয়ে যায়—'আমার পাপের ফল ফলিল।' অষ্টম পরিচ্ছেদে আবার মৃণালিনীর কথা। হেমচন্দ্রের বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই তাঁর! নবম পরিচ্ছেদে, 'দুর্গেশনন্দিনী' আর 'কপালকুণ্ডলা'র নায়িকার মতন এখানকার এই নায়িকারও একটি স্বপ্ন-বৃত্তান্ত! সে-স্বপ্নে মৃণালিনীর বাঞ্ছিত বীর হেমচন্দ্র দেখা দিয়েছেন বিজয়ী বেশে! এবং এই পরিচ্ছেদেরই শেষে,—স্বপ্নের অবসান, সত্যের অভাবিতপূর্ব বিস্ময়! হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর পুনর্মিলন ঘটে যায়। তারপর, দশম পরিচ্ছেদে একদিকে উপবন-গৃহে হেমচন্দ্র-মৃণালিনীর পুনর্মিলন, অন্যদিকে দিগ্বিজয়-গিরিজায়ার প্রণয়-কলহ! একাদশ পরিচ্ছেদে গিরিজায়ার কাছে মৃণালিনী তাঁর পূর্ব-পরিচয় জানান এবং গিরিজায়াও দিগ্বিজয়কে বিবাহ করবার সংকল্প জানায়। অতঃপর মাধবাচার্য হেমচন্দ্রকে নবদ্বীপ পরিত্যাগ করবার পরামর্শ দেন। হেমচন্দ্র-মাধবাচার্য প্রসঙ্গের পাশাপাশি মহম্মদ আলি আর পশুপতির কথাও দেখা দেয়। মহম্মদ আলির আনুকূল্যে মুক্তি লাভ ক'রে,—নগরের অগ্নিকাণ্ডের মধ্যে মনোরমার অনুসন্ধান ক'রতে গিয়ে পশুপতি মৃত্যু বরণ করেন। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে মনোরমার মৃত্যু, এবং পশুপতির বাড়িতে দেবীর পূজক ব্রাহ্মণ দুর্গাদাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। মনোরমার এই সহমরণ-প্রসঙ্গই এ-কাহিনীর সর্বশেষ কথা। তারপর 'পরিশিষ্ট' অংশে, দাক্ষিণাত্যে হেমচন্দ্রের রাজ্য-বিস্তারের খবর দেওয়া হয়েছে।

'মৃণালিনী'র কাহিনীতে যতো সমারোহ,—উচ্চ-নিম্ন ঘটনার যতো অবির্ভাব-তিরোভাব, সে-পরিমাণে এতে বাস্তব সম্ভাব্যতা রক্ষিত হয়নি। অর্ধ-ঐতিহাসিক, রোম্যান্সধর্মী কাহিনীর প্রকৃতিগত বিশিষ্টতা এসব। 'মৃণালিনী'র পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের সামাজিক উপন্যাসের সূত্রপাত ঘটে। আগে 'বিষবৃক্ষ',—তার বেশ কয়েক বছর পরে দেখা দেয় 'কৃষ্ণকান্তের উইল'। অতঃপর তাঁর 'বিষবৃক্ষের' কথা।

গোবিন্দপুরের জমিদার নগেন্দ্রনাথ যে নিতান্তই কল্পিত ব্যক্তি নন,—তিনি যে একজন সত্যিকার জীবিত মানুষ,—এবং 'বিষবৃক্ষ' যে বাস্তব জীবনের কাহিনী, প্রথম পরিচ্ছেদের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে সে-ধারণা জাগিয়ে তোলবার

চেষ্টা আছে। বঙ্কিম লিখেছেন,—'তাঁহার বাসস্থান গোবিন্দপুর। যে জেলায় সেই গ্রাম, তাহার নাম গোপন রাখিয়া, হরিপুর বলিয়া তাহার বর্ণনা করিব।'

তিনি তাঁর এ-কাহিনীতেও নায়ক-নায়িকা ইত্যাদি বিভিন্ন চরিত্রের বয়সের হিসেব দিতে ভোলেননি। এই অনুচ্ছেদেই বলা হয়েছে—'নগেন্দ্রবাবু যুবাপুরুষ, বয়ঃক্রম ত্রিংশৎ বর্ষমাত্র'; পঞ্চম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্রনাথের সহোদরা এবং শ্রীশচন্দ্র মিত্রের পত্নী কমলমণির বয়সের অঙ্ক আছে—'কমলের বয়স অষ্টাদশ বৎসর'; বন্ধু হরদেব ঘোষালের কাছে লেখা চিঠিতে নগেন্দ্রনাথ জানান—'কুন্দ নামে যে কন্যার পরিচয় দিলাম—তাঁহার বয়স তের বৎসর'; সপ্তম পরিচ্ছেদে, নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে এসে কুন্দনন্দিনী সূর্যমুখীকে দেখেছেন—'সূর্যমুখীর বয়স প্রায় ষড়বিংশতি'। দাসী হীরাকেও দেখেছেন তিনি। হীরার সঙ্গে, স্বপ্নে দেখা [তৃতীয় পরিচ্ছেদে স্বপ্নবৃত্তান্ত] 'পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী'র সাদৃশ্য দেখে কুন্দ ভয় পান,—মনে পড়ে, 'স্বপ্নদৃষ্টার বয়স বিংশতির অধিক বোধ হয় নাই'! আবার, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তারাচরণের পরিচয়সূত্রে তারও বয়সের হিসেব দেওয়া হয়েছে—'সে সূর্যমুখীর সমবয়স্ক'। দশম পরিচ্ছেদে হরিদাসী বৈষ্ণবীর ছদ্মবেশ মোচন ক'রে দেখা দেন দেবেন্দ্র! তাঁর 'বয়স পঞ্চবিংশ বৎসর,...কিন্তু মুখমণ্ডলে রোমাবলীর চিহ্নমাত্র ছিল না!'

নায়ক-নায়িকার কোনো কোনো স্বপ্নের বিবরণ এর আগেও দেখা গেছে, এখানেও লক্ষ্য করা গেল। এটি বঙ্কিমের আর এক বিশিষ্টতা। প্রথম খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিশিষ্টতায় এবং উপাদান-বিশেষত্বে কুন্দনন্দিনীর স্বপ্নবৃত্তান্ত সত্যিই চমকপ্রদ! তখন গভীর রাত্রি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক ছত্রে বলা হয়েছে—'সেই নিভৃত কক্ষে, স্তিমিত প্রদীপে, কুন্দনন্দিনী একাকিনী পিতার মৃতদেহ ক্রোড়ে লইয়া বসিয়া রহিলেন। নিশা ঘনান্ধকারাবৃতা; বাহিরে এখনও বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পড়িতেছিল, বৃক্ষপত্রে তাহার শব্দ হইতেছিল, বায়ু রহিয়া রহিয়া গর্জন করিতেছিল, ভগ্নগৃহের কবাট সকল শব্দিত হইতেছিল। গৃহমধ্যে নির্বাণোন্মুখ চঞ্চল ক্ষীণ প্রদীপালোক, ক্ষণে ক্ষণে শবমুখে পড়িয়া আবার ক্ষণে ক্ষণে অন্ধকারবৎ হইতেছিল। সে প্রদীপে অনেকক্ষণ তৈলসেক হয় নাই। এই সময়ে দুই চারিবার উজ্জ্বলতর হইয়া প্রদীপ নিবিয়া গেল।' এবং—'তখন নগেন্দ্র নিঃশব্দপদসঞ্চারে গৃহদ্বার হইতে অপসৃত হইলেন!

পিতার মৃত্যু কুন্দ বুঝতেই পারেননি! মৃতদেহে হাত-পাখার হাওয়া দিতে-দিতে, তিনি ঘুমিয়ে পড়েন এবং সেই ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে মনে হয় যেন—'চন্দ্রমণ্ডল সহস্র শীতলরশ্মি স্ফুরিত করিয়া, কুন্দনন্দিনীর মস্তকের উপর আসিল,'—'সেই মণ্ডলমধ্যে শোভিনী, আলোকময়ী, কিরীট-কুণ্ডলাদি-ভূষণালঙ্কৃতা মূর্তি স্ত্রীলোকের আকৃতিবিশিষ্টা'! তিনি কুন্দনন্দিনীর জননী। কন্যার অশেষ দুঃখ-ভোগের ভবিতব্য জানিয়ে দিয়ে, তিনি তাকে ডেকেছেন—'পৃথিবী ত্যাগ করিয়া আমার সঙ্গে আয়'! এবং—'কুন্দ তখন যেন বহুদূরবর্তী বেলাবিহীন অনন্ত সাগরপারস্থবৎ, অপরিজ্ঞাত নক্ষত্রলোক দৃষ্টি করিয়া কহিল, 'আমি অত দূর যাইতে পারিব না; আমার বল নাই।' তাঁর সেই অক্ষমতা এবং অনভিপ্রায়ের ফলে, জননীর 'কারুণ্য-প্রফুল্ল' মুখশ্রীতে ভ্রূকুটি দেখা দেয়! তিনি বলেন—'বাছা যাহা তোমার ইচ্ছা তাহা কর। কিন্তু আমার সঙ্গে আসিলে ভাল করিতে। ইহার পর তুমি ঐ নক্ষত্রলোক প্রতি চাহিয়া তথায় আসিবার জন্য কাতর হইবে। আমি আর একবার তোমাকে দেখা দিব। যখন তুমি মনঃপীড়ায় ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া আমাকে মনে করিয়া, আমার কাছে আসিবার জন্য কাঁদিবে, তখন আমি আবার দেখা দিব, তখন আমার সঙ্গে আসিও।' এই ব'লে,—মহাকাশে তর্জনী-সংকেত ক'রে,—সেখানে দৃশ্যমান দুটি মনুষ্য-মূর্তির দিকে তিনি কন্যার দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বলেন—'এই দুই মনুষ্যই ইহলোকে তোমার শুভাশুভের কারণ হইবে। যদি পার, তবে ইহাদিগকে দেখিলে বিষধরবৎ প্রত্যাখ্যান করিও।' এঁদের একজন নগেন্দ্রনাথ,—অন্যজন 'উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গী, পদ্মপলাশনয়নী যুবতী'—হীরা!

এইসব অলৌকিকতা সত্ত্বেও 'বিষবৃক্ষ' সামাজিক উপন্যাস। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের একরকম সংঘর্ষই এখানকার প্রধান কথা। সামাজিক উপন্যাসে ব্যক্তি ও পরিবারের বিভিন্ন সম্পর্ক সম্বন্ধে কথা ওঠা স্বাভাবিক। ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সেই কথাই তুলেছিলেন। এখানে তাঁর দু'একটি মন্তব্য দেখা যেতে পারে। সে-সব কেবল 'বিষবৃক্ষ' সম্পর্কেই নয়। তিনি 'ইন্দিরা', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি অন্যান্য রচনার কথাও তুলেছিলেন। যেমন, তিনি লেখেন:

> 'ইন্দিরার বিবাহের পর কথারম্ভ হইলেও ইহা বিবাহিত জীবনের ইতিহাস নহে, কেন না ইন্দিরার পতির সঙ্গে প্রকৃত মিলন

গ্রন্থশেষে। পরিবর্ধিত সংস্করণে গ্রন্থশেষে ইন্দিরার কলঙ্কভঞ্জন হইলে তাঁহার শ্বশুর-শাশুড়ী সন্তুষ্ট হইলেন [২২শ পরিচ্ছেদ], এই কথামাত্র আছে। কিন্তু পরিবর্ধিত সংস্করণে ইন্দিরার সখী সুভাষিণীর শাশুড়ীকে লইয়া ঘর করার প্রসঙ্গ আছে। 'রাজসিংহে'র পরিবর্ধিত সংস্করণে চঞ্চলকুমারীর সখী নির্মলকুমারীর বৃদ্ধা পিসশাশুড়ীর কথা আছে। 'চন্দ্রশেখর'এ শৈবলিনীর শাশুড়ী বিবাহের পূর্বেই পরলোকগতা ; সুন্দরী ত পিত্রালয়বাসিনী। রূপসীর শাশুড়ী থাকার কথাও শুনিনা। 'বিষবৃক্ষে' সূর্যমুখীর শাশুড়ী নাই, কিন্তু কমলমণির শাশুড়ীর উল্লেখ আছে, কুন্দর কুলত্যাগিনী শাশুড়ীর কথাও দুই-একবার উঠিয়াছে। 'কপালকুণ্ডলায়' শাশুড়ীর প্রসঙ্গ গ্রন্থকার দু'কথায় শেষ করিয়াছেন, 'আনন্দমঠে' শান্তির শাশুড়ীর সঙ্গে ঘর করার কথা পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত হইয়াছে।

'কৃষ্ণকান্তের উইলে' ভ্রমরের শাশুড়ীর কথা সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে। 'দেবীচৌধুরাণী'তে শাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক বিশদভাবে চিত্রিত হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখা গেল, বঙ্কিমচন্দ্রের চৌদ্দখানি আখ্যায়িকার মধ্যে যে সাতখানিতে বাল্যবিবাহ আছে সেই সাতখানিতে শাশুড়ীর প্রসঙ্গও আছে।'

তিনি এক-একখানি বই ধ'রে বিশ্লেষণ ক'রে দেখান যে, নবকুমারের বিধবা জননী কপালকুণ্ডলাকে 'মহাসমাদরে' বরণ ক'রে নেন। আবার, 'বিষবৃক্ষে'—'কমলের শ্বশ্রূ বর্তমান। কিন্তু তিনি শ্রীশচন্দ্রের পৈতৃক বাসস্থানেই থাকিতেন, কলিকাতায় কমলই গৃহিণী।' রাজসিংহে নির্মলকুমারীর পিসশাশুড়ীর স্নেহের দিকটি নিতান্তই তুচ্ছ। 'আনন্দমঠের পঞ্চম সংস্করণে সংযোজিত পুরো একটি পরিচ্ছেদে [দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদ] শান্তির শাশুড়ীর প্রসঙ্গ লক্ষ্য ক'রে ললিতকুমার তাঁর আলোচনায় সেই লাইনগুলি স্মরণ করেন—'শ্বশুর শাশুড়ী প্রথমে নিষেধ, পরে ভর্ৎসনা, পরে প্রহার করিয়া শেষে ঘরে শিকল দিয়া শান্তিকে কয়েদ রাখিতে আরম্ভ করিল।'—ইত্যাদি। ফলে, শান্তি পালিয়ে যায়। অনেকদিন পরে, শান্তি শ্বশুরবাড়িতে ফিরে এসে দেখে যে, তার শ্বশুরের মৃত্যু হয়েছে।—'শাশুড়ী তাহাকে গৃহে স্থান দিলেন না,—জাতি

যাইবে।' ললিতকুমারের কথায়—'এখানে শাশুড়ীকে সধবা ও বিধবা দুই অবস্থাতেই দেখা গেল। এবং ইহাও বুঝা গেল যে,তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনই শাশুড়ী-বৌএ মিলমিশ হয় নাই।' কৃষ্ণকান্তের উইলের ভিত্তি যে—'একান্নবর্তী পরিবারে দায়াদগণের মধ্যে সম্পত্তি বিভাগ সমস্যা'র ওপরেই প্রতিষ্ঠিত, সে-কথা জানিয়ে, উপন্যাসের প্রথম দিকে তিনি, কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর পরদিন পর্যন্ত [প্রথম খণ্ড, ২৭ পরিচ্ছেদ]—ভ্রমরের শাশুড়ীর সু-ব্যবহারের উল্লেখ করেন। অতঃপর বঙ্কিমের নিজের কথা উদ্ধৃত হয়—'আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকারমাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত।'—ইত্যাদি।

এইভাবে 'ইন্দিরা', 'দেবীচৌধুরাণী' ইত্যাদি কাহিনী ধ'রে বঙ্কিম-প্রদর্শিত শাশুড়ী-বৌ সম্পর্ক বিশ্লেষণ ক'রে দেখানো হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের চোদ্দটি 'আখ্যায়িকা'র মধ্যে সাতখানিতে শাশুড়ী-বৌয়ের প্রসঙ্গ—এবং তিনটিতে,—অর্থাৎ 'ইন্দিরা', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এবং 'দেবীচৌধুরাণী'তে যে এ-বিষয়ে পূর্ণায়তন চিত্র পাওয়া যাচ্ছে,—সে-কথা জানিয়ে ললিতকুমার লেখেন—'ভ্রমর, সুভাষিণী ও প্রফুল্ল বিশেষভাবে আদর্শ বধূ এবং সুভাষিণীর ও প্রফুল্লর শাশুড়ী প্রকৃতই স্নেহময়ী।' অতঃপর তিনি প্রতিকূল সমালোচকদের সমালোচনা-ভঙ্গির সমালোচনা করেন :

> 'তথাপি প্রতিকূল সমালোচকগণ সময়ে অসময়ে বলিয়া বসেন যে, বঙ্কিমচন্দ্রের আখ্যায়িকাবলীতে একান্নবর্তী পরিবারের প্রসঙ্গ নাই, শাশুড়ী-বৌএ স্নেহ-সম্পর্ক নাই, মাতা-পিতা প্রভৃতি গুরুজনে ভক্তির আদর্শ নাই, সৌভ্রাত্রের দৃষ্টান্ত নাই, ঘরগৃহস্থালীর খবর নাই, শিশুর খেলা নাই, মাতৃভাবের বিকাশ নাই, বাস্তব জীবনের চিত্র নাই—আছে কেবল নায়ক-নায়িকার নভেলী প্রেম ; দুটিতে মুখোমুখি করিয়া কেবল 'ভালবাসি ভালবাসি বুলি সাধিতেছে—যেন শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর প্রহসনের 'বৌমা'। প্রতিকূল সমালোচকগণ আরও গলা চড়াইয়া বলেন,—বঙ্কিমচন্দ্রের স্ত্রী-চরিত্রগুলি যেন টবের ফুল, কাশ্মীরী বারান্দার টবে টবে একা একা ফুটিয়া থাকে, বাগানের ফুলের মত পাঁচটার মধ্যে ফুটিয়া উঠিতে জানে না, খোলা জমির মাটি হইতে রস আকর্ষণ করিয়া, পাঁচটা

গাছপালার সঙ্গে আলো ও বাতাস ভাগ-বাঁটোয়ারা করিয়া লইয়া, বাড়িয়া উঠিতে জানে না।'

তাঁর কথায়—বঙ্কিমচন্দ্রের এই প্রতিকূল সমালোচকদের আর-একটি অভিযোগ এই ছিল যে—'তিনি বিলাতী নভেলের অনুকরণে ও অনুসরণে এবং বিলাতী সামাজিক প্রথার অনুমোদনে আমাদের পবিত্র সাহিত্যক্ষেত্রে বিদেশীয় বিজাতীয় আদর্শ আমদানি করিয়াছেন।' এ অভিযোগ খণ্ডন ক'রতে গিয়ে, এই বঙ্কিম-অনুরাগী সমালোচক—মুকুন্দরাম এবং ভারত-চন্দ্রের কাব্য থেকে লাইন তুলে দেন। অভিপ্রেত তুলনার জন্যে—ভারতচন্দ্রের উক্তি—'সতীনি বাঘিনী, শাশুড়ী রাগিনী, ননদী নাগিনী, বিষের ভরা',—মুকুন্দরামের উক্তি—'শাশুড়ী ননদী নাহি, নাহি তোর সতা—কার স'নে দ্বন্দ্ব কর‍্যা চক্ষু হৈল রাতা',—মেয়েলি ছড়ায়—'উড়কি ধানের মুড়কি দিব শাশুড়ি ভুলাতে' ইত্যাদি প্রবচনগুলি খুবই সংগতভাবে উদ্ধৃত হয়।

অর্থাৎ,—বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালী সমাজের, বাস্তব চিত্র কোনো ক্ষেত্রেই ঠিক উপেক্ষা করেননি—এই স্বীকার্য সত্যই তাঁর এ-আলোচনায় বেশ জোরের সঙ্গে ব্যক্ত হয়। তাঁর সমকালীন লেখকদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের 'পৌষপার্বণে'র—'শাশুড়ি ননদ কত কথা কয় বেঁকে',—রামনারায়ণের কুলীন-কুলসর্বস্ব' ও 'নব-নাটকে'—'শাশুড়ি রায়বাঘিনী'—এবং মধুসূদন, দীনবন্ধু, মনোমোহন বসু প্রভৃতি লেখকের নানা রচনার বিভিন্ন উক্তির উল্লেখসূত্রে তিনি দেখিয়েছেন—'বঙ্কিমচন্দ্রের প্রণালী অন্য সকলের প্রণালী হইতে বিভিন্ন নহে'।

তবে, বঙ্কিম যে কেবলমাত্র গার্হস্থ্য উপন্যাস লিখতে চাননি,—নর-নারীর প্রেমের বিস্ময় ফুটিয়ে তোলাতেই যে তাঁর প্রধান আকর্ষণ ছিল, ললিত-কুমারের এইসব সমালোচনায় সে-সত্যও স্বীকৃত! তিনি বলেন:

> 'বাস্তব জীবনের যথাযথ চিত্র অঙ্কিত করা, যথাদৃষ্টং তথা লিখিতং করা, তাঁহার প্রতিভার প্রিয় পদার্থ ছিল না। 'গার্হস্থ্য উপন্যাস' লেখাও তাঁহার অভিপ্রায় ছিল না। তাঁহার লক্ষ্য *Idealism,—Realism* নহে। সুতরাং 'আলালের ঘরের দুলাল'-এ বা 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বা 'সধবার একাদশীতে' বা 'স্বর্ণলতায়' বা 'মেজবউ'-এ গার্হস্থ্য জীবনের যে কঠোর বাস্তবতা আছে, এই শ্রেণীর আখ্যায়িকায় তাহার স্থান হইতে পারে না। পারিবারিক জীবনের সকল দিক সম্পূর্ণভাবে অঙ্কিত হইবে,

মাতৃভক্তি, পিতৃভক্তি, সন্তানস্নেহ, সৌভ্রাত্র প্রভৃতি সম্পর্কের পূর্ণায়তন চিত্র থাকিবে, ইহা কখনও এই শ্রেণীর কাব্যে আশা করা যাইতে পারে না। প্রেমকাহিনীই এই শ্রেণীর কাব্যে অধিক স্থান জুড়িয়া থাকিবে, অন্য অবান্তর বিষয় সংক্ষেপে থাকিবে। এ অবস্থায় যে কবি ননদ-ভাজ, দুই ভগিনী, শাশুড়ী বৌ প্রভৃতি সম্পর্কের সুন্দর চিত্র স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে প্রশংসা না করিয়া থাকা যায় না।'[২৭]

(নায়ক-নায়িকার প্রেমের রূপায়ণেই বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহ ছিল। তবে, 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি প্রেমের কাহিনীতে প্রেমও আছে, সামাজিক সমস্যাও উহ্য নেই। তাঁর প্রথম যে-তিনখানি রোম্যান্সধর্মী উপন্যাসের সুদীর্ঘ বিশ্লেষণ এতক্ষণ পরিবেষিত হোলো, সেগুলির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই—হয় চমকপ্রদ ঘটনা, না-হয় কবিত্বের উচ্ছ্বাস,—প্রকৃতি বা মানব-সমাজের বর্ণনা,—কিংবা গল্পবস্তুর ধারা রক্ষার পক্ষে প্রয়োজনীয় আনুষঙ্গিক অন্য কোনো আয়োজন এসে পড়ায় প্রেমের স্ফুরণ ও পরিণতির অত্যাবশ্যক মনোবিশ্লেষণ বাধাগ্রস্ত হয়েছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' সেই বিশ্লেষণের রূপ সার্থকতর। 'কপালকুণ্ডলা'য় যেমন একটি মৌলিক ভাবের ঐশ্বর্য এবং সেই সঙ্গে পরমাশ্চর্য কবিত্বের সমাবেশ দেখা গেছে,—ইতিহাসের গৌরবচিন্তা মাত্র নয়,—প্রেমের অতি-পরিচিত আকুতি-বর্ণনা মাত্র নয়,—সেখানে যেমন তান্ত্রিক প্রথার ইঙ্গিত,—সমুদ্রতট ও বনভূমির পশ্চাৎপট,—নির্জনতা,—নারী,—মানবসত্তার স্বাধীনতা-স্পৃহা ইত্যাদি উপাদানের সমাবেশে কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি অনন্যা হয়ে দেখা দিয়েছে,—তাঁর 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে তেমনি নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী, নগেন্দ্রনাথ-কুন্দ ইত্যাদি সম্পর্কের বিশ্লেষণ,—প্রেমের স্ফুরণ, বিকাশ, সংঘাত, অনুতাপ ইত্যাদি অবস্থা-বৈচিত্র্যের কথা,—চরিত্রের ক্রমাভিব্যক্তি প্রভৃতি সূক্ষ্মতর ব্যাপার চোখে পড়ে। পরিবেশ বর্ণনাতে আগের তুলনায় বাস্তবতা রক্ষিত হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদে নগেন্দ্র দত্তের নৌযাত্রার বর্ণনা 'বিষবৃক্ষে'র এই বাস্তব অভিমুখিতাই স্পষ্ট ক'রে তোলে। ঝড়-বৃষ্টির ফলে নৌকা থেকে নগেন্দ্রনাথকে নামতে হয়েছে। প্রথম পরিচ্ছেদের শেষ অনুচ্ছেদে, তাঁকে সেই অন্ধকার রাত্রে, বহু কষ্টে

২৭। 'কাব্যসুধা'—পৃষ্ঠা ১১৩ দ্রষ্টব্য।

কুন্দনন্দিনীদের 'ইষ্টক নির্মিত প্রাচীন বাসগৃহে' উপস্থিত হতে দেখা যায়। অবশ্য, এও কতকটা বিস্ময়কর পরিস্থিতি। রোম্যান্সের বিস্ময়াবেশ ঘনিয়ে তোলবার দিকেই তাঁর স্থায়ী রুচি! 'বিষবৃক্ষে'র প্রথম খণ্ডে দ্বিতীয়-তৃতীয় পরিচ্ছেদে বাস্তব সংগতি বা সম্ভাব্যতা বজায় রেখে, তিনি সহায়হীনা কন্যার জন্যে মুমূর্ষু পিতার দুশ্চিন্তাও দেখিয়েছেন, পিতার শবদেহের পাশে শ্রান্ত কন্যার—'মৃণালনিন্দিত বাহূপরি মস্তক রক্ষা করিয়া নিদ্রা'র ছবিও এঁকেছেন! তৃতীয় পরিচ্ছেদে কুন্দর স্বপ্নবৃত্তান্তও—বাস্তব এবং অলৌকিক দুই-ই! চতুর্থ পরিচ্ছেদে, নগেন্দ্রনাথ ঝুমঝুমপুর গ্রাম থেকে লোকজন ডেকে, কুন্দনন্দিনীর পিতার সৎকারের ব্যবস্থাও সম্পূর্ণ করেন। তারপর, তিনি শ্যামবাজারে কুন্দর মেসো বিনোদ ঘোষের কাছে তাকে পৌঁছে দেবার জন্যে কলকাতার পথে এগিয়েছেন। বিনোদ ঘোষের সন্ধান না পেয়ে, পঞ্চম পরিচ্ছেদে, নগেন্দ্রনাথ তাঁকে তাঁর বোনের বাড়িতে নিয়ে আসেন।

কমলমণির স্বামী শ্রীশচন্দ্র মিত্র ধনবান ব্যক্তি। এই স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অপরিসীম প্রীতি। কমলমণি আর সূর্যমুখী দুজনেই এক মেম- সাহেবের কাছে ইংরেজি শিখেছিলেন। কুন্দকে কমলমণির বাড়িতে রাখবার কোনা বাধা ছিল না। কমলমণিকে নগেন্দ্রনাথ বলেন—'এখন তুমি ইহাকে না রাখিলে আর রাখিবার স্থান নাই। পরে আমি যখন বাড়ি যাইব—উহাকে গোবিন্দপুরে লইয়া যাইব।'

এই পঞ্চম পরিচ্ছেদে—একসঙ্গে কমলমণির স্নেহ, সারল্য, আর পরিহাস-পটুতার পরিচয় আছে। অল্প কয়েকটি রেখাপাতে চরিত্র-রূপায়ণের এই কৌশল বিস্ময়কর। সূর্যমুখী এবং হরদেব ঘোষালের কাছে দুখানি চিঠিতে নগেন্দ্রনাথ কুন্দর উল্লেখ করেন। সে-খবর,—এবং সূর্যমুখীর জবাবের বৃত্তান্তও এই পরিচ্ছেদেই জানা গেছে। তারাচরণের সঙ্গে তিনি কুন্দর বিবাহ দিতে চান। তাই, পরের পরিচ্ছেদে তারাচরণের পরিচয়। তার আগেই, পঞ্চমের শেষদিকে লেখকের স্মরণীয় মন্তব্য—'এখন কমলমণি, সূর্যমুখী, নগেন্দ্র, তিন জনে মিলিত হইয়া বিষবীজ রোপণ করিলেন। পরে তিন জনেই হাহাকার করিবেন।' এ-পরিচ্ছেদের শেষ সংবাদ—'বজরা সাজাইয়া নগেন্দ্র কুন্দকে লইয়া গোবিন্দপুরে যাত্রা করিলেন।' তখন—

> 'কুন্দ স্বপ্ন প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল। নগেন্দ্রের সঙ্গে যাত্রাকালে একবার তাহা স্মরণপথে আসিল। কিন্তু নগেন্দ্রের কারুণ্যপূর্ণ

মুখকান্তি এবং লোকবৎসল চরিত্র মনে করিয়া কুন্দ কিছুতেই বিশ্বাস করিলনা যে, ইহা হইতে তাহার অনিষ্ট হইবে। অথবা কেহ কেহ এমন পতঙ্গবৃত্ত যে, জ্বলন্ত বহ্নিরাশি দেখিয়াও তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়।'

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের শুরুতেই, সংক্ষিপ্ত কয়েকটি অনুচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র পাঠককে ধৈর্যরক্ষার পরামর্শ দিয়ে গেছেন। তারপর সূর্যমুখীর পরিচয়,—এবং সেই সূত্রেই তারাচরণের প্রসঙ্গ :)

'সূর্যমুখীর পিত্রালয় কোন্নগর। তাঁহার পিতা একজন ভদ্র কায়স্থ; কলিকাতার কোন হৌসে কেশিয়ারি করিতেন। সূর্যমুখী তাঁহার একমাত্র সন্তান। শিশুকালে শ্রীমতী নামে এক বিধবা কায়স্থকন্যা দাসীভাবে তাঁহার গৃহে থাকিয়া সূর্যমুখীকে লালন-পালন করিত। শ্রীমতীর একটি শিশুসন্তান ছিল, তাহারই নাম তারাচরণ। সে সূর্যমুখীর সমবয়স্ক। সূর্যমুখী তাহার সহিত বাল্যকালে খেলা করিতেন এবং বাল্যসখিত্ব প্রযুক্ত তাহার প্রতি তাঁহার ভ্রাতৃবৎ স্নেহ জন্মিয়াছিল।

শ্রীমতী বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিপদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্যমুখীর পিতার গৃহ ত্যাগ করিয়া গেল।...

শ্রীমতী তারাচরণকে দেখিয়া গিয়াছিল। তারাচরণ সূর্যমুখীর পিতৃগৃহে রহিল।'

(সূর্যমুখীর পিতার মৃত্যুর পর তারাচরণ তাঁরই কাছে আশ্রয় পায়। নগেন্দ্রনাথকে দিয়ে গ্রামে একটি ইস্কুল প্রতিষ্ঠা করিয়ে, তারাচরণকে সূর্যমুখী সেখানে শিক্ষক নিযুক্ত করান। এই সূত্রে, ব্রাহ্ম মত ও শিক্ষাদর্শ সম্বন্ধে আবার একটু সমাজ-সমালোচনা দেখা দেয় :)

'এক্ষণে গ্রাণ্ট-ইন-এডের প্রভাবে গ্রামে গ্রামে তেড়িকাটা টপ্পাবাজ নিরীহ ভালমানুষ মাস্টারবাবুরা বিরাজ করিতেছেন, কিন্তু তৎকালে সচরাচর 'মাস্টারবাবু' দেখা যাইত না। সুতরাং তারাচরণ একজন গ্রাম্য দেবতার মধ্যে হইয়া উঠিলেন। বিশেষতঃ তিনি *Citizen of the World* এবং *Spectator* পড়িয়াছিলেন,

> এবং তিন বুক জিওমেট্রি তাঁহার পঠিত থাকার কথাও বাজারে রাষ্ট্র ছিল। এইসকল গুণে তিনি দেবীপুর-নিবাসী জমিদার দেবেন্দ্র-বাবুর ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইলেন এবং বাবুর পারিষদ মধ্যে গণ্য হইলেন। সমাজে তারাচরণ বিধবাবিবাহ, স্ত্রীশিক্ষা এবং পৌত্তলিকবিদ্বেষাদি সম্বন্ধে অনেক প্রবন্ধ লিখিয়া, প্রতি সপ্তাহে পাঠ করিতেন, এবং 'হে পরমকারুণিক পরমেশ্বর'!—এই বলিয়া আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন।'

[স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তারাচরণের খুবই উদারভাব! তার কারণ,—'তাঁহার নিজের গৃহ স্ত্রীলোকশূন্য'! এই কটাক্ষও বিশেষভাবে বঙ্কিমেরই নামাঙ্কবাহী! সূর্যমুখী এই তারাচরণের সঙ্গেই কুন্দর বিয়ের কথা ভাবেন।]

[সপ্তম পরিচ্ছেদে, গোবিন্দপুরে এসে নগেন্দ্রনাথের ঐশ্বর্য দেখে, কুন্দ অবাক হয়। প্রকাণ্ড বাড়ি, অনেক সম্পদ, অজস্র আত্মীয়-পরিজন নিয়ে বাড়ি যেন 'কাক সমাকুল বটবৃক্ষের ন্যায়'! এ উপমাও বাস্তব জগতের স্মারক। সূর্যমুখীর রূপ-বর্ণনাও এই পরিচ্ছেদের অন্যতম বিষয়। 'সূর্যমুখী পূর্ণচন্দ্রতুল্যা তপ্তকাঞ্চনবর্ণা।' নিজের দাসীকে ডেকে, তিনি তাকে কুন্দনন্দিনীর পরিচর্যার ভার দেন। সেই দাসীকে দেখেই, কুন্দ চমকে ওঠে।—'দেখিয়া কুন্দের শরীর কণ্টকিত এবং আপাদমস্তক স্বেদাক্ত হইল। যে স্ত্রীমূর্তি কুন্দ স্বপ্নে মাতার অঙ্গুলিনির্দেশক্রমে আকাশপটে দেখিয়াছিল, এই দাসীই সেই পদ্মপলাশলোচনা শ্যামাঙ্গী!' তারই নাম 'হীরা'।

অষ্টম পরিচ্ছেদে, পাঠককে সম্বোধন ক'রে, ঔপন্যাসিকের আবার একটি মন্তব্য দেখা দেয়। উপন্যাসের আঙ্গিক-বিচিন্তার দিক থেকে তাঁর এসব মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। ঘটনাস্রোতে,—এখানে তিনি কুন্দনন্দিনীর বিবাহ ঘটিয়ে দিয়ে, তাঁর পাঠকের কাছে তারই কৈফিয়ৎ দিয়েছেন,—যেমন ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে তারাচরণের কথা ব'লতে-ব'লতে হঠাৎ পাঠককে ধৈর্যরক্ষার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।] অষ্টম পরিচ্ছেদটি শুরু হয়েছে এইভাবে :

> 'এইখানে পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইবেন। আখ্যায়িকা গ্রন্থের প্রথা আছে যে, বিবাহটা শেষে হয়; আমরা আগেই কুন্দ-নন্দিনীর বিবাহ দিতে বসিলাম। আরও চিরকালের প্রথা আছে যে, নায়িকার সঙ্গে যাহার পরিণয় হয়, সে পরম সুন্দর হইবে, সর্বগুণে বিভূষিত, বড় বীরপুরুষ হইবে এবং নায়িকার প্রণয়ে

ঢল ঢল করিবে। গরিব তারাচরণের ত এ সকল কিছুই নাই।'

[কুন্দর বিবাহ আর বৈধব্য দুই-ই এই অষ্টম পরিচ্ছেদে ঘটে যায়—এবং দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের একটি মাত্র বাক্যে বিয়ের খবর পাওয়া যায়—'সে যাহা হউক, কুন্দনন্দিনীকে নগেন্দ্র বাটী লইয়া আসিলে তারাচরণের সঙ্গে তাহার বিবাহ হইল।' তারপর, উত্তরোত্তর প্লটের ঘাত-প্রতিঘাত বেড়েছে। দেবেন্দ্রের বৈঠকখানায় অবিবাহিত তারাচরণ ইতিপূর্বে নারী-প্রগতি সম্বন্ধে যে সব ধারণা প্রকাশ করেছে,—বিয়ের পরে সুন্দরী কুন্দনন্দিনীর স্বামী হিসেবে সে-সব ঘোষণা অনুসারে কাজ করা তার পক্ষে আর সম্ভব নয়। সূর্যমুখীর ভয়ে, বছর-খানেকের মধ্যেও, দেবেন্দ্রের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর আলাপ করিয়ে দিতে পারেনি তারাচরণ। তারপর—

> 'দেবেন্দ্র একদিন স্বয়ং দলবলে তারাচরণের আলয়ে উপস্থিত হইলেন। এবং তারাচরণকে মিথ্যা দাম্ভিকতার জন্য ব্যঙ্গ করিতে লাগিলেন। তখন অগত্যা তারাচরণ কুন্দনন্দিনীকে সাজাইয়া আনিয়া দেবেন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। কুন্দনন্দিনী দেবেন্দ্রের সঙ্গে কি আলাপ করিল? ক্ষণকাল ঘোমটা দিয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া কাঁদিয়া পলাইয়া গেল। কিন্তু দেবেন্দ্র তাঁহার নব-যৌবন সঞ্চারে অপূর্ব শোভা দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। সে শোভা আর ভুলিলেন না।'

দেবেন্দ্র আবার একবার তারাচরণের বাড়িতে এসে কুন্দের সঙ্গে আলাপ ক'রে গেছেন শুনে, সূর্যমুখী তাঁকে তিরস্কার করেন। তাতে কুন্দর সঙ্গে তাঁর পুনরালাপের চেষ্টা বন্ধ হয়। এইভাবে তিন বছর কেটে যায়। তারপর তারাচরণের মৃত্যু হয়। এবং লেখকের আসল মনোযোগ যে কুন্দর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে,—তারাচরণ যে নিতান্তই গৌণ চরিত্র, তার প্রমাণ আছে এই অষ্টম পরিচ্ছেদেরই শেষ দুটি অনুচ্ছেদে :]

> 'বিবাহের পর এইরূপে তিন বৎসর কাটিল। তাহার পর কুন্দনন্দিনী বিধবা হইলেন। জরবিকারে তারাচরণের মৃত্যু হইল। সূর্যমুখী কুন্দকে আপন বাড়িতে আনিয়া রাখিলেন। তারাচরণকে যে বাড়ি করিয়া দিয়াছিলেন, তাহা বেচিয়া কুন্দকে কাগজ করিয়া দিলেন।

পাঠক মহাশয় বড় বিরক্ত হইলেন সত্য, কিন্তু এত দূরে আখ্যায়িকা আরম্ভ হইল। এত দূরে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইল।'

[পঞ্চম পরিচ্ছেদে বলা হয়েছিল যে, কমলমণি, সূর্যমুখী, নগেন্দ্র—তিনজনের সম্মিলিত প্রয়াসে বিষবীজ রোপণ করা হয়; আবার, অষ্টমের এই শেষ অনুচ্ছেদে বিষবৃক্ষের বীজ বপনের উল্লেখ দেখা গেল। এইভাবে 'বিষবৃক্ষ' নামটির উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বিশ্লেষণ এগিয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে 'সূর্যমুখী' চরিত্রের সঙ্গে 'কুন্দনন্দিনী' চরিত্রের একরকম তুলনাও এতে অনুস্যূত হয়ে আছে, যেমন,—অষ্টম পরিচ্ছেদে কুন্দনন্দিনীর অভিভাবিকা হিসবে সূর্যমুখীর স্নেহ, শাসন, দৃঢ়তা, এবং কোমলতার ইঙ্গিত;—নবম পরিচ্ছেদে 'হরিদাসী বৈষ্ণবী' ছদ্মবেশে বিধবা কুন্দনন্দিনীকে দেখতে এসে, দেবেন্দ্র সেই মহিলা-মজলিশে 'জয় রাধে' বলে হাজির হয়,—সেই নিখুঁত সভা-বর্ণনার মধ্যেও দেখা যায়—'সূর্যমুখী এ সভায় ছিলেন না। তিনি কিছু গর্বিত, এ সকল সম্প্রদায়ে বড় বসিতেন না।'

নগেন্দ্র আর দেবেন্দ্র যে একই বংশের সন্তান,—এবং গোবিন্দপুরের নগেন্দ্রের পিতামহ যে দেবীপুরের দেবেন্দ্রের পিতামহের সঙ্গে মামলায় জিতেছিলেন,—ফলে, বংশের দুই শাখায় যে আর মিল হয়নি, দশম পরিচ্ছেদে সে-সব কথার উল্লেখ আছে। দেবেন্দ্রের পত্নী হৈমবতী খুবই মুখরা এবং আত্মপরায়ণা। হৈমবতীর সঙ্গে বিয়ের আগে পর্যন্ত—এই দেবেন্দ্র ছিলেন নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ। কিন্তু হৈমবতীর জ্বালায় অস্থির হয়ে তিনি—'হৈমবতীর কেশাকর্ষণ করিয়া তাঁহাকে পদাঘাত করিলেন। এবং সেই দিন হইতেই গৃহত্যাগ করিয়া পুষ্পোদ্যানমধ্যে তাঁহার বাসোপযোগী গৃহ প্রস্তুতের অনুমতি দিয়া কলিকাতায় গেলেন।' তার আগেই দেবেন্দ্রের পিতৃবিয়োগ হয়ে গেছে। এ অবস্থায় স্ত্রীর দুর্ব্যবহারে,—কল্যাণকর্মে উদাসীন দেবেন্দ্রের নিজের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত থাকাই স্বাভাবিক!] কলকাতা থেকে ফিরে—

'তিনি দেবীপুরে প্রত্যাগমন করিয়া রিফরমার বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিলেন। প্রথমেই এক ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপিত করিলেন। তারাচরণ প্রভৃতি অনেক ব্রাহ্ম জুটিল; বক্তৃতার আর সীমা রহিল না। একটা ফিমেল স্কুলের জন্যও মধ্যে মধ্যে আড়ম্বর করিতে লাগিলেন, কিন্তু কাজে বড় বেশি করিতে পারিলেন না। বিধবা-বিবাহে বড় উৎসাহ। এমন কি, দুই চারিটা কাওরা তিওরের

বিধবা মেয়ের বিবাহ দিয়া ফেলিয়াছিলেন ; কিন্তু সে বরকন্যার গুণে। জেনানারূপ কারাগারের শিকল ভাঙ্গার বিষয় তারাচরণের সঙ্গে তাঁহার এক মত—উভয়েই বলিতেন মেয়েদের বাহির কর। এ বিষয়ে দেবেন্দ্রবাবু বিশেষ কৃতকার্য হইয়াছিলেন—কিন্তু সে বাহির করার অর্থবিশেষে।'

[মাতুলপুত্র সুরেন্দ্রই দেবেন্দ্রের একমাত্র হিতার্থী ছিলেন]। দশম পরিচ্ছেদের শেষে, সুরেন্দ্রকে দেবেন্দ্র বলেন—'আমাকে যে সৎপথে যাইতে অনুরোধ করে, তুমি ভিন্ন এমন আর কেহ নাই। যদি কখন আমি [মদ] ত্যাগ করি, সে তোমারই অনুরোধে করিব।...আর যদি কখন আমার স্ত্রীর মৃত্যু সংবাদ কর্ণে শুনি—তবে মদ ছাড়িব। নচেৎ এখন মরি বাঁচি সমান কথা।'

[একাদশ পরিচ্ছেদে, দেবেন্দ্রের দিক থেকে ঘটনাস্রোত হঠাৎ যেন সূর্যমুখীর দিকে ফিরে যায় এবং—কমলমণির কাছে সূর্যমুখীর সুদীর্ঘ চিঠি, আর,—শেষ একটিমাত্র অনুচ্ছেদে কমলমণির লেখা তারই উত্তর চোখে পড়ে ! সূর্যমুখীর এই চিঠি থেকেই বোঝা যায় যে, ইতিমধ্যে অনেক ঘটনা ঘটে গেছে। সূর্যমুখীর সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথের মনে তখন বিমুখ জোয়ার দেখা দিয়েছে।] সূর্যমুখী কমলমণিকে লেখেন :

'তুমি সে হতভাগিনীকে যখন দেখিয়াছিলে, তখন সে বালিকা। এখন তাহার বয়স ১৭।১৮ বৎসর হইয়াছে। সে যে সুন্দরী, তাহা স্বীকার করিতেছি। সেই সৌন্দর্যই আমার কাল হইয়াছে।

পৃথিবীতে যদি আমার কোন সুখ থাকে, তবে সে স্বামী ; পৃথিবীতে যদি আমার কোন চিন্তা থাকে, তবে সে স্বামী : পৃথিবীতে যদি আমার কোন কিছু সম্পত্তি থাকে, তবে সে স্বামী ; সেই স্বামী কুন্দনন্দিনী আমার হৃদয় হইতে কাড়িয়া লইতেছে। পৃথিবীতে আমার যদি কোন অভিলাষ থাকে, তবে সে স্বামীর স্নেহ। সেই স্বামীর স্নেহে কুন্দনন্দিনী আমাকে বঞ্চিত করিতেছে।

তোমার সহোদরকে মন্দ বলিও না। আমি তাঁহার নিন্দা করিতেছি না। তিনি ধর্মাত্মা, শত্রুতেও তাঁহার চরিত্রের কলঙ্ক এখনও করিতে পারে না। আমি প্রত্যহ দেখিতে পাই তিনি প্রাণপণে আপনার চিত্তকে বশ করিতেছেন। সে দিকে কুন্দনন্দিনী

থাকে, সাধ্যানুসারে কখন সেদিকে নয়ন ফিরান না। নিতান্ত প্রয়োজন না হইলে তাহার নাম মুখে আনেন না। এমন কি, তাহার প্রতি কর্কশ ব্যবহারও করিয়া থাকেন। তাহাকে বিনা দোষে ভর্ৎসনা করিতেও শুনিয়াছি।'

এই চিঠিতে হৃদয়াবেগের লক্ষণ স্পষ্ট। তাছাড়া আরো একটি দিক বিবেচ্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে চরিত্র আর প্লটের আকর্ষণ মানতেই হয়, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর সংলাপের ভাষা যেমন কৃত্রিম, চিঠির ভাষাও তেমনি কৃত্রিম হয়ে ওঠে! তবু সাধুভাষায় লেখা, সুন্দরভাবে সাজানো, কিঞ্চিৎ বাগ্মিতাধর্মী এই চিঠিতে সূর্যমুখীর মনের কথা সোজাসুজিই ব্যক্ত হয়েছে। কমলমণির কাছে তাঁর নিজের অভিযোগের সত্যতা যথাযথভাবেই গৃহীত হবে,—এই ছিল তাঁর আশা। তিনি কমলমণিকে লিখেছেন—'পুরুষ এ কথা জিজ্ঞাসা করিলে বুঝান বড় ভার হইত; কিন্তু তুমি মেয়েমানুষ এতক্ষণে বুঝিয়াছ।' আর, আসন্ন দুর্যোগের সম্ভাবনা তাঁর মনে অন্য সমালোচনাও জাগিয়েছে। এই চিঠিতেই তিনি লেখেন:

'আর একটা হাসির কথা। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নামে কলিকাতায় কে না কি বড় পণ্ডিত আছেন, তিনি আবার একখানি বিধবাবিবাহের বহি বাহির করিয়াছেন। যে বিধবার বিবাহের ব্যবস্থা দেয়, সে যদি পণ্ডিত, তবে মূর্খ কে? এখন বৈঠকখানায় ভট্টাচার্য ব্রাহ্মণ আসিলে সেই গ্রন্থ লইয়া বড় তর্ক-বিতর্ক হয়। সেদিন ন্যায়-কচকচি ঠাকুর মা সরস্বতীর সাক্ষাৎ বরপুত্র বিধবা-বিবাহের পক্ষে তর্ক করিয়া বাবুর নিকট হইতে টোল মেরামতের জন্য দশটি টাকা লইয়া যায়। তাহার পরদিন সার্বভৌম ঠাকুর-বিধবাবিবাহের প্রতিবাদ করেন। তাঁহার কন্যার বিবাহের জন্য আমি পাঁচ ভরির সোনার বালা গড়াইয়া দিয়াছি। আর কেহ বড় বিধবাবিবাহের দিকে নয়।'

প্রেমের সত্যাসত্য-চিন্তা সাহিত্য-সমাজের চিরকালের ব্যক্তি-মনের সত্য। কিন্তু তারই মধ্যে,—নিজের কালের বিশেষ রুচি, আচার, আদর্শের ভাবনা অনুপ্রবিষ্ট হতে দিয়েছিলেন বঙ্কিম। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এও রোহিণীর বিধবা-বিবাহ-সম্ভাবনার কথা ওঠে। নগেন্দ্রনাথ আর গোবিন্দলাল উভয়েই ছিলেন রূপমুগ্ধ পুরুষ! কুন্দনন্দিনী এবং রোহিণী উভয়েই নায়কের প্রণয়ে

আকৃষ্ট! এই রূপমোহ আর প্রণয়াকর্ষণ ব্যক্তিমনের সমস্যা। কিন্তু বিধবা-বিবাহ এক সামাজিক আচার। সে-আচার শুধু ব্যক্তির অধিকারের বিষয় নয়,—তাতে জাতির জীবনের ব্যাপকতর ক্ষেত্রে, বিশেষ আদর্শ-অনুসরণের ঔচিত্যের চিন্তা জড়িত! সমাজবিবেকী বঙ্কিম তাতে অনুমোদন জানাতে কুণ্ঠিত ছিলেন। সূর্যমুখীর চিঠির উত্তরে কমলমণি কিন্তু সে-সব ভাবনা ফুৎকারে নিশ্চিহ্ন ক'রতে চেয়েছেন। তিনি লেখেন—'তুমি পাগল হইয়াছে।...স্বামীর প্রতি যাহার বিশ্বাস রহিল না তাহার মরাই মঙ্গল।'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদের নাম 'অঙ্কুর'। একদিকে কুন্দনন্দিনীর দুর্বার আকর্ষণ, অন্যদিকে তাঁর অভ্যস্ত বিবেকবোধ,—এই দুয়ের দ্বন্দ্বে নগেন্দ্রনাথের মনে অশান্তির অঙ্কুর বেড়ে ওঠে। বিষয়কর্মে তাঁর অবহেলা বেড়ে যায়, শুরু হয় মদ্যপান। ধীরে ধীরে 'বিষবৃক্ষে'র পরিণতি ঘটতে থাকে।]

['মৃণালিনী'তে এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ যেমন বিড়াল দেখা দিয়েছে, 'বিষবৃক্ষে'র এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে তেমনি আবার বিড়ালের কথা ওঠে। নগেন্দ্রনাথকে অসুস্থ দেখে, সূর্যমুখী তাঁকে ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করেন। কিন্তু—'নগেন্দ্র শিশি হাতে লইয়া পড়িয়া দেখিয়া একটা বিড়ালকে ছুঁড়িয়া মারিলেন—বিড়াল পলাইয়া গেল—ঔষধ তাহার ল্যাজ দিয়া গড়াইয়া পড়িতে পড়িতে গেল।']

এই সময়ে, হরদেব ঘোষালকে নগেন্দ্রনাথ লেখেন—'আমার উপর রাগ করিও না—আমি অধঃপাতে যাইতেছি।' আর, কমলমণির কাছে সূর্যমুখী লেখেন—'একবার এসো! কমলমণি! ভগিনি! তুমি বই আর আমার সুহৃদ কেহ নাই। একবার এসো।'

[গোবিন্দপুরের দত্ত-পরিবারের পুত্রকন্যাহীন দম্পতির এই ঘোর দুর্ঘটনার আবহাওয়া থেকে বেরিয়ে,—সুস্থ, সুখী সংসারে—স্বামীর স্নেহ,—পত্নীর সগৌরব অধিকার-বোধ,—এবং শিশুর হাস্য-কলরবের উজ্জ্বল প্রসন্ন পরিবেশে প্রবেশ করবার সুযোগ পাওয়া যায় ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে! শ্রীশচন্দ্র আর কমলমণির সহজ মমতার ছবি এবং শিশুসন্তান সতীশচন্দ্রের শৈশবকল্লোচ্ছ্বাস এসে,—হঠাৎ যেন প্রতীক্ষিত এক বিরতির মাধুর্যে মন ভরে দেয়! তারপর

চতুর্দশ পরিচ্ছেদে, ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে কমলমণি তাঁর দাদা-বৌদির কাছে আসেন। নগেন্দ্রের মুখমণ্ডলে তখন ঘোর অশান্তির মেঘ। এদিকে, কমলের প্রকৃতি 'চিরপ্রেমময়ী'। সেই মমতায় কুন্দও আকৃষ্ট হয়। নগেন্দ্রনাথের প্রতি তার অনুরাগের কথা সে তাই কমলের কাছে গোপন রাখতে পারে না। সে কমলের সঙ্গে গোবিন্দপুর ছেড়ে চলে যেতে রাজী হয়। পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক লাইনে লেখক নিজে জানান—'কুন্দনন্দিনী পরের মঙ্গল-মন্দিরে আপনার প্রাণের প্রাণ বলি দিল। নগেন্দ্রের মঙ্গলার্থ, সূর্যমুখীর মঙ্গলার্থ, নগেন্দ্রকে ভুলিতে স্বীকৃত হইল।'

অতঃপর পনেরোর পরিচ্ছেদে হরিদাসী বৈষ্ণবী আবার গোবিন্দপুরের দত্ত-বাড়িতে গান শোনাতে আসে। কিন্তু এবার তার আসল পরিচয় সম্বন্ধে মহিলা-মহল একটু বেশি সজাগ হয়ে ওঠে। কুন্দর সঙ্গে হরিদাসীর নির্জনে আলাপের দৃশ্য সূর্যমুখীর চোখে পড়ে যায়। সন্দেহের কথা শুনে, কমলমণি বলেন—'আমি একটা বাবলার ডাল আনি। মিন্সেকে কাঁটা ফোটার সুখটা দেখাই।' এবং হরিদাসী বৈষ্ণবীর আসল পরিচয় জানবার জন্যেই হীরা দাসীকে নিযুক্ত করা হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদটি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ-ষোড়শ-সপ্তদশ পরিচ্ছেদের সঙ্গে তুলনীয়। সে-উপন্যাসে পর পর এই তিনটি পরিচ্ছেদ জুড়ে বারুণীর জলে রোহিণীর আত্মহত্যার চেষ্টা, আর, গোবিন্দলাল কর্তৃক তার উদ্ধার-বৃত্তান্তের বর্ণনা আছে। 'বিষবৃক্ষে' কিন্তু তিনটি নয়,—এই একটি পরিচ্ছেদেই কুন্দ-নগেন্দ্রের অপ্রত্যাশিত সান্নিধ্যের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। 'সেই দিন প্রদোষকালে উদ্যানমধ্যস্থ বাপীতটে বসিয়া কুন্দনন্দিনী'—এইভাবে পরিচ্ছেদ শুরু ক'রে,—কুন্দর আত্মহত্যার সংকল্প,—নগেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তার প্রণয়াকুতি ইত্যাদির স্বগতোক্তি শুনিয়ে, তার মনে পুরোনো সেই স্বপ্ন-বৃত্তান্ত জেগে ওঠবার খবর দিয়েই) বঙ্কিম লিখেছেন :

> 'অস্খলিত সংকল্পে সে মাতার আজ্ঞাপালনার্থ ধীরে ধীরে যাইতেছিল। এমত সময় পশ্চাৎ হইতে কে অতি ধীরে ধীরে তাহার পৃষ্ঠে অঙ্গুলি স্পর্শ করিল। বলিল, 'কুন্দ!' কুন্দ দেখিল—সে অন্ধকারে দেখিবামাত্র চিনিল—নগেন্দ্র।'

কুন্দর আত্মহত্যা তাই স্থগিত থাকে। ঘটনাস্রোতের এই দুর্নিবার পরিণতি দেখিয়েই বঙ্কিম পরের অনুচ্ছেদে লিখেছেন :

> 'আর নগেন্দ্র! এই কি তোমার এত কালের সুচরিত্র? এই কি তোমার এত কালের শিক্ষা? এই কি স্বর্যমুখীর প্রাণপণ প্রণয়ের প্রতিফল? ছি ছি! দেখ, তুমি চোর!'

নগেন্দ্র সেদিন প্রশ্ন করেছিলেন, 'বিধবার বিবাহ কি অশাস্ত্র?'......বল বল—বল, আমার গৃহিণী হইবে কি না?'

কুন্দ বলেছেন : 'না।'

> 'তখন নগেন্দ্র চাহিয়া দেখিলেন পুষ্করিণী নির্মল, সুশীতল,—কুসুম-বাস-সুবাসিত—পবনহিল্লোলে তন্মধ্যে তারা কাঁপিতেছে,—ভাবিলেন, উহার মধ্যে শয়ন কেমন?
>
> 'অন্তরীক্ষে যেন কুন্দ বলিতে লাগিল, 'না'। বিধবার বিবাহ শাস্ত্রে আছে। তাহার জন্য নয়। তবে কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন? স্বচ্ছ বারি—শীতল জল—নিচে নক্ষত্র নাচিতেছে—কুন্দ ডুবিয়া মরিল না কেন?'

পাঠককে এই শেষ প্রশ্নের জবাব অনুমান ক'রতে দিয়ে, পরের পরিচ্ছেদে হীরা-দেবেন্দ্র সাক্ষাতের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। কুন্দর জন্যে দেবেন্দ্রের মত্ততা,—তার সুরাসক্তি ইত্যাদিরই দৃষ্টান্তর এটি। তার দুর্ব্যবহারে, তার একমাত্র সুহৃদ সুরেন্দ্র এই পরিচ্ছেদেই তাকে পরিত্যাগ ক'রতে বাধ্য হন। আর, হীরা স্বর্যমুখীর পরামর্শেই হরিদাসী বৈষ্ণবীর খবর নিতে গিয়ে দেবেন্দ্রের বাড়িতে ধরা পড়লেও,—কুন্দর জন্যে দেবেন্দ্রের ব্যাকুলতার দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেও—'কুন্দ যে নির্দোষী, তাহা হীরাও বলিল না, স্বর্যমুখীও বুঝিলেন না।'

আবার পাঠকের কৌতূহল উদ্রিক্ত ক'রে বঙ্কিম জানিয়েছেন—'হীরা কেন সে কথা লুকাইল—পাঠক তাহা ক্রমে বুঝিতে পারিবেন।'

অতঃপর কুন্দকে স্বর্যমুখী তিরস্কার করেন। সেই ঘটনার পরে সে গৃহত্যাগ করে।

আঠারোর পরিচ্ছেদের নাম 'অনাথিনী'।

নগেন্দ্রনাথের সঙ্গে কুন্দনন্দিনীর প্রথম দেখা হয় এক ঝড়ের রাত্রে। তারপর আবার এই ঝড়ের রাত্রি! মেঘাচ্ছন্ন আকাশ, রাত্রি গভীর! সে রাত্রে—'অনাথিনী সংসারসমুদ্রে একাকিনী ঝাঁপ দিল'। আলোকিত

জানলায় একবার নগেন্দ্রনাথের মুখ দেখা যায়। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ জানলেন না, অন্য কেউই জানলো না! প্রকৃতির ঝড়ের সঙ্গে সঙ্গে, কুন্দর অন্তরের ঝড়ের এই বিশেষ ছন্দ-রক্ষা হয়তো শেক্‌স্‌পীয়রের 'কিং লীয়রের' ক্ষীণ প্রতিধ্বনি! হয়তো বঙ্কিম নিজে এ-বিষয়ে সচেতন ছিলেন। কিন্তু ঝড়ের ছবি ফুটিয়ে তোলার চেয়ে, গল্পের স্রোতে পরবর্তী ঘটনা ফুটিয়ে তোলবার দায়িত্বই তিনি এখানে বেশি মেনেছেন। সে রাত্রে সামান্য একটু আশ্রয়ের জন্যে কুন্দকে এক কুটীরের দরজায় এসে দাঁড়াতে হয়। সে কুটীর হীরার! ঘরের দরজা খুলে দিয়ে হীরা বলে—'বুঝিয়াছি, তিরস্কারে পলাইয়াছ। ভয় নাই। আমি কাহারও সাক্ষাতে বলিব না। আমার এইখানে দুই দিন থাক।'

প্লটের চমক সার্থক ক'রে তোলবার জন্যে এইভাবে অভাবিতপূর্ব জায়গায় অভাবিতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়ে তোলবার চেষ্টা যে অতিনাটকীয়, তাতে সন্দেহ নেই! কিন্তু সেটুকু কৃত্রিমতা বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যাসের মধ্যেই গণ্য। অতঃপর উনিশ-কুড়ি পরিচ্ছেদে হীরার রাগ-দ্বেষের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। একুশের পরিচ্ছেদের শিরোনাম—'হীরার কলহ—বিষবৃক্ষের মুকুল'!

হীরার বাড়িতে কুন্দ আশ্রয় নেবার পরের রাত্রে, উনিশের পরিচ্ছেদেই, দেবেন্দ্রের অনুগৃহীতা মালতী গোয়ালিনী এসে হীরাকে ডেকে নিয়ে যায়। দেবেন্দ্র অনেক টাকার লোভ দেখিয়ে কুন্দকে—'বিক্রয় করিতে বলিলেন'! তাতে খুবই রাগ ক'রে হীরা বলে—'ইহার উত্তর আমি দিতে পারিব না। আমার মুনিবকে বলিব। তিনি ইহার উপযুক্ত উত্তর দিবেন।'

কুড়ির পরিচ্ছেদে, আবার গোবিন্দপুরের দত্ত-পরিবারের খবর। নগেন্দ্র, সূর্যমুখী, কমলমণি—কুন্দর গৃহত্যাগে সকলেই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত। এদিকে, হীরা ভাবে যে, বিধাতা তার সম্বন্ধে নির্দয়!—'বিধাতা তাহাকে ফাঁকি দিয়াছে, সেও সকলকে ফাঁকি দিতে চায়। হীরাকে সূর্যমুখীর আসনে বসাইলে, হীরার কি খলকপট থাকিত?'—সূর্যমুখীর সম্বন্ধে তার এই ঈর্ষা, আর দেবেন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণ—এখানে এই দুটি দিকই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

'বিষবৃক্ষে' ছোটো বড় সব চরিত্র সম্বন্ধেই তাঁর এই বিশ্লেষণ-প্রয়াস চোখে পড়ে। তবে, হীরার পক্ষে এই ধরনের মনোভাব কতোটা সংগত, তাও বিচার্য। সে ধনীর দাসী; কিন্তু মনিবের পত্নীর সঙ্গে ভাগ্য-বিনিময়ের

কল্পনা এক্ষেত্রে নিতান্তই তার বিদ্বেষ-বুদ্ধির পরিচায়ক। কুন্দকে সে দেবেন্দ্রের কাছে বিক্রয় ক'রতে পারেনি,—তার কারণ, দেবেন্দ্রের প্রতি তার নিজের অনুরাগ; সে ভেবেছে—'নগেন্দ্রকে কুন্দনন্দিনী দিব'! তার কারণ, নগেন্দ্র-সূর্যমুখীর সম্পর্কের মাধুর্য ধূলিসাৎ হোক্—এই তার কামনা! সে টাকাও চায়,—দাসীপনাতেও তার বিরক্তি ধরে গেছে। এই সংকল্পের পরে, সে তার 'আয়ী'কে কুটুমবাড়িতে পাঠিয়ে দিয়ে, কুন্দকে নিজের বাড়িতে রেখে আদরযত্ন দেখায়। সরলমতি কুন্দ ভাবে, 'হীরার মত মানুষ আর নাই, কমলও আমায় এত ভালবাসে না।'

'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসের খলচরিত্র এই হীরা। দেবেন্দ্রের দুর্বুদ্ধি অনেকটা তার স্ত্রী হৈমবতীর মন্দ স্বভাবের ফল। কিন্তু হীরা দেবেন্দ্রের তুলনায় আরো উগ্র, তীব্র, দুর্মতি! একুশের পরিচ্ছেদে, নগেন্দ্রনাথ আর সূর্যমুখীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাবার সংকল্প সে কাজে পরিণত ক'রতে আরম্ভ করে। কৌশল্যা নামে অন্য এক পরিচারিকার সঙ্গে ঝগড়া শুরু ক'রে,—সূর্যমুখীর কাছে তিরস্কৃত হয়ে,—সূর্যমুখীর দুর্ব্যবহার সম্বন্ধে নগেন্দ্রনাথকে কল্পিত অভিযোগ জানিয়ে,—সূর্যমুখীই যে কুন্দনন্দিনীকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, হীরা সে-কথাও বলে যায়। নগেন্দ্রনাথ তাকে বিদায় দিয়ে, সূর্যমুখীকে কুন্দর কথা জিগেস করেন। এবং সেই সময়েই কথায়-কথায় নগেন্দ্রনাথের মনের কথা বেরিয়ে পড়ে! তিনি নিজেই বলেন—'আমি পাপাত্মা—আমার চিত্ত বশ হইল না'; এবং—'কুন্দনন্দিনীকে সন্ধান করিয়া আমি দেশ-দেশান্তরে ফিরিব।'

এই মর্মান্তিক চিত্তদাহের দৃশ্যেই আবার কবি-কল্পনার কাজ দেখা দেয়:

> 'এই শেলসম কথা শুনিয়া সূর্যমুখী কি বলিবেন? কয়েক মুহূর্ত প্রস্তরময়ী মূর্তিবৎ পৃথিবীপানে চাহিয়া রহিলেন। পরে সেই ভূতলে অধোমুখে শুইয়া পড়িলেন। মাটিতে মুখ লুকাইয়া সূর্যমুখী—কাঁদিলেন কি? হত্যাকারী ব্যাঘ্র যেরূপ হত জীবের যন্ত্রণা দেখে, নগেন্দ্র সেইরূপ স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দেখিতেছিলেন।...'

স্বামীর কাছে এক মাস সময় চেয়ে নিয়ে, সূর্যমুখী নিজের ভবিষ্যৎ কর্তব্য স্থির ক'রতে চান। ইতিমধ্যে পর পর তিনটি পরিচ্ছেদে [২২, ২৩, ২৪] আবার হীরা-দেবেন্দ্র-কুন্দর কথা! দত্ত-বাড়ি থেকে হীরার চাকরি গেছে। মালতী গোয়ালিনী কৌশলে জেনে গেছে যে, কুন্দকে হীরাই লুকিয়ে রেখেছে। মালতীর কাছ থেকেই দেবেন্দ্র তা' জানতে পারেন। তেইশের পরিচ্ছেদে,

কুন্দর মনোভাবের বিশ্লেষণ দেখা যায়—তখন একদিকে লজ্জা, অন্যদিকে প্রণয়াকর্ষণ! নগেন্দ্রনাথের আশায়, সে দত্ত-বাড়িতেই ফিরে যাওয়া স্থির করে। হীরার বাড়িতে তারই সন্ধানে, দেবেন্দ্র এসে পড়বার আগে,—সে নিজে নগেন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে পৌঁছোয়! সূর্যমুখীই তাকে প্রথম দেখতে পান। দেখে, তাকে সাদরে ঘরে নিয়ে যান।

পরের পরিচ্ছেদে—সেইদিন রাত্রে—'দেবেন্দ্র দত্ত একাকী ছদ্মবেশে সুরারঞ্জিত হইয়া কুন্দনন্দিনীর অনুসন্ধানে হীরার বাড়িতে দর্শন দিলেন।' এবং —'দেবেন্দ্র হীরার মুখে অর্ধব্যক্তস্বরে শুনিলেন যে, হীরা দেবেন্দ্রকে মনে মনে প্রাণ সমর্পণ করিয়াছে।' কিন্তু পরমুহূর্তেই দেবেন্দ্রকে সে বলে—'আপনি যান —নহিলে আমি লোক ডাকিব—আপনি কেন আমার সর্বনাশ করিতে আসিয়াছিলেন?' এই তিরস্কারের মধ্যেই—বাংলা উপন্যাসের সেই আদি-পর্বে, হীরার মনোবিশ্লেষণ-প্রয়াসের চিহ্ন আছে। দেবেন্দ্র তাকে পত্নী হিসেবে গ্রহণ করতে পারেন,—কিন্তু 'কুলটা' হিসেবে আত্মনিবেদন ক'রতে হীরা বিমুখ! দেবেন্দ্র কিন্তু, এসব কোমল অনুভূতির রসিক ছিলেন না।—'দেবেন্দ্র আর এক ঢোঁক পান করিয়া বলিলেন, ভাল, ভাল! হীরে, তুমি ভাল বক্তৃতা করিয়াছ। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে একদিন বক্তৃতা দিবে?'

পঁচিশের পরিচ্ছেদে, কমলমণির কাছে লেখা সূর্যমুখীর চিঠি থেকে জানা যায় যে, নগেন্দ্র-কুন্দনন্দিনীর বিবাহ আসন্ন,—ঘটক স্বয়ং সূর্যমুখী! 'লোকরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর' ইত্যাদির রীতিতে, শ্রীশচন্দ্রের হুঁকা-তামাকের উদ্দেশে এখানে কিছু সংক্ষিপ্ত উচ্ছ্বাসোক্তি আছে,—সতীশচন্দ্রের সঙ্গে তার মা-বাবার স্নেহভাষণেরও পুনরাবৃত্তি আছে,—কিন্তু এ দুঃসংবাদে কমলমণির বিচলিত অবস্থার চিহ্নই এখানে সর্বাধিক! কমলমণির পরামর্শে নগেন্দ্রনাথকে ঠাট্টা ক'রে শ্রীশচন্দ্র এক চিঠি লেখেন। সে-চিঠির জবাবে নগেন্দ্র বিধবা-বিবাহ, পুরুষের একাধিক বিবাহ ইত্যাদি বিষয়ে নিজের মতামত উল্লেখ ক'রে, কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে বিবাহের প্রস্তাবে যে নড়চড় হবার সম্ভাবনা নেই, তারই ইশারা দেন! ছাব্বিশের পরিচ্ছেদে, কমলমণি আর শ্রীশচন্দ্রকে গোবিন্দপুরে এসে পৌঁছতে দেখা যায়; তখন বিয়ে হয়ে গেছে।

সাতাশের পরিচ্ছেদে, কমলমণির সঙ্গে সূর্যমুখীর অন্তরঙ্গ কয়েকটি কথা,—তাঁর তীব্র হৃদয়-যন্ত্রণা এবং সেই সঙ্গে আরো একটি খবর আছে। সূর্যমুখী সেইরাত্রেই বাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হন! পরের পরিচ্ছেদটি তাঁর বিদায়-লিপিতেই

সম্পূর্ণ। কমলমণিকে তিনি আশীর্বাদ জানিয়ে গেছেন। 'আরও আশীর্বাদ করি যে, যে দিন তুমি স্বামীর প্রেমে বঞ্চিতা হইবে, সেইদিন যেন তোমার আয়ুঃশেষ হয়। আমায় এ আশীর্বাদ কেহ করে নাই।' [তারপর উনত্রিশের পরিচ্ছেদের শিরোনামে দেখা যায়—'বিষবৃক্ষ কি ?']

[ইতিমধ্যে বিষবৃক্ষের 'বীজরোপণ', 'বপন', 'মুকুল'-সমাগমের বৃত্তান্ত ইত্যাদি দেখা গেছে। তারপর উনত্রিশের সূচনায় লেখকের মন্তব্য :

> 'যে বিষবৃক্ষের বীজ বপন হইতে ফলোৎপত্তি এবং ফলভোগ পর্যন্ত ব্যাখ্যানে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা সকলেরই 'গৃহপ্রাঙ্গণে রোপিত আছে। রিপুর প্রাবল্য ইহার বীজ ; ঘটনাধীনে তাহা সকল ক্ষেত্রে উপ্ত হইয়া থাকে। কেহই এমন মনুষ্য নাই যে, তাঁহার চিত্ত রাগদ্বেষকামক্রোধাদির অদৃশ্য।...চিত্তসংযমের অভাবই ইহার অঙ্কুর, তাহাতেই এ বৃক্ষের বৃদ্ধি। এই বৃক্ষ মহাতেজস্বী ; একবার ইহার পুষ্টি হইলে আর নাশ নাই। এবং ইহার শোভা অতিশয় নয়নপ্রীতিকর ; দূর হইতে বিবিধবর্ণ পল্লব ও সমুৎফুল্ল মুকুলদাম দেখিতে অতি রমণীয়। কিন্তু ইহার ফল বিষময় ; যে খায়, সেই মরে।'

তারপর, জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে লেখকের একটি কথা—'অন্তঃকরণের পক্ষে দুঃখভোগই প্রধান শিক্ষা।'

তিরিশ থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত 'বিষবৃক্ষে'র শেষ কুড়িটি পরিচ্ছেদে, অতঃপর বিষবৃক্ষের ফলের পরিচয় এবং বিভিন্ন চরিত্রের প্রায়শ্চিত্তের কাহিনী। উনত্রিশের শেষ অনুচ্ছেদে লেখক বলেছেন—'নগেন্দ্রের যে দোষ নাই, এমত বলি না। তাঁহার দোষ গুরুতর ; প্রায়শ্চিত্তও গুরুতর আরম্ভ হইল।'

তিরিশের পরিচ্ছেদে সূর্যমুখীর জন্যে অনুসন্ধানের সূচনা। শ্রীশচন্দ্র কলকাতায় যান, কমলমণি গোবিন্দপুরে অনুসন্ধান-ব্যবস্থায় নিযুক্ত থাকেন। একত্রিশের পরিচ্ছেদে, কুন্দনন্দিনীর সুখের সীমার কথা ওঠে! অদৃষ্টের ক্রীড়নক এই সহায়হীনার প্রতি নগেন্দ্রনাথের বিমুখতা দেখা দেয়। সূর্যমুখীর অভাবে তখন এই নর-নারী-সমাবেশের প্রতিটি জীবনেরই ছন্দ ব্যাহত হয়েছে!]কুন্দ-নগেন্দ্রের এই সময়ের কথার ধারা এই রকম :

> কুন্দ। 'তুমি আমাকে বিবাহ করিয়া যে সুখী করিয়াছ—তাহা আমি কখনও আশা করি নাই। আমি তাহা বলি না—

—আমি বলিতেছিলাম যে, কি করিলে সূর্যমুখী ফিরিয়া আসে?'

নগেন্দ্র। 'ঐ কথাটি তুমি মুখে আনিও না। তোমার মুখে সূর্যমুখীর নাম শুনিলে আমার অন্তর্দাহ হয়—তোমারই জন্য সূর্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল।'

[তখন কুন্দনন্দিনী ভাবেন—'এটি কি তিরস্কার? আমার ভাগ্য মন্দ—কিন্তু আমি ত কোন দোষ করি নাই। সূর্যমুখীই ত এ বিবাহ দিয়াছে।' কমলমণিও অপ্রসন্ন হন। অতঃপর বত্রিশের পরিচ্ছেদে—'বিষবৃক্ষের ফল'।] হরদেব ঘোষালের কাছে নগেন্দ্রনাথ এক চিঠিতে লেখেন—'তুমি লিখিয়াছ যে এ পৃথিবীতে যত কাজ করিয়াছি, তাহার মধ্যে কুন্দনন্দিনীকে বিবাহ করা সর্বাপেক্ষা ভ্রান্তিমূলক কাজ। ইহা আমি স্বীকার করি। শুধু তাই নয়—ভ্রান্তি। ভ্রান্তি। এখন চেতনা হইয়াছে। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছিল মরিবার জন্য।'

হরদেব ঘোষাল তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে লেখেন:

'প্রেম বুদ্ধিবৃত্তিমূলক। প্রণয়াস্পদ ব্যক্তির গুণসকল যখন বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা পরিগৃহীতা হয়, হৃদয় সেই সকল গুণে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রতি সমাকৃষ্ট এবং সঞ্চালিত হয়, তখন সেই গুণাধারের সংসর্গলিপ্সা এবং তৎপ্রতি ভক্তি জন্মে। ইহার ফল সহৃদয়তা এবং পরিণামে আত্মবিস্মৃতি ও আত্মবিসর্জন। এই যথার্থ প্রণয়; শেক্সপীয়র, বাল্মীকি, শ্রীমদ্ভাগবতকার ইহার কবি।'

সূর্যমুখীর প্রত্যাবর্তন-সম্ভাবনা সম্বন্ধে এই চিঠিতেই তিনি তাঁর বিশ্বাসের কথা জানান:

'তুমি নিরাশ হইও না। সূর্যমুখী অবশ্য পুনরাগমন করিবেন—তোমাকে না দেখিয়া তিনি কতকাল থাকিবেন? যতদিন না আসেন, তুমি কুন্দনন্দিনীকে স্নেহ করিও। তোমার পত্রাদিতে যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে বোধ হইয়াছে, তিনিও গুণহীনা নহেন। রূপজ মোহ দূর হইলে কালে স্থায়ী প্রেমের সঞ্চার হইবে। তাহা হইলে তাঁহাকে লইয়াই সুখী হইতে পারিবে। এবং যদি তোমার জ্যেষ্ঠা ভার্যার সাক্ষাৎ আর না পাও, তবে তাঁহাকে ভুলিতেও পারিবে।'

এই চিঠির জবাবে নগেন্দ্রনাথ লেখেন :

'এক মাস হইল, আমার সূর্যমুখী আমাকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।...আমিও গৃহত্যাগ করিব।...তাঁহাকে পাই, লইয়া গৃহে আসিব; নচেৎ আর আসিব না। [কুন্দনন্দিনীকে লইয়া আর গৃহে থাকিতে পারিনা। সে চক্ষুশূল হইয়াছে। তাহার দোষ নাই—দোষ আমারই,—কিন্তু আমি তাঁহার মুখদর্শন আর সহ্য করতে পারি না।']

[কুন্দনন্দিনীর প্রতি নির্মমতা এখানেই চরমে পৌঁছেছে! মনে পড়ে, অল্প বয়সে রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন :

'সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্রের শেষকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিরকালের জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল না? যখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক ফাটিয়া যাইতেছে, যখন উৎসবের কোলের উপর শোকের কঙ্কাল, তখন তাহার অপেক্ষা আর ট্র্যাজেডি কি আছে? কুন্দনন্দিনীর সমস্ত শেষ হইয়া গেল বলিয়া বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে—কুন্দনন্দিনী ত এ ট্র্যাজেডির উপলক্ষ্য মাত্র। নগেন্দ্র ও সূর্যমুখীর মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল বাঁচিয়া রহিল—মিলনের সহিত বিয়োগের চিরস্থায়ী বিবাহ হইল;—আমরা বিষবৃক্ষের শেষে এই নিদারুণ অশুদ্ধ বিবাহের প্রথম বাসরের রাত্রি মাত্র দেখিতে পাইলাম—বাকীটুকু কেবল চোখ বুজিয়া ভাবিলাম—ইহাই ট্র্যাজেডি। অনেকে জানেন না, সমস্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় ট্র্যাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সেমিকোলনে যতটা ট্র্যাজেডি থাকে, দাঁড়িতে ততটা থাকে না। কিন্তু যাঁহারা না বুঝিয়া ট্র্যাজেডি লিখিতে যান, তাঁহারা কাব্যের আরম্ভ হইতেই বিষ ফরমাস দেন, ছুরি শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে শুরু করেন।'[২৮]

২৮। 'মেঘনাদবধ কাব্য' [রবীন্দ্র-রচনাবলী, অচলিত ২; পৃষ্ঠা ৭৪। প্রথম প্রকাশ—'ভারতী' ভাদ্র, ১২৮৯]

হরদেব-নগেন্দ্রের এই পত্রালাপে,—আর 'মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের তরুণ বয়সের এই মন্তব্যে—'বিষবৃক্ষ' ট্র্যাজেডির আসল কথা,—অর্থাৎ তার গভীর যন্ত্রণার দিক সুন্দরভাবে ব্যক্ত হয়েছে। এই উপন্যাসের মাধ্যমে 'প্রেম', 'মোহ' ইত্যাদি সম্বন্ধে তিনি যে সমালোচনা জাগিয়ে তোলেন, 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এও সেই একই বিতর্ক আর-এক ভাবে দেখা দেয়! পুরুষের একাধিক বিবাহের বা ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর আনুষঙ্গিক তর্ক-বিতর্ক অনেকটাই তাঁর নিজের কালের পরবর্তী সমাজ-মনের,—তথা পরবর্তী ব্যক্তি-মনের বিতর্ক! তাঁর আমলে একান্নবর্তী-পরিবার, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার ছিল আমাদের সমাজের অভ্যস্ত সত্য। সে-পরিবেশে বিধবা-বিবাহের যৌক্তিকতা সম্বন্ধে অনুকূল মত দিতে কুণ্ঠিত হওয়াই স্বাভাবিক।] রবীন্দ্রনাথের সেই তরুণ বয়সের অন্য এক রচনায় এ-কথারও সমর্থন ছিল। পাদটীকায় তাঁর সে-উক্তির কয়েক ছত্র তুলে দেওয়া হোলো।[২৯]

[তেত্রিশের পরিচ্ছেদে আবার দেবেন্দ্র-হীরার প্রসঙ্গ। দেবেন্দ্র একদিন সন্ধ্যায় হীরার কাছে এসে, কুন্দর সঙ্গে দেখা করবার প্রস্তাব করেন। ফলে,

২৯। 'সমস্যা' [প্রথম প্রকাশ 'ভারতী' ফাল্গুন, ১২৯১] প্রবন্ধে তখনকার বঙ্গসমাজ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন: 'পুরুষদের মধ্যে ইংরাজি শিক্ষা ব্যাপ্ত হইয়াছে, স্ত্রীলোকদের মধ্যে হয় নাই। শিক্ষার প্রভাবে পুরুষেরা স্থির করিয়াছেন বাল্য-বিবাহ দেশের পক্ষে অমঙ্গলজনক—ইহাতে সন্তান দুর্বল হয়, অল্প বয়সে বহু পরিবারের ভারে সংসার-সাগরে অশ্রুপূর্ণ লোনাজলে হাবুডুবু খাইতে হয় ইত্যাদি।...কিন্তু স্ত্রীলোকেরা এরূপ শিক্ষা পান নাই এবং অধিক বয়সে বিবাহ করিবার জন্য প্রস্তুতও হন নাই।...আপিষের অন্নের ন্যায় প্রত্যুষেই তাঁহাদিগকে খরতাপে চড়ান হইয়াছে, এবং ক্রমাগত গরম মসলা পড়িতেছে—চেষ্টা হইতেছে যাহাতে দশ, বড় জোর সাড়ে দশের আগেই রীতিমত 'কনে' পাকাইয়া তাঁহাদিগকে ভদ্রলোকের পাতে দেওয়া যাইতে পারে।...একান্নবর্তী পরিবারের মধ্যে অধিক বয়স্ক নূতন লোক প্রবেশ করিতে পারে না। চরিত্রগঠনের পূর্বেই উক্ত পরিবারের সহিত লিপ্ত হওয়া চাই, নতুবা সেই নূতন লোক অচর্বিত কঠিন খাদ্যের ন্যায় পরিবারের পাকস্থলীতে প্রবেশ করিয়া বিষম বিশৃঙ্খলা উপস্থিত করে।'

ইংরাজি শিক্ষা সত্ত্বেও কেহ কেহ এমন বিবেচনা করেন যে, বিধবা-বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত নহে।...যত দিন একান্নবর্তিত্ব একেবারে না ভাঙ্গিয়া যায়, ততদিনই বা বিধবা-বিবাহ সুচারুরূপে সম্পন্ন হইবে কি করিয়া?'

তাই তাঁর সিদ্ধান্ত এই ছিল যে,—'মূল ধর্মনীতিসমূহের ন্যায় সমাজ-নীতি সকল অবস্থায় সকল লোকের পক্ষে উপযোগী না হইতে পারে।'

হীরার কৌশলেই সমুচিত শাস্তি ভোগ ক'রে সে-দিন তাঁকে পালাতে হয়! অতঃপর চৌত্রিশের পরিচ্ছেদে আবার সূর্যমুখীর প্রসঙ্গ।

নগেন্দ্রের বিদেশ-যাত্রার পরে, কুন্দ-সম্পর্কে দেবেন্দ্রের কু-অভিসন্ধি প্রতিরোধের জন্যেই হীরা কুন্দনন্দিনীর পরিচারিকা হয়ে আসে। দেবেন্দ্র সমুচিত শাস্তি ভোগ ক'রে, হীরার বিরুদ্ধে প্রতিশোধের সংকল্প নেন। তেত্রিশের শেষ অনুচ্ছেদে সে-কথা জানিয়ে,—ছত্রিশের পরিচ্ছেদে হীরার প্রতি দেবেন্দ্রের কপট প্রণয়-প্রদর্শন উল্লেখ ক'রে,—চল্লিশের পরিচ্ছেদে দেবেন্দ্রের পদাঘাত,—এবং সেই লাঞ্ছনার ফলেই হীরার আত্মহত্যার বাসনা দেখিয়েছেন বঙ্কিম। কিন্তু হীরা তার নিজের সংগৃহীত বিষ নিজে খায়নি! সে-বিষ সে কুন্দকে খাইয়েছে!

ইতিমধ্যে, নগেন্দ্রনাথের অনাদরে, কুন্দনন্দিনীর গভীর বেদনার বিবর, পাওয়া যায় বিয়াল্লিশের পরিচ্ছেদে। তেতাল্লিশে—নগেন্দ্রনাথ তাঁর বিষয়-সম্পত্তির দানপত্র রেজেষ্ট্রি করবার জন্যে গোবিন্দপুরে এসেও কুন্দনন্দিনীর সঙ্গে দেখা করেন না! তারপর, চুয়াল্লিশ থেকে ছেচল্লিশ পরিচ্ছেদে কেবল সূর্যমুখীর প্রত্যাগমনের বিবরণ। সাতচল্লিশের পরিচ্ছেদে কুন্দ আবার স্বপ্নে তাঁর মায়ের দেখা পান। চার বছর আগে, পিতার মৃত্যুর পরে, ঝুমঝুমপুরের সেই স্বপ্নের সঙ্গে,—চার বছরের এই বহুযন্ত্রণাবিক্ষত জীবনের অভিজ্ঞতা মিলিয়ে দেখবার উপলক্ষ্য সেই স্বপ্ন!

সাক্ষাৎভাবে হীরার প্রণয়ভঙ্গ, আর দেবেন্দ্রের প্রতিহিংসার আয়োজন অবলম্বন ক'রেই কুন্দনন্দিনীর সামনে বিষের পাত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্লটের এই দিকটি সার্থক ক'রে তোলবার জন্যেই, চার বছর পরে কুন্দনন্দিনীকে পূর্বপ্রতিশ্রুত স্বপ্ন দেখানো হয়েছে। সেই স্বপ্নে কুন্দর জননী এসে বলেন—'বলিয়াছিলাম আর একবার আসিব; তাই আবার আসিলাম। এখন যদি সংসারসুখে পরিতৃপ্তি জন্মিয়া থাকে, তবে আমার সঙ্গে চল।' অশ্রুমুখী কুন্দ সেই স্বপ্নাবস্থাতেই বলেন—'মা, তুমি আমাকে সঙ্গে লইয়া চল। আমি আর এখানে থাকিতে চাহিনা।' পরদিন সকালে কুন্দর কান্না দেখে,—হীরার—'আনন্দে হৃদয় ভাসিয়া গেল'। এই পরিচ্ছেদের নাম—'সরলা এবং সর্পী'! সর্পার মুখ থেকেই সরলা এ-পরিচ্ছেদে প্রথম 'আত্মহত্যা' শব্দটি উচ্চারিত হতে

শোনেন! হীরা এইসূত্রে নিজের প্রণয়ভঙ্গ আর লাঞ্ছনার খবরও জানিয়ে দেয়। কিন্তু সে-সব কথা অন্যমনা কুন্দর কানে পৌঁছোয় না! বিষের কৌটো খোলা হয়।—'আমিষলোলুপ মার্জারবৎ কুন্দ তাহার প্রতি দৃষ্টি করিতে লাগিল।'[৩০]

সূর্যমুখী যে ফিরে এসেছেন, হীরা তখনো তা জানতো না! আটচল্লিশের পরিচ্ছেদে পৌঁছে দেখা যায়,—এক পৌরস্ত্রীর মুখে হীরা সূর্যমুখীর প্রত্যাগমনের খবর পায় এবং তখন সে অনুভব করে যে, তিনিই 'ঘরের লক্ষ্মী' আর তার নিজের 'যম'!

কমলমণিকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যমুখী কুন্দকে দেখতে আসেন। কমলমণিকে তিনি বলেন—'সে আমার কাছে কোন দোষ করে নাই বা তাহার উপর আমার রাগ নাই। সে আমার এখন কনিষ্ঠা ভগিনী।'

সেকালের পক্ষে এই সপত্নীবিদ্বেষহীনতা বাস্তব কিংবা অবাস্তব, সে তর্কে-বিতর্কে নায়ক-নায়িকা বা পাঠক-পাঠিকাকে বঙ্কিম বেশিক্ষণ ব্যাপৃত রাখতে নারাজ! ঘটনার দ্রুত গতিবেগ রক্ষার দিকেই এখানে তাঁর বিশেষ মনোযোগ! আটচল্লিশের শেষ কয়েক ছত্রে সেই প্রবণতারই আর-এক নিদর্শন চোখে পড়ে। সূর্যমুখী কাঁদতে-কাঁদতে,—নগেন্দ্রনাথকে কুন্দর বিষপানের খবর দিয়ে,—উপযুক্ত চিকিৎসকের ব্যবস্থা ক'রতে যান। নগেন্দ্রনাথ এসে ঘরে প্রবেশ করেন। তারপর, আর মৃত্যুযন্ত্রণার চিহ্নও নেই,—কেবল পরস্পরের প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংক্ষিপ্ত দুটি উক্তি! ইনি বলেন 'তুমি কি দোষে ত্যাগ করিয়া যাইতেছ?' উনি বলেন, 'তুমি কি দোষে আমাকে ত্যাগ করিয়াছ'? সূর্যমুখী যেমন বলতে পারতেন, তেমনি অকৃত্রিম অনুরাগভরেই কুন্দ নগেন্দ্রনাথকে বলেছেন—'আমি তোমার হাসিমুখ দেখিতে দেখিতে যদি না মরিলাম—তবে আমার মরণেও সুখ নাই।' নগেন্দ্রনাথ ভেবেছেন—'অন্তকালে সবাই সমান'!

এই আটচল্লিশের পরিচ্ছেদেই 'বিষবৃক্ষ' কাহিনীর এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা প্রতিনায়িকার যথাবিধি অন্ত্যেষ্টি ঘটে যায়। সেইসঙ্গে পুরুষের খর্বতা, আর নারীর বিজয়িনী-বেশ,—অন্ধকারে-উজ্জ্বলে,—বৈপরীত্যের অভ্যস্ত সমাবেশই এ-কাহিনীর সমাপ্তি চিহ্নিত ক'রে রেখেছে!

৩০। মার্জার-সম্পর্কিত উল্লেখ বঙ্কিমের প্রিয় প্রয়োগগুলির অন্যতম। এখানে এই প্রয়োগ পুনর্বার এ-মন্তব্যের সমর্থক। নায়কের 'পদাঘাত'ও তাঁর এই রকম আর একটি প্রয়োগ।

বিষবৃক্ষের ফল প্রধানতঃ নগেন্দ্রনাথেরই প্রাপ্য ছিল। তাঁর সেই ফলপ্রাপ্তির বিবরণ আগেই শেষ হয়েছে। অবস্থাচক্রে সূর্যমুখী এবং কুন্দনন্দিনী দুজনেই ছিলেন বিষফলের অংশীদার! দুজনের জীবনেই সে-অংশফলও দেখা গেল। অতঃপর শেষ পরিচ্ছেদে হীরা-দেবেন্দ্রের কথা। কুন্দনন্দিনীর মৃত্যুকালেই হীরা নিরুদ্দেশ হয়। নগেন্দ্রনাথ তাকে ডাকাডাকি ক'রেছিলেন, কিন্তু তার দেখা পাননি। গোবিন্দপুরে হীরার নাম লুপ্ত হয়ে যায়। তার অনেক পরে, দেবেন্দ্র যখন 'কদর্য রোগগ্রস্ত',—সেই সময়ে, উন্মাদ অবস্থায় হীরা তার সঙ্গে দেখা ক'রে নিজের অপরাধের কথা জানিয়ে বলে—'শেষে তোমার কুন্দকে বিষ খাওয়াই মনের দুঃখ মিটাইলাম; তাহার মৃত্যু দেখিয়া অবধি আমার রোগ বাড়িল।...এখন তোমার মরণ নিকট শুনিয়া একবার আহ্লাদ করিয়া তোমাকে দেখিতে আসিয়াছি। আশীর্বাদ করি নরকেও যেন তোমার স্থান না হয়।' দেবেন্দ্রের মৃত্যুর পরেও সে মরেনি! উন্মাদিনী দেবেন্দ্রের বাগানে এসে, গভীর রাত্রে জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র কয়েক ছত্র গান করতো!

উপন্যাসের শেষ বাক্যে বঙ্কিম লিখে গেছেন—'আমরা বিষবৃক্ষ সমাপ্ত করিলাম। ভরসা করি ইহাতে গৃহে গৃহে অমৃত ফল ফলিবে।'

এই শেষ কথাটিতে এ-উপন্যাসের সমাজকল্যাণ-সম্পর্কিত উদ্দেশ্য-চেতনা একটু বিশেষভাবে উচ্চারিত হয়েছে। কিন্তু উপন্যাসে পাত্র-পাত্রীর জীবনাভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই এ-কথা তিনি বেশ জোরের সঙ্গে বলেছেন; অতএব, এই অন্তিম মন্তব্যটি বাহুল্য তো বটেই,—তাছাড়া সৃজনধর্মী এই রচনার রসেরও কতকটা বিঘ্ন বলে মনে হয়। বোধ হয়, তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে পাঠকের কাছে কোনো অনির্দিষ্টতা রাখতে চান নি। পাপের প্রতি শুধু তাঁর সহজ বিতৃষ্ণা ছিল বললেও তাঁর আসল মনোভাব ঠিক-ঠিক বলা হয় না। সংসারে সংকীর্ণ ব্যক্তিস্বার্থচেতনার তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ প্রতিবাদী। তাঁর এই বিমুখতা তাঁর শিল্পী হিসেবে তীব্র সক্রিয়তারই উদাহরণ।

এ-উপন্যাসে চৌত্রিশ থেকে ছেচল্লিশের পরিচ্ছেদের মধ্যে সূর্যমুখীর নিরুদ্দেশ অবস্থা থেকে তাঁর প্রত্যাগমনের বৃত্তান্ত ছড়িয়ে আছে। চৌত্রিশের পরিচ্ছেদে, কাশীর পথে,—তীর্থযাত্রী এক ব্রহ্মচারী—বর্ষাকালের এক

রাত্রে 'মরণোন্মুখী' সূর্যমুখীকে কুড়িয়ে পান। হরমণি নামে তাঁর পরিচিতা এক প্রাচীনার কুটীরে সূর্যমুখীর সেবার ব্যবস্থা ক'রে,—তাঁকে আত্মহত্যা ক'রতে নিষেধ ক'রে,—এই শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী এক চিঠিতে নগেন্দ্রনাথকে রানিগঞ্জে মাধবচন্দ্র গোস্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রতে লেখেন। তখন নগেন্দ্রনাথ কাশীতে। গোবিন্দপুর ঘুরে, সে-চিঠি তাঁর কাছে পৌঁছোতে দেরি হয়। সাঁইত্রিশের পরিচ্ছেদে দেখা যায়, নগেন্দ্রনাথ গ্রামে এসে শিবপ্রসাদ ব্রহ্মচারীর দেখা পান না, কিন্তু শোনেন যে, হরমণির গৃহদাহে সূর্যমুখী মারা গেছেন! ফলে, গভীর নৈরাশ্যে নগেন্দ্রনাথের মনে হয় যে,—সেই তেত্রিশ বছর বয়সেই তাঁর সমস্ত শেষ হয়ে গেছে! এই গভীর অনুতাপের ছবি কয়েক পরিচ্ছেদে ছড়িয়ে আছে। উনচল্লিশের পরিচ্ছেদে, শ্রীশচন্দ্রের কাছে নগেন্দ্রনাথ সূর্যমুখীর নিরুদ্দেশ ভ্রমণের কথা শোনেন। চুয়াল্লিশের পরিচ্ছেদটিই 'স্তিমিত প্রদীপে' শিরোনামে প্রসিদ্ধ। বাল্মীকি, ভবভূতি কালিদাস,—রামায়ণ, মহাভারত ইত্যাদি কবি ও কাব্যের স্মৃতিসমারোহময় নিশীথ পরিবেশে নগেন্দ্রনাথের অনুশোচনা দেখিয়ে,—এই পরিচ্ছেদেই সূর্যমুখীর 'ছায়া' দেখানো হয়েছে! 'কপালকুণ্ডলা'য় যেমন বিশেষ অর্থবহ ঘটনাসন্ধিতে প্রদীপ নিভেছিল, এখানেও সেই কৌশলেই—ছায়ামূর্তি আবির্ভাবের সঙ্গে-সঙ্গে,—'সেই সময় আলো নিবিল'! এবং—'তখন নগেন্দ্রনাথ চীৎকার করিয়া ভূতলে পড়িয়া মূর্চ্ছিত হইলেন।'

সূর্যমুখী এবং নগেন্দ্রনাথের পুনর্মিলনে,—দেবেন্দ্র, হীরা—এবং কুন্দেরও ধ্বংসসাধনে 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের সমাজদৃষ্টির চরিতার্থতা ঘটেছে। আখ্যান-পরিকল্পনা, চরিত্র-বৈচিত্র্য, সংলাপ-প্রকৃতি, ঘটনা-তরঙ্গ ইত্যাদি উপাদানগুলি একে একে দেখা গেল। বিধবা-বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর ধারণারও কতকটা আভাস পাওয়া গেল এ-উপন্যাসে।

১৮৭৩ এ 'বিষবৃক্ষ' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হবার পরে, ঐ বছরেই তাঁর 'ইন্দিরা' প্রকাশিত হয়। তারপর ১৮৭৪এ বেরোয় 'যুগলাঙ্গুরীয়'। এই দুখানি বইয়েরই আয়তন কম। অতঃপর তাঁর কথাসাহিত্য-ধারায় ১৮৭৫এ প্রকাশিত হয় 'চন্দ্রশেখর',—এবং সেই বছরেই 'রাধারাণী' বেরোয়। ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী—এই তিনখানি বইয়ের আলোচনা একসঙ্গে স্বীকার্য। তার আগে, 'চন্দ্রশেখর'-এর কথা ধরা যেতে পারে। কিন্তু তারও আগে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে 'সন্ন্যাসী' চরিত্রের পৌনঃপুনিক আবির্ভাব সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলবার আছে। এখন সংক্ষেপে, সেই প্রসঙ্গ আলোচ্য।

১৮৭৭-এ 'রজনী' বই হয়ে বেরোয়। সেটি 'চন্দ্রশেখর'-এর পরের ঘটনা। তবু সেই কাহিনীর একটি প্রসঙ্গ ধ'রেই এ আলোচনা এখানেই ধর্তব্য। একালে, বটুকনাথ ভট্টাচার্য তাঁর 'বঙ্কিম-সাহিত্যে সন্ন্যাস' প্রবন্ধে 'রজনী' উপন্যাসের সন্ন্যাসী সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্রের নিজের এই উক্তিটি স্মরণ করেন: 'আমাদের বাড়িতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত।' বঙ্কিম যে-সব সন্ন্যাসী-চরিত্রের ছবি এঁকে গেছেন, তাঁরা এই সাধারণ অর্থে,—গৃহীর দৃষ্টিতে দেখা,—এক ব্যাপক শ্রেণীতে পড়েন। 'দুর্গেশনন্দিনী'র অভিরাম স্বামী এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর গোবিন্দলাল নিজের নিজের অপকর্মে অনুতপ্ত হয়ে অথবা আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে উভয়েই গৃহত্যাগী হন। অভিরাম স্বামীর পূর্বনাম শশিশেখর ভট্টাচার্য। শশিশেখর প্রথম যৌবনে উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন। সম্পর্কে তিলোত্তমা তাঁর দৌহিত্রী, বিমলা কন্যা। পিতার তিরস্কারে তাঁকে গড়মান্দারণ ত্যাগ করতে হয়। কাশীতে কোনো এক দণ্ডীর কাছে দর্শনে-জ্যোতিষে পাণ্ডিত্য অর্জন ক'রেও তিনি স্বভাবদোষ ত্যাগ ক'রতে পারেন নি। বীরেন্দ্র সিংহের নিধন-ভূমিতে তাঁকে বিমলার পাশে থাকতে দেখা গেছে। আবার, জগৎসিংহ-তিলোত্তমার বিবাহ-সম্ভাবনায় তিনি এতোই খুশি হয়েছিলেন যে, বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে পুঁথির ওপর পা দিয়ে দাঁড়ান! 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর গোবিন্দলাল রোহিণীকে হত্যা ক'রে ভ্রমরের মৃত্যুর কারণ হয়ে, বারো বছর অজ্ঞাতবাস করেন। সেও সন্ন্যাসীর রূপ। বটুকনাথ বঙ্কিম-সাহিত্যের এই দুই সন্ন্যাসীর অবস্থা সম্বন্ধে বলেন—'আপৎ সন্ন্যাস বা বিধুর সন্ন্যাস'! দ্বিতীয় স্তরের সন্ন্যাসীদের মধ্যে তিনি 'সীতারাম'-এর শ্রী এবং গঙ্গাধর স্বামীর উল্লেখ করেন। গঙ্গাধরকে অবশ্য পরমযোগী বলা হয়েছে; শ্রী সে রকম নন,—জয়ন্তীর সঙ্গে তিনি সন্ন্যাসিনী সেজেছেন মাত্র। 'বিষবৃক্ষে' অভিমানবশে গৃহত্যাগিনী সূর্যমুখীকে সুস্থ ক'রে তুলে, ব্রহ্মচারী শিবপ্রসাদ শর্মা নগেন্দ্রনাথকে চিঠি লিখে মধুপুর গ্রামে আনিয়েছিলেন। 'চন্দ্রশেখর'-এর রমানন্দ স্বামী পরমহংস সিদ্ধ পুরুষ। যখন নবাব এবং ইংরেজের মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তখন যুদ্ধক্ষেত্রে রমানন্দ নিজে প্রতাপ আর চন্দ্রশেখরের পাশে এসে দাঁড়ান। 'রজনী'তে অবধূত তান্ত্রিকও এই দ্বিতীয় শ্রেণীর সন্ন্যাসী। এটিও ঠিক সন্ন্যাসগুণের শ্রেণী নয়। অভিরাম স্বামী এবং গোবিন্দলালকে বটুকনাথ যেমন তাঁদের পূর্ব জীবনের গ্লানি-মোচনের জন্যে

আত্মগোপনপ্রয়াসী সন্ন্যাসী হিসেবে একটি বিশেষ শ্রেণীভুক্ত ক'রেছেন,—দ্বিতীয় শ্রেণীর এইসব সন্ন্যাসীদের সম্বন্ধে তেমনি লক্ষ্য করেছেন যে, এঁরা উপন্যাসে অনেকটা গৌণ হয়ে আছেন। তাঁর নিজের কথায়—'দ্বিতীয় স্তরে কয়েকটি মামুলী ধরনের সন্ন্যাসী ও সাধকের অপূর্ণায়তন চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। এই চিত্রগুলি আবশ্যকীয় সকল রেখাপাতে পূর্ণভাবে অঙ্কিত হইয়া পাঠকের মানসনেত্রে স্পষ্ট আকার ধারণ করেনা—ইহাদিগকে ফুটাইয়া তুলিতে বঙ্কিমচন্দ্র সম্যক্ যত্ন-প্রয়োগ আবশ্যক বোধ করেন নাই। ইহারা আখ্যায়িকা-গুলিতে গৌণ চরিত্রের স্থান অধিকার করিয়াছে মাত্র।' দ্বিতীয় শ্রেণীটির এই ব্যাখ্যা দিয়ে, তিনি 'কপালকুণ্ডলার' কাপালিককেও এই শ্রেণীতেই জায়গা দিয়েছেন। কিন্তু সে কথা মেনে নিতে আপত্তি উঠতে পারে। কারণ, 'কপালকুণ্ডলা' কাহিনীতে কাপালিককে ঠিক গৌণ শক্তির মানুষ মনে করা সংগত নয়! মতিবিবির সঙ্গে ষড়যন্ত্র ক'রে,—কপালকুণ্ডলাকে সে যে সত্যিই ধ্বংস ক'রতে পেরেছিল, তাতে সন্দেহ নেই!

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রবন্ধ ও অন্যান্য গদ্য-রচনা স্মরণ ক'রে বটুকনাথ অতঃপর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যবর্তী আর-একটি শ্রেণীর উল্লেখ করেন :

> 'চৈতন্য সম্প্রদায়ের বৈরাগী ও বাবাজির দল বঙ্কিম-সাহিত্যে একরূপ বাদ পড়িয়াছে বলিলেই হয়। কেবল 'বিবিধ প্রবন্ধে'র তিনটি ছোট নকসায় গৌরদাস বাবাজির অপূর্ব চরিত্রটি তাঁহার কথাবার্তা ও কার্যকলাপের মধ্য দিয়া ফুটিয়া' [উঠিয়াছে]।
>
> 'বাবাজিতে মামুলী ধরনের কিছুই নাই। এটি একটি সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ছবি—সম্পূর্ণ গোঁড়ামি-বর্জিত। সেইজন্য বঙ্কিম-চিত্রিত সন্ন্যাসের দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মাঝে ইহার উপযুক্ত স্থান। বাবাজি তর্কে পটু—রূপক বুঝাইতে সুদক্ষ।...বাবাজি চিত্তশুদ্ধিকেই ধর্মের সার বুঝিয়াছেন। ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে বাবাজি রমাবল্লভবাবুকে বুঝাইতেছেন—বৈকুণ্ঠ বাহিরে নাই, ভিতরে আছে—মনের ভিতরে।'...ব্যাখ্যাশেষে বৈষ্ণবদ্বেষী রমাবল্লভবাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—'অতএব রে মূর্খ। এই সচ্চিদানন্দ পরম ব্রহ্মকে প্রণাম কর।'...

গৌরদাস বাবাজীর সঙ্গে কমলাকান্তের সাদৃশ্য অনুভব ক'রে, এইসূত্রেই তিনি লেখেন :

> 'এই গৌরদাস বাবাজি কমলাকান্তেরই দোসর—তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইবার উপযুক্ত। তফাৎ কমলাকান্ত পূর্ণাবয়ব তৈলচিত্র—গৌরদাস বাবাজি হ্রস্বায়তন রেখাঙ্কণ।'

অতঃপর বঙ্কিম-সাহিত্যের তৃতীয় স্তরের সন্ন্যাসীদের কথা উঠেছে। বটুকনাথের নিজের কথায় :

> 'দেবী চৌধুরাণী', 'আনন্দমঠ' ও 'সীতারামে' বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি পূর্ণায়তন সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর ছবি আঁকিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বঙ্কিম-চিত্রিত সন্ন্যাসচিত্ররাজির ইহারাই সার—ভগবদ্‌গীতোপদিষ্ট নিষ্কাম ধর্মের অনুশীলনে এসকল চরিত্রের মূল রহস্য। ইহাদের লইয়াই বঙ্কিম-সাহিত্যের তৃতীয় স্তর। ইহাদের মধ্যে দেবী চৌধুরাণী বা মহেন্দ্র-ভবানন্দ-জীবানন্দের সন্ন্যাস নৈমিত্তিক—সাময়িক। এই সাময়িক সংসার পরিহারকে সন্ন্যাস অপেক্ষা বরং ব্রহ্মচর্য বলাই উচিত। কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেহ ও মনের সকল শক্তির যে সঞ্চয় ও কেন্দ্রীকরণ তাহা সংযম, তাহা যোগ—কর্মী মাত্রেই তাহা অভ্যাস করিয়া থাকে। নিয়ন্ত্রিত হইলেও ইহাদের অন্তরে রিপুর তাড়না আছে—পাপপুণ্যের সংঘর্ষ আছে—ভাল-মন্দের বিপরীত স্রোতে ইতস্ততঃ চিত্তবিক্ষেপ আছে। ইহাদিগকে তৃতীয় স্তর অপেক্ষা প্রথম স্তরে স্থান দেওয়াই, বোধ হয়, অধিকতর সংগত।'

ডাকাতের সর্দার ভবানী পাঠক ডাকাতও বটে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও! দেবী চৌধুরাণী অর্থাৎ প্রফুল্ল ছিলেন গৃহস্থবধূ, হলেন সন্ন্যাসিনী! পাঁচ বছরে নানা শাস্ত্রের চর্চা ক'রে—পরিশেষে যোগ, ব্যায়াম, গীতাপাঠ ইত্যাদিতে তাঁর শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। শ্রীকৃষ্ণে কর্মফল অর্পণ ক'রে, সন্ন্যাসধর্মে আর ডাকাতিতে কিছুকাল কাটিয়ে, পরে তিনি পুনরায় অন্তঃপুরচারিণী হয়েছেন! এই অবিশ্বাস্য ব্যাপারটি সত্যিই চমকপ্রদ। আলোচক বটুকনাথ তাই প্রশ্ন করেন—'ইহাকে রোমান্স বা রমন্যাসের সন্ন্যাসীর বেশি কি বলিব?' তিনি আরো দেখিয়েছেন :

> 'আনন্দমঠের মহেন্দ্র, ভবানন্দ, জীবানন্দও এই পর্যায়ভুক্ত।

জীবানন্দ শান্তির অসিধার-ব্রত রূপকথার সন্ন্যাস। পত্নীনাশের ধারণায় মহেন্দ্রের সন্তানধর্ম গ্রহণ ও পুনরায় স্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ, কল্যাণীকে দেখিয়া ভবানন্দের চিত্তবিকার ও প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে মৃত্যুপণে রণপ্রবেশ, শান্তির নবীনানন্দস্বামী রূপে ছদ্মবেশ গ্রহণ—এ সকল কাল্পনিক সন্ন্যাসের দৃষ্টান্ত মাত্র।'

অর্থাৎ, বঙ্কিমের তৃতীয় স্তরের সন্ন্যাসীরা উপন্যাসে অপেক্ষাকৃত পূর্ণায়তন চরিত্র হিসেবে দেখা দেন এবং তাঁরা নিষ্কাম ধর্মের সাধক—এই সাধারণ লক্ষণ সূচিত ক'রেও দেবীচৌধুরাণী ইত্যাদি চরিত্রগুলিকে তিনি অসম্ভব বা অবাস্তব সন্ন্যাসী বলে মনে করেন! ধীরানন্দ, সত্যানন্দ কিন্তু অন্যরকম। সন্তান-সম্প্রদায় বলতে দীক্ষিত আর অদীক্ষিত দু'রকম দেশসেবী বোঝায়। দীক্ষিতরাই যথার্থ সর্বত্যাগী দেশকল্যাণব্রতী; অদীক্ষিতদল গৃহী। সত্যানন্দ বলেছেন—'চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন তিনি অনন্ত শক্তিময়। সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়। বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস শিশুপাল প্রভৃতি রাজগণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন।' 'সীতারামে'র জয়ন্তী আর শ্রী উভয়েরই জায়গা হওয়া উচিত এই শক্তিসেবী ত্যাগী সন্ন্যাসী-দলের মধ্যেই। শ্রীর বর্ণনায় বঙ্কিমচন্দ্র লিখে গেছেন—'শ্রীর প্রকৃতি মূর্তিমতী শোভা। চিত্ত প্রশান্ত, ইন্দ্রিয় ক্ষোভশূন্য, চিন্তাশূন্য, বাসনাশূন্য, ভক্তিময়, প্রীতিময়, দয়াময়, কাজেই সৌন্দর্যের বিকার নাই,—কোথাও এতটুকু দুঃখের রেখা নাই।' শ্রীর অন্তর্ধানের ফলে, সীতারাম জয়ন্তীকে বিবস্ত্র ক'রে বেত্রাঘাতের শাস্তি ঘোষণা করেন। এই দুই নারী-চরিত্রের সংযম ও সন্ন্যাস তুলনারহিত! স্নেহে, মমতায়, কল্যাণব্রতে এঁদের কৃচ্ছ্রসাধন স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছে। বটুকনাথ লিখেছেন—'যে গৈরিক বর্ণে তিনি তাঁহার কল্পিত সন্ন্যাসীগণের চীরবাস রঞ্জিত করিয়াছেন, তাহাতে মমতার, স্নেহ ভালবাসার রক্ত-আভা ফুটিয়া উঠিয়াছে'।[৩১]

'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বই-দুখানির তুলনাসূত্রে শ্রীকুমারবাবু কথায়-কথায় টমাস হার্ডি, শরৎচন্দ্র, এডগার অ্যালান পো, ন্যাথেনিয়েল হথর্ন

৩১। বঙ্গবাণী, শ্রাবণ ১৩৩৩ দ্রষ্টব্য।

প্রভৃতি লেখকদের কথা স্মরণ করেন। আমাদের সমাজ-জীবনের নানা অভাব বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কল্পনার প্রভাবে কতকটা দূর ক'রে,—ইতিহাস, রোম্যান্স এবং বাস্তব জীবনকে এক সূত্রে গেঁথে তুলেছিলেন। তাঁর সামাজিক উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'-তে শ্রীকুমার বাবু তারই নজীর লক্ষ্য করেন। 'বিষবৃক্ষে' মনোবিশ্লেষণ এবং চরিত্রের প্রধান প্রধান আচরণের কারণ দেখাবারও চেষ্টা আছে। হীরা বা দেবেন্দ্রের প্রণয়ের বিস্তৃত বিবরণ যে একেবারেই না দেওয়া হয়েছে, তাও নয়। কাহিনীর বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে এ-আলোচনায় এদিকটি আগেই দেখা গেছে। তবে, পাপের প্রতি লেখকের স্বাভাবিক বিতৃষ্ণা ছিল বলেই তিনি এ-প্রসঙ্গ বিস্তৃততর করেন নি। হীরার বিদ্বেষ প্রসঙ্গে শ্রীকুমারবাবু লিখেছেন যে, সে হোলো ধনীর বিরুদ্ধে দরিদ্রের গূঢ় অভিমান-জনিত বিদ্বেষ। কিন্তু সেও সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। তিনিই মন্তব্য করেন—'হীরা উপন্যাসের *villain* ; গ্রন্থের প্রধান পাত্র-পাত্রীদের মধ্যে যেখানে হৃদয়ের অসংযত, উদ্দাম প্রবৃত্তির জন্য অগ্নি জ্বলিয়াছে, সেইখানেই হীরা বাহির হইতে সেই অগ্নি-বিস্তারের সহায়তা করিয়াছে, অগ্নিতে ইন্ধন যোগাইয়াছে।' হীরার সম্বন্ধে তাঁর এই মন্তব্য বর্ণে বর্ণে সত্য যে,—'তিনি হীরাকে একটা Secondary বা গৌণ চরিত্রের পর্যায়ে দেখেন নাই, নগেন্দ্র-সূর্যমুখী-সৌরজগতের দূর-প্রান্তস্থিত একটা ক্ষীণপ্রভ উপগ্রহ মাত্র করেন নাই ; তাহার উপর ধূমকেতুর প্রচণ্ড গতিবেগ ও করাল দীপ্তি আনিয়া দিয়াছেন।'

'চন্দ্রশেখর'-এর বিভিন্ন খণ্ডে ব্যবহৃত সংকেতগুলির কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে 'পাপীয়সী', দ্বিতীয়ে 'পাপ',—তৃতীয় খণ্ডে 'পুণ্যের স্পর্শ',—চতুর্থে 'প্রায়শ্চিত্ত' ইত্যাদি সুনির্দিষ্ট বিষয়-বিভাগের পরিকল্পনা এখানে সুচিহ্নিত। এইসব 'খণ্ড'-বিভাগের আদিতেই একটি 'উপক্রমণিকা' আছে। 'উপক্রমণিকা'য় পর পর ছোটো ছোটো তিনটি পরিচ্ছেদ। প্রথম পরিচ্ছেদে কিশোর প্রতাপ আর আট বছরের বালিকা শৈবলিনীর ছবি আঁকা হয়েছে ছোটো ছোটো পাঁচটি মাত্র অনুচ্ছেদে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের প্রথম অনুচ্ছেদেই লেখক এই দুটি বালক-বালিকার বাল্যপ্রণয়ের খবর দিয়েছেন। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে লিখেছেন—'বাল্যকালের ভালবাসায় বুঝি কিছু অভিসম্পাত আছে।' তৃতীয় অনুচ্ছেদের শেষ বাক্যে আবার লিখেছেন—'বাল্যপ্রণয়ে কোন অভিসম্পাত আছে।' চতুর্থে দেখা যায়—'শৈবলিনী মনে মনে

জানিত, প্রতাপের সঙ্গে আমার বিবাহ হইবে। প্রতাপ জানিত, বিবাহ হইবে না। শৈবলিনী প্রতাপের জ্ঞাতিকন্যা। সম্বন্ধ দূর বটে, কিন্তু জ্ঞাতি। শৈবলিনীর এই প্রথম হিসাবে ভুল।' নায়ক-নায়িকা দুজনেই কিশোর-কিশোরী, দুজনেই দরিদ্রের সন্তান। শৈবলিনী রূপসী। এই কৈশোরেই তারা বোঝে যে, তাদের বিবাহ অসম্ভব। তাই আত্মহত্যার ষড়যন্ত্র হয়। বর্ষার গঙ্গায় এই দুটি বালক-বালিকার সেই সাঁতারের ছবি ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে ঔপন্যাসিকের কবিসত্তাই আবার দেখা দেয়:

> 'দুইজনে সেই জলরাশি ভিন্ন করিয়া মথিত করিয়া, উৎক্ষিপ্ত করিয়া, সাঁতার দিয়া চলিল। যেন চক্রমধ্যে, সুন্দর নবীন বপুর্দ্বয়, রজতাঙ্গুরীয় মধ্যে রত্নযুগলের ন্যায় শোভিতে লাগিল।'

কিন্তু, 'প্রতাপ ডুবিল। শৈবলিনী ডুবিল না।' তখন শৈবলিনীর মনে ভয় দেখা দেয়। সে ভাবতে থাকে—'কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে? আমার ভয় করে, আমি মরিতে পারিব না।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদে অতঃপর প্রতাপকে ডুবতে দেখে, নিজের পানসী থেকে জলে নেমে পড়েন চন্দ্রশেখর। প্রতাপকে উদ্ধার ক'রে, প্রতাপের মায়ের ইচ্ছা অনুসারে, তিনি সেদিন তাঁরই অতিথি হন। তখন তাঁর বয়স বত্রিশ বছর।

শৈবলিনী লজ্জায় আর প্রতাপকে মুখ দেখাননি। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাঁকে দেখেছিলেন। চন্দ্রশেখর—গৃহস্থ, অথচ, তখনো সংসারী হননি। 'দারপরিগ্রহে জ্ঞানোপার্জনের বিঘ্ন ঘটে বলিয়া তাহাতে নিতান্ত নিরুৎসাহী ছিলেন।' তার বছরখানেক আগে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়েছে। সংসারে তত্ত্বাবধানপটু উপযুক্ত গৃহিণী না থাকায় তাঁর অধ্যয়নে বাধা ঘটছিল।—'পুস্তকাদি হারাইয়া যায়, খুঁজিয়া পান না।' তাই তিনি বিবাহ ক'রবেন স্থির করেন। কিন্তু সুন্দরী স্ত্রী হ'লে সংসার-বন্ধন ঘটবে, এই ভয় ছিল তাঁর মনে! তবু সুন্দরী শৈবলিনীর সঙ্গেই তাঁর বিবাহ হয়ে যায়। শৈবলিনীর সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হন।

সেই ঘটনার আট বছর পরে আসল কাহিনী শুরু হয়।

আদিতেই 'চন্দ্রশেখর' সম্বন্ধে সমালোচকের এই মন্তব্যটি স্মরণীয় যে,—'ইহাতে আমাদের পারিবারিক জীবনের সহিত বৃহত্তর রাজনৈতিক জগতের সম্মিলন প্রায় স্বাভাবিক ভাবেই সংসাধিত হইয়াছে। সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসের যে আদর্শ, তাহার দিকে 'চন্দ্রশেখর' পূর্ববর্তী উপন্যাসগুলি অপেক্ষা

বেশি অগ্রসর হইয়াছে।' শ্রীকুমারবাবু তাঁর এই মন্তব্য ব্যাখ্যা ক'রে জানিয়েছেন যে, বঙ্কিমের এ-উপন্যাসে বাংলায় মুসলমান রাজত্বের অবসান এবং ইংরেজ বণিকদের প্রজা-শোষণে চিহ্নিত দেশের যুগসন্ধির ছায়া ফুটে উঠেছে। বঙ্কিম 'চন্দ্রশেখর'এ যে-যুগের কথা লিখে গেছেন,—তাঁর নিজের আমল থেকে সে-যুগ মাত্র শতবর্ষের দূরত্বে অবস্থিত। দেশে সে-পর্বে ছিল সর্বব্যাপী অরাজকতা আর প্রবলের অত্যাচার! এই দুর্যোগে নিপীড়িত নর-নারীর জীবনকথা রূপায়িত করবার প্রচেষ্টা যে সবক্ষেত্রে সার্থক হয়েছে, তা নয়। এরকম অবস্থায় করুণ রসের বাড়াবাড়ি ঘটাই প্রত্যাশিত! শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের 'ফুলজানি'র উদাহরণ দেখিয়ে অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিমের নিপুণতর শিল্প-রীতির উল্লেখ করেন। 'ফুলজানি'তে নায়িকা সরলার জীবনে প্রতিকূল বাহ্যজগতের পীড়ন যেমন আকস্মিক, তেমনি ভয়াবহ। কিন্তু বঙ্কিমের রীতি অন্য রকম। শৈবলিনীর নিজের মন-ই অশান্ত! তিনি বলেছেন—'শৈবলিনীর মনে গূঢ় পাপের অঙ্কুর না থাকিলে শুধু ফস্টরের পাপ ইচ্ছা ও প্রবল আগ্রহ তাহাকে গৃহাশ্রয় হইতে আকর্ষণ করিতে পারিত না; আবার ফস্টরের দুঃসাহসিকতার অপ্রত্যাশিত আশ্রয় না পাইলে শৈবলিনীর মনের গোপন পাপ অন্তরেই চাপা থাকিত, প্রকাশ্য বিদ্রোহের অগ্নিশিখায় জ্বলিয়া উঠিত না।' শৈবলিনীর প্রবৃত্তির শক্তি যে কতো তীব্র, সে-দিকটির ইঙ্গিত দিয়ে তিনি লেখেন—'বিশেষতঃ শৈবলিনী ও ফস্টরের মধ্যে কে যে অত্যাচারী ও কে যে অত্যাচারিত তাহা বলা কঠিন। ফস্টর বলপ্রয়োগ করিয়া লইয়া গেলেও শৈবলিনীর ইচ্ছাশক্তি ফস্টরের উপর জয়লাভ করিয়াছে; এমন কি সে ফস্টরকে নিজ গূঢ়তর অভিসন্ধি পূর্ণ করিবার উপায়রূপে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছে; এবং এক অপ্রত্যাশিত দিক হইতে বাধা না আসিলে শৈবলিনী যে তাহার দ্বারা নিজ মনোরথ-সিদ্ধির পথ পরিষ্কার করিয়া লইত, তাহাতে সন্দেহ নাই।'

এ-উপন্যাসে কুন্দ বা রোহিণীর মতো বঙ্কিম তাঁর শৈবলিনী-কাহিনীর সমস্যা মৃত্যুর 'সুলভ সমাধানে' পৌঁছে দেননি। শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত,—শ্রীকুমারবাবুর মতে,—'মিলটন ও দান্তের নরক-বর্ণনার সহিত প্রতিযোগিতার স্পর্ধা করিতে পারে।' 'চমকপ্রদ সংঘটন' ব'লতে কাহিনীর যে অপ্রত্যাশিত, অবিস্মরণীয় উপাদান-বিশেষত্ব এবং দ্রুত গতিবেগের কথা মনে পড়ে,—বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবসুলভ সেই বিশেষ লক্ষণ এখানেও বিদ্যমান।

তারপর, রমানন্দ স্বামীর অলৌকিক শক্তি,—শৈবলিনী-কাহিনীর সঙ্গে দলনী-কাহিনীর গ্রন্থন-কৌশল,—কয়েকটি তীব্র ভাবানুভূতির দৃশ্য-সংযোজনা ইত্যাদি বিশেষত্বও বিশেষভাবে স্মরণীয়। 'মৃণালিনী'র মনোরমাও জটিল চরিত্রের দৃষ্টান্ত বটে, কিন্তু সে শৈবলিনীর মতো বাস্তব নয়! অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় মনোরমাকে বলেছেন—'মুখ্যতঃ কল্পনা-রাজ্যের জীব'! কিন্তু রোম্যান্সের চমক-ধর্ম থাকলেও—'শৈবলিনী একেবারে আমাদের বাস্তব জগতের প্রতিবেশিনী।' তবে, 'চন্দ্রশেখর'এ রোম্যান্সের এই কল্পনাতিশয্যের দিকটিও তিনি দেখেছেন। দেখে, লিখেছেন :

> 'বঙ্কিম রোম্যান্সের বর্ণোচ্ছ্বাস গাঢ়তর করিয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত বিরলবর্ণ জগৎকে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিয়াছেন! কবি আসিয়া ঔপন্যাসিকের হস্ত হইতে লেখনী কাড়িয়া লইয়াছে। 'চন্দ্রশেখর'এর কল্পনাশক্তির সমৃদ্ধি ও সুসংগতি আমরা উপভোগ করি, ইহার কলা-সৌন্দর্য আমাদিগকে একেবারে মুগ্ধ করিয়া দেয়; কিন্তু উপন্যাসক্ষেত্রে কবিত্বের এই অনধিকার প্রবেশে যে ভবিষ্যৎ বিপদের বীজ নিহিত আছে, ইহাও অনুভব করি। 'চন্দ্রশেখর' 'আনন্দমঠ'-এর বাস্তব-সম্পর্কহীন আদর্শবাদের ও 'দেবী চৌধুরাণী'র অনুশীলনতত্ত্ব-প্রিয়তার অগ্রদূত।'

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তও 'চন্দ্রশেখর'এর রূপায়ণে ইতিহাস এবং কল্পনার সুসমন্বয়ের প্রশংসা করেছেন। স্কটের রীতির সঙ্গে বঙ্কিমের এই 'চন্দ্রশেখর'-এর তুলনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> 'খাঁটি ঐতিহাসিক উপন্যাসে দেখিতে পাই যে, ইতিহাসের ঘটনা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবের জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে। স্কটের উপন্যাসে এই আলোকপাতের অতি অপরূপ চিত্র রহিয়াছে। কিন্তু ঐতিহাসিক ঘটনাকেই প্রাধান্য দেওয়া হয় বলিয়া যে সকল নায়ক-নায়িকা ইতিহাসের অংশ নহে তাহারা নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে। স্কটের অনেক উপন্যাসে আবহাওয়া অতিশয় কৌশলের সহিত রচিত হইয়াছে, ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনার অতি জীবন্ত চিত্র দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু প্রধান নায়ক-নায়িকারা অস্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে।...'চন্দ্রশেখর' সেইরূপ ঐতিহাসিক উপন্যাস নহে; সুতরাং

ঐতিহাসিক ঘটনাকে প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। রাষ্ট্রবিপ্লব প্রতাপ ও শৈবলিনীর জীবনে প্রতিফলিত হইয়াছে, এবং এই উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য এই যে, ঐতিহাসিক বিপ্লবের সংস্পর্শে আসিয়া ইহারা অসাধারণ শক্তি, সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিতে পারিয়াছে, ইহাদের ব্যক্তিগত তেজ ও আসক্তির সংসক্তি বর্ধিত হইয়াছে। ইহাই রোম্যান্সের বৈশিষ্ট্য।'৩২

'চন্দ্রশেখর'-এর ইতিহাস-অনুগামিতা এবং রোম্যান্স-লক্ষণ সম্বন্ধে এই টীকার পরে, এখানকার বিভিন্ন আখ্যায়িকার যোগ এবং বইখানির নামকরণের ওপরেও তাঁর কিছু মন্তব্য আছে। এ-কাহিনীতে প্রতাপ এবং শৈবলিনীর তুলনায় চন্দ্রশেখর নিজে নিষ্প্রভ। তিনি নিজে কোনো বিরাট কাজের কর্মী নন। তবু, সুবোধ বাবুর বিচারে,—তিনিই কেন্দ্রস্থ চরিত্র। কারণ,

'শৈবলিনী তাঁহার স্ত্রী, রমানন্দ স্বামীর পরমাশ্চর্য যোগবল তাঁহারই মঙ্গলের জন্য শৈবলিনীর উপর প্রয়োগ করা হইয়াছে। প্রতাপ নবাবের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু চন্দ্রশেখরের সঙ্গে নবাবের সম্পর্ক আরও নিবিড়। চন্দ্রশেখর নবাবের শিক্ষাদাতা এবং চন্দ্রশেখরই নবাবের প্রিয়তমা মহিষী দলনী বেগমকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। এমনি করিয়া চন্দ্রশেখর উপন্যাসের বিচিত্র আখ্যায়িকার সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছেন। তিনি কোথাও প্রধান নহেন; কিন্তু তাঁহার প্রভাব সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। এইজন্য গ্রন্থের নামকরণের সময় বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহাকেই স্মরণ করিয়াছেন।'৩৩

'উপক্রমণিকা'র মূলকথার সঙ্গে পরবর্তী কাহিনীর সংযোগের ব্যাখ্যাসূত্রে উপক্রমণিকা অংশে শৈবলিনীর—'কেন মরিব? প্রতাপ আমার কে' ইত্যাদি ভাবনার উল্লেখ ক'রে তিনি লিখেছেন:

'মুর্শিদাবাদে প্রতাপকে রক্ষা করিয়া শৈবলিনী আর একবার নদীতে প্রতাপের সঙ্গে সাঁতার দিতে দিতে তাহাদের পুরাতন সমস্যার সমাধান করিতে চাহিল। এই সন্তরণ আসিয়াছে গ্রন্থের ঠিক মাঝখানে। ইহাদের সমস্যা এইখানে নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছে।

৩২। 'বঙ্কিমচন্দ্র' [১৩৬৮], পৃষ্ঠা ১১১ দ্রষ্টব্য।

৩৩। ঐ, পৃষ্ঠা ১১১-১১২ দ্রষ্টব্য।

এবারও প্রতাপ মরিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু শৈবলিনীর জীবন-নদীতে প্রথম বিপরীত তরঙ্গ বিক্ষিপ্ত হইল। 'আমি মরি, তাহাতে ক্ষতি কি? কিন্তু আমার জন্য প্রতাপ মরিবে কেন?' কিন্তু প্রতাপকে শৈবলিনীর জীবন হইতে মুছিয়া যাইতে হইবে। শৈবলিনী প্রাণান্তকর শপথ করিল যে, প্রতাপের চিন্তাও সে মনে স্থান দিবে না। উপক্রমণিকায় যে ঘটনা আছে, তাহারই পুনরাবৃত্তি হইল, কিন্তু এই পুনরাবৃত্তি নূতন তাৎপর্যে মণ্ডিত হইয়াছে।'[৩৪]

অবশ্য, সব ঔপন্যাসিকেই বিভিন্ন খণ্ডে এবং পরিচ্ছেদে কাহিনীর বিন্যাস অবলম্বন ক'রতে হয়। বঙ্কিমকেও তা ক'রতে হয়েছে। এক্ষেত্রে 'উপক্রমণিকা'র উপযোগিতাও দেখা গেল। তবে, এ-কাহিনীর শেষদিকে গল্পের গতি মন্থর হয়ে গেছে। তারই কারণ দেখিয়ে, অধ্যাপক সেনগুপ্ত লেখেন :

'ঘটনার আকস্মিক সামঞ্জস্যের প্রতি জোর দেওয়ায় শেষের দিকে আখ্যায়িকার গতি যেন মন্থর হইয়া আসিয়াছে। দলনী যে নিষ্পাপ এবং শৈবলিনী যে ফস্টরের উপপত্নী নহে, ইহা প্রমাণ করিবার জন্য গ্রন্থকার সকলকে একত্র করিয়াছেন।...যে উপন্যাস শুধু কাহিনীকে আশ্রয় করে তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই, যে-রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে তাহা পাঠকের নিকট হইতেও গোপন রহিবে। কিন্তু এই উপন্যাসে সেই সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই। পাঠকের অজ্ঞাত কিছুই ছিল না; নবাব, রমানন্দ স্বামী ও চন্দ্রশেখরের কৌতূহল নিবৃত্ত করিতে যাইয়া গ্রন্থকার পাঠককে ভুলিয়া গিয়াছেন।'

গঠন-পরিকল্পনার এই ত্রুটির দিকটি দেখিয়ে, তিনি এ-উপন্যাসে শেক্স্‌পীয়রের রীতিগত প্রভাবের কথা তোলেন। 'কুল্‌সম' শেক্স্‌পীয়রের 'ওথেলো' নাটকের এমিলিয়ার ছায়া,—'এমিলিয়ার মতই সে প্রভুপত্নীর প্রতি অনুরক্ত, আবার এমিলিয়ার মতই তাহার দৃষ্টি সংকীর্ণ।' ডেস্‌ডিমোনার মৃত্যুর পরে, ষড়যন্ত্র বুঝতে পেরে এমিলিয়া যে-স্বীকারোক্তি করে, তারই ফলে ওথেলোর কাছে ডেস্‌ডিমোনার সতীত্ব সংশয়াতীত হয়ে ওঠে! এবং সেখানে এমিলিয়া চরিত্রের নতুন পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। কিন্তু কুলসম দলনীকে ত্যাগ করে অনেকটা খেয়ালের বশে। নবাবের কাছে ফিরে এসে, সে যখন সব কথা

৩৪। ঐ, পৃষ্ঠা ১১৫ দ্রষ্টব্য।

খুলে বলেছে, তখন পাঠকের গভীর কোনো উপলব্ধি ঘটেনি। ইতিপূর্বে কুন্দনন্দিনীর কথা-প্রসঙ্গে লীয়রের কথা স্মরণ করা হয়েছে। এখানে আবার তারই আর-এক উদাহরণ পাওয়া যায়! সুবোধবাবু লিখেছেন—'শৈবলিনীর উন্মাদগ্রস্ততার চিত্র রাজা লীয়রের কথা স্মরণ করাইয়া দেয় যদিও সাদৃশ্য খুব নিবিড় নহে।'

'চন্দ্রশেখর' সম্বন্ধে এই বিশ্লেষণের শেষ কথায় সুবোধবাবু প্রশ্ন তুলেছেন—

> 'প্রতাপের জীবন বলিদানের সার্থকতা কি? প্রতাপ চন্দ্রশেখর ও শৈবলিনীর সুখের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করিলেন, রূপসীর কথা ভাবিলেন না, নিজের কথা ভাবিলেন না—এই সুখের মূল্য কি?'

এ-প্রশ্নের জবাবে তিনি জানিয়েছেন :

> 'প্রতাপের মৃত্যু যেন রমানন্দ স্বামীর যোগবল, Psychic Force ও শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তের উপর কঠিন পরিহাস। মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থ প্রণয়নে দোটানায় পড়িয়া গিয়াছিলেন। তিনি নীতিবেত্তা ও সৌন্দর্যের উপাসক। তাহার নীতিজ্ঞান সৌন্দর্যবোধকে সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে পারে নাই; সুতরাং কবি বঙ্কিমচন্দ্র কোথাও কোথাও আত্মপ্রকাশ করিয়া নীতিবেত্তাকে বিড়ম্বিত করিয়াছেন।··· নীতিবেত্তা বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখরের মুখ দিয়া শৈবলিনীকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন 'প্রতাপ কি তোমার জার?' কবি-বঙ্কিম শৈবলিনীর মারফতে উত্তর দিয়াছেন—'ছিঃ ছিঃ···এক বোঁটায় আমরা দুইটি ফুল, এক বনমধ্যে ফুটিয়াছিলাম, ছিঁড়িয়া পৃথক করিয়াছিলে কেন?'

বঙ্কিমের প্রথম চারখানি উপন্যাসের কাহিনী ইতিপূর্বে খুবই বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে। এইবার তাঁর রীতির বিশেষত্ব,—মনোধর্মের প্রকৃতি ইত্যাদি ব্যাপারগুলির ধারণায় পৌঁছে, অতঃপর গল্পবস্তু আরো সংক্ষেপে বিবৃত হতে পারে।

প্রথম খণ্ডের আদিতেই দেখা যায় দলনী বেগমের পরিচয়। মুঙ্গের-দুর্গে তখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার অধিপতি নবাব মীরকাসেম খাঁর বাস। রাত্রির প্রথম প্রহর। সে-রাত্রে সুসজ্জিত রঙমহলের এক কক্ষে সপ্তদশবর্ষীয়া যুবতী দলনী বেগম নবাবের তাঞ্জামের প্রতীক্ষায় গুলিস্তা

পরছিলেন। নবাব মীরকাশেম বিলম্বে প্রত্যাগমন করেন। দলনী বেগমকে তিনি যথার্থই ভালবাসেন। রাজার আদর্শ সম্বন্ধে সে-রাত্রে তিনি দলনীকে বলেন—'যদি প্রজার হিতার্থ রাজ্য করিতে না পরিলাম, তবে সে রাজ্য ত্যাগ করিব—অনর্থক কেন পাপ ও কলঙ্কের ভাগী হইব? আমি সেরাজউদ্দৌলা নহি—বা মীরজাফরও নহি।'

অর্থাৎ তখন যুদ্ধ আসন্ন। দলনী বেগম সেই যুদ্ধক্ষেত্রে মীরকাশেমের কাছে থাকতে চান। কিন্তু মীরকাশেম তাতে রাজী হন না। তখন দলনী বলেন—'জাঁহাপনা! আপনি গণিতে জানেন; বলুন দেখি আমি যুদ্ধের সময় কোথায় থাকিব।'

মীরকাশেম গণনা ক'রে বলেন—'যাহা দেখিলাম, তাহা অত্যন্ত বিস্ময়কর। তুমি শুনিও না।'

এই ব'লে,—তিনি তাঁর গণনার গুরু বেদগ্রামের চন্দ্রশেখরকে নিয়ে আসবার জন্যে লোক পাঠিয়ে দেন। মুর্শিদাবাদের বেদগ্রামের ব্রাহ্মণ চন্দ্রশেখরকে 'উপক্রমণিকা' অংশেই দেখা গেছে। শুরুতেই এইভাবে ইতিহাসের প্রধান চরিত্রের সঙ্গে গৌণ সাধারণ চরিত্রের সংযোগ ঘটে গেছে। তারপর দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, বেদগ্রামের ভীমা পুষ্করিণীর দৃশ্য! শৈবলিনী আর তাঁর সখী 'সুন্দরী' সেই পুষ্করিণীতে স্নান ক'রতে গিয়ে লরেন্স ফস্টরের নজরে পড়েন। সাহেবকে দেখে 'সুন্দরী' পালিয়ে যায়,—তখন সেই অল্পবয়স্ক সাহেব শৈবলিনীর সঙ্গে আলাপ করবার চেষ্টা করে। কিন্তু শৈবলিনী ইংরেজি জানতেন না। কিঞ্চিৎ পরিহাস প্রয়োগ ক'রে,—এই দৃশ্যে বঙ্কিম শৈবলিনীর সাহসের ছবিটি তুলে ধরেছেন। আর, তিনি লিখেছেন—'সেই সন্ধ্যাকালে শৈবলিনীর কাছে লরেন্স ফস্টর কতকগুলি দেশি গালি খাইয়া স্বস্থানে ফিরিয়া গেল।'

সে-রাত্রে ঘরে ফিরে শৈবলিনী চন্দ্রশেখরকে সেই 'গোরা'র বৃত্তান্ত জানান। কিন্তু পণ্ডিত তখন শাস্ত্রপাঠে মগ্ন ছিলেন। অন্যমনে, তিনি যা বলেন, সে যেন আসন্ন দুর্যোগের অজ্ঞানকৃত ভবিষ্যদ্বাণীর মতন শোনায়! তিনি বলেন—'আমি জলে ছিলাম, ভয়ে উঠিতে পারিলাম না। ভয়ে একগলা জলে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। সেটা গেলে তবে উঠিয়া আসিলাম।' কিন্তু শাঙ্করভাষ্যের প্রমা, মায়া, স্ফোট ইত্যাদি বিতর্কে চন্দ্রশেখর এতোই নিবিষ্ট ছিলেন যে, সুন্দরী স্ত্রীর এ-অভিজ্ঞতা শুনেও বিচলিত হন নি! অন্যমনে শৈবলিনীকে তিনি বলেন—'আর আসিও না'।

কিন্তু সেই রাত্রেই পাঠ স্থগিত রেখে, তিনি যখন বিশ্রামের আয়োজন করেন, তখন শয্যায় সুখসুপ্ত—'বিংশতিবর্ষীয়া যুবতী স্ত্রীর প্রফুল্ল মুখমণ্ডল দেখিয়া চন্দ্রশেখরের চক্ষে অশ্রু বহিল।' তিনি ভেবেছেন—'এই সুকুমার কুসুমকে কি অতৃপ্ত যৌবনতাপে দগ্ধ করিবার জন্যই বৃন্তচ্যুত করিয়াছিলাম?'

তাঁর এই আত্মানুশোচনার ইঙ্গিতটি অর্থময়! সমস্ত কাহিনীটি তাঁর এই অমনোযোগে প্রতিষ্ঠিত! চন্দ্রশেখরের এই অমনোযোগই এ-ট্র্যাজেডির প্রধান কারণ। সেই ছিদ্রপথেই ফস্টরের আবির্ভাব ঘটে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই ফস্টরের পরিচিতি দিয়েছেন লেখক।

বেদগ্রামের সন্নিহিত পুরন্দরপুর গ্রামে ইস্ট-ইণ্ডিয়া-কোম্পানির এক রেশমের কুঠির কুঠিয়াল এই লরেন্স 'অল্পবয়সে মেরি ফস্টরের প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় হতাশ্বাস হইয়া ইস্ট-ইণ্ডিয়া কোম্পানির চাকরি স্বীকার করিয়া বাংলায় আসিয়াছিলেন। এখনকার ইংরেজদিগের ভারতবর্ষে আসিলে যেমন নানাবিধ শারীরিক রোগ জন্মে, তখন বাংলার বাতাসে ইংরেজদিগের অর্থাপহরণ রোগ জন্মিত। ফস্টর অল্পকালেই সে রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। সুতরাং মেরির প্রতিমা তাঁহার মন হইতে দূর হইল।' সেই অবস্থায় শৈবলিনীকে দেখে সে ভেবেছে—'অনেক বাঙালীর মেয়ে ধনলোভে ইংরেজ ভজিয়াছে,—শৈবলিনী কি ভজিবে না?'

এই দুর্ধর্ষচরিত্র, লোভী ইংরেজ—'now or never' সংকল্প নিয়ে,—চন্দ্রশেখরের অনুপস্থিতিতে তাঁর বাড়িতে ডাকাতি ঘটিয়ে, শৈবলিনীকে অপহরণ করে! চতুর্থ পরিচ্ছেদে—ভাগীরথীর স্রোতে ফস্টরের নৌকোয় শৈবলিনী চলেছেন দাসদাসী-পরিবৃতা হয়ে। ফস্টর মুঙ্গেরে নৌকো নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়ে গেছে। পথে, ভদ্রহাটীর ঘাটে এক নাপিতানীর ছদ্মবেশে শৈবলিনীর সখী 'সুন্দরী' এসে পৌঁছোয়। শৈবলিনীকে সে নিজের ছদ্মবেশ উপহার দেয় বটে, কিন্তু শৈবলিনী বলেন—'মরি আর বাঁচি, আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, আর ঘরে ফিরিব না।' তাই, নিরুপায় হয়ে 'সুন্দরী'কে ফিরে যেতে হয়। তারপর, সপ্তম পরিচ্ছেদে চন্দ্রশেখরের গণনার কথা। তিনি গণনা করলেন বটে, কিন্তু রাজকর্মচারীকে বলেন—'আমি গণিতে পারিলাম না!' নিজের বাড়ি ফেরবার পথেই শৈবলিনী সম্বন্ধে তাঁর আত্মচিন্তা দেখা দেয়। তিনি ভাবেন—'এ মোহজাল কাটিতেও ইচ্ছা করে না—যদি

অনন্তকাল বাঁচি, তবে অনন্তকাল এই মোহে আচ্ছন্ন থাকিতে বাসনা করিব।' প্রথম খণ্ডের এই শেষ পরিচ্ছেদটি চন্দ্রশেখরের এই আত্মচিন্তায় এবং আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত। বাড়িতে ফিরে, সব শুনে, তিনি 'সুন্দরী'র পিতৃগৃহে তাঁর শালগ্রামশিলা রেখে এসে,—জিনিসপত্র প্রতিবেশীদের বিলিয়ে দিয়ে,—সন্ধ্যায় নিজের বইগুলিতে অগ্নিসংযোগ ক'রে—রাত্রি এক প্রহরে সেই গ্রন্থদাহ শেষ করেন—এবং ভদ্রাসন ত্যাগ ক'রে চ'লে যান!

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই দলনী বেগম আর তাঁর পরিচারিকা কুল্‌সমকে আলাপরত দেখা যায়; কুল্‌সম খবর দেয় যে, হাতিয়ার-বোঝাই ইংরেজের দুটি কিস্তি ঘাটে এসে পৌঁছেছে। আলি ইব্রাহিম খাঁ নৌকো ছেড়ে দিতে রাজী ছিলেন, কিন্তু—'গুরগন খাঁ বলেন, লড়াই বাধে বাধুক।' সেই নৌকো চলেছে পাটনার [আজিমাবাদ] কুঠীতে। এই কুলসমের সাহায্যে দলনী বেগম গুরগন খাঁর কাছে চিঠি পাঠান। পরিচ্ছেদের শেষের ছত্রে লেখকের মন্তব্য দেখা যায়—'এই পত্রকে সূত্র করিয়া বিধাতা দলনী ও শৈবলিনীর অদৃষ্ট একত্র গাঁথিলেন।'

এইভাবে, এই দ্বিতীয় খণ্ডে, দলনী-কাহিনী শৈবলিনী-কাহিনীর সঙ্গে মিশেছে! প্লটের ধারা উত্তরোত্তর জটিল হতে থাকে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে গুরগন খাঁর পরিচয়। বাংলায় নিযুক্ত এই রাজপুরুষ, জাতিতে আরমানি,—জন্মস্থান ইস্পাহান। সুদক্ষ যোদ্ধা এবং অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তি সে। ইউরোপীয় প্রথার রণকৌশলে সুশিক্ষিত এই সেনাপতি সম্বন্ধে মীরকাশেমের খুবই ভরসা ছিল। তার এই প্রতাপের জন্যেই মুসলমান কার্যাধ্যক্ষেরা তার সম্বন্ধে বিরক্তি পোষণ ক'রতেন। রাত্রি দ্বিপ্রহরে এই গুরগন খাঁ একখানি চিঠির প্রতীক্ষারত। সেই অবকাশেই তার কিঞ্চিৎ আত্মচিন্তা দেখা দেয়—'আমিই বাংলার কর্তা।...কর্তা ইংরেজ ব্যাপারী—তাহাদের গোলাম মীরকাশেম; আমি মীরকাশেমের গোলাম!'—এই ভাবনার ধারাতেই তার নিজের উচ্চাশার খবর পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ-কাহিনীতে গুরগন খাঁর উপস্থিতির কারণটি আর অস্পষ্ট থাকে'না! একটি বৃহৎ রাজনৈতিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা দিয়ে,—চন্দ্রশেখর-প্রতাপ-শৈবলিনী-কাহিনীর প্রণয়-চিন্তার সঙ্গে দেশের বৃহত্তর ক্ষেত্রের রাজনৈতিক জয়-পরাজয়ের চিন্তার যোগ ঘটিয়েছে এই গুরগন। গুরগন চায়—'এখন মীরকাশেম মসনদে থাক;

তাহার সহায় হইয়া বাংলা হইতে ইংরেজ-নাম লোপ করিব। সেই জন্যই উদ্যোগ করিয়া যুদ্ধ বাধাইতেছি। পশ্চাৎ মীরকাশেমকে বিদায় দিব। এই পথই সুপথ। কিন্তু আজি হঠাৎ এ পত্র পাইলাম কেন? এ বালিকা এমন দুঃসাহসিক কাজে প্রবৃত্ত হইল কেন?'—তার এই আত্মবিশ্লেষণের অবকাশেই দলনী বেগম নিজে এসে উপস্থিত হন।

দলনী যে গুরগনের পূর্বপরিচিতা, তাঁদের সংলাপ থেকেই পাঠকের সে-অনুমান সমর্থিত হয়। ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে দলনী বেগমের সম্মতি নেই। তাঁর ব্যাকুলতা দেখে গুরগন বলে—'না হয় মীরকাশেম সিংহাসনচ্যুত হইলেন, আমি তোমাকে সঙ্গে করিয়া দেশে লইয়া যাইব।' গুরগন আরো বলে—আমার ভরসা আছে তুমি একদিন ভারতবর্ষের দ্বিতীয় নূরজাহান হইবে।' দলনী বলেন—'তুমি নিপাত যাও! অশুভক্ষণে আমি তোমার ভগিনী হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম—অশুভক্ষণে আমি তোমার সহায়তার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলাম।' দলনীর সঙ্গে গুরগনের শত্রু-সম্বন্ধের সূত্রপাত হয় সেইদিন থেকেই!

দলনী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলে,—গুরগন হৃদয়ঙ্গম করে যে,—'দলনী আর এক্ষণে তাহার নহে, সে মীরকাশেমের হইয়াছে।' তারই হুকুমে দুর্গে দলনীর পুনঃপ্রবেশ নিষিদ্ধ হয়ে যায়। অন্ধকার রাত্রে নিরাশ্রয় হয়ে বেগম অশ্রু বিসর্জন করেন! পরিচারিকা কুলসমের সঙ্গে তিনি যখন আশ্রয়-চিন্তায় ব্যাকুল, সেই সময়ে,—তৃতীয় পরিচ্ছেদে,—দীর্ঘাকার এক পুরুষমূর্তি এসে তাঁদের আশ্রয়ের পথ দেখিয়ে দেন। এই দুটি স্ত্রীলোকের আত্মপরিচয় শুনে এই ব্রহ্মচারী বলেন—'ভবিতব্য কে খণ্ডাইতে পারে? তাই বলিয়া পুরুষকারকে অবহেলা করা কর্তব্য নহে।' তাঁর পরিচয়ের এই অস্পষ্টতা দূর করবার জন্যেই লেখক একটি মন্তব্য যোগ করেন—'হায়! ব্রহ্মচারী ঠাকুর! গ্রন্থগুলি কেন পোড়াইলে? সব গ্রন্থ ভস্ম হয়, হৃদয়-গ্রন্থ ত ভস্ম হয় না।' গল্পের ঘটনাপ্রবাহে নিরুদ্দেশ চন্দ্রশেখর এইভাবে আবার ফিরে আসেন! দলনী এবং কুল্‌সম সেই ব্রহ্মচারীর বাসস্থানে তাঁরই পরামর্শে আত্মগোপন ক'রে থাকেন। তাঁরই পরামর্শে, সব কথা জানিয়ে, দলনী নবাবকে একখানি চিঠি লেখেন। মুঙ্গেরের দুর্গে, মুন্সী রামগোবিন্দ রায়ের হাত দিয়ে সেই চিঠি পাঠিয়ে,—চিঠিখানি এক ব্রাহ্মণ দিয়ে গেছেন,—নবাবকে এই কথা জানাতে ব'লে,—পরদিন চিঠির জবাব পাবার ভরসা পেয়ে, ব্রহ্মচারী বাসস্থানে

ফিরে আসেন। পরিচ্ছেদ-সমাপ্তির আগে, আবার লেখকের একটি মন্তব্য চোখে পড়ে—'এই গৃহের উপরিভাগে অপর এক ব্যক্তি শয়ন করিয়া আছেন। এই স্থানে তাঁহার কিছু পরিচয় দিতে হইল। তাঁহার চরিত্র লিখিতে লিখিতে শৈবলিনী-কলুষিতা আমার এই লেখনী পুণ্যময়ী হইবে।'

এই ঘোষণার পরেই, চতুর্থ পরিচ্ছেদে, প্রতাপকে তিনি এই নতুন ঘটনাচক্রে ফিরিয়ে এনেছেন। শৈবলিনীর সখী 'সুন্দরী'র কথা অবলম্বন ক'রেই এই ঘটনাটি আত্মপ্রকাশ করে। তাঁর এ-কৌশলটিও দেখা দরকার। তিনি লিখেছেন :

> 'পূর্বেই বলিয়াছি, সুন্দরী চন্দ্রশেখরের প্রতিবাসী-কন্যা এবং সম্বন্ধে ভগিনী। তাঁহার পিতা নিতান্ত অসঙ্গতিশালী নহেন। সুন্দরী সচরাচর পিত্রালয়ে থাকিতেন। তাঁহার স্বামী শ্রীনাথ প্রকৃত ঘরজামাই না হইয়াও কখন কখন শ্বশুরবাড়ি আসিয়া থাকিতেন।...সুন্দরীর আর এক কনিষ্ঠা ভগিনী ছিল ; তাহার নাম রূপসী। রূপসী শ্বশুর-বাড়িতেই থাকিত।'

প্রতাপ এই রূপসীরই স্বামী! চন্দ্রশেখরই প্রতাপের সঙ্গে রূপসীর বিয়ে দেন। নবাব-সরকারে প্রতাপের চাকরিও হয় তাঁরই চেষ্টায়।—'এক্ষণে প্রতাপ জমিদার। তাঁহার বৃহৎ অট্টালিকা—এবং দেশবিখ্যাত নাম।'

'সুন্দরী' এই প্রতাপের বাড়িতে এসে, চন্দ্রশেখর-শৈবলিনীর নির্বাসনের খবর দিলে, পরদিন প্রতাপ মুঙ্গেরে গিয়ে পৌঁছোন। মুঙ্গেরে ব্রহ্মচারী যে বাড়িতে দলনী এবং কুলসমকে রেখেছিলেন, সেই বাড়িই প্রতাপের!

পঞ্চম পরিচ্ছেদে লেখককে আবার ফিরতে হয় ফস্টর-প্রসঙ্গে। ইংরেজ রাজকর্মচারীরা ফস্টরকে অস্ত্রের নৌকোর অধিনায়ক ক'রে পাটনায় পাঠায়। পথে, ফস্টর মুঙ্গেরে, আমিয়ট সাহেবের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু গুরগন খাঁ নৌকো আটক ক'রলে নবাবের সঙ্গে ফস্টরের বাদানুবাদ শুরু হয়। আমিয়টের সঙ্গে আলোচনার ফলে স্থির হয় যে, নবাব অস্ত্রের নৌকো না ছাড়লে ফস্টর অন্য নৌকো নিয়েই পাটনায় চলে যাবে। এই সময়ে, ফস্টরের কবল থেকে প্রতাপ শৈবলিনীর বজরা উদ্ধার করেন। তখন বজরার এক কক্ষে শৈবলিনী নিদ্রিতা! তাঁর স্বপ্নে ফস্টর আসেন শূকরমুণ্ড ধারণ ক'রে! বঙ্কিমচন্দ্রের এই রীতিও সুপরিচিত। তবে এ-স্বপ্ন ঠিক ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নয়,—এতে নায়িকার গভীর আত্মকথারই আভাষ!

স্বপ্নে, ছায়াচ্ছন্ন ভীমা পুষ্করিণীতে শৈবলিনী নিজে পদ্ম হয়ে ফুটেছেন,—'সরোবরের প্রান্তে যেন এক সুবর্ণনির্মিত রাজহংস বেড়াইতেছে—তীরে একটা শ্বেত শূকর বেড়াইতেছে।' রাজহংস শৈবলিনীকে প্রত্যাখ্যান করে; শূকর 'শৈবলিনীপদ্ম'কে ধ'রতে চেষ্টা করে;—'শূকরের মুখ দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন, ফস্টরের মুখের মত'! এই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, প্রতাপের অনুচর রামচরণ এবং প্রতাপ নিজে—শৈবলিনীর বজরা এক চরে লাগিয়ে,—পালকি-বাহনে,—লাঠিয়াল সঙ্গে দিয়ে, শৈবলিনীকে প্রতাপের মুঙ্গেরের বাড়িতে নিয়ে যান। বকাউল্লা নামে ফস্টরের এক অনুচর সেই খবর আমিয়টকে জানিয়ে দেওয়ার ফলে, সেই রাত্রেই রামচরণ, প্রতাপ এবং দলনী আর কুল্‌সম আমিয়টের হাতে বন্দী হন! সে-দুর্যোগের কাহিনী সপ্তম পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। তার আগেই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, গভীর রাত্রে প্রতাপ-শৈবলিনীর আকস্মিক সাক্ষাৎ ঘটে যায়! আকস্মিক,—কারণ, প্রতাপ শৈবলিনীকে দেখা দেননি এ পর্যন্ত। তিনি শৈবলিনীকে জগৎ শেঠের বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। কিন্তু রামচরণ তাঁকে প্রতাপের নিজের ঘরে রেখে আসে। ফলে, একই বাড়িতে অপ্রত্যাশিত পরিস্থিতির চমক পরিবর্ধিত ক'রে,—একে একে দলনী, কুলসম, প্রতাপ, শৈবলিনী,—এবং পরদিন প্রভাতে প্রথম তিনজনের বন্দী অবস্থায় অন্তর্ধানের পরে,—চন্দ্রশেখরও এসে দেখা দেন!

সে-রাত্রে শৈবলিনী প্রতাপকে দেখে মূর্চ্ছিত হন!—'হৃদয়মধ্যে অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাঁহার নখ পর্যন্ত কাঁপিতেছিল,—সর্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়াছিল।' শৈবলিনী জিগেস করেন—'কেন তোমরা এখানে আনিলে?' প্রতাপ তাঁকে বলেন—'পাপিষ্ঠা'। বলেন, 'ঈশ্বর জানেন, ইদানীং আমি তোমাকে সর্প মনে করিয়া, ভয়ে তোমার পথ ছাড়িয়া থাকিতাম। তোমার বিষের ভয়ে আমি বেদগ্রাম ত্যাগ করিয়াছিলাম।' কিন্তু এই ব্যাপারে, কেবল তাঁর নিজের প্রবৃত্তিই দায়ী,—প্রতাপের কোনো দায়িত্ব নেই,—শৈবলিনী এ-অভিযোগ মানতে নারাজ! তিনি গর্জে ওঠেন—'তুমি কি জান না, তোমারই রূপ ধ্যান করিয়া গৃহ আমার অরণ্য হইয়াছিল? তুমি কি জান না যে তোমার সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন হইলে যদি কখন তোমায় পাইতে প্যারি, এই আশায় গৃহত্যাগিনী হইয়াছি? নহিলে ফস্টর আমার কে?'

শৈবলিনীর এই কথা শুনে—'প্রতাপের মাথায় বজ্র ভাঙিয়া পড়িল'—তিনি 'বৃশ্চিকদষ্টের ন্যায় পীড়িত হইয়া সে স্থান হইতে বেগে পলায়ন

করিলেন।' শৈবলিনী সম্বন্ধে প্রতাপের নির্মম আচরণের গভীরে প্রচ্ছন্ন ছিল বাল্য-প্রণয়ের এই আকর্ষণ। শৈবলিনীর জীবনে প্রতাপ ছিলেন—'নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ'!

বকাউল্লা আমিয়টকে খবর দিলে,—গল্‌স্টন আর জন্‌সন নামে দুই সাহেব এসে প্রতাপকে, রামচরণকে,—'আর ফস্টর সাহেবের বিবি'-ভ্রমে দলনীকে আর সেই সঙ্গে কুল্‌সম্‌কেও ধরে নিয়ে গেছে। অষ্টম পরিচ্ছেদে, শৈবলিনী সেই নির্জন বাড়িতে বসে ভেবেছেন—'প্রতাপ আমার কে? আমি তাহার চক্ষে পাপিষ্ঠা—সে আমার কে? কে, তাহা জানি না—সে শৈবলিনী-পতঙ্গের জলন্ত বহ্নি—সে এই সংসার-প্রান্তরে আমার পক্ষে নিদাঘের প্রথম বিদ্যুৎ—সে আমার মৃত্যু!' তাই প্রতাপের কী হয়, তা না জেনে তিনি মৃত্যু বরণ ক'রতেও অক্ষম! তবু, নায়কের মুখে 'পাপিষ্ঠা' তিরস্কারটি লেখক বার বার প্রয়োগ করেন। সে তাঁর নিজেরই সমাজ-বিবেকের মন্তব্য! তাঁর সেই শুভবুদ্ধিই নায়িকা সম্বন্ধে তাঁর আরো কিছু কিছু মন্তব্যের কারণ! বঙ্কিম এই সূত্রেই লিখেছেন—'পাপিষ্ঠা শৈবলিনীর একথা মনে পড়িল না যে, পাপের অনর্থকতা আর সার্থকতা কি? বরং অনর্থকতাই ভাল। কিন্তু একদিন সে একথা বুঝিবে; একদিন প্রায়শ্চিত্তের জন্য সে অস্থি পর্যন্ত সমর্পণ করিতে প্রস্তুত হইবে। সে আশা না থাকিলে আমরা এ পাপচিত্রের অবতারণা করিতাম না।'

অথচ শৈবলিনী যে স্থূল দেহগত লালসামাত্রেরই বশীভূত নন, সে ধারণা বঙ্কিম নিজেই জানিয়েছেন। আগেই জানানো হয়েছে—শৈবলিনীর সঙ্গে থাকতো তীক্ষ্ণফলক ছুরি। প্রয়োজন হলে ফস্টর সে ছুরির লক্ষ্য হতে পারতো,—প্রয়োজন হলে আত্মহত্যাতেও দ্বিধা ঘটতো না! চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে সেই রাত্রেই তিনি ভেবেছেন—'না—আমি তাঁহার কেহ নহি। পুঁতিই তাঁহার সব।' চন্দ্রশেখর সম্বন্ধে তাঁর মনে তখন ভালবাসার চিহ্নও ছিল না,—ছিল শ্রদ্ধা, অভিমান, সংস্কারের টান!

দ্বিতীয় খণ্ডের এই শেষ পরিচ্ছেদে,—সেই বাড়িতে,—সকালে চোখ খুলেই চন্দ্রশেখরকে দেখে, শৈবলিনী তাই 'বিস্মিত, ভীত, স্তম্ভিত' হন! তারপর তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে রমানন্দ স্বামীর পরিচয়। চন্দ্রশেখরের গুরু তিনি। যযাতি, হরিশচন্দ্র, দশরথ প্রভৃতির জীবন-বৃত্তান্ত বর্ণনাসূত্রে শিষ্যকে তিনি সুখ-দুঃখের নশ্বরতার কথা বলেন। পরোপকারেই সুখ! চন্দ্রশেখর

সেই সেবাধর্মের আদর্শে উদ্বুদ্ধ হন। এদিকে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, দলনীর চিঠি পেয়ে, নবাব মীরকাশেম বেগমকে নিয়ে যাবার জন্যে লোক পাঠান। তারা ভুল ক'রে শৈবলিনীকে বেগম মনে ক'রে ধ'রে নিয়ে যায়। শৈবলিনী বাধা দেন না। লেখক সে-আচরণের এই ব্যাখ্যা দেন—'আশায় মুগ্ধ হইয়া শৈবলিনী আপত্তি না করিয়া শিবিকারোহণ করিল।' প্রতাপের স্ত্রী 'রূপসী' নামে আত্মপরিচয় দিয়ে,নবাবের সঙ্গে দেখা ক'রে,—ইংরেজ দলনী বেগমকে এবং প্রতাপকেও ধরে নিয়ে গেছে,—এই খবর জানিয়ে, শৈবলিনী প্রতাপকে উদ্ধারের চেষ্টা করেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, নবাব এবং গুরগনের মধ্যে এই পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়। শৈবলিনীর সুন্দর মুখের আকর্ষণেই নবাব তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন। উপযুক্ত অস্ত্র নিয়ে, মুর্শিদাবাদের পথে শৈবলিনীর নৌযাত্রা শুরু হয়। এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে—প্রতাপ-শৈবলিনীর পুনর্মিলন ঘটে। সে এক জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রি,—গঙ্গার জল ঘন নীল,—তটারূঢ় বনভূমি ঘনশ্যাম। নদীর অন্ত দেখা যায় না সেখানে,—'মানবাদৃষ্টের ন্যায় অস্পষ্ট দৃষ্ট ভবিষ্যতে মিশাইয়াছে।' বাইরে এই প্রাকৃতিক দৃশ্য,—আর ভেতরে শৈবলিনীর নিজের গুণ—তার চাতুর্য, সাহস, সৌন্দর্য,—সব মিলে. বিস্ময়কর একটি পরিস্থিতি ঘটিয়ে তোলে! চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের এই প্রতাপ-উদ্ধার বৃত্তান্তের মধ্যেই ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—অগাধ জলে দু'জনে সাঁতার দিতে-দিতে,—প্রতাপের কথায় ধর্মসাক্ষী ক'রে,—শৈবলিনী প্রতিজ্ঞা করেন—'আজি হইতে তোমাকে ভুলিব—আজি হইতে আমার সর্বসুখে জলাঞ্জলি!' এই দৃশ্যটির শেষেই, তীরে ফিরে এসে তাঁরা ছিপ খুলে দেন! অতঃপর আবার লেখকের কথা—'উভয়ের মধ্যে কেহই জানিত না যে, রমানন্দ স্বামী তাহাদিগকে বিশেষ অভিনিবেশের সহিত লক্ষ্য করিতেছেন।'

সপ্তম পরিচ্ছেদে রামচরণের কথা। ইংরেজরা তাকে আগেই ছেড়ে দেয়। কিন্তু প্রতাপের সঙ্গে থাকবার জন্যেই, রামচরণ নিজের আঘাতের চিকিৎসার অছিলায় আমিয়ট সাহেবের নৌকোয় থেকে গিয়েছিল। শৈবলিনীর সঙ্গে প্রতাপ পালিয়ে যাবার পরে, সেই রাত্রেই সে নৌকো থেকে নেমে চলে যায়। এই খবরটি খুবই সংক্ষেপে জানিয়ে,—অষ্টম পরিচ্ছেদে আর-এক অপ্রত্যাশিত সংঘটন দেখানো হয়েছে। শেষ-রাত্রে অনুসরণকারী ইংরেজের নৌকো পেছনে ফেলে, প্রতাপের ছিপ এক নিভৃত জায়গায় এসে দাঁড়ায়। সেখান থেকে সকলের অলক্ষ্যে শৈবলিনী চলে যান! লেখক বলেন—

‘প্রাণভয়ে শৈবলিনী, সুখ সৌন্দর্য প্রণয়াদি-পরিপূর্ণ সংসার হইতে পলাইল।' শুধু এইটুকু নয়,—মধ্য-ভারতের গিরিমালার বনভূমিতে লুকিয়ে,—অনাহারে,—আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে,—শৈবলিনী দূরে চলে গেলেন। ‘চন্দ্রশেখর’-এর এই তৃতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র জানিয়েছেন—‘শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্ত আরম্ভ হইল।' তখন আকাশে ঘোরতর মেঘাড়ম্বর,—‘বৃষ্টির, বায়ুর, মেঘের গর্জ্জন',—‘দূরে গঙ্গার ক্ষিপ্ত তরঙ্গমালার কোলাহল'! অন্তরে দুর্জয় প্রবৃত্তির নিরোধ একদিকে,—আর বাইরে এই প্রকৃতির উদ্দাম রণরঙ্গ! বঙ্কিমের নর-নারীর জীবনে এ-যোগও একাধিক ক্ষেত্রে ঘটতে দেখা গেছে। এখানে, পাত্র-পাত্রী-সমাবেশের এই ক্ষেত্রেও আবার তিনি ‘লোকরহস্য’-‘কমলাকান্তে'র ভঙ্গিতে নিজের কথা যোগ করেন:

> ‘তুমি জড় প্রকৃতি! তোমায় কোটি কোটি কোটি প্রণাম। তোমার দয়া নাই, মমতা নাই, স্নেহ নাই,—জীবের প্রাণনাশে সংকোচ নাই, তুমি অশেষ ক্লেশের জননী—অথচ তোমা হইতে সব পাইতেছি—তুমি সর্বসুখের আকর, সর্বমঙ্গলময়ী, সর্বার্থসাধিকা, সর্বকামনাপূর্ণকারিণী, সর্বাঙ্গসুন্দরী! তোমাকে নমস্কার।...'

হঠাৎ এই প্রকৃতি-প্রণতির উচ্ছ্বাসোক্তি শোনা যায়! কিন্তু, নারী-প্রকৃতির গভীর আকর্ষণে পুরুষের জীবনে গভীর আলোড়ন-সম্ভাবনার সঙ্গে প্রকৃতির এই ভয়াল রূপের সাদৃশ্যবোধটুকু এখানে আরো সুব্যক্ত হওয়া উচিত ছিল। সে-সাদৃশ্যের ব্যঞ্জনা সমুচিতভাবে দেখা দিলেই এ-বর্ণনার আকস্মিকতা দূর হোতো! কিন্তু প্রতাপকে বঙ্কিম কতকটা অতি-বিবেকী ক'রেছেন! শৈবলিনী সম্বন্ধে তার বিমুখতা উচ্চারিত হবার অচিরকাল মধ্যেই নায়িকার অন্তর্লোকে প্রেমের এই কষ্টসাধ্য প্রত্যাহার-প্রয়াসের যোগ্য সাদৃশ্য হিসেবে, প্রকৃতি-ঘটিত এই উচ্ছাসের ঔচিত্য পাঠককে অনুমান ক'রে নিতে হয়! রবীন্দ্রনাথের ‘চতুরঙ্গে'র কথা মনে পড়তে পারে। গুহার মধ্যে ঘুমন্ত শচীশের পদাঘাতে দামিনীর সেই পরমাশ্চর্য অবহেলার স্বাদ! কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ,—অন্য ভূমি! এখানে কেবল নারীচিত্তের অন্তর্দাহ,—প্রণয়াস্পদের মঙ্গলকামনায় তার তীব্রতম, কঠোরতম শপথের সত্যরক্ষা! বাইরের সঙ্গে ভেতরের সে-যোগটুকু লেখক সমুচিত প্রযত্নের সঙ্গে দেখান নি! পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক ছত্রে শুধু অন্ধকারে অজ্ঞাতপূর্ব, একটি শক্তিশালী মানুষ

শৈবলিনীকে কোলে তুলে নিয়ে সেখান থেকে পাহাড়ে উঠেছে। তারপর চতুর্থ খণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছে 'প্রায়শ্চিত্ত'![৩৫]

প্রতাপ ভেবেছিলেন শৈবলিনী ডুবে মরেছেন! তাই, ফস্টরের ওপরেই তাঁর রাগ হয়। নিজের দায়িত্বের কথাও মনে পড়ে। ক্ষণকালের জন্যে চন্দ্রশেখরের ওপরেও রাগ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মনে হয়—'ইংরেজ জাতি বাংলায় না আসিলে শৈবলিনী লরেন্স ফস্টরের হাতে পড়িত না।' তাই তিনি ইংরেজ ধ্বংস ক'রতে উদ্যত হন। মুঙ্গেরে নবাবের সঙ্গে দেখা ক'রে,—দেশে ফিরে, 'সুন্দরী' এবং 'রূপসী'র সঙ্গে দেখা ক'রে,—তিনি আবার দেশত্যাগী হন। মুঙ্গের থেকে কাটোয়া পর্যন্ত এই খবর ছড়িয়ে পড়ে যে, তাঁরই নেতৃত্বে দেশের লাঠিয়াল-দস্যুদল সংঘবদ্ধ হচ্ছে! শুনে, গুরগন খাঁর উদ্বেগ বাড়ে। চতুর্থ খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, আবার শৈবলিনীর খবর পাওয়া যায়। সেই অজ্ঞাতপরিচয় রক্ষাকর্তা শৈবলিনীকে পাহাড়ের এক গুহায় রেখে যান। সেখানে স্বপ্নে তাঁকে নরক দর্শন ক'রতে হয়। স্বপ্নে এক 'মহাকায় পুরুষ' তাঁকে বারো বছর পরে স্বামীর সঙ্গে মিলিত হবার আশা দিয়ে, সাতদিন কঠোর প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা দেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই প্রায়শ্চিত্ত-বর্ণনা! এবং পরিশেষে, ব্রহ্মচারী-বেশে চন্দ্রশেখর এসে দেখা দেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদের নাম 'নৌকা ডুবিল'। লেখকের নিজের কথায় —'চন্দ্রশেখর দেখিলেন জীবনেই শৈবলিনীর নরকভোগ আরম্ভ হইয়াছে।' সেই তাঁর উন্মাদ অবস্থার সূত্রপাত। চন্দ্রশেখর তাঁকে অন্যত্র নিয়ে চলেন। পঞ্চম খণ্ডের চারটি পরিচ্ছেদে আখ্যান-ধারার মোট কথা এই যে, ইংরেজের নৌকাগুলি মুর্শিদাবাদে এসে পৌঁছেছে। মীরকাশেমের নায়েব মহম্মদ তকি খাঁর সৈন্যেরা আমিয়ট্, গলস্টন, আর জনসনকে হত্যা করে। দলনী এবং কুল্‌সমের সঙ্গে লরেন্স ফস্টর অন্য নৌকোয় ছিল; সে নৌকো খুলে দেয়। কাশিমবাজার, ফরাসডাঙ্গা, সৈদাবাদ ছেড়ে, তীরবেগে সে-নৌকো এগিয়ে যায়। একখানি ছোটো নৌকোকে তাদের অনুসরণ ক'রতে দেখে, দলনীকে তীরে নামিয়ে দিয়ে, কুল্‌সমকে নিয়েই,—ফস্টরের নৌকো এগিয়ে যায়। কিন্তু অনুসরণকারী নৌকো নিজামতের নৌকো নয়! তাই, নিরাশ্রয়—'দলনীর মাথায় বজ্রাঘাত পড়িল। পূর্বেই সন্ধ্যা হইয়াছিল—এক্ষণে অন্ধকার হইল।'

৩৫। 'চন্দ্রশেখর'-এ পরিকল্পনাগত ত্রুটির অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দেখিয়েছেন অধ্যাপক সুধাকর চট্টোপাধ্যায়। তাঁর সদ্য-প্রকাশিত 'কথাসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র' [শ্রাবণ, ১৩৭০] পৃষ্ঠা ১৫৩-৫৮ দ্রষ্টব্য।

সেই অবস্থায়,—গভীর নৈরাশ্যে দলনী বেগম যখন মৃত্যুর প্রতীক্ষারত,—তখন, সেই গভীর রাত্রে শৈবলিনীর মতোই তাঁকেও এক মহাকায় পুরুষের উপস্থিতি অনুভব ক'রতে হয়। বিনা বাক্যে তিনি দলনীর পাশে এসে বসেন। —'এই দীর্ঘাকৃতি পুরুষ শৈবলিনীকে তুলিয়া লইয়া ধীরে ধীরে অন্ধকারে পর্বতারোহণ করিয়াছিল।' দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ অবধি এই বৃত্তান্তের বর্ণনা,—তারপর তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদে আবার যুদ্ধ-প্রসঙ্গ ও অন্যান্য কথা দেখা দেয়। তৃতীয়ের সূচনায় মুঙ্গেরের প্রশস্ত অট্টালিকায় স্বরূপচন্দ এবং মাহতবচন্দ জগৎশেঠের নৃত্যগীত-সভার বর্ণনা এর আগেই দেখা গেছে।[৩৬] সেই বর্ণনার পরেই লেখক জানান—'বাঙ্গালা রাজ্যে সমরাগ্নি এক্ষণে জ্বলিয়া উঠিয়াছে।' শেঠদের সঙ্গে গুরগন খাঁর ষড়যন্ত্র শুরু হয়। —'মীরকাশেমের নিপাত উভয়ের উদ্দেশ্য'! সেই সভাতেই গুরগন খাঁ খবর দেন—'একজন নূতন বণিক কুঠি খুলিতেছে।' এই বণিকেরই নাম প্রতাপ রায়! অতঃপর চতুর্থ পরিচ্ছেদে—পুনরায় দলনীর প্রসঙ্গ। দলনী যখন সেই 'মহাপুরুষে'র পাশে বসে কাঁদছিলেন, তকি তখন নবাবকে এই কথা লিখে জানান যে, বেগমকে আমিয়টের নৌকায় পাওয়া গেছে বটে, কিন্তু—'বেগম আমিয়টের উপপত্নী স্বরূপ নৌকায় বাস করিতেন,'—তা-ছাড়া, —'তিনি এক্ষণে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বন করিয়াছেন' ইত্যাদি। তকি খাঁর এই মিথ্যা অভিযোগ নিয়ে যে-মুহূর্তে নবাবের কাছে চিঠি গেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই —সেই মহাপুরুষের পাশে—'দলনীর শরীর রোমাঞ্চিত হইল!' দলনী-কে তিনি মুর্শিদাবাদে মহম্মদ তকি খাঁর কাছে নিয়ে চলেন। পরিচ্ছেদের শেষ বাক্যে দেখা যায়—'দলনী-পতঙ্গ বহ্নিমুখবিবিক্ষু হইল'! অতঃপর ষষ্ঠ খণ্ডের আটটি পরিচ্ছেদে এ-উপন্যাসের শেষ কথাগুলির মধ্যে প্রথম পরিচ্ছেদে—গুরু রমানন্দ স্বামীর আদেশ অনুসরণ ক'রে চন্দ্রশেখর শৈবলিনীকে ঘরে নিয়ে যান; সে-খবরটি কিন্তু শেষ কয়েকটি মাত্র ছত্রে ব্যক্ত; আসল উদ্দেশ্য তিনি প্রথমেই জানিয়ে দিয়েছেন—'পূর্বকথা যাহা বলি নাই, এক্ষণে সংক্ষেপে বলিব। চন্দ্রশেখরই যে পূর্বকথিত ব্রহ্মচারী, তাহা জানা গিয়াছে।'

রমানন্দস্বামী যখন জানতে পারেন যে ফস্টর, দলনী-বেগম ইত্যাদি আমিয়টের সঙ্গে গেছেন, তখন তিনি গঙ্গাতীরে চন্দ্রশেখরের দেখা পেয়ে,

৩৬। পৃষ্ঠা ৩৫৫-৫৬ দ্রষ্টব্য।

শৈবলিনীকে কাশী পাঠাবার সংকল্প প্রকাশ করেন এবং 'ধর্মিষ্ঠা যবনকন্যা' দলনীকে উদ্ধার করবার জন্যে শিষ্য চন্দ্রশেখরকে নিযুক্ত করেন। তারপর তিনিই চন্দ্রশেখরকে পাহাড় থেকে শৈবলিনীকে উদ্ধার করবার কাজে নিয়োগ করেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—ইংরেজের সঙ্গে কাটোয়ার যুদ্ধে মীরকাশেমের পরাজয়,—তকি খাঁর বিশ্বাসঘাতকতার ফলে উত্তেজিত নবাব কর্তৃক দলনীকে বিষপানে হত্যার আদেশ,—তকি দলনীকে নিবৃত্ত ক'রতে গেলে দলনী কর্তৃক পদাঘাত,—এবং পরিচারিকা করিমন বিবির সাহায্যে বিষ আনিয়ে দলনীর আত্মহত্যার খবর দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, ওয়ারেন হেস্টিংসের আনুকূল্যে কুল্‌সম্ এসে পৌঁছোয়,—এবং নবাবকে তিরস্কার ক'রে সে দলনীর নির্দোষিতার খবর জানায়। নবাব খুবই অনুতপ্ত হন। শৈবলিনী, ব্রহ্মচারী, তকি খাঁ—সকলকেই তিনি তাঁর কাছে হাজির করবার হুকুম দেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে—ওয়ারেন হেস্টিংসের প্রশংসা! বঙ্কিম তাঁকে 'দয়ালু ও ন্যায়নিষ্ঠ' বলেছেন। হেস্টিংস ফস্টরকে পদচ্যুত করেন। ডাইস সাম্বর নামে মীরকাশেমের এক সেনাপতি সে-সময়ে বিখ্যাত হয়। তার-ই কাছে 'স্ট্যালকার্ট' নামে আত্মপরিচয় দিয়ে, ফস্টর নবাবের সেনাদলে প্রবেশ করে। নবাবের অনুচর আমীর হোসেন কুল্‌সমের সহায়তায় ফস্টরকে গ্রেপ্তার করেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে—আবার বেদগ্রামের কথা। চন্দ্রশেখর নিজের বাড়িতে ফেরেন। উন্মাদরোগগ্রস্ত শৈবলিনীকে দেখতে আসে 'সুন্দরী'। সেখানে প্রতাপ এবং রমানন্দ স্বামীও উপস্থিত হন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে—শৈবলিনীর ওপর যোগবল প্রয়োগের বর্ণনা! যোগশক্তির বলে সম্মোহিত অবস্থায়,—প্রতাপ এবং ফস্টর সম্বন্ধে শৈবলিনী তাঁর নিজের মনোভাব ব্যাখ্যা করেন। ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনীর অন্তর্ধানের কারণটিও ব্যক্ত হয়—'যদি পুরন্দরপুরে গেলে প্রতাপকে পাই, এই ভরসায়।' এই যোগ-সম্মোহের মধ্যেই শৈবলিনী বলেন,—নবাবের সৈনিক মহম্মদ ইরসান আসছেন—'আমাকে লইয়া যাইতে—নবাব আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন।' সপ্তম পরিচ্ছেদে, এঁদের সকলকেই নবাব-শিবিরে উপস্থিত হতে দেখা যায়। তকি খাঁর অপরাধ প্রমাণিত হয়। ফস্টর স্বীকার করে যে, শৈবলিনী নিষ্পাপ। ঠিক সেই সময়েই ইংরেজের কামানের শব্দে নবাব-শিবির কেঁপে ওঠে। তকি খাঁকে স্বহস্তে বধ ক'রে নবাব বেরিয়ে আসেন। এই নাটকীয় ঘটনাজালের মধ্য দিয়ে কাহিনী এগিয়ে চলে। অষ্টম পরিচ্ছেদে—চন্দ্রশেখর, রমানন্দ স্বামী,

শৈবলিনীর সঙ্গে ফিরে যাবার পথে প্রতাপের সঙ্গে তাঁদের দেখা হয়ে যায়। প্রতাপকে একান্তে ডেকে নিয়ে গিয়ে শৈবলিনী বলেন যে, স্বামী যদি তাঁকে গ্রহণ করেন, তাহলে—'পূর্বকথা সকল তাঁহাকে বলিয়া ক্ষমা চাহিব।' সেই সঙ্গে তাঁর একটি অনুরোধ ছিল—'যতদিন তুমি এ পৃথিবীতে থাকিবে, আমার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ করিও না।' এই কথার পরে, ফস্টরকে হত্যা করবার জন্যেই প্রতাপ এগিয়ে যাচ্ছিলেন, কিন্তু চন্দ্রশেখর ঘোড়ার বল্গা ধ'রে তাঁকে নিরস্ত করেন। চন্দ্রশেখরের মহত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে প্রতাপ বিদায় নেন এবং যুদ্ধে প্রাণ দেন। রমানন্দ স্বামী মৃতপ্রায় প্রতাপকে তাঁর আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন—'ইন্দ্রিয় জয়ে যদি পুণ্য থাকে, তবে অনন্ত স্বর্গ তোমারই।'

শ্রীকুমার বাবু লিখেছেন :

> 'চন্দ্রশেখর'-এ যে কল্পনাতিশয্যের স্ত্রপাত, তাহা 'আনন্দমঠ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে প্রকটতর হইয়াছে এবং বঙ্কিমকে অল্পবিস্তর ঔপন্যাসিক আদর্শ হইতে স্খলিত করিয়াছে। বিশেষতঃ, 'আনন্দমঠ'-এ এই কল্পনা-বিলাস বাস্তবতাকে একেবারে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে।'

'আনন্দমঠ' এবং দেবীচৌধুরাণী'র বিভিন্ন সাদৃশ্যের কথা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন :

> 'উভয়েরই ঘটনা-কাল প্রায় এক—ইংরেজ-রাজত্বের প্রথম পত্তনের সময়; 'দেবী চৌধুরাণী'র আখ্যায়িকা 'আনন্দমঠ'এর কয়েক বৎসর পরে মাত্র। বঙ্কিমের অধিকাংশ রোম্যান্সের কাল এই ইংরেজ রাজত্বের প্রথম সূচনার সময়। বঙ্কিমের এই কালনির্বাচনের প্রধান হেতু এই যে, এই যুগে ইতিহাসের সহিত সাধারণ জীবনের সংযোগ ফুটাইয়া তোলা তাঁহার পক্ষে অধিক কষ্টসাধ্য ছিল না।'

'দুর্গেশনন্দিনী' এবং 'মৃণালিনী'র ঘটনাকাল সে-তুলনায় সুদূর অতীতের। 'চন্দ্রশেখর', 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী'—তিনখানি উপন্যাসেই অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের সমাজচিত্র অবলম্বন করা হয়েছে। দ্বিতীয়তঃ, 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবীচৌধুরাণী'তে—'রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতার রন্ধ্রপথ দিয়াই আমাদের সাধারণ জীবনের উপর রোম্যান্সের অলৌকিকত্ব আসিয়া পড়িয়াছে।' তৃতীয়তঃ—'আনন্দমঠ'-এর সত্যানন্দ এবং 'দেবীচৌধুরাণী'র ভবানী

পাঠক—'উভয়েই এমন একই বিরাট আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন, যাহা সে যুগের সামগ্রী বলিয়া আমরা কোন মতেই স্বীকার করিতে পারি না।' অর্থাৎ, এই বিশেষ ক্ষেত্রে কালাতিক্রমণ দোষ প্রবেশ ক'রেছে। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় আরো বলেন—'যে দেশভক্তি ও রাজনৈতিক আদর্শ ইংরেজ রাজত্বের শতবার্ষিকী সাধনার ফল, তাহা বঙ্কিম অনায়াসে মুসলমান শাসনের শেষ যুগের বিকাশ বলিয়া চালাইতে চেষ্টা করিয়াছেন।' অর্থাৎ তাঁর মতে, এই ধরনের অবাস্তবতা-দোষ এই দুখানি উপন্যাসেরই সৌন্দর্যহানি ঘটিয়েছে। কিন্তু তিনিই আবার এ অভিযোগ অংশতঃ খণ্ডন করবার চেষ্টা ক'রেছেন। ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে, এদেশের সমাজ ও পরিবারের আশ্রয় প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হয়েছিল। ফলে,—'যখন পুরাতন সমস্ত বন্ধন ছিন্ন হইয়াছে, যখন দুর্ভিক্ষদানবের তাড়নায় মানুষ চিরকালের সামাজিক ও পারিবারিক গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া পড়িয়াছে, তখন যে তাহাদের মনে অভিনব ভাবের শিখা জ্বলিয়া উঠিবে, তাহারা যে নানাপ্রকার অভাবনীয় মিলনে সংঘবদ্ধ হইবে, ভাবিয়া দেখিলে তাহাতে খুব বেশি বিস্ময়ের কারণ নাই।' যাঁরা সমাজের সহজ নেতা, সেই সব জমিদার বা অন্য শ্রেণীর মানুষই প্রথমে আত্মরক্ষার তাগিদে অরাজকতা প্রতিরোধের চেষ্টা ক'রে থাকেন,—বিশৃঙ্খলা দূর ক'রে তাঁরা শৃঙ্খলা স্থাপনের চেষ্টা করেন। সুতরাং আনন্দমঠের সন্তান-সম্প্রদায়ের অভ্যুদয় অস্বাভাবিক বা অবাস্তব বলা চলে না। কিন্তু তাঁদের অনুসৃত উচ্চ আদর্শ সত্যিই—'আদর্শলোকের রাজ্যে' গিয়ে পৌঁছেছে! সন্তান-সম্প্রদায়ের 'আনন্দ-কানন'-এর অবস্থান-পরিচিতি সম্বন্ধে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য নেই!—'তাহার অনতিদূরে মুসলমান-শক্তির আশ্রয়স্থল স্বরূপ যে 'নগরের' কথা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাও একটা নামধামহীন ছায়ার মত অশরীরী হইয়াছে।' তবে, 'সন্তান'দের প্রতিষ্ঠার বিবরণ না দিলেও, বঙ্কিম বুভুক্ষুদের দলপুষ্টির বিবরণ দিয়ে গেছেন। উচ্চ আদর্শের সাধক সন্তান-নেতাদের সঙ্গে,—বা তাঁদেরই খুব কাছাকাছি যে-অন্যদল কাজ ক'রেছেন, লুঠতরাজে তাঁদের লোভের কথা বঙ্কিম নিজেই জানিয়ে গেছেন। কাপ্তেন টমাসের বিরুদ্ধে,—প্রথম যুদ্ধজয়ের পরে,—ধীরানন্দের কথা থেকে জানা যায়—'রাজ্য-জয়ের জন্য সৈনিকের অভাব,—সকলেই লুটের নেশায় মত্ত'! 'আনন্দমঠে'র অবাস্তবতা সম্বন্ধে এইসব মন্তব্যের ধারায় শ্রীকুমারবাবু জানিয়েছেন—'এই সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং প্রায়ই অলক্ষিত

ইঙ্গিতের দ্বারা লেখক বাস্তবতার দাবী রক্ষা করিতে ও প্রকৃত অবস্থার ধারণা দিতে একটা ক্ষণস্থায়ী চেষ্টা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।' এসব আপত্তি খুবই সংগত।

এইবার তাঁর তিনখানি কমেডি-শ্রেণীর ক্ষুদ্রায়তন লঘু রচনার কথা আলোচ্য। 'ইন্দিরা' মোট বাইশ পরিচ্ছেদে,—'যুগলাঙ্গুরীয়' নয় পরিচ্ছেদে, এবং—'রাধারাণী' আট-এ সম্পূর্ণ।[৩৭] 'রজনী'র মতন 'ইন্দিরা'তেও নায়িকার আত্মকথা দিয়ে গল্প আরম্ভ হয়। 'ইন্দিরা'তেই এ-রীতির সূত্রপাত্।—'অনেকদিনের পর আমি শ্বশুরবাড়ি যাইতেছিলাম। আমি উনিশ বৎসরে পড়িয়াছিলাম, তথাপি এ পর্যন্ত শ্বশুরের ঘর করি নাই। তাহার কারণ, আমার পিতা ধনী, শ্বশুর দরিদ্র।'—এইভাবে ইন্দিরার [নামান্তর 'কুমুদিনী'] কথা এগিয়েছে। বনেদী বড়মানুষ হরমোহন দত্ত যখন উপেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর কন্যা ইন্দিরার বিয়ে দেন, তখন জামাতার বয়স ছিল মাত্র কুড়ি বছর। সে তখন উপার্জনে অক্ষম। সেই কারণেই, হরমোহন তাঁর মেয়েকে স্বামীর ঘর ক'রতে পাঠান নি। তারপর, সাত বছর কেটে গেছে। ইতিমধ্যে উপেন্দ্র কমিসেরিয়েটের কাজ পেয়ে খুবই ধনী হয়। ইন্দিরার শ্বশুর তখন পুত্রবধূকে আনবার জন্যে পালকি পাঠিয়ে দেন। ইন্দিরার পিত্রালয় মহেশপুর থেকে তার শ্বশুরবাড়ি দশ ক্রোশ রাস্তা। পথে কালাদিঘির কাছে পালকি নামিয়ে বেহারারা যখন স্নান করছিল, সেই সময়ে ডাকাত পড়ে এবং ইন্দিরা অপহৃতা হয়। ডাকাতদল তার অলঙ্কার কেড়ে নিয়ে, তাকে নিবিড় অরণ্যে ছেড়ে দিয়ে যায়। পরদিন, গৌরীগ্রামের এক যাজক ব্রাহ্মণের বাড়িতে গিয়ে,—সেখান থেকে, কৃষ্ণদাস

৩৭। বিষয়বস্তুর প্রকৃতি অনুসারে বঙ্কিমের চোদ্দটি গল্প-উপন্যাসের শ্রেণীবিভাগ ক'রতে গিয়ে সুকুমার বাবু তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' [জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৬] বইয়ের তৃতীয় সংস্করণে জানিয়েছেন—ক] দ্বন্দ্বহীন অনুরাগাত্মক, খ] প্রণয়দ্বৈধমূলক মানসিক দ্বন্দ্বাত্মক, এবং গ] দেশপ্রীতিমূলক উপদেশাত্মক—এই তিনটি শ্রেণীর প্রথম শ্রেণীতে পড়ে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী, ইন্দিরা এবং রাজসিংহ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে—বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর ও কৃষ্ণকান্তের উইল। রজনীকে তিনি প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় শ্রেণীতেই ধরেছেন। তৃতীয় শ্রেণীতে—আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম।

১৮৯৩এ পঞ্চম সংস্করণে 'ইন্দিরা' এবং চতুর্থ সংস্করণে 'রাধারানী' পরিবর্ধিত হয়।

'মুচিরাম গুড়ের জীবন চরিত' [১২৮৭, বঙ্গদর্শন] এবং 'কমলাকান্তের দপ্তর' [১৮৭৫] বই দু'খানিকে তিনি গল্প-উপন্যাসের মধ্যেই ধর্তব্য বলে ইঙ্গিত করেন [পৃষ্ঠা ১০৫ দ্রষ্টব্য]।

বসু নামে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে কলকাতায় তার কাকার বাড়িতে যাবে ব'লে ইন্দিরা যাত্রা করে বটে, কিন্তু ঠিকানা খুঁজে না পাওয়ায়, কৃষ্ণদাসের শ্যালিকা-কন্যা সুভাষিণীর বাড়িতে তাকে পাচিকাবৃত্তি গ্রহণ ক'রতে হয়। কিন্তু ইন্দিরা যে বড় ঘরের মেয়ে, সুভাষিণী তা বুঝতে পারেন। সুভাষিণীর স্নেহে,—এবং তাঁর স্বামী উকিল রমনবাবু ও অন্যান্য আত্মীয়দের প্রশংসার গুণে, বাড়ির গৃহিণীও ইন্দিরার রন্ধনপটুতায় খুশি হন। রমনবাবু ইন্দিরার পিতৃগৃহে এবং শ্বশুরবাড়িতে চিঠি লেখেন, কিন্তু কোনো জবাব পান না, এদিকে, রমনবাবু তাঁর এক মক্কেলকে একদিন আহারের নিমন্ত্রণ করেন; পরিবেষণ ক'রতে গিয়ে ইন্দিরা [কুমুদিনী] চিনতে পারেন যে, নিমন্ত্রিত ব্যক্তিই তাঁর স্বামী উপেন্দ্র! উপেন্দ্র যখন শোনেন যে, পাচিকার বাড়ি কালাদিঘি, তখন তিনিও চমকে ওঠেন। একাদশ পরিচ্ছেদে এই বর্ণনার পরেই,—দ্বাদশ পরিচ্ছেদে সুভাষিণী আর পরিচারিকা হারানীর সাহায্যে ইন্দিরা তার স্বামীর কাছে 'পাচিকা' পরিচয় দিয়ে একখানি চিঠি পাঠায়। মূর্ছার ভান ক'রে উপেন্দ্র সে-রাত্রে রমনবাবুর বাড়িতেই থেকে যান এবং ইন্দিরা চিঠির প্রতিজ্ঞা পালন ক'রে সেই রাত্রেই তাঁর সঙ্গে দেখা করে! কিন্তু উপেন্দ্র বলেন—'সে স্ত্রীকে পাইলেও আমি আর গ্রহণ করিব, এমন বোধ হয় না। তাহার আর জাতি নাই বিবেচনা করিতে হইবে।' নিজের রূপে উপেন্দ্রকে বশ ক'রে, ইন্দিরা সেই রাত্রেই উপেন্দ্রের সঙ্গে সিমলায় তাঁর বাড়িতে চলে যায়। সে-বাড়িতে একটি ঘরে আটদিন একলা বাস ক'রে,—উপেন্দ্রের সান্নিধ্য থেকে সে আত্মরক্ষা করে! তারপর স্বামী-স্ত্রীর প্রকৃত পুনর্মিলনের এবং ইন্দিরার পিত্রালয় মহেশপুরের কথা আছে,—তাছাড়া উপান্ত পরিচ্ছেদে ইন্দিরার বোন কামিনী ও অন্যান্য অন্তঃপুরিকাদের রঙ্গ-রহস্যের বর্ণনা দিয়ে, শেষ পরিচ্ছেদে স্বামীর সঙ্গে ইন্দিরার পতিগৃহে প্রত্যাবর্তনের চূড়ান্ত সুখ-সংবাদটি দেওয়া হয়েছে।

একালের দৃষ্টিতে,—কতকটা সুখোচ্ছলতা সত্ত্বেও, 'ইন্দিরা' দুর্বল রচনা বলেই গণ্য।[৩৮] এখানে প্রগল্ভতা এবং স্থূল রঙ্গরসের বাহুল্য দেখে তাঁকে প্রধানতঃ ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য এবং দীনবন্ধুর বন্ধু বলেই

৩৮। এ-রচনার শিরোভূষণ হিসেবে ব্যবহৃত শেলির উদ্ধৃতি স্মরণীয়—'Rarely, rarely comest thou, Spirit of Delight.'

মনে হয়। তবে ইন্দিরা,—সুভাষিণী,—সুভাষিণীর শাশুড়ী 'কালির বোতল',—র-বাবু,—সোনার মা,—হারানী দাসী ইত্যাদি চরিত্রগুলি সত্যিই বেশ সজীব। সেকালের সুখী দম্পতির এবং পরিজন-পরিবৃত ঘর-সংসারের ছবি এখানে সার্থক হয়ে উঠেছে। শ্রীকুমার বাবু লিখেছেন—'রমণীর সুরই গল্পটির আদ্যোপান্ত অভ্রান্তভাবে ধ্বনিত হইয়াছে।' এদিক থেকে, 'ইন্দিরা' বঙ্কিমচন্দ্রের ক্ষুদ্রায়তন পারিবারিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকার্য। সুবোধবাবুও এটিকে উপন্যাস ব'লে স্বীকার ক'রেছেন,—এবং 'ইন্দিরা', 'রাধারাণী', 'যুগলাঙ্গুরীয়'—তিনটির মধ্যেই উপকথাসুলভ অলৌকিকতার প্রাচুর্য লক্ষ্য ক'রেছেন তিনি।

বেশ কিছু বাস্তব পরিবেশ বর্ণনার গুণে 'ইন্দিরা' কতকটা উপন্যাস হয়েছে বটে, কিন্তু 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপকথা মাত্র। ব্যাপক অর্থে, 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রভৃতি রচনার প্রসঙ্গেও 'উপন্যাস' কথাটি ব্যবহৃত হয়ে থাকে ; কিন্তু অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আলোচনায় দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী, যুগলাঙ্গুরীয়, চন্দ্রশেখর, রাজসিংহ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী এবং সীতারাম—মোট এই ন'টি রচনাকে ব'লেছেন 'রোমান্স শ্রেণীভুক্ত' উপন্যাস। ভূদেবের 'অঙ্গুরীয়-বিনিময়-এ',—বঙ্কিমের 'দুর্গেশনন্দিনী'তেও আংটির ব্যবহার দেখা গেছে,—এবং 'যুগলাঙ্গুরীয়' কাহিনীর অঙ্গুরীয়-বৃত্তান্ত সেই ধারাতেই স্মরণীয়। ১৮৭৪ এ 'যুগলাঙ্গুরীয়' ছাপা হয়,—১৮৭৫এ 'রাধারাণী' বেরোয়। শ্রীকুমারবাবু লিখেছেন :

> 'এই দুইখানি আখ্যান অনেকটা আধুনিক ছোটগল্পের অনুরূপ—উপন্যাসের বিস্তৃতি ও প্রগাঢ়তা ইহাদের নাই। বিশেষতঃ ইহাদের প্রধান আকর্ষণ ঘটনা-বৈচিত্র্যে, চরিত্র-চিত্রণে নহে। আমাদের প্রাত্যহিক জীবনে যেমন অনেক সময়ে অনেক অসাধারণ, অপ্রত্যাশিত ঘটনার আবির্ভাব হয়, সৌভাগ্যলক্ষ্মীর অযাচিত অনুগ্রহ লাভ হয়, এই উপন্যাস দুইখানিও সেইরূপ আশাতীত শুভাদৃষ্টের, বিস্ময়কর মিলের [coincidence] কাহিনী। 'যুগলাঙ্গুরীয়' ও 'রাধারাণী' ঠিক একই জাতীয় উপন্যাস ; প্রভেদের মধ্যে এই যে, প্রথমখানি অতীত যুগের কাহিনী ও দ্বিতীয়টি ঘটনাকাল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ আধুনিক। কিন্তু এই প্রভেদ কেবল

> নামমাত্র। 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে ঐতিহাসিক উপন্যাস মনে করিবার কোন কারণ নাই; কোনরূপ ঐতিহাসিকতার ক্ষীণ আভাসমাত্রও ইহাতে নাই।...হিরণ্ময়ী-পুরন্দরের প্রেমে যা কিছু অসামাজিকতা বা অসাধারণত্ব আছে, তাহা সুদূর অতীতের আশ্রয় লাভে আমাদের চক্ষু এড়াইতে অনেকটা সমর্থ হইয়াছে।'

'রাধারাণী'কে তিনি 'ছেলেমানুষী গল্প' বলেছেন এবং একথাও জানিয়েছেন যে, 'ইহার স্বাভাবিকতা ও সুসংগতি রক্ষা করিতে লেখককে অনেকখানি বেগ পাইতে হইয়াছে।' তবে, তাঁর মতে, শেষ পর্যন্ত 'রাধারাণী'তে বিসদৃশ লক্ষণের প্রাধান্য ঘটে নি!

অতঃপর এই দুটি রচনার গল্পবস্তু সংক্ষেপে বলে নেওয়া যাক।

তাম্রলিপ্ত—অর্থাৎ আধুনিক তমলুকের এক উদ্যানবাটিকায় শচীসুত শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুরন্দর এবং ধনদাস শ্রেষ্ঠীর কন্যা হিরণ্ময়ীর কথোপকথনের দৃশ্যে 'যুগলাঙ্গুরীয়' কাহিনীর সূচনা। এক সময়ে এঁদের বিয়ের কথা হয়েছিল, কিন্তু হিরণ্ময়ীর পিতার মত ছিলনা ব'লেই বিয়ে হয়নি। পুরন্দর বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সিংহলে যান। হিরণ্ময়ীর বয়স তখন ষোল বছর। প্রথম পরিচ্ছেদে এই পূর্বকথা জানিয়ে,—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অপ্রত্যাশিত, অদ্ভুত ঘটনা-সমাবেশের সাহায্যে পাঠকের কৌতূহল বাড়িয়ে তোলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইতিমধ্যে আরো দু বছর কেটে যায়। হিরণ্ময়ীর বয়স হয় আঠারো বছর। তবু তার বিয়ের কোনো আয়োজনই হয় না; পুরন্দরও সিংহল থেকে ফেরেন না। এই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, হিরণ্ময়ী সম্বন্ধে বঙ্কিম সুকৌশলে এক জ্যোতিষ-গণনার ইশারা দিয়েছেন এবং সে-গণনার মীমাংসা আছে এ-কাহিনীর প্রায় শেষ দিকে। শ্রেষ্ঠী ধনদাস তাঁর পত্নীকে চীন দেশে তৈরী বিচিত্র একটি কৌটো দিয়েছিলেন। তিনি সেটিতে অলঙ্কার রাখতেন। ধনদাসের কন্যা হিরণ্ময়ী তাঁর মায়ের কাছ থেকে সেই কৌটোটি পান। একদিন তাতে একখানি চিঠির টুকরো পেয়ে, তাতে নিজের নাম দেখে, সেই ছিন্নপত্রের পাঠ উদ্ধার ক'রে তাঁর মনে হয় যে, সেটি তাঁর বিবাহ-সম্পর্কিত কোনো বিপদের আশঙ্কার ইঙ্গিত। সে-বিষয়ে তিনি কাউকে কিছু না ব'লে, সেই চিঠির টুকরো আবার যথাস্থানে রেখে দেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, আরো এক বছর পরের ঘটনা দেখা দেয়। ধনদাস হঠাৎ তাঁর স্ত্রী-কন্যাকে নিয়ে কাশী চলে যান; সেখানে

ধনদাসের গুরু আনন্দস্বামীর পৌরোহিত্যে হঠাৎ হিরণ্ময়ীর সঙ্গে একজনের বিয়ে হয়ে যায়। পাত্র-পাত্রী উভয়কেই চোখ বেঁধে এই অনুষ্ঠান পালন ক'রতে হয়। তাঁরা কেউ কাউকে দেখতে পান না! তাঁদের দুজনকে স্মারক চিহ্ন হিসেবে দুটি আংটি দিয়ে আনন্দস্বামী বলে দেন যে, পাঁচ বছরের মধ্যে তাঁরা যেন সেই আংটি না পরেন—'অদ্য আষাঢ় মাসের শুক্লা পঞ্চমী রাত্রি একাদশ দণ্ড হইয়াছে, ইহার পর পঞ্চম আষাঢ়ের শুক্লা পঞ্চমীর একাদশ দণ্ড রাত্রি পর্যন্ত অঙ্গুরীয় ব্যবহার নিষেধ করিলাম। আমার নিষেধ অবহেলা করিলে গুরুতর অমঙ্গল হইবে।' তৃতীয় পরিচ্ছেদে এই বিবাহ অনুষ্ঠানের পরে, চতুর্থ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, হিরণ্ময়ীর পিতামাতা দুজনেই তখন স্বর্গত; এবং পিতার ঋণ পরিশোধের জন্যে হিরণ্ময়ীর সমস্ত সম্পত্তি হস্তান্তরিত হয়েছে! পঞ্চম পরিচ্ছেদে, হিরণ্ময়ীর সেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় অমলা নামে তাঁর একটি সঙ্গী দেখা দিয়েছেন। তাঁরই কাছে হিরণ্ময়ী শুনতে পান যে, পাঁচ বছর পরে পুরন্দর অনেক টাকাকড়ি নিয়ে দেশে ফিরেছেন এবং তখনো তাঁর বিয়ে হয় নি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, পুরন্দরের অনুরোধেই হিরণ্ময়ী তাঁর পৈতৃক বাড়িতে ফিরে গিয়ে বাস করেন, কিন্তু পুরন্দরের দেওয়া উপহার তিনি গ্রহণ করেন না। উপহারের সেই হারটি গোপনে রাজা মদনদেবের কাছে দিয়ে এসে অমলা পুরস্কার লাভ করেন। সপ্তম পরিচ্ছেদে, বিবাহের পঞ্চম বর্ষ পূর্ণ হয়,— এবং হঠাৎ রাজা মদনদেবের আজ্ঞায় হিরণ্ময়ীকে রাজ-সন্দর্শনে যেতে হয়। অষ্টম পরিচ্ছেদে, রাজা মদনদেব তাঁকে সেই আংটি দেখান। কিন্তু সংশয় দূর ক'রে, নবম পরিচ্ছেদে তিনি নিজেই জানিয়ে দেন যে, হিরণ্ময়ীর স্বামী নন তিনি! পুরন্দর সম্বন্ধে হিরণ্ময়ীকে তিনি কয়েকটি কথা জিগেস করেন, এবং তাঁকে সেই চিঠির টুকরোটি নিয়ে আসতে বলেন। হিরণ্ময়ী ফিরে এলে তিনি জানিয়ে দেন যে, পুরন্দরই হিরণ্ময়ীর স্বামী! রাজা পুরন্দরকে বলেন—'আমি দিবারাত্র ইঁহাকে প্রহরাতে রাখিয়াছিলাম, তাহাতে বিশেষ জানি যে, ইনি অনন্যানুরাগিণী, তোমার ইচ্ছাক্রমে উহার পরীক্ষা করিয়াছি, আমি উহাকে স্বামী বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলাম, কিন্তু রাজ্যলোভেও হিরণ্ময়ী লুব্ধ হইয়া তোমাকে ভুলেন নাই।' এইভাবে জ্যোতিষ-গণনা ও অঙ্গুরীয়-সংকেতের মধ্য দিয়ে 'যুগলাঙ্গুরীয়' কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটে।

অতঃপর 'রাধারাণী' কাহিনীর মূল কথা সংক্ষেপে বলা যেতে পারে।

জ্ঞাতির সঙ্গে মামলায় একেবারে নিঃস্ব হয়ে রাধারাণীর বিধবা মা তাঁর এগার বছরের মেয়েকে নিয়ে মাহেশে বাস ক'রতে আসেন। বিধবার দুঃখের অবধি ছিল না। সে-বার রথের আগে, তিনি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁরই পথ্যের ব্যবস্থা করবার জন্যে উপায়ান্তর না দেখে, রাধারাণী রথের হাটে বনফুলের মালা বিক্রি ক'রতে যায়। কিন্তু ঝড়-বৃষ্টিতে রথের মেলা ভেঙ্গে যায়। অন্ধকার রাত্রে রাস্তা হারিয়ে, সে কাঁদতে বসে। তখন রুক্মিণীকুমার রায় নামে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক দয়ালু ভদ্রলোক তাকে বাড়ি পৌঁছে দেন, আর সেই সঙ্গে তাদের দারিদ্র্যের কথা শুনে, অযাচিত ভাবে কিছু অর্থসাহায্য করেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অবশেষে বিধবার মৃত্যুর খবর আছে। তাঁর শেষ অবস্থায় উকিল কামাখ্যাবাবু কাছ থেকে তিনি খবর পান যে, প্রিভি-কাউন্সিলের আপিলে তাঁদের অনুকূলেই মামলার রায় বেরিয়েছে। মৃত্যুর আগে বিধবা এই কামাখ্যাবাবুকে অনুরোধ করেন যে, তিনি যেন রাধারাণীকে নিজের মেয়ের মতো লালন পালন করেন। সেই কামাখ্যাবাবুই রাধারাণীর বিয়ের ব্যবস্থা স্থগিত রেখে তার লেখাপড়ার ব্যবস্থায় মন দেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, রাধারাণীর বয়স যখন ষোল বছর, সেই সময় তার বিয়ের ব্যবস্থা ক'রতে গিয়ে কামাখ্যাবাবু তাঁর নিজের মেয়ে বসন্তকুমারীর কাছে শোনেন যে, রুক্মিণীকুমার ছাড়া আর কাউকেই রাধারাণী বিয়ে ক'রবে না! অগত্যা রুক্মিণীকুমারের জন্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। ইতিমধ্যে কামাখ্যাবাবুর মৃত্যু হয়। রাধারাণী তার সম্পত্তি ফিরে পায়। স্বগ্রাম রাজপুরে সে তখন দুলক্ষ টাকা খরচ ক'রে, এক অনাথ-আশ্রম স্থাপন করে, এবং তার নাম দেওয়া হয়—'রুক্মিণীকুমারের প্রাসাদ'। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, এক বছর পরে, সেই প্রাসাদে এক ভদ্রলোক এসে উপস্থিত হন এবং তিনি রাধারাণীর সঙ্গে দেখা করেন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে, এই সাক্ষাতের ফলেই রাধারাণী তাঁকে চিনতে পারে। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে রাধারাণীর ব্যাকুলতার কথা বলা হয়েছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে,—রাধারাণীর নিজের পরিচয়; পূর্ব-ঘটনার স্মারকচিহ্ন হিসেবে রুক্মিণীকুমারের নাম লেখা,—তাঁরই ফেলে-যাওয়া পুরোনো একখানি নোট দেখায় সে! এই রুক্মিণীকুমারের আসল নাম 'দেবেন্দ্রনারায়ণ রায়'। অষ্টম পরিচ্ছেদে, রাধারাণীর সঙ্গে রুক্মিণীকুমারের শুভ-পরিণয় সম্পন্ন হয়।

বিভিন্ন সমালোচকের সমালোচনা থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির প্রকৃতিগত শ্রেণীবিভাগ বা তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে কল্পনাতিশয্য, রোমান্সধর্ম,

বাস্তবানুগামিতা ইত্যাদির হ্রাস-বৃদ্ধি সম্বন্ধে ইতিপূর্বে একাধিক মন্তব্য স্মরণ করা হয়েছে। অধ্যাপক সুকুমার সেন,[৩৯] শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়[৪০] এবং আরো কেউ কেউ এই আলোচনায় যোগ দিয়েছেন। অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেন—দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী এবং বিষবৃক্ষ তাঁর প্রথম যুগের রচনা; চন্দ্রশেখর, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, রাজসিংহ,—এবং ইন্দিরা, যুগলাঙ্গুরীয়, রাধারাণী—এই সাতটিই দ্বিতীয় যুগের; আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম তাঁর তৃতীয় অর্থাৎ শেষ যুগের রচনা। গ্রীক ট্র্যাজেডি, শেক্‌সপীয়র এবং টমাস হার্ডির উল্লেখ ক'রে তিনি বলেছেন যে, গ্রীক ট্র্যাজেডিতে নিয়তির জাল দুশ্ছেদ্য; হার্ডির উপন্যাসে এবং নাটকেও—'দেবতারা সভা করিয়া বসিয়া আছেন এবং মানবজীবনের ব্যর্থতা, অপূর্ণতা, প্রয়াস ও তাহার পরিসমাপ্তি লইয়া কৌতুক করিতেছেন'; কিন্তু—

> 'বঙ্কিমচন্দ্র অন্য রীতি অবলম্বন করিয়াছেন। তাঁহার উপন্যাসে মানবের জ্ঞান খুবই স্পষ্ট; সুতরাং তাহার পদস্খলন অধিকতর শোকাবহ। ইহাতে নিয়তির অনতিক্রমণীয়তা অতিশয় তীব্র হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। মানুষ সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভ করিলেও নিয়তির হাত হইতে তাহার নিষ্কৃতি নাই। এই দিক দিয়া বিচার করিলে বঙ্কিমপ্রতিভার পরিপূর্ণ বিকাশ মনোরমা-কাহিনীতে নহে, কুন্দনন্দিনীর কাহিনীতে।'

পূর্বোক্ত দ্বিতীয় যুগের কথা-প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন:

> 'এই যুগে বঙ্কিমচন্দ্র মানবের শক্তিতে ক্রমশঃ আস্থাবান হইয়াছেন এবং নিয়তির অলঙ্ঘ্যতা সম্পর্কে তাঁহার বিশ্বাস যেন শ্লথ হইয়া উঠিয়াছে। ইন্দিরা, রাধারাণী, রজনী ও কৃষ্ণকান্তের উইল-এ নিয়তির পরিচয় পাওয়া যায় না। বরং শেষোক্ত গ্রন্থে ভ্রমর নিজেই ভবিষ্যতের ঘটনার স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়াছেন। 'তুমি আবার আসিবে, আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে—আমি সেই আশায় প্রাণ রাখিব'—ইহা খণ্ডিতা নায়িকার অভিশাপ নয়, সতীনারীর দিব্যদৃষ্টি। সূর্যমুখী ভ্রমরের মত অভিমানিনী নহেন, কিন্তু তাঁহার এই দিব্যদৃষ্টি নাই। 'যুগলাঙ্গুরীয়'কে জনৈক বিদগ্ধ

৩৯। এই গ্রন্থের •৫২-৫৩, ৩১৩-১৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪০। এই গ্রন্থের ২৬০, ২৯০-৯১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সমালোচক 'ফলিত জ্যোতিষ' আখ্যা দিয়াছেন। এই আখ্যা অসম্পূর্ণ। 'দুর্গেশনন্দিনী' হইতে 'সীতারাম' পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্র যে কয়খানি উপন্যাসে জ্যোতির্গণনার কথা লিখিয়াছেন, প্রত্যেক খানিতেই দেখা যায় যে সেই গণনা সফল হইয়াছে। 'যুগলাঙ্গুরীয়' গল্পের বৈশিষ্ট্য এই যে, যে বিপদের সম্ভাবনা ছিল জ্যোতিষী ও প্রণয়িযুগলের শুভানুধ্যায়ীরা কৌশল করিয়া তাহা এড়াইয়া গিয়াছেন। যাহা ট্র্যাজেডি হইতে পারিত তাহা রোমান্সে পরিবর্তিত হইয়াছে।'

বঙ্কিমচন্দ্রের কথাসাহিত্যের ধারায় এই দ্বিতীয় যুগের 'চন্দ্রশেখর' এবং 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে তিনি জ্যোতিষ-গণনা আর নিয়তির অনিবার্যতা উল্লেখ করে লিখেছেন যে, চন্দ্রশেখরের মূল কাহিনীতে নিয়তির পদক্ষেপ অনুপস্থিত,—রাজসিংহও নিজের শৌর্যে নির্ভরশীল, তিনি দৈবশক্তির বাহন নন। মবারক এবং দলনী দুজনেই উপন্যাসে অপেক্ষাকৃত অপ্রধান। মবারক দুর্দমনীয় প্রবৃত্তি সংযত ক'রেছিল; দরিয়াকে সে ত্যাগ ক'রতে চায়নি। তার মৃত্যু ঘটেছিল অতর্কিতভাবে। দলনীকে বিষ খেতে হয়েছিল নবাবের 'অপরিসীম ব্যস্ততা'র ফলে। এই দুটি দুর্ঘটনা ঠিক অবিমিশ্র নিয়তি-তাড়িত নয়। 'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তও—প্রতাপের দিক থেকে চন্দ্রশেখরের দিকে তাঁর অনুরাগস্রোতের গতি ফিরিয়ে দেবার মনুষ্যসাধ্য বা মানবিক ক্ষমতারই অভিব্যক্তি! শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তবিধিতে অতিপ্রাকৃত কিছুই ছিলনা,—সে পথ আত্মসংযমের পথ! সুবোধবাবু এই সূত্রে, এদিক থেকে হিন্দুধর্মের নিষ্কাম কর্মবাদ, ভক্তিতত্ত্ব এবং নিরীশ্বরবাদী কোম্ৎ-দর্শনে বঙ্কিমের আস্থার কথা জানিয়েছেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের নায়িকাদের সাধারণ বয়সের তুলনায় দু'একটি ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্তও চোখে পড়ে। রাধারাণীর উনিশ বছরেও বিয়ে হয়নি; 'রজনী'রও বিয়ের দেরি হয়েছে। রাধারাণীর মায়ের মৃত্যুর পর কামাখ্যাবাবু তার অভিভাবক হন; তিনি বাল্যবিবাহের বিরোধী। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে বলা হয়েছে—'কিন্তু কামাখ্যাবাবু নব্যতন্ত্রের লোক—বাল্যবিবাহে তাঁহার দ্বেষ ছিল। তিনি বিবেচনা করিলেন যে, রাধারাণীর বিবাহ তাড়াতাড়ি না দিলে, জাতি গেল মনে করে, এমত কেহ তাহার নাই। অতএব যবে রাধারাণী স্বয়ং বিবেচনা করিয়া বিবাহে ইচ্ছুক হইবে, তবে তাহার বিবাহ দিব। এখন সে লেখাপড়া

শিখুক।' 'যুগলাঙ্গুরীয়'তে হিরণ্ময়ীর, এবং 'রজনী'তে রজনীর বিবাহের বিলম্ব সম্বন্ধেও উপযুক্ত কারণ দেখানো হয়েছে। কিন্তু এ নিতান্তই আনুষঙ্গিক গৌণ কথা। অতঃপর তাঁর রজনী' উপন্যাসের কথা আলোচ্য।

সমুচিত কৌতূহল বজায় রেখে কাহিনীর প্রবাহে বেগ সঞ্চারের দক্ষতার দৃষ্টান্ত তাঁর প্রায় সমস্ত উপন্যাসেই বিদ্যমান। 'রজনী'তেও সে-গুণ উপস্থিত। থ্যাকারের 'হেনরি এসমণ্ড'এ [১৮৫২], কিংবা ডিকেন্সের 'ডেভিড কপারফিল্ড'এ [১৮৪৯-৫০], কিংবা উইল্‌কি কলিন্সের 'এ উওম্যান-ইন-হোয়াইট'এ যেমন উত্তম পুরুষে আত্মজীবনী বর্ণনা চ'লেছে—'রজনী'তে তেমনি প্রথম খণ্ডে 'রজনীর কথা ,—দ্বিতীয় খণ্ডে 'অমরনাথের কথা',—তৃতীয়ে 'শচীন্দ্রের',—গল্প এগিয়েছে এইভাবে। এই সাদৃশ্যের দিকটি অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন অনেকদিন আগেই স্মরণ করেন। তাছাড়া বুলওয়ার-লিটন-এর 'The Last Day of Pompeii' [১৮৩৪] উপন্যাসে অন্ধ ফুলওয়ালী 'নিডিয়া' চরিত্রের সঙ্গে 'রজনী'র সাদৃশ্যের কথাও ভাবা হয়েছে। প্রথম খণ্ডের আটটি পরিচ্ছেদে রজনীর আত্ম-পরিচিতি বর্ণনার আদিতেই,—অন্ধের জগৎ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা আছে। সেই কথাগুলিও বঙ্কিম-সাহিত্য-পাঠকের মনোযোগের বিষয় :

> 'তোমাদের সুখদুঃখ আমার সুখদুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্ন প্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না··· আমি জন্মান্ধ।'

—রজনীর আত্মকথা শুরু হয়েছে এই সুরে। বাপ-মার সঙ্গে রজনী কলকাতায় বাস করে। সে কুমারী। তার পিতার পেশা মালাকরবৃত্তি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তেষট্টি বছর বয়সের রামসদয় মিত্রের কথা আছে। তাঁরই দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা। তাঁর বয়স উনিশ বছর। রজনীর মা সেই বাড়িতে ফুল সরবরাহ ক'রতেন। —সেই 'লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে একটি এই যে, তিনি বাস্তবিকই পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ।' রজনীর প্রতি লবঙ্গলতার স্নেহ ছিল অকৃত্রিম! একদিন মায়ের অসুস্থতার জন্যেই, রজনী সে-বাড়িতে ফুল দিতে গেলে, রামসদয়ের ছোট ছেলে শচীন্দ্র তার চোখ পরীক্ষা করেন। রজনী সেই স্পর্শেই

বিহ্বল হয়! শব্দ, স্পর্শ আর গন্ধ—এই তিনটি মাত্র সংবেদনের সামর্থ্য সম্বল ক'রে, রজনী জগতের অভিজ্ঞতা যথাসাধ্য ধরবার চেষ্টা করে। রূপ দেখবার অক্ষমতার জন্যে মন তার বিদীর্ণ হয়ে যায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে সেই ব্যাকুলতার পরিচয়। চতুর্থ পরিচ্ছেদে আর-একটি খবর পাওয়া যায়। শচীন্দ্র তাঁদের সরকার হরনাথ বসুর ছেলে গোপালের সঙ্গে রজনীর বিয়ের কথা তোলেন। লবঙ্গলতার তাতে সমর্থন ছিল। সে-কথা জানতে পেরে, রজনী সে বাড়িতে গিয়ে আপত্তি প্রকাশ করায় লবঙ্গলতা রাগ ক'রে তাকে তাড়িয়ে দেন। অপমানিত হয়ে ফিরে যাবার সময়ে শচীন্দ্রের সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে, লবঙ্গলতার সঙ্গে তাঁর সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রের এ-বিষয়ে কিছু কথা হয়। এই পঞ্চম পরিচ্ছেদেই গোপালের স্ত্রী চম্পকলতার কথা ওঠে। চম্পকলতাও নিজের সতীন চায়না, তাই সে তার দুশ্চরিত্র ভাই হীরালালকে টাকার লোভ দেখিয়ে রজনীকে বিয়ে করবার জন্যে রাজি করে। রজনীর বাবার কাছে হীরালাল এই বিয়ের প্রস্তাব জানায় বটে, কিন্তু তার আশা সফল হয় না। শেষে চম্পকলতা নিজে এসে রজনীকে বলে যে, গোপালের সঙ্গে বিয়ে হলে, সে বিষ খেয়ে আত্মহত্যা ক'রবে! অতঃপর চম্পকলতার সাহায্যেই এই বিয়ে বন্ধ করবার জন্যে, নিজের পিতৃগৃহ ত্যাগ ক'রে হীরালালের সঙ্গে রজনী একরাত্রে চাঁপার বাড়িতে যাত্রা করে। সপ্তম পরিচ্ছেদে, সেই অবস্থাতেই অন্ধ বালিকা রজনীর তীব্রতর দুর্দশা শুরু হয়। হীরালাল রজনীকে তার প্রস্তাবে রাজি ক'রতে না পেরে,—এক চরে নৌকো লাগিয়ে, সেখানে তাকে পরিত্যাগ ক'রে চলে যায়। সে-রাত্রে রজনী তার হাতের লাঠি ছুঁড়ে হীরালালকে আঘাত করে এবং হীরালাল শাসিয়ে যায় যে, খবর-কাগজে সে তার নামে সমালোচনা লিখবে! প্রথম খণ্ডের শেষে, অষ্টম পরিচ্ছেদে এই দুরবস্থায় প'ড়ে রজনীকে আত্মহত্যার সংকল্প নিতে দেখা যায়। রজনী গঙ্গায় গা ভাসিয়ে দেয়। কিন্তু তার মৃত্যু হয় না। অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষ অংশে তার কথা—'ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।' এই কৌশলে বঙ্কিম প্রথম খণ্ডের সঙ্গে দ্বিতীয় খণ্ডের যোগ ঘটিয়েছেন!

অতঃপর দ্বিতীয় খণ্ডে অমরনাথের কথা। প্রথম পরিচ্ছেদে অমরনাথ বলেন—'আমার নিবাস—অথবা পিত্রালয় শান্তিপুর—আমার বর্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নেই। আমি সৎকায়স্থকুলোদ্ভূত, কিন্তু

আমার পিতৃকুলের একটি গুরুতর কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। আমার খুল্লতাত-পত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন।' অমরনাথের পিতার মৃত্যুর পরে, তার এক পিসী ভবানীনগরের সন্নিহিত কালিকাপুরের লবঙ্গলতার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধ করেন। এই সূত্রে, এই পরিচ্ছেদেই লবঙ্গলতার রূপ-বর্ণনার ঈষৎ আয়োজন দেখা যায়। যৌবনের রূপানুরাগ—এবং সৌন্দর্যের আসল প্রকৃতি সম্বন্ধে এখানে কমলাকান্তের ভঙ্গিতেই লেখকের কয়েকটি উক্তি দেখা দেয়। অমরনাথ বলেন—'এই সময় আমাদের কুলকলঙ্ক কন্যাকর্তার কর্ণে প্রবেশ করিল—সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমার হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল—এমত সময়ে ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র আসিয়া লবঙ্গলতা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হইল। লবঙ্গলতাতে নিরাশ হইয়া আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম।' এই ঘটনারই কয়েক বছর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটে, যার ফলে অমরনাথ গৃহত্যাগ ক'রে নানা দেশে ভ্রমণ ক'রতে থাকেন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই অমরনাথের কাশীবাসের বিবরণ আছে। কাশীতে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোনো এক প্রাচীন ভদ্রলোকের কাছে অমরনাথ শুনতে পান যে, হরেকৃষ্ণ দাস নামে একটি লোক তার মৃত্যুর সময় তার একমাত্র কন্যা রজনীকে নিজের শ্যালিকার স্বামী রাজচন্দ্র দাসের কাছে রেখে গেছেন। অমরনাথ এর পরে কাশী ত্যাগ করেন। তৃতীয় পরিচ্ছেদে অমরনাথের জীবনের নানা দুঃখের কথাসূত্রে কিঞ্চিৎ দুঃখতত্ত্বের বর্ণনা দেখা দেয়, যেমন—'দুঃখ কি অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ, কারণ রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাবমাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাব বিশেষই দুঃখ।' অমরনাথের জীবনের কাম্যবস্তু কী, তারই আলোচনাসূত্রে মানব-মনের কামনা-বাসনা সম্পর্কে আবার এক মন্তব্য দেখা যায়,—যেমন চতুর্থ পরিচ্ছেদের প্রথমেই তিনি লিখেছেন: 'এই অনন্ত সংসার, অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছু নাই?'

এইভাবে পর পর কয়েকটি অনুচ্ছেদ চ'লেছে। পঞ্চম পরিচ্ছেদে, শচীন্দ্রনাথের কিঞ্চিৎ বিবরণ; তাঁর পিতার নাম রামসদয় মিত্র, পিতামহ বাঞ্ছারাম, প্রপিতামহ কেবলরাম। শচীন্দ্র প্রভৃতি যে বিষয় ভোগ ক'রছিলেন, বাঞ্ছারামের উইল অনুসারে সে-সম্পত্তি আসলে মনোহর দাস এবং হরেকৃষ্ণ দাস নামে দুটি ভাইয়ের জীবিত উত্তরাধিকারীদের প্রাপ্য। অর্থাৎ তখন সে-সম্পত্তি রজনীর-ই

প্রাপ্য! ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অমরনাথের কথা থেকেই জানা যায় যে, বাংলার এক পল্লীগ্রামে কোনো এক বনে রজনীকে এক দুর্বৃত্তের হাতে লাঞ্ছিত হতে দেখে তিনি তাকে সে-অবস্থা থেকে উদ্ধার করেন। কলকাতায় রজনীর সঙ্গে অমরনাথ রাজচন্দ্র দাসের বাড়িতে এসে, রাজচন্দ্রকে জানিয়ে দেন যে, রজনী তার মেয়ে নয়! রাজচন্দ্র স্বীকার করে যে, রজনী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা। দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি এইখানেই।

তৃতীয় খণ্ডে শচীন্দ্রই বক্তা। শচীন্দ্র বলেন যে, রজনীর যেদিন বিবাহ স্থির হয়, সেইদিনই সকালে শোনা যায় যে, রজনী পালিয়ে গেছে। তাঁর বিশ্বাস হয় যে, হীরালালই রজনীকে ভুলিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু হীরালাল ফিরে আসে, তবু রজনীর দেখা না পেয়ে, রজনীর জন্যে খবর-কাগজে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শচীন্দ্রের কথা থেকেই জানা যায় যে, তাকে বিয়ে করবার লেশমাত্র ইচ্ছা ছিল না তাঁর! তবে রজনীর জন্যে সমবেদনা ছিল।—'রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ; রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না; ইচ্ছাও নাই।' কিন্তু এ-কথায় তাঁর 'সুন্দরী পাঠিকা'র সংশয় কল্পনা ক'রে শচীন্দ্র তাঁর মনোমত পাত্রীর প্রকৃতি সম্বন্ধে সরস এবং বিস্তৃত বর্ণনা দিয়েছেন! প্লটের ঠাসবুনানির দিক থেকে, সে-সব কথা বাহুল্য। রাজচন্দ্র দাসের কাছ থেকে জানা যায় যে, রজনীকে পাওয়া গেছে! কিন্তু রজনীর গৃহত্যাগের কারণ সম্বন্ধে,—এবং কী ভাবেই বা তাকে ফিরে পাওয়া যায় সে-বিষয়ে রাজচন্দ্র এবং তার স্ত্রী সম্পূর্ণ নির্বাক হয়ে থাকে। তারা অন্য বাড়িতে উঠে যায়। তারই একমাস পরে, শচীন্দ্রের অপরিচিত অমরনাথ এসে শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করেন। এই আলাপে অমরনাথ শেক্‌স্‌পীয়র, হক্‌স্‌লি, ডারুইন,—ট্যাসিটাস, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস ইত্যাদি সাহিত্যিক-বৈজ্ঞানিক-ঐতিহাসিকের কথা তোলেন। শচীন্দ্র তাঁর পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হন। তারপর কথায়-কথায় অমরনাথ বলেন, রজনী রাজচন্দ্র দাসের পালিতা কন্যা,—এবং অমরনাথ তাকে বিয়ে ক'রবেন মনস্থ ক'রেছেন! শচীন্দ্র এও শোনেন যে, তাঁদের বিষয়-সম্পত্তি এই রজনীরই প্রাপ্য! বলা বাহুল্য, শচীন্দ্র এতে উদ্বিগ্ন হন। ঈষৎ কথা-কাটাকাটি হয়। অমরনাথ শেষ কথা বলে যান—'উকিলের মুখে সংবাদ শুনিবেন।' পঞ্চম পরিচ্ছেদে রামসদয়

রাজচন্দ্রকে ডেকে পাঠান—তাঁর উদ্দেশ্য রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ ঘটিয়ে তোলা। লবঙ্গলতা প্রতিজ্ঞা করেন যে, এ-বিবাহ তিনি অবশ্যই ঘটাবেন। শচীন্দ্র নিজে কিন্তু রাজী নন। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে অতঃপর সন্ন্যাসী দেখা দিয়েছেন। তাঁরই ক্ষমতার গুণে শচীন্দ্র সে-রাত্রে স্বপ্নে রজনীকে দেখেন। সন্ন্যাসী বলেছিলেন, স্বপ্নে তিনি যাকে দেখতে পাবেন, পৃথিবীতে সে-ই তাঁকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসে!

চতুর্থ খণ্ডে 'সকলের কথা'। প্রথমেই লবঙ্গলতা তাঁর নিজের কথা জানিয়েছেন। রাজচন্দ্রের স্ত্রীর কাছে তিনি শোনেন যে রজনী নাকি অমরনাথকেই বিয়ে ক'রতে চায়,—শচীন্দ্র সম্বন্ধে তার আগ্রহ নেই। লবঙ্গলতা তাই রজনীর বাড়িতে গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করেন। সেখানে অমরনাথকেও দেখতে পান। অমরনাথ কক্ষান্তরে গেলে রজনী বলে, শচীন্দ্রের প্রতি তার অনুরাগ অকৃত্রিম, কিন্তু অমরনাথই তার প্রাণরক্ষা ক'রেছেন এবং অমরনাথের জন্যেই সে বিষয়-সম্পত্তি পেয়েছে,—তাই অমরনাথকেই সে বিয়ে করবে। প্লটের দিক থেকে দ্বিতীয় ও চতুর্থ, দুটি পরিচ্ছেদই উল্লেখযোগ্য। অমরনাথের সঙ্গে নিভৃতে আলোচনা ক'রে লবঙ্গলতা রজনী সম্বন্ধে তাঁর যথার্থ অনুরাগের পরিচয় পান। কিন্তু, অতীতে লবঙ্গলতার কুমারী-অবস্থায় অমরনাথই যে তাঁর প্রণয়-কামনায় একদিন রাত্রে তাঁর ঘরে সিঁধ কেটে ধরা পড়েন, আর তাঁর পিঠে 'চোর' লিখে তাঁকে শাস্তি দেওয়া হয়,—সেই বিবরণ উল্লেখ ক'রে লবঙ্গলতা তাঁকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদের শেষ দিকে দেখা যায়, অমরনাথ রজনীকে নিজেই সব কথা জানাতে প্রস্তুত! লবঙ্গলতা বলেন—'আমি হারিয়া মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে হর্ষবিষাদে ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।' এদিকে পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম পরিচ্ছেদে রজনীর চিন্তায় শচীন্দ্র খুবই কাতর হয়ে রোগগ্রস্ত হন। চতুর্থ খণ্ডের এই শেষ পরিচ্ছেদে লবঙ্গলতা সন্ন্যাসী, অমরনাথ, রজনী,—সকলেই শচীন্দ্রের রোগশয্যার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন!

পঞ্চম খণ্ডের শুরুতেই অমরনাথের কথা ওঠে। অমরনাথ বলেন—'এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অথচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পরে আর কখন কাহাকে ভালবাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ!' এই শেষ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই অমরনাথ রজনীকে

লবঙ্গলতা-সম্পর্কিত তাঁর আত্মকথা জানিয়েছেন,—এবং রজনী যে শচীন্দ্রের অনুরাগিণী, রজনীর কাছ থেকে তিনি সে-কথাও শুনেছেন। লবঙ্গলতা তাঁর পা জ'ড়িয়ে ধ'রে শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহের অনুমতি দাবি করেন। বাস্তব সংগতির দিক থেকে এ-পরিস্থিতি খুব স্বাভাবিক মনে ক'রতে বাধা আছে বটে,—কিন্তু এই অপ্রত্যাশিত, অতিনাটকীয় আয়োজনের মধ্য দিয়েই অভিপ্রেত উপসংহারের দিকে কাহিনী এগিয়ে যায়! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে শচীন্দ্রকে অমরনাথ বলেন—তিনি নিজে সন্ন্যাসী, তাই রজনীর জন্যে পাত্রান্তর-সন্ধানী! শচীন্দ্র বলেন—'রজনীর পাত্রের অভাব নাই।' এই উক্তি-প্রত্যুক্তিতে শচীন্দ্রের চরিত্রও কতকটা অস্বাভাবিক হয়ে পড়ে। কিন্তু সন্ন্যাসীর কৌশলের কথা আগেই বলা হয়েছে। যাই হোক্, তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায় অমরনাথ তাঁর সব সম্পত্তি রজনীর স্বামীর নামে দান করেন এবং তার পরেই সুদূর কাশ্মীর অভিমুখে চলে যান! চতুর্থ ও শেষ পরিচ্ছেদে দু'বছর পরের খবর দেওয়া হয়েছে। ভবানীনগরে শচীন্দ্রের সঙ্গে অমরনাথের দেখা হয়। তখন সন্ন্যাসীর চিকিৎসায় রজনীর অন্ধত্ব নিরাময় হয়েছে। তাঁদের সন্তানের নাম রাখা হয়েছে—'অমরপ্রসাদ'!

'লবঙ্গলতা বঙ্কিম-সাহিত্যে অনন্যা'—অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের এ মন্তব্য অনিবার্য! তিনি এই সূত্রে নীতিবিদ্ বঙ্কিমের চিত্তসংযমের আদর্শ ব্যাখ্যা ক'রেছেন এবং সৌন্দর্যস্রষ্টা বঙ্কিমের অন্যতর প্রবণতার কথাও জানিয়েছেন। 'বঙ্গদর্শনে' 'রজনী'র প্রথম প্রকাশে ['বঙ্গদর্শন', বৈশাখ ১২৮২, পৃষ্ঠা ১৭] দেখা গিয়েছিল যে,—'অমরনাথ লবঙ্গলতা হরণের প্রতিশোধ' নেবার জন্যেই রজনীকে উদ্ধার ক'রতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বই হিসেবে 'রজনী' যখন আত্মপ্রকাশ করে, তখন অমরনাথের প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি শান্ত হয়েছে! 'বঙ্গদর্শনে', 'রজনী'র শেষ অধ্যায়ে অমরনাথকে লবঙ্গলতা বলেছিলেন—'শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয় পাষণ্ড' [বঙ্গদর্শন, অগ্রহায়ণ ১২৮২, পৃষ্ঠা ৩৬৪]। কিন্তু বইয়ে দেখা যায়—'শুনিয়াছি, তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও; আমি তোমার গুণ জানিতাম না।' এই তুলনাভিত্তিক আলোচনা উত্থাপন ক'রে অধ্যাপক সেনগুপ্ত খুবই সংগত মন্তব্য ক'রেছেন:

> 'লবঙ্গলতার কাহিনী 'রজনীর' অপ্রধান আখ্যায়িকা। তবু বঙ্কিমচন্দ্রের বিশ্লেষণ অতিশয় সুন্দর ও সূক্ষ্ম এবং নীতির বাঁধন

অপেক্ষাকৃত দৃঢ় বলিয়াই নীতিবিদ্রোহী প্রেমের অপরাজেয় প্রাবল্য বিশেষ করিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। অনেকের মনে এই ধারণা আছে যে, বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের যে রাজপথ আবিষ্কার করিয়া গিয়াছিলেন শরৎচন্দ্র তাহা পরিত্যাগ করিয়া নূতন পথের সন্ধান করিয়াছিলেন। কিন্তু লবঙ্গলতার চরিত্রের যে বিশ্লেষণ বঙ্কিমচন্দ্র করিয়াছেন তাহা হইতে প্রতীতি হয় যে, এই নূতন পথের সন্ধান—তাঁহার জানা ছিল। ইহা যথেষ্ট প্রশস্ত নয় বলিয়া তিনি সাধারণতঃ ইহা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।'[৪১]

অতঃপর 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর কথা। তাঁর এ-উপন্যাসের প্লট-পরিকল্পনায় উইল-বিভ্রাট একটি উল্লেখযোগ্য কৌশল! উপন্যাসের কাহিনী-পরিকল্পনার দিক থেকে এই উইল-সংক্রান্ত আয়োজন এ-উপন্যাসের বাহ্যশক্তির মধ্যে গণ্য।[৪২] উইলের এই পৌনঃপুনিক পরিবর্তন-ঘটিত বিপত্তিজাল যেমন বাইরের উৎপাত, তেমনি অভিমানবশে ভ্রমরের পিতৃগৃহে যাত্রাও পরিজন-মণ্ডলীর ঈর্ষা, নিন্দা এবং সমালোচনার ফল! এও বহিঃশক্তির তাড়না! শ্রীকুমারবাবু লিখেছেন:

> 'ঠিক যে মুহূর্তে গোবিন্দলাল ভ্রমরের একত্রাবস্থান তাহাদের ভবিষ্যৎ সুখের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল, সেই সময়ে ভ্রমরের

৪১। 'বঙ্কিমচন্দ্র' [১৩৬৮], পৃষ্ঠা ১২৬-১২৭ দ্রষ্টব্য।

৪২। শ্রীকুমার বাবু লিখেছেন—'বাহ্যশক্তিগুলির মধ্যে প্রথম কৃষ্ণকান্তের উইল। প্রত্যেকবার উইল পরিবর্তন কেবল যে সম্পত্তির বিভাগ বণ্টনের অংশ বদলাইয়াছে, তাহা নহে, ইহা অলঙ্ঘ্য বিধিলিপির ন্যায় উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীদের ভাগ্যপরিবর্তনও করাইয়াছে। কৃষ্ণকান্তের দ্বিতীয় উইল, যাহাতে হরলালের ভাগে শূন্য পড়িল, তাহা হরলালকে রোহিণীর সাহায্য-প্রার্থী করিয়া রোহিণীর জীবনে একটা অভাবনীয় নূতন পরিচ্ছেদ উদ্‌ঘাটন করিয়া দিল। ইহা রোহিণীর যে তীব্র মনোবৃত্তি তাহার হৃদয়-বিবরে শীতাগমনিস্তেজ, কুণ্ডলীকৃত সর্পের ন্যায় সুপ্ত ছিল তাহাকে তীক্ষ্ণ আঘাত দিয়া জাগাইয়া তুলিল, দংশনলোলুপ বিষধরবৎ সে ফণা উন্নত করিয়া উঠিল। এই নব-জাগ্রত-প্রেম-ক্লিষ্টার চক্ষে গোবিন্দলালের সাধারণ সমবেদনা ও তৎপ্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের জন্য অনুতাপ তাহার তৎকালীন মনোবিকারের মধ্য দিয়া শীঘ্রই প্রণয়ে রূপান্তরিত হইল। অতঃপর দ্বিতীয়বার উইল পরিবর্তন করিতে আসিয়া রোহিণী ধরা পড়িল; এবং এই বন্দী অবস্থাতেই গোবিন্দলালের সহানুভূতির নিবিড়তর সম্পর্কে আসিয়া ভাগ্যপরিবর্তনের এক নূতন সোপানে পা দিল; গোবিন্দলালের নিকট নিজ অনিবার্য

শাশুড়ী আসিয়া তাহাদিগকে পরস্পর হইতে বিছিন্ন করিয়া দিলেন। এমন কি কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুও এমন অসময়ে ঘটিল যে ইহাও এই পরস্পর-বিভিন্ন দম্পতির মনোমালিন্য লোপের পক্ষে অন্তরায়স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইল…। এইরূপ সর্বত্রই অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ একটা অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত হইয়াছে।'

বাহ্যজগতের এই বাধা-বিপত্তির উল্লেখ ক'রেই তিনি টমাস হার্ডির 'ironic treatment of nature' স্মরণ ক'রেছেন। এবং এই সত্যতর বাস্তবতা-চর্চার জন্যেই, তাঁর মতে, উপন্যাস হিসেবে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' 'বিষবৃক্ষের' তুলনায় বেশি উৎকর্ষের পরিচায়ক। আবার, তিনি 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর নায়ক-নায়িকার গভীর বেদনার সমাধানহীন, সুকঠোর বাস্তবতারও উল্লেখ ক'রেছেন! 'বিষবৃক্ষের' নগেন্দ্রনাথ-সূর্যমুখী—'যেন একটা স্বল্পকালব্যাপী দুঃস্বপ্ন হইতে জাগিয়া আবার তাহাদের চিরভ্যস্ত প্রেমের জীবনযাত্রা আরম্ভ করিয়াছে।' কিন্তু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর নায়ক-নায়িকা ততো সহজে অব্যাহতি পান নি!

হরিদ্রাগ্রামের জমিদার কৃষ্ণকান্ত রায়ের বার্ষিক আয় প্রায় দু'লক্ষ টাকা। এই জমিদারি উপার্জন করেন কৃষ্ণকান্ত আর রামকান্ত, দুই ভাই। রামকান্ত স্বর্গত। তাঁর ছেলের নাম গোবিন্দলাল। মৃত্যুর আগে তিনি সম্পত্তি ভাগ ক'রে যাবার কথা ভেবেছিলেন, কিন্তু সময় পাননি। কৃষ্ণকান্ত ভ্রাতৃবৎসল, সজ্জন। তাঁর বড়ো ছেলে হরলাল,—ছোট বিনোদলাল এবং কন্যার নাম শৈলবতী। তিনি প্রথম যে 'উইল' করেন, তাতে গোবিন্দলালের আট আনা, হরলাল-বিনোদলালের প্রত্যেকের তিন আনা, গৃহিণীর এক আনা এবং শৈলবতীর এক আনা অংশ ছিল। কিন্তু সেই উইলের জন্যেই দুর্দান্ত,

প্রণয়াবেগের কথা স্বীকার করিয়া ফেলিল। গোবিন্দলাল আবার এই কথা ভ্রমরের নিকট প্রকাশ করিল; ভ্রমর রোহিণীকে বারুণীর জলে ডুবিয়া মরিতে উপদেশ দিল; প্রেমজর্জরা, নৈরাশ্য-দগ্ধ-হৃদয়া রোহিণী সেই উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করিল। তারপর গোবিন্দলাল-কর্তৃক জলমগ্না রোহিণীর উদ্ধার ও পুনর্জীবন দান, এবং তাহার রোহিণী কর্তৃক আকর্ষণের প্রথম অনুভব—এই সমস্তই এক অলঙ্ঘ্য নিয়তি-শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া উইল চুরির স্বাভাবিক পরিণতিরূপে আসিয়া পড়িল। আবার কৃষ্ণকান্তের মৃত্যুর ঠিক পূর্বে উইলের শেষবার পরিবর্তন ভ্রমরের প্রতি গোবিন্দলালের বিরাগের মাত্রা পূর্ণ করিয়া নিয়তি-হস্ত-প্রেরিত ছুরিকার ন্যায় দম্পতির মধ্যে ছিন্নপ্রায় বন্ধনসূত্রের শেষ গ্রন্থিটি ছেদন করিল।'

অবাধ্য, দুর্মুখ হরলাল তাঁকে তিরস্কার করে। তখন কৃষ্ণকান্ত বলেন—'হরলাল, তুমি যদি বালক হইতে তবে আজ তোমাকে গুরু মহাশয় ডাকাইয়া বেত দিতাম।' হরলাল তাতে আরো কিছু কটূক্তি শোনায়। কৃষ্ণকান্ত নিজেই সে-উইল ছিঁড়ে ফেলে নতুন উইল করেন। তাতে পূর্ব-ব্যবস্থার পরিবর্তে বিনোদলালকে পাঁচ আনা এবং হরলালকে এক আনা অংশের অধিকারী করবার সংকল্প দেখে হরলাল রাগ ক'রে কলকাতায় চলে যায় এবং সেখান থেকে কৃষ্ণকান্তকে বিধবা-বিবাহ করবার ভয় দেখিয়ে চিঠি লেখে! তার উত্তরে কৃষ্ণকান্ত লেখেন—'তুমি আমার ত্যাজ্য পুত্র। তোমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিবাহ করিতে পার। আমার যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে বিষয় দিব। তুমি এই বিবাহ করিলে আমি উইল বদলাইব বটে, কিন্তু তাহাতে তোমার অনিষ্ট ব্যতীত ইষ্ট হইবে না।' তার উত্তরে হরলাল খবর পাঠায় যে, সে বিধবা-বিবাহ ক'রেছে! তখন কৃষ্ণকান্ত দ্বিতীয় উইল ছিঁড়ে ফেলে, তৃতীয় উইল রচনার আয়োজন করেন। পাড়ায় ব্রহ্মানন্দ ঘোষ নামে একটি নিরীহ ভালমানুষের বাস ছিল। সেই ব্রহ্মানন্দকে দিয়েই উইল লেখাবেন ব'লে কৃষ্ণকান্ত তাকে আসতে বলেন। বিনোদলালকে তিনি বলেন, 'এবার তোমার জ্যেষ্ঠের ভাগে শূন্য পড়িবে।' হরলালের শিশুপুত্রকে মাত্র এক পাই দিতে চান তিনি।—'এক পাই বখরায় তিন হাজার টাকার উপর হয়। তাহাতে একজন গৃহস্থের গ্রাসাচ্ছাদন অনায়াসে চলিতে পারে।'

প্রথম পরিচ্ছেদটিতেই এই তৃতীয়বার 'উইল' প্রণয়নের সংকল্পে এসে পৌঁছোনো যায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে হরলাল-ব্রহ্মানন্দ সংলাপ। ব্রহ্মানন্দ পাঁচশ টাকা অগ্রিম নিয়ে হরলালের অনুকূলে সম্পত্তির বারো আনা অংশ লিখে জাল উইল তৈরি ক'রে দেয়,—এবং আরো পাঁচশ টাকা পাবার ভরসা পেয়ে আসল উইল হরলালের হাতে পৌঁছে দেবার প্রস্তাব মেনে নেয়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে, ব্রহ্মানন্দ কিন্তু কৃষ্ণকান্তের নির্দেশ-মতন আসল উইল লিখে এসেছে এবং পাঁচশ টাকা ঘুষ সে হরলালকে ফিরিয়ে দেয়! তখন হরলাল সেই ব্রহ্মানন্দের বিধবা ভ্রাতুষ্পুত্রী রোহিণীর কাছে গিয়ে,—অতীতে কোনো এক রাত্রে রোহিণীকে সে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করেছিল, সেই ঘটনা মনে ক'রিয়ে দিয়ে,—সে-ঋণের প্রতিদান দাবি করে! তখন রোহিণী বলে—'কি বলুন,—আমি প্রাণ দিয়াও আপনার উপকার করিব।'

কিন্তু আসল উইলের জায়গায় জাল-উইল রেখে আসতে হবে শুনে

রোহিণী শিউরে ওঠে। বলে,— 'চুরি! আমাকে কাটিয়া ফেলিলেও আমি পারিব না।' সে হরলালের টাকা ছুঁতেও নারাজ। হরলাল তাকে বিধবা-বিবাহের আশা দেয়—'দেখ তোমাদের সঙ্গে আমাদের গ্রাম সুবাদ মাত্র—সম্পর্কে বাধে না।' রোহিণী সেই আশা পেয়েও প্রথমে দ্বিধায় মৌনী হয়। তারপর হরলাল যখন বিষণ্ণভাবে ফিরে যেতে উদ্যত হয়, তখন সে বলে—'কাগজখানা না হয় রাখিয়া যান, দেখি কি করিতে পারি।'

এই তৃতীয় পরিচ্ছেদেই রোহিণীর প্রথম আবির্ভাব। বঙ্কিম লিখেছেন—'এই রোহিণীতে আমার বিশেষ কিছু প্রয়োজন আছে।' রোহিণীর রূপ-বর্ণনায় তিনি তাঁর স্বভাব-মতন কিছু বাস্তবানুগামিতা, কিছু প্রগল্‌ভতারও চিহ্ন রেখে গেছেন। সে-বর্ণনার প্রয়োজনীয় কথাগুলি এই :

> 'রোহিণীর যৌবন পরিপূর্ণ—রূপ উছলিয়া পড়িতেছিল—শরতের চন্দ্র ষোল কলায় পরিপূর্ণ। সে অল্প বয়সে বিধবা হইয়াছিল, কিন্তু বৈধব্যের অনুপযোগী অনেকগুলি দোষ তাহার ছিল। সে কালাপেড়ে ধুতি পরিত, হাতে চুড়ি পরিত, দোষ, পানও বুঝি খাইত।'

তাছাড়া সে রন্ধনে দ্রৌপদী,—'চুল বাঁধিতে, কন্যা সাজাইতে পাড়ার একমাত্র অবলম্বন!' নিরাশ্রয় ছিল বলেই ব্রহ্মানন্দের বাড়িতে থাকতে হোতো। গভীর রাত্রে কৃষ্ণকান্তের ঘর থেকে রোহিণী আসল উইল্ গোপনে নিয়ে আসে। সেইটুকুই চতুর্থ পরিচ্ছেদের আসল কথা। সেই সঙ্গে আফিমসেবী কৃষ্ণকান্তের ঝিমুনির কথা বলা হয়েছে,—এবং তারই ফলে, এখানে কতকটা কমলাকান্তের আবহ অনুভব করা যায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে, নিজের কার্যসিদ্ধির খবর জেনে,—বিবাহের দাবি শুনে, হরলাল রোহিণীকে বলে—'আমি যাই হই—কৃষ্ণকান্ত রায়ের পুত্র। যে চুরি করিয়াছে, তাহাকে কখনও গৃহিণী করিতে পারিব না।' হরলালকে যোগ্য ধিক্কার দিয়ে রোহিণী বলে—'তুমি যদি মেয়েমানুষ হইতে, তোমাকে আজ যা দিয়া ঘর ঝাঁট দিই, তাই দেখাইতাম। তুমি পুরুষ মানুষ, মানে মানে দূর হও।'

এই রূঢ়, কঠোর আঘাতের দৃশ্যটিও বঙ্কিম তাঁর স্বভাবসিদ্ধ স্মিত-ইঙ্গিত দিয়ে শেষ ক'রেছেন! সে-দিক থেকে পরিচ্ছেদের শেষ ক'টি কথাও স্মরণীয় :

> 'হরলাল বুঝিল, উপযুক্ত হইয়াছে। মানে মানে বিদায় হইল—যাইবার সময় একটু টিপি টিপি হাসিয়া গেল। রোহিণীও বুঝিল যে, উপযুক্ত হইয়াছে—উভয় পক্ষে। সেও খোঁপাটা একটু

আঁটিয়া নিয়া রাঁধিতে বসিল। রাগে খোঁপাটা খুলিয়া গিয়াছিল। তার চোখে জল আসিতেছিল।'

হরলালকে রোহিণী উইল দেয় নি। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে,—এই দুর্ঘটনার পরেই, জল আনতে গিয়ে, বারুণীর ঘাটে ব'সে তার কানে আসে কোকিলের কুহুধ্বনি! তার চোখে পড়ে সুনীল, নির্মল, অনন্ত আকাশ! বাগানে তখন ফুলের শোভা,—কুঞ্জবনে 'কুসুমিতবৃক্ষাধিক সুন্দর' গোবিন্দলাল! অন্তরের দুর্জ্ঞেয় বেদনায় রোহিণীর চোখে জল আসে! এ-দৃশ্য বঙ্কিম-সাহিত্যের সর্বাধিক প্রসিদ্ধ বর্ণনাগুলির অন্যতম।

এ-পরিচ্ছেদের সূচনাটি পরিহাসচিহ্নিত! লেখক এর পরিসমাপ্তিতে রোহিণীর অন্তরালোড়নের ইঙ্গিতমাত্র দিয়েই বর্ণনায় ক্ষান্ত হয়ে লিখেছেন —'কেন কাঁদিতে বসিল, তাহা জানি না। আমি স্ত্রীলোকের কথা কি প্রকারে বলিব? তবে আমার বড়ই সন্দেহ হয়, ঐ দুষ্ট কোকিল রোহিণীকে কাঁদাইয়াছে।' রোহিণীর নিঃসঙ্গতা, ব্যর্থতা, নৈরাশ্যের গূঢ় ইঙ্গিতটি তাঁর সহানুভূতিবর্জিত নয়। কিন্তু কোকিল-কে সম্বোধন ক'রে তাঁর এই কমলাকান্তী ভঙ্গির উচ্ছ্বাস দেখে, এখানে শিল্পীর যে নিহিত সংকল্প অনুভব করা যায়, তার প্রকৃতি নির্ণয় ক'রতে গেলে তাঁরই স্নেহাস্পদ কবি রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষণিকা'র উক্তি মনে পড়ে—'গভীর সুরে গভীর কথা শুনিয়ে দিতে তোরে,—সাহস নাহি পাই'! এ-পরিহাসভঙ্গিতে নায়িকার প্রতি লেখকের সহানুভূতিরই ইশারা পাওয়া যায়।

সব দেশে, সব যুগেই ব্যক্তি-জীবনের আগ্রহে-আকাঙ্ক্ষায় অব্যাহত চরিতার্থতার কিছু কিছু বাধা থাকে। অতএব ব্যক্তিবিশেষের জীবনে কোনো কোনো সামাজিক নীতির শাসন দুর্নিবার হয়ে দেখা দিতে পারে! রোহিণীর জীবনেও তাই ঘটেছিল। রোহিণীর দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে বঙ্কিমের সহানুভূতির অভাব ছিল না, কিন্তু তিনি কিছুতেই সমাজ-নীতির প্রতিকূলে তাকে প্রশ্রয় দিতে চান নি। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এর প্রথম ন'টি পরিচ্ছেদে প্রধানতঃ এই হরলাল-রোহিণী-গোবিন্দলাল সংবাদই পরিবেষিত হয়েছে! নবম পরিচ্ছেদে,—গোবিন্দলালের যাতে ক্ষতি না হয়, সেজন্যে আসল উইল কৃষ্ণকান্তের ঘরে ফিরিয়ে দিতে গিয়েই রোহিণী ধরা পড়ে; এবং তারপর দশম পরিচ্ছেদে,—'সেই রাত্রের প্রভাতে'—রোহিণী যখন কৃষ্ণকান্তের

ঘরে বন্দিনী,—পুষ্পশোভাময় সেই প্রত্যূষের আলোয় গোবিন্দলাল বাগানে বেড়াতে বেরিয়েছেন এবং ভ্রমর এসে তাঁর সঙ্গে সুখী পত্নীর সহজ প্রণয়-কলহে যোগ দিয়েছে! ভ্রমরের সে মুখচ্ছবির বর্ণনা এর আগেই দেখা গেছে।[৪২] সে-বর্ণনার পরেই সে-বাড়ির চাকরাণী-মহলের ঈষৎ বর্ণনা দিয়ে, রোহিণীর দুর্দশার খবর এই সুখী দম্পতির শ্রুতিগোচর করা হয়েছে। সম্পন্ন সংসারে সকালবেলার ঘর ঝাঁটান, জল ছড়ান, বাসন মাজা ইত্যাদির সপ্-সপ্, ছপ্-ছপ্, ঝন্ ঝন্ শব্দের সঙ্গে-সঙ্গে—স্বাভাবিক অত্যুক্তির ফলেই, রোহিণীর চুরির বিবরণ 'ডাকাতির' খবর হয়ে দাঁড়িয়েছে! ভ্রমর সে-খবর গোবিন্দলালকে জানান। গোবিন্দলাল বলেন—'আমার বিশ্বাস হইল না যে রোহিণী চুরি করিতে আসিয়াছিল—তোমার বিশ্বাস হয়?'

রোহিণী সম্বন্ধে ভ্রমরও তা বিশ্বাস করেনা,—কারণ, 'গোবিন্দলালের বিশ্বাসেই ভ্রমরের বিশ্বাস।' ভ্রমরের মুখচুম্বন ক'রে, গোবিন্দলাল কৃষ্ণকান্তের শাসন থেকে রোহিণীকে বাঁচাতে যান। এই চুম্বনের কারণ ব্যাখ্যা ক'রে পরিচ্ছেদের শেষ কথাটিতে লেখক জানান—'পরদুঃখকাতরের হৃদয় পরদুঃখকাতরে বুঝিল—তাই গোবিন্দলাল ভ্রমরের মুখচুম্বন করিলেন।'

গোবিন্দলালের সমস্যার সূত্রপাত ঘটে রোহিণী সম্বন্ধে তাঁর সৌন্দর্য-মুগ্ধতায় এবং এই পরদুঃখকাতরতায়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে. বারুণীর ঘাটে রোহিণীর কান্নার উল্লেখ ছিল। সপ্তম পরিচ্ছেদে তারই ব্যাখ্যা দেখা যায়। গোবিন্দলাল অনেকক্ষণ রোহিণীর কান্না লক্ষ্য ক'রে—অবশেষে সূর্যাস্তের পরে,—আকাশে যখন চাঁদ উঠেছে, সেই সময়ে ঘাটের সিঁড়িতে নেমে,—দুঃখের সংসারে রোহিণীকে 'সংসার পতঙ্গ' ভেবে,—'ভগিনী' ভেবে,—নিজেকে তার দুঃখ-নিবারণের সহায়ক মনে ক'রে,—কাছে গিয়ে তার দুঃখের কারণ জিগেস করেন। রোহিণী বলে—'একদিন বলিব। আজ নহে। একদিন তোমাকে আমার কথা শুনিতে হইবে।' তখনো রোহিণী সম্বন্ধে তাঁর কোনো গোপন ব্যবহার ছিল না! রোহিণীকে তিনি বলেন—'নিজে না বলিতে পার, তবে আমাদের বাড়ির স্ত্রীলোকদিগের দ্বারায় জানাইও।' তারপর অষ্টম পরিচ্ছেদে, রোহিণীর মনে সুমতি-কুমতির অন্তর্দ্বন্দ্বে,—উইল-চুরির কাহিনী গোবিন্দলালকে

৪২। এ-গ্রন্থের ৩৮৯-৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বলে ফেলবা'র পরামর্শ দিয়েছে 'সুমতি'! কিন্তু 'কুমতির-ই জয় হয়। এবং পরিশেষে—

'দুই জনে সন্ধি করিয়া সখ্যভাবে আর এক কার্যে প্রবৃত্ত হইল। সেই বাপীতীরবিরাজিত, চন্দ্রালোকপ্রতিভাসিত, চম্পক-দামবিনির্মিত দেবমূর্তি আনিয়া রোহিণীর মানস চক্ষের অগ্রে ধরিল। রোহিণী দেখিতে লাগিল—দেখিতে, দেখিতে, দেখিতে, কাঁদিল। রোহিণী সে রাত্রে ঘুমাইল না।'

নবম পরিচ্ছেদে :

'গোবিন্দলালের রূপ রোহিণীর হৃদয়পটে দিন দিন গাঢ়তর বর্ণে অঙ্কিত করিতে লাগিল। অন্ধকার চিত্রপট—উজ্জ্বল চিত্র! দিন দিন চিত্র উজ্জ্বলতর, চিত্রপট গাঢ়তর অন্ধকার হইতে লাগিল।···রোহিণী সহসা গোবিন্দলালের প্রতি মনে মনে অতি গোপনে প্রণয়াসক্ত হইল। কুমতির পুনর্বার জয় হইল।'

রোহিণীর প্রতি লেখকের অকৃত্রিম সহানুভূতিই ছিল। তবু, সে যে কুমতির বশেই সমাজ-নীতি লঙ্ঘন করে, এই শেষ বাক্যটি তারই সংকেত! আবার এর পরের অংশে এ-ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে যে, নর-নারীর মনে যখন দুর্বার প্রেমের আকর্ষণ দেখা দেয়, তখন সমাজ-নীতি বা অন্য কোনো সাধারণ বাধা আর বাধা বলে গণ্য হয় না। নবম পরিচ্ছেদের সেই বিশ্লেষণও স্মরণীয় :

'কেন যে এতকালের পর, তাহার এ দুর্দশা হইল তাহা আমি বুঝিতে পারি না, এবং বুঝাইতেও পারি না। এই রোহিণী এই গোবিন্দলালকে বালককাল হইতে দেখিতেছে—কখনও তাহার প্রতি রোহিণীর চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই। আজি হঠাৎ কেন? জানি না। যাহা যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তাহা বলিয়াছি। সেই দুষ্ট কোকিলের ডাকাডাকি, সেই বাপীতীরে রোদন, সেই কাল, সেই স্থান, সেই চিত্তভাব, তাহার পর গোবিন্দলালের অসময়ে করুণা—আবার গোবিন্দলালের প্রতি রোহিণীর বিনাপরাধে অন্যায়াচরণ—এই সকল উপলক্ষে কিছুকাল ব্যাপিয়া গোবিন্দলাল রোহিণীর মনে স্থান পাইয়াছিল। তাহাতে কি

হয় না হয়, তাহা আমি জানি না, যেমন ঘটিয়াছে আমি তেমনি লিখিতেছি।'

এই প্রণয়াসক্তি অস্বাভাবিক নয়। বঙ্কিম এও লিখেছেন যে, রোহিণী অতি বুদ্ধিমতী ; সে—'একেবারেই বুঝিল যে মরিবার কথা'। আবার,—'যদি গোবিন্দলাল ঘুণাক্ষরে একথা জানিতে পারে, তবে কখনও তাহার ছায়া মাড়াইবে না।' তাই সে—'অতি যত্নে মনের কথা মনে লুকাইয়া রাখিল।' এই অবস্থাতেই গোবিন্দলালের প্রতি সহানুভূতিবশে সে কৃষ্ণকান্তের ঘরে দ্বিতীয়বার উইল চুরি ক'রতে যায়। তারপর দশম পরিচ্ছেদে, ভ্রমরের অনুমোদন নিয়ে গোবিন্দলালকে কৃষ্ণকান্তের কাছে রোহিণীর উদ্ধার-চেষ্টায় যেতে দেখা গেছে। কৃষ্ণকান্ত বুঝেছেন—'এ সেই হরা পাজির কারসাজি'। তখন তাঁর কথা—'আমিই থানা, আমিই মেজেস্টর, আমিই জজ'। বিতাড়নের আদেশ শুনে রোহিণী বলে—'ক্ষতি কি?' গোবিন্দলাল তার জামিন হতে চাইলে কৃষ্ণকান্ত ভাবেন—'বুঝি যা ভেবেছি তাই। বাবাজির কিছু গরজ দেখছি।' তিনি রোহিণীকে ভ্রমরের কাছে পাঠিয়ে দেন। একাদশে এই সংবাদের পরে, দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, একান্তে রোহিণীকে কয়েকটি কথা জিগেস ক'রে এই প্রথম—

> 'গোবিন্দলাল বুঝিলেন। দর্পণস্থ প্রতিবিম্বের ন্যায় রোহিণীর হৃদয় দেখিতে পাইলেন। বুঝিলেন, যে মন্ত্রে ভ্রমর মুগ্ধ, ভুজঙ্গীও সেই মন্ত্রে মুগ্ধ হইয়াছে। তাঁহার আহ্লাদ হইল না—রাগও হইল না—সমুদ্রবৎ সে হৃদয়, তাহা উদ্বেলিত করিয়া দয়ার উচ্ছ্বাস উঠিল। বলিলেন, 'রোহিণী, মৃত্যুই বোধ হয় তোমার ভাল, কিন্তু মরণে কাজ নাই। সকলেই কাজ করিতে এ সংসারে আসিয়াছে। আপনার আপনার কাজ না করিয়া মরিব কেন?'

গোবিন্দলাল তাকে দেশত্যাগের পরামর্শ দিয়েছেন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে বলেন—'আর, তোমরা যদি এমনই বিবেচনা কর যে, উহার দোষ নাই—তবে ছাড়িয়া দাও।' পরের পরিচ্ছেদেই রোহিণীর মতান্তরের খবর পাওয়া যায় ; সে বলে—'যাইতে পারিব না।' ভ্রমর ক্ষীরিকে পাঠিয়ে রোহিণীকে খবর দেয়—'তুমি মর।' রোহিণী উত্তর জানায়—'আচ্ছা'। 'পরদুঃখকাতর' গোবিন্দলালের অনুযোগ শুনে ভ্রমর বলে—'ভাবিও না। সে মরিবে না। যে তোমায় দেখিয়া মজিয়াছে—সে কি মরিতে

পারে?' তারপর, পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ পর্যন্ত তিনটি পরিচ্ছেদ জুড়ে,—বারুণীতে রোহিণীর নিমজ্জন ও পরিত্রাণের বিবরণ! জল থেকে তুলে রোহিণীর 'মৃতদেহ' দেখে, গোবিন্দলালের চোখে জল আসে। তিনি বলেন—'মরি মরি! কেন তোমায় বিধাতা এত রূপ দিয়া পাঠাইয়াছিলেন, দিয়াছিলেন ত সুখী করিলেন না কেন? এমন করিয়া তুমি চলিলে কেন?' তারপর রোহিণীর শরীরে শ্বাস-সঞ্চারের চেষ্টার সূত্র ধ'রে উৎকলবাসী মালীর কথা-প্রসঙ্গে সে-কালের অভ্যস্ত রঙ্গরসের মধ্য দিয়ে এগিয়ে, ভবিতব্যের অভিপ্রায় সম্বন্ধে বঙ্কিম এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দিয়েছেন:

> 'গোবিন্দলাল তখন সেই ফুল্লরক্তকুসুমকান্তি অধরযুগলে ফুল্লকুসুমকান্তি অধরযুগল স্থাপিত করিয়া—রোহিণীর মুখে ফুৎকার দিলেন।
>
> সেই সময়ে ভ্রমর, একটা লাঠি লইয়া একটা বিড়াল মারিতে যাইতেছিল। বিড়াল মারিতে, লাঠি বিড়ালকে না লাগিয়া, ভ্রমরেরই কপালে লাগিল।'

সতেরোর পরিচ্ছেদের শেষ কয়েক ছত্রে, গভীর চিন্তায়,—নির্মম ভবিতব্যের ভয়াল মূর্তি দেখে, গোবিন্দলাল রোহিণীর ইহজন্মের নিবৃত্তিহীন পিপাসার যন্ত্রণা,—আর তাঁর নিজের এবং ভ্রমরের অনিবার্য অন্যতর দুঃখের কথা ভেবে,—মাটিতে মুখ লুকিয়ে ঈশ্বরকে ডেকেছেন:

> 'হা নাথ! নাথ! তুমি আমায় এ বিপদে রক্ষা কর!—তুমি বল না দিলে কাহার বলে আমি এ বিপদ হইতে উদ্ধার পাইব?—আমি মরিব—ভ্রমর মরিবে। তুমি এই চিত্তে বিরাজ করিও—আমি তোমার বলে আত্মজয় করিব।'

আঠারোর পরিচ্ছেদে, ভ্রমর জিগেস করে—'আজি এত রাত্রি পর্যন্ত বাগানে ছিলে কেন?' কিন্তু সে-কৌতূহল পরিতৃপ্ত করবার সারল্য তখন অন্তর্হিত! গোবিন্দলাল তখন দ্বিধাবিক্ষত! তিনি জবাব দেন—'কালও বলিব না—দুই বৎসর পরে বলিব। এখন আর জিজ্ঞাসা করিও না ভ্রমর।' ভ্রমর তখন 'কেমন একটা বড় ভারি দুঃখ' অনুভব করে। লেখক জানান—'সে কালো মেঘখানা কিছুতেই নামিল না'!

অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত রোহিণী সম্বন্ধে শরৎচন্দ্রের প্রসিদ্ধ মন্তব্য

স্মরণ ক'রে লিখেছেন—'কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসের প্রধান আলোচনার বিষয় রোহিণী'।[৪৩] তিনি দেখিয়েছেন :

'এই আলোচনায় সর্বপ্রথম মনে রাখিতে হইবে যে রোহিণী কুন্দনন্দিনী নহে, বিনোদিনী নহে, রাজলক্ষ্মী বা সাবিত্রী নহে। তাহার চরিত্রসৃষ্টিতে আর্টের দাবী মিটিয়াছে কি না ইহা বিচার করিতে হইলে সামাজিক নীতিকে বাদ দিতে হইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু অ-সামাজিক কোন নীতিকে খাড়া করিলেও চলিবে না।'

অন্য দেশের অন্য প্রসিদ্ধ সাহিত্য-সৃষ্টির উল্লেখ ক'রে তিনি জানান —ক্লিওপ্যাট্রা অ্যান্টনিকে ভালবাসতেন বটে, শেক্স্পীয়রই দেখিয়েছেন যে—'ক্লিওপ্যাট্রার প্রেম যত ঐশ্বর্যবানই হউক তাহাকে একনিষ্ঠ বলা যায় না।' অতএব—'রোহিণী-চরিত্রের আলোচনায় রমণী-হৃদয়ের তথা মনুষ্য-হৃদয়ের এই বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ রাখিতে হইবে।'

ভ্রমর সম্বন্ধে রোহিণীর মনে প্রীতিবোধ থাকবার কথা নয়, তা ছিলও না। সে ভেবেছে—'পরের সুখ দেখিয়া আমি কাতর নই; কিন্তু আমার সকল পথ বন্ধ কেন?' সুবোধবাবু তার এই 'আত্মসুখকামনা ও মাৎসর্য' দেখিয়ে,—তার 'নৈরাশ্য ও পরাজয়ের গ্লানি' উল্লেখ ক'রে,—হরিদ্রা-গ্রামে গোবিন্দলাল-রোহিণী সম্পর্কিত অপবাদের কথায় সে যে ভেবেছে ভ্রমরই সে রটনার কারণ, সে-দিকটি দেখিয়ে, তারই সিদ্ধান্ত স্মরণ ক'রেছেন—'এদেশে আর থাকিব না, কিন্তু যাইবার আগে একবার ভ্রমরকে হাড়ে হাড়ে জ্বালাইয়া যাইব।' প্রথম খণ্ডের উনিশ পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালের বন্দরখালি যাত্রার প্রস্তাব,—কুড়ি-একুশ-বাইশের পরিচ্ছেদে রোহিণী আর ভ্রমর, দু'জনেরই অন্তর্জ্বালা,—এবং বিশেষতঃ বাইশের পরিচ্ছেদে দেখা গেছে—ভ্রমরকে গিল্টির গহনা দেখিয়ে রোহিণী বলে যে, সেগুলি মেজবাবুর উপহার! তেইশের পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালকে লেখা ভ্রমরের চিঠিতে দেখা যায়—'যতদিন তুমি ভক্তির যোগ্য, ততদিন আমারও ভক্তি; যতদিন তুমি বিশ্বাসী ততদিন

৪৩। 'স্বদেশ ও সাহিত্যে' শরৎচন্দ্র লিখেছিলেন—'সে পাপের পথে নেমে গেল। তারপর পিস্তলের গুলিতে মারা গেল।...অনেকবারই আমার মনে হয়েছে, রোহিণীর চরিত্র আরম্ভ করবার সময় এ কল্পনা তাঁর ছিল না, থাকলে এমন করে তাকে গড়তে পারতেন না।...হিন্দু-ধর্মের সুনীতির আদর্শে এ প্রেমের সে অধিকারী নয়, এ ভালবাসা তার প্রাপ্য নয়।...মৃত্যুর জন্য আক্ষেপ করিনে, কিন্তু করি তার অকারণ অহেতুক জবরদস্তি অপমৃত্যুতে'।

আমারও বিশ্বাস। এখন তোমার উপর আমার ভক্তি নাই, বিশ্বাসও নাই। তোমার দর্শনে আমার আর সুখ নাই। তুমি যখন বাড়ি আসিবে, আমাকে অনুগ্রহ করিয়া খবর লিখিও—আমি কাঁদিয়া কাটিয়া যেমন করিয়া পারি পিত্রালয়ে যাইব।' সেই ডাকেই গোবিন্দলাল ব্রহ্মানন্দ ঘোষের চিঠি পেয়েছেন—'তোমার উপর বৌমা সকল দৌরাত্ম্য করিতে পারেন। কিন্তু আমরা দুঃখী প্রাণী, আমাদিগের উপর এ দৌরাত্ম্য কেন?' অর্থাৎ, রোহিণীকে গোবিন্দলাল সাত হাজার টাকার অলঙ্কার দিয়েছেন,—এ রটনার জন্যে ভ্রমরই দায়ী, ব্রহ্মানন্দের এই ছিল অভিযোগ! ভ্রমরের নির্মম সিদ্ধান্ত জেনে, বন্দরখালি থেকে গোবিন্দলাল বাড়ি ফেরবার উদ্যোগ করেন। চব্বিশের পরিচ্ছেদে, গোবিন্দলালের প্রত্যাগমনের খবর পেয়ে ভ্রমর পিত্রালয়ে গেছেন। এ-পক্ষের অভিমান তখন তীব্রতর হয়েছে। গোবিন্দলাল ভাবেন—'এত অবিশ্বাস! না বুঝিয়া না জিজ্ঞাসা করিয়া আমাকে ত্যাগ করিয়া গেল! আমি সে ভ্রমরের মুখ দেখিব না।' এই দুর্ঘটনার ভূমিকা হিসেবেই চব্বিশের পরিচ্ছেদের সূচনায় লেখক জানিয়েছেন—'যাহাকে ভালবাস, তাহাকে নয়নের আড় করিও না। যদি প্রেমবন্ধন দৃঢ় রাখিবে, তবে সুতা ছোট করিও। বাঞ্ছিতকে চোখে চোখে রাখিও।'

পঁচিশের পরিচ্ছেদে,—ভ্রমর যখন পিত্রালয়ে,—সেই সময়ে রোহিণীর সঙ্গে বাগানের বৈঠকখানায় আবার গোবিন্দলালের দেখা হয়। ছাব্বিশের সূচনায় দেখা যায়:

> 'রূপে মুগ্ধ? কে কার নয়? আমি এই হরিত নীল চিত্রিত প্রজাপতিটির রূপে মুগ্ধ। তুমি কুসুমিত কামিনী শাখার রূপে মুগ্ধ। তাতে দোষ কি?...পাপের প্রথম সোপানে পদার্পণ করিয়া পুণ্যাত্মাও এইরূপ ভাবে।'

গোবিন্দলালের এই অব্যাহত অধঃপতনের জন্যে তাঁর নিজের অসংযম দায়ী, ভ্রমরের অনুপস্থিতি দায়ী, কৃষ্ণকান্তের অসুস্থতাও দায়ী! কৃষ্ণকান্ত গোবিন্দলালকে শাসন করবার কথা ভাবছিলেন। কিন্তু যে-মুহূর্তে তাঁকে এ বিষয়ে কিছু বলবেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই তাঁর অসুস্থতা বেড়ে যায়। ছাব্বিশের পরিচ্ছেদে কয়েকটি মাত্র অনুচ্ছেদে কৃষ্ণকান্তের সেই সংকল্প উল্লেখের পরেই অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত বেগে ঘটনাস্রোত একেবারে তাঁর দেহাবসানে এসে পৌঁছোয়! তাঁর মৃত্যুর আগের মুহূর্তে শেষবার 'উইল' বদলায়।

গোবিন্দলালের নাম কেটে, ভ্রমরের নাম যোগ করা হয়। এ-পরিচ্ছেদের শেষ বাক্য—'সেই রাত্রে হরিনাম করিতে করিতে তুলসীতলায় কৃষ্ণকান্ত পরলোক গমন করিলেন।' ঘটনাস্রোতের এ গতিবেগ তাঁর 'রাজসিংহের' মতন!

কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু-সংবাদের পরে, ছাব্বিশের পরবর্তী দুটি পরিচ্ছেদে শ্রাদ্ধের খবর এবং সেইসঙ্গে গোবিন্দলাল-ভ্রমরের শোক ও চরম বিচ্ছেদের বিবরণ পাওয়া যায়। শ্বশুরের মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে ভ্রমর ফিরে আসে; গোবিন্দলালের জননী তাকে আনতে লোক পাঠিয়েছিলেন। প্রথম সাক্ষাতে গোবিন্দলাল কোনো কথা তোলেন নি, পরে বলেন—'শ্রাদ্ধের পর যাহা বলিবার আছে তাহা বলিব।' ভ্রমরও বলে—'আমারও কিছু বলিবার আছে। তোমার যখন অবকাশ হইবে, জিজ্ঞাসা করিও। স্বামী-স্ত্রীর সহজ প্রীতির পূর্ণিমা তখন দুস্তর মেঘে ঢাকা পড়েছে। সাতাশের পরিচ্ছেদে পর পর কয়েকটি অনুচ্ছেদে বঙ্কিম সেই কথাই বেশ বিস্তৃতভাবে লিখেছেন। তারপর আঠাশের পরিচ্ছেদে, শ্রাদ্ধান্তে 'উইল' পড়া হয়। হরলাল কোনো গোলমাল না ক'রে বিদায় নেয়। গোবিন্দলাল ভ্রমরকে বলেন—'তোমার অর্ধাংশ'। এই অভিমান বা অভিযোগের উত্তরে ভ্রমর শান্ত হয়ে বলে—'তাহা হইলেই তোমার।' কিন্তু গোবিন্দলাল নিজে দু' পয়সা উপার্জন ক'রে দিনপাত করবার অভিপ্রায়ের কথা জানান। তখন সেও শুনিয়ে দেয়—'বিষয় আমার জ্যেষ্ঠ শ্ব-রের নহে, আমার শ্বশুরের। তুমিই তাঁহার উত্তরাধিকারী, আমি নহি। জেঠার উইল করিবার কোন শক্তিই ছিল না। উইল অসিদ্ধ। আমার পিতা শ্রাদ্ধের সময় নিমন্ত্রণে আসিয়া এই কথা বুঝাইয়া দিয়া গিয়াছেন। বিষয় তোমার, আমার নহে।' কিন্তু নিবেদনে নয়, সমর্পণে নয়, বিতর্কেও নয়,—গোবিন্দলাল 'পদপ্রান্তে বিলুণ্ঠিতা সেই সপ্তদশবর্ষীয়া বনিতা'কে কিছুতেই পূর্বগৌরবে গ্রহণ ক'রতে পারেন নি! ভ্রমর তাঁর পা ধ'রে কেঁদে বলেছে—'ক্ষমা কর। আমি বালিকা!' তবু, গোবিন্দলাল তখন রোহিণীর কথা ভেবেছেন:

> 'এ কালো! রোহিণী কত সুন্দরী! এর গুণ আছে, তার রূপ আছে। এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এখন কিছু দিন রূপের সেবা করিব।—আমার এ অসার, এ আশাশূন্য, প্রয়োজন-শূন্য জীবন ইচ্ছামত কাটাইব। মাটির ভাণ্ড যে দিন ইচ্ছা সেইদিন ভাঙ্গিয়া ফেলিব।'

গোবিন্দলালের এ নির্মমতার মার্জনা নেই! এর পরের ঘটনাধারা যেন এই অপরাধেরই প্রায়শ্চিত্ত! রোহিণী এবং গোবিন্দলালের পক্ষে পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হওয়া অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু ভ্রমর সম্বন্ধে দু'জনেই পৃথকভাবে অপরাধী। সে-অপরাধ পুরোপুরি অদৃষ্টের সৃষ্টি নয়। তাঁরা সমাজ-নীতির বিরুদ্ধে গেছেন তো বটেই, তাছাড়া এইসব অবস্থায়,—এই রকম নিবিড় মুহূর্তে,—হাহাকার-ধ্বনিত এ রকম বিশেষ সন্ধিতে—এই প্রশান্ত বিমুখতো কেমন যেন অপ্রত্যাশিত,—কেমন যেন অসম্ভব বলে মনে হয়! এ প্রেম নয়, —রোহিণী সম্বন্ধে এ কেবল অন্ধ রূপানুরাগ! এ তাঁর অন্ধকার প্রবৃত্তি!

মোহিতলাল মজুমদার বলেছিলেন যে, ১৮৭৩ থেকে ১৮৭৮এর মধ্যে কবি-প্রতিভার মধ্যাহ্নকালেই বঙ্কিম বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, রজনী, আর কৃষ্ণকান্তের উইল, এই চারখানি উপন্যাস লিখে গেছেন। এই চারখানিতে তাঁর 'কবিচিত্তের পরমোৎকর্ষা' এবং 'জীবন-জিজ্ঞাসার দিক-পরিবর্তন' দুইই বিদ্যমান—

> 'বিষবৃক্ষে' তাঁহার কবি-প্রতিভা কথাশিল্পকে একটা মৌলিক রসরূপে অনবদ্য করিয়া তুলিয়াছে, বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি ইহার উপরে উঠিতে পারে নাই। 'চন্দ্রশেখরে' রোমান্টিক কল্পনার চরম স্ফূর্তি হইয়াছে, দেহের অপরিমেয় ক্ষুধা ও আত্মার আত্মাভিমান—দুইই এক উদাত্ত করুণ বিলাপ-ধ্বনিতে ফাটিয়া পড়িয়াছে। এই 'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে তাঁহার কবিত্বের পরাকাষ্ঠা আছে—ভাব-কল্পনার অমিত পরাক্রমে তিনি সেই এক সমস্যার জটিল গ্রন্থি ভেদ করিবার শেষ ও চরম প্রয়াস করিয়াছেন। কিন্তু প্রায় একই কালে তিনি 'রজনী' ও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' রচনা করিয়াছিলেন—একটিতে তাঁহার কবি-মানসের স্পষ্ট গতি-পরিবর্তন আছে, অপরটিতে তিনি প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে পুরুষের পরাজয়কে অতি-গভীর অনুভূতি-সহযোগে নিরীক্ষণ করিয়াছেন।'

'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ গোবিন্দলাল ভ্রমরের দ্বারাও আহত, রোহিণীর দ্বারাও বিপর্যস্ত! সে দিক থেকে মোহিতলালের বিশ্লেষণ মানতেই হয়। তিনি জানিয়েছেন:

> 'কৃষ্ণকান্তের উইল' শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডির আদর্শে কল্পিত

হইলেও শেষ পর্যন্ত তাহা একটা করুণ রসাত্মক মেলোড্রামায় পর্যবসিত হইয়াছে। 'চন্দ্রশেখর' ও 'রজনী'র পরে বঙ্কিমচন্দ্র পুনরায় ঐ যে দাম্পত্য প্রেমকেই মহীয়ান করিতে গিয়াছেন, তাহাতে পত্নীর প্রতি বিশ্বাসঘাতী এক পুরুষের রূপতৃষ্ণাকেই একমাত্র হেতু করিয়া তাহার পৌরুষের চরম দুর্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। ফলে, তাঁহার কবিদৃষ্টিও যেমন সংকুচিত হইয়াছে, তেমনই সেই ট্র্যাজেডিকে বড় সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ করা হইয়াছে, উহার যেটুকু প্রসার বা জটিলতার সম্ভাবনা ছিল, রোহিণী চরিত্রটিকে নিষ্পেষিত করায় তাহা নষ্ট হইয়াছে। প্রতাপ-চন্দ্রশেখরের তো কথাই নাই, নগেন্দ্র দত্তের জীবনেও যে ট্র্যাজেডির ছায়া পড়িয়াছে, তাহাতে অন্ততঃ সেই প্রকৃতি-শক্তির লীলা নারী-হৃদয়-মহিমাকে আশ্রয় করিয়া পুরুষ-জীবনের নিয়তি-কুটিল, রহস্য-গভীর রূপকে বৃহত্তর করিয়াছে ; এখানে নারীর সেই স্বভাব-শক্তির মহিমা —কুন্দ বা হীরা—এমন কি সূর্যমুখীর মত চরিত্রেও ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই ; ইহার একমাত্র কারণ, ঐ দাম্পত্য-নীতির প্রতি কবির ব্যক্তি-হৃদয়ের পক্ষপাত। এই উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার সেই দাম্পত্য-জীবনের গৌরব-কীর্তন-বাসনা যেন একটু জিদ্ করিয়াই এই শেষবার চরিতার্থ করিয়াছেন। কিন্তু বাসনা চরিতার্থ হইলেও তাঁহার কবি-কল্পনা স্পষ্টই হার মানিয়াছে।' [৪৪]

৪৪। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস' – শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মৃতিবক্তৃতা [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫৫], পৃষ্ঠা ২৯। মোহিতলাল আরো বলেন— বঙ্কিম মানব-জীবনের নিয়ন্ত্রী হিসেবে বিশেষ-ভাবে প্রকৃতি-শক্তির ধ্যান ক'রে গেছেন ; ঐ প্রকৃতি-শক্তিকে তিনি ইউরোপের কাব্যে ও ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করেন। R. W. Fraser এর 'Literary History of India' থেকে তিনি উদ্ধৃতি তুলে দেখিয়েছেন যে, Marriage de Loti-র সঙ্গে Fraser 'কপালকুণ্ডলা'র সাদৃশ্য অনুভব করেন। এই সূত্রে প্রকৃতির শুভাশুভ দুই মূর্তিরই উল্লেখ ক'রে তিনি বলেন—'ঐ নারীশক্তির সহিত 'সামরস্য'ই পুরুষের সর্বার্থ-সিদ্ধির উপায়।' 'সামরস্য' হোলো তন্ত্রের পারিভাষিক শব্দ। বঙ্কিমের 'কাব্যমন্ত্র বোল আমা তান্ত্রিক' বলেই মোহিতলাল এ-শব্দপ্রয়োগের কৈফিয়ৎ দিয়েছেন। কপালকুণ্ডলা,—মনোরমা,—বিষবৃক্ষের হীরা,—এঁরা সেই নারীশক্তিরই তীব্রতার নিদর্শন। বিষবৃক্ষে—'বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষকে গৌণস্থানে বসাইয়া নারীকে তিন দিক দিয়া দেখিয়াছেন।' কিন্তু, মোহিতলালের মতে 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এ নারীর কল্যাণী ও মোহিনী দুই মূর্তিই পুরুষ গোবিন্দলালের—'আত্মতরিতার শান্তিদায়িনী'। শরৎচন্দ্র যেভাবে আপত্তি তুলেছিলেন মোহিতলাল সেভাবে তোলেন নি। কিন্তু তাঁর এ-বিশ্লেষণের প্রতিবাদ সম্ভব নয়।

সুবোধবাবু রোহিণী-চরিত্রের 'দুঃসাহসিক জিগীষা'র উল্লেখ করেন।[৪৫] সেই জিগীষা-দোষ স্বীকার্য। কিন্তু গোবিন্দলাল সম্বন্ধে তাঁর কথা—'গোবিন্দলালের অধঃপতন প্রতি পদে নির্ভর করিয়াছে বাহিরের ঘটনার উপর'[৪৬],—প্রথম খণ্ডের আঠাশের পরিচ্ছেদে ভ্রমরের অশ্রুবিপ্লুতা মূর্তির সামনে গোবিন্দলালের কঠোর, নিপ্রেম, প্রবৃত্তি-প্রদাহতাড়িত আত্মসর্বস্বতার দৃশ্য মনে রাখলে এ-সিদ্ধান্ত কিছুতেই মানা যায় না। এ শুধু হৃদয়বর্জিত স্বার্থান্ধের লোলুপতা!

> 'গোবিন্দলাল বলিল, 'আমি তোমায় পরিত্যাগ করিব।'
>
> ভ্রমর পদ ত্যাগ করিল। উঠিল। বাহিরে যাইতেছিল। চৌকাঠ বাধিয়া পড়িয়া মূর্চ্ছিতা হইল।'

পরের দুটি পরিচ্ছেদের প্রথমটিতে [২৯], গোবিন্দলালের এ-আচরণের মূলে তাঁর মনের গূঢ় রহস্য উদ্ঘাটনের জন্যেই আবার সুমতি-কুমতির সংলাপ দেখা দেয়। 'সুমতি' বলে—'এত কাল রোহিণী জোটে নাই', তাই এ-বিমুখতা ছিলনা। গোবিন্দলাল যে 'গোল্লায়' যেতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, 'সুমতি'র মনে তখন সেই ধারণাই সুনিশ্চিত! তিরিশের পরিচ্ছেদে লেখক নিজেই এ-দুর্ঘটনার দ্বিতীয় কারণটি জানিয়ে দেন—'আমার এমন বিশ্বাস আছে যে, গোবিন্দলালের মাতা যদি পাকা গৃহিণী হইতেন, তবে ফুৎকার মাত্রে এ কাল মেঘ উড়িয়া যাইত।' কিন্তু তিনিও 'আত্মপরায়ণা',—এই কারণেই পুত্রবধূর সংসারে বাস ক'রতে তাঁর বাধা ছিল। তিনি কাশী-যাত্রার উদ্যোগ করেন। ভ্রমর এসে তাঁর পায়ে পড়েও তাঁকে নিরস্ত ক'রতে পারেনি। মাকে নিয়ে কাশী যাত্রার আগে, ভ্রমরের দানপত্র দেখেও গোবিন্দলালের মন বদলায় নি। ভ্রমর 'ধর্ম' রক্ষার যুক্তিও দেখিয়েছিল। কিন্তু তাতেও ফল হয় না। তখন জীবনের গভীর দুঃখে, গভীরতর হতাশায়,—দেবতা সাক্ষী রেখে, সতীত্বের দোহাই দিয়ে ভ্রমর বলে—'এখন যাও, বলিতে ইচ্ছা হয়, বল যে, আর আসিব না। কিন্তু আমি বলিতেছি—আবার আসিবে—আবার ভ্রমর বলিয়া ডাকিবে, আমার জন্য কাঁদিবে।...তুমি আমারই, রোহিণীর নও।'

একত্রিশের পরিচ্ছেদে এই দম্পতির জীবনের একটি নতুন খবর পাওয়া যায়। লেখক জানিয়েছেন—'এই আখ্যায়িকা আরম্ভের কিছু পূর্বে ভ্রমরের একটি পুত্র

৪৫। 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃষ্ঠা ১৩৮ দ্রষ্টব্য। ৪৬। 'বঙ্কিমচন্দ্র' পৃষ্ঠা ১৩৯ দ্রষ্টব্য।

হইয়া সূতিকাগারেই নষ্ট হয়।' সেই শোক উপলক্ষে ক'রে ভ্রমরের কান্না শুরু হয়। আর, গোবিন্দলাল পথে যেতে যেতে রোহিণীর রূপরাশির ভাবনায় মন দেন!

এখানেই 'কৃষ্ণকান্তের উইল' এর প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি।

দ্বিতীয় খণ্ডের মোট পনেরোটি পরিচ্ছেদের প্রথমটিতেই—কাশী থেকে বেরিয়ে গোবিন্দলাল অন্য কোথাও গেছেন, মাত্র এইটুকু খবরই পাওয়া যায়। ভ্রমরের কাছে তাঁর কোনো চিঠিও আসে না। ইতিমধ্যে হরিদ্রাগ্রামেই রোহিণীর অসুস্থতার খবর পাওয়া যায়! তারপর সেও কোথায় চলে যায়! ভ্রমরের সন্দেহ হয় বটে, কিন্তু সে কাউকে কিছু বলে নি। শাশুড়ীর কাছেও স্বামীর কোনো খবর আসে না। এই সব জেনে, পিত্রালয়ে গিয়ে ভ্রমর প্রথম বছরের শেষে অসুস্থ হয়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ভ্রমরের পিতা মাধবীনাথ সরকারের কথা ওঠে। কৃষ্ণকান্তের শ্রাদ্ধের সময়ে কেবল তাঁর উপস্থিতির খবরটুকুই পাওয়া গিয়েছিল। তিনি চতুর, সুপুরুষ, বুদ্ধিমান। নিজের মেয়ের দুর্দশা দেখে তিনি কাঁদেন। অপরিসীম চাতুর্যবলেই—ব্রহ্মানন্দ ঘোষ, পোষ্টমাষ্টার, নিদ্রাসিংহ কন্‌স্টেব্‌ল, বয়ঃকনিষ্ঠ নিষ্কর্মা আত্মীয় নিশাকর দাস ইত্যাদির সাহায্যে—চিত্রা নদীর তীরে প্রসাদপুরের কুঠিতে 'হাপ পরদানসীন' রোহিণীর ঘরে কাহিনী এগিয়ে নিয়ে যাবার যোগ্য যন্ত্র হয়ে উঠেছেন এই মাধবীনাথ! পঞ্চম পরিচ্ছেদে, মনিবের পক্ষ নিয়ে ওস্তাদ দানেশ খাঁও অনাহূত 'রাসবিহারী'কে [নিশাকর] কটাক্ষ করে। তার যোগ্য জবাবও তাকে শুনতে হয়। ভ্রমরের বিষয়-সম্পত্তির বিলি-ব্যবস্থা প্রসঙ্গে গোবিন্দলাল বলেন—'আমার অনুমতি লওয়া অনাবশ্যক।' নিশাকর বিদায় নেবার পরে, নিজের ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে,—দু'হাতে মুখ ঢেকে গোবিন্দলাল কাঁদতে বসেন!

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের এই ঘটনার পরেই সপ্তম-অষ্টম পরিচ্ছেদে দেখা যায়—গোবিন্দলালকে লুকিয়ে 'সোনা' 'রূপো' দুই পরিচারকের মধ্যে রূপোকে দিয়ে রোহিণী দেশের খবর নেবার জন্যেই নিশাকরকে অপেক্ষা ক'রতে ব'লেছে। চতুর নিশাকর চিত্রার বাঁধা ঘাটে রোহিণীকে 'একাকিনী' যেতে বলেছে। আর, সেই দৃশ্যটি গোবিন্দলালকে দেখিয়ে দেবার জন্যে সোনাকে অগ্রিম পুরস্কার দিয়ে গেছে। অষ্টমের শেষ কয়েক ছত্রে গোবিন্দলাল সত্যিই সেই ঘাটে পৌঁছে, পিছন থেকে রোহিণীর গলা টিপে ধরেন! অদৃষ্টের সেই নৃশংসতা দেখে 'কপালকুণ্ডলা'র শেষ অংশে নবকুমারের কথা মনে পড়ে।

রোহিণী চমকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'কে রে?'
গম্ভীর স্বরে কে উত্তর করিল, 'তোমার যম।'

নবম পরিচ্ছেদে,—নিভৃত শয়নকক্ষের দরজা বন্ধ ক'রে,—নিরস্ত্র, নিরাশ্রয় রোহিণীকে পিস্তল দেখিয়ে নায়ক জিগেস করেন—'কেমন্ মরিতে পারিবে'?

অতীতে বারুণীর জলে তার আত্মহত্যার প্রয়াসের সঙ্গে এই বর্তমানের তুলনা ক'রে লেখক ব্যাখ্যা করেন—'সে দুঃখ নাই, সুতরাং সে সাহসও নাই।' রোহিণীকে দিয়ে তিনি বলিয়েছেন—'মরিব না, মারিও না। চরণে না রাখ, বিদায় দেও।' তারপর—'গোবিন্দলালের পিস্তলে খট্ করিয়া শব্দ হইল। তার-পর বড় শব্দ, তারপর সব অন্ধকার! রোহিণী গতপ্রাণা হইয়া ভূপতিতা হইল।'

পিস্তলের শব্দ শুনে ভৃত্যেরা এসে দেখে—'বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ রোহিণীর মৃতদেহ ভূমে লুটাইতেছে।'

রোহিণীর স্নিগ্ধ সুন্দর নারীসত্তার প্রতি লেখকের শেষ সমবেদনা উচ্চারিত হয়েছে এই উপমায়! বালক-নখর-বিচ্ছিন্ন পদ্মিনীবৎ! গোবিন্দলালের বিভ্রান্তিও তিনি সমবেদনা দিয়ে দেখে গেছেন। তাই, তাকে বলেছেন 'বালক'!

অতঃপর থানা-পুলিশের খবর। গোবিন্দলাল নিরুদ্দেশ। ভ্রমর-গোবিন্দলালের অদর্শনের তৃতীয় বৎসরে ভ্রমরের বড় বোন যামিনী এসে বলে—এখন গোবিন্দলাল হরিদ্রাগ্রামে বাস করলেই ভালো হয়। তখন,—রোগ-শয্যায় নানা ভাবনায় ভ্রমরের দিন যায়। পঞ্চম বৎসরে—উপন্যাসের দ্বাদশ পরিচ্ছেদে,—গোবিন্দলাল ধরা পড়েন। কিন্তু মাধবীনাথের চেষ্টায় বিচারে তিনি মুক্তি পান। মুক্তির পরেই আবার নিরুদ্দেশ হন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে,—ছ'বছর পরে গোবিন্দলাল ভ্রমরকে চিঠি লিখে নিজের মায়ের মৃত্যু-সংবাদ জানান এবং লেখেন—'পেটের দায়ে তোমার আশ্রয় চাহিতেছি—দিবে না কি?' এই চিঠির পরেই ভ্রমরের জবাব পান—অর্থসাহায্যের ব্যবস্থা পুরোপুরিই করা হয়েছে, কিন্তু—'আপনার সঙ্গে আমার ইহজন্মে আর সাক্ষাৎ হইবার সম্ভাবনা নাই।' অতঃপর দ্বিতীয় চিঠিতে গোবিন্দলাল কলকাতায় তাঁর কাছে মাসিক পাঁচশ টাকা পাঠাতে লেখেন। চতুর্দশ পরিচ্ছেদে,—সপ্তম বছরে, হরিদ্রাগ্রামের এক জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিতে ভ্রমরের মৃত্যুর ঠিক পূর্বমুহূর্তে—অপ্রত্যাশিত ভাবে গোবিন্দলাল সেখানে গিয়ে পৌঁছোন। প্রণতি জানিয়ে, ভ্রমর শেষ নিঃশ্বাস ফেলে। তারপর, শেষ

পরিচ্ছেদে গোবিন্দলালের ঐকান্তিক শোক,—তাঁর আত্মচিন্তা,—অন্ধকারে বারুণীর ঘাটে তাঁর মোহদৃষ্টি,—তাঁর রোহিণী-চিন্তা,—ভ্রমর-চিন্তা,—মূর্চ্ছা ইত্যাদির বিবরণ! সেই মুগ্ধ অবস্থাতেই রোহিণী-মূর্তি অন্ধকারে লীন হয়ে গেছে! দেখা দিয়েছে জ্যোতির্ময়ী ভ্রমর-মূর্তি! সে মূর্তি ভ্রমরাধিক ভ্রমরের অস্তিত্বে বিশ্বাস ক'রতে ব'লেছে। সুস্থ হয়ে গোবিন্দলাল আবার নিরুদ্দেশ হন। সাত বছর পরে তাঁর শ্রাদ্ধ হয়ে যায়। তারপর 'পরিশিষ্ট' অংশে ভ্রমরের মৃত্যুর বার বছর পরে তিনি 'ভ্রমরাধিক' ভ্রমর লাভ ক'রে ফিরে আসেন!

রোহিণীর হত্যাকাণ্ডের পর থেকে শেষ পর্যন্ত—ঘটনাস্রোতে সৌন্দর্যবর্জিত হৃদয়-জ্বালাই প্রধান হয়ে ওঠে। ভ্রমর সম্বন্ধে গোবিন্দলালের, এবং গোবিন্দলাল সম্বন্ধে ভ্রমরের উদাসীনতাই শুধু নয়,—তাঁদের তীব্র বিমুখতার পরে,—'পরিশিষ্ট' অংশের গোবিন্দলালকে দেখে মনে হয়, প্রায়শ্চিত্ত-অন্তে তিনি বুঝেছেম যে, অনন্তাভিমুখী মানবসত্তার ঐহিক আনন্দ-বেদনা বড়োই নশ্বর,—নিতান্তই অজ্ঞানের ফল! কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের আগের লেখাগুলির নায়ক নায়িকার চিত্ত-সংঘাত দেখে বার বার মনে হয়, শেক্সপীয়রই ছিলেন তাঁর প্রিয় লেখক! প্রথম দিকে তিনি শেক্সপীয়রের নাটকের দ্বারা প্রভাবিত হন। সে-কথা তিনি নিজেই বলে গেছেন। দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা—এই তিনখানির প্রথম ও দ্বিতীয়টিতে সুবোধবাবু Much Ado About Nothing, The Winter's Tale, Cymbeline প্রভৃতি কমেডির প্রভাব অনুভব করেছেন। আবার, কপালকুণ্ডলার প্রতি নবকুমারের সন্দেহ অমূলক হলেও অনিবার্য। সে-দিক থেকে শেক্সপীরীয় ট্র্যাজেডি 'ওথেলো'র সঙ্গেই সে-উপন্যাসের সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। আবার, 'বিষবৃক্ষে' কুন্দর স্বপ্নে তার জননীর আবির্ভাবের সঙ্গে হ্যামলেটের পিতার প্রেতমূর্তি আবির্ভাবের সাদৃশ্যও তিনি দেখিয়েছেন। 'চন্দ্রশেখরে' কুল্‌সম যেন 'ওথেলো'র এমিলিয়ার ক্ষীণ ছায় শৈবলিনীর উন্মাদ-অবস্থাও কতকটা লীয়রের স্মারক! শেষ পর্বের 'সীতারাম' প্রভৃতিতেও যদুনাথ সে-প্রভাবের কথা স্মরণ করেন। 'অলৌকিক' সংকেতও তিনি দেখিয়েছেন,—অপ্রাকৃতের ঝোঁকও তাঁর ছিল। তবে, তাঁর সম্বন্ধে এইসবই প্রধান কথা নয়। ঔপন্যাসিক হিসেবে, মানবসমাজের এবং ব্যক্তি-জীবনের কল্যাণবাদই তাঁর নিজস্ব বিশেষত্ব। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত এই অনুভূতিই প্রধান।

কথাসাহিত্যের ধারাবসান

উপন্যাসের শেষ পর্ব :
রাজসিংহ থেকে সীতারাম

'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে 'কৃষ্ণকান্তের উইল, পর্যন্ত তাঁর উপন্যাস-ধারায় একটি সুদীর্ঘ পর্বের আলোচনা শেষ হোলো। ১৮৭৮এ 'কৃষ্ণকান্তের উইল' প্রকাশিত হয়। তারপর ১৮৮২তে 'রাজসিংহ' ['ক্ষুদ্র কথা'মাত্র] ৮৩ পৃষ্ঠার এক পুস্তিকা হিসেবে প্রথম দেখা দেয়। /১৮৯৩এ সেই 'রাজসিংহ' চতুর্থ সংস্করণে প্রবেশ করে,—এবং সে-কাহিনীর আয়তনও ইতিমধ্যে বহু পরিমাণে বেড়ে যায়।) তাঁর 'আনন্দমঠ' প্রথম ছাপা হয় ১৮৮২তে,—'দেবী চৌধুরাণী' ১৮৮৪তে,—এবং 'সীতারাম' দেখা দেয় ১৮৮৭তে। এইশেষ চারখানি উপন্যাসে স্বদেশের স্বাধীনতার চিন্তা এবং জীবনের আধ্যাত্মিক ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর পরিণত জীবনের মনোযোগ যেন বেশি পড়েছিল। ইতিহাসের কাহিনী স্মরণ করবার দৃষ্টান্ত এর আগের লেখাগুলিতেই দেখা গেছে। যোগবল এবং সাধু-সন্ন্যাসীর উল্লেখও আগের পর্বের কথা। কিন্তু শেষ দিকের এই চারখানি উপন্যাস যখন লেখা হয়, বঙ্কিমচন্দ্র তখন ধর্মতত্ত্ব, কৃষ্ণচরিত্র ইত্যাদির চিন্তাতেই উত্তরোত্তর বিভোর হয়ে উঠেছেন। |বিভিন্ন সংস্করণে তাঁর 'রাজসিংহ' খুবই পরিবর্তিত হয় বটে, কিন্তু সেও তাঁর পুরোনো অভ্যাস। শচীশচন্দ্র সে-কথা জানিয়ে গেছেন।[১] তাঁর অনেক লেখাই 'প্রত্যেক সংস্করণে কিছু না কিছু পরিবর্তিত' হয়েছে।[২] শচীশচন্দ্রের দেওয়া তালিকায় দেখা যায়—'রাজসিংহ' প্রথম সংস্করণ ছাপা হয় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি, ১৮৮২; 'আনন্দমঠ'-এর প্রথম সংস্করণ ১৫ই ডিসেম্বর, ১৮৮২; 'দেবী চৌধুরাণী'

১। 'বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ত পরিবর্তন করিতেন, লিখিবার সময় করিতেন—পর দিন করিতেন—ছয় মাস, এক বৎসর পরেও করিতেন। যতক্ষণ না কথাটি তাঁহার পছন্দসই হইত—যতক্ষণ না ভাবটি তাঁহার মনঃপুত হইত, ততক্ষণ তিনি পরিবর্তন করিতেন। একটা কথা বা একটা ভাব লইয়া এতটা সময় ব্যয় করিতে আমি অপর কাহাকেও দেখি নাই —'বঙ্কিম কাহিনী' পৃষ্ঠা ২৩।

২। 'বঙ্কিম-জীবনী', পৃষ্ঠা ২৭৫ দ্রষ্টব্য।

প্রথম সংস্করণ ২০এ মে ১৮৮৪; এবং 'সীতারাম' বেরোয় ৪ঠা মার্চ, ১৮৮৭।[৩] সেই ১৮৮২-তেই হেস্টির সঙ্গে 'স্টেট্‌সম্যান' পত্রিকায় তাঁর বিতর্কের উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ লৌকিক ঘাত-প্রতিঘাত বা ভাবের ক্ষেত্র থেকে তিনি যে ক্রমশঃ অন্তর্মুখী অন্যান্য চিন্তার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, সে-পরিচয় তাঁর এই শেষ পর্বের উপন্যাসগুলিতে নানা প্রসঙ্গে বিদ্যমান। 'ধর্মতত্ত্বে' তিনি বলেছেন—'সকল ধর্মের উপর স্বদেশপ্রীতি, ইহা বিস্মৃত হইও না।' দেশের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা এবং ব্যক্তিগত ও জাতিগত কল্যাণের আদর্শ তাঁর মনে বিশেষ এক অন্বয়ানুভূতিতে একসূত্রে গ্রথিত হয়। 'আনন্দমঠ' প্রভৃতি উপন্যাসে তাঁর সেই দৃষ্টিই বিশেষভাবে সূচিত। সত্যানন্দ দেশ-সেবক। মহাপুরুষ তাঁর নেতা। সন্তানধর্ম সেবার ধর্ম, কল্যাণের ধর্ম। ভবানন্দের 'বন্দেমাতরম্' গান একসঙ্গে দেহ-মন-আত্মার উদ্দীপক! জীবানন্দ এবং শান্তির সাধারণ লোক-পরিচিতি বা বাস্তব সম্পর্কের বাস্তবতা তাঁর এই পর্বের আদর্শবাদের ফলে, সাধারণ দাম্পত্য সম্পর্ক অতিক্রম ক'রে,—কতকটা অবিশ্বাস্যভাবে আদর্শায়িত হয়ে ওঠে। সত্যানন্দের হিন্দু-রাজত্ব স্থাপনের স্বপ্ন এই শেষ পর্বেরই বিশেষ স্বপ্ন। 'বিবিধ প্রবন্ধে'র বাংলা ও বাঙালীর ইতিহাস-সম্পর্কিত লেখাগুলি,—এবং কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'ই যেন উপন্যাস-বাহনে পুনর্ব্যক্ত হয়েছিল। 'বন্দেমাতরম্' গানের দেবী তাঁর সেই স্বপ্নের,—সেই অন্বয়বোধের আদর্শ! অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত লিখেছেন:

> 'তিনি বিশেষ কোন দেবতা নহেন। তাঁহার মধ্যে মিলিত হইয়াছে, দুর্গার শক্তি, কমলার ঋদ্ধি ও সরস্বতীর জ্ঞানের ঐশ্বর্য। তিনি তিলোত্তমার মত নূতন সৃষ্টি, সকল দেবতার গুণ তাঁহার মধ্যে আছে, কিন্তু তিনি কাহারও মধ্যে আপনাকে বিলীন করেন নাই।'[৪]

'দেবীচৌধুরাণী'তে হিন্দুর ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ-সম্পর্কিত আদর্শেরই আর এক রূপায়ণ চোখে পড়ে। প্রতিদিনের লৌকিক সংসারের বাস্তবতা মেনে নিয়ে, এখানে তিনি আর-একভাবে অবাস্তবতা বা আদর্শ চিন্তা যোগ ক'রে গেছেন। ভবানী পাঠকের কাছে যোগ ও নিষ্কাম ধর্মের পাঠ নিয়ে, সাধারণ সাংসারিক সম্পর্কের পরিবেশেই প্রফুল্লর নবতর প্রতিষ্ঠা-লাভের সম্ভাবনা কতদূর সার্থক হ'তে পারে, তারই রূপায়ণ দেখা যায় এ-উপন্যাসে। 'সীতারাম'-এর 'শ্রী'ও নারীর সাংসারিক প্রবৃত্তি আর গভীর অধ্যাত্ম-অনুভূতির

৩। ঐ, পৃষ্ঠা ২৭০-২৭১। ৪। 'বঙ্কিমচন্দ্র', পৃষ্ঠা ১৬৭।

সংঘর্ষস্থল! শেষ পর্বে এই আধ্যাত্মিকতা,—এই দর্শন-চিন্তাই প্রধান হয়ে উঠেছে। উপন্যাসে তত্ত্বের এই পরিমাণবৃদ্ধিই এ-পর্বের প্রধান কথা। এবং আগের পর্বে যা ছিল প্রবণতা, এ-পর্বে উপন্যাস-বাহনে সেই প্রবণতাই তাঁর গভীর প্রত্যয় রূপে ব্যক্ত হয়েছে। 'ধর্মতত্ত্বে'র সাতাশের অধ্যায়ে' তিনি লিখেছিলেন—'কবি ধর্মের একজন প্রধান সহায়।'

এসব ক্ষেত্রে কিছুটা 'অবাস্তবতা'র অভিযোগ ওঠা অপ্রত্যাশিত নয়। তাঁর সমালোচকরা অনেকেই সে অভিযোগ উত্থাপন ক'রেছেন। বঙ্কিম-সাহিত্যে এ এক ধরনের অবাস্তবতা; আর এক ধরনের অবাস্তবতার নমুনাও পরিচিত। শরৎচন্দ্র রোহিণী-হত্যার কঠোর সমালোচনা ক'রে গেছেন। তিনি বিশ্বাস ক'রতেন যে, উপন্যাসের প্রথম দিকে রোহিণী সম্বন্ধে বঙ্কিম যা ভাবেননি, শেষদিকে তাঁকে তাই-ই ভাবতে হয়েছিল,—এবং তারই ফলে সেখানে অসংগতি দেখা দেয়! আবার, বঙ্কিমের রোমান্সধর্মিতার কথাও প্রসিদ্ধ। মোহিতলাল সে-বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা ক'রে গেছেন।[৫]

এইসব রচনায় শিল্পবিধি সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কিছু চিন্তা—অর্থাৎ তাঁর সজ্ঞান প্রয়াসের কথা মনে হয়। এই চিন্তায়, সমালোচকের মনে এই সরল প্রশ্নটি বার বার জাগতে পারে যে, সাহিত্যের আস্বাদন থেকে আমরা কোন্ সত্য উপলব্ধি করি? শিল্পের সৃষ্টি না শিল্প-ই সৃষ্টি? উপাদানের প্রকৃতি, আঙ্গিকের বিধি, আদর্শের দিকে তর্জনী-প্রসারণের তাড়না ইত্যাদি বিষয়ে শিল্পীকে যখন আগে থেকেই সজ্ঞানে মাথা ঘামাতে হয়, তখন তাঁর রচনায় সাবলীল উদ্ভবের অভাব দেখা দেওয়াই স্বাভাবিক। কাহিনী বয়নের দিক থেকে 'ইন্দিরা' বা 'যুগলাঙ্গুরীয়' যে-অর্থে জটিলতার

৫। বঙ্কিমের বিরোধী সমালোচকদের সমালোচনার মূল কথাগুলি মোহিতলাল সংক্ষেপে এইভাবে বিবৃত করেন:

'বঙ্কিমচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রধান অভিযোগ—তাঁহার কল্পনার 'অ্যারিস্টোক্রেসি'; তিনি নিম্ন-শ্রেণীর মানুষকে লইয়া উপন্যাস রচনা করেন নাই, অর্থাৎ রামা-শ্যামা বা রামী-বামী তাঁহার সহানুভূতি লাভ করে নাই—তিনি জীবনের বাস্তবতাকে স্বীকার করেন নাই। আর এক গুরুতর অভিযোগ এই যে, তিনি ধর্ম ও নীতিকে তাঁহার রচিত চরিত্র ও ঘটনা-সৃষ্টিতে এতই প্রাধান্য দিয়াছেন যে, তাহাতে রসিকের রসবোধকে পীড়িত অপমানিত করা হইয়াছে। এত বড় জবরদস্ত নীতি-শিক্ষক ও গোঁড়া বর্ণাভিমানী ব্রাহ্মণ যে, সে কবি হয় কেমন করিয়া? তাঁহার উপন্যাসগুলির প্লট এক একটা ছেলে-ভুলানো ফাঁকি—তাঁহার চরিত্রগুলা এমনভাবে চলে যে, তাহাতে সাইকলজির সত্য নাই, জীবনের স্ফূর্তি তাহাতে নাই।'—'বিবিধ কথা' [ভাদ্র, ১৩৪৮], পৃষ্ঠা ৩৩ দ্রষ্টব্য।

বৃত্তান্ত,—নগেন্দ্রনাথের কাছে স্বর্যমুখীর প্রত্যাবর্তন যে-অর্থে রহস্যসমারোহময় মনে হয়,—অরণ্যময় পর্বতে শৈবলিনীর উদ্ধারকল্পে চন্দ্রশেখরের আবির্ভাব যে-রকম অপ্রত্যাশিত, চমকপ্রদ ব্যাপার,—রাধারাণীর প্রথম দৃষ্টিতেই রুক্মিণীকুমারের প্রতি অনুরাগ যে অর্থে অবাস্তব, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' কখনোই ঠিক সে-অর্থে 'অবাস্তব' নয়। 'কপালকুণ্ডলা'র পটভূমিতে এবং কাহিনীতে রোমান্সের লক্ষণ আছে, কিন্তু সেখানকার আবহে বা ঘটনাধারায়,—চরিত্রে বা কাহিনী-প্রকৃতিতে সংগতির অভাব নেই। অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ সংগতি সেখানে বজায় আছে। তাঁর উপন্যাসে বাস্তব-অবাস্তবের যথাযথ তুলনা বা পরিমাপের কথা-প্রসঙ্গে মোহিতলাল ঠিক এই প্রশ্নই তুলেছিলেন। তিনি লেখেন :

> 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস—উপন্যাস নয় ? 'উপন্যাস' কি ? বাস্তব জীবনের নিখুঁত প্রতিকৃতি ?—এ কথা কোন্ শাস্ত্রে বলে ? উপন্যাস যদি তাহাই হয়, তবে বঙ্কিমের কাব্যগুলিকে 'উপন্যাস' বলিও না—কেহ মাথার দিব্য দেয় নাই।'

অর্থাৎ, তিনি রসসৃষ্টির রূপভেদের কথা স্বীকার ক'রে বঙ্কিমের অনুকূলে এই কথাটি বিশেষভাবে বলেন যে—'প্রতিভা যেমন মৌলিক, তাহার প্রকাশ-ভঙ্গিও সেইরূপ মৌলিক।' এই ব'লে, তিনি মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যের দৃষ্টান্ত স্মরণ ক'রে জানান যে—'কবি পরম পাণ্ডিত্য সহকারে সর্ববিধ আয়োজন করিয়া, উপকরণ সংগ্রহ করিয়া মহাকাব্য ফাঁদিলেন ; কিন্তু দেখা গেল তাঁহার সেই সংজ্ঞা অনুযায়ী বস্তু হয় নাই ; তাহা মহাকাব্য নয়, গীতিকাব্য নয়—তাহা একখানি উৎকৃষ্ট কাব্যমাত্র।'

মেঘনাদবধকাব্য যথার্থ মহাকাব্য হয়েছে কী না, সে-প্রশ্ন অন্যত্র বিচার্য। এখানে, মোহিতলালের আলোচনার এই বিশেষ অভিমুখিতাই কেবল লক্ষ্য করা গেল। উপন্যাসের প্রতিষ্ঠাভূমি সর্বত্র নিখুঁতভাবে বাস্তবই হবে,—এই ধারণাটিকে কটাক্ষ ক'রে তিনি বলেন—'মূর্খতাসুলভ সংস্কার'! বলা বাহুল্য, এও অতিশয়োক্তি!

ইংরেজিতে গদ্য কথা-কাব্যের সাধারণ নাম Fiction। মোহিত-লাল সেই সাধারণ শ্রেণী-নামটি উল্লেখ ক'রে বলেছেন—'আধুনিক সমালোচনা-বিজ্ঞান জাতি ধরিয়া কোন রসরচনার বিচার করে না।' তাই তাঁর সিদ্ধান্ত—'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস বলিতে আমরা একজন

বিশিষ্ট কবিব্যক্তির বিশিষ্ট প্রেরণার বিশিষ্ট রূপের—বা ছাঁচের—সৃষ্টি বুঝিব; তাহাকে উপন্যাস বলিতে হয় বল, না বলিলেও কিছুমাত্র হানি নাই।' এ সম্বন্ধে যুগ-মনোবৃত্তি বা সম্প্রদায়-বিশেষের তত্ত্ববুদ্ধির সাধারণ সীমা ছাড়িয়ে—তিনি রসসত্য উপলব্ধির ঔচিত্য সম্বন্ধে ইশারা ক'রেছেন। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের বিরুদ্ধে অবাস্তবতার অভিযোগটি তিনি অন্য একদিক থেকেও দেখেছেন। তথাকথিত 'বাস্তব'-এর ধারণাকে তিনি বলেছেন—'একটা ব্যবহারিক প্রাকৃত সংস্কার মাত্র।' 'রসবস্তুর বাস্তবতা' এবং 'উপাদানের বাস্তবতা'—এই দুটি দিকের উল্লেখ ক'রে তিনি প্রথমটির শ্রেয়ত্ব ঘোষণা ক'রে,—তাঁর এই চূড়ান্ত মন্তব্য জানান যে,—'সকল কাব্যসৃষ্টির মত উপন্যাসেও বাস্তব অবাস্তব ভেদ নাই—জীবন ও জগতের একটা রসরূপ উদ্ভাবন করাই তাহার মূলীভূত প্রেরণা।'

'অতি আধুনিক সমালোচক ও বঙ্কিমচন্দ্র' প্রবন্ধে মোহিতলাল এইভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের বিরোধী সমালোচকের অভিযোগ খণ্ডনের আয়োজন ক'রে গেছেন বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও 'ইন্দিরা', যুগলাঙ্গুরীয়', 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' ইত্যাদি সম্বন্ধে অংশতঃ অবিশ্বাস্য যে উপাদান-সমাবেশ ও পরিস্থিতি-প্রবর্তনার কথা বলা হোলো, এসব তর্ক-বিতর্ক সে-বিষয়ে প্রত্যাশিত সমাধানের কোনো ইঙ্গিত দেয় না। 'বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনচরিত' [১৩১৮] বইখানিতে শচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমের লেখক-সত্তার সাতটি পৃথক ভাগের কথা তুলেছিলেন—যেমন, (১) সমাজ-সংস্কারক বঙ্কিমচন্দ্র, (২) কবি বঙ্কিমচন্দ্র, (৩) ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র (৪) ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র (৫) স্বদেশভক্ত বঙ্কিমচন্দ্র (৬) সমালোচক বঙ্কিমচন্দ্র (৭) এবং ধর্মোপদেষ্টা বঙ্কিমচন্দ্র। তিনি দেখিয়েছিলেন যে, 'বিষবৃক্ষ' এবং 'দেবী চৌধুরাণী',—এই দুখানি উপন্যাসে সমাজ-সংস্কারকের সঙ্গে ভাবময়-বঙ্কিমের একরকম বিরোধ ঘটেছিল। সংস্কারক হিসেবে নগেন্দ্র এবং কুন্দর বিধবা-বিবাহ ঘটিয়ে তোলা লেখকের একটি বিশেষ কৃতিত্ব; কিন্তু এ বিবাহের পরেই,—শচীশচন্দ্রের কথায়,—ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র গর্জন ক'রে উঠে বলেন—'মতলব, উদ্দেশ্য রসাতলে যাউক, আমি সূর্যমুখীর প্রাণে ব্যথা দিতে পারিব না!' এইরকম সংঘর্ষ বা অভিপ্রায়-বিরোধের কথা-সূত্রেই তাঁর শেষ উপন্যাস সম্বন্ধে শচীশচন্দ্র বলেন, যে 'সীতারামে'র উদ্দেশ্য এইটুকুই যে সীতারামকে সিংহাসনে বসিয়ে তাকে রাজ্যভ্রষ্ট ক'রতে হবে! কিন্তু সে বীর, স্বদেশ-প্রেমিক, দেবদ্বিজে ভক্তিমান, পরোপকারী

এবং সত্যাশ্রয়ী। তার পক্ষে রাজ্যভ্রষ্ট হওয়া অসম্ভব! ঔপন্যাসিক সেই কথা বুঝে,—সীতারামকে বিশেষ একটি পাপের পাপী দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়েই 'জয়ন্তী' চরিত্র সৃষ্টি করেন। মহাভারতের দুর্যোধনের মত সীতারাম রমণীর প্রতি অত্যাচাররত! জয়ন্তীকে বেত্রাঘাতের আদেশ দেওয়ায় চণ্ডালও বলে—'মহারাজ আমা হইতে হইবে না।' তারপর এক নৃশংস কশাইকে আনা হয়। জয়ন্তী তখন জগন্নাথ স্মরণ করে! ঠিক সেই সময়ে, ভাবময় বঙ্কিমচন্দ্র সীতারামের সহধর্মিণী নন্দাকে আনেন। বাস্তব সম্ভাব্যতা রক্ষা ক'রে,—একটি নির্মম পরিস্থিতি যখন চরম পূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছেচে,—ঠিক সেই অবস্থায় এ-উপন্যাসে মহারাণী দেখা দেন। ফলে, উপন্যাসের বাস্তব সংগতির বিনাশ ঘটে।

ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর নিজের ধারণা কোথাও বিশদভাবে বলেন নি। তবে 'রাজসিংহ'-ই যে তাঁর একমাত্র ঐতিহাসিক উপন্যাস, একথা তিনি নিজেই জানিয়ে গেছেন। 'দেবীচৌধুরাণীর' 'বিজ্ঞাপন' অংশে বলা হয়:

> 'দেবী চৌধুরাণীর কিয়দংশ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইয়াছিল। এক্ষণে সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।
>
> আনন্দমঠ প্রকাশিত হইলে পর, অনেকে জানিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন, ঐ গ্রন্থের কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি আছে কিনা। সন্ন্যাসিবিদ্রোহ ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু পাঠককে সে কথা জানাইবার বিশেষ প্রয়োজনের অভাব। এই বিবেচনায় আমি সে পরিচয় কিছুই দিই নাই। ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা আমার উদ্দেশ্য ছিল না, সুতরাং ঐতিহাসিকতার ভাণ করি নাই। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া ইচ্ছা হইয়াছে, আনন্দমঠের ভবিষ্যৎ সংস্করণে সন্ন্যাসিবিদ্রোহের কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক পরিচয় দিব।
>
> দেবী চৌধুরাণীরও ঐরূপ একটু মূল আছে। যিনি বৃত্তান্ত অবগত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি হণ্টর সাহেব কর্তৃক সংকলিত এবং গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রচারিত বাঙ্গালার 'Statistical Account' মধ্যে রঙ্গপুর জিলার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া জানিতে পারিবেন। সে কথাটা বড় বেশি নয়, এবং 'দেবী চৌধুরাণী' গ্রন্থের সঙ্গে

> ঐতিহাসিক 'দেবী চৌধুরাণীর' সম্বন্ধ বড় অল্প। দেবী চৌধুরাণী, ভবানী পাঠক, গুডল্যাড সাহেব, লেফটেনাণ্ট ব্রেনান, এই নামগুলি ঐতিহাসিক। আর দেবীর নৌকায় বাস, বরকন্দাজ, সেনা প্রভৃতি কয়টা কথা ইতিহাসে আছে বটে। এই পর্যন্ত। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহপূর্বক আনন্দমঠকে বা দেবী চৌধুরাণীকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বিবেচনা না করিলে বড় বাধিত হইব।'

এই ইতিহাস-চিন্তার সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর তৎকালীন দর্শন-চিন্তার কথাও বিবেচ্য। 'দেবী চৌধুরাণী'র উৎসর্গ-পত্রে দেখা যায়—'যাঁহার কাছে প্রথম নিষ্কাম ধর্ম শুনিয়াছিলাম,—যিনি স্বয়ং নিষ্কাম ধর্মই ব্রত করিয়াছিলেন',—তাঁরই উদ্দেশে এ-বই উৎসর্গ করা হয়।[৬]

দেবীচৌধুরাণীর 'ঐতিহাসিক মূল' সম্বন্ধে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ্‌সংস্করণের বইখানির ভূমিকাতে বিশদ আলোচনা আছে। স্বর্গত যদুনাথ সরকার রংপুরের ঘটনা সম্বন্ধে সরকারী কাগজপত্রে অনুসন্ধানলব্ধ এই খবর জানিয়ে গেছেন :

> 'In (June) 1787, Lt. Brennan was employed against a notorious leader of dacoits, named Bhawani Pathak. He despatched a native officer with 24 sepoys, who surprised Pathak with 60 of his followers in their boats. A fight took place in which Pathak himself and three of his lieutenants were killed and eight wounded, besides 42 taken prisoners. We catch a glimpse from the lieutenant's report of a female dacoit, by name Devi Chaudhurani, also in league with Pathak. She lived in boats, had a large force of barkandazes in her pay, and committed dacoities on her own account, besides receiving a

৬। তাছাড়া ক্রোড়পত্রে দেখা যায় এই দুটি উল্লেখ : ক] The Substance of Religion is Culture. The Fruit of it the Higher Life'—Natural Religion by the Author of Ecce Homo, p. 145 ; এবং খ] 'The General Law of man's Progress, whatever the point of view chosen, consists in this that Man becomes more and more Religious'—Auguste Comte - Catechism of Positive Religion, English Translation by Congreve, 1st Edition, p. 374.

share of the booty obtained by Pathak. Her title of *Chaudhurani* would imply that she was a zamindar, probably a petty one, else she need not have lived in boats for fear of capture.

On receiving Lieut. Brennan's report, the collector of Rangpur wrote to him, on 12th July, 1787......' I cannot at present give you any orders with respect to the female dacoit mentioned in your letter. If on examination of (the) Bengali (i) papers which you have sent it shall appear that there are sufficient grounds for apprehending her,...... I shall send you such orders as may be necessary.'

জমিদার হরবল্লভের নাম বঙ্কিম গ্লেজিয়ার-সংকলিত Notes on Rungpore থেকে পান। সেখানে নিয়মভঙ্গকারী এক বড় রাজস্বকর্মচারীর নাম ছিল 'হরকান্ত অথবা হরনাথ'। ১৭৮৭র জুলাই মাসে 'আরা জেলার বিহারী ব্রাহ্মণ' ভবানী পাঠক ইংরেজ সিপাহীদের সঙ্গে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করে। তখনো আন্দামানে কয়েদী পাঠাবার রীতি প্রচলিত হয়নি, সুতরাং দ্বীপান্তরের কথা কল্পনা মাত্র। ভবানী পাঠকের অনুচররা ছিলেন রাজপুত। আচার্য যদুনাথ এখানে ঐতিহাসিক তথ্যের একান্ত অভাবই লক্ষ্য করেন! এই শেষ পর্বের লেখাগুলি সম্বন্ধে সেই সূত্রেই তিনি জানান :

'আনন্দমঠ, সীতারাম ও দেবী চৌধুরাণীতে বঙ্কিম কাব্য রচনা করিতে বসিয়াছিলেন—রাজসিংহ এ তিনটি অপেক্ষা অনেক অধিক মাত্রায় ঐতিহাসিক হইলেও তাহাকে কাব্য বলা ভুল হইবে, যদি 'কাব্য' বলিতে জীবনের অন্তস্তলের পর্যালোচন, 'a criticism of life'…বুঝি। এই তিনখানি মহাগ্রন্থে ইতিহাস লেখা, এমন কি ঐতিহাসিক দৃশ্যপট আঁকা পর্যন্ত বঙ্কিমের উদ্দেশ্য ছিল না ; মানবের হৃদয়কে দিব্য জ্যোতিতে আলোকিত করা, তাহাকে উর্ধ্বতম স্তরে তুলিয়া দেওয়া, এ ক্ষেত্রে ইহাই ছিল তাঁহার প্রতিভার কাজ।'

প্রসঙ্গটি আরো বিস্তৃত ক'রে তিনি জানিয়ে গেছেন :

'স্বর্গের ও মর্তের মধ্যে সম্বন্ধ বজায় রাখাই মানবজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সিদ্ধি, আর প্রকৃত আধ্যাত্মিক জ্ঞানের অনুশীলন সংযম ও

আত্মত্যাগ—এই তিনটি বহু দিন ধরিয়া সাধনা করিলে তবে ঐ সিদ্ধিতে উপনীত হওয়া যায়। প্রফুল্লের জীবনে তাহার চরম দৃষ্টান্ত, শান্তি এবং শ্রীও এই সাধনার ভিতর দিয়া গিয়াছিল, কিন্তু ফলে পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যই বঙ্কিমের শিল্প-কৌশলের প্রমাণ।'

শান্তি, শ্রী এবং প্রফুল্ল—এই তিন গ্রন্থের তিন নায়িকার মধ্যে তিনি একই ভাবের বিকাশ লক্ষ্য করেন। 'দেবী চৌধুরাণীর' প্রফুল্ল—'বাহির অপেক্ষা ভিতরে আরও মধুর'—'সীতারামের' শ্রীও তাই,—'আনন্দমঠে'র শান্তিও তাই! যোগবল, মহাপুরুষ ইত্যাদি এই তিনটিতেই উপস্থিত। তবু তিনটি ঠিক একই ভাবের উদাহরণ নয়।

'আনন্দমঠের' কথাপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ ও সজনীকান্ত 'এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা' থেকে অংশতঃ রমেশচন্দ্র দত্তের এই সমালোচনাটি স্মরণ করেন :

> …'of all his works, however, by far the most important from its astonishing political consequence was the *Ananda Math*, which was published in 1882, about the time of the agitation arising out of the Ilbert Bill. The story deals with the Sannyasi (i, e, fakir or hermit) rebellion of 1772 near Purnea, Tirhut and Dinapur, and its culminating episode is a crushing victory won by the rebels over the United British and Mussulman forces, a success which was not, however followed up, owing to the advice of a mysterious 'physician' who, speaking as a divinely inspired prophet, advises Satyananda, the leader of the children of the Mother' to abandon further resistance since a temporary submission to British rule is a necessity; for Hinduism has become too speculative and unpractical and the mission of the English in India is to teach Hindus how to reconcile theory and speculation with the facts of science. The general moral of the *Ananda Math*, then, is that British rule and British education are to be accepted as the only alternative to Mussulman oppression, a

moral which Bankim Chandra developed also in his *Dharmatattwa*, an elaborate religious treatise in which he explained his views as to the changes necessary in the moral and religious condition of his fellow-countrymen before they could hope to compete on equal terms with the British and Mohammedans. But though the *Ananda Math* is in form an apology for the loyal acceptance of British rule, it is none the less inspired by the ideal of the restoration, sooner, or later. of a Hindu kingdom in India. This is especially evident in the occasional verses in the book of which the *Bande Mataram* is the most famous.'

'বন্দেমাতরম্' গানের মর্মার্থ সম্বন্ধে রমেশচন্দ্র তাঁর এই লেখাটিতে জানিয়ে গেছেন :

'As to the exact significance of this poem a considerable controversy has raged. *Bande Mataram* is the Sanskrit for 'Hail to thee, Mother' or more literally 'I reverence thee, Mother' and according to Dr. G. A. Grierson (The Times, Sept, 12, 1906) it can have no other possible meaning than an invocation of one of the 'mother' goddesses of Hinduism, in his opinion Kali 'the goddess of death and destruction'. Sir Henry Cotton on the other hand, (ib. Sept. 13, 1906) sees in it merely an invocation of the 'mother-land' Bengal, and quotes in support of this view the free translation of the poem by the late W. H. Lee, a proof which, it may be at once said, is far from convincing. But though. as Dr. Grierson points out, the idea of a 'mother land' is wholly alien to Hindu ideas, it is quite possible that Bankim Chandra may have assimiliated it with his European culture, and the true explanation is probably that given by Mr. J. D. Anderson in the *Times* of Sept. 24, 1906, He points out that in the 11th chapter of the 1st book

of the *Ananda Math* the Sannyasi rebels are represented as having erected, in addition to the image of Kali, 'the mother who Has Been', a white marble statue of 'the Mother that Shall Be' which 'is apparently a representation of the mother-land. The *Bande Mataram* hymn is apparently addressed to both idols'.

তাই তাঁর সিদ্ধান্ত :

'The poem, then is the work of a Hindu idealist who personified Bengal under the form of a purified and spiritualised Kali. Of its thirty-six lines, partly written in Sanskrit, partly in Bengali, the greater number are harmless enough. But if the poet sings the praise of the 'Mother'

'As Lachmi, bowered in the flower
That in the water grows.'

he also praises her as 'Durga, bearing ten weapons' and lines 10. 11 and 12 are capable of very dangerous meanings in the mouths of unscrupulous agitators. Literally translated these run, 'She has seventy millions of throats to sing her praise, twice seventy millions o hands to fight for her, how then is Bengal powerless? As S. M. Mitra points out (*Indian Problems*, London, 1908), this language is the more significant as the *Bande Mataram* in the novel was the hymn by singing which the Sannayasis gained strength when attacking the British forces.

During Bankim Chandra Chatterji's lifetime the *Bande Mataram*, though its dangerous tendency was recognised, was not used as a party war-cry; it was not raised, for instance during the Ilbert Bill agitation, nor by the students who flocked round the court during the trial of Surendra Nath Banerji in 1883. It has, however, obtained an evil notoriety in the agitation that followed the partition of Bengal. That Bankim Chandra himself foresaw or

desired any such use of it, is impossible to believe. According to S. M. Mitra, he composed it 'in a fit of patriotic excitement after a good hearty dinner, which he always enjoyed. It was set to Hindu music, known as the *Mallar-Kawali-Tal.* The extraordinarily stirring character of the air, and its ingenious assimilation of Bengali passages with Sanskrit, served to make it popular.'

Circumstances have made the *Bande Mataram* the most famous and the most widespread in its effects of Bankim Chandra's literary works.'

'আনন্দমঠের' ঐতিহাসিক সত্য সম্বন্ধে আচার্য যদুনাথ লিখে গেছেন—'এই গ্রন্থে সেই যুগের রাজনৈতিক এবং সামাজিক অবস্থা ঠিক প্রতিফলিত হইয়াছে এবং ইহার প্রধান ঘটনাটি নিছক সত্য, ইতিহাস হইতে আগাগোড়া ধার করা।' তাঁর মতে, দিল্লীর বাদশাহদের আমল থেকে শুরু ক'রে পলাশীর যুদ্ধের দুশ বছর আগে পর্যন্ত দেশের শাসন-ব্যবস্থা ভালোই ছিল, কিন্তু—

'যখন মুঘল শাসন ও সভ্যতার অর্ধচন্দ্র ডুবিয়াছে, অথচ ব্রিটিশেরা নিজ হাতে সাম্রাজ্যশাসন লইতে কুণ্ঠিত, শুধু বাণিজ্য এবং টাকা আদায় ছাড়া বাংলায় কোন কাজ করিবেন না, সেই আঠার বৎসর—পলাশীর যুদ্ধ হইতে হেস্টিংস কর্তৃক শাসন-সংস্কার আরম্ভ পর্যন্ত বাংলার পক্ষে যে কি ভীষণ কাল ছিল, তাহা সকল সাহেব-লেখকই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। মেকলের চক্ষে বাঙ্গালীরা কি হিন্দু, কি মুসলমান—সমান ঘৃণার পাত্র, মনুষ্য নামের উপযুক্ত কি না সন্দেহ। অথচ তিনি তাঁহার 'লর্ড ক্লাইভ' এবং 'ওয়ারেন হেস্টিংস' নামক দুইটি জগদ্বিখ্যাত প্রবন্ধে এই অত্যাচার-অবিচারের জ্বলন্ত চিত্র দিয়াছেন। অতি আধুনিক অধ্যাপক রাম্‌জে ম্যুর সেই সময়কে 'Power without responsibility'র যুগ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন।'

এই আলোচনাসূত্রেই যদুনাথ জানান যে, সেই মন্বন্তরের সময়ে [১৭৭০] দেশের হর্তাকর্তা মুহম্মদ রজা খাঁ—'did not worry about the suffering of the people. He collected the revenue almost in full and added 10 per cent. for 1771'। এ উক্তি তিনি ভিনসেণ্ট স্মিথের

'অক্সফোর্ড হিস্ট্রি' থেকে স্মরণ করেছেন। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা নভেম্বর 'কোর্ট অব ডিরেক্টরস্'-এর উদ্দেশ্যে লেখা হেস্টিংসের চিঠি থেকে তিনি দেখিয়েছেন যে, এই মন্বন্তরে প্রদেশের লোকসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ ধ্বংস হয় কিন্তু তৎসত্ত্বেও ১৭৭১-এ যা রাজস্ব আদায় হয়, ষোল আনা ফসল জন্মানোর বছর ১৭৬৮র চেয়েও সে-অঙ্ক বেশি! ১১৭৭ সালে যখন সারা বছর দুর্ভিক্ষে কেটেছে, তখন বাংলাদেশে রাজস্ব আদায় হয়েছে এককোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা!

'সিয়র-উল-মুতাখ্‌খরীন'-রচয়িতা প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক সৈয়দ খুলাম হুসেন তবাতবাই উল্লেখ ক'রে গেছেন যে, ভারতে মুসলমান শাসনের সেই অবনতির যুগে রাজকর্মচারাদের দুঃসহ অত্যাচারে হিন্দু প্রজারা বিদ্রোহী হয়। পঞ্জাবে শিখরা গুরুগোবিন্দের নাম স্মরণ ক'রে সংঘবদ্ধ হয়। যদুনাথ আরো লিখেছেন—'ঠিক সেই কারণে, সেই শতাব্দীতে বাংলায়ও জোট বাঁধিয়া 'সন্তানেরা' বিদ্রোহী হয়, ইহা বঙ্কিম দেখাইয়াছেন।' খুঁটিনাটি বিবরণের মধ্যে কিছু কিছু স্বকপোল কল্পনা থাকলেও, 'আনন্দমঠে' তিনি দেখেছেন 'মানুষের জীবন্ত ছবি'! এবং—

> 'কিছু কিছু বাস্তব সত্য ইতিহাস হইতে লইয়া, তাহাতে তাঁহার অদ্বিতীয় চরিত্রসৃষ্টির কল্পনা যোগ করিয়া, সবটার মধ্যে নিজ উর্ধ্বপ্রবাহিণী ভাবধারা ঢালিয়া দিয়া এই গ্রন্থগুলির প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিলেন...।'

'আদর্শবাদের' বদলে যদুনাথ 'উর্ধ্বপ্রবাহিণী ধারা' প্রয়োগটিই পছন্দ করেন। দ্বিতীয়তঃ আনন্দমঠের সঙ্গে স্কটের 'ওল্ড্ মর্টালিটির' তুলনা ক'রে তিনি দেখিয়েছেন:

> 'দুইটি গ্রন্থই বিদ্রোহী সন্ন্যাসী বা ধর্মোন্মত্ত যোদ্ধাদের রাজ-শক্তির সহিত সংঘর্ষের কাহিনী। কিন্তু স্কটের গ্রন্থে কভেনাণ্টারদের বাক্য ও কার্যগুলির প্রায় সমস্তই ইতিহাসে পাওয়া যায়, কারণ তাহাদের কথাবার্তার রিপোর্ট এবং তাহাদের লিখিত পুস্তিকা ও অসংখ্য চিঠি বর্তমান আছে; ইতিহাস-লেখক ঐ বিদ্রোহীদের ঘরের কথা তাহাদের মুখ হইতেই শুনিতে পাইতেছেন; তাহার উপর প্রতিপক্ষের অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের কাগজপত্র কাহিনী তো আছেই। কিন্তু বিদ্রোহী সন্তানগণ নিরক্ষর; তাহারা বা তাহাদের দলের

ভিতরে প্রবেশ করিয়া অন্য কেহ সে সময়ে কোন বিবরণ লিখিয়া যায় নাই ; তাই আজ আমাদের একমাত্র পুঁজি হেস্টিংস লাটের কয়খানা চিঠি এবং রেকর্ড অফিসে রক্ষিত নিম্ন ইংরেজ কর্মচারীর কয়খানা রিপোর্ট, সুতরাং এখানে একতরফা অসম্পূর্ণ ব্যাখ্যানের উপর নির্ভর করিয়া ঐ যুগের ঘটনার বিবরণ ও মানবচরিত্র সৃষ্টি করা ভিন্ন আমাদের আর উপায় নাই।'

বঙ্কিমচন্দ্রের 'আনন্দমঠে' ঐতিহাসিকতা এবং কবি-কল্পনার সার্থক অন্বয়জাত সৌন্দর্যের কথা থেকেই তিনি লিটন-এর 'লাস্ট ডেজ অব পম্পির' উল্লেখ করেন। পম্পি নগরীর ধ্বংসকালে গ্রীক ও রোমক অধিবাসীদের জীবনরূপের যে বর্ণনা বহুকালের গবেষণায় পণ্ডিতরা রেখে গেছেন, লিটনের বইখানিতে তারই বিবরণ পাওয়া যায়। যদুনাথের কথায়—'লিটনের নভেলখানিতে বাহ্য পরিচ্ছদ ঠিক আছে, অবিকল সত্য ; কিন্তু উহার মধ্যে প্রাণ কই ?' এই যুক্তির জোরেই তিনি লিখেছেন :

'সমালোচক মেকলে ঠিক বলিয়াছেন যে, এডিসনের মত পণ্ডিত ক্লাসিক্যাল স্কলারের রচিত কেটো নাটকের মহাসম্ভ্রান্ত রোমান সিনেটর অপেক্ষা স্কটের উপন্যাসে বর্ণিত বর্বর দরিদ্র ডাকাত মস্টরূপার অনেক বড়, কারণ অধিকতর জীবন্ত, অধিকতর বাস্তব। এই পরীক্ষায় বঙ্কিমের ঐতিহাসিক চরিত্রগুলি অপরাজিত, সাহিত্যে সর্বপ্রথম পদ অধিকার করিয়াছে।'[৭]

৭। 'বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠের প্রথা লিটনের পন্থার বিপরীত। প্রথমেই তো গোড়ায় গলদ ; তাহার 'সন্তানেরা' বাঙালী ব্রাহ্মণ কায়স্থের ছেলে, গীতা যোগশাস্ত্র প্রভৃতিতে পণ্ডিত ; কিন্তু যে সব 'সন্ন্যাসী ফকিরেরা' সত্য ইতিহাসের লোক, এবং উত্তরবঙ্গে [বীরভূমে নহে] ঐসব অত্যাচার করে, তাহারা এলাহাবাদ কাশী ভোজপুর প্রভৃতি জেলার পশ্চিমে লোক এবং প্রায় সকলেই নিরক্ষর, ভগবদ্‌গীতার নাম পর্যন্ত জানিত না। বঙ্কিমের সন্তানসেনা বৈষ্ণব, আর আসল 'সন্ন্যাসীরা' ছিল শৈব। এইসব সন্ন্যাসী গোঁসাই যোদ্ধাদের প্রকৃত ইতিহাস 'রাজেন্দ্রগিরি গোঁসাই' [১৭৫৩ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর বাহিরে যুদ্ধে মৃত্যু] এবং তাহার চেলা 'হিম্মত বাহাদুর' সম্বন্ধে রচিত ফারসী গ্রন্থ এবং হিন্দী 'হিম্মৎ বাহাদুর বিরুদাবলী' প্রভৃতিতে পাওয়া যায়। বাংলার বিপ্লবকারী সন্ন্যাসীদের অতি মূল্যবান সত্য বিবরণ ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার 'Dawn of New India'তে [১৯২৭] এবং রায় সাহেব যামিনীমোহন ঘোষ তাঁহার 'Sannyasi Fakir Raiders of Bengal' গ্রন্থে [Bengal Secretariat Book Depot, 1930] দিয়াছেন।... [পরপৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য]

'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম'—এই তিনখানি বইয়ের ঐতিহাসিক সত্যে যতোই ত্রুটি থাক্‌,—যদুনাথ এগুলির মধ্যে এই [illegible] দিকটি দেখিয়ে, তারই নাম দিয়েছেন—'অমৃতরস'! 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে তাঁর এই সমর্থনের সঙ্গেই 'সীতারাম' সম্বন্ধে যদুনাথের এই কথাগুলিও দেখা দরকার :

'বঙ্কিম স্বয়ং বলিয়াছেন, 'সীতারাম ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এই গ্রন্থে সীতারামের ঐতিহাসিকতা কিছুই রক্ষা করা হয় নাই। গ্রন্থের উদ্দেশ্য ঐতিহাসিকতা নহে।' [সীতারামের বিজ্ঞাপন]। আবার,—'দুর্গেশনন্দিনী বা চন্দ্রশেখর বা সীতারামকে ঐতিহাসিক উপন্যাস বলা যাইতে পারে না।' [রাজসিংহের বিজ্ঞাপন]

কিন্তু বঙ্গদেশের সত্য ইতিহাস পড়িবার পর বঙ্কিমের ঐ অস্বীকার বাণী গ্রহণ করা যাইতে পারেনা।···বঙ্কিমচন্দ্র সীতারাম নামক রাজার জীবনের ঘটনাগুলির ও সেই যুগের বাংলার অবস্থার যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা অধিকাংশ একেবারে সত্য : ইহার কোন স্থানেই ঐতিহাসিক সত্যের প্রচণ্ড অপলাপ করেন নাই।··· সেই যুগে প্রজা ও শাসকের সম্বন্ধ দেশের দশা, যুদ্ধবিগ্রহ-প্রণালী বঙ্কিম অক্ষরে অক্ষরে সত্য করিয়া আঁকিয়াছেন, অর্থাৎ এই উপন্যাসখানির দৃশ্যটি একেবারে সত্য।'

ঐতিহাসিক উপন্যাসের যথাস্থান সম্বন্ধে ডক্টর গুচের মন্তব্য তুলে দেখিয়েছেন যদুনাথ।[৮] কিন্তু সে-বিষয়ে এখানে বিস্তার নিষ্প্রয়োজন। শুধু

সত্যকার সন্ন্যাসী ফকিরেরা অর্থাৎ পশ্চিমে গিরিপুরীর দল একেবারে লুঠেড়া ছিল, কেহ কেহ অযোধ্যা সুবায় জমিদারিও করিত মাতৃভূমির উদ্ধার, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন উহাদের স্বপ্নেরও অতীত ছিল এই মহাব্রত চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কল্পনায় সৃষ্ট কুয়াশা মাত্র। সুতরাং ইতিহাসের দিক দিয়া দেখিতে গেলে আনন্দমঠে' বর্ণিত নরনারী এবং তাহাদের কার্য ও কথা [ইংরেজ সৈন্যের সহিত দুইটা খণ্ডযুদ্ধ বাদে] অনেকাংশ অসত্য এবং এ বইখানি কোন মতেই ঐতিহাসিক, এই বিশেষণ পাইতে পারে না।'

—'আনন্দমঠ' বঙ্কিম শতবার্ষিক সংস্করণ [দ্বিতীয় মুদ্রণ পৌষ, ১৩৪৪] পৃষ্ঠা ৸৹—৸/৹ দ্রষ্টব্য।

৮। 'The proper place of historical novels is not among histories but among literature The shortcomings of the historical novel proper, particularly the historical novel in our own time, which tends more and more to appropriate the authentic figures of the past and to have less and less to do with imaginary characters. On the whole the greater the use the historical novelist makes of invented people and incidents, the better are his chances of producing what is called a work of art. "What might have been is not the

তাঁর নিজের কথাগুলাই দেখা যেতে পারে। এই ঐতিহাসিকতার কথা-সূত্রে তাঁর পূর্বালোচক অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির আলোচনা স্মরণ ক'রে যদুনাথ জানিয়ে গেছেন :

> '১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে সতীশচন্দ্র মিত্রের 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইবার ফলে ঐসব পুরাতন তর্কবিতর্কের নিরসন হইয়াছে, এবং সীতারামের প্রকৃত বিবরণ সম্পূর্ণ ও বিস্তৃত-ভাবে জানা গিয়াছে। সে যুগের পারসী সরকারী কাগজ এবং ফরাসী কুঠিয়াল সাহেবদের চিঠি হইতে ঐ সময়কার দেশের ইতিহাস অতি বিশদ ও বিশুদ্ধ ভাবে জানা যায়।'

তিণি লিখেছেন যে, রাজা সীতারামের কার্যকলাপ সম্বন্ধে তিনি বেশি কিছু তথ্য পাননি। বঙ্কিম লোকমুখে সীতারামের গল্প শুনেছিলেন। ১৮৬১-৬৩তে তিনি খুলনার ডেপুটি কলেক্টর এবং ঐ জেলার মাগুরার মহকুমা হাকিম ছিলেন। মাগুরা শহরের তের মাইল দক্ষিণ-পূর্বে সীতারামের রাজধানী মহম্মদ-পুরের ভগ্নাবশেষ! শোনা যায়, রাইচরণ মুখোপাধ্যায় নামে এক গল্পরসিকের কাছে বঙ্কিম সীতারামের গল্প শোনেন [সতীশচন্দ্র, ২য় খণ্ড. পৃষ্ঠা ৫১৪]। সীতারাম সম্পর্কিত কিংবদন্তী —স্টুয়ার্টের ইতিহাস,—রিয়াজ-উস্-সলাতীন,—এবং সলিমুল্লার তারিখ-ই-বংগালা—এই সব আকর-লব্ধ তথ্যই তিনি তাঁর উপন্যাসের কাজে লাগিয়েছিলেন। উত্তর-রাঢ়ীয় কায়স্থ সীতারামের পিতা উদয়নারায়ণ মাগুরার ষোল মাইল পূর্বে অবস্থিত ভূষণায় পদস্থ রাজকর্মচারী হয়ে আসেন এবং ঢাকা থেকে ১৬৭০ এর কাছাকাছি কোনো সময়ে

same as what was" [Dr. Gooch], and fiction, therefore, however conscientious and erudite, could never provide a substitute for genuine historical study. However, it is because of a certain inadequacy in history—the dead carrying most of their secrets with them to the grave and our knowledge [of past ages] thus remaining eternally incomplete—that Dr. Gooch championed the case of the historical novel.

Again and again Dr. Gooch illustrated how much the historical novel has contributed to the understanding of history.

Millions have gathered from the historical novel a knowledge of history which they would not have acquired by any other means. Finally, historical fiction has played an active part in reviving and sustaining the sentiment of nationality, which for good or evil has changed the face of Europe in the nineteenth and twentieth centuries' (Times, Lit. Sup., 30 June, 1945. p. 307).

মধুমতীর তীরে হরিহর নগরে বাসস্থান পত্তন করেন। সীতারাম তখন বালক। এই বালকই যথাকালে শারীরিক ও মানসিক নানা দক্ষতা অর্জন করেন। ফারসী ও সংস্কৃত শেখেন। তিনি বাংলার সুবাদারের কাছ থেকে মাহুরার দক্ষিণে নলদী পরগনা [নড়াইল] নিজের নামে বন্দোবস্ত ক'রে নেন। দক্ষিণ-রাঢ়ীয় কায়স্থ রামরূপ বা রঘুরাম ঘোষ [মেনাহাতী] এবং বঙ্গজ-কায়স্থ-মুনিরাম রায় তাঁর মন্ত্রদাতা ও সহায়ক হন। তাঁর সেনাবিভাগ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। যদুনাথ লিখেছেন,—সীতারামের 'দেওয়ান যদুনাথ গাঙ্গুলী [উপাধি মজুমদার] বোধ হয় বঙ্কিমের চন্দ্রচূড়।' সীতারামের লুঠতরাজ অব্যাহত বেগে বেড়ে যায়। কারণ, ১৬৮৮তে সায়েস্তা খাঁ বিদায় নেবার পরে,—'১৬৮৯-১৬৯৭ পর্যন্ত বাংলার সুবাদার ছিলেন শান্তিপ্রিয়, গ্রন্থকীট, নিশ্চল, বৃদ্ধ নবাব ইব্রাহিম খাঁ'! 'তিন দিকে বিল, এক দিকে নদী, মধ্যস্থানে উচ্চ স্থলভূমি মহম্মদপুরের তিনটি মন্দিরের ফলকে [১৬৯৯, ১৭০৩ ও ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের] সীতারামের নাম পাওয়া গেছে। নিজের রাজ্যবিস্তার সূত্রেই ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে সীতারাম ভূষণার ফৌজদার সৈয়দ আবুতুবাবকে হঠাৎ আক্রমণ ক'রে হত্যা করেন এবং ভূষণা দখল করেন। তখন পদ্মার উত্তরে কিছুদূর থেকে সুন্দর-বনের তটভূমি পর্যন্ত তাঁর রাজ্যের বিস্তার! আবুতুরাবের হত্যার খবর পেয়ে মুর্শিদ কুলি খাঁ সীতারামকে দমনের আয়োজন করেন। ১৭১৪র ফেব্রুয়ারিতে সীতারাম পরাজিত হন এবং সম্ভবতঃ ঐ বছর অক্টোবর মাসে নৃশংসভাবে মুর্শিদাবাদে তাঁর প্রাণদণ্ড হয়।

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে,—দাক্ষিণাত্য বিজয়ের তিন বছর পরেই ঔরংজেবের গৌরবের চরম অবস্থার অবসান ঘটে। তারপর দক্ষিণে মারাঠা, উত্তরে জাঠ ও রাজপুতেরা বিদ্রোহী হয়। মোগল সৈন্য তখন মারাঠার প্রতাপে বিপর্যস্ত। সেই খবর পেয়ে, সুদূর বাংলাদেশে জমিদাররা খাজনা দেওয়া বন্ধ করেন। দক্ষিণবঙ্গে এবং উড়িষ্যায় পাঠান-শক্তির প্রতাপ দেখা দেয়। ১৬৯৬-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে শোভা সিংহ ও রহিম আফগানের বিদ্রোহ বর্ধমান-চন্দ্রকোনা থেকে রাজমহল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। যদুনাথ এই সূত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকালীন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নময়ী' নাটকের বিষয়বস্তুর উল্লেখ ক'রেছেন। ১৬৯৮এ নতুন সুবাদার শাহাজাদা আজীমউদ্দীন বিদ্রোহ দমন করেন বটে, কিন্তু বাংলার সীমান্ত অঞ্চলে, খুলনা জেলায় বিদ্রোহ বন্ধ হয়নি। ঔরংজেব তখন অতি বৃদ্ধ। জনশ্রুতি এই যে, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে

ঔরংজেবের মৃত্যুর পরে, আজীমউদ্দীন বাংলা বিহার ছেড়ে যখন আগ্রায় যান তখন তিনি তিন কোটি টাকা সঙ্গে নিয়ে যান! এই অশান্তি ও অত্যাচারের মধ্যেই সীতারামের অভ্যুদয়!

ঐতিহাসিক বিবরণ উল্লেখ ক'রে যদুনাথ দেখিয়েছেন যে,—'গঙ্গারামের লঘু অপরাধে জীবন্ত সমাধির হুকুম সে যুগের বাংলার ঐতিহাসিক সত্যের অনুযায়ী'। তবে, সীতারামের পতনের কারণ—রাজা হবার পরে তাঁর অতিরিক্ত বিলাস-ব্যসন! তিনি আরো বলেন:

> 'এইখানেই বঙ্কিম তাঁহার কবি-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, এই তুচ্ছ নিত্যনৈমিত্তিক ভোগ বিলাসের অন্তরে একটি গূঢ় কারণ নিহিত করিয়া ইহাকে সাধারণ বাস্তব জগৎ হইতে অনেক দূরে অনেক ঊর্দ্ধে আনিয়াছেন। তাঁহার সীতারাম রায় প্রথমে আমাদের কাছে দেখা দেন—অনন্যসামান্য মহাপ্রাণ উদ্যোগী পুরুষসিংহ-রূপে। তাহার পর ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তাঁহার চরিত্রের অভিব্যক্তি হইয়া ক্রমে গভীর অবনতিতে আসিয়া পড়েন,—যদিও জীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁহার বীরত্ব মনুষ্যত্ব আবার দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। নায়কের এই চরিত্র পরিবর্তনই 'সীতারাম' উপন্যাসকে শেক্সপীয়রের ম্যাকবেথের মত শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক করিয়া তুলিয়াছে। এই দুই কাব্যেই আমরা দেখি, কেমন করিয়া ধীরে ধীরে, প্রায় অদৃশ্য গতিতে বাহ্য ঘটনার আঘাতে অর্থাৎ স্বাভাবিক কারণে, একজন দেবচরিত্র বীর অবশেষে দানব হইয়া উঠেন।'

এই বিশ্লেষণের সঙ্গে সঙ্গে 'আনন্দমঠ' এবং 'দেবী-চৌধুরাণী'র সঙ্গে তুলনা ক'রে তিনি লেখেন:

> 'আনন্দমঠ ও দেবী চৌধুরাণীতে চরিত্রের ক্রমবিকাশ উপরের দিকে, ক্রমে মহৎ হইতে মহত্তর হইতেছে···। সীতারামের হৃদয়ের গতি ঠিক ইহার বিপরীত দিকে।···শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার নাটকের এণ্টনি কি বীর দক্ষ কর্মকুশল যোদ্ধা! আর সেই লোকটিই এণ্টনি অ্যাণ্ড ক্লিওপেট্রা নাটকে উদ্যোগহীন ইন্দ্রিয়পরায়ণ কামিনীর দাস হইয়া প্রাণ দিলেন।'

সীতারাম তাঁর যোগ্য সহধর্মিণী পান নি। প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে

বঙ্কিম নিজেই সে-কথা বলে গেছেন,—এবং আচার্য যদুনাথ তা' উল্লেখ ক'রে—এ-উপন্যাসে 'করুণা ও লোমহর্ষণভাব' দেখে বলেন—'সীতারাম নিঃসন্দেহে গদ্য ট্র্যাজেডি'।

শেষ পর্বের এই উপন্যাসগুলিতে প্রধানতঃ কর্মযোগী নায়ক-নায়িকার সমাবেশ ঘটেছে। সেই সূত্রেই আবার রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ মনে পড়ে। 'পঞ্চভূত' এর 'নরনারী' প্রবন্ধে 'সমীর' ব'লেছিলেন যে, ইংরেজী সাহিত্যে গদ্য, পদ্য উভয় ক্ষেত্রেই নায়ক-নায়িকা,—উভয়েরই মাহাত্ম্য পরিস্ফুট হয়েছে, কিন্তু বাংলা সাহিত্যে দেখা যায় নায়িকারই প্রাধান্য! এই মন্তব্যের সমর্থনে তিনি কুন্দনন্দিনী-সূর্যমুখী—এবং ভ্রমর-রোহিণীর কথা তোলেন। 'ক্ষিতি' এর জবাবে বলেন—এসব উপন্যাস,—অর্থাৎ 'বিষবৃক্ষ' বা 'কৃষ্ণকান্তের উইল'—মানসপ্রধান উপন্যাস, কার্যপ্রধান নয়। এবং—'যেখানে কেবলমাত্র হৃদয়বৃত্তির কথা, সেখানে পুরুষ স্ত্রীলোকের সহিত পারিয়া উঠিবে কেন? কার্যক্ষেত্রেই তাহার চরিত্রের যথার্থ বিকাশ হয়।' তার উত্তরে 'দীপ্তি' বলেন—'দুর্গেশনন্দিনীতে' বিমলার চরিত্র কি কার্যেই বিকশিত হয় নাই?' আবার,—'আনন্দমঠ তো কার্যপ্রধান উপন্যাস। সত্যানন্দ, জীবানন্দ, ভবানন্দ, প্রভৃতি সন্তান-সম্প্রদায় তাহাতে কাজ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহা কবির বর্ণনা মাত্র, যদি কাহারও চরিত্রের মধ্যে যথার্থ কার্যকারিতা পরিস্ফুট হইয়া থাকে তাহা শান্তির। দেবী চৌধুরাণীতে কে কর্ত্রিত্বপদ লইয়াছে? রমণী। কিন্তু সে কি অন্তঃপুরের কর্ত্রিত্ব? নহে।'

নরনারীর স্বভাব আর ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি সম্বন্ধে এই তর্কের কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'আনন্দমঠ',—দুটিতেই নায়িকার চরিত্র যে কার্যপ্রধান, তাতে সন্দেহ নেই।

অধ্যাপক প্রিয়রঞ্জন সেন তাঁর 'Western Influence in Bengali Novels' [১৯৩২] পুস্তিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলির শ্রেণী-বিভাগ ক'রতে গিয়ে দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, রাজসিংহ এবং চন্দ্রশেখর—এই পাঁচখানির একই শ্রেণীভুক্তি সম্বন্ধে লেখেন যে, এগুলিতে অল্পাধিক ঐতিহাসিক ব্যক্তিমণ্ডলীই দেখা দিয়ে গেছেন। দ্বিতীয় শ্রেণীতে তিনি বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, রজনী, কৃষ্ণকান্তের উইল—এবং যুগলাঙ্গুরীয় ও রাধারাণীর উল্লেখ

ক'রে লেখেন যে, এগুলির প্রথম চারটিতে সমকালীন বাঙালী সমাজের ছায়া পড়েছে—'with Jugalanguriya which is of slight interest and is a romance, and Radharani, which is a close approach to that'। তৃতীয় শ্রেণীতে তিনি দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ এবং সীতারাম—এই তিনখানির উল্লেখ ক'রে নিজেই জানিয়ে দেন যে, এ-বিভাগ ঠিক ন্যায়সংগত নয়, তবে আলোচনার সুবিধার জন্যেই তাঁকে এ-রকম বিভাগ স্বীকার ক'রতে হয়। সেই আলোচনায় 'রাজসিংহ' সম্বন্ধে তিনি লেখেন—'His Rajsimha, written with a purpose, to demonstrate the greatness of Hindu prowess in the pre-British period, was on his own admission, based on Todd and Orme'। বঙ্কিম নিজে একে 'ঐতিহাসিক নাটক' নামে উল্লেখ ক'রে,—পরে 'বিজ্ঞাপনে' উপন্যাস শব্দটি ব্যবহার ক'রেন।' সে-কথা স্মরণ ক'রে প্রিয়রঞ্জন বাবু বিস্ময় প্রকাশ করেন।[৯]

আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, এবং সীতারাম—শেষ পর্বের এই তিনখানি উপন্যাসেই বঙ্কিমের গল্প-বর্ণনার ক্ষমতা মোটামুটি অব্যাহত। আনন্দমঠে দেশপ্রেমই প্রধান কথা। মোহিতলাল লিখেছেন—'দেশপ্রেমের এমন কবিত্বময় বিগ্রহসৃষ্টি বোধ হয় জগৎ-সাহিত্যে বিরল; অতএব কাব্যের দিক দিয়াও এই উপন্যাস বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলির অন্যতম; ইহাকে কেবল একটা বিশেষ Cult বা ধর্মমন্ত্রের প্রচারমূলক উপন্যাস বলিয়া পৃথক করিলে চলিবে না'।[১০] এ উপন্যাসে তিনি একাধারে উপন্যাস, গীতিকাব্য, নাটক এবং কাহিনীর 'রাসায়নিক রসমিশ্রণ' ঘটেছে ব'লে অনুভব করেন। দেশপ্রেমকে পুরুষের মহৎ ধর্মরূপে স্থাপনা,—এবং সেই ভিত্তিতেই দেহ-আত্মার দ্বন্দ্বকে রূপ দেওয়া এই ''আনন্দমঠের' অনির্বচনীয় কীর্তি! মোহিতলালের আলোচনায়

৯। প্রিয়রঞ্জন লেখেন—'The idea of comparing Indian heroes and actors in this great ''historical drama' with personages of European history is always present before him and in the body of the book Isabella, Elizabeth and Catherine Napoleon, Leonidas and Philip II of Spain have been freely named.' দেবীচৌধুরাণী, আনন্দমঠ, সীতারাম সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন—'there is to be marked a prominence of philosophy and Bankim opened himself liberally to the western influence in this.'

১০। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস', পৃষ্ঠা ৫৮।

এই ধারণাই ব্যক্ত হয়েছে। তিনি মনে করেন—'এই ক্ষুদ্র কাব্যখানির ঘনীভূত একাগ্র কল্পনায়—যৌন প্রবৃত্তি বা রূপমোহ, দাম্পত্য প্রেম, সামাজিক ও পারিবারিক সংস্কার, সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসের আদর্শ, যুগধর্ম ও সনাতন শাশ্বত পন্থা—এ সকলই একটি ভাব-সত্যের আশ্রয়ে সুসমাহিত হইতে পারিয়াছে।'[১১] আনন্দমঠের বিশেষ আবহ ও সংস্থানক্ষেত্রকে তিনি বলেন—'নৈশ-গম্ভীর অরণ্যচ্ছায়া'।[১২] আনন্দমঠে পাত্র-পাত্রী ও ঘটনাবলীর সামঞ্জস্য বঙ্কিমের শ্রেষ্ঠ কবি-শক্তির নিদর্শন মনে ক'রেই তিনি আবার লেখেন—'আনন্দমঠ কেবল দেশপ্রেমের উদ্দেশ্যমূলক একখানি দ্বিতীয় শ্রেণীর কাব্য নয়, উহা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিণত লেখনীর একখানি উৎকৃষ্ট রস-রচনা।'[১৩] 'দেবী চৌধুরাণী' সে তুলনায় দুর্বলতর রচনা। তাতে গল্পসৃষ্টির সামর্থ্য এবং কাব্যরসের লক্ষণ, দুই-ই আছে বটে,—কিন্তু বাঙালীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম যে গার্হস্থ্যধর্ম, এই তত্ত্ব প্রচারের চেষ্টাই সেখানে প্রধান। তাই মোহিতলালের কথায়—সেখানে,—'এই একবার মাত্র তত্ত্বের খাতিরে কবিশক্তির অবমাননা' ঘটেছে। 'রাজসিংহ' এবং 'সীতারাম' সম্বন্ধে অন্য কথা।

'রাজসিংহ' উপন্যাসের আলোচনাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ প্রথমেই এ-কাহিনীর দ্রুত গতিবেগের উল্লেখ করেন। একবার সৈন্যদলের চলার সঙ্গে, আবার পর্বতনিঃসৃত নির্ঝরের প্রবল গতিবেগের সঙ্গে এ-প্রবাহের তুলনা দিয়েছেন তিনি। সেই সূত্রেই তিনি লেখেন যে, 'স্ত্রী-চরিত্রের মধ্যে বড়ো একটা দ্রুততা আছে', এবং—

> 'সাহিত্যে আমরা জগতের সত্য চাই, কিন্তু জগতের ভার চাহি না।
>
> কিন্তু সত্যকে সম্যক্ প্রতীয়মান করিয়া তুলিবার জন্য কিয়ৎ পরিমাণে ভারের আবশ্যক, সেটুকু ভারে কেবল সত্য ভালোরূপে অনুভবগম্য হইয়া হৃদয়ে আনন্দ উৎপাদন করে; কল্পনা-জগৎ প্রত্যক্ষবৎ দৃঢ় স্পর্শযোগ্য ও চিরস্থায়িরূপে প্রতিষ্ঠিত বোধ হয়।
>
> বঙ্কিমবাবু রাজসিংহে সেই আবশ্যক ভারেরও কিয়দংশ যেন বাদ দিয়াছেন বোধ হয়। ভারে যেটুকু কম পড়িয়াছে গতির দ্বারায় তাহা পূরণ করিয়াছেন। উপন্যাসের প্রত্যেক অংশ

১১। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস', পৃষ্ঠা ৫৯। ১২। ঐ। ১৩। 'বঙ্কিম-বরণ' পৃষ্ঠা ১১০ দ্রষ্টব্য।

অসম্বিদ্ধরূপে সম্ভবপর ও প্রসঙ্গসহ করিয়া তুলেন নাই, কিন্তু সমস্তটার উপর দিয়া এমন দ্রুত অবলীলা ভঙ্গিতে চলিয়া গিয়াছেন যে প্রশ্ন করিবার আবশ্যক হয় নাই।'...

...রাজসিংহের গল্পটা সৈন্যদলের চলার মতো—ঘটনাগুলো ব্যূহরচনা করিয়া বৃহৎ আকারে চলিয়াছে। এই সৈন্যদলের নায়ক যাঁহারা, তাঁহারাও সমান বেগে চলিয়াছেন, নিজের সুখদুঃখের খাতিরে কোথাও বেশিক্ষণ থামিতে পারিতেছেন না।'

দ্বিতীয়তঃ তিনি বলেন যে, এ উপন্যাসে ইতিহাসের ঘটনা এবং মানব-জীবনের কাহিনী, দুইই একত্র ব্যক্ত হ'য়েছে। ইতিহাসের বিশাল প্রবাহ যে মনোযোগ এবং মর্যাদা দাবি করে, সে-দিকে কোনো কার্পণ্য বা অনবধান ঘটেনি। এই প্রসঙ্গটির ব্যাখ্যাতে লেখা হয়ঃ

'রাজসিংহের সহিত চঞ্চলকুমারীর প্রণয় ব্যাপারটা তেমন ঘনাইয়া উঠে নাই বলিয়া কোনো কোনো পাঠক এবং সম্ভবতঃ বহুসংখ্যক পাঠিকা আক্ষেপ করিয়া থাকেন। বঙ্কিমবাবু বড়ো একটি দুর্লভ অবসর পাইয়াছিলেন—এই সুযোগে কন্দর্পের পঞ্চশরে এবং করুণ রসের বরুণ বাণে দিগ্বিদিক সমাকুল করিয়া তুলিতে পারিতেন।

কিন্তু তাহার সময় ছিল না। ইতিহাসের সমস্ত প্রবাহ তখন একটি সংকীর্ণ সন্ধিপথে বজ্রস্তনিত রবে ফেনাইয়া চলিতেছে—তাহারই উপর দিয়া সামাল্ সামাল্ তরী। তখন রহিয়া-বসিয়া ইনিয়া-বিনিয়া প্রেমাভিনয় করিবার সময় নহে।'

তখনকার যে প্রেম, সে অত্যন্ত বাহুল্যবর্জিত, সংক্ষিপ্ত, সংহত। ঔরংজেবের শাসনকালে রাজপুত এবং মোগলের বিরোধ ঐতিহাসিক ব্যাপার। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'রাজসিংহে' সেই সংঘর্ষের প্রধান বৃত্তান্ত যথাযথ ইতিহাস অবলম্বন ক'রেই বর্ণনা করেন। ঔরংজেব, রাজসিংহ, জেব-উন্নিসা, রূপনগরের রাজকুমারী—এঁরা সকলেই ঐতিহাসিক চরিত্র। ঔরংজেবের চরিত্রে বুদ্ধিমত্তা, কপটতা, ক্রূরতা, অবিশ্বাস ইত্যাদি বিশেষত্ব ছিল। রাজসিংহের ছিল ক্ষাত্রধর্ম। মবারক বঙ্কিমের কল্পনার সৃষ্টি। রাজসিংহের মধ্যে স্বজাতিপ্রীতি ছিল, কিন্তু মোগলবিদ্বেষ ছিলনা। চঞ্চলকুমারীর মধ্যে বঙ্কিম তেজস্বিতা সঞ্চার ক'রেছেন। জেব-উন্নিসা পরমাশ্চর্য রমণী। রাজসিংহের

ঐতিহাসিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সঙ্গে জেব-উন্নিসার অন্তরের জাগরণ এবং তাঁর গভীর আর্তি, দুই-ই চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।

ইতিহাসের বৃহৎ উত্থান-পতনের বিস্তীর্ণ পটভূমির মধ্যেই মানব-জীবনের চিরকালের প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির দ্বন্দ্ব ফুটিয়ে তুলে, কামনা-বাসনা এবং আধ্যাত্মিকতা উদ্ঘাটনে মনোযোগী ছিলেন তিনি। মোহিতলালের মতে,—'বিষবৃক্ষ' তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস। তাতে নারীর পূর্ণ নারীরূপ, পুরুষের পূর্ণ সংগ্রাম,—এবং কবির পূর্ণ দৃষ্টিতে কাহিনীর কেন্দ্রগত ঐক্যের উপলব্ধি,—তিনটিই সংশয়াতীত! নারী, প্রেম এবং নিয়তি—এই তিনটিই প্রধান। 'মৃণালিনী'তে মনোরমা বলেন—প্রেম 'মৃত্যুঞ্জয়জটাবিহারিণী' গঙ্গার মতন! পুরুষের ওপর প্রকৃতির শাসনকে বঙ্কিম অমোঘ নীতি ব'লে মেনেছিলেন, এই ছিল মোহিতলালের বিশ্বাস। প্রেম সেই 'প্রকৃতি-পুরুষের মিলন-সেতু'! 'চন্দ্রশেখরে' সেই প্রেমের বিস্ময়, উৎকণ্ঠা, আলোড়ন, সবই আছে,—তবু তাতে একদিকে হোমর-শেক্সপীয়রের আদর্শে প্রতাপের 'রাজসিক আত্মাভিমান', অন্যদিকে ব্যাস-বাল্মীকির আদর্শে চন্দ্রশেখরের 'কীর্তিহীন, বীরত্বহীন, অবিক্ষুব্ধ, পৌরুষের' জয়গান! 'চন্দ্রশেখরের' উপসংহারে প্রতাপের উদ্দেশ্যে বঙ্কিম যে সান্ত্বনাবাণী শুনিয়েছিলেন, মোহিতলাল তার মধ্যে জীবন-বর্জন ও প্রকৃতিরূপা নারী-বর্জন, দুইই অনুভব করেন! তাঁর ধারণা—'য়ুরোপীয় প্রবৃত্তিধর্মকেই এতখানি শোধন করিয়া তাহা দ্বারাই প্রকৃতিকে জয় করার এই যে অত্যুচ্চ কল্পনা—এই Intrified Idealism—বঙ্কিমচন্দ্র সম্ভবতঃ ভিক্টর হুগোর উপন্যাস' থেকে পেয়েছিলেন।[১৪] কমলাকান্তের সুরে,—'রজনী'র শেষ দিকে অমরনাথ বলেন:

> 'প্রভো, তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কই তুমি? দর্শনে, বিজ্ঞানে নাই, জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই।...
>
> সুখ! তোমাকে সর্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই, তবে আশার কাজ কি?...'

এ-কথা স্মরণ ক'রে মোহিতলাল লিখে গেছেন—'এই উপন্যাসেই বঙ্কিম-কাব্যের একটি সকরুণ আর্তস্বর ধ্বনিয়া উঠিয়াছে।'[১৫] জেব-উন্নিসার রূপায়ণে এ আর্তস্বর আরো তীব্র, আরো সরস হয়ে ওঠে। 'রাজসিংহে'

১৪। 'বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস': মোহিতলাল; পৃষ্ঠা ৪৫।

১৫। ঐ, পৃষ্ঠা ৫১ দ্রষ্টব্য।

জেব-উন্নিসা গৌণ চরিত্র বটে, কিন্তু এ-চরিত্রটি ইতিহাসের বৃহৎ, জটিল, আবর্তভঙ্গে বিলুপ্ত হয়নি। রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—'সে আপনার জীবন-কাহিনী লইয়া স্বতন্ত্রভাবে দীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে।'

'রাজসিংহ' উপন্যাসের প্রধান চরিত্রগুলি মধ্যে রাজসিংহ,—আলম্‌গীর,—রাজস্থানের অন্তর্গত রূপনগরের অধিপতি বিক্রমসিংহের কন্যা চঞ্চলকুমারী ইত্যাদি আছেন। কিন্তু রাজসিংহের পুরো কাহিনীর বিস্তারে এঁদের অবস্থানগুরুত্ব সমান নয়। শুধু তাই নয়, কেবল রাজসিংহ অথবা কেবলমাত্র ঔরংজেব এ-কাহিনীর সর্বত্র উপস্থিতও নন, সর্বধারকও নন! রবীন্দ্রনাথ জানিয়েছেন:

> 'রাজসিংহ ঐতিহাসিক উপন্যাস। ইহার নায়ক কে কে? ঐতিহাসিক অংশের নায়ক ঔরংজেব, রাজসিংহ এবং বিধাতাপুরুষ —উপন্যাস অংশের নায়ক আছে কি না, জানিনা, নায়িকা জেব-উন্নিসা।
>
> বঙ্কিমবাবু সেই ইতিহাস এবং মানব উভয়কেই একত্র করিয়া এই ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।
>
> তিনি এই বৃহৎ জাতীয় ইতিহাসের এবং তীব্র মানব-ইতিহাসের পরস্পরের মধ্যে কিয়ৎ পরিমাণে ভাবেরও যোগ রাখিয়াছেন।
>
> মোগল সাম্রাজ্য যখন সম্পদে এবং ক্ষমতায় স্ফীত হইয়া একান্ত স্বার্থপর হইয়া উঠিল, যখন সে সম্রাটের পক্ষে ন্যায়পরতা অনাবশ্যক বোধ করিয়া, প্রজার সুখদুঃখে একেবারে অন্ধ হইয়া পড়িল, তখন তাহার জাগরণের দিন উপস্থিত হইল।'

এই ইতিহাসের সঙ্গে জেব-উন্নিসার ব্যক্তিগত জীবনের যোগ দেখিয়ে দিয়েছেন তিনি:

> 'বিলাসিনী জেব-উন্নিসাও মনে করিয়াছিল সম্রাটদুহিতার পক্ষে প্রেমের আবশ্যক নাই, সুখই একমাত্র শরণ্য। সেই সুখে অন্ধ হইয়া যখন সে দয়াধর্মের মস্তকে আপন জরি-জহরৎজড়িত পাদুকা-খচিত সুন্দর বামচরণখানি দিয়া পদাঘাত করিল, তখন কোন্ অজ্ঞাত গুহাতল হইতে কুপিত প্রেম জাগ্রত হইয়া তাহার মর্মস্থলে দংশন করিল, শিরায় শিরায় সুখমন্থরগামী রক্তস্রোতের মধ্যে

একেবারে আগুন বহিতে লাগিল, আরামের পুষ্পশয্যা চিতাশয্যার মতো তাহাকে দগ্ধ করিল—তখন সে ছুটিয়া বাহির হইয়া উপেক্ষিত প্রেমের কণ্ঠে বিনীত দীনভাবে সমস্ত সুখসম্পদের বরমাল্য সমর্পণ করিল—দুঃখকে স্বেচ্ছায় বরণ করিয়া হৃদয়াসনে অভিষেক করিল। তাহার পরে আর সুখ পাইল না, কিন্তু আপন সচেতন অন্তরাত্মাকে ফিরিয়া পাইল। জেব-উন্নিসা সম্রাট-প্রাসাদের অবরুদ্ধ অচেতন আরামগর্ভ হইতে তীব্র যন্ত্রণার পর ধূলায় ভূমিষ্ঠ হইয়া উদার জগতীতলে জন্মগ্রহণ করিল। এখন হইতে সে অনন্ত জগৎ-বাসিনী রমণী।'

দেশের এই ইতিহাস এবং মানুষের এই হৃদয়ালোড়নের কাহিনী,—দুটি একসূত্রে বেঁধে, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই 'রাজসিংহ' বইখানিতে যে কৃতিত্ব দেখিয়ে গেছেন, তারই ব্যাখ্যাসূত্রে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই সুদূর ১৩০০ সালের এই প্রবন্ধটিতে আরো লেখেন :

'ইতিহাসের মহাকোলাহলের মধ্যে এই নবজাগ্রত হতভাগিনী নারীর বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় মাঝে মাঝে ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া উঠিয়া রাজসিংহের পরিণাম অংশে বড়ো একটা রোমাঞ্চকর সুবিশাল করুণা ও ব্যাকুলতা বিস্তার করিয়া দিয়াছে। দুর্যোগের রাত্রে একদিকে মোগলের অভ্রভেদী পাষাণপ্রাসাদ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, আর একদিকে সর্বত্যাগিনী রমণীর অব্যক্ত ক্রন্দন ফাটিয়া ফাটিয়া উঠিতেছে; সেই বৃহৎ ব্যাপারের মধ্যে কে তাহার প্রতি দৃক্‌পাত করিবে—কেবল যিনি অন্ধকার রাত্রে অতন্দ্র থাকিয়া সমস্ত ইতিহাস-পর্যায়কে নীরবে নিয়মিত করিতেছেন, তিনি এই ধূলিলুণ্ঠ্যমান ক্ষুদ্র মানবীকেও অনিমেষ লোচনে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন।

এই ইতিহাস এবং উপন্যাসকে এক সঙ্গে চালাইতে গিয়া উভয়কেই এক রাশের দ্বারা বাঁধিয়া সংযত করিতে হইয়াছে। ইতিহাসের ঘটনাবহুলতা এবং উপন্যাসের হৃদয়বিশ্লেষণ উভয়কেই কিছু খর্ব করিতে হইয়াছে—কেহ কাহারও অগ্রবর্তী না হয়, এ বিষয়ে গ্রন্থকারের বিশেষ লক্ষ্য ছিল দেখা যায়। লেখক যদি উপন্যাসের পাত্রগণের সুখ দুঃখ এবং হৃদয়ের লীলা বিস্তার করিয়া

দেখাইতে বসিতেন তবে ইতিহাসের গতি অচল হইয়া পড়িত। তিনি একটি প্রবল স্রোতস্বিনীর মধ্যে দুটি একটি নৌকা ভাসাইয়া দিয়া নদীর স্রোত এবং নৌকা উভয়কেই এক সঙ্গে দেখাইতে চাহিয়াছেন।'

শেষ পর্বের এই লেখাগুলিতে ইতিহাসের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের মনোযোগের বিশেষত্ব মনে রেখেও শ্রীকুমার বাবু 'সীতারাম'-এর সঙ্গে 'চন্দ্রশেখর' এর সাদৃশ্যের দিকটি দেখিয়েছেন। এ দুটি উপন্যাসে ব্যক্তি-জীবনের রূপায়ণই প্রাধান্য লাভ ক'রেছে বলে তাঁর বিশ্বাস। সেদিক থেকে তিনি 'রাজসিংহ'কে মূলতঃ ভিন্ন বলে মনে করেন। দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম—এই তিনটির প্রত্যেক ক্ষেত্রেই ইতিহাস বা অর্ধ-ইতিহাস কেবল—'প্রতিবেশ রচনায় সহায়তা করিয়াছিল মাত্র'—'সীতারাম' উপন্যাসে সীতারামের অন্তর্দ্বন্দ্বই প্রধান বিষয়। কিন্তু তিনি বলেন :

'রাজসিংহ ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত ; এখানে ইতিহাসই প্রধান বিষয়, ব্যক্তিগত জীবনসমস্যা ইতিহাসের অনুবর্তন করিয়াছে মাত্র।'[১৬]

বিশ্লেষণের সাহায্যে তিনি দেখিয়েছেন—এ-উপন্যাসে বৃহৎ সংঘটনের মধ্যে সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষের কোন স্থান নেই,—চঞ্চলকুমারী রাজকন্যা,—নির্মলকুমারী বংশ-গৌরবে সামান্য হলেও—'নিজ বুদ্ধি ও সাহসপ্রভাবে এই রাজনৈতিক সংক্ষোভের ঠিক কেন্দ্রস্থলে আপনাকে অধিষ্ঠিত' ক'রেছে,—কেবল এক মাণিকলালই—'অভাবনীয় রূপান্তর ও উচ্চপদে আরোহণ সত্ত্বেও, স্বভাবসিদ্ধ ধূর্ততার জন্যই তাহার প্রাকৃত উদ্ভবের [Plebeian origin] চিহ্ন রক্ষা করিয়াছে, সম্পূর্ণ লুপ্ত হইতে দেয় নাই'। তিনি এও দেখিয়েছেন যে, ইতিহাসের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে বঙ্কিম রাজনৈতিক ঘটনা-পর্যায়ের মধ্যেও 'মানসিক সংঘর্ষজাত অগ্নিশিখার ক্রীড়া' দেখিয়েছেন। তবে,—'এই ইতিহাস-নাগপাশের মধ্যে মানবহৃদয়ের সর্বাপেক্ষা স্বাধীন স্ফুরণ হইয়াছে মবারক ও জেব-উন্নিসার প্রণয় কাহিনীতে।'[১৭] মোহিতলালও লিখে গেছেন যে, 'সীতারাম'এ বঙ্কিম মূলতঃ শেক্সপীরীয় ট্রাজেডির আদর্শই বরণ ক'রেছিলেন।

১৬। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' দ্রষ্টব্য। ১৭। পৃষ্ঠা ১০৪ দ্রষ্টব্য।

(ভাষার বিচারে, শ্রীকুমার বাবুর কথা হোলো—'রাজসিংহ' উপন্যাসে চঞ্চলকুমারীর সংলাপের ভাষা কিংবা ভাব দু'য়ের কোনোটিই ব্যক্তিগত নয়, —typical। নির্মলকুমারীর সরস বাক্‌পটুতাও জাতির প্রতিনিধিত্বসূচক। কিন্তু এ-কাহিনীর দ্রুততা এবং এর গঠন-কৌশল, দুই-ই অনবদ্য।)

'সীতারাম' কিন্তু ধর্মতত্ত্ব-প্রচারধর্মী উপন্যাস। বইখানির মুখবন্ধেই দেখা যায় গীতার বাণী এবং শ্রী ও জয়ন্তী চরিত্রে অতিপ্রাকৃতের প্রয়োগ! সীতারাম চরিত্রটি উজ্জ্বল। এ-উপন্যাসে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণও আছে, রোমান্সের সমারোহও আছে। রাজসিংহ, সীতারাম—উভয়েই ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এইবার এই দুটি কাহিনীর মূলকথা সংক্ষেপে স্মরণ করা যেতে পারে। 'দেবী চৌধুরাণী' এবং 'আনন্দমঠ' কাহিনী তার পরে দেখা যাবে।

'রাজসিংহ' পর পর আট খণ্ডে প্রবাহিত। প্রথম খণ্ডের পাঁচ পরিচ্ছেদেই চঞ্চলকুমারী, নির্মলকুমারীকে দেখা যায়। রাজসিংহের একখানি ছবি দেখেই রূপনগরের রাজকন্যা চঞ্চলকুমারী তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হন,—আর, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের রঙ্গরসের আবহাওয়াতেই আলমগীর বাদশাহের ছবিতে তাঁকে পদাঘাত ক'রতে দেখা যায়! তসবীরওয়ালী বৃদ্ধার নিবাস আগ্রায়। সে তার ছেলে খিজিরকে সেদিনের এই অভিজ্ঞতা জানায়। চিত্রকর খিজির দিল্লিতে পৌঁছে তার স্ত্রী ফতেমাকে এই কাহিনী জানিয়ে, প্রতিবেশিনী দরিয়া বিবিকে সে-কথা জানাতে বলে। দরিয়া নিজে বেগমসাহেবার কাছে গিয়ে খবরটি সমুচিত মূল্যে বিক্রি ক'রে আসবে—এই ছিল খিজিরের অভিপ্রায়। পঞ্চম পরিচ্ছেদে দরিয়া বিবির কিঞ্চিৎ রূপ-বর্ণনা পাওয়া যায়। তার বয়স 'সতের বৎসরের বেশি নহে—তাহাতে আবার কিছু খর্বাকার, পনের বছরের বেশি দেখাইত না। দরিয়া বিবি বড় সুন্দরী, ফুটন্ত ফুলের মত, সর্বদা প্রফুল্ল'।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'নন্দনে নরক'। দিল্লীর চাঁদনীচৌকে দরিয়ার অনুরোধে মবারকের অদৃষ্ট গণনার দৃশ্য এটি। জ্যোতিষী মবারককে কোনো এক রাজকুমারীকে বিয়ে করবার পরামর্শ দেয়। ভিড়ের মধ্যে আত্মগোপন ক'রে,—সেই বিবাহের ফল যে 'মৃত্যু'-সম্ভাবনা, দরিয়া তারই ইশারা দেয়! দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, ঔরংজেবের দুই ভগিনী জাহানারা আর রৌশন্‌আরার কথা। এ-পরিচ্ছেদের নাম 'জেব উন্নিসা'। মোগল রাজকন্যাদের

শাসনদক্ষতার কথাসূত্রে এই পরিচ্ছেদেই 'জেনোবিয়া, ইসাবেলা, এলিজাবেথ, কাথারাইন ইত্যাদির কথা উঠেছে।

জাহানারা ছিলেন পিতা শাহজাঁহার বিশেষ হিতৈষী, কিন্তু তিনি যেমন গুণান্বিতা, তেমনি ইন্দ্রিয়পরায়ণা! আর,—'রৌশন্আরা পিতৃদ্বেষিণী, ঔরংজেবের পক্ষপাতিনী ছিলেন।'

দরিয়ার স্বামী মবারক বাদশাহ্-নন্দিনী জেব-উন্নিসার প্রণয়পাত্র। দরিয়া এতে ঈর্ধ্যান্বিতা। মবারকের বিবাহ-প্রসঙ্গ তাই তার বিরক্তির কারণ। সে রংমহালে গিয়ে জেব-উন্নিসাকে তসবীর ভাঙার ঘটনাটিও বলে,—মবারকের সঙ্গে তার বিবাহের কথাও জানিয়ে দেয়। এদিকে, দরিয়া সেখানে যাবার আগেই মবারকের সঙ্গে জেব-উন্নিসার কিছুক্ষণ কথা হয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদের নাম 'ঐশ্বর্যে নরক'! সেখানে বঙ্কিম তাঁর অভ্যস্ত রীতিতে জেব-উন্নিসার বিলাসগৃহের বর্ণনা দিয়েছেন,—'তথায় গৃহসকল বিচিত্র; গৃহসজ্জা বিচিত্র; অন্তঃপুরবাসিনী সকল বিচিত্র।' ঔরংজেবের তিন কন্যার মধ্যে জ্যেষ্ঠা এই জেব-উন্নিসা বিয়ে করেনি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পিসী-ভাইঝি—রৌশন্আরা, আর জেবউন্নিসা, উভয়েই 'মদন-মন্দিরে প্রতিযোগিনী' হয়ে দাঁড়াতো!

পঞ্চম পরিচ্ছেদের নাম 'উদীপুরী বেগম'। সুদূর জর্জিয়ায় উদিপুরীর জন্ম। ঔরংজেবের অগ্রজ দারা এই খ্রীষ্টান কন্যাকে ক্রীতদাসী হিসেবে কিনেছিলেন, পরে তাকে বিয়ে করেন। দারাকে হত্যা ক'রে ঔরংজেব উদীপুরীকে বেগম করেন। দারার প্রথমা মহিষী রাজপুতকন্যা কিন্তু ঔরংজেবের অনুরূপ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ক'রে আত্মহত্যা করেন। উদীপুরী প্রসঙ্গে বঙ্কিম এখানে ঐতিহাসিকের মূল্যবোধ সম্পর্কে কটাক্ষ ক'রে লিখেছেন—'ইতিহাস এই গণিকার নাম কীর্তিত করিয়া জন্ম সার্থক করিয়াছেন, আর যে ধর্মরক্ষার জন্য বিষপান করিল তাহার নাম লিখিতে ঘৃণা বোধ করিয়াছেন। ইতিহাসের মূল্য এই!' জেব-উন্নিসা যখন উদীপুরীর ঘরে প্রবেশ করে, তখন মদ্যাসক্তা—'উদীপুরীর বাম হাতে সটকা, নয়ন অর্ধনিমীলিত, অধরবান্ধুলীর উপর মাছি উড়িতেছে; বৃন্তচ্যুত বিভিন্ন ভূপতিত বৃষ্টিনিষিক্ত পুষ্পরাশির মত উদীপুরী বিছানায় পড়িয়া আছে।'

মহিষী উদীপুরীর সাহায্যে জেব-উন্নিসা দরিয়ার প্রদত্ত খবর বাদশাহের কাছে পৌঁছে দেয়,—এবং তাকে পরামর্শ দেয় যে, চঞ্চলকুমারীকে দাসী ক'রে নেবার সুযোগ উপস্থিত! বাদশাহ্‌ সব শুনে, চঞ্চলকুমারীকে বিবাহ করবার অভিপ্রায় জানিয়ে রূপনগরে লোক পাঠান। রূপনগরে উল্লাস দেখা দিলেও চঞ্চলকুমারী আর তাঁর সখীরা কিন্তু এর অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝে সন্ত্রস্ত হন। এদিকে, ঔরংজেবের হিন্দু মহিষী যোধপুরী-বেগম বাদশাহকে এ বিষয়ে নিবৃত্ত ক'রতে অসমর্থ হ'য়ে, চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে না-এসে রাজসিংহের সাহায্য গ্রহণ করবার পরামর্শ দিয়ে, গোপনে 'দেবী' নামে এক পরিচারিকাকে রূপনগরে পাঠান। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের নামই 'যোধপুরী বেগম'। যোধপুরী ঔরংজেবের অত্যাচারে জর্জর। দিল্লীর তক্তে কোনোদিনই তাঁর নিজের সন্তানের অধিকার হবে না—একথা তাঁর অজানা ছিল না। একবার সে-ভরসা প্রকাশ করায় রৌশন্‌আরা তাঁর নাক মুখ ছিঁড়ে দেয়! কাজে-কাজেই দিল্লীর সিংহাসন যে টলছে,—চঞ্চলকুমারীকে তিনি সে খবরও জানিয়ে দেন!

রূপনগরে চঞ্চলকুমারী আর নির্মলকুমারী রাজসিংহের শরণার্থিনী হবার কথা ভাবছিলেন! যোধপুরীর উপদেশ পেয়ে তাঁরা মনস্থির ক'রে, অনন্ত মিশ্র নামে কুলপুরোহিতকে দূত ক'রে উদয়পুরে পাঠান। কিন্তু পথে তিনি দস্যুর হাতে সর্বস্ব হারান। সৌভাগ্যক্রমে মহারাণা স্বয়ং তখন ছদ্মবেশে কয়েকজন অনুচরের সঙ্গে সেই পথে আসছিলেন। দস্যুর হাত থেকে চঞ্চলকুমারীর চিঠিখানি তাঁর হস্তগত হয়। দস্যুদের প্রায় সকলেই তাঁর হাতে নিহত হয়। শুধু মাণিকলাল নামে একজন দস্যু রক্ষা পায়। তার ব্যবহারে সন্তুষ্ট হ'য়ে রাজসিংহ তাকে পরে তাঁর সঙ্গে দেখা ক'রতে বলেন। চঞ্চলকুমারীর চিঠি প'ড়ে তিনি তাঁর অনুচরবর্গের সঙ্গে দিল্লী যাত্রা করেন। এদিকে রূপনগরে চঞ্চলকুমারীকে নিতে বাদশাহের যে ফৌজ এসেছিল, তাদের সঙ্গে নর্তকীর ছদ্মবেশে দরিয়াও ছিল! সে কৌশলে সৈনিকের বেশভূষা সংগ্রহ করে! মাণিকলালও বিচক্ষণতার সঙ্গে দিল্লীর পথে রাণার সঙ্গে মিলিত হয়। তারপর রাণার পরামর্শে, রাজকন্যাকে বাঁচাবার জন্যে,—মোগল-সওয়ারের বেশ সংগ্রহ করবার জন্যে রূপনগরে এসে, সে এক পানওয়ালীর সাহায্যে এক মোগল সৈনিককে ঠকিয়ে,—তার ঘোড়া, পোষাক, হাতিয়ার নিয়ে মোগল সৈন্যদলের মধ্যে প্রবেশ করে।

চঞ্চলকুমারীর পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তটি তৃতীয় খণ্ডের ঘটনা। এ-খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের নাম 'বক ও হংসীর কথা'। বলা বাহুল্য, চঞ্চলকুমারীই 'হংসী'! নির্মলকুমারীকে তিনি বলেন—'হংসী কি বকের সেবা করে'? অর্থাৎ দিল্লীতে গিয়ে ঔরংজেবের সেবিকা হবেন না তিনি। দিল্লীর পথে বিষপানে আত্মহত্যা করাই তাঁর সংকল্প!

চতুর্থ খণ্ডের নাম 'রন্ধ্রে যুদ্ধ'। নির্দিষ্ট দিনে চঞ্চলকুমারীকে দিল্লী যাত্রা ক'রতে হয়। শিবিকার পেছনে অশ্বারোহীদের মধ্যেই মাণিকলাল নিজের জায়গা ক'রে নেয়। নির্মলকুমারীও গোপনে পদব্রজে অনুসরণ করে। তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদে,—দিল্লীর পথে রাণার সেনাদলের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ হয়! রাণার অবস্থা শোচনীয় হ'তে দেখে, চঞ্চলকুমারী আত্মসমর্পণ ক'রতে এগিয়ে আসেন; কিন্তু বীরাঙ্গনার মহৎ হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে সেনানায়ক মবারক তাঁকে বন্দিনী না ক'রেই ফিরে যায়! এদিকে, মাণিকলাল অবিলম্বে রূপনগরে গিয়ে, রাজাকে ছলনা ক'রে সৈন্য নিয়ে উপস্থিত হয়। পথে নির্মলকুমারীকে পরিশ্রান্ত অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে,—তার সৌন্দর্যে মুগ্ধ হ'য়ে, তাকে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে, সে তাকে নিরাপদ স্থানে রেখে আসে। তারপর রূপনগরের ফৌজের সাহায্যে সে সেই মোগলবাহিনী ছত্রভঙ্গ করে দেয়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে,—নিজের সৈন্যদের নির্দেশ দিতে গিয়ে মবারক হঠাৎ যেন অদৃশ্য হয়ে যায়! আর, রূপনগরের সেনাদলকে ফিরিয়ে দিয়ে,—চতুর্থ খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে 'স্নেহশালিনী' এক পিসীর বাড়িতে পৌঁছে নির্মলকুমারীকে সে বিবাহ করে।

পঞ্চম খণ্ডের শিরোনাম 'অগ্নির আয়োজন',—ষষ্ঠের 'অগ্নির উৎপাদন,—সপ্তমের 'অগ্নি জ্বলিল'—এবং অষ্টম খণ্ডের নাম 'আগুনে কে কে পুড়িল'! মোগল-রাজপুতের সমরাগ্নি-সমারোহের দিকে নজর রেখে ঔপন্যাসিক অতঃপর এ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীর অভিজ্ঞতা বর্ণনা ক'রে গেছেন। ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদের আদিতেই তিনি লিখেছেন—'রাজসিংহ যে তীব্রঘাতী পত্র ঔরংজেবকে লিখিয়াছিলেন, তৎপ্রেরণ হইতে এই অগ্ন্যুৎপাদন খণ্ড আরম্ভ করিতে হইবে।'

মবারক হঠাৎ অদৃশ্য হবার কারণ—অতর্কিতে সে এক ইঁদারায় প'ড়ে যায়! সৈনিকবেশধারিণী দরিয়া তাকে উদ্ধার করে। উদ্ধার পেয়ে, দিল্লীতে গিয়ে সে কিছু দিন দরিয়াকে নিয়ে সুখে ঘর-সংসার করে। এদিকে রাজসিংহের সঙ্গে চঞ্চলকুমারীও উদয়পুরে এসে পৌছোন।

পঞ্চম খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রাজসিংহ আর চঞ্চলকুমারীর আলাপের দৃশ্যটি কিঞ্চিৎ লঘুতাদুষ্ট। চঞ্চলকুমারী বধূ হ'তে চেয়েছেন। রাজসিংহ বলেন —'বৃদ্ধস্য তরুণী বিষম্।' এই হাস্য-পরিহাসের পরে চঞ্চলকুমারীর পিতা বিক্রম সোলাঙ্কির কাছে বিবাহের প্রস্তাব জানানো হয়। কিন্তু রাজসিংহকে অযোগ্য মনে ক'রে বিক্রম তিরস্কার করেন। কাজে-কাজেই নিবৃত্ত হ'তে হয়। চঞ্চল-কুমারীর অনুরোধে নির্মলকুমারী তাঁর সঙ্গে রাণার অন্তঃপুরে বাস ক'রতে আসে। এক জ্যোতিষীকে দিয়ে চঞ্চলকুমারীর বিবাহ সম্বন্ধে গণনা ক'রিয়ে সে শোনে যে, সসাগরা ধরণীপতির মহিষী এসে পরিচর্যা না ক'রলে তাঁর বিবাহ হবে না! এদিকে রাজসিংহের ওপর রেগে গিয়ে ঔরংজেব হিন্দুদের ওপর অত্যাচার শুরু করেন। রাজসিংহ এক চিঠি লিখে এর প্রতিবাদ করেন। অবস্থা আরো খারাপ হয়। উভয় পক্ষেই যুদ্ধের আয়োজন চ'লতে থাকে।

রাণার সেই পত্রবাহকরূপে মাণিকলাল দিল্লীতে এসে পৌঁছোয়। চঞ্চল-কুমারীর পরামর্শ অনুসারেই উদীপুরীকে লেখা আদেশপত্র নিয়ে নির্মলকুমারী মাণিকলালের সঙ্গ নেয়। মাণিকলাল দিল্লীতে পাথরের জিনিসের এক দোকান খুলে, পলায়নের পথ প্রস্তুত রেখে বাদশাহকে রাণার চিঠি দেয়।

সে-চিঠির তথ্য জেনে, বাদশাহ গোপনে তার হত্যার আদেশ দেন। মাণিকলাল তখন সদাগরের ছদ্মবেশে দোকানে ছিল; তাই কেউ তার সন্ধান পায়নি। বাদশাহের অনুচরদল নির্মলকুমারীকে ধ'রে ফেলে। যোধপুরী-বেগমের দাসী ব'লে আত্মপরিচয় দিয়ে, তাঁরই 'পাঞ্জা'র বলে নির্মলকুমারী রংমহালে যোধপুরীর কাছে গিয়ে পৌঁছোয়। যোধপুরীর পরামর্শ অনুসারে উদীপুরীকে চিঠি দেওয়া হয়। কিন্তু পরদিন পালাতে গিয়ে স্বয়ং ঔরংজেবের হাতে নির্মলকুমারী ধরা প'ড়ে যায়! উদীপুরীর পত্রবাহিকা জেনে ঔরংজেব উদীপুরীর মহলে গিয়ে সেই চিঠি প'ড়ে শোনান।

রাজসিংহের বলবীর্য সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের জন্যেই নির্মলকুমারীকে খুব সমাদরের সঙ্গে বন্দিনী ক'রে রাখা হয়। মবারকের দুর্বলতার জন্যেই যে

চঞ্চলকুমারীকে দিল্লীতে আনা যায়নি, একদিন কথাপ্রসঙ্গে, জেব-উন্নিসাকে সে এই খবর জানিয়ে দেয়। মবারকের কর্তব্যচ্যুতির খবর দিয়ে, ক্ষুব্ধ জেব-উন্নিসা তার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা করায়। কিন্তু প্রণয়ীর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে অন্তরের ব্যাহত প্রেম আবার জেগে ওঠে। তাই তাকে বাঁচাবার জন্যে সমাধিক্ষেত্রে লোক পাঠায়। সেই সময়ে মাণিকলাল সেখান দিয়ে দেশে ফিরছিল। তাকে দেখে সেই লোকটি 'মৃতদেহ' ফেলে রেখে পালিয়ে যায়। মাণিকলাল মবারককে বাঁচিয়ে, তার সব কথা শুনে, তাকে নিজের দেশে নিয়ে যায়। কিন্তু জেব-উন্নিসা শুনতে পায় যে মবারককে বাঁচানো যায়নি!

রাজসিংহ-কাহিনী সরল হলেও নানা চরিত্র আর অসংখ্য ঘটনার ভিড়ে জটিল বোধ হয়। এ-আখ্যানসূত্র স্মৃতিতে জাগিয়ে রাখা মনোযোগ-সাধ্য ব্যাপার। তাই কিঞ্চিৎ পুনরাবৃত্তি স্বীকার্য। এ পর্যন্ত ঘটনাধারা সংক্ষেপে এই দেখা গেল যে—দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে, অর্থাৎ সপ্তমে—জেব-উন্নিসার প্রশ্নের জবাবে মবারক দরিয়ার সঙ্গে তার বিবাহের খবর জানিয়েছে,—এবং তারপরেই রূপনগরের রাজকুমারীকে আনবার জন্যে তার সসৈন্য যাত্রা! তৃতীয় খণ্ডে কুলপুরোহিত অনন্ত মিশ্রকে দৌত্যে নিয়োগ এবং পথে দস্যুহস্তে তাঁর নিপীড়ন,—এবং সেই সূত্রেই রাজসিংহের হাতে দস্যু মাণিকলালের উদ্ধার-বিবরণ! সেই তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে, মবারকের অধীনস্থ মোগল সেনাপতি সৈয়দ হাসান আলিকে 'মেহেরজান বিবি' ছদ্মনামে নৃত্য-কৌশলে মুগ্ধ ক'রেছে দরিয়া! ঐ খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ,—দশমে, এক রসিকা পানওয়ালীর সাহায্যে মাণিকলাল মোগল সৈন্যের হাতিয়ার ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে মোগল শিবিরে উপস্থিত হয়। চতুর্থ খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে চঞ্চলকুমারীকে নিয়ে মোগল সেনাবাহিনীর যাত্রারম্ভ। এবং শেষ পরিচ্ছেদ—সপ্তমে, মাণিকলাল তার 'স্নেহশালিনী পিসী'র কাছে ফিরে নির্মলকুমারীকে বিবাহ ক'রেছে। পঞ্চম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে যুদ্ধক্ষেত্রে মবারকের এক কূপে পতন ও দরিয়া-কর্তৃক তার উদ্ধার-প্রসঙ্গ। শেষ পরিচ্ছেদ—ষষ্ঠে, ক্রোধান্ধ ঔরঙ্গজেব জিজিয়া-কর পুনঃ প্রবর্তিত করেন এবং রাজসিংহ তাতে অসম্মত হওয়ায় উভয়পক্ষে যুদ্ধায়োজন শুরু হয়। ষষ্ঠ খণ্ডের প্রথম তিনটি পরিচ্ছেদে রাজসিংহের চিঠি নিয়ে মাণিকলালকে দিল্লীতে

আসতে দেখা গেছে। তার সঙ্গে এসেছে নির্মলকুমারী। চঞ্চলকুমারী তারই হাতে চিঠি দিয়েছেন—উদীপুরীকে তাঁর দাসী হবার আমন্ত্রণ! ঔরংজেব দূতের প্রাণদণ্ড দেন বটে, কিন্তু ধূর্ত মাণিকলাল আত্মগোপন করে। যোধপুরী বেগমের পাঞ্জা দেখিয়ে নির্মলকুমারীও যোধপুরীর আশ্রয় পায়। কিন্তু, উদীপুরীকে চিঠি দিয়ে ফিরে যাবার সময়ে রঙমহলের ফটকে সে বন্দিনী হয়। এই ষষ্ঠ খণ্ডে স্বয়ং আলমগীর নির্মলকুমারীর তীক্ষ্ণবুদ্ধির পরিচয় পেয়ে তার প্রতি আকৃষ্ট হ'য়ে যোধপুরী বেগমের কাছে তাকে বন্দী ক'রে রাখেন। জেব-উন্নিসাকে নির্মলকুমারী জানায় যে, চঞ্চলকুমারীর কাছে স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার ক'রে মবারক চলে এসেছে। তার আগেই মবারক জেব-উন্নিসার আহ্বান উপেক্ষা ক'রেছিল। তাই, ক্ষুব্ধ, ক্রোধান্ধ জেব উন্নিসা ঔরংজেবের কৃপায় মবারকের প্রাণদণ্ড ঘটায় এবং এই অস্থিরচিত্ত রমণী অনুতপ্ত হয়ে, অষ্টম পরিচ্ছেদে—সর্পদংশনে মৃত মবারককে ওঝার সাহায্যে বাঁচিয়ে তোলবার আদেশ দিয়ে বিশ্বাসী খোজা আসিরুদ্দীনকে পাঠিয়ে দেয়! মাণিকলাল মবারককে চিনে, তাকে বাঁচিয়ে তুলে উদয়পুরে চলে যায়। এদিকে জেব-উন্নিসা শুনেছে যে, মবারক বাঁচেনি। ষষ্ঠ খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদ—নবমে, এই আবহাওয়ার মধ্যেই দরিয়া এসেছিল জেব-উন্নিসাকে বধ করবার সংকল্প নিয়ে। কিন্তু তাকে কাঁদতে দেখে উন্মাদিনী বিদায় নেয়।

সপ্তম খণ্ডের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে উদয়সাগরের তীরে মোগল শিবিরে ঔরংজেবকে দেখা যায়। মোগল-সৈন্য রাজসিংহের কাছে পরাজিত হয়। ঔরংজেব শিবির তুলে ফেলবার আদেশ দেন। নির্মলকুমারীর প্রতি আন্তরিক আকর্ষণবশেই তিনি তাকে মুক্তি দেন। নির্মলকুমারী বলে—'যখন উভয়পক্ষের মঙ্গলার্থ সন্ধি করিতে আমি আপনাকে অনুরোধ করিব, তখন আমার কথায় কর্ণপাত করিবেন।' তৃতীয়-চতুর্থ পরিচ্ছেদে রাণা রাজসিংহ ঔরংজেবের বাহিনীকে আক্রমণ ক'রে, নির্মলকুমারীর নির্দেশ অনুসারেই, জেব-উন্নিসা আর উদীপুরীকে বন্দী ক'রে চঞ্চলকুমারীর কাছে পাঠিয়েছেন। মবারক এক মোগল সওদাগরের ছদ্মবেশে মোগল সেনাপতি বখ্‌ত খাঁকে ভুল পথ দেখিয়ে বিপদে ফেলে; এবং এইভাবেই সে মাণিকলালের ঋণ শোধ করে! তারপর বাদশাহের সেনাদলে যোগ দিয়ে, রাজপুতের বিরুদ্ধে সে যুদ্ধে উদ্যত হতে চায়

কিন্তু তার আগে একবার জেব-উন্নিসাকে দেখবে ব'লে মাণিকলালের কাছে সে প্রার্থনা জানায়।

অষ্টম খণ্ডের প্রথম দুটি পরিচ্ছেদে—মবারকের প্রদর্শিত ভুল পথে পাহাড়ে উঠে বেগমদের সঙ্গে ঔরংজেবের অবরোধ-বিবরণ পাওয়া যায়। রাজসিংহের অন্তঃপুরে উদীপুরী এবং জেব-উন্নিসা সসম্মানে গৃহীতা হয়। কিন্তু উদীপুরী নিজের ব্যবহার-দোষে সে সম্মান হারায়। তৃতীয় পরিচ্ছেদে,—অনেকদিন পরে সে একবার যীশুখ্রীস্ট স্মরণ করে। মাণিকলালের অনুরোধে চঞ্চলকুমারীর নির্দেশে এক রাত্রে জেব-উন্নিসার সঙ্গে মবারকের সাক্ষাৎ হয়। চতুর্থ-পঞ্চম-ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে জেব-উন্নিসার অনুতাপের দাহ,—মবারকের দর্শন-লাভ,—ও অশ্রু-বিসর্জনের বর্ণনা! অনুতপ্তা জেব-উন্নিসা ক্ষমা প্রার্থনা করে। গোপনে তাদের বিবাহ হয়। ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর বাদশাহ সন্ধির জন্যে আগ্রহ দেখালে রাজসিংহ তাতে সম্মত হন। সেই সন্ধির একটি শর্ত ছিল—কন্যা-জামাতাকে মার্জনা ক'রতে হবে। বাদশাহ রাজী হন। যাত্রার প্রাক্কালে উদীপুরীকে দিয়ে সত্যিই চঞ্চল-কুমারীর তামাক সাজিয়ে নেওয়া হয়! মুক্তি পেয়ে ঔরংজেব কিন্তু সন্ধিপত্র ছিঁড়ে ফেলেন; তিনি গোপনে মবারকের প্রাণহানির ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধ চ'লতে থাকে। দু'পক্ষের প্রবল সংগ্রামের মধ্যেই উন্মাদিনী দরিয়ার গু'লিতে মবারক প্রাণ হারায়। নীতিনিষ্ঠ লেখক হয়তো এইভাবেই মবারকের রূপমোহের দণ্ড দিয়েছেন! কিন্তু জীবনরস-কৌতূহলের দিক থেকে এ যেন নির্মম অদৃষ্টের বজ্রাগ্নি! পনেরোর পরিচ্ছেদের শেষে, এই মৃত্যুর খবর পেয়ে উদয়সাগরের পাথুরে মাটিতে লুটিয়ে প'ড়ে জেব-উন্নিসা তার জীবনের কান্না কেঁদেছে!

এই ঘটনার পরে, রাজসিংহকে বহু সমাদরে বরণ ক'রে বিক্রমসিংহ তাঁর সঙ্গে যোগ দেন। মোগলবাহিনী পরাজিত হয়। তারপর রাজসিংহের সঙ্গে চঞ্চলকুমারীর বিবাহ হয়।

সপ্তম পরিচ্ছেদের নাম—'দগ্ধ বাদশাহের জলভিক্ষা'—ত্রয়োদশের 'মবারকের দহনারম্ভ',—এবং শেষ পরিচ্ছেদের নাম—'পূর্ণাহুতি—ইষ্টলাভ'। বিক্রম সোলাঙ্কি রাজসিংহের শিবিরে এসে সম্মতি জানিয়ে, সেখান থেকে উদয়পুরে গিয়ে স্বহস্তে কন্যাদান করেন! উপন্যাসের পরিসমাপ্তি সেখানেই। তবু শেষ পরিচ্ছেদে খুবই দ্রুত গতিতে,—মাত্র কয়েক ছত্রের মধ্যে আরো চার বছরের যুদ্ধ-বৃত্তান্ত জানিয়ে গেছেন লেখক। তবে, তিনি এটুকুও

লিখেছেন যে—'তারপর যা ঘটিল, তাহাতে ইতিহাসেরই অধিকার, উপন্যাস-লেখকের সে সব কথা বলিবার প্রয়োজন নাই।'

পরিশেষে এক 'উপসংহার' যোগ করা হ'য়েছে। সেটি কিন্তু কোনো মতেই উপন্যাসের অঙ্গ নয়।

'সীতারাম' কাহিনী আরো সংক্ষেপে বলা যেতে পারে। প্রথম খণ্ডে 'দিবা-গৃহিণী',—দ্বিতীয়ে 'সন্ধ্যা-জয়ন্তী',—তৃতীয়ে 'রাত্রি-ডাকিনী'—এই তিন বিভাগের পরিকল্পনা অবলম্বন ক'রে তিনি এ-কাহিনী বর্ণনা ক'রেছেন। পূর্ব-বাংলার ভূষণা গ্রামে—'আজি হইতে প্রায় একশত আশি বৎসর পূর্বে' [অর্থাৎ 'সীতারাম'-এর প্রকাশকাল ১৮৮৭ থেকে] গঙ্গারাম দাস নামে এক কায়স্থ যুবক নিজের মুমূর্ষু জননীর চিকিৎসার জন্যে কবিরাজ ডাকতে যাচ্ছিলেন। সেই সময়ে পথে এক ফকির শুয়েছিল। ফকির ইচ্ছে করেই পথ ছাড়েনি। তাই গঙ্গারাম তাকে ডিঙিয়ে যেতে বাধ্য হয়। গঙ্গারামের মায়ের মৃত্যুর পরে, ফকিরের অভিযোগের ফলে,—এই প্রথম পরিচ্ছেদেই, কাজির লোকজন এসে তাকে ধরে নিয়ে যায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—দীর্ঘ অদর্শনের পরে, গঙ্গারামের অনুজা—প্রায় পঁচিশ বছরের যুবতী,—শ্রী তাঁর স্বামী সীতারামের সঙ্গে দেখা ক'রে নিজের এই বিপন্ন ভাইয়ের সংকটত্রাণের জন্যে সাহায্য ভিক্ষা করেন। 'হিন্দুকে হিন্দু না রাখিলে কে রাখিবে ?'—এ তাঁরই আবেদন।

সীতারাম সে-আবেদন অগ্রাহ্য করেননি। এই 'ধর্ম-যুদ্ধ'ই এ-উপন্যাসের প্রধান বিষয়। সীতারাম,—সীতারামের গুরুদেব চন্দ্রচূড় তর্কালঙ্কার,—বলিষ্ঠ, বিশ্বাসী অনুচর মৃন্ময়,—সীতারামের পরিত্যক্তা স্ত্রী শ্রী,—সন্ন্যাসিনী 'জয়ন্তী' ইত্যাদি পাত্র-পাত্রীর ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে 'অনন্তসুন্দর কৃষ্ণপাদপদ্মের' দিকে মনের গতি ফিরিয়ে দেওয়াই এ-উপন্যাসের অভিপ্রেত উপায় এবং উদ্দেশ্য।

তৃতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রী সম্বন্ধে সীতারামের মনোভাবের ইঙ্গিত দিতে গিয়ে বঙ্কিম নিজেই শেক্স্‌পীয়রের 'লিয়র'-এর কথা স্মরণ করেন। তার আগে, সপ্তমের শেষ দিকে শ্রী বলেন—'ধর্মার্থে ভিন্ন যে ইন্দ্রিয়পরিতৃপ্তি, তাহা অধর্ম।' মানব-জীবনের যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে, [illegible]

রক্ত-মাংসের বাসনা থেকে,—ক্রমশঃ উন্নততর বাসনায় এগিয়ে যাবার কাহিনীই এই শেষ উপন্যাসের প্রধান কথা।

কাজির অন্যায় বিচারে, গঙ্গারামের জীবন্ত কবরের আদেশ হয়! চতুর্থ থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদের বিস্তারে,—সীতারাম তাঁর গুরুদেব চন্দ্রচূড়ের সাহায্যে গঙ্গারামকে রক্ষা ক'রে স্থানীয় ফৌজদারের বিরাগভাজন হন; তাই বাসস্থান ভূষণা ছেড়ে শ্যামপুরে গিয়ে তাঁকে বসবাস শুরু ক'রতে হয়। তাঁর বহু অনুগত প্রজাও তাঁর অনুসরণ করে। ফলে, শ্যামপুর এক সমৃদ্ধ নগর হ'য়ে ওঠে। এই নগরের নাম রাখা হয় মহম্মদপুর।

চতুর্থ পরিচ্ছেদে গঙ্গারামকে উদ্ধারের দৃশ্যে শ্রীকে দেখা গেছে—'সিংহ-বাহিনী সিংহপৃষ্ঠে দাঁড়াইয়া রণরঙ্গে নাচিতেছে।' ষষ্ঠে, সীতারামকে তিনি বলেন 'আমি তোমার বিবাহিতা স্ত্রী, তোমার সর্বস্বের অধিকারিণী, আমি তোমার শুধু দয়া লইব কেন?' সপ্তমে, সীতারাম স্ত্রী-পরিত্যাগের কারণ শুনিয়েছেন। জ্যোতিষীর গণনায় দেখা গিয়েছিল—শ্রীকে 'প্রিয় প্রাণহন্ত্রী' হ'তে হবে! সীতারামের পিতা তাই তাঁকে পরিত্যাগ ক'রেছিলেন। 'তপ্তকাঞ্চন শ্যামাঙ্গী নন্দা',—'হিমরাশি-প্রতিফলিত কৌমুদী রমা'— এই দুই স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সীতারাম তাঁর প্রথমা স্ত্রী শ্রীর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। কিন্তু বহুদিন পরে সুন্দরী শ্রীকে দেখে তাঁর প্রতি সীতারামের আবার নতুন অনুরাগ দেখা দেয়।[১৮] কিন্তু কেন যে তাঁকে ত্যাগ ক'রতে হয়েছিল, প্রথম খণ্ডের সপ্তমে, সেই কোষ্ঠী-গণনার কথা জানতে পেরে,—একাদশ পরিচ্ছেদে, শ্রী গোপনে উড়িষ্যায় চলে যান এবং সেখানে সন্ন্যাসিনী জয়ন্তীর সঙ্গ লাভ করেন।

⁂

দ্বিতীয় খণ্ডের আদিতেই দেখা যায়—সীতারাম কিছুতেই শ্রীর সন্ধান না পেয়ে রাজকার্যে মন দেন। গোপনে ভূষণার মুসলমান ফৌজদারের

১৮। শ্রীর প্রতি সীতারামের এই নব-অনুরাগের ব্যাখ্যা আছে প্রথম খণ্ডের দশম পরিচ্ছেদে। সেই সূত্রে 'প্রেম' সম্বন্ধে বঙ্কিম লিখেছেন—'প্রেম কি, তাহা আমি জানি না। দেখিল আর মজিল, আর কিছু মানিল না, কই এমন দাবানল ত সংসারে দেখিতে পাই না। প্রেমের কথা পুস্তকে পড়িয়া থাকি বটে, কিন্তু সংসারে 'ভালবাসা' স্নেহ ভিন্ন প্রেমের মত কোন সামগ্রী দেখিতে পাই নাই, সুতরাং তাহার বর্ণনা করিতে পারিলাম না। প্রেম, যাহা পুস্তকে বর্ণিত, তাহা আকাশকুসুমের মত কোন একটা সামগ্রী হইতে পারে, যুবক-যুবতীগণের মনোরঞ্জন জন্য কবিগণ কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে বোধ হয়।' তবে নূতনের জন্য দুর্দমনীয় বাসনা'ও স্বীকার্য। শ্রীর সম্বন্ধে সীতারামের ছিল সেই অনুভূতি।

আক্রমণের সংবাদ পেয়ে,—প্রতিরোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে 'রাজা' উপাধি লাভের জন্যে তিনি দিল্লী যাত্রা করেন। এদিকে তাঁর তিন স্ত্রী—শ্রী, নন্দা এবং রমার মধ্যে—তৃতীয়া রমা বড়োই ভীরুস্বভাবা। যুদ্ধের সম্ভাবনায় অত্যন্ত ভয় পেয়ে,—গোপনে নগররক্ষক গঙ্গারামকে ডেকে, নিজের আশঙ্কা এবং কৌতূহল দুইই তিনি জানিয়ে ফেলেন। মুসলমান ফৌজ এসে তাঁর ছেলেকে মেরে ফেলবে, এই তাঁর ভয়! দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে মাতৃহৃদয়ের এই ভয়ব্যাকুলতার বর্ণনা দেখে মনে হয়, তিনি যেন রাজবধূ হবার উপযুক্ত নন। তাঁর স্নেহ এবং সারল্য,—আবার, নন্দারও সারল্য,—কিন্তু রমার তুলনায় নন্দার আত্মস্থতা এবং ঈশ্বর-বিশ্বাসের দিক, দুই-ই বেশ স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে।

গঙ্গারাম রমাকে অভয় দিয়ে,—প্রয়োজন হ'লেই তাকে আবার ডাকতে ব'লে চলে যায়। সুন্দরী রমার প্রতি আসক্ত হ'য়ে, এই অজুহাতে সে প্রায়ই গোপনে অন্তঃপুরে আসতে থাকে। দাসী মুরলার মুখে নিন্দার আভাস পেয়ে, রমা তার আসা বন্ধ ক'রে দেন। ইতিমধ্যে দ্বিতীয় খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে পূর্বনির্দেশ অনুসারে বিরূপাতীরে ললিতগিরি-উপত্যকায় জয়ন্তীর সঙ্গে শ্রীকে 'মহাপুরুষ' সন্দর্শনের জন্যে উপস্থিত হ'তে দেখা যায়। মহাপুরুষ কেবলমাত্র জয়ন্তীর সঙ্গে দেখা ক'রে তাঁদের দুজনকেই ভৈরবীবেশে সীতারামের রাজ্যে ফিরতে বলেন। এই পরিচ্ছেদেই শ্রীর আশঙ্কার কথা আছে। স্বামীর কাছে ফেরবার প্রস্তাবে শ্রী বলেন যে, সীতারাম—'যখন দেখিবেন, তাঁহার শ্রী মরিয়া গিয়াছে, তাহার দেহ লইয়া একজন সন্ন্যাসিনী প্রবঞ্চনা করিয়া বেড়াইতেছে, তখন কি তাঁর দুঃখ হইবে না?'

এদিকে গঙ্গারাম রমার বিনিময়ে ভূষণার ফৌজদারকে সীতারামের গড়ের অধিকার দেবার হীন ষড়যন্ত্র করে। চন্দ্রচূড় এবং মৃন্ময়ের সমস্ত সতর্কতা ব্যর্থ ক'রে যথাসময়ে মুসলমান সৈন্য এসে নগর আক্রমণ করে। গঙ্গারাম তখন নিশ্চেষ্ট থাকে।

ঠিক সময়েই জয়ন্তীর সঙ্গে শ্রী মহম্মদপুরে ভৈরবীবেশে এসে উপস্থিত হন। কৌশলে গোলা-বারুদ এবং কামান চালক সংগ্রহ ক'রে তিনি শত্রু দমনের কাজ শুরু করেন। দিল্লী থেকে সীতারামও সেই সময়ে সাধারণ পথিকের বেশে দেশে ফিরছিলেন। এইভাবে শত্রুদমন সম্পন্ন হ'তেই

জয়ন্তী অদৃশ্য হন। গঙ্গারামের বিশ্বাসঘাতকতার খবর পেয়ে সীতারাম তাকে কারারুদ্ধ করেন এবং গঙ্গারামের চক্রান্ত নিষ্ফল ক'রে, ভূষণা জয় ক'রে— বাদশাহী সনদের বলে তিনি 'মহারাজ' উপাধি গ্রহণ করেন।

প্রথম খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদে স্বামীর প্রতি শ্রীর একান্ত আগ্রহের কথা ছিল। জয়ন্তীকে তিনি বলেছিলেন—'আমি ঈশ্বরও জানি না—স্বামীই জানি।' তারপর, এই দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ সপ্তদশ পরিচ্ছেদটি খুবই সংক্ষিপ্ত। এই খণ্ডে শ্রীর পতি-সান্নিধ্য-প্রাপ্তির কাহিনীও অনেকটা এগিয়ে এসেছে। সীতারামের প্রতিষ্ঠা দেখে, জয়ন্তী বলেন—'শ্রী! আর দেখ কি? এক্ষণে স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর।' কিন্তু জয়ন্তীর অভিপ্রায় অনুসারে শ্রী সীতারামকে 'রাজর্ষি' ক'রে তুলতে পারবেন কি না, সে বিষয়ে তখনো তাঁর সন্দেহ দূর হয়নি! তাই 'তনি কিছুদিন অপেক্ষা ক'রতে চান। এইখানেই দ্বিতীয় খণ্ডের পরিসমাপ্তি।

তৃতীয় খণ্ডে, গঙ্গারামের দণ্ডাদেশের সঙ্গেই রমার নামে কলঙ্ক ছ'ড়িয়ে পড়ে।[১৯] সীতারামের দ্বিতীয়া স্ত্রী নন্দার পরামর্শে রমা প্রকাশ্য সভায় প্রকৃত ঘটনা স্বীকার ক'রে নিজের নির্দোষিতার প্রমাণ দিতে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সীতারামও এই প্রস্তাব সমর্থন করেন। সেই ব্যবস্থা অনুসারে,—আম-দরবারে বিচারে—চন্দ্রচূড়, ফকির চাঁদ শাহ ইত্যাদির কথার পরে, রমাও নিজের কথা বলেন। গঙ্গারাম কিন্তু তখনো নিজের দোষ অস্বীকার ক'রে, রমাকে অসতী প্রমাণ করবার চেষ্টা করে! সেই অবস্থায়, ভৈরবী বেশে জয়ন্তী সভায় এসে, ত্রিশূলের আঘাতে তাকে হত্যার ভয় দেখিয়ে, তার অপরাধ স্বীকার করিয়ে নেন। গঙ্গারামের প্রাণদণ্ড হয়। মুরলাও নগরের বাইরে বিতাড়িত হয়। রমা কাঁদতে-কাঁদতে বলেন—'পতিসেবার অপেক্ষা স্ত্রীলোকের আর পুণ্য নাই।' সভায়

১৯। তৃতীয় খণ্ডের প্রথম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে: 'ভূষণা দখল হইল। যুদ্ধে সীতারামের জয় হইল। তোরাব্ খাঁ মৃন্ময়ের হাতে মারা পড়িলেন। যে সকল ঐতিহাসিক কথা। কাজেই আমাদের কাছে ছোট কথা। আমরা তাহার বিস্তারিত বর্ণনায় কালক্ষেপ করিতে পারি না। উপন্যাসলেখক অন্তর্বিষয়ের প্রকটনে যত্নবান হইবেন—ইতিবৃত্তের সঙ্গে সম্বন্ধ রচনা নিষ্প্রয়োজন।' ঐতিহাসিক উপন্যাসের আদর্শ সম্বন্ধে 'রাজসিংহ' ও 'দেবী চৌধুরাণী'তে যেমন, তেমনি তাঁর 'সীতারামে'র এ-উক্তিও স্মরণযোগ্য।

লোকজন—'গৃহে গিয়া সকলেই রমাকে 'সাক্ষাৎ লক্ষ্মী' বলিয়া প্রশংসা করিল।' আবার, ভ্রাতৃবিয়োগের কষ্ট থেকে শ্রীকে রক্ষা করবার জন্যে,—চতুর্থ পরিচ্ছেদে, সীতারামের কাছে জয়ন্তীকে গঙ্গারামের প্রাণভিক্ষা চাইতে দেখা যায়। সীতারাম তাঁকে কোনো দেবী মনে ক'রে, সে প্রস্তাবে স্বীকৃত হয়ে শ্রীকে প্রার্থনা করেন। জয়ন্তী তাঁর সে-প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে,—ছাড়া পেয়ে, গঙ্গারাম দেশত্যাগী হয়। ষষ্ঠ-সপ্তম পরিচ্ছেদে, সন্ন্যাসিনী শ্রী একান্তভাবে তাঁরই ভাবনাসর্বস্ব, রাজধর্মভ্রষ্ট সীতারামকে দেখা দেন বটে, কিন্তু বহু অনুরোধ-সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে একত্র বাস ক'রতে রাজি না হওয়ায় তাঁর জন্যে 'চিত্তবিশ্রাম' নামে একটি ভিন্ন মহল প্রস্তুত হয়। সপ্তমে, শ্রী সীতারামকে বলেন—'আমি সন্ন্যাসিনী; সর্বকর্ম ত্যাগ করিয়াছি'। শুধু তাই নয়, সংসারে যে ভালবাসা পায়, আর যে ভালবাসে,—এই দুই পক্ষের অবস্থা-ভেদের উল্লেখ ক'রে ঈশ্বর-অর্পিত প্রীতির শ্রেয়স্ত্বের কথা বলেন। এদিকে, রাজা রাজকার্য বন্ধ ক'রে সর্বদা সেই অন্যমনা শ্রীর প্রশান্ত, ইন্দ্রিয়ক্ষোভশূন্য, বাসনাশূন্য, রূপ দেখতে লাগলেন। তখন—'শ্রী হইতে সীতারামের সর্বনাশ হইল।'

রাজার উপেক্ষায় রমার শরীর মন দুই-ই ভেঙে যায়, এবং শেষে,—দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর জন্যে নন্দা, চন্দ্রচূড় ইত্যাদি সকলেই সীতারামকে দায়ী করেন। তাতে সীতারাম ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। রাজকার্যের অব্যবস্থার দিকে চন্দ্রচূড় তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; সীতারাম তখন সকলকে নিপীড়িত করবার আদেশ দেন। ষোড়শ পরিচ্ছেদে, জয়ন্তী এসে শ্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে রাজ্যের অবস্থা জেনে নিয়ে, শ্রীকে অন্যত্র পাঠিয়ে দেন। জয়ন্তীর কাছে শ্রীর কোনো সন্ধান না পাওয়ায়, মহারাজ সীতারাম তাঁকে প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করবার ব্যবস্থা করেন।

এইখানে একথা স্বভাবতঃই মনে আসে যে, 'কৃষ্ণচরিত্র' প্রথম ভাগ ছাপা হয় ১৮৮৬তে,—অর্থাৎ 'সীতারাম' প্রকাশিত হবার ঠিক আগের বছর। ১৮৯২এ—অর্থাৎ, 'সীতারাম' প্রকাশিত হবার পাঁচ বছর পরে, বইখানির পরিবর্ধিত সংস্করণ বেরোয়। মহাভারতের 'দুর্যোধনবধ' সম্বন্ধে বঙ্কিমের আলোচনা পাওয়া যায় 'কৃষ্ণচরিত্রের' ষষ্ঠ খণ্ডের অষ্টম পরিচ্ছেদে। ঠিক ন্যায়

আগে—সপ্তমের শেষে, কর্ণবধ সম্বন্ধে আলোচনায় তিনি পুনর্বার মনে করিয়ে দেন যে 'কৃষ্ণ অধর্মের শাস্তা'। কর্ণবধের অব্যবহিত পূর্বে কৃষ্ণ তাঁকে মনে করিয়ে দেন—'দেখ দুর্যোধন, দুঃশাসন ও শকুনি তোমার মতানুসারে একবস্ত্রা দ্রৌপদীরে যে সভায় আনয়ন করিয়াছিল, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল?' আবার—'যখন তুমি সভামধ্যে দুঃশাসনের বশীভূতা রজস্বলা দ্রৌপদীরে,—হে কৃষ্ণে! পাণ্ডবগণ বিনষ্ট হইয়া শাশ্বত নরকে গমন করিয়াছে, এক্ষণে তুমি অন্য পতিরে বরণ কর, এই কথা বলিয়া উপহাস করিয়াছিলে এবং অনার্য ব্যক্তিরা তাঁহারে নিরপরাধে ক্লেশ প্রদান করিলে উপেক্ষা করিয়াছিলে, তখন তোমার ধর্ম কোথায় ছিল?'

'সীতারামে'র এই অংশে, জয়ন্তীকে লাঞ্ছনা করবার দুর্মতি বঙ্কিমচন্দ্রের সেই মহাভারত-কথা-চিন্তারই সমকালীন কল্পনা।

যাই হোক্, এই তৃতীয় খণ্ডে,—নির্দিষ্ট দিনে অধর্মবিমুখ, পত্রিপুত্রবতী, নন্দার মধ্যস্থতায় জয়ন্তী রক্ষা পান। মহারাণীর এই কল্যাণী-সত্তাই ধর্মভ্রষ্ট সীতারামকে বাঁচিয়েছে! জয়ন্তী চলে যাবার পরে রাজা কিন্তু আরো রুদ্রমূর্তি ধারণ করেন। রাজকার্য পরিত্যাগ,—দেশের সাধ্বী নারীর দলন—ইত্যাদি দেখে চন্দ্রচূড়ও তাঁকে ত্যাগ ক'রে চলে যান। দেখতে-দেখতে মুসলমান সৈন্য এসে গড় ঘেরাও করে। তখন সীতারামের সংবিৎ ফেরে। গড়ের প্রায় সকলেই তখন পালিয়েছে। উনিশের পরিচ্ছেদে, চাঁদশাহ ফকিরও ব'লে গেছেন—'যে দেশে হিন্দু আছে সে দেশে আর থাকিব না। এই কথা সীতারাম শিখাইয়াছে।' সেই সময়ে সীতারাম জয়ন্তীর কাছে ক্ষমা-প্রার্থী! তখন তিনি নিজেই অস্ত্রধারণ ক'রে সম্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণের জন্যে যাত্রা করেন। নন্দা তখন মুমূর্ষু। সেই অবস্থায়—একুশের পরিচ্ছেদে, রাজার কাছে নন্দা শোনেন যে, শ্রী-ই তাঁর সেই 'পতিবিঘাতিনী স্ত্রী'! যাত্রার আগে জয়ন্তী এবং শ্রীর সঙ্গে সীতারামের দেখা হয় এবং তাঁদের মুখে ভগবদ্গীতার বাণী এবং অন্যান্য ভগবৎ-প্রসঙ্গ শুনে তাঁর মন শান্ত হয়। তাঁকে শ্রী বলেন—'আজ তোমার মৃত্যু উপস্থিত, আমি তোমার সাথে মরিতে আসিয়াছি!'

ইতিমধ্যে দুর্গে যে পঞ্চাশজন রাজপুত ছিল, যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে তারা রাজার অনুমতি প্রার্থনা ক'রতে আসে; তাদেরই সাহায্যে ব্যূহ রচনা ক'রে,—মাঝখানে মুমূর্ষু নন্দাকে এবং পুত্রকন্যাদের শিবিকা

রেখে,—রাজা এগিয়ে চলেন। সকলের আগে পদব্রজে চলেন শ্রী আর জয়ন্তী। এইভাবে যখন তাঁরা মুসলমানবাহিনী প্রায় অতিক্রম ক'রে এসেছেন, সেই সময়ে মুসলমান সেনাপতি [ছদ্মবেশী গঙ্গারাম] কামান নিয়ে তাঁদের আক্রমণ করে। শ্রী এবং জয়ন্তীর 'তোপ-জিতিয়া লইয়াছি' হাসিতে সে-আক্রমণ ব্যর্থ হয় এবং সীতারাম তাকে বধ করেন। সেই গোলন্দাজকে কেটে ফেলে, শত্রুসৈন্য ছিন্নভিন্ন ক'রে,—সীতারাম সপরিবারে নিরাপদ স্থানে চলে যান।

শত্রুসৈন্য দুর্গ লুঠ ক'রতে শুরু করে। এই ভাবে সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হয়। তারপর চব্বিশের পরিচ্ছেদে শ্রী আর জয়ন্তী এসে গঙ্গারামের শব দাহ করেন। আর, গঙ্গারাম কেন যে আবার এসেছিল,—তারও কিঞ্চিৎ ব্যাখ্যা আছে তাঁদের কথায়। বোধ হয়, রমার মৃত্যুর খবর তার জানা ছিলনা,—রমাকেই নিতে এসেছিল সে!

'রাজসিংহে'র মতন 'সীতারাম'-এর শেষ অংশে একটি 'পরিশিষ্ট' যোগ করা হয়েছে। সেটি কিন্তু অপেক্ষাকৃতঅপ্রাসঙ্গিক। তৃতীয় খণ্ডের মোট চব্বিশ পরিচ্ছেদের মধ্যেই সীতারামের রাজ্য ধ্বংস হবার বিবরণটুকু পুরোপুরি পাওয়া গেছে। 'প্রিয়-প্রাণহন্ত্রী' কথাটির মর্মার্থও সেই শেষ পরিচ্ছেদে শ্রীর মুখ থেকেই শোনা গেছে। শ্রী বলেন—'আমি তাঁহার প্রাণহন্ত্রী হই নাই —আপনার সহোদরেরই প্রাণঘাতিনী হইয়াছি। বিধিলিপি এতদিনে ফলিল।'

পরিশিষ্ট অংশে এসব কথার পুনরাবৃত্তি নেই। সেখানে শুধু সীতারামের বীরত্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের বিস্মৃতি সম্পর্কে,—কিংবদন্তীর ব্যাখ্যান সম্বন্ধে ঈষৎ কটাক্ষ আছে। শেষ খণ্ডের নবম ও সপ্তদশ পরিচ্ছেদে রামচাঁদ আর শ্যামচাঁদকে দেখা গেছে। দু'জনেই সাধারণ মানুষ। সেই দুর্যোগের দিনে তাঁরা নলডাঙ্গায় পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা ক'রেছিলেন। যুদ্ধের পরে রাজা-রানীর অবস্থা সম্বন্ধে তাঁদের মধ্যে আলাপ জমে ওঠে। রামচাঁদ বলেন,—'তুমিও যেমন! ও সব হিন্দুদের রচা কথা, উপন্যাস মাত্র।' তখন শ্যামচাঁদ জবাব দেন—'তা এটা উপন্যাস, না ওটা উপন্যাস, তার ঠিক কি? ওটা না হয় মুসলমানের রচা। তা যাক্ গিয়ে—আমরা আদার ব্যাপারী—জাহাজের খবরের কাজ কি?…'

এবং কবিতার ধারাও লক্ষ্য ক'রে গেছেন, নতুন কালের গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধাদির ধারাও তিনি পরিবর্ধিত ক'রে গেছেন। এই শেষ ক্ষেত্রে শুধু পরিবর্ধন নয়,—তাঁর ছিল প্রবর্তনার দায়িত্ব। তিনি নতুন সাহিত্যের স্রষ্টা।

১৮৫৩ থেকে ১৮৫৫র মধ্যে সংবাদ-প্রভাকরে প্রাচীন কবিদের জীবনকথা বেরিয়েছে। ১৮৬৯এ হরিমোহনের 'কবিচরিত' ছাপা হয়েছে। পুরোনো বাংলা সাহিত্যের সে-পরিচয় তিনি অগ্রাহ্য করেননি। নতুন কালকেও তিনি নতুন পথ দেখতে সাহায্য ক'রেছেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দে গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের এবং তাঁর নিজের সম্পাদনায় 'ঈশ্বর গুপ্তের কবিতা-সংগ্রহ প্রথম খণ্ড' ছাপা হয়। দীনবন্ধু মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ইত্যাদি সমকালীন কবি ও নাট্যকার সম্বন্ধে,—বিদ্যাসাগর, ভূদেব, প্যারীচাঁদ, অক্ষয়কুমার দত্ত ইত্যাদি গদ্য-লেখকদের সম্বন্ধেও তাঁর নানা উল্লেখ-আলোচনার কথা সুবিদিত। ঈশ্বর গুপ্তকে তিনিই প্রথম বলেন—'কলিকাতা শহরের কবি'। কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের অন্ধ শিষ্য ছিলেন না তিনি। ঈশ্বর গুপ্ত সম্বন্ধে হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের মন্তব্যটি স্মরণীয়। তিনি লিখে গেছেন—তাঁর কবিত্বশক্তির অনুযায়িনী বিদ্যাবত্তা থাকলে তিনি নিকৃষ্ট কবি হয়ে থাকতেন না।[২৪] ঈশ্বর গুপ্ত যদিও সংস্কৃতে অধিকারী ছিলেন, ইংরেজিতে তাঁর বিদ্যাবত্তার নির্ভরযোগ্য সমর্থন নেই। বঙ্কিম তাঁর গুরুর বাঙালীয়ানার সঙ্গে নতুন কালের বিশ্বসংস্কৃতিচেতনা যোগ ক'রে নিজের ব্যক্তিত্বের বিপুলতর অধিকার দেখিয়ে গেছেন।

বঙ্কিম যখন বালক,—মিশনারীদের উদ্যোগে,—দেশীয় লোকদের ছলে-বলে খ্রীষ্টানধর্মে দীক্ষিত করবার অপচেষ্টার বিরুদ্ধে দেশে তখনই আন্দোলন হয়ে গেছে। সে ১৮৪৫-এর কথা। সস্ত্রীক উমেশ সরকারকে সে-সময়ে খ্রীষ্টান করা হয়। তারই বিরুদ্ধে ১৭৬৭ শকের জ্যৈষ্ঠের 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবন্ধ ছাপা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের হিন্দু-ঐতিহ্য সম্পর্কিত যাবতীয় গবেষণার সঙ্গে তাঁর পারিপার্শ্বিক এইসব অল্লাধিক দংশন ও তৎপ্রতিরোধ-ব্যবস্থার যোগ যে স্বীকার্য, তাতে সন্দেহ নেই। দেবেন্দ্রনাথ, ঈশ্বর গুপ্ত এবং বঙ্কিমচন্দ্র—তিন জনের একজনও বিধবা-বিবাহে পূর্ণ-উৎসাহী ছিলেন না। সিপাহী-যুদ্ধ সম্বন্ধে হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ঈশ্বর

২৪। 'কবিচরিত': হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা ১৭৬ দ্রষ্টব্য।

গুপ্ত, কিশোরীচাঁদ মিত্র, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্রও ইংরেজের বিরোধী মন্তব্য রেখে যান নি, বরং এঁদের কেউ কেউ কটাক্ষ-সংযোগে সিপাহী-পক্ষের সাময়িক উত্তেজনার কথাই চিহ্নিত ক'রে গেছেন। আনন্দ মঠের প্রথম 'বিজ্ঞাপনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন—'সমাজ-বিপ্লব অনেক সময়েই আত্মপীড়ন মাত্র। বিদ্রোহীরা আত্মঘাতী। ইংরেজরা বাংলাদেশ অরাজকতা হইতে উদ্ধার করিয়াছেন।' সমুচিত ইতিহাস অনুশীলনের দায়িত্ব সম্বন্ধে দেশবাসীকে তিনি বার বার সতর্ক ক'রে গেছেন।

১৮৫৭তে প্রকাশিত নীলমণি বসাকের 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' সেকালের একখানি স্মরণীয় বই। যথার্থ ইতিহাস-সন্ধিৎসু মন দিয়ে লেখা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহের' লেখাগুলিরই অনুযায়ী সে-বই! রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের 'প্রথম শিক্ষা বাঙ্গালার ইতিহাস'-এর আলোচনাসূত্রে বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয়, সেই ধারাতেই ১২৮১র মাঘের 'বঙ্গদর্শনে' লেখেন—'মার্শম্যান, স্টুয়ার্ট প্রভৃতির প্রণীত পুস্তকগুলিকে আমরা সাধ করিয়া ইতিহাস বলি, সে কেবল সাধ পূরণ মাত্র।' আবার, বঙ্গদর্শনে ১৩০৯ সালের ভাদ্র সংখ্যায় 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ সেই ধারাতেই ভারতবর্ষের যথার্থ ব্যাপক, জটিল, উত্থান-পতনময় অন্তর-ইতিহাসের অনুসন্ধান জাগিয়ে তোলবার পরামর্শ দেন। একালে, অধ্যাপক নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' বইখানির পরিকল্পনায় সেই দৃষ্টিরই অনুধ্যান মেনেছেন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর 'হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি' লেখবার প্রেরণা পান রাজেন্দ্রলালের সেই অনুশীলন থেকেই।[২৫] যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণের 'আর্যদর্শন' ছিল বঙ্গদর্শনেরই অনুসরণজাত পত্রিকা। তাতে প্রকাশিত জন স্টুয়ার্ট মিল সম্পর্কিত লেখাগুলি প্রফুল্লচন্দ্রের মনে লেগেছিল। ভারতের ভবিষ্যৎ ভাগ্য-নিয়ন্ত্রণে জড়-বিজ্ঞানের স্থান সম্বন্ধে 'আনন্দমঠে'র উক্তি তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে লক্ষ্য ক'রে গেছেন।[২৬] বিজ্ঞান আলোচনায় দেশীয়দের মধ্যে অক্ষয়কুমার দত্ত যে পথ দেখিয়েছিলেন, বঙ্কিম ছিলেন সেই ধারারই সক্রিয় অনুবর্তী। দেশ, সমাজ, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে তাঁর সদাজাগ্রত অধ্যবসায়ী মনের সঞ্চয় তাঁর নিত্যজাগ্রত বিবেক-বুদ্ধির কষ্টিতে ফেলে তিনি যাচাই ক'রে নিয়েছিলেন। সাহিত্য-রচনা

২৫। Autobiography [১৯৫৮] পৃষ্ঠা ২৮-২৯ দ্রষ্টব্য।

২৬। ঐ পৃষ্ঠা ১১৪ দ্রষ্টব্য।

সাহিত্যিকের এই তথ্য-সঞ্চয় এবং তথ্য-বিচারে যেমন আশ্রিত, তেমনি তাঁর হৃদয়-বোধেরও মুখাপেক্ষী। 'ভালবাসার অত্যাচার' প্রবন্ধে বঙ্কিম তাঁর হৃদয়বোধের সেই গূঢ় দিকটির ইশারা দিয়ে গেছেন। তাতে তাঁর ধর্মবোধের দিক আর মানবিক হৃদয়ানুরাগের দিক, দুটিরই অন্বয়-সন্ধানের ঔচিত্য উচ্চারিত হয়। স্বর্গত মণীন্দ্রমোহন বসু 'কৃষ্ণকান্তের উইল'এর আলোচনাসূত্রে সেই উক্তিটি স্মরণ ক'রেছিলেন।[২৭] সে-প্রবন্ধে বঙ্কিম জানান —'মনুষ্যগণ কার্যতঃ স্নেহকে ধর্ম হইতে পৃথগ্‌ভূত রাখিয়াছে। এইজন্য ভালবাসার অত্যাচার নিবারণ জন্য ধর্মের দ্বারা স্নেহের শাসন অত্যাবশ্যক।'[২৮] রাজসিংহ, সীতারাম, আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী—শেষ পর্বের এই উপন্যাসগুলিতে একযোগে বঙ্কিমের এই তথ্যবোধ, ধর্মবোধ, হৃদয়বোধের কথাই বিবেচনার যোগ্য। আগের পর্বে তিনি যে অন্য কোনো ধর্মবোধ বা অন্য কোনো বিবেকবোধ দেখিয়ে গেছেন, তা নয়। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ তাঁর যে-ধর্মচেতনা, পরের এইসব উপন্যাসেও সেই ধর্মচেতনারই নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতা চোখে পড়ে। তবে, শেষ পর্বে তা' আরো একমুখী উৎসাহে ব্যক্ত হয়েছে।

তিনি ছিলেন বুদ্ধিবাদী এবং অদৃষ্ট-সচেতন মানুষ! রোহিণী-গোবিন্দলালের কথা-প্রসঙ্গে শশাঙ্কমোহন তাঁর 'বাণী মন্দির'-এ সেই 'অদৃষ্টের অরুন্তুদ পরিহাস' স্মরণ করেন।[২৯] জলমগ্ন রোহিণীকে উদ্ধার ক'রে কৃত্রিম উপায়ে তার শ্বাসসঞ্চারের চেষ্টায় উদ্যত হয়ে গোবিন্দলালকে পুনরপি যে মোহ-মদিরা পান ক'রতে হয়েছিল,—তাতেই গোবিন্দলালের 'মহামৃত্যু' ঘটে! সেই ঘটনার সঙ্গে তিনি 'রোমিও জুলিয়েটে'র অনন্ত তৃষ্ণাময় মৃত্যু-চুম্বনের তুলনা ক'রে; লিখেছেন—'স্কট, হুগো অথবা টল্‌স্টয়ের বাহিরে নবেল-সাহিত্য কদাচিৎ এরূপ মহাসম্মিলন সমাধা করিতে পারিয়াছে।'

সমাজে এবং ব্যক্তি-জীবনে কখনো কখনো অন্যায় ঘটনা ঘটা মোটেই অপ্রত্যাশিত নয়। প্রবৃত্তির বিধ্বংসী রূপ বঙ্কিমও দেখিয়ে গেছেন। কিন্তু জীবনে প্রবৃত্তির অন্যায় দংশন তিনি মৃদুভাবে দেখান নি, কমনীয়ভাবে স্পর্শ ক'রেই তা পরিহার করেন নি; তিনি তা তীব্রভাবেই তিরস্কার

২৭। 'কৃষ্ণকান্তের উইল' [১৯৫১], পৃষ্ঠা ১৮০ দ্রষ্টব্য।

২৮। এই গ্রন্থের ৪৯৯ পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

২৯। 'বাণী-মন্দির' ১৯২৮ ; পৃষ্ঠা ২০৩-২০৪।

ক'রে গেছেন। সেই দিকটি দেখাতে গিয়েই শশাঙ্কমোহন 'কৃষ্ণকান্তের উইল' আর রবীন্দ্রনাথের 'চোখের বালি', 'ঘরে বাইরের' ঈষৎ আলোচনা করেন।[৩০] বিষবৃক্ষে কুন্দনন্দিনীর কোমল স্বভাব লক্ষ্য ক'রে তিনি বলেন যে, সে আমাদের স্নেহ-সহানুভূতির যোগ্য বলেই তার সম্বন্ধে অদৃষ্টের প্রহার অতি মর্মান্তিক মনে হয়! 'কপালকুণ্ডলা'য় অদৃষ্টের প্রহার কতকটা গ্রীক আদর্শের স্মারক বটে,—কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' ক্রুর অদৃষ্ট 'শিল্পের রসনীতির তরফে একেবারে বেমানান'! শৈবলিনীর প্রায়শ্চিত্তও তাঁর মতে ঠিক কুন্দনন্দিনীর যন্ত্রণার মতন অসংগত নয়, কারণ শৈবলিনীও 'কুলটাবুদ্ধি'। নিজের এ-বিশ্বাস তিনি সূত্রাকারে জানিয়েছেন—'জবাবদায়ী ('*Responsible*') পাপই প্রকৃত প্রস্তাবে শিল্প-সাহিত্যের বিষয় হইতে পারে।[৩১]

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছিলেন যে, 'আনন্দমঠ' 'দেবীচৌধুরাণী' আর 'সীতারাম',—এই তিনখানি উপন্যাসে বঙ্কিম—'বাঙালীর প্রকৃতির আধারে···সমষ্টি, ব্যষ্টি এবং সমন্বয়ের অনুশীলন-পদ্ধতি পরিস্ফুট'—ক'রে গেছেন। সন্ন্যাসী-নিয়ন্ত্রিত জনকল্যাণের আয়োজন এই তিনখানি উপন্যাসেই প্রতিফলিত। 'দেবী চৌধুরাণী'তে ব্যক্তিগত সাধনার দিক,—'আনন্দমঠে' দুর্যোগের তাড়নায় সমষ্টির ব্যাপক জাগরণ,—এবং 'সীতারাম'-এ 'সমাজ ও সাধকের' সম্মিলনে রাষ্ট্রের গঠন-সম্ভাবনা দেখানো হয়েছে ব'লেই তিনিই বিশ্বাস করতেন। এ চিন্তা পাঁচকড়ির চিন্তা। বঙ্কিমচন্দ্র নিজে বলে গেছেন —এগুলি তাঁর আদর্শ প্রচারের বাহক! এইবার সেই আদর্শ প্রচারের দ্বিতীয় বই 'আনন্দমঠে'র কথা।

'আনন্দমঠ'-এর মোট চারটি খণ্ডের আদিতেই, একটি 'উপক্রমণিকা' আছে। তাতেই মহৎ আদর্শের সংকেত দেওয়া হয়েছে। মানুষের মনস্কাম সিদ্ধির একমাত্র পথ, ভক্তি! ভক্তি আর কর্মের যোগই দেশোদ্ধারের নির্ভরযোগ্য অবলম্বন। দেশের ব্রাহ্ম, হিন্দু, নব্যহিন্দু ইত্যাদি বিভিন্ন

৩০। 'কৃষ্ণকান্তের উইলে রোহিণী গোবিন্দলালের ব্যভিচার এমনভাবে সংকেতিত এবং অঙ্কিত হইয়াছে যে চিত্তাকর্ষক হইয়া উহার সঙ্গে পাঠকের প্রীতি সহানুভূতি ঘটিবার অবকাশ ঘটে না।'—ঐ পৃষ্ঠা ২৬০ দ্রষ্টব্য।

৩১। ঐ, পৃষ্ঠা ৩০৪-৫ দ্রষ্টব্য।

সাধকের চিন্তা থেকে,—আর পাশ্চাত্য বিভিন্ন মতবাদ থেকে বঙ্কিম তাঁর এই প্রচারযোগ্য মতটি পেয়েছিলেন। মনে পড়ে, সুরেন্দ্রনাথের 'A Nation in Making'ও সেই পর্বের চিন্তা!

'আনন্দমঠে'র প্রথম পরিচ্ছেদে দেখা যায়—এগারোশ' ছিয়াত্তরের মন্বন্তরে পদচিহ্ন গ্রাম জনশূন্য! ধনী-দরিদ্রের তখন সমান অবস্থা। বাঁচবার অন্য কোনো উপায় না দেখে, মহেন্দ্র এবং কল্যাণী নিজেদের শিশু-কন্যাকে নিয়ে শহরের দিকে যাত্রা করেন। সন্ধ্যার আগেই তাঁরা এক চটিতে পৌঁছে যান। স্ত্রীকে এবং শিশু-কন্যাটিকে সেখানে রেখে, মহেন্দ্র সেই মেয়ের জন্যে দুধ সংগ্রহ ক'রতে যান। সেই তৃতীয় পরিচ্ছেদেই, ক্ষুধার্ত দস্যুদল মা-মেয়েকে হরণ ক'রে এক বনে নিয়ে যায়। সেই অরণ্যের দৃশ্যটি 'মনোহর' বটে,—কিন্তু ঘটনার দিকেই বেশি মনোযোগী হওয়ায় বঙ্কিমের স্বভাবসুলভ বর্ণনার ঝোঁক চোখে পড়ে না সেখানে। ক্ষুধার্ত দস্যুরা অলঙ্কার ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে, দলপতিকে হত্যা ক'রে 'জয় কালী' ধ্বনির সঙ্গে সামনে এসে দাঁড়ায়!—'বিশীর্ণদেহ কৃষ্ণকায় প্রেতবৎ মূর্তিসকল অন্ধকারে খল-খল হাস্য করিয়া, করতালি দিয়া নাচিতে আরম্ভ করিল'! সেই অবকাশ মেয়েটিকে নিয়ে কল্যাণী পালিয়ে যায়! পরিচ্ছেদের শেষ দুটি বাক্যে দেখা যায়—'শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া মার মার শব্দ করিয়া, সেই প্রেতমূর্তি দস্যুদল চারিদিকে ছুটিল। অবস্থা বিশেষে মনুষ্য হিংস্র জন্তু মাত্র।' চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে সেই বনভূমিই ঘটনাধারার দৃশ্যপট। রাত্রে, অন্ধকার বনে কাঁটায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে মা তাঁর মেয়েটিকে নিয়ে প্রাণভয়ে পালিয়ে যাচ্ছেন! দস্যুদল তাঁদের অনুসন্ধানরত। আকাশে চাঁদ ওঠে। 'বনের অন্ধকার আলোতে ভিজিয়া উঠিল'! মেয়েটির কান্না শুনে দস্যুরা চারিদিক থেকে ছুটে আসে। তখন নিরুপায় কল্যাণী একটি গাছের নিচে ব'সে প'ড়ে মধুসূদন স্মরণ করেন:

> 'সেই সময়ে ভয়ে, ভক্তির প্রগাঢ়তায়, ক্ষুধা-তৃষ্ণার অবসাদে,
> কল্যাণী ক্রমে বাহ্যজ্ঞানশূন্য, আভ্যন্তরিক চৈতন্যময় হইয়া শুনিতে লাগিলেন, অন্তরীক্ষে স্বর্গীয় স্বরে গীত হইতেছে—
>
> হরে মুরারে মধুকৈটভারে।
> গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
> হরে মুরারে মধুকৈটভারে।'

কল্যাণী চোখ খুলেই দেখেন তাঁর সামনে এক—'শুভ্রশরীর, শুভ্রকেশ, শুভ্রশ্মশ্রু, শুভ্রবসন ঋষিমূর্তি'! সেই ঋষিমূর্তিকে প্রণাম করেন তিনি। তারপর তাঁর সংজ্ঞা লুপ্ত হয়।

কল্যাণী যে 'মহেন্দ্রের পত্নী',—এই 'মহাপুরুষ' ব্রহ্মচারী সে-পরিচয় জেনে, —তাঁদের মঠে রেখে, মহেন্দ্রের সন্ধানে বেরিয়ে যান। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নায় আলোকিত সেই বনস্থলীর বর্ণনা! বিস্তীর্ণ মাঠের মধ্য দিয়ে মুর্শিদাবাদ-কলকাতার পথ চলে গেছে। পথের ধারে কালো পাথরের ছোট একটি পাহাড়। সেই পাহাড়ে উঠে, নিচের জঙ্গল দেখে নিয়ে, সেই বনে প্রবেশ ক'রে, ব্রহ্মচারী দুশ' লোকের নির্বাক এক সমাবেশ দেখতে পান— 'মানুষ সকল দীর্ঘাকার, কৃষ্ণকায়, সশস্ত্র, বিটপবিচ্ছেদ-নিপতিত জ্যোৎস্নায় তাহাদের মার্জিত আয়ুধসকল জ্বলিতেছে'। সেই লোকগুলির মধ্য থেকে ব্রহ্মচারী ইঙ্গিতে যাকে কাছে ডাকেন, সে—'যুবা পুরুষ—ঘনকৃষ্ণ গুম্ফ শ্মশ্রুতে তাহার চন্দ্রবদন আবৃত,—সে বলিষ্ঠকায় অতি সুন্দর পুরুষ',—তার পরিধানে গৈরিক বসন! ভবানন্দের এই প্রথম প্রবেশ!

ভবানন্দকে মহেন্দ্রের অনুসন্ধানের ভার দিয়ে ব্রহ্মচারী অন্যত্র চলে যান। সপ্তম থেকে পর পর তিনটি পরিচ্ছেদে অতঃপর ইংরেজের খাজনার গাড়ি লুট করবার বিবরণ। এই গাড়ির রক্ষকরা পথে মহেন্দ্রকে দেখতে পেয়ে, তাঁকে ডাকাত মনে ক'রে ধ'রে নিয়ে যাচ্ছিল। ভবানন্দ তখন মহেন্দ্রের অনুসন্ধানে চ'লেছিলেন। ডাকাতরা তাঁকেও ধরে নিয়ে যায়। খাজনার গাড়ি লুট হয়ে যাবার পরে, ভবানন্দের অনুরোধে মহেন্দ্র নিজের স্ত্রী-কন্যাকে দেখতে যান।

সপ্তমে মহেন্দ্র,—এবং অষ্টমে ভবানন্দ,—দুজনকেই ডাকাত সন্দেহে ধরা পড়তে দেখা গেছে। সপ্তম পরিচ্ছেদে বঙ্কিম তখনকার ইংরেজ-মুসলমান দুই শক্তির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যথার্থ সম্পর্কের কথা জানিয়েছেন:

> '১১৭৬ সালে বাংলা প্রদেশ ইংরেজদের শাসনাধীন হয় নাই। ইংরেজ তখন বাংলার দেওয়ান। তাঁহারা খাজনার টাকা আদায় করিয়া লন, কিন্তু তখনও বাঙালীর প্রাণ সম্পত্তি প্রভৃতি রক্ষণা বেক্ষণের ভার লয়েন নাই। তখন টাকা লইবার ভার ইংরেজদের

আর প্রাণ সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণের ভার পাপিষ্ঠ, নরাধম, বিশ্বাস-হন্তা, মনুষ্যকুলকলঙ্ক মীরজাফরের উপর। মীরজাফর আত্মরক্ষায় অক্ষম, বাঙ্গালা রক্ষা করিবে কি প্রকারে? মীরজাফর গুলি খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় করে ও ডেস্‌প্যাচ্ লেখে। বাঙালী কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।'

সেই দুর্ভিক্ষ আর দস্যুভয়ের আবহাওয়ায় পঞ্চাশজন সশস্ত্র সিপাহীর সঙ্গে এক সাহেব অধ্যক্ষের তত্ত্বাবধানে কলকাতায় টাকা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। গেরুয়াবসন সন্ন্যাসীও তখন ডাকাত! ভবানন্দও সেই রকম সন্ন্যাসী। তিনিও সন্দেহে ধরা পড়েন। বন্দী মহেন্দ্রের সঙ্গে একই গাড়িতে যেতে-যেতে ভবানন্দই গাড়ির চাকায় হাতের বাঁধন ঘষে-ঘষে দড়ি কেটে ফেলবার পরামর্শ দেন। দস্যুদল যখন সত্যিই গাড়ি আক্রমণ করে, তখন সেই 'গোরা অধ্যক্ষ' এসে বন্দুক তুলে ধরবার আদেশ দেয়। বঙ্কিম ইংরেজ চরিত্রের বিশেষত্ব দেখিয়েছেন সেই প্রসঙ্গে—'ইংরেজের নেশা বিপদের সময় থাকেনা।' নেশা কেটেছিল বটে,—কিন্তু সেই সাহেব নিহত হয়। জীবানন্দ সেই দৃশ্যেই প্রথম দেখা দেন। ভবানন্দ এবং জীবানন্দ পরস্পরকে আলিঙ্গন করেন এই অষ্টম পরিচ্ছেদের শেষে। নবমে, ভবানন্দ মহেন্দ্রকে বলেন—'অস্ত্র হাতে করিয়া তফাৎ রহিলে—জমিদারের ছেলে, দুধ-ঘির শ্রাদ্ধ করিতে মজবুত—কাজের বেলা হনুমান!'

অতঃপর সেই চন্দ্রালোকিত রাত্রে ভবানন্দ আর মহেন্দ্র দুজনকে হাঁটতে দেখা যায়। ভবানন্দ তখন 'হাস্যমুখ, বাগ্মী, প্রিয়সম্ভাষী; মহেন্দ্র 'নীরব, শোককাতর গর্বিত কিছু কৌতূহলী।' ভবানন্দ গেয়েছেন:

বন্দে মাতরম্
সুজলাং সুফলাং মলয়জশীতলাম্
শস্যশ্যামলাং মাতরম্
শুভ্র জ্যোৎস্না পুলকিত যামিনীম্
ফুল্লকুসুমিত দ্রুমদলশোভিনীম্
সুহাসিনীং সুমধুরভাষিণীম্
সুখদাং বরদাং মাতরম্।...

এই গান শুনে,—এবং গানের সঙ্গে সঙ্গে ভবানন্দকে কাঁদতে দেখে,

মহেন্দ্র প্রশ্ন করেন—'তোমরা কারা?' ভবানন্দ বলেন—'আমরা সন্তান'। ইংরেজ রাজত্বের বিরুদ্ধে সন্তানদের এই বিদ্রোহে বিস্মিত মহেন্দ্রকে ভবানন্দ বলেন—'যে রাজা রাজ্যপালন করে না, সে আবার রাজা কি?' মহেন্দ্র আবার প্রশ্ন করেন—ইংরেজ শক্তিকে কি দু'একজন মাত্র দুঃসাহসীর বলেই বিতাড়িত করা সম্ভব?—'তুমি একা তাড়াবে?' এ-কথার উত্তরে ভবানন্দ আবার গান করেন:

'সপ্তকোটিকণ্ঠ কলকল নিনাদকরালে
দ্বিসপ্তকোটিভুজৈর্ধৃতখরকরবালে
অবলা কেন মা এত বলে।'

তবু মহেন্দ্রের সন্দেহ যায় না! বলেন, ইংরেজ আর বাঙালীর মধ্যে সমকক্ষতা কোথায়? ভবানন্দ সন্তানদের সাহসের কথা বলেন। বলেন—'গুণ গাছ থেকে পড়ে না। অভ্যাস করিতে হয়।'

এই অভ্যাসের উপযোগিতা সম্বন্ধে মন্তব্য শুনে, আবার মনে পড়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলনধর্মের উপন্যাস-রূপ এই 'আনন্দমঠ'! সন্তানরা ছিলেন সত্যার্থী। তাঁরা জানতেন যে, মায়ার সংসারে সম্পূর্ণ মায়া কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রতরক্ষার পথেই মায়া ক্ষীণ হয়ে আসুক,—এই তাঁদের আদর্শ। ভবানন্দ বলেন—'সন্তানকে মিথ্যা কথা কহিতে নাই—তোমার কাছে মিথ্যা বড়াই করিব না।...আমরা মায়া কাটাই না—আমরা ব্রত রক্ষা করি। তুমি সন্তান হইবে?'

মহেন্দ্র তখনো স্ত্রী-কন্যা পরিত্যাগ ক'রে ব্রতচারী হতে নারাজ। কিন্তু ভবানন্দের সঙ্গে রাস্তা চ'লতে-চ'লতে 'বন্দেমাতরম্' সংগীতে যোগ দিয়ে, তাঁরও চোখে জল আসে!

একাদশ পরিচ্ছেদে, 'আনন্দমঠের' আদর্শের রূপটি ভাস্বর হয়ে আছে। যেমন নবম পরিচ্ছেদে অংশে অংশে 'বন্দেমাতরম্' গানটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তেমনি এই এগারোর পরিচ্ছেদে দেখা যায় মাতৃমূর্তির রূপ-রূপান্তর! ব্রহ্মচারী সকালে, মহেন্দ্রকে নিয়ে সত্যানন্দ ঠাকুরের কাছে পৌঁছোন। সন্ধ্যাহ্নিক শেষ ক'রে সত্যানন্দ সুড়ঙ্গপথে তাঁকে নিয়ে দেশমাতৃকার তিনটি প্রতিমা দেখান—সর্বাঙ্গসম্পূর্ণা, সালঙ্কারা জগদ্ধাত্রীমূর্তি—মা যা ছিলেন; অন্ধকারসমাচ্ছন্না, কালিমাময়ী' হৃতসর্বস্বা কালী,—মা যা হয়েছেন; আর

সুবর্ণপ্রতিমা দশভুজা—মা যা হবেন। মহেন্দ্র এও শোনেন যে, দেশের সন্তান দেশজননীকে 'মা' ব'লে ডাকলেই মায়ের এই গৌরবময় ভবিষ্যৎ দেখা দেবে। নিজের স্ত্রী-কন্যার কথা মনে আসে। বলেন—'তাহাদের একবারমাত্র আমি দেখিয়া বিদায় দিব।' কারণ, মহেন্দ্র মহামন্ত্র গ্রহণ ক'রবেন। সত্যানন্দ তাঁকে পরে চিন্তা ক'রে সেই ব্রত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে ব'লে, তাঁকে সুড়ঙ্গের বাইরে বিষ্ণুমণ্ডপে রেখে আসেন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, মহেন্দ্রের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর এবং কন্যার দেখা হয়। তাঁরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবার সংকল্প করেন। ইতিমধ্যে কল্যাণীর সঙ্গে যে বিষের কৌটো ছিল, শিশুকন্যা সেই বিষ মুখে দেয়। শিশুর মুখ থেকে বিষ বার ক'রে কল্যাণী সে-বিষ নিজে খেয়ে ফেলেন।

এ-পরিণাম অপ্রত্যাশিত। অসাধারণ ঘটনাচক্র, অসাধারণ পরিমণ্ডল, অসাধারণ তখনকার এই যুগসন্ধি। বিষক্রিয়ায় মোহাচ্ছন্ন হয়ে কল্যাণী গান শুনতে পান,—গান গেয়ে ওঠেন তিনি—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে'। কিছুক্ষণ পরে তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে যায়। তখন সত্যানন্দ এসে মহেন্দ্রকে কোলে নিয়ে বসেন।

আনন্দমঠে 'বন্দেমাতরম্',—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে' ইত্যাদি সংস্কৃত শব্দপ্রবাহের এই আয়োজনের দিকটি একটু দেখে নেওয়া দরকার। তাই কাহিনীর ধারা থেকে সরে দাঁড়িয়ে, বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের ভাষা-প্রকৃতির দিকটি এখানে সংক্ষেপে দেখা যাক্।

তাঁর ভাষার প্রকৃতি সর্বত্র একরকম নয়। বিষয় এবং উদ্দেশ্য হিসেবে,—লেখকের আবেগ, সংকল্প ইত্যাদির বিভিন্নতা অনুসারেই ভাষারীতির নানা বিচিত্রতা দেখা দিয়ে থাকে। তাঁর ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা-রীতি সম্বন্ধে অনেকের অনেক আলোচনার মূল কথাটি অধ্যাপক শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ১৯৪৯এর একটি সুলিখিত 'ভূমিকা'য় সংক্ষেপে জানিয়েছেন। অজরচন্দ্র সরকার তাঁর 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা' নামে এক পুস্তিকায় প্রধানতঃ রমণীর রূপ-বর্ণনার নমুনা তুলে তুলে বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা-বিবর্তনের আলোচনা করেন। সে-আলোচনার ভূমিকায় অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় জানান—'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা·· প্রথম স্তরের সংস্কৃত-ঘেঁষা অতিরিক্ত গুরুগাম্ভীর্য পরিহার করিয়া ক্রমশঃ সহজ সরল দেশী ভাষার বহুলতর প্রয়োগের দিকে অগ্রসর হইয়াছে···।'[৩২] বঙ্কিম-শিষ্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার এই

৩২। 'বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষা' [কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৯] 'ভূমিকা', পৃষ্ঠা ৫০ দ্রষ্টব্য।

অজয়চন্দ্রের পিতা। পুত্র অজয়চন্দ্র গভীর অনুরাগের সঙ্গেই তাঁর এই বিশ্লেষণে উদ্ধৃতি-নির্বাচনে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। সে-সামর্থ্যের প্রশংসা ক'রে শ্রীকুমারবাবু এই সংগত কথাটিও জানিয়েছেন :

> 'ভাষায় পরিবর্তন বুঝাইতে সমজাতীয় বিষয়ের মধ্যে তুলনা করাই সমীচীন—রূপ-বর্ণনা ও সাহিত্যরস-বিশ্লেষণ বা যুক্তি শৃঙ্খলা-সংযোজন ঠিক একরূপ ভাষার দাবী করে না।…উদ্দেশ্যের পার্থক্যের দ্বারাও ভাষার পার্থক্য নির্ণীত হয়। সামাজিক জীবনের নায়িকা ও ইতিহাসের নায়িকার রূপ-বর্ণনায় বর্ণপ্রলেপের তারতম্য থাকিবেই। গার্হস্থ্য পরিবেশে ভাব-সৌকুমার্যের স্ফুরণ ও ঐতিহাসিক পরিমণ্ডলে চোখ-ঝলসান দীপ্তি ও উদাত্ত মহিমার দ্যোতনাই বিশেষভাবে লেখকের লক্ষ্য হইবে। আমার সেইজন্য মনে হয় যে, বিষবৃক্ষ ও কৃষ্ণকান্তের উইল হইতেই বঙ্কিমের ভাষার নিগূঢ় পরিবর্তনের সূচনা।'

রোমান্স রাজ্যের নায়িকাদের সমারোহ-ঔচিত্য রক্ষা ক'রে,—দুর্গেশ-নন্দিনীর তিলোত্তমা-আয়েষা-বিমলার রূপবর্ণনায় সংস্কৃতবহুল ভাষায়, দীর্ঘায়তন সন্ধি-সমাসের সাহায্যে বঙ্কিম 'রূপের সমগ্রতা ও অন্তরের প্রতি-ফলন' ব্যক্ত ক'রেছেন। 'কপালকুণ্ডলা'য়—কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি উভয়েই অসাধারণ! সেখানকার ভাষায়—প্রকৃতি-বর্ণনায়, রূপ-বর্ণনায় একই 'সাগর কল্লোল' এবং 'গোধূলির রহস্যময় অস্পষ্টতা' অনুভব ক'রেছেন তিনি। রূপ-বর্ণনার যোগ্য উপাদান-চয়নের ফলে, 'মৃণালিনী'তে 'মনোরমার রহস্যময় দ্বৈত প্রকৃতির' বিশেষত্ব ভাষাতেও নিপুণভাবে ব্যক্ত হ'য়েছে। কিন্তু 'বিষবৃক্ষে' কুন্দনন্দিনী রোমান্সের নায়িকা নন,—'তাহার রূপবর্ণনায় শব্দ বা উপমার আড়ম্বর নাই, বা সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের ঐতিহ্যানুবর্তন নাই।' এখানকার এই ভাষায় শ্রীকুমারবাবু ভাবোচ্ছ্বাসের প্রশান্তি এবং মিতভাষিতা লক্ষ্য ক'রেছেন এবং গার্হস্থ্য জীবনে অধিষ্ঠিত সমস্ত নায়িকা বর্ণনাতেই বঙ্কিমের এই বিশেষত্ব চিহ্নিত ক'রেছেন। আবার তাঁরই কথায় :

> 'কমলাকান্তের মনোহারিণী যুবতীর বর্ণনায় পরিহাস-রসিকতা ও খামখেয়ালী ভাবই নিয়ন্ত্রী শক্তি; কাব্যোচ্ছ্বাস ব্যঙ্গাত্মক মনোভাবের দ্বারা উপহসিত হইয়াছে। যুবতীর কটাক্ষেপে পাঁজরের হাড়ভাঙ্গার অনুভূতি বর্ণনাটিকে যেন হাস্যরসের স্তরে

নামাইবার উদ্দেশ্যেই প্রযুক্ত। এখানে সহজ শব্দপ্রয়োগ ও সংস্কৃত-রীতি বর্জনের পিছনে এই পরিহাসকুশল মনোভাবই ক্রিয়াশীল।'

'চন্দ্রশেখরে' শৈবলিনীর বর্ণনা—তাঁর মতে—'অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যসৃষ্টি-কুশলতার পরিচয়'। শৈবলিনী গ্রাম্য বালিকা। তার দারিদ্র্য সুপ্রতিষ্ঠিত। সে রূপ-বর্ণনায় আর-একভাবে বঙ্কিমচন্দ্রের ঔচিত্যবোধের পরিচয় দেখা গেছে। শ্রীকুমারবাবু অতি সুন্দর মন্তব্য ক'রেছেন—'তাহার সুষুপ্তি-সুস্থির রূপ তপোভঙ্গের এক বিরল মুহূর্তে তাহার উদাসীন স্বামীর অতর্কিত দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে।' 'রজনীতে' লবঙ্গলতার বর্ণনায় বৈষ্ণব পদাবলীর বয়ঃসন্ধি-বর্ণনার প্রভাব!—'কিশোরীর সহিত যুবতীর সৌন্দর্যের ও সৌন্দর্যানুভূতির পার্থক্যটিই ইহার বিশেষ বর্ণনীয় বস্তু।' রোহিণীর রূপের প্রধান কথা তার 'লীলাচঞ্চল নৃত্যশীল গতিচ্ছন্দ'। শ্রীকুমার বাবুর সে-বিশ্লেষণও স্বর্ণাক্ষরে সংরক্ষণযোগ্য :

> 'বঙ্কিমের ভাষা কিরূপ অভ্রান্ত শিল্পজ্ঞানের সহিত সরল ও গুরুগম্ভীর শব্দাবলীর সমন্বয়-সাধন করিতে পারে তাহা এই বর্ণনাতেই চমৎকারভাবে উদাহৃত হইয়াছে। 'অধরে পানের রাগ, হাতে বালা, ফিতেপেড়ে-ধুতিপরা, আর কাঁধের উপর'—লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমের অবদমিত কবি-প্রতিভা, তাঁহার ব্যঞ্জনার ঔচিত্যবোধে জাগ্রত হইয়া উঠিল, এবং তিনি বাক্যটিকে শেষ করিলেন অসাধারণ শব্দাড়ম্বর ও ধ্বনিগাম্ভীর্যের মধ্যে—চারু-বিনির্মিতা, কালভুজঙ্গিনীতুল্যা, কুণ্ডলীকৃতা, লোলায়মানা, মনো-মোহিনী কবরী।' প্রতিভাবানের ভাষা যে নামতার ছক ধরিয়া চলে না, ইহা তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত।'

দেবী চৌধুরাণীতে—'রাজমহিমার সঙ্গে উদ্বেলপ্রায় প্রণয়-বেদনার অপূর্ব সমন্বয় ভাষার সাংকেতিকতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে—দেবীর জীবন-সমস্যার সংক্ষিপ্তসার তাহার এই রূপ-বর্ণনায় ব্যঞ্জিত হইয়াছে।' 'সীতারামে' সীতারাম রাজা এবং গৃহস্থ, দুই-ই। তাঁর এই দুই জীবনের বিপর্যয় সেখানে! রমা 'গার্হস্থ্য জীবনের ম্লান প্রদীপ',—শ্রী 'অনধিগম্য আদর্শলোকের বিভ্রান্তকারী তড়িৎ-ছটা'। ভাষাও দুই ক্ষেত্রে দু'রকম।'

সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের কথা ভেবে দেখলে একথাও মানতে হয় যে, তাঁর ভাষাগত বৈচিত্র্য একরকমও নয়, দু'রকমও নয়,—বিষয় এবং অভিপ্রায়ের বিভিন্নতা অনুসারে তা বহুবিধ। ১২৮৫ সালের জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গদর্শনে' 'বাঙ্গালা ভাষা' নামে তাঁর যে লেখাটি প্রকাশিত হয়, তাতে তিনি 'সাধু' আর 'কথিত'—দুই রূপেরই উল্লেখ করেন। ইংরেজি-শিক্ষিত টেকচাঁদ ঠাকুরই যে সেকালের অন্ধ সংস্কৃতানুকারিতার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে,—কথোপকথনের ভাষাকে সাহিত্যে মর্যাদা দেন, সে-বৃত্তান্ত সে-প্রবন্ধে সসম্মানে স্বীকৃত হয়।

রামগতি ন্যায়রত্নকে তিনি যে 'সংস্কৃতবাদী সম্প্রদায়ের মুখপাত্র' ধরেন, তার একটি বিশেষ কারণ ছিল। সেকালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই যথার্থ সংস্কৃত-শিক্ষিত বিদ্বজ্জনের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। বিদ্যাসাগর ইংরেজি-অভিজ্ঞ ব্যক্তি, কিন্তু রামগতি ইংরেজি জানতেন না; এই ছিল বঙ্কিমের অভিযোগ। রামগতির লেখাতে তিনি ইংরেজিতে অনধিকারী সংস্কৃত-পণ্ডিতের গোঁড়ামি লক্ষ্য করেন। আলালী, হুতোমী এবং 'মৃণালিনী'-ভঙ্গির [অর্থাৎ বঙ্কিমী গদ্যের] বিরুদ্ধে রামগতি এই আপত্তি তোলেন যে, এ-সব রীতি—'সর্বসমক্ষে পাঠ করিতে লজ্জা বোধ হয়'! বঙ্কিম তাই রামগতির ধারণা সম্বন্ধে কটাক্ষ করেন। আবার, ১৮৭৮এর 'ক্যালকাটা রিভিয়ু'এ প্রকাশিত—তখনকার ইংরেজি-শিক্ষিত নব্য-সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়ের বাংলা-ভাষা-সম্পর্কিত প্রবন্ধের প্রশংসা ক'রে তিনি শ্যামাচরণের সংস্কৃত-বিরোধিতার আতিশয্য সম্বন্ধে সমালোচনা করেন।

বিশেষ বিশেষ তৎসম শব্দের ব্যবহার বাংলায় চ'লবে না—এই ছিল শ্যামাচরণের বক্তব্য। বঙ্কিম লেখেন—'নিষ্কারণ ভাষাকে ধনশূন্যা করা কোন ক্রমে বাঞ্ছনীয় নহে।' অ-তৎসম দেশী এবং বিদেশী শব্দ সম্বন্ধে শ্যামাচরণের উদার আগ্রহ অনুমোদন ক'রে তিনি জানান যে, বাংলার পক্ষে—'মহাজন সংস্কৃতের কাছেই ধার করা কর্তব্য'। আমাদের সে-পর্বের ভাষা-সন্ধানের মূল কথা তাঁর সে প্রবন্ধটিতে তিনি নিজেই লিখে গেছেন—'বিষয় অনুসারেই রচনার ভাষার উচ্চতা বা সামান্যতা নির্ধারিত হওয়া উচিত।' যদুনাথ সরকার লিখেছেন যে, তাঁর ভাষা কখনোই সংযম হারায়নি,—আভিজাত্য ছাড়েনি।

তাঁর ভাষাবৈচিত্র্যের আসল কারণ তাঁর এই দৃষ্টিতেই নিহিত। বাংলা গদ্যে ক্ষণে ক্ষণে সংস্কৃত শব্দ বা বাক্য-বাক্যাংশের প্রয়োগের হেতু যে কী, সে-তত্ত্ব তাঁর সমকালীন টেকচাঁদ-কালীপ্রসন্ন-বিদ্যাসাগর-সম্পর্কিত তাঁর এইসব চিন্তাতেই আশ্রিত। আনন্দমঠের 'বন্দেমাতরম্' প্রভৃতি অংশে—বা 'কপাল-কুণ্ডলা'য় বা 'মৃণালিনী'তে,—কিংবা অন্যান্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে তাঁর সংস্কৃত রীতির ঝোঁক তাঁর এই আদর্শবোধের সঙ্গে জড়িত।[৩৩] রজনীকান্ত গুপ্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ ইত্যাদি আরো অনেকেই তাঁর ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে গেছেন। 'রাজসিংহে'র পরিবর্ধিত সংস্করণের 'বিজ্ঞাপন'-এ বাংলা ভাষার নিজস্ব প্রকৃতির মর্যাদা মেনে,—আবার অন্যত্র, ঈশ্বর গুপ্তের 'খাঁটি বাঙ্গালা'র প্রশংসা ক'রে, বাংলা রীতিকে 'সংস্কৃতজনিত বিকার' এবং 'ইংরাজিনবীশীর বিকার'—উভয় সংকট থেকেই রক্ষা করবার নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি।[৩৪]

প্রসঙ্গতঃ ভাষার কথা উঠেছিল। সংক্ষেপে সে-দিকটি দেখা গেল। এইবার আবার 'আনন্দমঠ' কাহিনীর দিকে চোখ ফেরানো দরকার। রাজধানীতে খাজনা লুঠ হবার খবর পৌছোবার সঙ্গে-সঙ্গে,—ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—সত্যানন্দ আর মহেন্দ্র দুজনেই ধরা পড়েন। নদীতীরে কল্যাণীর মৃতদেহ এবং জীবিত শিশুকন্যাটি—দুইই ফেলে রেখে, সিপাহীর হাতে বন্দী হ'য়ে, নগরে পৌঁছে, তাঁরা কারারুদ্ধ হন। বঙ্কিম মন্তব্য ক'রেছেন—'সে কারাগার অতি ভয়ঙ্কর, যে যাইত সে প্রায় বাহির হইত না; কেননা বিচার করিবার লোক ছিল না। ইংরেজের জেল নয়—তখন ইংরেজের বিচার ছিল না। আজ নিয়মের দিন—তখন অনিয়মের দিন।'

সত্যানন্দ, তথা সন্তানদল যে দেবতার মতন ক্ষমতাসম্পন্ন, মহেন্দ্রের মনে ক্রমশঃ সেই ধারণা দেখা দেয়! সিপাহীদের সঙ্গে যেতে যেতে, সত্যানন্দ পথে সংকেতময় একটি গান গেয়েছিলেন—'ধীর সমীরে তটিনীতীরে বসতি বনে

৩৩। এই প্রবন্ধে তাঁর একটি মন্তব্য—'টেকচাঁদি ভাষা-হুতোমি ভাষার এক পৈঠা উপর। হাস্য ও করুণরসের ইহা বিশেষ উপযোগী। স্কচ কবি বার্ণস্ হাস্য ও করুণরসাত্মিকা কবিতায় স্কচ্ ভাষা ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বিষয়ে ইংরেজি ব্যবহার করিতেন। গম্ভীর এবং উন্নত বা চিন্তাময় বিষয়ে টেকচাঁদি ভাষা কুলায় না।'

৩৪। 'বঙ্কিম প্রতিভা': 'বঙ্কিমচন্দ্র ও বাঙ্গালা ভাষা' দ্রষ্টব্য।

বরনারী—মা কুরু ধনুর্দ্ধর, গমনবিলম্বন—অতি বিধুরা সুকুমারী।' গানের এই নির্দেশের পরে, মহেন্দ্রের উদ্দেশে সত্যানন্দের ঘোষণা মনে পড়ে—'তুমি এখনই কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিবে'! তার ঠিক পরমুহূর্তেই প্রহরীবেশে ভবানন্দ-প্রেরিত ধীরানন্দ দেখা দেন। ফলে, মহেন্দ্র সিংহ মুক্তি পান। কিন্তু সত্যানন্দের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত মহেন্দ্র আবার ফিরে আসেন! সত্যানন্দ বলেন—'উভয়েই আজ রাত্রে অন্য প্রকারে মুক্ত হইব।' এই ঘটনা ঘটে চতুর্দশ পরিচ্ছেদে। পঞ্চদশে, সত্যানন্দের সেই গানের ইঙ্গিত অনুসারে জীবানন্দ মহেন্দ্রের শিশু-কন্যাকে নিয়ে ভৈরবীপুর বা ভরুইপুর গ্রামের এক বাড়িতে গিয়ে সতেরো-আঠারো বছরের মেয়ে 'নিমি'কে তার পরিচর্যার ভার দেন। এই 'নিমি' বা নিমাই জীবানন্দের বোন। বোনের বাড়ির পাশেই ভৈরবীপুরের এই পর্ণকুটীরে জীবানন্দ শান্তিকে রেখে গিয়েছিলেন। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে দেখা না ক'রেই ফিরে যেতে চেয়েছিলেন, কিন্তু বোনের অনুরোধে তাঁকে অপেক্ষা ক'রতে হয়।

সত্যানন্দের সংস্কৃতবহুল ভাষা থেকে এই আম-কাঁঠালের ছায়ায় ঘেরা পর্ণকুটীরের পরিবেশে—জীবানন্দ-নিমির সংলাপে পৌঁছে, হঠাৎ অভূতপূর্ব পরিবর্তন অনুভব করা যায়। ষোলোর পরিচ্ছেদে, সেই পর্ণকুটীরেই জীবানন্দের সঙ্গে তাঁর স্ত্রী শান্তির দেখা হয়। উপন্যাসে শান্তির এই প্রথম আবির্ভাব। তার বয়স পঁচিশ বছর। সে ঘরে ঢুকতেই—'বোধ হইল, পাতায় ঢাকা কোন গাছের যত ফুলের কুঁড়ি ছিল, হঠাৎ ফুটিয়া উঠিল।' পর পর আরো দুটি উপমা দেখা দেয়—'বোধ হইল যেন কোথায় গোলাপজলের কার্বা মুখ আঁটা ছিল, কে কার্বা ভাঙ্গিয়া ফেলিল'!—'যেন কে প্রায়, নিবান আগুনে ধূপ-ধুনা গুগ্‌গুল ফেলিয়া দিল!'

জীবানন্দ তখন আঙিনার আমগাছের ডালে মাথা রেখে কাঁদছিলেন। দীর্ঘ অদর্শনের পরে পরস্পরের অনুরাগী এই দম্পতির এ-সাক্ষাৎ সুখেরও বটে, দুঃখেরও বটে! শান্তি নিজের বীর-পত্নীত্বের গৌরব স্মরণ ক'রে স্বামীকে সান্ত্বনা দেয়। গাঢ় আলিঙ্গনের পরে জীবানন্দ ব্রতভঙ্গজনিত প্রায়শ্চিত্তের দায়িত্ব স্মরণ করেন। সেদিন তিনি বলেন—'একদিকে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ, জগৎ-সংসার; একদিকে ব্রত, হোম, যাগ, যজ্ঞ; সবই একদিকে, আর একদিকে তুমি!' বলেন—'আমি কোন্ ধর্মের জন্য দেশে দেশে বনে বনে বন্দুক ঘাড়ে করিয়া, প্রাণিহত্যা করিয়া এই পাপের

তার সংগ্রহ করি?' এই বিক্ষুব্ধ অবস্থায় তিনি তাঁর সংকল্প প্রকাশ করেন—'চল গৃহে যাই, আর আমি ফিরিব না'।

এই দুশ্চর স্বদেশ-তপস্যার সংশয়-সন্দেহ-বিরোধ-বিতর্কের দিকটি খুবই বাস্তব, খুবই প্রত্যাশিত। বীরের হৃদয়ে বার বার এ-সংশয় দেখা দেয় ব'লেই এ-যাত্রার নাম 'তপস্যা'! রবীন্দ্রনাথ এই 'তপস্যা' শব্দটিই তাঁর স্বদেশপ্রেম-সম্পর্কিত প্রবন্ধে-নিবন্ধে ব্যবহার ক'রে গেছেন। সাধারণ মানুষের চোখে সেই তপস্যা-ধারণার রূপটি এই জীবানন্দই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ক'রে তুলেছিলেন! যাই হোক, জীবানন্দ আবার পথে বেরিয়ে যান। সত্যানন্দের সন্ধানে তাঁকে নগরে যেতে হবে।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদে, সশস্ত্র মোগল যুবকের বেশে ভবানন্দকেও সেই একই উদ্দেশ্যে পথে বেরুতে দেখা যায়। কল্যাণীর বৃত্তান্ত তাঁর জানা ছিল না। পথে মৃতদেহ দেখে, বনৌষধির সাহায্যে কল্যাণীকে তিনি বাঁচিয়ে তোলেন। পরিচ্ছেদটি সংক্ষিপ্ত। কিন্তু শেষ কয়েক পংক্তিতে সেই পুনরুজ্জীবনের কথায় আবার কবিসত্তার হৃদয়-তরঙ্গ দেখা দেয়! তাই, এ অংশে একটু বেশি অলঙ্কার, যেমন—'শেষে অল্পে অল্পে পূর্বদিকের প্রথম প্রভাতরাগ বিকাশের ন্যায়, প্রভাতপদ্মের প্রথমোন্মেষের ন্যায়, প্রথম প্রেমানুভবের ন্যায় কল্যাণী চক্ষুরুন্মীলন করিতে লাগিলেন।' তখন ভবানন্দ তাঁকে নিজের ঘোড়ায় তুলে নিয়ে নগরাভিমুখে এগিয়ে যান।

উপন্যাস রচনায় বহুচর্চালব্ধ দক্ষতা অর্জনের পরে, বঙ্কিম তাঁর শেষজীবনে এই 'আনন্দমঠ' লিখতে বসেন। স্বদেশপ্রেম তাঁর দেবী-চৌধুরাণী'তেও বিদ্যমান, 'সীতারামে'ও উপস্থিত। কিন্তু, 'সীতারাম' বঙ্কিমের শেষ উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের মনোযোগ তখন পুরোপুরি অন্যদিকে! তাই 'সীতারাম' যতো ঘটনাময়, যতো প্রচারমুখী, সে তুলনায় মোটেই কবিত্ব-চিহ্নিত বলা চলেনা। কিন্তু 'আনন্দমঠে' তাঁর স্বভাবগত কবিত্বের উদাহরণ ক্ষণে ক্ষণে দেখা দেয়। 'দেবীচৌধুরাণী'তেও সে-লক্ষণ ধর্তব্য। তবে, এই দুটি ক্ষেত্রেই মাঝে মাঝে মনে হয়, এই সব কবিত্বের মূলেও যেন প্রত্যাশিত হৃদয়াবেগ কমে এসেছে। তিনি যেন অভ্যাসের বশেই কিছু কিছু অলঙ্কার ছিটিয়ে চ'লেছেন! কল্যাণীর চেতনা ফিরে আসার বর্ণনা এই ধরনের। আবার, আঠারোর পরিচ্ছেদে ভিন্ন প্রসঙ্গে ভিন্ন রীতির বাগ্মিতা দেখা দিয়েছে। সত্যানন্দ আর মহেন্দ্রের মুক্তির জন্যে মঠের সন্তানরা সেই

অরণ্যের দেবালয় বেষ্টন ক'রে দাঁড়িয়েছেন। সেই সন্ধ্যায়, হাতে তলোয়ার নিয়ে, জ্ঞানানন্দ বলেন—'এই বাবুইয়ের বাসা ভাঙিয়া, এই যবনপুরী ছারখার করিয়া, নদীর জলে ফেলিয়া দিব'! উত্তেজিত সন্তানদল কারাগার ভেঙে ফেলেন। সত্যানন্দকে, মহেন্দ্রকে তাঁরা মুক্ত করেন বটে, কিন্তু কামানধারী 'পরগণা সিপাহী' এসে তাঁদের বিতাড়িত করে। প্রথম খণ্ডের পরিসমাপ্তি ঘটে সেই ঘটনাতেই।

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদে শান্তি-জীবানন্দের পূর্বকথা পাওয়া যায়। অল্প বয়সে শান্তির মাতৃবিয়োগ হয়; পিতা ছিলেন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ; পিতার ছাত্রদের সঙ্গে কন্যাও বালকের মতন বেড়ে ওঠে। সে মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ,—ভট্টি, রঘু, কুমার, নৈষধাদির শ্লোক মুখস্থ করে। অধ্যাপকের মৃত্যুর পরে, তাঁর ছাত্র জীবানন্দ নিরাশ্রয়া শান্তিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। পিতা-মাতার সম্মতি পেয়ে শান্তিকে তিনি বিবাহ করেন।

কিন্তু শান্তি কপালকুণ্ডলারই কোমল সংস্করণ! কাপালিকের আশ্রয়ে কপালকুণ্ডলা যেমন সমাজ-বিচ্ছিন্না নারীসত্তা, বাল্যাবস্থায় শান্তিও তেমনি বধূ-সংস্কার-বর্জিতা নারী-প্রকৃতি! মেয়েলী বসন-ব্যসনের ধার ধারে না সে! স্বামীর আত্মীয়-পরিজনের শাসনে বিরক্ত হয়ে, একদিন ঘরের বাঁধন ফেলে দিয়ে, সন্ন্যাসী সেজে, সে এক রাজবিদ্রোহী সন্ন্যাসীদলে ঢুকে পড়ে! তারপর—'ক্রমশঃ তাহার যৌবন-লক্ষণ দেখা দিল। অনেক সন্ন্যাসী জানিল যে, এ ছদ্মবেশিনী স্ত্রীলোক! কিন্তু সন্ন্যাসীরা সচরাচর জিতেন্দ্রিয়; কেহ কোন কথা কহিল না।'—কিন্তু একজন অধ্যাপক-সন্ন্যাসী তার প্রতি আকৃষ্ট হন। শান্তি তাঁকে প্রহার ক'রে হঠাৎ আবার একদিন শ্বশুরবাড়িতে ফেরে! তখন শ্বশুর মারা গেছেন। শাশুড়ী তাকে ঘরে নিতে নারাজ! সেই অবস্থায় জীবানন্দ তার কথা শুনে, তাকে বিশ্বাস ক'রে, ভৈরবীপুরে তার জন্যে আলাদা বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন।

শান্তি-জীবানন্দের এই নব-অনুরাগের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বঙ্কিম লিখেছেন যে, পুষ্পধন্বার বাণ এসে শান্তির বুকে বিঁধেছিল! তখন সেই বাণ—'শান্তিকে জানাইল যে,সে বুক মেয়েমানুষের বুক—বড় নরম জিনিস। নবমেঘনির্মুক্ত-প্রথম জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকার ন্যায়, শান্তি সহসা ফুটিয়া উঠিয়া, উৎফুল্ল নয়নে জীবানন্দের মুখপানে চাহিল।'

বিষয় বা অবস্থার স্বাভাবিক দাবি অনুসারেই এখানকার ভাষায় এই

'জলকণানিষিক্ত পুষ্পকলিকা' আর 'মেয়েমানুষের বুক'—দুজাতের শব্দ-সমাবেশ ঘটাতে গিয়ে কৃত্রিম বা কাল্পনিক কোনো বাধা মানেননি তিনি! এও তাঁর ভাষার প্রকৃতি!

জীবানন্দ এই পর্বেই সন্তানদলে প্রবেশ ক'রে, ব্রত গ্রহণ করেন। ভৈরবীপুর থেকে চলে যাবার পরে, শান্তি সে-রাত্রে সন্ন্যাসীর বেশে বনে প্রবেশ করে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের এই হোলো মূল কথা। তৃতীয়ে, গোলাগুলি ইত্যাদি অস্ত্র সংগ্রহের জন্যে সত্যানন্দ তীর্থযাত্রায় উদ্যত। আশ্রমের ভার পড়ে ভবানন্দ আর জীবানন্দের ওপর। মহেন্দ্রকে দীক্ষিত ক'রে পদচিহ্ন গ্রামে তিনি অস্ত্রের কারখানা ক'রতে চান। এই পরিচ্ছেদেই ভবানন্দ শোনেন যে, তিনি যাকে বাঁচিয়ে তুলেছেন, সেই রমণীই মহেন্দ্রের পত্নী কল্যাণী। শুনে, তিনি চমকে ওঠেন!

সেই সন্ধ্যায় সত্যানন্দ শুধু মহেন্দ্রকেই নয়, আরো একজনকে দীক্ষিত ক'রবেন—'একটি নূতন লোক,—অতি তরুণবয়স্ক যুবাপুরুষ'! ভবানন্দ আর জীবানন্দকে তিনি বলেন যে, তাঁদের দুজনের কেউ যদি কোনো অপরাধ ক'রে থাকে, তাহলে সত্যানন্দ ফিরে আসবার পরে তার প্রায়শ্চিত্ত হবে, আগে নয়। সে-কথা শুনে, জীবানন্দ ভবানন্দকে শান্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের কথা বলেন। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, সত্যানন্দ সন্তানধর্মের নিষ্ঠা এবং ত্যাগের ব্যাখ্যা করেন; বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক দেখাতে গিয়ে বলেন,—সন্তান দ্বিবিধ,—দীক্ষিত আর অদীক্ষিত। যারা অদীক্ষিত, তারা যুদ্ধের সময়ে আসে, পুরস্কার নিয়ে চলে যায়। মহেন্দ্র বলেন—কিন্তু যারা দীক্ষিত, তারা সর্বত্যাগী! তিনি আরো বলেন যে, সন্তানরা বৈষ্ণব। অহিংসা বৈষ্ণবদের পরম ধর্ম,—তাহ'লে 'সন্তান'দের এই হিংসাচরণের যুক্তিসংগতি কোথায়? মহেন্দ্রের এই প্রশ্ন শুনে সত্যানন্দ বলেন:

> 'সে চৈতন্যদেবের বৈষ্ণব। নাস্তিক বৌদ্ধধর্মের অনুকরণে যে অপ্রকৃত বৈষ্ণবতা উৎপন্ন হইয়াছিল, এ তাহারই লক্ষণ। প্রকৃত বৈষ্ণব ধর্মের লক্ষণ দুষ্টের দমন, ধরিত্রীর উদ্ধার। কেন না, বিষ্ণুই সংসারের পালনকর্তা। দশ বার শরীর ধারণ করিয়া পৃথিবী উদ্ধার করিয়াছেন। কেশী, হিরণ্যকশিপু, মধুকৈটভ, মুর, নরক প্রভৃতি দৈত্যগণকে, রাবণাদি রাক্ষসগণকে, কংস, শিশুপাল প্রভৃতি রাজ-গণকে তিনিই যুদ্ধে ধ্বংস করিয়াছিলেন। তিনিই জেতা, জয়দাতা,

> পৃথিবীর উদ্ধারকর্তা, আর সন্তানের ইষ্টদেবতা। চৈতন্যদেবের বৈষ্ণবধর্ম প্রকৃত বৈষ্ণবধর্ম নহে—উহা অর্ধেক ধর্ম মাত্র। চৈতন্য-দেবের বিষ্ণু প্রেমময় – কিন্তু ভগবান কেবল প্রেমময় নহেন—তিনি অনন্ত শক্তিময়। চৈতন্যদেবের বিষ্ণু শুধু প্রেমময়—সন্তানের বিষ্ণু শুধু শক্তিময়।'

এ-কথায় কটাক্ষ ক'রে মহেন্দ্র বলেন—'কাশিমবাজারে একটা পাদরির সঙ্গে আমার দেখা হইয়াছিল—সে ঐ রকম কথাসকল বলিল—অর্থাৎ ঈশ্বর প্রেমময়—তোমরা যীশুকে প্রেম কর—এ যে সেইরকম কথা।' সত্যানন্দ বলেন, 'আমাদিগকে চতুর্দশ পুরুষ' যে ত্রিগুণাত্মক ঈশ্বর উপাসনা ক'রে আসছেন, সন্তানদের ঈশ্বর-ধারণা সেই ধারাতেই ধর্তব্য।

> '—সত্ত্বগুণ হইতে তাঁহার দয়া-দাক্ষিণ্যাদির উৎপত্তি, তাঁহার উপাসনা ভক্তির দ্বারা করিবে। চৈতন্যের সম্প্রদায় তাহা করে। আর রজোগুণ হইতে তাঁহার শক্তির উৎপত্তি; ইহার উপাসনা যুদ্ধের দ্বারা—দেবদ্বেষীদিগের নিধন দ্বারা—আমরা তাহা করি। আর তমোগুণ হইতে ভগবান শরীরী—চতুর্ভুজাদি রূপ ইচ্ছাক্রমে ধারণ করিয়াছেন। স্রকচন্দনাদি উপহারের দ্বারা সে গুণের পূজা করিতে হয়—সর্বসাধারণে তাহা করে।'

তখন মহেন্দ্র জিগেস করেন—'সন্তান'রা তবে উপাসক-সম্প্রদায় মাত্র? সত্যানন্দ জবাব দেন—'তাই। আমরা রাজ্য চাহিনা—কেবল মুসলমানেরা ভগবানের বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই।'[৩৫]

আনন্দমঠের দ্বিতীয় খণ্ডে, একদিকে সন্তানধর্মের এই দার্শনিক তাৎপর্য-সংকেত, অন্যদিকে জীবানন্দ-শান্তি এবং মহেন্দ্র-কল্যাণী-ভবানন্দের কাহিনী-

৩৫। দেশের ইতিহাসের সেই বিশেষ পর্বে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের এই ইঙ্গিতটি এই গ্রন্থের ৫৮-৫৯ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত রেজাউল করীম সাহেবের মতামতের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে এদেশে অখণ্ড এক-জাতিবোধের চর্চা যে মহৎ আদর্শ, তাতে সন্দেহ নেই। 'রাজসিংহে'র উপসংহারে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ভাল মন্দ উভয়ের মধ্যে তুল্যরূপেই আছে' [পৃষ্ঠা ৬২] মন্তব্যটি এদিকে সুবিবেচনার উদাহরণ। কিন্তু একালের মুসলমান পাঠকের পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো কোনো ইঙ্গিত যে সাম্প্রদায়িকতা-চিহ্নিত মনে হতে পারে, তাও অনস্বীকার্য। অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর তাঁর 'Sarat Chandra Chatterjee' [শিল্পী সংস্থা প্রকাশনী, ১৯৬৩] বইখানির তৃতীয় অধ্যায়ে বঙ্কিমের কথা-প্রসঙ্গে তাঁকে 'conservative' এবং 'dogma'-র ভক্ত ব'লেছেন। শরৎচন্দ্রের সঙ্গে তুলনাসূত্রে সে বইয়ে বলা হয়েছে—'with Saratchandra conservatism was an element in his art but Bankim is himself a conservative'।—ঐ পৃষ্ঠা ৪৪ দ্রষ্টব্য।

সূত্রে ক্রমেই হয় চমক, নয় জটিলতা দেখা দিয়েছে। চতুর্থ পরিচ্ছেদে, সত্যানন্দের ব্যাখ্যা শেষ হয়েছে। পঞ্চমে, মহেন্দ্রকে এবং সেইসঙ্গে জীবানন্দের স্ত্রী শান্তিকেও ছদ্মবেশে 'নবীনানন্দ স্বামী' নামে দীক্ষা গ্রহণ ক'রতে দেখা যায়। ইন্দ্রিয়জয়,—গৃহধর্ম এবং জাতিভেদ ত্যাগের শপথ নিয়ে, তাঁরা দীক্ষিত হন। পদচিহ্ন গ্রামে মহেন্দ্রের বাড়িতে 'সন্তান'দের দুর্গ-নির্মাণের সংকল্পের কথা সত্যানন্দ জানিয়ে দেন। মহেন্দ্র কায়স্থ-সন্তান। শান্তি ব্রাহ্মণ-কুমার ব'লে আত্ম-পরিচয় দেয়। সপ্তমে, সত্যানন্দ যে শান্তির ছদ্মবেশ ধ'রতে পেরেছেন, সে কথা জানিয়ে দেন। সে যে জীবানন্দের স্ত্রী, এ পরিচয় জেনে,—তার অসাধারণ দৈহিক শক্তির পরিচয় পেয়ে,—তার ব্রহ্মচর্য সম্বন্ধে তারই স্বীকৃতি শুনে, সে-রাত্রির মতন সত্যানন্দ তাকে মঠে থাকবার অনুমতি দেন। স্বামীর কাছে নিজের অবস্থানের প্রয়োজনীয়তা বোঝাতে গিয়ে শান্তি বলে—'অর্জুন যখন যাদবী সেনার সহিত অন্তরীক্ষ হ'তে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, কে তাঁহার রথ চালাইয়াছিল? দ্রৌপদী সঙ্গে না থাকিলে, পাণ্ডব কি কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যুঝিত?' আবার, অষ্টম পরিচ্ছেদে, গোবর্ধন নামে এক পরিচারকের সঙ্গে নিজের বাসযোগ্য ঘর খুঁজতে-খুঁজতে সে দেখে, ধীরানন্দ তখন মহাভারতের দ্রোণপর্বে সপ্তরথীর বিরুদ্ধে অভিমন্যুর যুদ্ধকথা প'ড়ছিলেন! কৃষ্ণ-কথার সত্যানুসন্ধানের বহুপ্রযত্নময় পর্বেই বঙ্কিম-জীবনে 'আনন্দমঠের' উদ্ভব ঘটে! এসব তারই লক্ষণ। আবার, তত্ত্বচিন্তার এই গুরু পরিবেশের মধ্যেই ভবানন্দকে কল্যাণীর রূপ-চিন্তায় বিভোর দেখা গেছে! সে-দৃশ্য দেখে নিয়ে, জীবানন্দের ঘরে এসে, শান্তি নিজের জায়গা ক'রে নেয়। দ্বিতীয় খণ্ডের এই শেষ পরিচ্ছেদটি ব্রহ্মচর্যব্রতী স্বামী-স্ত্রীর প্রীতিসৌহার্দ্যময় কৌতুক-পরিহাসের দৃশ্য। জীবানন্দ ঘরে ঢুকেই শান্তিকে চিনতে পেরেছেন! কিন্তু পরস্পরের সান্নিধ্য-কামনা এখানে শুধু হাস্যকৌতুকেই সীমিত! জীবানন্দ পৃথক শয্যায় বিশ্রামরত! শেষ উপন্যাস 'সীতারামে' বঙ্কিমের যে হিন্দু-সংগ্রাম-চেতনা লক্ষ্য করা গেছে, 'আনন্দমঠে' সন্তানধর্মের ব্যাখ্যানের কথা-প্রসঙ্গে সেই আদর্শের দিকটি এই দ্বিতীয় খণ্ডেই দেখা গেল।[৩৬] অতঃপর তৃতীয় খণ্ডে সে-কথা আবার দেখা দিয়েছে।

৩৬। 'বঙ্গদর্শনের' পত্র-সূচনায় বাংলা ভাষায় বাঙ্গালীর আত্মপ্রকাশের সামর্থ্য অর্জন করা যে অবশ্যকর্তব্য, তার ইঙ্গিত ছিল। 'বঙ্গদর্শনে'র বিজ্ঞাপনে প্রচারিত লেখকদের মধ্যে ছিলেন দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশনাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়,

তৃতীয় খণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদের আদিতেই ১১৭৬ সালের মন্বন্তরের কথা—'কাল ৭৬ সাল ঈশ্বর কৃপায় শেষ হইল'। পরের বছর ফসল ভালোই হয়, বটে কিন্তু ব্যাধি দেখা দেয়। দুর্ভিক্ষে, ব্যাধিতে রিক্ত লোকালয় তখন জঙ্গলে পরিণত! সন্তানদল তখন হিন্দু ডাকাতের দল! এই পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে বঙ্কিম লেখেন—'মুসলমান রাজ্যের অরাজকতায় ও অশাসনে সকলে মুসলমানের উপর বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। হিন্দুধর্মের বিলোপে অনেক হিন্দুই হিন্দুত্ব স্থাপনের জন্য আগ্রহচিত্ত ছিল। অতএব দিনে দিনে সন্তান-সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।'

ওয়ারেন হেস্টিংস তখন কাপ্তেন টমাসের অধিনায়কত্বে কোম্পানির সৈন্য পাঠিয়ে সন্তানদের দমনের আয়োজন করেন। কিন্তু টমাসের সৈন্যরা হেরে যায়। টমাস শিবগ্রামে কোম্পানীর রেশমের কুঠীতে কুঠীর অধ্যক্ষ ডনিওয়ার্থের কাছে আসে। একদিন জঙ্গলে শিকারে গিয়ে সে সন্ন্যাসিনী শান্তিকে দেখতে পায়। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, শান্তির সঙ্গে টমাসের কথোপকথনে হিন্দু রমণীর সাহস এবং বীরত্বের পরিচয় ফুটিয়ে তুলে, শান্তির কথাতে সাহেবকে 'বুনো', 'রূপী বাঁদর' ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে, বঙ্কিম যেন লরেন্স ফস্টরের সঙ্গে শৈবলিনী প্রথম আলাপের দৃশ্যটিই পুনরায় আঁকবার চেষ্টা করেন! তৃতীয় পরিচ্ছেদে, সাহেবের বন্দুক সাহেবকে ফিরিয়ে দিয়ে, শান্তি সেই অরণ্যের গভীরে অদৃশ্য হ'য়ে গেছে। তারপর তার গান শোনা যায়—'এ যৌবন জলতরঙ্গ রোধিবে কে'? জীবানন্দের সঙ্গে দেখা হ'য়েছে তার। ইহলোকের ভালবাসায় বিশ্বাস রেখে, এই ব্রহ্মচারী-দম্পতি তখন গলা মিলিয়ে গেয়ে ওঠেন—'বন্দেমাতরম'!

চতুর্থ পরিচ্ছেদে, নগরে গিয়ে ভবানন্দ তাঁর চেয়ে বয়সে পঁচিশ বছর বড়ো গৌরীঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা করেন। এই গৌরী ঠাকুরাণী কতকটা গজপতি

কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, রামদাস সেন এবং অক্ষয়চন্দ্র সরকার। স্বর্গত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ অক্ষয়চন্দ্রের 'সাহিত্য-সাধন' বইখানির ভূমিকায় লিখেছিলেন যে, আনন্দমঠ প্রকাশিত হবার অনেকদিন আগেই 'বঙ্গদর্শনে' অক্ষয়চন্দ্রের 'দশ মহাবিদ্যা' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। তাতে দশ মহাবিদ্যার রূপভেদের সঙ্গে ভারতবর্ষের দশ দশার তুলনা ছিল। ভারতমাতার 'ছিন্নমস্তা', 'ধূমাবতী' ইত্যাদি মূর্তিতে হেমচন্দ্র দুর্দশার লক্ষণ দেখে ভবিষ্যতের 'মহালক্ষ্মী' মূর্তির কথা বলেন। 'আনন্দমঠের দেশমাতৃকা-মূর্তির ধ্যান কমলাকান্তের 'আমার দুর্গোৎসব'-এর মধ্যেও যেমন তুলনীয়, তেমনি অক্ষয়চন্দ্রের এই লেখাটির সঙ্গেও।

বিদ্যাদিগ্‌গজের পুরুষ-সংস্করণ। ভবানন্দ তাকে 'ঠানদিদি' ব'লে ডাকেন—'সাঙ্গা' ক'রে নেবার প্রস্তাবও জানান। গৌরী ঠাকরুণ তাতে অসম্মত নন! 'বিষবৃক্ষে'র হীরার আয়ি-বুড়ির 'ইষ্টিরস' ব্যাধির 'কেষ্টরস' প্রতিষেধকের কথাও মনে পড়ে! এই কৌতুকময় প্রবেশপথ অতিক্রম ক'রে, ভবানন্দ গিয়ে পৌঁছোন কল্যাণীর ঘরে। কল্যাণী 'দেবলোকে শাপগ্রস্তা দেবী।' চরিত্র-বলে, পতিনিষ্ঠায়, ধর্মবোধে অতুলনীয়া এই রমণীর রূপে মুগ্ধ সন্ন্যাসী নিজের অসংযম এবং অদৃষ্টদোষের ফলে তিরস্কৃত হন। কল্যাণীকে বিবাহ ক'রতে চান ভবানন্দ! কল্যাণী বলেন, 'দুরাচার পামর ব্রহ্মচারী'! ভবানন্দ রূপমুগ্ধ, কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত নন। এই পরিচ্ছেদের শেষে তাঁকে প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে মৃত্যু বরণ ক'রতে উদ্যোগী দেখা যায়।

পঞ্চম পরিচ্ছেদে, ভবানন্দের সঙ্গে বীরানন্দের দেখা হয়। বীরানন্দ সত্যানন্দের চর। সত্যানন্দকে অপসারিত ক'রে তিনি ভবানন্দকে সন্তান-সম্প্রদায়ের নেতা হবার পরামর্শ দিলে ভবানন্দ তাঁকে বধ ক'রতে উদ্যত হন এবং বীরানন্দ পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। তারপর, ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, ভবানন্দ যখন অরণ্যে আত্মহত্যায় উদ্যত, সেই সময়ে গুরুর কণ্ঠস্বর শুনতে পান—'ধর্মে তোমার মতি থাকিবে—আশীর্বাদ করিলাম।' সপ্তমে, শান্তি আর সত্যানন্দের সাক্ষাৎ। শান্তির গুণে, জ্ঞানে, ভক্তিতে মুগ্ধ হ'য়ে সত্যানন্দ বলেন—'তোমাকে মা বলিলাম, তুমি মা হইয়া সন্তানের কাজ কর।' অষ্টমে, জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রে, সেই অরণ্যে,—দশ সহস্র সন্তানের সভায় সত্যানন্দ সসৈন্যে টমাসকে আক্রমণের প্রস্তাব জানান। যখন টমাসের সেনাবাহিনী আক্রমণের এই সংকল্প নেওয়া হয়,—ঠিক সেই মুহূর্তেই ইংরেজের তোপের শব্দ শোনা যায়।—'জালনিবদ্ধ মীনদলবৎ কাপ্তেন টমাস সন্তান-সম্প্রদায়কে এই আম্রকাননে ঘিরিয়া বধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে।' নবমে, ভবানন্দ, জীবানন্দ, নবীনানন্দও সেই দশ হাজার সন্তানসেনা নিয়ে যুদ্ধে উদ্যত হন! দশম একাদশে, একদিকে টমাস আর তার সহযোগী লেপ্টেনান্ট ওয়াটসন এবং হে সাহেবের সেনাদল, অন্যদিকে এই সন্তানদল,—উভয় পক্ষের তুমুল যুদ্ধ-বর্ণনা! সেই যুদ্ধেই ভবানন্দের মৃত্যু হয়। আর, বন্দী কাপ্তেন টমাসের অনুরোধে 'একজন আইরিশম্যান' তাকে গুলি করে। মৃত্যুর আগে ভবানন্দ জেনে যান যে, কল্যাণীর সঙ্গে তাঁর সে-দিনের আলোচনা শুনেছিলেন স্বয়ং সত্যানন্দ! সত্যানন্দ ব'লেছেন, পরলোকে ভবানন্দের বৈকুণ্ঠলাভ হবে।

ভবানন্দের মৃত্যু-বর্ণনার পরে এই পরিচ্ছেদেই বঙ্কিম লিখেছেন—'হায়! রমণীরূপলাবণ্য! ইহসংসারে তোমাকেই ধিক্!'

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, যুদ্ধের শেষে, জীবানন্দ প্রভৃতি শিষ্যদের সঙ্গে নিয়ে সত্যানন্দকে হিন্দু-রাজ্যে সন্তানধর্ম প্রচারে উদ্যোগী দেখা যায়। তিনি নিজে সিংহাসনে ব'সতে চাননি। সত্যানন্দ এই সময়ে মহেন্দ্রকে বলেন :

> 'তোমরা সকলে বিষ্ণুমণ্ডপে শপথ করিয়া সন্তানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলে। ভবানন্দ ও জীবানন্দ দুই জনেই প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়াছে, ভবানন্দ আজ তাহার স্বীকৃত প্রায়শ্চিত্ত করিল, আমার সর্বদা ভয় কোন্ দিন জীবানন্দ প্রায়শ্চিত্ত করিয়া দেহ বিসর্জন করে। কিন্তু আমার এক ভরসা আছে, কোন নিগূঢ় কারণে সে এক্ষণে মরিতে পারিবে না। তুমি একা প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছ। এক্ষণে সন্তানের কার্যোদ্ধার হইল; প্রতিজ্ঞা ছিল যে, যতদিন না সন্তানের কার্যোদ্ধার হয়, ততদিন তুমি স্ত্রী কন্যার মুখদর্শন করিবে না। এক্ষণে কার্যোদ্ধার হইয়াছে, এখন আবার সংসারী হইতে পার।'

সত্যানন্দের আদেশে, 'নবীনানন্দ' [শান্তি] মহেন্দ্রকে তাঁর কন্যার সন্ধান দেখিয়ে দিতে যায়। সকলে চলে গেলে, নিঃসঙ্গ সত্যানন্দ সেই রাত্রে মাটিতে মাথা রেখে ঈশ্বরচিন্তা করেন। রাত কেটে গেলে, সত্যানন্দের মাথায় কে একজন হাত রেখে বলেন—'আমি আসিয়াছি।' ব্রহ্মচারী চম্‌কে উঠে বলেন—'হে প্রভু! আজ ক্ষমা করুন। আগামী মাঘী পূর্ণিমায় আমি আপনার আজ্ঞা পালন করিব।'

এইভাবে গল্পের ধারায় কৌতূহল বজায় রেখে, 'আনন্দমঠে'র তৃতীয় খণ্ডে ছেদ টানা হ'য়েছে। চতুর্থ খণ্ডে, সন্তানসেনার বিজয়-সংবাদ পেয়ে, মহেন্দ্রের সঙ্গে মিলিত হবার জন্যে কল্যাণী সেই রাত্রেই পদচিহ্ন গ্রামের পথে বেরিয়েছেন। পথে দস্যুর কবল থেকে শান্তি তাঁকে রক্ষা করে। এই দুটি রমণী পরস্পরের সঙ্গ লাভ ক'রে সুখী হন। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, অতি প্রত্যুষে মহেন্দ্র-কল্যাণীর সাক্ষাৎ ঘটে। সেই দুপুরেই জীবানন্দ ভরুইপুরে 'নিমি'র কাছ থেকে শিশু-কন্যা সুকুমারীকে

নিয়ে আসেন। কিন্তু নিমাই সুকুমারীর স্বত্ব ত্যাগ ক'রতে রাজী ছিল না। এই স্নেহমাধুর্যের দৃশ্য পেরিয়েই,—তৃতীয় পরিচ্ছেদে দেখা যায়—পদচিহ্ন গ্রামের নতুন দুর্গে, কল্যাণীর উপস্থিতিতে 'নবীনানন্দ' মহেন্দ্রের কাছে আত্মপরিচয় দেয়। চতুর্থে, আবার ইংরেজের সন্তানসৈন্য আক্রমণের প্রসঙ্গ! ওয়ারেন হেষ্টিংস সেবার মাঘী পূর্ণিমার মেলা আক্রমণের জন্যে মেজর এডওয়ার্ডসকে পাঠান। পদচিহ্ন দুর্গে অল্পসংখ্যক সৈন্য রেখে, মহেন্দ্রও মেলায় ইংরেজকে বাধা দিতে যান। কিন্তু ইংরেজের কৌশল তাঁরা বুঝতে পারেননি! এদিকে, শান্তি আর জীবানন্দ তাঁদের পূর্বসংকল্প অনুসারে মৃত্যু বরণ ক'রতে যাচ্ছিলেন। মেলা-আক্রমণের গুজব শুনে, তাঁরা পথে যেতে যেতে এক জায়গায় ইংরেজদের শিবির দেখতে পান। পঞ্চমে, বৈষ্ণবী বেশ ধারণ ক'রে, সেই ইংরেজ-শিবিরে গিয়ে, এড্‌ওয়ার্ডসের কাছে পদচিহ্ন আক্রমণ পরিকল্পনার খবর সংগ্রহ ক'রে, তাকে ছলনায় ভুলিয়ে,—শান্তি তার চার বছর সন্তান-সেনাদলের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে, ইংরেজ-দলের লিণ্ডলে সাহেবের সঙ্গে তারই আরবী ঘোড়ায় চড়ে,—সাহেবকে ঘোড়া থেকে ফেলে দিয়ে,—জীবানন্দের কাছে সে-খবর পৌঁছে দেয়! জীবানন্দ তখন মহেন্দ্রকে খবর দিতে যান। শান্তিকে যেতে হয় সত্যানন্দের কাছে। ইতিমধ্যে এড্‌ওয়ার্ডস্‌ শান্তির এই পলায়ন-বৃত্তান্ত জেনেই শিবির তুলে ফেলবার হুকুম দেন। অতঃপর এক টিলায় তুমুল যুদ্ধ হয়। ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, সেই যুদ্ধ-বর্ণনার শেষদিকে দেখা যায় পঁচিশ হাজার সন্তানসেনা নিয়ে সত্যানন্দ শত্রুসৈন্য পরাভূত করেন।—"ওয়ারেন হেষ্টিংসের কাছে সংবাদ লইয়া যায়, এমন লোক রহিল না।'

সেই যুদ্ধেই জীবানন্দের 'মৃত্যু' হয়। পূর্ণিমার গভীর রাত্রে—মশালের আলোয় শান্তি জীবানন্দের দেহ খুঁজছিলেন। এই অপূর্বদৃশ্য জটাজুটধারী মহাপুরুষ জীবানন্দের মৃতদেহ খুঁজে বের ক'রতেই শান্তি—'সামান্য স্ত্রী-লোকের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল।' মহাপুরুষ 'চিকিৎসক' ব'লে আত্ম-পরিচয় দেন। অলৌকিক শক্তির গুণে জীবানন্দকে তিনি বাঁচিয়ে তোলেন। তখন শান্তি বলেন—প্রায়শ্চিত্তের জন্যেই জীবানন্দ দেহত্যাগ ক'রেছিলেন; অতঃপর তীর্থভ্রমণে এবং দেশজননীর কল্যাণ-কামনায় হিমালয়ে বাস ক'রে দেবতার আরাধনা করাই তাঁদের লক্ষ্য হোক্! সপ্তম পরিচ্ছেদের শেষে, শান্তি-জীবানন্দের এই যাত্রার উল্লেখ ক'রেই ঔপন্যাসিক স্বদেশলক্ষ্মীর উদ্দেশ্যে নিজের মন্তব্য যোগ ক'রেছেন—'হায়! আবার

আসিবে কি মা! জীবানন্দের ন্যায় পুত্র, শান্তির ন্যায় কন্যা, আবার গর্ভে ধরিবে কি?'

চতুর্থ খণ্ডের শেষ পরিচ্ছেদটি প্রধানতঃ 'আনন্দমঠে'র বিপ্লবনীতির ব্যাখ্যা। দেশের মুক্তি এবং হিন্দু-রাজ্যের প্রতিষ্ঠা,—সত্যানন্দ এই দুটি ব্যাপার অভিন্ন ব'লে বুঝেছিলেন। গভীর রাত্রে, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে আনন্দমঠে ফিরে, বিষ্ণুমণ্ডপে ব'সে তিনি ধ্যানস্থ হন। সেই সময়ে সেই 'চিকিৎসক মহাপুরুষ' এসে তাঁকে ডাকেন; বলেন,— 'সত্যানন্দ আজ মাঘী পূর্ণিমা।'

সত্যানন্দের সংশয় ছিল। প্রাণিহত্যার পথে মাতৃসাধনার লক্ষ্যলাভ সম্বন্ধে লেখকেরও কিছু জবাবদিহি ছিল। মহাপুরুষ সত্যানন্দকে বলেন—'মুসলমানরাজ্য ধ্বংস হইয়াছে, কিন্তু হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হয় নাই—এখনও কলিকাতায় ইংরেজ প্রবল।' ইংরেজই ভবিষ্যৎ ভারতের অধিপতি! সত্যানন্দ সে-কথা শুনে অশ্রুবিসর্জন করেন। নিজের মৃত্যুকামনা করেন তিনি! তারপর মহাপুরুষের উক্তিতে সন্তানদলের বিপ্লবাদর্শের অপূর্ণতার ব্যাখ্যা পাওয়া যায়:

> 'তুমি বুদ্ধির ভ্রমক্রমে দস্যুবৃত্তির দ্বারা ধন সংগ্রহ করিয়া রণজয় করিয়াছ। পাপের কখনও পবিত্র ফল হয় না। অতএব তোমরা দেশোদ্ধার করিতে পারিবে না। আর যাহা হইবে তাহা ভালই হইবে। ইংরেজ রাজা না হইলে সনাতনধর্মের পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা নাই।'

সনাতন ধর্মের যথার্থ আদর্শ সম্বন্ধে তিনি বলেন:

> 'তেত্রিশ কোটি দেবতার পূজা সনাতন ধর্ম নহে, সে একটা লৌকিক অপকৃষ্ট ধর্ম; তাহার প্রভাবে প্রকৃত সনাতনধর্ম—ম্লেচ্ছেরা যাহাকে হিন্দুধর্ম বলে—তাহা লোপ পাইয়াছে। প্রকৃত হিন্দুধর্ম জ্ঞানাত্মক, কর্মাত্মক নহে। সেই জ্ঞান দুই প্রকার, বহির্বিষয়ক ও অন্তর্বিষয়ক। অন্তর্বিষয়ক যে জ্ঞান, সে-ই সনাতন ধর্মের প্রধান ভাগ। কিন্তু বহির্বিষয়ক জ্ঞান আগে না জন্মিলে অন্তর্বিষয়ক জ্ঞান জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। স্থূল কি, তাহা না জানিলে, সূক্ষ্ম কি, তাহা জানা যায় না। এখন এদেশে অনেক দিন হইতে

বহির্বিষয়ক জ্ঞান বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে—কাজেই প্রকৃত সনাতন ধর্মও লোপ পাইয়াছে।'

ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন-পর্বে ভারতবর্ষে ইংরেজের শাসক-ভূমিকা কেন প্রয়োজনীয়, সে-বিষয়ে এই শেষ কথাগুলির মধ্যেই তিনি বলেন :

> 'এখন এদেশে বহির্বিষয়ক জ্ঞান নাই—শিখায় এমন লোক নাই ; আমরা লোকশিক্ষায় পটু নহি। অতএব ভিন্ন দেশ হইতে বহির্বিষয়ক জ্ঞান আনিতে হইবে। ইংরেজ বহির্বিষয়কজ্ঞানে অতি সুপণ্ডিত, লোকশিক্ষায় বড় সুপটু। সুতরাং ইংরেজকে রাজা করিব। ইংরেজী শিক্ষায় এদেশীয় লোক বহিস্তত্ত্বে সুশিক্ষিত হইয়া অন্তস্তত্ত্ব বুঝিতে সক্ষম হইবে। তখন সনাতন ধর্মপ্রচারের আর বিঘ্ন থাকিবে না।…যত দিন তা না হয়, যত দিন না হিন্দু আবার জ্ঞানবান, গুনবান আর বলবান হয়, ততদিনে ইংরেজরাজ্য অক্ষুণ্ণ থাকিবে। ইংরেজ রাজ্যে প্রজা সুখী হইবে—নিষ্কণ্টকে ধর্মাচরণ করিবে।'

সত্যানন্দ প্রশ্ন করেন—তাহলে ইংরেজের বিরুদ্ধে সন্তানদের সে নৃশংস যুদ্ধের প্রয়োজন হয়েছিল কেন? মহাপুরুষ উত্তর দেন :

> 'ইংরেজ এক্ষণে বণিব—অর্থসংগ্রহেই মন, রাজ্যশাসনভার লইতে চাহে না। এই সন্তানবিদ্রোহের কারণে, তাহারা রাজ্যশাসনের ভার লইতে বাধ্য হইবে ; কেন না রাজ্যশাসন ব্যতীত অর্থসংগ্রহ হইবে না। ইংরেজ রাজ্যে অভিষিক্ত হইবে বলিয়াই সন্তানবিদ্রোহ উপস্থিত হইয়াছে।'

এই ব্যাখ্যান শেষ ক'রে সত্যানন্দকে তিনি জ্ঞান-সাধনায় আহ্বান করেন। কিন্তু সত্যানন্দের তখনো তাতে আন্তরিক বাধা ছিল। তিনি বলেন, 'শক্র-শোণিতে সিক্ত করিয়া মাতাকে শস্যশালিনী করিব'।

মহাপুরুষ বলেন—'শক্র কে? শক্র আর নাই। ইংরেজ মিত্ররাজ্য। আর ইংরেজের সঙ্গে যুদ্ধে শেষ জয়ী হয়,এমন শক্তি কাহারও নাই।' সত্যানন্দ আত্মহত্যা ক'রতে চান। মহাপুরুষ তাঁকে নিরস্ত ক'রে জ্ঞানের পথে নিয়ে যান। দু'জনের সেই বিদায়-দৃশ্যটিই 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের শেষ কথা :

> 'কি অপূর্ব শোভা। সেই গম্ভীর বিষ্ণুমন্দিরে প্রকাণ্ড চতুর্ভুজ মূর্তির সম্মুখে, ক্ষীণালোকে সেই মহাপ্রতিভাপূর্ণ দুই পুরুষ মূর্তি

শোভিত—একে অন্যের হাত ধরিয়াছেন। কে কাহাকে ধরিয়াছে ? জ্ঞান আসিয়া ভক্তিকে ধরিয়াছে—ধর্ম আসিয়া কর্মকে ধরিয়াছে; বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে ধরিয়াছে; কল্যাণী আসিয়া শান্তিকে ধরিয়াছে। এই সত্যানন্দ শান্তি; এই মহাপুরুষ কল্যাণী। সত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা, মহাপুরুষ বিসর্জন।'

'বিসর্জন আসিয়া প্রতিষ্ঠাকে লইয়া গেল।'

'আনন্দমঠ' এবং 'দেবীচৌধুরাণী' ছুটিতেই অরণ্য-পরিবেশের প্রাধান্য। বঙ্কিম তাঁর উপন্যাস-সৃষ্টির প্রথম পর্বে, 'কপালকুণ্ডলা'তেও অরণ্য-প্রকৃতির পটেই তাঁর নায়ক-নায়িকার আবির্ভাব দেখিয়েছিলেন। 'দেবীচৌধুরাণী'র সূচনা অবশ্য লোকালয়ে, কিন্তু প্রথম সাতটি পরিচ্ছেদের পরেই হঠাৎ অষ্টম পরিচ্ছেদে কাহিনীর অভিপ্রেত অভিমুখিতাও ব্যক্ত হ'য়েছে, অরণ্যও স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে। 'আনন্দমঠে' সত্য, শান্তি, কল্যাণ, জ্ঞান, কর্ম, বিদ্রোহ, দেশপ্রেম, ইত্যাদি বিভিন্ন চিন্তার মধ্যেই শান্তির নারীসত্তার বিশেষত্ব ব্যক্ত হ'তে দেখা গেছে। শ্বশুরবাড়িতে তার খুব সমাদর হয়নি বটে, কিন্তু 'নিমি' তাকে খুবই ভালবাসতো,—আর স্ত্রীর প্রতি জীবানন্দের স্নেহ-মমতা তো তুলনারহিত। 'দেবীচৌধুরাণী'র প্রফুল্ল কিন্তু নির্যাতিতা নারী। প্রথম খণ্ডের প্রথম পরিচ্ছেদেই এখানে যেন সামাজিক উপন্যাসের আবহাওয়া প্রাধান্য পেয়েছে। কাহিনীর সূচনাতেই দরিদ্র সংসারের মা-মেয়ের সংলাপ :

'ও পি—ও পি পি—ও প্রফুল্ল—ও পোড়ারমুখী।'

'যাই মা'

মা ডাকিল—মেয়ে কাছে আসিল। বলিল, 'কেন মা ?

মা বলিল, 'যা না ঘোষেদের বাড়ি থেকে একটা বেগুন চেয়ে নিয়ে আয় না।'

প্রফুল্লমুখী বলিল, 'আমি পারিব না। আমার চাইতে লজ্জা করে।

মা। তবে খাব কি ? আজ ঘরে যে কিছু নেই।

প্র। তা শুধু ভাত খাব। রোজ রোজ চেয়ে খাব কেন গা ?

তাঁর প্রথম পর্বের উপন্যাসে, 'কৃষ্ণকান্তের উইল' পর্যন্ত রচনাধারার বিস্তারে, এক 'রাধারাণী'তে ছাড়া,—এ-রকম দারিদ্র্যের দৃশ্য অন্য কোথাও নেই। সামাজিক-পারিবারিক পরিবেশের এই বাস্তবানুগামিতা বজায় রেখে, প্রথম পরিচ্ছেদে তিনি দারিদ্র্য-নিপীড়িত প্রফুল্লমুখীকে তার মায়ের সঙ্গে শ্বশুরবাড়ির পথে যাত্রা ক'রিয়ে, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে প্রফুল্লর বিবাহের আদিকথা বর্ণনা ক'রেছেন। বরেন্দ্রভূমে ভূতনাথ গ্রামের ধনী হরবল্লভের বড়ো ছেলের সঙ্গে প্রফুল্লর বিয়ে হয়। ছ'ক্রোশ পথ হেঁটে, বেলা তৃতীয় প্রহরে সেই ধনীর বাড়িতে পৌঁছোন এই মা-মেয়ে। প্রফুল্লর বিয়ের সময়, বরযাত্রীদের আহারের ব্যবস্থা ভালোই ছিল, কিন্তু কন্যাপক্ষের নিমন্ত্রিতদের কেবল চিঁড়ে-দই দেওয়া হয় ব'লেই প্রতিবেশীরা প্রফুল্লর মায়ের কলঙ্ক রটনা করে! হরবল্লভ তাই শুনে, পুত্রবধূকে ত্যাগ করেন এবং ছেলের অন্য বিবাহ দেন। তারপর এতোদিন পরে, দারিদ্র্যের জ্বালা দুঃসহ হওয়ায় প্রফুল্লর মা তাঁর মেয়েকে নিজে পৌঁছে দিতে এসেছেন দেখে 'বেহান' তাঁকে কটাক্ষ করেন। প্রফুল্লর মা বলেন—'তোমার বউ একা আসিতে পারে না, তাই রাখিতে সঙ্গে আসিয়াছি। এখন তোমার বউ পৌঁছিয়াছে, আমি চলিলাম।' তিনি চ'লে যাবার পরে, বধূর রূপ দেখে, গৃহিণী তার প্রতি কিঞ্চিৎ প্রসন্ন হ'য়ে বলেন—'কি করব মা জেতের ভয়'! অনুকূল মন নিয়েই তিনি তাঁর স্বামীর সঙ্গে দেখা ক'রতে যান।

সেই অবসরে,—তৃতীয় পরিচ্ছেদে সপত্নী সাগরের সঙ্গে প্রফুল্লর আলাপ হ'য়ে যায়। সাগর সুরূপা। সে পিতা-মাতার একমাত্র সন্তান। প্রফুল্লকে সে তাদের তৃতীয় সতীনেরও খবর দেয়। বলে—'আমার বাপের সঙ্গে আমার শ্বশুরের বড় বনে না—তাই আমি এখানে কখন থাকি না।' দু'চার দিন পরেই সে যে আবার চলে যাবে, সাগর সে-খবরও জানিয়ে দেয়। ব্রহ্মঠান্‌দিদি সম্পর্কে তাদের পিসশাশুড়ী। প্রফুল্লর মাকে তাঁরই কাছে নিয়ে গিয়ে, তাঁর পরিচর্যার ব্যবস্থা ক'রে, প্রফুল্লকে নিজের বাপের বাড়ি থেকে পাওয়া সন্দেশ খাইয়ে, স্বামীর সঙ্গে প্রফুল্লর সাক্ষাতের ব্যবস্থা করবারও প্রতিশ্রুতি দেয় সাগর। ইতিমধ্যে শাশুড়ী এসে খবর দেন যে, শ্বশুর প্রফুল্লকে ফিরিয়ে নিতে রাজি নন! সে-কথা শুনে, পরদিন চ'লে যাবার সংকল্প জানিয়ে সে বলে—'একটা কথা ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিও। আমার মা চরকা কাটিয়া খায়, তাহাতে একজন মানুষের একবেলা আহার কুলায় না। জিজ্ঞাসা করিও—আমি কি করিয়া খাইব।'

চতুর্থ পরিচ্ছেদটি সাগর-বৌ, নয়ন-বৌ আর প্রফুল্ল,—তিন সপত্নীর আলাপের দৃশ্য। এঁদের সংলাপে,—বিশেষতঃ সাগরের অকৃত্রিম কৌতুক-ধর্মিতায় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের চিহ্ন ফুটে ওঠে। সেকালের বিবাহিতা হিন্দুনারীর সমাজ-সমালোচনার তিক্ত-মধুর দংশনও ভোলবার নয়।

নয়নের নাম 'নয়নতারা'। বন্ধ ঘরের বাইরে তার ডাক শুনে, সাগর বলে—'তুমি কে গা—যেন নাপিত-বোয়ের গলা শুনিলাম না'? পরস্পরের এই পরিহাস-তিরস্কারের মধ্যেই বঙ্কিম জানিয়ে দেন যে, সাগরের বয়স চোদ্দ বছর, নয়নের সতের। বন্ধ ঘরের বাইরে থেকে নয়ন জানতে চায়—প্রফুল্লর কথা! তাদের সে প্রশ্নোত্তর সরস এবং স্বতঃস্ফূর্ত :

> নয়ন—বলি, জিজ্ঞাসা করিতেছিলাম কি, আবার একজন এয়েছে না কি?
>
> সাগর—আবার একজন কি? স্বামী?
>
> নয়ন—মরণ আর কি! তাও কি হয়?
>
> সাগর—হলে ভালো হোতো—দুই জনে ভাগ করিয়া নিতাম। তোমার ভাগে নূতনটা দিতাম।

তিন সপত্নীর এই হাস্য-পরিহাস, সংশয়-সমালোচনার দৃশ্যটি বঙ্কিম-সাহিত্যের শেষ পর্বের তত্ত্ব-প্রাধান্যের মধ্যে হাস্যোচ্ছল, বিরল বাস্তবতার অবকাশ ব'লে মনে হয়।

সে-রাত্রে আহারে বসে হরবল্লভ তাঁর গৃহিণীর কাছে শোনেন যে, প্রফুল্ল তখনো সে-বাড়ি ছেড়ে যায় নি। শুনে, তিনি কটূক্তি করেন। গৃহিণী বলেন—'রাত্রে একটা অতিথ এলে তুমি তাড়াও না—আর আমি বৌটাকে রাত্রে তাড়িয়ে দেব?' হরবল্লভ তখন তাঁর ছেলে ব্রজেশ্বরকে ডেকে 'বাগ্দীর মেয়ে' প্রফুল্লকে তাড়িয়ে দিতে বলেন!

ব্রজেশ্বরের বয়স একুশ-বাইশ; বঙ্কিম লিখে গেছেন—'ব্রজ নীরব—বাপের সাক্ষাতে বাইশ বছরের ছেলে—হীরার ধার হইলেও সে কালে কথা কহিত না—এখন যত বড় মূর্খ ছেলে তত বড় লম্বা স্পীচ্ ঝাড়ে।'

কর্তা গিন্নিকে ব'লেছিলেন—ঝাঁটা মেরে বউকে তাড়িয়ে দিতে। ছেলেকে বলেন—'মেয়েমানুষ মেয়েমানুষের গায়ে হাত কি দিতে পারে? এ তোমার কাজ!' গৃহিণী তার উত্তরে জিগেস করেন—বৌয়ের ভরণ পোষণ হবে কোন্

উপায়ে? তার উত্তরে তিনি বলেন—'যা খুশি করুক, চুরি করুক, ডাকাতি করুক,—ভিক্ষা করুক।'

ব্রজেশ্বর স্ত্রীকে সে-কথা বলেন নি বটে,—কিন্তু প্রফুল্ল যে দেবীচৌধুরাণীতে পরিণত হ'য়েছিল,—উপন্যাসে কার্য-কারণের সংগতি রক্ষার দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন ব'লেই বঙ্কিম তার এই আদি-ইতিহাস জানাতে ভোলেন নি।

'আনন্দমঠে' শান্তির পুরুষালী ভাবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ক্ষুণ্ণ হ'য়েছিলেন ব'লে শোনা যায়।[৩৭] কিন্তু সমাজে নারী-নির্যাতনের যে আবহাওয়া বঙ্কিম তাঁর এই শেষ উপন্যাসগুলিতে দেখিয়ে গেছেন, সেই বাস্তব পরিস্থিতির যোগ্য প্রতিবিধানের জন্যেই কল্পনার পাখায় তাঁকে একটু বেশি বেগ সঞ্চার ক'রতে হয়েছিল! এদিক থেকে দেখলে, একথাও মানতে আপত্তি উঠবে না যে, শরৎচন্দ্রের আগেই,—বাংলা উপন্যাসের যথার্থ জনপ্রিয় প্রবর্তক এই বঙ্কিমের লেখাতেই আমাদের নারী-নির্যাতনের প্রতিবাদ শোনা গেছে! রমেশচন্দ্র,—বা 'স্বর্ণলতা'র তারকনাথ,—বা 'মডেল ভগিনী'র যোগেন্দ্রচন্দ্র ঠিক এদিকে কৃতী নন। বঙ্কিম তাঁর নিজস্ব রীতিতে, শরৎচন্দ্রের আগেই, এ-কাজ শুরু ক'রেছিলেন।

ব্রহ্মঠাকুরাণীর সঙ্গে দেখা ক'রে পরিহাসের সঙ্গে ব্রজেশ্বর 'বাগ্দী বউয়ের' কথা তুলেছিলেন। ব্রহ্মঠাকুরাণী বলেন—'ভাই, আমি বুড়ো মানুষ—কৃষ্ণনাম জপ করি, আর আলো চাল খাই।...বাগ্দীর কথাতেও নাই, বামনীর কথাতেও নাই।' পঞ্চম পরিচ্ছেদের এই বৃত্তান্তের পরে, ষষ্ঠে, সাগরের প্রযত্নে প্রফুল্ল আর ব্রজেশ্বরের মিলনের দৃশ্যটি বঙ্কিম খুবই সরসভাবে, পরম সহানুভূতির সঙ্গে ফুটিয়ে তোলেন।

সে-রাত্রে ব্রজেশ্বর প্রফুল্লর মুখচুম্বন করেন। সেই অবকাশে, ঘরের দরজায় কৌতুকহাস্যময়ী সাগর এসে দাঁড়ায় এবং সে-ই কুলুপ দিয়ে দরজা বন্ধ ক'রে দেয়। পরদিন সকালে সে-ই আবার দরজা খুলে দেয়। পতিগৃহ

৩৭। 'অবস্থার সঙ্গে অসঙ্গত বেশভূষা সম্পর্কে মন্তব্য ক'রতে গিয়ে তিনি বঙ্কিমচন্দ্রকেও রেহাই দেন নি: 'তথাপি আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ইহা অপেক্ষাও হাস্যকর ব্যাপার ['ইংরাজি ও বাংলা পোষাক', 'ভারতী' চৈত্র, ১৩০২] 'শান্তি' নাম্নী বীর বঙ্গনারীর শাড়ী পরিয়া অশ্বারোহণ ও মলের গুঁতা দিয়া অশ্বপরিচালনার কিম্ভূতত্ত্ব বঙ্কিমবাবুর ন্যায় একজন সুনিপুণ সৌন্দর্যতত্ত্বজ্ঞ 'আর্টিষ্টের' হৃদয়ঙ্গম হইল না।'—'দ্বিজেন্দ্রলাল কবি ও নাট্যকার,' [১৯৬০] : ডক্টর রথীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত ; পৃষ্ঠা ৪২৫ দ্রষ্টব্য।

ত্যাগ ক'রে যাবার জন্যে প্রস্তুত হ'য়ে,—প্রফুল্ল উঠে দাঁড়িয়ে বলে—'স্ত্রী বলিয়া স্বীকার কর না কর, দাসী বলিয়া মনে রাখিও।' পিতা হরবল্লভকে ব'লে প্রফুল্লর 'খোরপোশ' পাঠাবার ইচ্ছে ব্যক্ত করেন ব্রজেশ্বর। তেজস্বিনী তার জবাবে বলে—'তিনি আমায় ত্যাগ করিয়াছেন, আমি তাঁর কাছে ভিক্ষা লইব না। তোমার নিজের যদি কিছু থাকে, তবে তোমার কাছে ভিক্ষা লইব।' ব্রজেশ্বর নিজের আংটি খুলে দেন। বিদায়ের আগে হালকা ভাবেই আবার চুরি-ডাকাতি ক'রে জীবিকা-অর্জনের পরামর্শের কথা ওঠে। 'দেখা যাবে' বলে প্রফুল্ল বিদায় নেয়! সাগরের সঙ্গে দেখা ক'রে, নিজের মায়ের সঙ্গেই সে-বাড়ি থেকে সে শেষ বিদায় নেয়!

'দেবীচৌধুরাণী'র এই প্রথম ছটি পরিচ্ছেদই এ-কাহিনীর নায়িকা-রূপের পূর্বপ্রস্তাব। তারপর, সংক্ষিপ্ত সপ্তম পরিচ্ছেদে, একই সঙ্গে ঘটনাস্রোতে দুটি প্রধান ব্যাপার ঘ'টে যায়,—প্রথমতঃ প্রফুল্লর মায়ের ব্যাধি এবং মৃত্যু; দ্বিতীয়তঃ মায়ের মৃত্যুর পরে অনাথা কন্যার সম্বন্ধে পল্লীসমাজের স্বাভাবিক চিত্ত-পরিবর্তন! প্রতিবাসীদের সাহায্যেই শ্রাদ্ধ চুকে যায় বটে, কিন্তু শ্রাদ্ধের নিমন্ত্রণ পেয়েও হরবল্লভ আসেন নি। শুধু তাই নয়,—'তাঁহার মন প্রফুল্লর প্রতি বরং আরও নিষ্ঠুর ও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।' আর, ব্রজেশ্বর ভাবলেন—'একদিন রাত্রে লুকাইয়া গিয়া প্রফুল্লকে দেখিয়া আসিব। সেই রাত্রেই ফিরিব।'

এদিকে, প্রফুল্ল তখন অনাথা সুন্দরী! তাদের গ্রামে তখন দুর্বৃত্ত দুর্লভ চক্রবর্তীর লালসা! হঠাৎ ঘটনা-স্রোতের প্রকৃতি ব'দলে যায়। একটি মাত্র পরিচ্ছেদে, বঙ্কিম তাঁর এই কাহিনীকে সে-পরিস্থিতি পেরিয়ে যেতে দিয়েছেন। ফুলমণি-নাপতিনী শ্রাদ্ধের পরে, রাত্রে প্রফুল্লর ঘরে থাকতে রাজি হয়েছিল। জমিদার পরাণ চৌধুরীর গোমস্তা দুর্লভ চক্রবর্তী ছিল ফুলমণির অনুগৃহীত। ষড়যন্ত্র ক'রে তারাই এক রাত্রে প্রফুল্লকে ধ'রে নিয়ে যায়। জমিদারের প্রমোদগৃহের দিকে সে পালকিতে বাহিত হবার সময়ে, পথে দুজন সাধারণ পথিককে আসতে দেখে, তাদের ডাকাত মনে ক'রে,—দুর্লভ, আর, প্রত্যেকটি পালকি-বেহারা—আর, ফুলমণি ইত্যাদি সকলেই পালিয়ে যায়। সেই সুযোগে পালকি থেকে বেরিয়ে, প্রফুল্ল এক জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। হাঁটতে হাঁটতে এক জীর্ণ বাড়িতে পৌঁছে, মুমূর্ষু বৃদ্ধ বৈষ্ণব কৃষ্ণগোবিন্দ

দাসের অন্তিম শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ ক'রে, সে তার দারিদ্র্যপীড়িত অনুজ্জ্বল জীবনে অভাবিতপূর্ব নতুন এক অধ্যায়ে পদার্পণ করে। সপ্তম পরিচ্ছেদ অবধি এ-কাহিনী যেন সামাজিক উপন্যাসের আবহাওয়ায় এগিয়েছে। তারপর হঠাৎ রোমান্সের চমকপ্রদ ঘটনাবৈচিত্র্য দেখা দেয়।

আসন্ন মৃত্যুর ছায়া দেখতে পেয়ে, বৃদ্ধের বৈষ্ণবীটি তাকে ফেলে পালিয়েছে। কৃষ্ণগোবিন্দের যক্ষের ধন প্রফুল্লর জন্যেই তোলা ছিল! অপরাহ্নে বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। নবম পরিচ্ছেদে, তারই নির্দেশ অনুসারে,—আলো জ্বেলে, সুড়ঙ্গে নেমে, মাটি খুঁড়ে, গুপ্তধন পেয়ে প্রফুল্লর শরীর রোমাঞ্চিত হয়! রোমান্সের প্রিয় আবহাওয়ায় ফিরে, বঙ্কিম এই সুযোগে মৃত কৃষ্ণগোবিন্দের তামাক-সেবনের প্রসঙ্গ ধ'রে, অনেকদিন পরে—আবার কমলাকান্তের ভঙ্গিতে সার ওয়াল্টার রালের তামাক আবিষ্কারের সরস উল্লেখ ক'রে, কৃষ্ণগোবিন্দ দাসের ইতিকথা পরিবেষণে মন দেন। 'দেবীচৌধুরাণীর' তৃতীয় খণ্ডে 'লাঠির' গুণমাহাত্ম্য বর্ণনায়, আবার সেই কমলাকান্তী ভঙ্গিই দেখা গেছে।[৩৮]

কৃষ্ণগোবিন্দ ছিল কায়স্থ-সন্তান। এক বৈষ্ণবীর রূপে মুগ্ধ হ'য়ে, বিভিন্ন পুরুষের দৃষ্টি থেকে তাকে কেবলই সরিয়ে সরিয়ে নিজের আয়ত্তে রাখবার চেষ্টায়, সে লোকালয়ের বাইরে এই নির্জন স্থানে বৈষ্ণবীকে এনে বসবাস করে। কালক্রমে, কৃষ্ণদাস সেই বাড়িতে উত্তর-বাংলার নীলধ্বজ বংশের রাজা নীলাম্বর দেবের পূর্বপুরুষদের সঞ্চিত অর্থের সন্ধান পায়। পাঠান-আক্রমণের ভয়ে রাজপরিবারের সেই কুড়ি ঘড়া সোনা-রূপা-মণি-মাণিক্য সেখানে লুকোনো ছিল। প্রফুল্ল সেই টাকা পেয়ে,—সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর বিচালির বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে!

দশম পরিচ্ছেদে ফুলমণির-কথা। ফুলমণি পলায়নরত দুর্লভকে ধ'রতে না পেরে, ঘরে ফিরে, তার বোনের কাছে প্রফুল্লর অন্তর্ধান সম্বন্ধে এই বিবরণ দেয় যে, প্রফুল্লর মা এসে তাকে নিয়ে গেছে! চারদিকে এই অলৌকিক কাহিনীই ছড়িয়ে পড়ে। এ খবর পল্লবিত হ'য়ে প্রফুল্লর শ্বশুরবাড়িতেও পৌঁছে যায়।

একাদশ পরিচ্ছেদে, ভবানী পাঠকের,—এবং দ্বাদশে, রঙ্গরাজের আবির্ভাব। খুচরো টাকা-পয়সা না থাকায় প্রফুল্ল মোহর নিয়ে হাট ক'রতে বেরিয়েছিল।

৩৮। এই গ্রন্থের ১১৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অচেনা পথে, ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের মতন যে লোকটির সঙ্গে তার দেখা হয়, তাঁরই নাম ভবানী পাঠক! প্রফুল্লকে সুলক্ষণা দেখে, ভবানী তাকে 'মা' বলেন। তিনি নাগরা বাজিয়ে দিতেই কালান্তক যমের মতন পঞ্চাশজন বলিষ্ঠ পুরুষ এসে দেখা দিলে তিনি তাদের বলেন—'এই বালিকাকে তোমরা চিনিয়া রাখ। ইহাকে আমি 'মা' বলিয়াছি। ইহাকে তোমরা সকলে 'মা' বলিবে এবং মার মত দেখিবে। তোমরা ইহার কোন অনিষ্ট করিবে না, আর কাহাকেও করিতে দিবে না।' প্রফুল্লকে ভবানী পাঠকের শরণার্থিনী হ'তে হয় এই অবস্থায়! ভবানী তার আশ্রয়-স্থানটি দেখে রাখেন,—পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে তার প্রাপ্ত ধনের পরিমাণও জেনে নেন; হয় পাপের পথে, নয় পুণ্যের পথে সেই সম্পদের ব্যয় যে অনিবার্য, তাও আলোচনা করেন। সেই আলোচনার মধ্যেই দেখা যায়:

প্রফুল্ল 'আপনি দেখিতেছি জ্ঞানী, আপনি আমায় শিখাইয়া দিন, ধন লইয়া কি করিব।'

ভবানী 'শিখাইতে পাঁচ সাত বৎসর লাগিবে। যদি শেখ আমি শিখাইতে পারি। এই পাঁচ সাত বৎসর তুমি ধন স্পর্শ করিবে না। তোমার ভরণ-পোষণের কোন কষ্ট হইবে না। তোমার খাইবার পরিবার জন্য যাহা যাহা আবশ্যক, তাহা আমি পাঠাইয়া দিব। কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে দ্বিরুক্তি না করিয়া মানিতে হইবে।'

প্রথমেই প্রফুল্লর লেখাপড়ার কাজ শুরু হবে। এই নতুন ব্যবস্থায় সে সম্মত হয়।

বাড়ির বাইরে এসে ভবানী পাঠক দেখেন রঙ্গরাজ তাঁর জন্যে অপেক্ষা ক'রছে।

রঙ্গরাজকে তিনি বলেন এতোদিনের প্রতীক্ষার পরে একজন 'রাণী' পাওয়া গেছে! রঙ্গরাজ বলে,—'রাজা রাণী আর খুঁজিতে হইবে না। ইংরেজ রাজা হইতেছে। কলিকাতায় নাকি 'হস্টিন' [ওয়ারেন হেস্টিংস] বলিয়া একজন ইংরেজ ভাল রাজ্য ফাঁদিয়াছে।'

ভবানী তখন রঙ্গরাজকে প্রফুল্ল সম্বন্ধে তাঁর পরিকল্পনার ইঙ্গিত দেন:

'জগদীশ্বর লোহা সৃষ্টি করেন, মানুষ কাটারী গড়িয়া লয়। ইস্পাত ভাল পাইয়াছি; এখন পাঁচ সাত বৎসর ধরিয়া

গড়িতে শানিতে হইবে।[৩৯] দেখিও, এই বাড়িতে আমি ভিন্ন আর কোন পুরুষ মানুষ না প্রবেশ করিতে পায়।'

রঙ্গরাজ বলে—'সম্প্রতি ইংরাজদের লোক রঙ্গনপুর লুঠিয়াছে।' ভবানী বলেন—'চল, তবে আমরা ইজারাদারের কাছারি লুঠিয়া, গ্রামের লোকের ধন গ্রামের লোককে দিয়া আসি।...'

ভবানী পাঠকের সন্ধান, লক্ষ্য, বৃত্তি, স্বপ্ন এবং স্বভাবের মূলকথাগুলি এই দ্বাদশ পরিচ্ছেদে একসঙ্গে সুকৌশলে দেখানো হয়েছে। রঙ্গরাজের অল্প কয়েকটি কথাতে হেস্টিংসের উল্লেখ সে-পর্বের শাসন-ব্যবস্থারও ইঙ্গিত দেয়; এবং সপ্তম পরিচ্ছেদে, দুর্লভ চক্রবর্তী যখন প্রফুল্লকে ধ'রে নিয়ে যায়, সেই অংশে দেশের তৎকালীন অবস্থা সম্বন্ধে ইতিপূর্বেই কিছু বলা হ'য়েছে।

৩৯। এই 'গড়িয়া শানিতে হইবে' উক্তিটি অনুশীলন-আদর্শের ইঙ্গিত। বিসমার্ক, ডিস্‌রেলি, গ্লাডস্টোন, রুশো, ভলটেয়ার,—মিল্‌, বেন্থাম, ওয়েন ইত্যাদি রাষ্ট্রজ্ঞ ও সমাজবিদ্‌দের চিন্তা,—বাঙালী সমাজে নারীর অসহায় অবস্থার চিন্তা ইত্যাদি সবই বঙ্কিমের মনে ছিল। 'বিবিধ প্রবন্ধের' 'প্রাচীনা এবং নবীনা' স্মরণীয়। সেই সঙ্গে এও মনে পড়ে যে, ১৮৬০-৮০র মধ্যে বাংলাদেশে কোঁতের চর্চা ছিল। মন্মথনাথ ঘোষের 'Life of Girish Chunder Ghose' [১৯১১] বইখানিতে 'Canning Institute' এর কথা আছে। ১৮৬৫র এপ্রিলে হাওড়ায় এই সংসদ স্থাপিত হয়। দীনবন্ধু সান্যালের লেখা জাস্টিস দ্বারকানাথ মিত্রের ইংরেজি জীবনীতে [১৮৮৩] দ্বারকানাথের কাছে লেখা Congreve এর কয়েকখানি চিঠি ছাপা হয়। 'Letters on Hinduism'-এ বঙ্কিম 'ধর্ম' সম্বন্ধে লেখেন:

'Positivists give quite rightly the name of religion to their own system which utterly ignores and puts entirely out of court that theology to which alone the professors of religion have hitherto restricted the name. We have heard of a religion of Art and a religion of Science. (See **Natural Religion** by the author of **Ecce Homo.**) What then is religion ?

...I am not one of those who think that a belief in God, or in a number of gods, or in a future existence, or anything else which does admit of proof, constitute religion. But when such belief, or any belief whatever, furnishes a basis for conduct—for the conduct of the individual towards himself as well as towards others, when by becoming a common faith and therefore furnishing a common basis of conduct, it becomes a bond of union between man and man, a standard by which human existence individual and aggregate, comes to be regulated, it is religion. This is a very large definition, I admit. Religion, viewed thus, is in theory a philosophy of life; in practice it is a rule of life. It includes our beliefs, and the principles of our conduct founded upon those beliefs.'

অতঃপর তিনি বলেন: 'Now, test this definition by taking as an illustration an extreme case. Take the case of the Utilitarian. He has a rule of conduct, —the greatest good of the greatest number. No one has ever dreamt of

'আনন্দমঠে এই দেশ-কালের কথাই অপেক্ষাকৃত বেশি মনে হয়। 'দেবীচৌধুরাণী'তে সে তুলনায় আধ্যাত্মিক তত্ত্বালোচনাই বেশি।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে, প্রতিশ্রুত দুটি পরিচারিকা এসে পৌঁছোয়—একজন তিয়াত্তর বছরের ক্ষীণশ্রুতি 'গোবরার মা'; দ্বিতীয়া,—প্রফুল্লের চেয়ে পাঁচ-সাত বছরের বড়ো, উজ্জ্বল-যৌবনা ব্রাহ্মণ-কন্যা 'নিশি'। 'গোবরার মা'র কোনো কাজেরই সামর্থ্য ছিলনা। নিশি কিন্তু অধ্যাত্মবোধময়ী বিদুষী! ছেলেবেলায় তাকে ডাকাতে ধ'রে নিয়ে এক রাজবাড়িতে বেচে দেয়; সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে সে ভবানী পাঠকের হাতে পড়ে।

নিশি বলে—'আমি তাঁহার কন্যা, তিনি আমার পিতা'। ভবানী তাকে শ্রীকৃষ্ণে সমর্পণ করেন! শ্রীকৃষ্ণই তার স্বামী! তাই, নিশির কথা—'যিনি সম্পূর্ণরূপে আমার অধিকারী, তিনিই আমার স্বামী।' এবং—'শ্রীকৃষ্ণে সকল মেয়েরই মন উঠিতে পারে; কেননা তাঁর রূপ অনন্ত, যৌবন অনন্ত, ঐশ্বর্য অনন্ত, গুণ অনন্ত!' নিশি ভবানীঠাকুরের যোগ্য চেলা। প্রফুল্ল কিন্তু তখনো নিরক্ষরা। নিশির কথার ওপর বঙ্কিম তাঁর এই ভাষ্য যোগ ক'রেছেন:

applying the name of religion to simple Utilitarianism. But why, I ask, does the Utilitarian seek the greatest good of the greatest number? Why does he seek the good? Because he loves the good. He is a worshipper of the good. That is his Religion. Nor is his religion a wholly false religion, for the good is entitled to our love and our worship, and to regulate our conduct. It is so far a false religion that it does not take any cognizance of what along with the good claims our love and worship, and to regulate our life. It takes cognizance only of one of the aspects in which man and nature are presented to our apprehension. Add to it, the worship of the Beautiful and the true, and you have a complete religion. Add to Morality, Science and Art, and you have a complete guide to life.

You may reply to this, that this is culture, not Religion. I may reply to you, in the words of the writer, whom we both admire, that 'the substance of Religion is Culture' (Natural Religion by the author of Ecce Homo, p. 145).

বঙ্কিমের মনে সনাতন ধর্মের চিন্তা, আর কোঁৎ, বেন্থাম প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিকদের মতামতের ভাবনা একই সঙ্গে বিদ্যমান ছিল। বঙ্কিম যখন হুগলী কলেজের ছাত্র, কোঁতের Systeme de Philosophie বইখানি সেই সময়ে [১৮৫৪] ছাপা হয়। ডক্টর রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত লিখেছেন—'অনুমান করিতে পারি Comte-এর দর্শনের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয় Harriet Martineau কৃত The Positive Philosophy of Auguste Comte দুই খণ্ডের গ্রন্থ হইতে।' এইসূত্রে তিনি বঙ্কিমের 'The Study of Hindu Philosophy'তে Lecky ও Buckle-এর উল্লেখ সম্বন্ধেও আলোচনা ক'রেছেন।—'কথাসাহিত্য', আশ্বিন, ১৩৭০ দ্রষ্টব্য।

'ঈশ্বর অনন্ত জানি। কিন্তু অনন্তকে ক্ষুদ্র হৃদয়পিঞ্জরে পুরিতে পারি না। সান্তকে পারি। তাই অনন্ত জগদীশ্বর, হিন্দুর হৃৎ-পিঞ্জরে সান্ত শ্রীকৃষ্ণ। স্বামী আরও পরিষ্কাররূপে সান্ত। এইজন্য প্রেম পবিত্র হইলে, স্বামী ঈশ্বরে আরোহণের প্রথম সোপান। তাই হিন্দুর মেয়ের পতিই দেবতা। অন্য সব সমাজ, হিন্দু সমাজের কাছে এ অংশে নিকৃষ্ট।'

এই তত্ত্ব-বিচিন্তার পরেই, চতুর্দশ পরিচ্ছেদে, ব্রজেশ্বরের বৃত্তান্তে ফিরেছেন লেখক। দুর্লভ চক্রবর্তী যে-রাত্রে প্রফুল্লকে তার মায়ের বাড়ি থেকে ধ'রে নিয়ে যায়, ব্রজেশ্বর সেই রাত্রেই তার সঙ্গে দেখা ক'রতে যান, কিন্তু প্রফুল্লকে সেখানে না পেয়ে তাঁকে ফিরে যেতে হয়। তারপর, দিনে দিনে মন তাঁর ভারাক্রান্ত হ'য়ে ওঠে। ব্রহ্মঠাকুরাণী তাঁর মনের খবর জানতে চেষ্টা ক'রে নয়ন-বৌ, সাগর-বৌয়ের কথা তোলেন। তিনি প্রফুল্লর নাম ক'রতেই ব্রজেশ্বরের মুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্রের সে উপমাটি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ একটি উপমার ছায়া!

'যেমন পথে কেহ প্রদীপ লইয়া যখন চলিয়া যায়, তখন পথিপার্শ্বস্থ অন্ধকার ঘরের উপর সেই আলো পড়িলে, ঘর একবার হাসিয়া আবার তখনই আঁধার হয়, প্রফুল্লের নামে ব্রজেশ্বরের মুখ তেমনই হইল।'

কালিদাসের 'রঘুবংশে' ইন্দুমতীর স্বয়ংবর-সভার কথা মনে পড়ে!

প্রফুল্লর অন্তর-বাহিরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ ব্রজেশ্বরের হৃদয় তখন 'প্রফুল্লময়'! ইতিমধ্যে ফুলমণির রটনা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হ'য়ে তাঁদের কানে পৌঁছোয় —'প্রফুল্ল বাত শ্লেষ্মা বিকারে মরিয়াছে—মৃত্যুর পূর্বে তার মরা মাকে দেখিতে পাইয়াছিল।' এ-খবর পেয়ে ব্রজেশ্বর মর্মান্তিক আহত হন। কিন্তু পিতার প্রতি শ্রদ্ধা এবং নিজের পত্নীর প্রতি পিতার দুর্ব্যবহারের যন্ত্রণা,—এই দুইয়ের মধ্যে প্রথমটিরই জয় হয়।

প্রথম খণ্ডের শেষ দুটি পরিচ্ছেদে,—অর্থাৎ পঞ্চদশে, ষোড়শে প্রফুল্লর শিক্ষাপর্বের পরিচয় দেওয়া হয়েছে। ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, অভিধান,—রঘু, কুমার, নৈষধ, শকুন্তলা প্রভৃতি কাব্য,—এবং অল্পপরিমাণে সাংখ্য, বেদান্ত,

ন্যায়শাস্ত্রও প্রফুল্ল অবলীলাক্রমে শিখে ফেলে! তারপর, তার যোগ-সাধনায় নিয়োগ,—এবং পরিশেষে, আচার্য তাকে—'সর্বগ্রন্থশ্রেষ্ঠ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় অধীত করাইলেন'। প্রফুল্লর এ-শিক্ষা পাঁচ বছরে সম্পন্ন হয়। নিশির সাহায্যে ভবানীঠাকুর তার আহার-নিদ্রা-সংযমের এবং শরীর-চর্চারও শিক্ষা দেন। প্রফুল্ল সবই মেনে নেয়, কেবল একাদশীর দিন সে জোর ক'রে মাছ খেতো! ভবানীঠাকুরের উপস্থিতিতে পুরুষ লাঠিয়ালের সঙ্গে মল্লযুদ্ধেও পারদর্শিনী হ'য়ে উঠতে হয় তাকে। পঞ্চম বৎসরে এইভাবে তার শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়! এইভাবে ঐশ্বর্যভোগের জন্যে সর্বপ্রকারে প্রস্তুত হ'য়ে,—ষোড়শ পরিচ্ছেদে তাকে ভবানীঠাকুরের কাছে নিজের নির্বাচিত সাধনাদর্শের কথা জানাতে হয়। কর্মপথেই তার অভিরুচি জেনে, ইন্দ্রিয়সংযমের দ্বারা অনাসক্তচিত্ত কর্মসাধনার গীতোক্ত শ্লোক স্মরণ ক'রে ভবানীঠাকুর বলেন—'নিরহঙ্কার ব্যতীত ধর্মাচরণ নাই',—'সর্বকর্মফল ঈশ্বরে অর্পণ করিবে'।

তখন প্রফুল্ল বলে—'তিনি সর্বভূতস্থিত,—অতএব সর্বভূতে এ ধন বিতরণ করিব'।

ভবানী বলেন—'কিন্তু এই সর্বভূতসংক্রামক দানের জন্য অনেক কষ্ট, অনেক শ্রমের প্রয়োজন। তাহা তুমি পারিবে?' তিনি ব্যাখ্যা ক'রে বলেন যে, তাঁর দস্যুবৃত্তিও সেই একই সাধনা।[৪০] প্রফুল্ল বলে—'আমার কাছে শ্রীকৃষ্ণের যে ধন আছে, কিছু আপনার কাছে থাক্। এই ধন লইয়া ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত থাকুন। দুষ্কর্ম হইতে ক্ষান্ত হউন।'

বস্তুতঃ ভবানী 'আনন্দমঠের' সত্যানন্দেরই আর এক রূপ। তিনি বলেন:

> 'এ দেশে রাজা নাই। মুসলমানও লোপ পাইয়াছে। ইংরেজ সম্প্রতি ঢুকিতেছে—তাহারা রাজ্যশাসন করিতে জানেও না, করেও না। আমি দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করি।'[৪১]

৪০। 'বঙ্কিমের অনেক গল্পেই ডাকাত আছে। 'রাজমোহনস্ ওয়াইফ'-এর ডাকাত শুধু ডাকাত, 'রাজসিংহে'র মানিকলাল পলিটিক্যাল ডাকাত। আর, সত্যানন্দ, ভবানী ঠাকুর ডাকাত বটে, কিন্তু কত উঁচুমনা, কত বিভিন্ন শ্রেণীর। তাহারা যেন বর্জাইস টাইপে ছাপা ভগবদ্গীতা সর্বদা পকেটে লইয়া বনে পাহাড়ে ঘুরিয়া বেড়ায়।'

—'বঙ্কিম-প্রতিভার ক্রমবিকাশ' : যদুনাথ সরকার

৪১। 'তখন দেশ অরাজক। মুসলমানের রাজ্য গিয়াছে; ইংরেজের রাজ্য ভাল করিয়া পত্তন হয় নাই—হইতেছে মাত্র। তাতে আবার বছর কত হইল, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর দেশ

বাগ্মীর বাক্যচ্ছটার গুণে তখনকার দেশব্যাপী দুষ্টের দৌরাত্ম্য বর্ণনা ক'রে তিনি প্রফুল্লর মন জয় ক'রে নেন। প্রফুল্ল তখন তাঁর ডাকাতির ব্রতে শাণিত অস্ত্র হ'য়ে উঠেছে! প্রথম খণ্ডের শেষ কথাগুলিতে ভবানীর এই সংকল্পসিদ্ধির ইঙ্গিতই স্পষ্ট। সেইসঙ্গে দেবীচৌধুরাণীর গূঢ় নারী-প্রকৃতি সম্বন্ধে আরো একটি ইঙ্গিত পাওয়া যায়—'তবে ভবানীঠাকুরের একটা বড় ভুল হইয়াছিল—প্রফুল্ল একাদশীর দিন জোর করিয়া মাছ খাইত, এ কথাটা আর একটু তলাইয়া বুঝিলে ভাল হইত।'

দ্বিতীয় খণ্ডের মোট বারোটি পরিচ্ছেদে প্রফুল্লর 'দেবীচৌধুরাণী'-সত্তার —এবং হরবল্লভ আর ব্রজেশ্বরের সঙ্গে তার এই পর্বের সংযোগ-সম্পর্কের কথাই প্রধান। 'বাগ্দীর মেয়ে' ব'লে প্রফুল্লকে হরবল্লভ যেদিন তাড়িয়ে দেন, তখন থেকে সুদীর্ঘ দশটি বছর কেটে গেছে। হরবল্লভের জমিদারির অবস্থা এই দশ বছরের মধ্যে ক্রমেই খারাপ হ'য়ে যায়। ইজারাদার দেবী সিংহের কাছে তাঁকে প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকা ধার নিতে হয়। সংক্ষিপ্ত প্রথম পরিচ্ছেদে প্রদত্ত সেই খবরের পরেই, দ্বিতীয়ে দেখা যায়—হরবল্লভের নামে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা বেরিয়েছে! তখন বাপকে বাঁচাবার জন্যে ব্রজেশ্বর তাঁর শ্বশুরের কাছে—অর্থাৎ সাগর-বৌয়ের বাপের বাড়িতে যান। সাগরের বাবা জামাইকে টাকা দিতে অনিচ্ছুক ছিলেন না, কিন্তু হরবল্লভের হাতে প'ড়লে সে টাকা 'মহাজনে' ধ্বংস ক'রবে ব'লেই তিনি তাতে অসম্মত হন। শ্বশুরের তিরস্কারে, রাগ ক'রে ব্রজেশ্বর সাগরকে পরিত্যাগ করেন। বিদায়ের আগে স্বামী-স্ত্রীর নিভৃত সাক্ষাতেও ব্রজেশ্বরের সে রাগ নেভে না, বরং আরো জ্ব'লে ওঠে। সাগর অনুরোধ করে; স্বামীর পা জড়িয়ে ধরে। ব্রজেশ্বর পা ছাড়িয়ে নেন। সাগর বলে 'কি? আমায় লাথি মারলে?' কথায় কথায় কথা বেড়ে যায়। সেই রাগের ঝোঁকে, সেই অভাবিতপূর্ব পরিস্থিতিতে,—ঘরের জানলায় উপস্থিত দেবী চৌধুরাণীর আকস্মিক নির্দেশ শুনে, সাগর ব'লে ফেলে: 'আমি যদি ব্রাহ্মণের মেয়ে হই, তবে তুমি আমার পা কোলে লইয়া চাকরের মত টিপিয়া দিবে'! ব্রজেশ্বর বলেন, 'আমারও সেই কথা'!

ছারখার করিয়া গিয়াছে। তারপর আবার দেবী সিংহের ইজারা। পৃথিবীর ওপারে ওয়েস্টমিনস্টর হলে দাঁড়াইয়া এদ্‌মন্দ্ বার্ক সেই দেবী সিংহকে অমর করিয়া গিয়াছেন। পর্বতোত্তীর্ণ অগ্নিশিখাবৎ জ্বালাময় বাক্যস্রোতে বার্ক দেবীসিংহের দুর্বিষহ অত্যাচার অনন্তকালসমীপে পাঠাইয়াছেন।...'—দেবী চৌধুরাণী. প্রথম খণ্ড, সপ্তম পরিচ্ছেদ।

ব্রজেশ্বর চ'লে যাবার পরে সাগর পা ছ'ড়িয়ে কাঁদতে বসে। সেই অবস্থায় দেবী চৌধুরাণীর আবির্ভাবে সাগরের পরিচারিকা ভয়ে ব'সে পড়ে। সাগরও সন্ত্রস্ত হয়। কিন্তু সে কেবল মুহূর্তের জন্যে। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের শেষ বাক্যেই মেঘ কেটে যেতে দেখা যায়! বঙ্কিম লিখেছেন: 'সাগর আবার ক্ষণেক পরে হাসিয়া উঠিল। তখন দেবী চৌধুরাণীও হাসিল।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদে, বর্ষার ত্রিস্রোতা নদীর ধারায় দেবীর বজরা ভাসতে দেখা যায়! গভীর রাত্রে বীণা বাজাতে-বাজাতে, দেবী এক নৌকো অনুসরণের আদেশ দিতেই রঙ্গরাজ ছিপ খুলে দেয়। চতুর্থে, দেবীর অনুচরদল সেই নৌকো থেকে ব্রজেশ্বরকে বন্দী ক'রে আনে। সে-দৃশ্যে ব্রজেশ্বরের সাহসের পরিচয় আছে। পঞ্চমে, পর্দার আড়ালে থেকে দেবী ব্রজেশ্বরের সঙ্গে আলাপ করেন। 'আপনি কে?'—এই কথাটি ব'লতে গিয়ে দেবীর গলার স্বর যেন বেধে যায়! চোখের জলও পড়ে। তিনি সরে যান। অতঃপর ব্রজেশ্বরের সঙ্গে 'নিশি ঠাকুরাণী'র কথা। এক-কড়া কানা-কড়ির দামে, রাঁধুনী বামুনের কাজে লাগাবার জন্যে, নিশি-ঠাকরুণ দেবীর কাছ থেকে ব্রজেশ্বরকে কিনে নেন! ষষ্ঠ পরিচ্ছেদে, এই আপাতভয়প্রদ কৌতুকাবহের মধ্যেই ছদ্মবেশী সাগর সেই বজরায় ব্রজেশ্বরকে দিয়ে পা টিপিয়ে নেয় এবং পরিচ্ছেদের শেষে তার আত্মপরিচয় উদ্‌ঘাটিত হয়! যোগ্য সম্মান-সম্ভ্রম, আদর-আপ্যায়নের পরে ব্রজেশ্বরকে দেবী-সন্দর্শনে নিয়ে যাওয়া হয়। অষ্টমে, দেবত্র সম্পত্তি হিসেবে ব্রজেশ্বরকে দেবী এক ঘড়া মোহর ধার দেন। সে মোহরের দাম পঞ্চাশ হাজার টাকার বেশি! ব্রজেশ্বরের আঙুলে দেবী নিজের হাতের আংটি পরিয়ে দেন। তখন আবার অশ্রুপাত! অনতিস্পষ্ট স্মৃতির সূত্র ধ'রে প্রফুল্লর মুখ মনে পড়ে! দেবী চৌধুরাণীর মুখচুম্বন ক'রেও নিজের অনতিনিশ্চিত স্মৃতি জাগাতে না পেরে, লজ্জায়, সংশয়ে বিচলিত অবস্থায় ব্রজেশ্বর ঊর্ধ্বশ্বাসে নিজের নৌকোয় গিয়ে ওঠেন। তাঁর সঙ্গে তখন দুটি রত্নাধার—এক সাগর,—আর দ্বিতীয়টি মোহরের ঘড়া! নিশি ফিরে এসে, দেবীকে নৌকোর তক্তায় লুটিয়ে প'ড়ে কাঁদতে দেখে! তখন নিশি বলে: 'ও সকল ব্রত মেয়েমানুষের নহে। যদি মেয়েকে ও পথে যেতে হয়, তবে আমার মত হইতে হইবে। আমাকে কাঁদাইবার জন্য ব্রজেশ্বর নাই। আমার ব্রজেশ্বর বৈকুণ্ঠেশ্বর একই।'

নবম পরিচ্ছেদে, প্রত্যাবর্তনের পথে, সাগরের কাছে ব্রজেশ্বর শোনেন দেবী-ই প্রফুল্ল, প্রফুল্লই 'দেবী চৌধুরাণী'! তখন, দেবীর দেওয়া আংটিতে ব্রজেশ্বর নিজের নাম দেখতে পান। নিস্পন্দ হয়ে কিছুক্ষণ ব'সে থাকেন তিনি। তারপর বলেন 'প্রফুল্ল ডাকাত। ছি!'

দশম পরিচ্ছেদে নৌকোয় ব্রজেশ্বরের এই চিন্তার সঙ্গে দূরস্থিতা দেবীর ভাবান্তরের যোগটি বঙ্কিম যেন ইঙ্গিতে দেখিয়েছেন। তারপর অরণ্যে, ভূগর্ভের এক শিবমন্দিরে ভবানী পাঠকের সঙ্গে দেবীর দেখা হয়। ভবানী পাঠককে তিনি বলেন—আমার মত ফিরিতেছে।...পরদ্রব্য কাড়িয়া লওয়া মন্দ কাজ নয়ত মহাপাতক কি?...আমি কাশী গিয়া বাস করিব, মানস করিয়াছি।'

হরবল্লভকে সাহায্য করবার সংকল্প শুনে ভবানী বলেন 'হরবল্লভ রায় অতি পাষণ্ড'। প্রফুল্লকে হরবল্লভ যে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, ভবানী সে-ইতিহাস জানতেন; কিন্তু দেবী-ই যে প্রফুল্ল, সে-খবর তখনো তাঁর জানা ছিল না। পরিচ্ছেদের শেষদিকে, বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলে এক সভার আয়োজনের খবর পাওয়া যায়। সেই পথে বজরা ফিরিয়ে,—'দেবী স্বহস্তে আপনার শাকান্ন পাকের জন্য হাঁড়িশালায় গেল'!

ইতিমধ্যে গুডল্যাড সাহেবের কাছে সেই সভার খবর পৌঁছোয়; আর, হরবল্লভ শোনেন যে, দেবীর কাছে টাকা ধার করা হ'য়েছে এবং বৈশাখের শুক্লা সপ্তমীর রাত্রে সন্ধানপুরে কালসাজির ঘাটে দেবীর বজরায় সে টাকা ফিরিয়ে দিতে হবে! একাদশ-দ্বাদশ পরিচ্ছেদে এই দুটি খবরই প্রধান। এই পরিস্থিতিতে চতুর হরবল্লভ ইংরেজের কাছে দেবীকে ধরিয়ে দেবেন স্থির করেন! তিনি গৃহিণীকে বলেন, ছেলের সম্মতি থাকলে তার আর-একটি বিয়ের আয়োজনে তাঁর কোনো আপত্তি নেই!

তৃতীয় খণ্ডে এ-কাহিনীর মধুর, অবিশ্বাস্য, কল্যাণময় পরিণাম দেখানো হ'য়েছে। রংপুরের কালেক্টারের সাহায্য পেয়ে হরবল্লভ গোপনে দেবীকে ধ'রিয়ে দিতে চলেন। লেফটেনাণ্ট ব্রেন্যান সৈন্য নিয়ে তাঁর সঙ্গী হন। এদিকে দেবীর লাঠিয়াল বরকন্দাজ-দলের কথাও সে-পক্ষের জানা ছিল। সেইসূত্রে এ-উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্রের লাঠি-বন্দনার কথা আগেই বলা হ'য়েছে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে, দেবী সেই আসন্ন সংকট সম্বন্ধে অবিচলিত থেকেই নিজের বজরায় দিবা-নিশির সঙ্গে ঈশ্বর মানুষের প্রত্যক্ষ কী না, তারই আলোচনা ক'রছিলেন। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং ততোধিক মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়ে কথা ওঠে। নিশির কথায় সাংখ্যপ্রবচন আর সাংখ্যভাষ্যের ইঙ্গিত দেখা দেয়। দেবী বলেন 'ঈশ্বর মানস-প্রত্যক্ষের বিষয়।' জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ যেন মনের দূরবীণে সত্যদর্শনের সাধনা!

সেই আলাপ-আলোচনার মধ্যেই যথানির্দিষ্ট কালে ব্রজেশ্বরের পান্‌শি এসে পৌঁছোয়। ব্রজেশ্বর এবার 'প্রফুল্ল' ব'লে ডাকেন। তখন দেবীর চোখে জল। ব্রজেশ্বরের চোখে জল। ব্রজেশ্বর বলেন—'মনের মন্দিরের ভিতর সোনার প্রতিমা গড়িয়া বলিয়াছিলাম—আমার সেই প্রফুল্ল—মুখে আসেনা—সেই প্রফুল্লের এই বৃত্তি!'

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে এই উক্তি শুনেও প্রফুল্ল স্বামীকে শ্বশুরবাড়িতে তার নির্যাতনের পূর্বকথা মনে না-করিয়ে দেবার পুণ্য অর্জন করে! বঙ্কিম দেবীর সেই আত্মসংবরণের সাধুবাদ ক'রেছেন। দেবী তখন শুধু এই কথা বলেন: 'তোমায় এই দশ বৎসরের পর পাইয়া এখন উপযাচিকা হইয়া বিদায় দিতেছি।' নিজের দুটি সখীকে তিনি স্বামীর নৌকোয় উঠিয়ে দিতে চেয়েছেন। এ সবই আসন্ন বিঘ্নের আশঙ্কায় শেষ বিদায়ের আয়োজন! কিন্তু ভবিতব্যের অন্য অভিপ্রায় ছিল। সেই সময়ে—'দুম্ করিয়া একটা বন্দুকের শব্দ হইল।'

তৃতীয় পরিচ্ছেদে কোম্পানির সিপাহী এসে পড়ে। দ্রুতগতি, অবসানমুখী অবসরে প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে বলেন:

> 'আর বাঁচিয়া কি হইবে? তোমার দেখা পাইলাম, তোমাকে মনের কথা বলিলাম, তুমি আমায় ভালবাস, তাহা শুনিলাম। আমার যে ধন ছিল, তাহাও বিলাইয়া শেষ করিয়াছি।...আর বাঁচিব কেন?'

ব্রজেশ্বর বলেন—'বাঁচিয়া আমার ঘরে গিয়া, আমার ঘর করিবে।'

সঙ্গে সঙ্গে দেবীর সংকল্প ব'দলে যায়! আর, হরবল্লভই 'গোয়েন্দা' —এ-কথা শুনে ব্রজেশ্বরকে মাথায় করাঘাত ক'রতে হয়!

কিন্তু তবু,—বঙ্কিমের আমলে আমাদের সামাজিক জীবনে বহুকালের পারিবারিক শ্রদ্ধা-ভক্তির বিবেক ছিল দুর্মর! হরবল্লভের সন্তান ব্রজেশ্বর!

পিতা স্বর্গ, পিতা ধর্ম, পিতাই তাঁর পরম তপস্যা। প্রথম খণ্ডের চতুর্দশ পরিচ্ছেদে আবার একবার সে-উল্লেখ দেখা গেছে। তৃতীয় খণ্ডের তৃতীয় পরিচ্ছেদে আবার সেই স্মৃতি দেখা দেয়। ব্রজেশ্বর বলেন: 'তোমার আত্মরক্ষার আগে, আমার ছার প্রাণ রাখিবার আগে, আমার পিতাকে রক্ষা করিতে হইবে।'

তারপর, চতুর্থ থেকে দশম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত চমকপ্রদ ঘটনার তীব্র, তীক্ষ্ণ তরঙ্গচ্ছটা! দেবীর দলের সাহস, প্রত্যয়, শৃঙ্খলা, অভয়সাধনা! দেবী অসংখ্য অনুগামীর প্রাণনাশ চান নি! রঙ্গরাজ তাঁরই হুকুমে শান্তির শ্বেত পতাকা দেখিয়েছে। লেফটেনান্ট সাহেব এসেছেন দেবীর বজরায়। কিন্তু দিবা, নিশি, দেবী, রঙ্গরাজ—এঁদের সকলের কথার ভিড়ে কে যে আসল দেবী, সাহেবের মনে সে-বিষয়ে সন্দেহ ঘনিয়ে ওঠে। সপ্তম পরিচ্ছেদে, তাঁদের সকলকে নিয়ে বৈশাখী ঝড়ে দেবীর বজরা হঠাৎ উধাও হবার আগেই, আসল দেবীকে চিনিয়ে দেবার জন্যে গোয়েন্দা হরবল্লভকে সেখানে হাজির করা হয়। কিন্তু হরবল্লভও অক্ষম! তিনিও দেবীকে চিনতে পারেন না। সাহেব বলেন—'টোম্ বজ্‌জ্রাট—শূওর'! ব্রজেশ্বরকেও ডাকা হয়। ব্রজেশ্বর বলেন যে, দেবী সেখানে নেই। পিতৃলাঞ্ছনায় ক্রুদ্ধ সন্তান সাহেবের গালে 'বিরাশি সিক্কার এক চপেটাঘাত' করেন। অষ্টমে, বন্দী অবস্থায় বজরায় ভাসতে-ভাসতেও আবার হরবল্লভের সাহেব-বন্দনা দেখা দেয়! ব্রজেশ্বরের প্রতিবাদও স্তব্ধ হয় না! এদিকে, নিশি হরবল্লভকে ডাকিনীর শ্মশানে শূলে দেবার ভয় দেখায়। তখন 'হরবল্লভ ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিল।' সাহেব বলে: 'রোও মৎ—উল্লুক! মরনা এক রোজ আলবৎ হ্যায়।'

ভয়ার্ত হরবল্লভকে নিশি পঁচিশ-ত্রিশ বছরের একটি কুলীন-কন্যাকে বিয়ে ক'রতে বলে। প্রাণনাশের পরিবর্তে বিবাহে সম্মতি জানাতে হরবল্লভ তখন খুবই আগ্রহী। কিন্তু বঙ্কিম তাঁকে একটু বাঁচিয়ে ছবি এঁকেছেন! নিজের নয়, ছেলের বিয়েতেই হরবল্লভকে মত দিতে হয়! রাজী হ'য়ে সাহেবের কাছে হরবল্লভ সে-সব কথা কিছুই বলেন নি। আর সাহেব বলে: 'বাঙ্গালী এমনই মিথ্যাবাদী বটে!'

নবম পরিচ্ছেদে, সাহেবকে পাথেয় দিয়ে পথে নামিয়ে দেওয়া হয়। দশমে, ছেলেকে বিয়ের আদেশ দিয়ে, ব্রজেশ্বর আর নিশির প্রণাম নিয়ে, হরবল্লভও বিদায় নেন। দেবী নিশিকে বলেন: 'দেবী চৌধুরাণী মরিয়াছে,

তার নাম এ পৃথিবীতে মুখেও আনিও না।' একাদশে, ভূতনাথের ঘাটে দিবা-নিশির আশীর্বাদ নিয়ে, সালঙ্কারা বধূ প্রফুল্ল আবার সংসারের পথে নেমে যায়। রঙ্গরাজকে দেবীগড়ের সমস্ত সম্পত্তি উপহার দিয়ে সে ব'লে যায়ঃ 'দুষ্টের দমনঃ রাজা না করেন, ঈশ্বর করিবেন—তুমি আমি কে? শিষ্টের পালনের ভার লইও—কিন্তু দুষ্টের দমনের ভার ঈশ্বরের উপর রাখিও।' তবু যাবার আগে, ভবানী ঠাকুরের উদ্দেশ্যে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে গেছে সে।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদে, পুরোনো সংসারে প্রফুল্ল আর-একবার নববধূ হ'য়ে প্রবেশ করে। এবার তার সমাদরের দিন। গৃহিণী তাকে চিনেছেন। ব্রজেশ্বরকে তিনি বলেন—পূর্ব- ইতিহাসের 'আর কোন উচ্চবাচ্যে কাজ নাই।' বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এবারের এই গৃহিণীপনার অকুণ্ঠ প্রশংসা ক'রেছেন।

শেষ দুটি পরিচ্ছেদে সাগর-বৌকে প্রফুল্ল বলেঃ সংসারেই নারীর সহজ ক্ষেত্র! 'ইহার অপেক্ষা কোন যোগই কঠিন নহে।' চতুর্দশ পরিচ্ছেদে দেখা যায়, প্রফুল্লর এ-সংসার সুখের সংসার। সংসারে সর্বপ্রীতিদায়িনী সে! লেখকের নিজের কথায়—'তার কোন কামনা ছিল না, কেবল কাজ খুঁজিত।' এবং—'যথাকালে পুত্র-পৌত্র সমাবৃত হইয়া প্রফুল্ল স্বর্গারোহণ করিল। দেশের লোক সকলেই বলিল, আমরা মাতৃহীন হইলাম।'

প্রায়শ্চিত্তের জন্যে ভবানী স্বেচ্ছায় ইংরেজের হাতে ধরা দেন। তাঁর যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর হয়। তিনি প্রসন্নভাবে সে দণ্ডাদেশ গ্রহণ করেন।

উপন্যাস শেষ ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র যা লিখেছেন, এ-আলোচনার ১৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় সে সব কথা আগেই বলা হয়েছে।[৪২]

'সীতারাম' তাঁর শেষ উপন্যাস বটে, কিন্তু সে-তুলনায় 'আনন্দমঠ' আর 'দেবীচৌধুরাণী' শিল্পগুণে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। 'দেবী চৌধুরাণীর

৪২। 'ধর্মতত্ত্বে'র উনিশের অধ্যায়ে 'দেবীচৌধুরাণী'র অতিপ্রাকৃত-লক্ষণের ব্যাখ্যা আছে। অনুশীলনের ফলে ভক্ত সর্বপ্রকারে 'দক্ষ' হয়। এবং ঈশ্বরানুগ্রহে 'নৈসর্গিক নিয়মের সাহায্যেই সে অত্যন্ত বিপন্ন অবস্থাতেও আত্মরক্ষা করতে পারে। বিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ চরিত্র তারই উদাহরণ। এই কথার পরে পাদটীকায় তিনি লিখেছেন: 'ঠিক এই কথাটি প্রতিপন্ন করিবার জন্য সিপাহীহস্ত হইতে দেবী-চৌধুরাণীর উদ্ধার বর্তমান লেখক কর্তৃক প্রণীত হইয়াছে। সময়ে মেঘোদয় ঈশ্বরের অনুগ্রহ; অবশিষ্ট ভক্তের নিজের দক্ষতা। দেবীচৌধুরাণীর সঙ্গে পাঠক এই ভক্তিব্যাখ্যা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।'

কাহিনী শেষ হবার পরে, বই বন্ধ ক'রে, এই অবাস্তব কল্পনা-সমারোহের কল্যাণদীপ্তির আবেশটুকু উপভোগ ক'রতে-ক'রতে মনে হয়—বঙ্কিম আমাদের সনাতন শুভবুদ্ধি! কথা-সাহিত্যে তিনি আমাদের আধুনিক শিল্পীদের মধ্যে আদিশিল্পী। মধুসূদনের,—বিদ্যাসাগরের,—ভূদেবের তিনি সমসাময়িক। দেবেন্দ্রনাথ, কেশবচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দের সমকালে তিনি আমাদের গভীর মনন, কল্পনা, বিতর্ক ও ভাবানুভূতির পথিকৃৎ। রবীন্দ্রনাথের ভাব-জীবনে প্রথম দীপ-দাতাদের তিনি অন্যতম। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী প্রভৃতি লেখকদের তিনি প্রেরণাদাতা। তাঁর সমকালে বাংলা উপন্যাস রচনায় তাঁর প্রভাব এড়িয়ে আত্মরক্ষা ক'রতে পেরেছিলেন বোধ হয় একমাত্র প্রতাপচন্দ্র ঘোষ। যোগ্য আহরণে-পরিমার্জনে ঈশ্বর গুপ্তের ভাষাকে তিনি সম্ভাবনাময়ী পরিণতি দিয়ে গেছেন। সংস্কৃত-বাংলা-ইংরেজির ত্রিস্রোতায় এগিয়ে, সুব্যক্ত সুপরিণামের দিকে তিনি তাঁর অবিশ্বাস্য অভিযানের কীর্তি রেখে গেছেন!

ইংরেজি রোমান্সের অনুরাগী পাঠকমনই ছিল বঙ্কিমের লেখক-মনের আদি উদ্দীপনা। রবীন্দ্রনাথই সেকথা ব'লে গেছেন।[৪৩] কথা-সাহিত্যে তাঁর কৃতিত্বের দাবি দু' দিক থেকে বিবেচ্য। প্রথমতঃ তিনি আমাদের প্রথম চিত্তাকর্ষক, সাহিত্যগুণান্বিত গল্প-কথাকার; দ্বিতীয়তঃ রোমান্স, উপন্যাস, এবং বড় গল্প,—তিন রকম রচনারই সার্থক দৃষ্টান্ত দিয়ে গেছেন তিনি। তিনি ছোট গল্প লেখেন নি।[৪৪] তবে, ১২৭৯ সালের চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে' তিনি ছোট আকারের গল্প 'ইন্দিরা' লেখেন। ১৩৬৪ সালের 'দেশ' পত্রিকার সাহিত্য-সংখ্যায় স্বর্গত উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়—এবং

৪৩। 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' [বিশ্বভারতী] ১৪শ খণ্ডের 'গ্রন্থপরিচয়ে' শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সঙ্গে আলোচনার অনুলিপিতে রবীন্দ্রনাথের এই কথার মধ্যেই আরো দেখা যায়—'বঙ্কিমের রচনায় আমরা যা পাই তা সামন্ততন্ত্র নয়। তাকে নতুন একটা পিপাসা বলতে পার...।'

৪৪। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন: 'মুহূর্তের,—যত গভীর অতলান্তই হোক্ সে মুহূর্ত,—কোনো মূল্য নেই বঙ্কিমের পূর্ণ জীবনায়নের সাধনায়। চন্দ্রশেখরে 'অগাধ জলে সাঁতার'-এর চরম সৌন্দর্যবিন্দুকে তিনি ভেঙে চুরে বিচূর্ণ করে দিতে পারেন অনায়াসে 'যোগবল' বা Psychic Force-এর জীবন-জিজ্ঞাসায়।' 'যুগলাঙ্গুরীয়' কাহিনীর শেষ দিকে হিরণ্ময়ী পুরন্দরের সাক্ষাৎ ও মিলনের দৃশ্যটিতেও বঙ্কিম গল্পের পটক্ষেপ করতে পারেননি। সকল প্রসঙ্গ, সকল কৌতূহল আগাগোড়া শেষ করে তবেই তিনি থামতে পেরেছেন।' —'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' [১৯৬২] পৃষ্ঠা ৬২ দ্রষ্টব্য।

তারও আগে স্বর্গত নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী তাঁর 'বাংলা ছোট গল্প' সম্পর্কিত আলোচনায় বাংলা ছোটগল্পের প্রথম আবির্ভাবের উদাহরণ দিতে গিয়ে ১২৮০ সালের জ্যৈষ্ঠের 'বঙ্গদর্শনে' প্রকাশিত 'শ্রী পূঃ' লিখিত 'মধুমতী' গল্পের উল্লেখ করেন। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী লিখেছেন:

> 'লেখক বঙ্গদর্শনে রচনাটিকে উপন্যাস নামে পরিচিত করেছেন। মূল গল্পাংশে বঙ্কিমচন্দ্রের বিভিন্ন কাহিনীর প্রভাব অনায়াসে চোখে পড়বে,—বিন্যাস এবং ভাষাভঙ্গিতেও তাই। তাছাড়া মনে হয়, ইন্দিরার মতই সংক্ষিপ্ত গল্প বা উপন্যাস হিসেবে কাহিনীটির পরিকল্পনা করা হয়েছিল। বঙ্গদর্শনে 'ইন্দিরার' বিস্তার প্রায় ১৮ পৃষ্ঠা; 'যুগলাঙ্গুরীয়' সমাপ্ত হয়েছে কিঞ্চিৎ অধিক ১৫ পৃষ্ঠায়। সেই একই আকারের মুদ্রিত পৃষ্ঠা ১৪টির কিছু বেশি জুড়েছে মধুমতী। কিন্তু এই আকৃতি-সংক্ষিপ্তির জন্যে মধুমতী ছোট গল্প নয়; স্রষ্টার দৃষ্টিভঙ্গির হ্রস্বতা ও আপেক্ষিক সীমায়তিই এখানে যথার্থ ছোটগল্পের সম্ভাবনাকে অঙ্কুরিত করেছে।'[৪৫]

রবীন্দ্রনাথের ষোল বছর বয়সের গল্প 'ভিখারিণী'র ['ভারতী' ১২৮৪, শ্রাবণ-ভাদ্র] আবহাওয়ায় তিনি অনুভব করেছেন—'বঙ্কিমের দুর্গেশনন্দিনী, মৃণালিনী',—রমেশচন্দ্রের জীবন-সন্ধ্যা, জীবন-প্রভাতের স্বপ্ন-সৈকতে ঘুরে ফিরছে সমুত্তীর্ণ কৈশোর বয়ঃসন্ধির উদ্বেল আবেগ।'[৪৬]

ইংরেজি রোমান্সের প্রতি অনুরাগ মেনে নিয়ে, বঙ্কিম তাঁর নিজের কালের বাঙালী মনের বস্তুদৃষ্টি এবং ভাবকল্পনা—দুয়েরই সমবায়ে, নিজস্ব এক জগৎ সৃষ্টি করেন। সমাজ এবং রাষ্ট্রের বাস্তব অবস্থা, এবং ব্যক্তি-মনের তদানীন্তন চাহিদা,—দুইই তিনি লক্ষ্য ক'রে গেছেন। ভাটপাড়ার রামশিরোমণির কাছে বঙ্কিমের সংস্কৃত শিক্ষার কথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখে গেছেন। বঙ্কিম তাঁর গল্প-উপন্যাসে অরণ্যভূমির দৃশ্যপটও ব্যবহার ক'রেছেন, রাজা-বাদশা'র হারেম-দরবার-যুদ্ধক্ষেত্রের ছবিও দেখিয়েছেন। অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী তাঁর 'ইন্দিরা', 'যুগলাঙ্গুরীয়ে'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রের 'রামের সুমতি, 'বিন্দুর ছেলে' ইত্যাদি ক্ষুদ্রায়তন উপন্যাসের সাদৃশ্যের দিকটিও জানিয়েছেন।[৪৭]

৪৫। 'বাংলা সাহিত্যের ছোটগল্প ও গল্পকার' [১৯৬২] পৃষ্ঠা ৭১ দ্রষ্টব্য।

৪৬। ঐ পৃষ্ঠা ৭৯ দ্রষ্টব্য।

৪৭। ঐ, পৃষ্ঠা ১২৬ দ্রষ্টব্য।

তাঁর কথাসাহিত্যে সমাজের তদানীন্তন সমস্যা যা ফুটেছে, তা প্রধানতঃ নর-নারীর বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়ের সমস্যা। রোহিণী-গোবিন্দলাল, প্রতাপ-শৈবলিনী, নগেন্দ্র-কুন্দ ইত্যাদি প্রতিটি ক্ষেত্রেই সমস্যা-গ্রন্থি আছে বটে, কিন্তু সে সবই প্রেম আর বিবাহ-ঘটিত সমস্যা! কিন্তু আধুনিক সমাজেও সে-সমস্যার দাবি ফুরোয়নি। সেই সমস্যা-ক্ষেত্রেই তাঁর রোহিণী চিরস্মরণীয়া! সে-সম্বন্ধে অনেকের অনেক মন্তব্যের সঙ্গে ডক্টর সুশীলকুমার দের 'নানা নিবন্ধের' 'রোহিণী' প্রবন্ধটি স্মরণীয়। রোহিণী সম্বন্ধে উগ্র বঙ্কিম-বিরোধিতার ধারা পরিহার ক'রেও তিনি পরিণামে গোবিন্দলালের শাস্তিলাভ এবং রোহিণী আর ভ্রমরের শোচনীয় অবসান দেখে ব্যথিত হ'য়েছেন!

একালের ব্যক্তি-মনের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য এবং সমাজ-জীবনের বিভিন্ন-সমস্যা,—আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে নাস্তিক্য, সংশয়বাদ ইত্যাদি তাঁর চিন্তা-জগতে ছিল বটে, কিন্তু একালের সাম্প্রতিকতম সমস্যাগুলি তাঁর কথাসাহিত্যে স্বভাবতঃই অনুপস্থিত! জাতীয়তাময় দেশপ্রেম,—আর, তারই মধ্যে বিশ্বসংস্কৃতির প্রতি অনুরাগ, দুইই তিনি অনুভব ক'রেছেন, কিন্তু প্রথমটির প্রাধান্যে দ্বিতীয়টি হয়তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে গৌণ মনে হ'তে পারে।

মধুসূদনের মতনই রমণীর বীরাঙ্গনা মূর্তির ধ্যান ছিল তাঁর মনে! দেশকে তিনি দেশের অতীত থেকে বর্তমান অবধি সুদীর্ঘ এক তপস্যায় বিস্তীর্ণ ব'লে অনুভব ক'রেছেন। পাত্র-পাত্রীর মনোবিশ্লেষণেও তাঁর আগ্রহ ছিল,—সংলাপে, ঘটনায়, গল্পের আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ রাখতেও তিনি আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু 'চোখের বালি' বা নষ্টনীড়'-এর তীক্ষ্ণ মনোবিশ্লেষণী আগ্রহ বাংলা কথাসাহিত্যে তখনো ভবিষ্যতের সম্ভাবনা! রোহিণী-কুন্দ-শৈবলিনী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে তিনিই সে-সম্ভাবনা উজ্জ্বলতর ক'রে গেছেন। তাঁর 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর' প্রভৃতি সেদিক থেকে স্মরণীয়।

চরিত্র, ঘটনা এবং গল্পরস,—কথাসাহিত্যের এই তিন উপাদানের প্রত্যেক দিকেই তাঁর নজর ছিল। কিন্তু তাঁর সমস্ত রচনা একযোগে মিলিয়ে দেখলে, তাঁকে প্রধানতঃ ঔপন্যাসিক ব'ললেও আশা মেটেনা, প্রধানতঃ প্রবন্ধ-সাহিত্যিক ব'ললেও বলা শেষ হয় না। উজ্জ্বল, আয়তচক্ষু, প্রশান্ত, আত্মস্থতার রূপ তিনি! তাঁর দেশপ্রেম তাঁর কৃষ্ণচরিত্র-চিন্তায় গিয়ে মিশেছে। তাঁর কথাসাহিত্যও সেই কৃষ্ণকথায় মিলেছিল। দেশের শিক্ষিত-সমাজের লোকপ্রবৃত্তিকে বহুপ্রযত্নে তিনি মধ্যযুগ থেকে

'আধুনিক' ক'রে তোলবার চেষ্টা ক'রে গেছেন। এ-কাজে, রামমোহন-বিদ্যাসাগরের তুলনায় তাঁর হাতে ছিল যোগ্যতর বাহন। তিনি যে মূলতঃ সাহিত্য-স্রষ্টা, সে-কথা ভোলবার নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবের আগে থেকেই তাঁর জন্যে দেশের মাটি তৈরী হয়েছে। সেকালের 'জ্ঞানসন্দীপনী সভা,' 'জ্ঞানোপার্জিকা সভা' ইত্যাদি জ্ঞানচর্চার অসংখ্য আয়োজনের কথা বিবেচ্য। আঠারো শ ষাটের দশকে, দেশে যখন কোঁৎ-চর্চা চ'লেছে, সেই সময়েই, ১৮৬৮তে হিন্দু-মেলার দ্বিতীয় অধিবেশনে গণেন্দ্রনাথ ঠাকুর ব'লেছেন—'এই মেলার প্রথম উদ্দেশ্য, বৎসরের শেষে হিন্দুজাতিকে একত্রিত করা।'

যুগের সেই হাওয়াতেই বাংলা সাহিত্যে য়ুরোপের ভাব-ভাবনা-সংযোগের সার্থক আদি-প্রবর্তকদের অন্যতম তিনি। তিনি জ্ঞানপ্রবীণ 'আধুনিক'! সে-আধুনিকতা ঠিক আঞ্চলিক দেশপ্রেম নয়। তাঁর দৃষ্টি ছিল আন্তর্জাতিক, অখণ্ড মানব-কল্যাণের দিকে।

'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশের সময় থেকে প্রায় শেষ পর্যন্ত তাঁর পারিবারিক জীবনের কয়েকটি প্রসঙ্গ এখানেই স্মরণ করা যেতে পারে। ১৮৬৫তে যাদবচন্দ্র উইল ক'রে কাঁটালপাড়ার ভদ্রাসন সঞ্জীবচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্রকে দেন; শ্যামাচরণ আর বঙ্কিম বঞ্চিত হন। ১৮৭৬এ আবার পারিবারিক অশান্তি, আর সেই সঙ্গে তাঁর 'বঙ্গদর্শন'-এর স্বত্ব-ত্যাগ স্মরণীয়। ১৮৭৭এ তিনি কাঁটালপাড়া ছেড়ে চুঁচুড়ায় চ'লে আসেন। ১৮৮১তে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। ১৮৮২তে পিতৃ-শ্রাদ্ধ উপলক্ষে বড়ো ভাই শ্যামাচরণের সঙ্গে তাঁর মতান্তর ঘটে। সেই সময়ে হেস্টির সঙ্গে তাঁর বাদানুবাদ চ'লেছে। ১৮৭৩ এর ডিসেম্বরে বহরমপুরে ডাফিন সাহেবের সঙ্গে তাঁর বিবাদের কথা বলা হয়েছে। ১৮৮১তে আবার কর্মস্থানে বাক্‌ল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়। আবার, ১৮৮৩তে হাবড়ায় ম্যাজিস্ট্রেট ওয়েস্টমেকটের সঙ্গেও তাঁর তীব্র মনান্তর ঘটে। তিনি নিত্য-সক্রিয়তার উদাহরণ। কর্ম-জীবনে, সাহিত্য-ক্ষেত্রে সর্বত্রই তিনি ছিলেন অশ্রান্ত কর্মী এবং স্পষ্ট মতামতের মানুষ।

শেষ কথা

রবার্ট ওয়েন, প্রুধোঁ ইত্যাদি সমাজতান্ত্রিক চিন্তার অগ্রণী মনীষীদের সম্বন্ধে বঙ্কিমের যেমন খেয়াল ছিল, কার্ল মার্কসের প্রসঙ্গও তেমনি তাঁর নজর এড়ায়নি। তিনি রজার বেকন সম্বন্ধেও সজাগ ছিলেন, ফ্রান্সিস বেকন সম্বন্ধেও। ক্যান্ট, স্পিনোজা, হেগেল, হ্যামিল্‌টন, ফিক্টে,—গ্যেটে, শ্লেগেল, শীলারও তাঁর রচনার অন্তর্ভুক্ত। আরো অনেকেই। অতীতের শঙ্করাচার্য, শ্রীধরস্বামী,—একালের দয়ানন্দ সরস্বতী, প্রতাপচন্দ্র মজুমদার, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি অনেকের কথাই তিনি তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে' এবং অন্যান্য লেখায় উল্লেখ ক'রেছেন। কার্লাইল, ইমার্সন, গ্যারিবল্‌ডি, ম্যাৎসিনী, ডিস্‌রেলি, গ্লাডস্টোনের ভাবধারায় তাঁর কৈশোর-যৌবনের পুষ্টি ঘটেছিল। সেই সঙ্গে ছিল হিন্দু ঐতিহ্যের অনুসন্ধান।

১৮৮২র অক্টোবরে কার্লাইল-ইমার্সন-পড়া কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি ব্রাহ্ম ভক্তদের রামকৃষ্ণ ঠাকুর নিষ্কাম ধর্ম আর অচলা ভক্তির কথা শুনিয়েছেন।[১] লোকশিক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন: 'আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুনবে? কলকাতার হুজুগ তো জানো। যতক্ষণ কাঠে জ্বাল, দুধ ফোঁস ক'রে ফোলে। কাঠ টেনে নিলে কোথাও কিছু নাই। কলকাতার লোক হুজুগে।'

সাহিত্যের মাধ্যমে বঙ্কিম চেয়েছিলেন লোক-কল্যাণ। শেষ বয়সে, খুবই স্পষ্টভাবে তিনি নিজে সেই প্রচারকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন! সেই সময়ে রামকৃষ্ণ বলেন—'আদেশ না থাকলে, 'আমি লোক শিক্ষা দিচ্ছি' এই অহঙ্কার হয়। অহঙ্কার হয় অজ্ঞানে। অজ্ঞানে বোধ হয়, 'আমি কর্তা।' বলেন—'আমি ম'লে ঘুচিবে জঞ্জাল। হাজার বিচার কর, 'আমি' যায় না।

১। কার্লাইল সম্বন্ধে বঙ্কিমের আগ্রহের একটি নজীর তাঁর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাইশের শ্লোকের ব্যাখ্যায় পাদটীকায় পাওয়া যায়। আবার, জন্মান্তরবাদের কথা-প্রসঙ্গে তিনি খ্রীষ্ট, বৌদ্ধ, ইস্‌লাম ও হিন্দুধর্মের প্রধান তত্ত্বের মধ্যে আত্মার অবিনাশিতার কথা বলেছেন এবং Tylor এর 'Primitive Culture' এর যেমন উল্লেখ করেছেন, তেমনি আবার Herder, Lessing, Fourier, Soame, Jenys, Figuier, Dupont de Nemours, Pezzani প্রভৃতি আলোচকদের নাম করেছেন।

তোমার আমার পক্ষে 'ভক্ত আমি' এ অভিমান ভাল।' বঙ্কিম তাঁর 'ধর্মতত্ত্বে', 'শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়', 'কৃষ্ণচরিত্রে' বিচার-বিতর্কের পথ ধ'রেই লোকহিতের সাধনায় সাধ্যানুসারে 'অহং'-সংকীর্ণতা দূর করবার উপদেশ দিয়ে গেছেন।

সিঁথির ব্রাহ্ম-সমাজে শিবনাথ শাস্ত্রী প্রভৃতির উদ্দেশে রামকৃষ্ণ বলেন—'বেদান্তদর্শনের বিচারে ব্রহ্ম নির্গুণ। তাঁর কি স্বরূপ, তা খুলে বলা যায় না! কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎও সত্য। ঈশ্বরের নানারূপও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তিবোধও সত্য।' এবং—'যদি আমার এক ঘটি জলে তৃষ্ণা যায়, পুকুরে কত জল আছে, এ মাপবার আমার কি দরকার? আমি আধ বোতল মদে মাতাল হ'য়ে যাই, শুঁড়ির দোকানে কত মণ মদ আছে, এ হিসাবে আমার কি দরকার? অনন্তকে জানার দরকারই বা কি?'

সেই ১৮৮২র ডিসেম্বরের মাঝামাঝি, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সঙ্গে কথা-প্রসঙ্গে ব্রাহ্ম-সমাজের কাজে নিযুক্ত থাকবার জন্যেই বিজয়কৃষ্ণ তাঁর কাছে আসবার ফুরসৎ পাননি শুনে রামকৃষ্ণ বলেন,—'কামিনী-কাঞ্চনে জীবকে বদ্ধ করে। জীবের স্বাধীনতা যায়।' এই প্রসঙ্গেই তিনি নিত্যানন্দ গোস্বামীর ছেলে বীরভদ্রের 'বারশো নেড়া আর তেরশো নেড়ীর' গল্প বলেন!

রামকৃষ্ণ ছিলেন সেব্য-সেবক ভাবের ভাবুক। তিনি বলেন: 'দেখো গঙ্গারই ঢেউ, ঢেউয়ের গঙ্গা কেউ বলে না।' বঙ্কিম এসব অনুভূতির প্রতি উদাসীন ছিলেন মনে করা ঠিক হবে না। কিন্তু পুরোপুরি কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগের নির্দেশ এ-সংসারে বড়োই অসামঞ্জস্য-ব্যঞ্জক ব্যাপার! নানা ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি সম্বন্ধে গভীর অধ্যবসায়ের সঙ্গে অনুসন্ধান ক'রে,—শেষ পর্যন্ত গীতার 'স্বধর্মপালন'-তত্ত্বই ছিল তাঁর আদর্শ। বিদ্যাসাগরও সেই আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। আমাদের উনিশ শতকের জাতীয় সংস্কৃতির প্রধান অবলম্বন এই গীতা! শেষ পর্যন্ত গীতার কর্মবাদ আর অহং-বিসর্জনের সাধনাই ছিল বঙ্কিমের সাধনা।

১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের ৬ই ডিসেম্বর শোভাবাজার বেনেটোলায় অধরলাল সেনের বাড়িতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে রামকৃষ্ণদেবের আলাপ হয়। অধরলাল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তখন তাঁর বয়স প্রায় তিরিশ বছর। বঙ্কিম

স্বতঃপ্রবৃত্ত হ'য়ে সেখানে রামকৃষ্ণকে দেখতে যান। রাধা-কৃষ্ণের যুগল-মূর্তির ব্যাখ্যা শুনে, তিনি তাঁর বন্ধুদের সঙ্গে একান্তে ইংরেজিতে কয়েকটি কথা বলেন। ইংরেজি আলাপ শুনে, রামকৃষ্ণ কৌতুকময় তিরস্কার করেন। তাঁকে বঙ্কিম বলেন—'আপনি প্রচার করেন না কেন?' তার উত্তরে তিনি কেশবচন্দ্র প্রভৃতির উদ্দেশে ব্যবহৃত পূর্বোদ্ধৃত কথাগুলিরই পুনরাবৃত্তি করেন। তিনি ইঙ্গিতে বলেন, ইহজীবনের সঞ্চয় পরকালে বর্তায়। তারপর সোজাসুজি বঙ্কিমকে প্রশ্ন করেন—'আচ্ছা আপনি কি বল, মানুষের কর্তব্য কি!'

বঙ্কিম হাসতে হাসতে বলেন—'আজ্ঞে তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন'!

সে-পরিহাসে রামকৃষ্ণ অপ্রসন্ন হন। বলেন: 'চিল শকুনি খুব উঁচুতে উঠে, কিন্তু ভাগাড়ের দিকে কেবল নজর!' তারপর নরম সুরে বঙ্কিমকে বলেন: 'আপনি কিছু মনে কোরো না।'

বঙ্কিম বলেন—'আজ্ঞা, মিষ্টি শুনতে আসিনি।'

দ্বিধা না ক'রে, বঙ্কিম সেদিন তাঁকে একথাও বলেন যে, 'টাকা মাটি, মাটি টাকা' কথাটা ঠিক নয়। টাকা থাকলে অন্ততঃ পরের উপকার করা যায়। পরমহংসদেব বলেন, ঈশ্বর নিজের কাজ নিজেই ক'রিয়ে নেন! জীবের কর্তব্য শুধু তাঁর শরণাগত হওয়া!

রামকৃষ্ণ নিজেও মাঝে মাঝে ভক্তদের কাছে শোনা দু'একটি ইংরেজি শব্দ ব্যবহার ক'রতেন। তিনি জিগেস করেন—'তুমি কি বল? আগে সায়েন্স না আগে ঈশ্বর?' বঙ্কিম বলেন—'আগে পাঁচটা বিষয় জানতে হয়'।

মনে পড়ে, 'আনন্দমঠে' আদিতেই বহির্বিষয়ক জ্ঞানচর্চার প্রাধান্যের প্রসঙ্গ! বঙ্কিমের এ-উত্তর তাঁর সে-ধারণার সঙ্গে খুবই সংগত। রামকৃষ্ণের উত্তরও প্রসিদ্ধ। তিনি বলেন: 'তোমার দরকার ঈশ্বরকে লাভ করা। তুমি অত জগৎ, সৃষ্টি, সায়েন্স-ফায়েন্স ক'রছো কেন?...আম খেতে এসেছিস্, আম খেয়েই যা।'[২] বঙ্কিম ঠিক এ-দৃষ্টিরও মানুষ ছিলেন না, আবার শশধর তর্কচূড়ামণি বা কৃষ্ণপ্রসন্ন সেনের হিন্দুয়ানিও তাঁর ছিল না।

বঙ্কিম বহির্বিষয়ক জ্ঞানেও আগ্রহী ছিলেন, অন্তর-জ্ঞানেও অনুসন্ধিৎসু ছিলেন। তাঁর জীবনচর্চার আদর্শকে সংক্ষেপে 'সামঞ্জস্যবাদ' বলা চলে।

২। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ৫ম ভাগ পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৭২-৭৭ দ্রষ্টব্য।

১৮৯৪এ গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে লেখা তাঁর একখানি চিঠি ছাপা হ'য়েছে তাঁর 'পত্রাবলী'তে। গুরুদাস তাঁর 'জ্ঞান ও কর্ম' বইখানির [দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯১৩] অন্ততঃ দু'জায়গায় বঙ্কিমের উল্লেখ করেন এবং শেষ উল্লেখ-টিতে 'কৃষ্ণচরিত্রের' প্রথম পরিচ্ছেদ স্মরণ ক'রে বলেন—পরার্থপ্রধান 'হিতবাদ' আর স্বার্থবিলোপী 'নিবৃত্তিবাদ', এই দুই 'বাদের' সামঞ্জস্য-সাধনের পথ-ই 'সামঞ্জস্যবাদ'।[৩] বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্ব' ১৩শ অধ্যায়ে ভক্তিবাদের আলোচনায় গীতার জ্ঞান, কর্ম, ভক্তির সামঞ্জস্য-আদর্শ প্রদর্শিত হ'য়েছে। ২২শ-২৩শ অধ্যায়ে পাশ্চাত্য হিতবাদের সঙ্গে হিন্দু সামঞ্জস্য-আদর্শের যোগ দেখিয়ে গেছেন তিনি।

কালীপ্রসন্ন ঘোষ, শ্রীশচন্দ্র মজুমদার, গিরিজাপ্রসন্ন রায়, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, কুমার বিনয়কৃষ্ণদেব প্রভৃতি বন্ধুদের কাছে লেখা তাঁর 'চিঠিগুলিতে তাঁর 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'আনন্দমঠ', 'কৃষ্ণচরিত্র' ইত্যাদি রচনার যৎকিঞ্চিৎ উল্লেখও এইসূত্রে মনে পড়ে। মনে পড়ে, রমাপ্রসাদ চন্দ, ললিতকুমার মিত্র, হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ প্রভৃতির বঙ্কিম-আলোচনা। রবীন্দ্র-নাথের কাছে লেখা চিঠিতে 'আনন্দমঠ' সম্বন্ধে চন্দ্রনাথ বসুর প্রতিকূল সমালোচনার কথা মনে পড়ে।[৪] মনে পড়ে সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা 'কপালকুণ্ডলা ও মিরাণ্ডা', 'সূর্যমুখী ও কুন্দনন্দিনী।' এই রকম আরো অনেক লেখা!

উমেশচন্দ্র বটব্যাল [১২৫৯-১৩০৫] যখন প্রেমচাদ-রায়চাঁদ-বৃত্তি [১৮৭৬] পান, বঙ্কিমের 'চন্দ্রশেখর' তখন সদ্য-প্রকাশিত বই। রামেন্দ্রসুন্দর এই উমেশচন্দ্রের বৈদিক প্রবন্ধগুলির প্রশংসা ক'রে লিখেছেন—'তিনি পাশ্চাত্য পদ্ধতি অবলম্বন করিয়া দেশের প্রাচীন অবস্থার আলোচনা করিতেন।' ইংরেজি 'evolution' আর সাংখ্যদর্শনের অভিব্যক্তিবাদ যে এক নয়, উমেশ-চন্দ্রের সে-আলোচনারও তিনি বিশেষ প্রশংসা করেন। চৈতন্যদেবের ভক্তি-আদর্শ সম্বন্ধে উমেশচন্দ্রের কতকটা প্রতিকূলতা ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর তাতে অনুমোদন জানান নি বটে, কিন্তু তাঁর সে-প্রবন্ধের উপসংহারে লিখে গেছেন—'যে ভাবপ্রবণ সমাজদ্রোহ ও কর্মদ্রোহ শাস্ত্রসম্মত নিষ্কাম

৩। 'জ্ঞান ও কর্ম' ৭৮ ও ২৪৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

৪। 'সাহিত্যসাধক চরিতমালা' দ্রষ্টব্য।

কর্মতৎপরতা হইতে আমাদের সমাজকে ভ্রষ্ট করিবার জন্য পুনঃপুনঃ চেষ্টা করিয়া আসিতেছে, উমেশচন্দ্র তৎপ্রতিকূলে দাঁড়াইতে সাহসী হইয়াছিলেন।' আনন্দমঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম সম্বন্ধে সত্যানন্দের সমালোচনা মনে পড়ে। বঙ্কিমচন্দ্র এ ব্যাপারে একক বা নিঃসঙ্গ ছিলেন না। তারই নানা দৃষ্টান্তের একটি দৃষ্টান্ত এই উমেশচন্দ্র বটব্যাল! শতাব্দীর প্রথম প্রান্তের হাওয়া যেন শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিশেষ একভাবে টিঁকেইছিল! সে-হাওয়ায় হিন্দু কলেজের ডিরোজিও-রিচার্ডসনও ছিলেন,—বেদ-বেদান্ত, গীতা-মহাভারতও ছিল!

রামকৃষ্ণের অখণ্ড বিশ্বাসের আশ্রয় পেয়ে বিবেকানন্দের জিজ্ঞাসু মনের পরিতৃপ্তি ঘটেছিল। বিদ্যাসাগর নিজের ধর্মমতের কথা বিশেষ ব'লতে চাইতেন না। তবে, বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁর বিশেষ স্নেহাস্পদ ছিলেন। তাঁরই কথা-মতন 'বোধোদয়' বইখানিতে ছোটোদের জন্যে ঈশ্বর-সম্পর্কে একটি নিবন্ধ যোগ ক'রেছিলেন তিনি। রামকৃষ্ণদেব তাঁর কাছে এসে বলেন—'খানা ডোবা খাল বিল পার হয়ে এবার সাগরে এসে পড়লাম'! সে-সমাদরের জবাবে তিনি নিজেকে বলেন—'নোনা জলের সাগর'! কিন্তু বারাসতের সাধক কালীকৃষ্ণ মিত্রের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল। তবে, কখনোই ধর্ম-প্রচারক হ'তে চাননি তিনি। একবার তাঁর স্নেহাস্পদ ডাক্তার অমূল্যচন্দ্র বসুকে তিনি ব'লেছিলেন, জীবনে গীতার উপদেশ অনুসারে চলাই শ্রেয়![৫]

১২৮২র চৈত্রের 'বঙ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র লেখেন: 'মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেকগুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না।'

বঙ্কিমও জীবনে নানা কাজ ক'রে গেছেন। তবু, সাহিত্যই ছিল তাঁর চিরব্রত। বঙ্কিম-সাহিত্য সেই চিরব্রতী জীবন-রসিকের বিচিত্র কথা।

বঙ্কিম আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের প্রথম শিল্পী এবং প্রথম ভাবনেতাদেরই একজন। ইতিহাস, বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য—একালের

৫। 'বিদ্যাসাগর': চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ২য় সং; পৃষ্ঠা ৫৩৫-৩৯ দ্রষ্টব্য।

শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' বইখানির দ্বিতীয় খণ্ডে [মাঘ, ১৩৬৪, পৃষ্ঠা ২৭৬-৭৭] ব্রাহ্মসমাজের নানা সংস্কারে বিদ্যাসাগরের উৎসাহের কথা লক্ষ্য করেছেন।

মানুষের প্রধান ভাবনাগুলির কোনোটিই তিনি বাদ রাখেন নি। তাই তাঁর কীর্তি আরো অনেক কালের আলোচনার বিষয়। খুব সাম্প্রতিক কালেও তাঁর সম্বন্ধে আমাদের সাহিত্যিকদের সানুরাগ মনোযোগ যে ফুরোয়নি, তারই নমুনা হিসেবে স্বর্গত কবি মোহিতলাল, যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতির এবং শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ বিশী ইত্যাদি লেখকদের নাম করা হয়েছে। সেই ধারাতেই শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'বঙ্কিমচন্দ্র' পুস্তিকা এবং শ্রীযুক্ত শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'শাদা পৃথিবী [১৩৫৫] গল্প-সংকলনের প্রথম রচনা 'মায়া-কানন' স্মরণীয়। শরদিন্দু বাবু তাঁর এই লেখাটিতে, বঙ্কিম-সাহিত্যপাঠে একালের সাহিত্যস্রষ্টার গভীর আনন্দের প্রণতি জানিয়েছেন!

বঙ্কিমচন্দ্রের অনুরাগী লেখক-লেখিকার তালিকা নিরন্ত। তিনি সব্যসাচী! বাংলার চিন্তাক্ষেত্রে আজও তিনি যাত্রীর মশাল! এই কথাই তাঁর সম্বন্ধে শেষ কথা।

প্রসঙ্গ-নির্দেশিকা

মুদ্রণ-ত্রুটি

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ পাঠ
৪	১১	হস্তলিখিত	হস্তলিখিত
৫	১৬	১৮৩০-৭০	১৮৪০-৭০
৯	১	আরোহপস্থা	আরোহপন্থা
১৪	১২	সার ডিরোজিও	আর ডিরোজিও
১৫	১৪	নরসন	নিরুসন
৪৪	২৩	জ্ঞানেন্দ্রনাথের	জ্ঞানেন্দ্রলালের
৪৭	৬	then	than
৪৮	১৭	was to	was to be
৪৯	২৩	য্যাপক	ব্যাপক
৫৪	১১	গম্ভীর	গম্ভীর
৮০	১৮	সাহিত্যে-সাধনার	সাহিত্য-সাধনার
৯৪	৯	'ইউ-টিল্-ইটি-আই'	'ইউ-টিল্-ইট্-ই'
৯৯	২৯	ব্যবহার বিবিধও	ব্যবহারবিধিও
১০৪	৪	লঘু	লঘু
১১২	১০	লঘু	লঘু
১১৭	শেষ	সমুচিত	সমুচিত
১২১	১৯	উাদহরণ	উদাহরণ
১৩০	১১	[তারিখে ভাঙা টাইপ]	১২৮০
১৩৭	৭	ঐ	১২৮৪
১৪২	পাদটীকা	Warkingmen	Workingmen
১৪৬	২১	[তারিখে ভাঙা টাইপ]	১৮৬০
১৫৭	৭	এ-সঙ্গে	একসঙ্গে
১৫৮	৫	[তারিখে ভাঙা টাইপ]	১২৯১
১৫৮	২০	ঐ	১৮৯২
১৬৬	১৩	'করুণা ও ফুলমণি'	'ফুলমণি ও করুণার বিবরণ'
১৬৭	২৩	১৮৫৭-১৯৩২	১৮৫৮-:৯৩২
৩০৪	২৭	বিশ্বসযোগ্যতা	বিশ্বাসযোগ্যতা
৩৯৬	২২	মুর্তিবৎ	মূর্তিবৎ
৪০৪	৯	খাওয়াই	খাওয়াইয়া

'রোম্যান্স' বানানটি এ-বইয়ের সর্বত্র 'রোমান্স' পড়তে হবে।

এই লেখকের :

আলোচনা

কবিতার বিচিত্র কথা

রবীন্দ্র-সাহিত্য-পাঠ

তারাশঙ্কর

সাহিত্য-পাঠকের ডায়ারি

সাহিত্যের নানা কথা

সাহিত্য-বিচিন্তা

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা ও কাব্যরূপ

সম্পাদিত

কিরণধন চট্টোপাধ্যায়ের 'নতুন খাতা'
ও অন্যান্য কবিতা

রবীন্দ্র-চর্চা

কবিতা

তিমিরাভিসার

সাম্প্রতিক স্বনির্বাচিত কবিতা

[illegible]

গল্প-সংগ্রহ

অশেষ গল্প

ছোটোদের

মধ্যরাতের সূর্য

এবং অন্যান্য বই